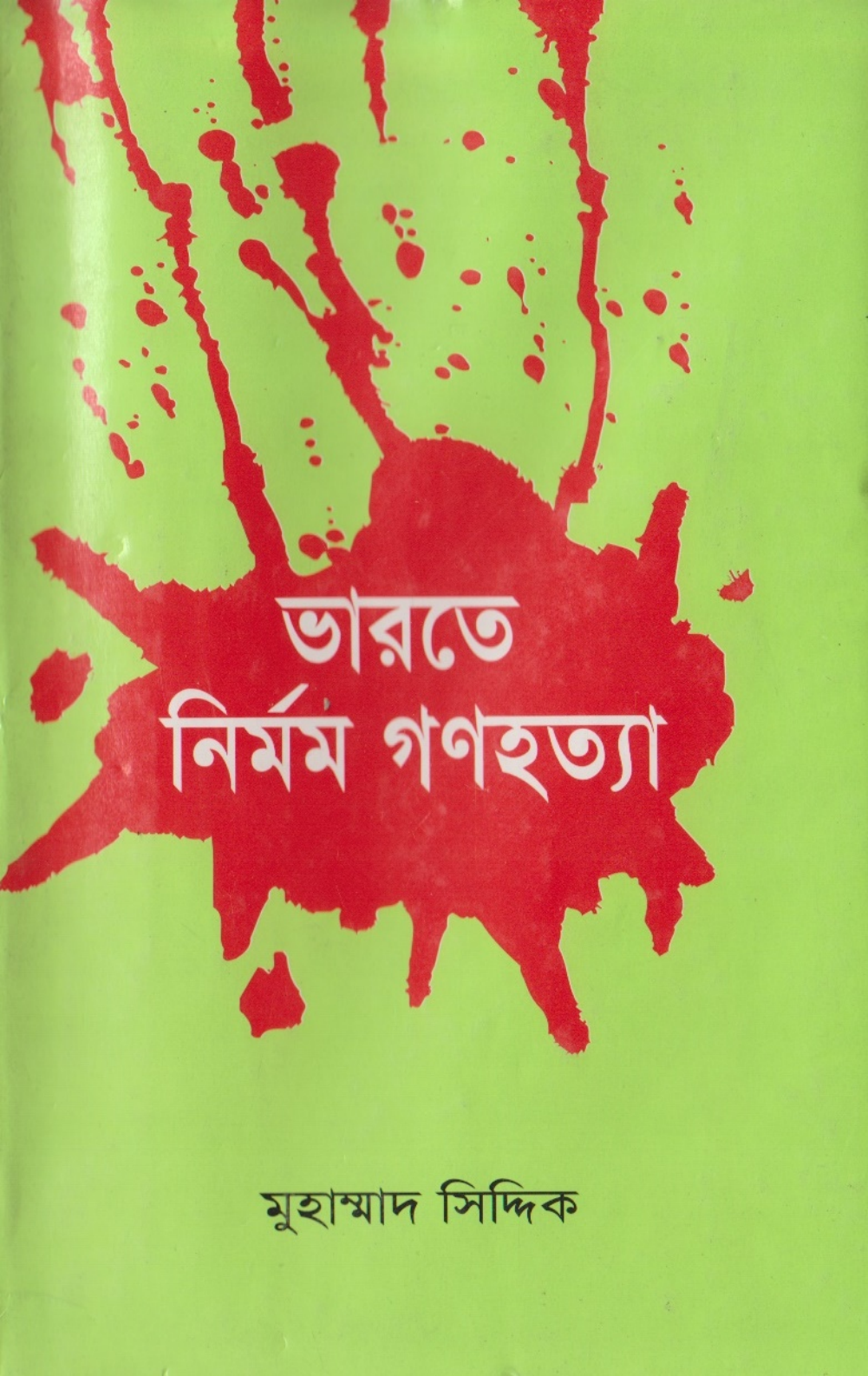


মুহাম্মাদ সিদ্দিক

# ভারতে নির্মম গণহত্যা

লেখক ও সংকলক
মুহাম্মাদ সিদ্দিক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৯৬

১ম প্রকাশ

| | |
|---|---|
| মহররম | ১৪২৯ |
| মাঘ | ১৪১৪ |
| জানুয়ারী | ২০০৮ |

বিনিময় মূল্য ঃ ২৭০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

BHARATE NIRMAM ETHNIC CLEANSING (Brntal Ethnic Cleansing in India) by Mohammad Siddeque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 270.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সূচীপত্র

ভূমিকা-১১
নির্মমতা বনাম উদারতার ইতিহাস–মুহাম্মদ সিদ্দিক-১৩
কাঁদো, আরো কাঁদো ঃ কান্নায় ভিজছে গোটা দেশ–হর্ষ মান্‌দার-১২৯
চাইলে পুলিশ দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারতো–হর্ষ মান্‌দার-১৩৯
মুষল পর্বই চলছে–মহাশ্বেতা দেবী-১৪৩
কোথায় শেষ ?–মহাশ্বেতা দেবী-১৪৭
এমন নিদান আছে নাকি হিন্দুশাস্ত্রে ?–অরুন্ধতী রায়-১৫০
বহুরূপী–অরুন্ধতী রায়-১৫৪
কাঠের রুটি–অরুন্ধতী রায়-১৫৯
আমরা কি আদৌ তৈরি ?–অরুন্ধতী রায়-১৬৫
নিষ্ক্রিয়তার মাশুল গুনছি আমরা–অরুন্ধতী রায়-১৬৮
হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে পঞ্চম পদক্ষেপ–জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়-১৮৮
গুজরাতে দাঙ্গার নামে হয়েছে পরিকল্পিত গণহত্যা–অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী-১৯২
গুজরাতে যা দেখে এলাম ঃ 'হিন্দুত্ব'র নামে সংগঠিত হত্যা–শর্মিলা বসু-১৯৬
মহাত্মা গান্ধীর ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার এক পরিকল্পিত চক্রান্ত–রফীক যাকারিয়্যা-২০০
গুজরাট ঃ গ্রামাঞ্চলও ধ্বংসের শিকার–দিওনি বুনশা-২০৩
আর এস এস প্রধানমন্ত্রী ও গুজরাট সফর–আবু রিদা-২০৮
বাজপেয়ীর গুজরাত দর্শন–মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন-২১১
এক ভারতীয় পত্নী ও আর এস এসের স্বপ্নের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী–আবু রিদা-২১৪
শত কোটি ভারতবাসী আর কতদিন দাঁড়িয়ে দেখবে এই অব্যাহত গণহত্যা ?–আবু রিদা-২১৭
শুধু কথা ? শুধুই কথা ?–দেবেশ রায়২১৮
জবাব কী হবে মহাত্মাজি ?–দিলীপ রায়২২১
গুজরাট ঃ যতটুকু বুঝেছি–অশোক দাশগুপ্ত-২২৭
প্রতিটি দাঙ্গার বিষময় উপহারে আক্রান্ত হচ্ছে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর–দেবাংশু দাসগুপ্ত-২৩১
গুজরাতের পথে-ঘাটে শয়তানের নগ্ননাচ–রাজ্যসভায় মুহাম্মদ আজম খানের ভাষণ-২৩৫
অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে গুজরাটের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস–দেবু দত্তগুপ্ত-২৩৭
গুজরাতের গণহত্যার সামাজিক প্রেক্ষাপট–বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়-২৫৩

www.pathagar.com

গোধরাকাণ্ড ঃ ক্রিয়া ও 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'-র স্বরূপ সন্ধান–আবদুর রউফ-২৬১
শিখে নিতেই হবে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদকে ঠেকানোর নতুন গঠন প্রণালী–অরিজিৎ মিত্র-২৮২
জাতীয় আবেগের মহিমা— ভোট মেলেনি, আগুন জ্বলছে–অনির্বান চট্টোপাধ্যায়-২৮৯
আমাদের জোট বাঁধা জরুরি এই শহরেও, দাঙ্গার আগেই–অনিতা অগ্নি হোত্রী-২৯২
না, ধ্বংসকে বিধিলিপি ভেবে আমরা চুপ করে থাকবো না আর–শঙ্ক ঘোষ-২৯৪
গুজরাতের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার খেলা–সুমন চট্টোপাধ্যায়
আজও এত বিষ !–ভীষ্ম সাহানি-২৯৮
রাজা তোর কাপড় কোথায় ?–সোনিয়া জব্বার-৩০০
কেন এই গরীব মারা রাষ্ট্রীয় বাজেট ? কেন ধর্মের নামে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ?–মহাশ্বেতা দেবী-৩০৪
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভগৎ সিংয়ের আদর্শ চাই–এ. কে. রয়-৩০৭
গুজরাট নিয়ে প্রশ্ন, বাংলা নিয়ে ভাবনা–তপন মিত্র-৩০৯
ফৈয়াজ খাঁর সমাধির পর পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত তাজমহল–পাচু রায়-৩১৪
এ ভারত কি শুধুই গোবলয়ের ভূ-স্বামীদের ?–আজিজুল হক-৩১৮
গুজরাট দিচ্ছে ডাক–অশোক দাসগুপ্ত-৩২২
অশান্তির দূত–সঞ্জীব সিংহ-৩২৮
গুজরাট গণহত্যার বিশেষ রূপ–সুকোমল সেন-৩৩৯
ঘৃণার ধারণাই সঙ্ঘের চিন্তার কেন্দ্রে–এ. জি. নুরানি-৩৪৬
নাথুরামের বীজ থেকেই তৈরি হয়েছে এই রাজনীতি–আবুল বাশার-৩৫১
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বায়ন ও গুজরাতের শ্রমিক শ্রেণী–রতন খাসবিশ-৩৫৪
আমরা কোথায় চলেছি ?–দীপংকর চক্রবর্তী-৩৬২
গুজরাত ঃ ভবিষ্যত হিন্দু ভারতের সূতিকাগার–সৌমিত্র বসু-৩৭০
নিসন্দেহে ধারাবাহিক, কিন্তু একটি নতুন অধ্যায়–শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত-৩৭৮
গুজরাতে নরমেধ যজ্ঞের আগুন নেভেনি–আবদুর রউফ–৩৮২
সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা–বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে গুজরাত–তরুণ সান্যাল-৩৮৬
গুজরাটের আয়নায়–অশোক দাসগুপ্ত-৩৯৭

www.pathagar.com

গুজরাত হিংসা ঃ মেয়েদের দৃষ্টিকোণ—পি ইউসিএল ভদোদরা এবং শান্তি অভিযান-এর পক্ষে সংকলিত-৪০১
গুজরাত গণহত্যা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ জনস্বাস্থ্যের এক চূড়ান্ত বিপর্যয়–মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেলের একটি তদন্তের প্রতিবেদন-৪২৮
নারী সংগঠনের স্মারকলিপি-৪৩৪
পূর্ণিমা আদবানিকে খোলা চিঠি-৪৩৮
রাম রহিমের নামে বুদ্ধু বানাবে কে কাকে ? মৈত্রী (গর্ভঘাতী গুজরাত গ্রন্থ থেকে) -৪৪২
গুজরাতে সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার নগ্ন নাচ–মাওলানা আসরারুল হক কাসেমী-৪৪৭
ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক পেগামদের হাতে এটাই ভবিতব্য–সুমন চট্টোপাধ্যায়-৪৫৩
গুজরাট গণহত্যা ঃ বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-এর শিরোনাম সংকলন (২৮-২-২০০২, ৩০-৪-২০০২) সংকলক রাখী চক্রবর্ত্তী-৪৫৫
ঠাকরের হুংকার–হিন্দুত্ববাদীদের নোংরা ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন–অধ্যাপক গৌতম রায়-৪৮৭
শ্যামাপ্রসাদ ও বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসা–৪৯১
ফ্যাসিবাদের মানস সন্তান বর্বর বিজেপির শিক্ষা ক্ষেত্রকে গৈরীকিকরণ প্রসংগে–৪৯২
গুজরাট–এই বর্বরতার অবসান চাই–৫১৫
'পজিটিভ সেকুলারিজিম'–শেখ নাসীর আহমদ-৫১৮
ভারতের রাজনীতিতে গরু–শেখ নাসীর আহমদ-৫২৬
ধ্বংসাত্মক ভাষানীতি–শেখ নাসীর আহমদ-৫৩৪
ইতিহাস যখন অনৈতিহাসিক–অধ্যাপক গৌতম রায়-৫৪৫
অভিমত–আবদুল হামিদ কাসেমী-৫৪৯
মুখবন্ধ–ড. ওসমান গনী-৫৫১
"ভারত তুমি কার ?" (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে "আমার কথা"–আহমদ আলী মোল্লা এম. এ-৫৫৭
কয়েকটি মন্তব্য-৫৫৯
সমন্বয়ের কথা-৫৬১
ভারত তুমি কার ?–৫৬৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ভূমিকা

ভারত একটি বড় দেশ। হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও মুসলমান সংখ্যায় কম নয়। শতকরা প্রায় পনর ভাগ মুসলমান। তবে কম করে হলেও প্রায় পনর কোটি মুসলমান সেখানে। এ সংখ্যা ইন্দোনেশিয়ার পরই সর্ববৃহত, এমনকি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়েও বেশী। কিন্তু ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়ায় সর্বত্র নিগৃহীত মুসলমানরা। আর এ যুলুম ভারতে সংঘ পরিবার গদিতে আসার পরে শত গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাশ্মীরে বর্বর হত্যাকাণ্ডসমূহ চলার সাথে সাথে গুজরাটে যা হয়ে গেল তা প্রকাশ্যভাবে সম্পূর্ণ জঘন্য। ভারতের উগ্রপন্থী উপ-প্রধানমন্ত্রী এল কে আদভানীর রাজ্য হলো গুজরাট। আদভানী যা চেয়েছিলেন তাই হলো গুজরাটে। মানুষ মরার পরে চিতায় জ্বালানো হয়। গুজরাটে জীবন্ত মুসলমানদের জ্বলন্ত চিতায় শহীদ করা হয়েছে।

ভারতে যা হয়েছে তার সমর্থনে রয়েছে সংঘ পরিবার ঃ বিজেপি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, বজরং দল ইত্যাদি গোষ্ঠীসমূহ। সবগুলোর পিছনটা রসুনের কোয়ার মতো—এক জায়গায়। যে বাজপেয়ী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের উদারপন্থী সরকারের থেকে দেশাইয়ের নীতিতে প্রতিবেশী দেশসমূহ, বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে ঝগড়া-বিবাদ মেটালেন, সেই বাজপেয়ীর আমলে হলো ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা গুজরাটে। ভারতে আদভানী-বাজপেয়ীর মত নির্মম ও কট্টরপন্থী ব্যক্তিত্ব থাকলেও অনেক উদারপন্থী ব্যক্তিও রয়েছেন। তারা এই যে সংখ্যালঘু নির্যাতন তাকে ঘৃণা করেছেন, লিখেছেন বহু লেখা ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেও, এমনকি বই আকারেও এসবের কিছু সংগ্রহ রয়েছে এই গ্রন্থে। এতে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না ; আর জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪২

আরজ গুজার
**মুহাম্মাদ সিদ্দিক**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

# নির্মমতা বনাম উদারতার ইতিহাস

–মুহাম্মদ সিদ্দিক

ভারতের গুজরাটেতো মুসলানদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হোল। এমনকি একটা দুটো যে মামলা কেউ সাহস করে করল, তারও কোন সুবিচার হোল না। বাদীদের প্রতি হুমকি, সাক্ষীদের প্রতি হুমকি, পুলিশ ও প্রশাসনের বিরোধিতার কারণে মামলা চালানো ছিল অসাধ্য ব্যাপার।

এপি জানালো গুজরাটের লোমহর্ষক মুসলমান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত বাইশ জনকে ভারতের নিম্ন আদালত নির্দোষ ঘোষণা করেছে। অভিযুক্ত সবাই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেই দাঙ্গার সময় এরা চৌদ্দজন মুসলমান শ্রমিকসহ একটি বেকারি জ্বালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ছিল। আগেই ধারণা করা হয়েছিল যে, এরা ছাড়া হবে। কারণ ষাটজন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনই সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে। কারণ হোল হুমকিতে তারা ভয় পেয়ে যায়।

ভারতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী এবং মানবাধিকার কর্মী শাবানা আজমী বলেন যে, দোষীরা শাস্তি না পাওয়ায় ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অব্যাহত রয়েছে। এজন্য শুধু রাজনীতিকরাই দায়ী নন—আঞ্চলিক পর্যায়ের সমাজ সংগঠকরাও দায়ী। শাবানা আজমী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ দুপুরে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, "গুজরাটের ঘটনায় দায়িরা শাস্তি পায়নি—এটা আজ সর্বজনবিদিত।"

ভারত সরকারের যে গুজরাট দাঙ্গার ব্যাপারে লুকোবার রয়েছে তার প্রমাণ হল এ্যামনেস্টি প্রধানকে সেখানে যেতে দেয় নাই। ভারত সরকার লণ্ডনভিত্তিক এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খান জুবেইদাকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশন কোনো বিশেষ কারণের উল্লেখ ছাড়াই জুবেইদার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী আইরিন খান জুবেইদা ২০০১ সালে মানবাধিকার গ্রুপটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯ জুলাই ২০০৩ থেকে তাঁর গুজরাট সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন। খবরে বলা হয়, ২০০২ এর গুজরাটে দাঙ্গার ঘটনার বিচার শুরু এবং বেষ্ট বেকারি

www.pathagar.com

মামলার পুর্নবিচার করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য সারাবিশ্বে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টার সময় সংস্থার প্রধানের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হয়। খবরে বলা হয়, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার লংঘন, গুজরাটে মহিলাদের জন্য ন্যায়-বিচারদানে অস্বীকৃতি এবং নর্মদা বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি সদস্যদের পুনর্বাসন প্রশ্নে ভারত সরকারের সমালোচনা করে। পত্রিকায় বলা হয়, এ্যামনেস্টির দিল্লী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে, মহাসচিব এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভারতের কার্যালয়ে সফরে আসবেন বলে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তাঁকে ভিসা দেয়া হয়নি।

ভারতের সংখ্যালঘু নির্যাতনকে আড়াল করতে ভারত অন্যদের সহায়তায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কাহিনী ছড়ালো। ভারতীয় এজেন্টরা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের নিকটও বাংলাদেশে তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। বাংলাদেশে এই তথাকথিত নির্যাতন বন্ধে মার্কিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে কলিন পাওয়েলকে ১৫ জুন এবং ৩০ জুন ২০০৩ যে পত্র দেয়া হয়েছিল তার জবাব দিয়েছেন তিনি ৩ জুলাই ২০০৩। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি রূপ কুমার ভৌমিককে লেখান ঐ পত্রে পাওয়েল উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে আপনরা ইতিমধ্যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ডেস্কের কর্মকর্তা এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। বিষয়টি আন্তর্জাতিক রিলিজিয়াস ফ্রিডম অফিসও অবহিত হয়েছে। আপনাদের অভিযোগগুলো বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, যা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেও রয়েছে। ভবিষ্যতে আপনাদের যে কোনো ডকুমেন্ট সাদরে গৃহীত হবে। এমন একটি বিষয় আমাদেরকে অবহিত করার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কলিন পাওয়েলের মন্তব্যকালে নিউইয়র্কে ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা যারা বিদেশে বলছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক নন, বিদেশী নাগরিক।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে লণ্ডনে গার্ডিয়ান পত্রিকা একটি খবর প্রকাশ করে। ২১ জুলাই ২০০৩ 'র‍্যাপ এন্ড টর্চার এমটিজ্যদা ভিলেজেম' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বার বছরের পূর্ণিমা রাণীকে ধর্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়। অথচ কত মুসলমান নারী যে ধর্ষিতা রয়েছে। তা কি মুসলিম নির্যাতন বলে অভিহিত হবে ?

www.pathagar.com

বাংলাদেশের 'জনকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক তোয়াব খান লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকাকে বলেন যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা বাংলাদেশে অব্যাহত। তোয়াব খান একজন ভারতপন্থী ব্যক্তি। তাঁর পত্রিকায় ভারতের 'রিলায়েন্স' গোষ্ঠীর অর্থ খাটে। ভারতীয় গোয়েন্দারা বিভিন্ন কোম্পানীর মাধ্যমে বিদেশে কার্যক্রম চালায়।

আন্তর্জাতিক রিলিজিয়াস ফ্রিডম অফিসকে বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করেনি। বুশ প্রশাসনের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টে ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা হরণকারী ১২টি দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের নাম রয়েছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সূত্র আমেরিকা নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছে, মোট ২২টি দেশের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয়। এ অভিযোগ পাওয়া যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অথবা রেডিও-টিভি তে প্রচারিত খবরের সূত্র থেকে। এছাড়া মানবাধিকার বিষয়ক ৪টি সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপরও ভিত্তি করা হয় এই রিপোর্ট তৈরীর সময়। সংস্থা চারটি হচ্ছে জাতি সংঘ মানবাধিকার কমিশন, এন্টি সেমিটিজম, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা। যে ২২টি দেশের বিরুদ্ধে ধর্মীয় স্বাধীনতা লংঘনের অভিযোগ উঠেছিল সেগুলো হচ্ছে, আফগানিস্তান, বেলারোজ, বেলজিয়াম, বার্মা, চীন, নর্থ কোরিয়া, মিসর,ফ্রান্স, জর্জিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, লাউস, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়া, সৌদি আরব, সুদান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম। এর মধ্যে যে ১২টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে বার্মা, চীন, ভারত, ইরান, ইরাক, লাওস, নর্থ কোরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সুদান, তুর্কমেনিস্তান এবং ভিয়েতনাম। সবচেয়ে বেশী খারাপ হিসেবে সৌদি আরবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাই হোক এ তালিকায় ভারত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ নেই। তবুও আওয়ামী লীগ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ বাজে প্রচারনা করে চলেছে।

নিউইয়র্কে ইউএন মিলিনিয়াম প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রবাসী নাগরিক কমিটির নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ন আহ্বায়ক মহাদেব সরকার এবং অধ্যাপিকা মেবেল গোমেজ। নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মহল কর্তৃক বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানকে এই বৈঠকে অবহিত করেন।

www.pathagar.com

মহাদেব সরকার অভিযোগ করে বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। কারণ, তিনি জানেন জনগণের ভোটে তাদের ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। সে জন্য সংখ্যালঘু নামক বেহুদা ইস্যু সৃষ্টি করে ঐক্য পরিষদকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ বিরোধী তথ্য সন্ত্রাস ও অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনাশ করছে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে।

অধ্যাপিকা মেবেল গোমেজ বলেন, ঐক্য পরিষদ শেখ হাসিনা এবং প্রতিবেশী একটি দেশ থেকে অনুদান পাওয়া লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বইপত্র এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে বিতরণ করে যাচ্ছে। তারা ফাণ্ডরেইজিং-এর নামে দেশের সুনাম বিরোধী কর্মকাণ্ডও অব্যাহত রেখেছে।

"ওয়াশিংটন পোষ্ট" পত্রিকায় গুজরাটের লোমহর্ষক ঘটনাবলীর কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি থেকে ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ইতিহাসের যে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায়, তার একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জহিরা শেখ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, একটি মাচার উপর থেকে তিনি একদল উগ্র হিন্দু তার ১৪ জন আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং তাদের পারিবারিক বেকারির শ্রমিককে নির্মমভাবে খুন করার দৃশ্য দেখেছেন। এক রাতেই তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। ১৯ বছরের তরুণী জহিরা পরে ভারতের আদালতে এই হত্যা মামলার বিচারের সময় অন্যতম প্রধান সাক্ষী হলেও বিভিন্ন দিক থেকে হুমকির মুখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আদালতে সত্য কথা বলতে পারেননি। তাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়েছে। তাকে আদালতে বলতে হয়েছে তিনি খুনীদের কাউকে চিনতে পারেননি। ফলে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বিচারক খুনের দায়ে অভিযুক্ত ২১জন আসামীর সবাইকে খালাস দেন। মানবাধিকারবাদীরা এই ঘটনাকে খুনীদের দায়ী করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গুজরাটের ওই সহিংসতায় হিন্দুরা ১ থেকে ২ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। জহিরা শেখ আদালতে সাক্ষী দেয়ার পর ভয়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করেন। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ্যে এসেছেন। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবং মুম্বাইর একটি হোটেলে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে গুজরাটে তার দেখা মুসলিম হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি জানান, স্থানীয় হিন্দু রাজনীতিকরা তার পরিবারকে বার বার হুমকি দেয়ায় ভয়ে তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। হিন্দু রাজনীতিকরা তার ভাইয়ের মোবাইল

www.pathagar.com

ফোনে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিতেন। অন্যদিকে মামলার বিচারকও আসামীদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না। কেননা বিচারক আন্তরিক হলে নির্ভয়ে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন। জহিরা বলেন, ওই দুর্দিনে আমার আইনী সহায়তা খুবই দরকার ছিল অথচ করার কেউ ছিল না। নৈতিকভাবে আমাকে সাহস যোগানোর মত কোন লোককেও তখন পাইনি। জহিরা কথা বলার সময় একটি কালো গাউন পরা ছিল। তার মাথায় ছিল ওড়না। তিনি বলেন, যেসব লোক আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে খুন করেছে আমি তাদেরকে চেহারায় এবং তাদের পরিবারকে চিনি। মে মাসে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার কথা স্মরণ করে জহিরা বলেন, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মতই গুজরাটের রাজ্য সরকারও উগ্র হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। গুজরাটের এসব উগ্র হিন্দু রাজনীতিকদের অনেকেই দাঙ্গায় জড়িত। অনেকে ছিলেন মদদ ও উস্কানিদাতা। ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ একটি ঘটনার অজুহাতে গুজরাটে এই মুসলিম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যদিও শত শত লোক এই রক্তপাতের ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তথাপি রাজ্য সরকার একজন হিন্দু আসামীকেও আজ পর্যন্ত শাস্তি দেয়নি। পক্ষান্তরে মানবাধিকারবাদী সংগঠনগুলো জানায়, যে ঘটনার অজুহাতে এই মুসলিম হত্যাকাণ্ড চলে সেই ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বহু মুসলমানকে অভিযুক্ত ও শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলিম হত্যা সত্ত্বেও হিন্দুদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ হয়নি। খুন করেও তারা সন্ত্রাসী হিসেবে সাজা পায়নি। মানবাধিকার সংগঠন সিটিজেনস ফর জাস্টিস এন্ড পিস-এর নেত্রী তিস্তা সেতালভাদ গুজরাট হত্যাকাণ্ডের পুর্নবিচারের জন্য জহিরা, তার মা এবং দুই ভাইকে মুম্বাই নিয়ে আসেন। তিস্তা বলেন, সম্ভবত বিচারক ভয় পেয়েছিলেন। কারণ, গুজরাটের সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। জহিরা বলেন, তিনি জনগণের সামনে তার দেখা সত্য ঘটনা তুলে ধরবেন। লোকজন ঘুষ নিয়ে সত্য ঘটনা গোপন করেছেন এবং আদালতে সাক্ষী দিয়েছেন বলে এখন তাকে অভিযোগ করছে শুনে তিনি খুবই ব্যথিত। জহিরা বলেন, ঘটনার সময় রাত ৮টা। একদল উগ্র হিন্দু তাদের বেকারির বাইরে জটলা পাকায়। তারা প্লাস্টিক পাত্র ভর্তি গ্যাসোলিন বোমা ফাটিয়ে বেকারি জ্বালিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করে। জহিরা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং কয়েকজন প্রতিবেশী নিয়ে একটি ভবনের উপর তলায় আশ্রয় নেন। অন্যদিকে তার চাচা, বড় বোনসহ কয়েকজন আত্মীয় ভবনের নিচ তলায় রয়ে যায়। এ সময় খুনীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। আটকা পড়া লোকগুলো

www.pathagar.com

বারবার পুলিশের কাছে সাহায্য চায়। অবশেষে সাড়ে ৯টায় একজন পুলিশ অফিসারকে ঘটনাস্থলে দেখা গেলেও তিনি আটকে পড়া মুসলমানদের কোন সাহায্য করেননি বরং দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শোনা গেছে তোমাদের যা করার রাতের মধ্যেই সেরে ফেল। সকালের জন্য কিছু বাকি রেখো না।

জহিরা বলেন, তিনি কয়েকজন দুর্বৃত্তকে পরিষ্কার চিনেছেন যারা তার মামাকে লোহার রড দিয়ে মেরেছে।৬ মাস আগে এসব দুর্বৃত্তের পরিবার পাশের রাজ্যে চলে গেছে। জহিরা বলেন, কয়েকজন খুনীকে তিনি নামেই চেনেন। তাদের সাথে হৃদ্যতা ছিল বলে ভাবতেই পারেনি তারা আমাদের উপর হামলা করতে পারে। তিনি বলেন, ওই রাতেই আমার বোন, চাচা, প্রতিবেশী ৪টি ছেলেমেয়েসহ ১৪জনকে খুন করা হয়। জহিরা বলেন, সকালে খুনীরা তাকে, তার মা এবং আরেক বোনকে পাশের একটি মাঠে নিয়ে যায়। এ সময় দূর্বৃত্তদের একজন পুড়িয়ে মারার আগে তাদের ধর্ষণ করার জন্য অন্যদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ আসাতে তারা শ্লীলতাহানি থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও তাদের মারধর করা হয়। জহিরার মাথার আঘাত থেকে রক্ত পড়তে থাকে। অন্যদিকে তার ভাই আঘাতে জ্ঞান হারায়। তাদেরকে হাসপাতালে নেয়া হয়। ওয়াশিংটন পোষ্টের এই প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ১৩ জুলাই ২০০৩ প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারত তাদের সংখ্যালঘু নির্যাতনকে আড়াল করতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অলীক কাহিনী প্রচার করে। মুসলমানরা কুরআন-হাদীসকে মান্য করে। তাই মানুষের অধিকার অমুসলমানের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। অমুসলমানদের উপর যুলুমকে রসূল (স.) পর্যন্ত সমর্থন করেননি। মুসলমানরা এমন কোন কাজ করবে না। যা তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। তবে সব সমাজেই কিছু কুলাঙ্গার রয়েছে। এদের হাতে সবাই নিগৃহীত হয়—ধর্ম এখানে কোন প্রশ্ন নয়। যত মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে বাংলাদেশে তার বেশীর ভাগই তো মুসলমান। এটা কি এজন্য যে তারা মুসলমান ? না তা নয়, অপরাধীদের ধর্ম বিচার নেই। একত্রে মুসলমান অমুসলমানদের ব্যাপারে ইসলামের অনুশাসন মানতে বাধ্য। আর অতীত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন মুসলমানরা উপমহাদেশে ক্ষমতায় ছিল কোন ধর্মীয় দাঙ্গা হয়নি। বৃটিশরা নিজস্ব শঠতাপূর্ণ শাসনকে বজায় রাখতে এই সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়।

www.pathagar.com

ইসলামের একজন প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী হলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি মুসলিম সমাজে অমুসলমানদের অধিকারের ব্যাপারে চমৎকার কথা লিখে গেছেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার" বইয়ে লেখেন ঃ

**প্রাণের নিরাপত্তা**

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন ঃ

"যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।"–[ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে।

–[বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭]

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে ফতোয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, "আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, "ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বললো, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না।" তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

"আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।"–[বুরহান, ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা]

www.pathagar.com

অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেনঃ

"তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছে এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।"

এ কারণেই ফকীহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়।-[দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩]

## ফৌজদারী দণ্ডবিধি

ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে, কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[১]

## দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানদের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ সাম্যের অনিবার্য দাবী অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলমানের ওপর যেসব দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের উপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শূকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে।-[আল মাবসুত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮]

১. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০৮-২০৯ ; আল মাবসুত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮। ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমকে মদের ন্যায় ব্যভিচারের শাস্তি থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেকের অভিমতের উৎস হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই সিদ্ধান্ত যে, অমুসলিম নাগরিক ব্যভিচার করলে তার ব্যাপারটা তাদের সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন অনুসারে কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ বা শূকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দুররে মুখতারে আছে ঃ

"মুসলমান যদি মদ ও শূকরের ক্ষতি করে তবে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।"–[৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩]

## সম্মানের হিফাযত

কোনো মুসলমানকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুররুল মুখতারে আছে ঃ

"তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।"–[৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪]

## অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এ চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারে না। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেংগে দিতে পারে 'বাদায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"অমুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দানের চুক্তি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই তা ভাংতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।"

–[দুররুল মুখতার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২]

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সম্বলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবী করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা হবে না। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এক, যদি সে মুসলমানদের দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুই, যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয় অরাজকতার সৃষ্টি করে।–[বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩ ; ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮২]

www.pathagar.com

**পারিবারিক বিষয়াদি**

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন [Personal Law] অনুসারে স্থির করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের উপর ইসলামী আইন কার্যকর হবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মোহরানা ছাড়া বিয়ে, ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

"খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে, মদ ও শূকরের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে ?"

জবাবে হযরত হাসান লিখেছেন ঃ

"তারা জিযিয়া দিতে তো এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।"

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ মুসলমান হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক ফায়সালা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন খৃস্টান মহিলা কোনো মুসলমানের স্ত্রী ছিল এবং তার স্বামী মারা গেল। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়ত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতরে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে।–[আল মাবসুত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮-৪১]

**ধর্মীয় অনুষ্ঠান**

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে, আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।[১] বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শূকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোক না কেন। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এসব কাজ পসন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুমআ, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ..... তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে, যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।"–[বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩]

কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতেও তাদেরকে শুধুমাত্র ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।–[শরহু সিয়ারিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১]

**উপাসনালয়**

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে একই জায়গায় পুনঃ নির্মাণের অধিকারও তাদের আছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই।–[বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪ ; শরহু সিয়রিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১]

তবে যেগুলো নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুমআ, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের

১. নির্ভেজাল ইসলামী জনপদ শরীয়তের পরিভাষায় 'আমসারুল মুসলিমীন" (বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ) আখ্যায়িত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলের ভূসম্পত্তি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত এবং যেসব অঞ্চলকে মুসলমানরা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি ও উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে।-[বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪ ; শরহু সিয়রিল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফতোয়া নিম্নরূপ ঃ

যেসব জনপদকে মুসলমানরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শূকরের গোশত ও মদ বিক্রি করার অধিধার নেই। আর অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে মুসলমানদের হাতে বিজিত এবং মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারকারী জনপদে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে চিহ্নিত হবে মুসলমানরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।"–পৃষ্ঠা-১২-১৮

মাওলানা মওদূদী আরো লিখেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত আবু উবাইদা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, "এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।"–[কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১১]

এই নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিম্‌স নগরীতে জিযিয়ার[১] অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, "ইতিপূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পসন্দ করি। এখন আমরা যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনো মতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দেবো না।"–[ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-১৩৭]

---

১. উল্লেখ্য যে, জিযিয়ার নাম শুনতেই অমুসলিমদের মনে যে আতংক জন্মে, সেটা শুধু মাত্র ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। অন্যথায় এ আতংকের কোনো ভিত্তি নেই। জিযিয়া মূলত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপনের সুযোগ পায় তারই বিনিময়। শুধুমাত্র সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে এটা নেয়া হয়। এটাকে যদি ইসলাম গ্রহণ না করার জরিমানা বলা হয়, তাহলে যাকাতকে কি বলা হবে ? যাকাত তো শুধু প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই নয় বরং সক্ষম নারীর কাছ থেকেও আদায় করা হয়। ওটা কি তাহলে ইসলাম গ্রহণের জরিমানা ?

www.pathagar.com

**মুসলিম ফকীহদের সমর্থন**

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে আইন প্রণীত হয়েছিল, উপরের আলোচনায় তার কিছু বিশদ বিবরণ দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচনায় পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে যখনই অমুসলিমদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, তখন মুসলিম ফকীহগণ সর্বাগ্রে মযলুম অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, উমাইয়া শাসক ওলীদ বিন আবদুল মালেক দামেস্কের ইউহান্না গীর্জাকে জোরপূর্বক খৃস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয ক্ষমতায় এলে খৃস্টানরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ দায়ের করলো। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে লিখে পাঠালেন, মসজিদের যেটুকুই অংশ গীর্জার জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেংগে খৃস্টানদের হাতে সোপর্দ করে দাও।"

ওলীদ বিন ইয়াযীদ রোমক আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিম অধিবাসীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে মুসলিম ফকীহগণ ও সাধারণ মুসলমানরা ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হন এবং তারা একে একটা মস্তবড় গোনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর যখন ওলীদ বিন ইয়াযীদ পুনরায় তাদের সাইপ্রাসে নিয়ে পুনর্বাসিত করলেন, তখন তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ইনসাফের দাবী। ইসমাঈল বিন আইয়াশ বলেন ঃ

> "মুসলমানরা তার এ কাজে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ফকীহগণ একে গোনাহর কাজ মনে করেন। অতপর যখন ইয়াযীদ খলীফা হলেন এবং তাদের আবার সাইপ্রাসে ফেরত পাঠালেন। তখন মুসলমানরা এ কাজ পসন্দ করেন এবং একে ন্যায়বিচার আখ্যায়িত করেন।"
>
> –[ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-১৫৬]

ঐতিহাসিক বালাযুরী বর্ণনা করেন, একবার লেবাননের পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সালেহ বিন আবদুল্লাহ তাদের দমন করার জন্য একটি সেনাদল পাঠান এই সেনাদল উক্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সকল সশস্ত্র পুরুষদের হত্যা করে এবং বাদবাকীদের একদলকে দেশান্তরিত করে ও অপর দলকে যথাস্থানে বহাল রাখে। ইমাম আওযায়ী তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সালেহকে এই যুলুমের জন্য তিরস্কার করেন এবং একটা দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটির অংশবিশেষ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

"লেবানন পর্বতের অধিবাসীদের বহিষ্কারের ঘটনাটা তোমার অজানা নয়। তাদের ভেতরে এমনও অনেকে আছে, যারা বিদ্রোহীদের সাথে মোটেই অংশগ্রহণ করেনি। তথাপি তুমি তাদের কতককে হত্যা করলে এবং কতককে তাদের বাসস্থানে ফেরত পাঠিয়েছিলে। আমি বুঝি না, কতিপয় বিশেষ অপরাধীর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের শাস্তি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দেয়া যায় এবং তাদের সহায়-সম্পত্তি থেকে তাদের কিভাবে উৎখাত করা যায় ? অথচ আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, "একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না।" এটা একটা অবশ্য করণীয় নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ হলো, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটা মনে রেখো যে, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম করবে এবং তাদের সামর্থের চেয়ে বেশী তার উপর বোঝা চাপাবে তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।"–[ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-১৬৯]

ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম আলেম সমাজ চিরদিনই অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার থেকেছেন। কখনো কোনো রাজা বা শাসক তাদের উপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি যদি করে থাকে, তবে তৎকালে ইসলামী আইনের যেসব রক্ষক বেঁচে ছিলেন, তারা কখনো সেই যালিমকে তিরস্কার না করে ছাড়েননি।"–[পৃষ্ঠা-২১-২৪]

মাওলানা মওদূদী সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন, আগে থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত করতে পারবে।

২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও মজলিশে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করতে পারবে এবং সরকার ইনসাফ সহকারে তার পর্যালোচনা করবে।

৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দেশের অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্নও করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবে।

উপরোক্ত তিনটি পন্থার যে কোনো একটি পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে (Local Bodies) অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোটদানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।

### বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অবিকল সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধি নিষেধ মুসলমানদের উপর থাকবে, তা তাদের উপরও থাকবে।

আইন সংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে।

তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে কোনো মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দীতে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে এরূপ ধর্মত্যাগী মুসলমানকে আপন ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে অমুসলিম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না।

তাদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোনো কাজ তারা আপন বিবেকের দাবী অনুসারে করতে পারবে।

### শিক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্র গোটা দেশের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

### চাকুরী

কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

www.pathagar.com

সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদসমূহকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি দলের যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর এই পদগুলোর তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। আমি একটা দিকনির্দেশক মূলনীতি হিসেবে শুধু এই কথা বলতে পারি যে, যেসব পদ নীতি ও নির্ধারণ ও বিভিন্ন বিভাগের দিকনির্দেশনার সাথে জড়িত, সেগুলো মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদ। একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই সব পদ কেবল সংশ্লিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসীদেরকেই দেয়া যেতে পারে। এই পদগুলো বাদ দেয়ার পর বাদবাকী সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় পদেও যোগ্যতা সাপেক্ষে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রের মহা হিসাব রক্ষক, মহা প্রকৌশলী কিংবা পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ন্যায় পদে সুযোগ্য অমুসলিম ব্যক্তিদের নিয়োগে কোনো বাঁধা নেই।

অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্ব সংরক্ষিত দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। এছাড়া অন্যান্য সামরিক বিভাগ যার কোনো সম্পর্ক সরাসরি যুদ্ধের সাথে নেই, অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

## অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশা

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দুয়ার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা অমুসলমানরা ভোগ করবে এবং মুসলমানদের উপর আরোপ করা হয় না এমন কোনো বিধি নিষেধ অমুসলিমদের উপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

## অমুসলিমদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়

একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকারই দেবে, তা পার্শ্ববর্তী কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কি কি অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয় না, তার পরোয়া না করেই দেবে। আমরা একথা মানি না যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের দেখাদেখি আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করবে। তারা ইনসাফ করলে এরাও ইনসাফ করবে আর তারা যুলুম করলে এরাও যুলুম করবে, এটা হতে পারে না। আমরা মুসলমান হিসেবে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসারী। আমাদের যতদূর সাধ্যে কুলায়, নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজ করতে হবে। আমরা যা দেব তা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়েই দেব এবং তা শুধু কাগজে

www.pathagar.com

কলমে নয় বরং বাস্তবেই দেব। যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো তা পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথে পালন করবো।

এরপর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এই রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত গোটা এই উপমহাদেশ জুড়ে যুলুম ও নিপীড়নের যে পৈশাচিক বিভীষিকা চলছে, তাকে প্রশমিত করার এটাই একমাত্র অব্যর্থ উপায়। শুধুমাত্র এই পন্থা অবলম্বনেই পাকিস্তানও হতে পারে ইনসাফের আবাসভূমি আর ভারত এবং অন্যান্য দেশও ইনসাফের পথ খুঁজে পেতে পারে। পরিতাপের বিষয় হলো, অমুসলিমরা দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামের কেবল অপব্যাখ্যাই শুনে ও দেখে আসছে। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনের কথা শুনলেই আতংকিত হয়। আর তাদের কেউ কেউ দাবী জানাতে থাকে যে, আমাদের এখানেও ভারতের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কায়েম হওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে কি এমন কোনো আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রত্যাশা করা যেতে পারে ? তার পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থার পরীক্ষা করা কি ভাল নয় যার ভিত্তি আল্লাহভীতি, সততা এবং শাশ্বত সুন্দর আদর্শের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ?–[তরজমানুল কুরআন, আগস্ট ১৯৪৮ ঈসায়ী, পৃষ্ঠা-২৫-২৯]

মাওলানা মওদূদী আরো লিখেন, বাস্তবিকই একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে তার মূলনীতির সম্পূর্ণ পৃথক মূলনীতিতে বিশ্বাসী, যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। অন্যরা এ জটিলতার সমাধান প্রায়ই দুইটি পন্থায় করেছে ; হয় তাকে [সংখ্যালঘুকে] নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে অথবা শূদ্র বা অস্পৃশ্য শ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে তার নীতিমালা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তার নীতিমালা পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধ্য করে এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে। আর যারা তার নীতিমালার অনুসারী নয় তাদেরকে সে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক সীমা পর্যন্ত তার বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও মানবীয় অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

www.pathagar.com

**নাগরিক অধিকার**

এরপর আমাকে বলতে হবে যে, ইসলামে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম ইসলাম নাগরিকদেরকে জান মাল ও ইয্যত আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার দান করেছে। আইন সংগত বৈধ কারণসমূহ ছাড়া অন্য কোনো কারণে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মহানবী সাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর সংখ্যক হাদীসে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের মান সম্মান তদ্রূপ সম্মানার্হ যেমন আজকের এই হজ্জের দিনটি সম্মানার্হ।"

কেবল একটি অবস্থায় তা সম্মানার্হ থাকবে না। তা তিনি অপর এক হাদীসে এভাবে বলেছেন ঃ

"ইসলামী আইনের আওতায় কারো জান মাল অথবা ইয্যত আব্রুর উপর কোনো হক (অধিকার) প্রমাণিত হলে আইন অনুমোদিত পন্থায় অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।"

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, যে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ। দেশে প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত আইন সংগত পন্থায় দোষ প্রমাণ না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ইসলামে কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। সুনানে আবু দাউদ-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

একদা মদীনার কিছু সংখ্যক লোক কোনো সন্দেহের কারণে বন্দী হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভাষণদানরত অবস্থায় একজন সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর নিকট আরজ করলেন, আমার প্রতিবেশীদেরকে কোন্ অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয়বারে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। শহরের পুলিশ প্রধানকে তাদের গ্রেফতারের সংগত কোনো কারণ থাকলে তা পেশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি (সা) নিরুত্তর থাকলেন। ঐ সাহাবী তৃতীয় বার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে এবং পুলিশ প্রধান নিরুত্তর থাকলে মহানবী স. বললেন ঃ

"তার প্রতিবেশীদের ছেড়ে দাও।"–[আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা]

www.pathagar.com

উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নাগরিককে গ্রেফতার করা যাবে না। ইমাম খাত্তাবী (র) তাঁর "মায়ালিমুস সুনান" গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ "ইসলামে শুধু দু' প্রকারের গ্রেফতারী বৈধ। [এক] শাস্তি স্বরূপ আটক করা অর্থাৎ আদালতের রায়ে কোনো নাগরিককে কয়েদীর শাস্তি প্রদান করা হলে তাকে আটক করা। নিঃসন্দেহে এই আটক সম্পূর্ণ সংগত। [দুই] তদন্তের জন্য আটক করা অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইরে থাকলে তদন্তকার্যে ব্যাহত হতে পারে এরূপ আশংকা থাকলে তাকে কয়েদ করা যেতে পারে। এছাড়া অন্য প্রকারের আটক বৈধ নয়।"-[মায়ালিমুস সুনান, কিতাবুল কাদা]

ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, কোনো ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দী করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দোষারোপের ভিত্তিতেই কাউকে বন্দী করতেন না। বাদী ও বিবাদী উভয়ই আদালতে হাযির হতে হবে। সেখানে বাদী দলিল-প্রমাণসহ তার দাবী উত্থাপন করবে। সে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীকে বেকসুর খালাস দিতে হবে।-[কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১০৭]

হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও একটি মুকদ্দমার রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন ঃ

"ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবে না।"-[মুয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব শারতিশ শাহিদ]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার হচ্ছে, মত প্রকাশের এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল। বর্তমানকালে নৈরাজ্যবাদী (Nihilist) দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করতো এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। আলী রা. এই অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান ঃ

"তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারো। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এ চুক্তি রইলো যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না এবং কারো উপর যুলুম করবে না।"-[নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ, ১৩০]

www.pathagar.com

অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন ঃ

"তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করবো না।"–[নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগে (By Violent Means) বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরও একটি মৌলিক অধিকারের প্রতি ইসলাম যথেষ্ট জোর দিয়েছে। তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র তার চতুর্সীমার মধ্যে বসবাসকারী কোনো নাগরিককে তার জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না। ইসলাম এ উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান ফরয করেছে এবং এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।"–[বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক হাদীসে মহানবী স. মূলনীতি হিসেবে ইরশাদ করেন ঃ

"যার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নেই, তার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার।"

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"মৃত ব্যক্তি যে বোঝা [ঋণ অথবা পরিবারের অসহায় সদস্য] রেখে গেলো তার দায়িত্ব আমাদের উপর।"–বুখারী ও মুসলিম

এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মোটেই পার্থক্য করেনি। কোনো নাগরিককেই অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করা যাবে না। ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের মতো তার অমুসলিম নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক ইহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তার উপর আরোপিত কর মওকুফ করেন এবং তার জন্য রাজকোষ থেকে ভাতা মঞ্জুর করে রাজকোষ কর্মকর্তাকে লিখে পাঠান ঃ

"আল্লাহর শপথ ! এ লোকটির যৌবনকালে যদি তার দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন তার এ বার্ধক্যে তাকে নিরুপায় অবস্থায় ত্যাগ

www.pathagar.com

করি তবে তার সাথে মোটেই সুবিচার করা হবে না।"–[ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৭২]

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হীরা নামক এলাকার অমুসলিম নাগরিকদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছবে অথবা যে ব্যক্তি আকস্মিক বিপদে পতিত হবে অথবা যে ব্যক্তি গরীব হয়ে যাবে তার নিকট থেকে কর আদায় করার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে তার এবং তার পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।–[কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮৫]

জনাব অধ্যাপক গোলাম আযম অমুসলিম বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মন্তব্যসমূহও প্রণিধানযোগ্য। জনাব গোলাম আযম হিন্দু মনীষী গিরীশ চন্দ্র সেনের ইসলাম ধর্ম চর্চা সম্পর্কে লিখেন ঃ তিনি (গিরীশ) লিখেছেন, 'কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী। মানুষের জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ নানান বিধি নিষেধের উল্লেখ করেছেন, সহজতম উপদেশ দান করেছেন। মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই আল কুরআনের অবতারণা। সুতরাং কুরআন শরীফ হলো বিশ্ব মানুষের জন্য ঐশ্বরিক সংবিধান। এ মহাগ্রন্থে পাওয়া যাবে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে সঠিক চলার অভ্রান্ত পথনির্দেশ।' এ ভূমিকার পর তিনি বিষয়সূচি অনুযায়ী প্রতি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাণীসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে চয়ন করেছেন।

এ কুরআন তাদেরই জন্য পথ নির্দেশ, যারা পথ তালাশ করে। মুসলমান শিক্ষিত লোকদের ক'জন কুরআন বুঝার জন্য এ রকম কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করেন ? সুতরাং মুসলমান নামধারী হলেই কুরআনের সাধক হয় না। গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয় মুসলমান না হয়েও কুরআনের শিক্ষাকে জানার ও মানার চেষ্টা করে সবার জন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

### জামায়াতের দৃষ্টিতে অমুসলিম

আমার দেশের হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আমার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন অভিন্ন হওয়ার ফলে এদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে অমুসলিম ভাই-বোনদের কথা বাদ দেবার কোনো উপায় নেই। তাই জামায়াতে ইসলামী তাদেরকে কী দৃষ্টিতে দেখে, সে কথা পয়লাই বলা দরকার।

জামায়াতে ইসলামী এদেশের অমুসলিম নাগরিকদেরকে এদেশের সন্তান হিসেবে দেশের মুসলিম নাগরিকদের সমমর্যাদার নাগরিক মনে



www.pathagar.com

করে। জামায়াতে ইসলামী এ দেশে কুরআনের শাসন চায়। মানবিক অধিকারের ব্যাপারে কুরআন মুসলিম ও অমুসলিম কোনো পার্থক্য করে না। কুরআনে স্রষ্টা স্বয়ং অমুসলিম নাগকিরদেরকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, তা পরিবর্তন করে কেউ তাদের অধিকার খর্ব করতে চাইলে জামায়াতে ইসলামী কুরআনের মর্যাদার স্বার্থেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। ধর্ম একেবারেই বিশ্বাস ও মনের ব্যাপার। মনের উপর যেহেতু শক্তি প্রয়োগ করা যায় না, সেহেতু জোর করে মুসলমান বানাবার বিরুদ্ধে কুরআন অত্যন্ত সোচ্চার। জামায়াত মনে করে যে, হিন্দু-বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নাগরিকগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কুরআনের বিধানকে সমর্থন করতে পারেন। যদি অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনা করে কুরআনের বিধানকে তারা অধিকতর কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে নিজ নিজ ধর্মে থেকেও তারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। কেউ যদি হিন্দু থেকেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে যুক্তির বিচারে কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করলে হিন্দু হিসেবেও তা সমর্থন করতে পারেন। তাই জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমর্থন করতে হলে ধর্মীয় দিক দিয়েও মুসলিম হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কুরআনকে মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু ধর্মান্তরিত না হয়েও কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করেছেন বলে ইতিহাসে উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে।

## হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উত্থান-পতন

বাংলাদেশের বর্তমান (২০০১) জনসংখ্যা প্রায় তের কোটি। এর মধ্যে এক কোটিরও বেশি অমুসলিম। অমুসলিমদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাকী এক-চতুর্থাংশ বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য উপজাতি।

এ হিসেব অনুযায়ী কমপক্ষে ৭০-৭৫ লাখ হিন্দু এদেশে বাস করছেন। শহরে ও গ্রামে মুসলমানদের পাশাপাশি শত শত বছর থেকে একই দেশে বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক পরিচয় এককালে আরো ঘনিষ্ঠ ছিল। বর্তমানেও এ সম্পর্ক গ্রামাঞ্চলে প্রায় আগের মতোই দেখা যায়।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তাবাদের দাবীর ফলে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হবার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই তিক্ত হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর এ তিক্ততা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমেই কমতে থাকে। এমনকি ভারতে মুসলিম হত্যা চলতে থাকলেও এদেশের মুসলমানরা এর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ফলে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক এদেশে ক্রমেই পূর্বের অবস্থায় উন্নীত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হবার কোন কারণই ঘটেনি। "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম ভোটারদের ভোটে মুসলিম প্রার্থী এবং হিন্দু ভোটারদের ভোটে হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমদের কোন বিরোধ বা সমস্যাই সৃষ্টি হয়নি।

ঐ নির্বাচনে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবদের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করলেও কিছুদিন পরেই শেরে বাংলা ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। ফলে যুক্তফ্রন্ট দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যদের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য চলে যায়। প্রথমে হিন্দু সদস্যগণ শেরে বাংলার সাথেই ছিলেন। ১৯৫৪ সালের শেষ ভাগে আওয়ামী মুসলিম লীগের জয়পুরহাট সম্মেলনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দিয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় আদর্শ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ আইন পরিষদে হিন্দু সদস্যদের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ দুটো ব্যবস্থার পর আওয়ামী লীগ আইন সভায় হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে মন্ত্রীসভা গঠনে সক্ষম হয়।

সে সময়কার হিন্দু নেতৃবৃন্দ যুক্ত-নির্বাচনের সমর্থন কেন করেছিলেন তা তারাই ভাল জানেন। যুক্ত নির্বাচন দ্বারা হিন্দুদের সত্যি কোন উপকার হয়েছে কিনা তাও তারাই বলতে পারেন। কিন্তু জনগণের ময়দানে ভোটের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা আবার কিছু তিক্ত হয়ে গেলো। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় আইন সভার ভিতরে মুসলিম সদস্যদের দ্বিধা-বিভক্তির ফলে হিন্দু সদস্যদের যে রাজনৈতিক সুবিধা ছিল তাতে জনগণের ময়দানে কোন রকম তিক্ততার কারণ ঘটেনি। কিন্তু যুক্ত নির্বাচনে ভোটের ময়দানে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

এখন অবস্থা এই দাঁড়াল যে, হিন্দু ভোটারদের চেয়ে মুসলিম ভোট দাতার সংখ্যা বেশী হওয়ায় শুধু হিন্দু ভোটে কোন প্রার্থীর বিজয়ের কোন সম্ভাবনা রইল না। এর ফলে হিন্দু ভোটারদের নিয়ে মুসলিম দল ও প্রার্থীরা টানাটানি করার সুযোগ পেলো। এ পরিস্থিতিটা হিন্দুদের জন্য কোন দিক দিয়েই লাভজনক প্রমাণিত হয়নি। একদিকে হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে তারা পার্লামেন্টে কোনো প্রতিনিধিত্ব পেলেন না। অপরদিকে রাজনৈতিক ময়দানে মুসলিম ভোটারদের কাছে তারা কোন সম্মানজনক পজিশনও পাননি। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

## সংখ্যালঘু সমস্যা

দুনিয়ার প্রায় দেশেই কোন না কোন আকারে স্থায়ী সংখ্যালঘু সমস্যা বিরাজ করে। গণতন্ত্রের যত দোহাই-ই দেয়া হোক, স্থায়ী সংখ্যালঘু সমস্যা শাসনতন্ত্রে যতভাবেই দূর করার ব্যবস্থা থাকুক, বাস্তবে তা থেকেই যায়। এদেশের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে মুছে ফেলে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমকে একক সত্তা বানাবার কোন উপায় নেই। হিন্দুগণ এদেশে ধর্মীয় দিক দিয়ে যেমন সংখ্যালঘু, তেমনি রাজনৈতিক ময়দানেও সংখ্যালঘু। কোন রকমেই এ অবস্থার অবসান সম্ভব নয়।

সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে ধরে নিয়েই রাজনৈতিক সমাধান দিতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও উপজাতিসমূহকে তাদের নিজস্ব সত্তা হিসেবেই গণ্য করতে হবে এবং তাদেরকে এ দেশের নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার দিতে হবে। তাদের জোর করে রাজনৈতিক ময়দানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে এক সত্তায় পরিণত করলে কি ফল দাঁড়ায় তা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন। এটা একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।

## হিন্দুদের বর্তমান রাজনৈতিক মর্যাদা

এ কথা কারো অজানা নয় যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দুদেরকে এ দেশের মুসলিম জনগণ একটি পৃথক সত্তা মনে করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে যেসব হিন্দু এ দেশ ছেড়ে চলে যাননি, তাদেরকে পৃথক সত্তা মনে করলেও তারা যে এ দেশেরই স্থায়ী নাগরিক সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। এ দেশের ভাল-মন্দের সাথেই তাদের ভাগ্য জড়িত। তবুও দেখা যায় যে, সাধারণত মুসলমানরা আজও তাদেরকে ভারত ঘেঁষা বলে মনে করে। অথচ পাকিস্তান হবার মাত্র দু' বছর পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়ও

www.pathagar.com

হিন্দুদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এ ধারণা ছিল না। কারণ পৃথক নির্বাচনের কারণে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দুদের সাথে জনগণের কোন সংঘর্ষ বা মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু যুক্ত-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনের বেলায় মুসলমানদের সাথে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে, হিন্দু ভোটারদের জোরে মুসলিম নামধারী এমন প্রার্থী বিজয়ী হয়ে যায়, যে চিন্তা ও চরিত্রে মুসলিম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ফলে মুসলিম চেতনাসম্পন্ন সবাই হিন্দু ভোটারদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধী বলে মনে করতে বাধ্য হয়।

১৯৭৭ সাল থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত যে ক'টা নির্বাচন হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেনি। যে কারণেই হোক বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতকে এ দেশের নিঃস্বার্থ বন্ধু মনে করে না। তারা আওয়ামী লীগকে ভারতের বন্ধু মনে করে এবং হিন্দুদেরকে আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে ধারণা করে। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলে এ জাতীয় ধারণা সৃষ্টির কোন পরিবেশই থাকতো না। তাই হিন্দু ভোটে হিন্দু প্রতিনিধি এবং মুসলিম ভোটে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান ছাড়া হিন্দুদের রাজনৈতিক মর্যাদা বহাল করার কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না।

এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, পাকিস্তান আন্দোলনেরও বহু বছর আগে থেকেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিল। বৃটিশ ভারতে তফসিলী হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই সংখ্যানুপাতিক হারে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। আজও এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও উপজাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব পেতে পারেন। এ পথেই সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান সহজ ও সম্ভব।

কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত অমুসলিম নাগরিকদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর পৃথক নির্বাচন চাপিয়ে দেয়ার প্রস্তাব আসা স্বাভাবিক নয়। সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে এ জাতীয় প্রস্তাব পেশ করা হলে জাতীয় সংসদ তা বিবেচনা করতে পারে।

## জামায়াতে ইসলামী ও সংখ্যালঘু সমস্যা

জামায়াতে ইসলামী একথা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ ও

www.pathagar.com

অবিশ্বাস দূর করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুগণ তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবেন এবং জনগণের ময়দানে মুসলমানদের সাথে বিরোধ সৃষ্টিরও কোন কারণ ঘটবে না। তাদেরকে ভারতপন্থী বলে সন্দেহ করারও কোন সুযোগ থাকবে না। আইন সভায় তাদের ভূমিকা প্রকাশ্যভাবেই সবাই দেখতে পাবে। গোপন তৎপরতার কোন অজুহাত তুলে কেউ তাদের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাবারও সুযোগ পাবে না।

একথা নিশ্চয়ই তারা বুঝেন যে, কোন কালেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবেন না। তাদেরকে সংখ্যালঘুই থাকতে হবে। জামায়াতে ইসলামী মনে করে যে, তারা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমেই সঠিক মর্যাদা ফিরে পাবেন। তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করার উপায়ও এটাই। সংখ্যালঘু সমস্যার সঠিক সমাধানও তাই। কারণ হিন্দু ও মুসলিমের পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। তাই রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ পার্থক্য দূর করা যাবে না। হিন্দু হিসেবেই তাদের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া এর অন্য সমাধান নেই।

## রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতের সাথে সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক

জামায়াতে ইসলামী এ দেশের অমুসলিম নাগরিকদের কাছে সঠিকভাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পায়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে এক শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে ইসলামের নামকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এসেছে, তাতে অমুসলিমগণ জামায়াতে ইসলামীকে একটি সাম্প্রদায়িক দল বলে সন্দেহ করলে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। পাকিস্তান আমলে ২৫ বছরের শাসনকালে ক্ষমতাসীনগণ মুখে ইসলামের নাম নিয়েছেন, আর বাস্তবে ইসলাম বিরোধী সবকিছুই করেছেন। মুসলিমদের সমর্থন আদায় করার স্বার্থে তারা ইসলামের নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ইসলামের মহান আদর্শের পক্ষে কোন একটি কাজও করেননি।

ইসলামের শ্লোগানদাতা তথাকথিত মুসলিম নেতা ও দল থেকে জামায়াতে ইসলামীর পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। জামায়াতে ইসলামী মুসলিম নামধারী লোকদের সংগঠন নয়। জামায়াত তাদেরকেই সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে, যারা চিন্তা ও মনোভাব এবং কথায় ও কাজে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি দল নয়। ইসলামী আদর্শ, নীতি ও পদ্ধতিতে মানব সমাজকে গড়ে তোলার আন্দোলনের নামই জামায়াতে ইসলামী।

www.pathagar.com

সুতরাং জামায়াত কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়। কারণ ইসলাম কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ নয়। এ দেশে অগণিত রাজনৈতিক দল আছে এবং নেতাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামী আদর্শ ও জীবন বিধানের সমর্থক নন। বরং বহু দল ও মুসলিম নেতা ইসলাম বিরোধী বলে পরিচিত। ইসলাম যদি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হতো, তাহলে মুসলিম নামের সবাই ইসলামের সমর্থক হতো।

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের পার্থক্য বুঝলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও ইসলামী আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের আসল লক্ষ্য ছিল। অখণ্ড ভারতে একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য হতো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের মূল উদ্দেশ্য।

তাই ইসলামের নামে পাকিস্তান আন্দোলন করা হলেও সে আন্দোলন ইসলামী আন্দোলনে উন্নীত হতে পারেনি। ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন করতে হতো না। মুসলিম লীগের গোটা শাসনকালে সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংঘর্ষ লেগেই ছিল। আইয়ুব খাঁর ১০ বছরের শাসনামলে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই পৃথকভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতে ইসলামী কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়।

যারা এ দেশের অমুসলিম নাগরিক, তারা হিন্দু মতবাদ বা খৃষ্টান মতবাদ বা বৌদ্ধ মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে চালু করার দাবী করেন না। কিন্তু এ দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চয়ই তারা চান। কারণ এছাড়া কোন নাগরিকই নিরাপত্তাবোধ করতে পারেন না এবং শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব মনে করেন না।

এ অবস্থায় তারা কোন্ পথকে এ দেশের ও নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেন? কেউ মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র ভাল। আবার অন্য কেউ নিশ্চয়ই অনুভব করেন যে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই বলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কেউ নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারেন।

www.pathagar.com

জ্ঞানী লোকেরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এক সাথে চলতে পারে না। সমাজতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক মতবাদ নয়—এটা একটা পৃথক সমাজ দর্শন। আর গণতন্ত্র শুধু সরকার গঠনের একটি পদ্ধতি মাত্র। আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাই গণতন্ত্রের সাথে এর রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও সমাজতন্ত্রের বিকল্প মতবাদ হিসেবে গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন জাগে যে, যারা সংগত কারণেই সমাজতন্ত্র পসন্দ করেন না, তাদের কাছে বিকল্প মতাদর্শ আর কি আছে? এখানেই ইসলামের আবির্ভাব। সমাজতন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে শুধু গণতান্ত্রিক অস্ত্রই যথেষ্ট নয়। একমাত্র ইসলামের মত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও সমাজ দর্শনই বিকল্প মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে সক্ষম।

এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান ভাইদের কাছে জামায়াতে ইসলামী একথাটা গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা ইসলামের চেয়ে সমাজতন্ত্রকে কেন বেশি পসন্দ করবেন? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও সরকার গঠনের বেলায় তাদের সাথে জামায়াতের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাহলে সমাজতন্ত্রের জায়গায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করতে আপত্তি হবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দু থেকেও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে ইসলামকে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। এ দেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলিম হওয়ার কারণে ইসলামী আদর্শকে এখানে চালু করতে চেষ্টা করলে সাফল্যের আশা সবচেয়ে বেশি এবং এর ফলে কোন বিদেশী শক্তির আধিপত্য কায়েম হওয়ার কোন আশংকাও নেই।

## এ দেশের অমুসলিম নাগরিকদের নিকট জামায়াতের আবেদন নিম্নরূপ

এ দেশে যখন ইসলামী আদর্শ কায়েমের আন্দোলন চলছে, তখন আপনাদের পক্ষে এ বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকা মোটেই উচিত নয়। এ আন্দোলনকে সঠিকভাবে জানা ও বুঝা আপনাদের এক বিরাট দায়িত্ব। যদি এ আন্দোলন দেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু যদি এটা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে এর সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা কর্তব্য। সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এ আন্দোলনকে ভালভাবে জানতে হবে; সরাসরি জ্ঞান লাভ করা ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। আশা করি আপনারা এ বিষয়টাকে ধীরভাবে বিবেচনা করবেন।

www.pathagar.com

## ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জামায়াতে ইসলামী

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা সবাই এক রকম দেয় না। এর অর্থ যদি এটা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না এবং সব ধর্মকে স্বাধীনভাবে পালন করার সমান সুযোগ দিতে হবে, তাহলে জামায়াতে ইসলামী একথা সমর্থন করে। কিন্তু, কেউ যদি ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বলেন যে, "ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্কই থাকবে না," তাহলে এটা অবাস্তব কথা। যে ব্যক্তি সত্যিকার ধার্মিক, তাকে শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধার্মিক হতে হবে। বিশেষ করে ইসলাম মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ধর্ম নয়।

প্রকৃত কথা এই যে, ইসলাম শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রের পথ দেখায় না, ইসলাম মানব জীবনের সব ময়দানেই বিধান দিয়েছে। কেউ কেউ শুধু ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকু পালন করাই যথেষ্ট মনে করে। তারা এর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিধানকে পালন করা প্রয়োজন মনে করে না। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের সবটুকুকেই মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ বিধান বিবেচনা করে। কোন অমুসলিম যদি নিজ ধর্ম পালন করেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে অন্য বিধান থেকে উন্নত মনে করে পালন করতে চান, তাহলে তা-ও তিনি করতে পারেন।

যারা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে হিন্দু ও মুসলিমের এক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব বলে ধারণা করেন, তাদের এ ভ্রান্তমত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান সমর্থন করেনি। ভারতে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়কেও অভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। আয়ারল্যাণ্ড একই খৃষ্ট ধর্মের দুটো শাখা প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিককে রাজনৈতিক ময়দানে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। সুতরাং এ দেশে এ ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত হওয়া ছাড়া কোন লাভ হবে না।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষবাদের যে কঠিন মূল্য মুসলিম নাগরিকদেরকে দিতে হচ্ছে, তা বিশ্বে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। আসামে মুসলিম সংখ্যালঘু ভোটাররা (১৯৮৩ সালের) নির্বাচনে অহমিয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ইন্দিরা সরকারের জোর করে চাপিয়ে দেয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যে মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করেছে, তা ঐ ধর্মনিরপেক্ষবাদেরই চরম ব্যর্থতার জ্বলন্ত সাক্ষী।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর সম্পর্ক মধুর রাখার প্রয়োজনেই ধর্মনিরপেক্ষবাদ বর্জন করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলাদলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদেরকে নিয়ে টানাটানি করার সুযোগ থাকাটা সাম্প্রদায়িক সুন্দর পরিবেশের জন্য মোটেই উপযোগী নয়।

## ধার্মিকতা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা

যারা বিবেকের দাবীতে, মনের তাকিদে ও যুক্তির ভিত্তিতে কোন ধর্ম পালন করে, তারাই ধার্মিক। এ জাতীয় মানুষের মন স্বাভাবিক কারণেই উদার হয়ে থাকে। তারা আন্তরিকতার সাথে নিজ ধর্ম পালন করে। তাই অন্য ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের সম্পর্কেও তারা ভাল ধারণা পোষণ করে।

যে মুসলিম তার ধর্মের বিধান মেনে চলে, সে যখন অন্য কোন মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে বা ইসলামের নৈতিক বিধানকে অমান্য করতে দেখে, তখন সে কিছুতেই তার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে পারে না। কিন্তু সে যখন অন্য ধর্মের কোন লোককে তার নিজ ধর্ম পালনে নিষ্ঠাবান দেখতে পায়, তখন ভিন্ন ধর্মের ঐ মানুষটিকে সে ভালবাসতে বাধ্য হয়। ভিন্ন ধর্মের লোক হওয়ার দরুন তার প্রতি বিরূপ মনোভাব সে পোষণ করে না।

অপরপক্ষে যে নিজের ধর্মকেই মেনে চলে না, সে অন্য ধর্মের অনুসারী মানুষকে কী করে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে ? প্রকৃতপক্ষে ধর্মই মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা দূর করে। সত্যিকার ধার্মিক লোকই সব মানুষকে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি হিসেবে সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে।

ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা কখনও এক হতে পারে না। যার কোন বিশেষ এক ধর্মের কতক অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে পালন করে এবং অন্ধভাবে ধর্মের খোলসটুকু নিয়েই চলে, কিন্তু ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা সহজেই ধর্মান্ধতার রোগে আক্রান্ত হয়। তারা নিজ ধর্মকে এতটা অন্ধভাবে মেনে চলে যে, তারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে ধর্মহীন মনে করে ঘৃণা করে বসে।

সত্যিকার ধার্মিক কখনো ধর্মান্ধ হতে পারে না। যারা ধর্মকে পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করে, তারাই ধর্মান্ধ হয়। যারা নৈতিক উন্নয়নের জন্য ধর্ম পালন করে এবং পরকালীন মুক্তিই যাদের ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্য, তাদেরকে ধর্মান্ধতা কখনো স্পর্শ করতে পারে না। সত্যিকার ধার্মিকতা মানুষকে উদার বানায় এবং অন্য সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।

সাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কোন একটি মানবগোষ্ঠী যখন কোন একটি বিশেষ ভাষা, বর্ণ, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণী চেতনাবোধ করে, তখনই তারা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তখন

www.pathagar.com

তারা নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থে ভিন্ন ভাষা, বর্ণ বা পেশার লোকদের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে পড়ে। আদর্শহীন ও নীতিহীন লোকেরা নিজেদের নেতৃত্বের স্বার্থেই তাদের সম্প্রদায়কে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

আসামে বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে অহমিয় ভাষীদের বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতারই একটি রূপ। ধর্মের খোলস পরেও সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ভারতে যেসব মুসলিম গণহত্যা হচ্ছে, তা সত্যিকার ধার্মিকদের কাজ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে অধার্মিক ও ধর্মান্ধরাই এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক কুকাণ্ড করে থাকে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগে ও পরে যেসব হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে, তা ধার্মিক লোকেরা করেনি। আমার ছাত্র জীবনেও ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা স্বচক্ষে দেখেছি। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীই এসব দাঙ্গার উৎস। উভয় দিকের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা অপর সম্প্রদায়ের যে কোন ভাল মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

১৯৪৪ সালের কথা। পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, বোম্বের হিন্দু ও মুসলিম গুণ্ডারা পৃথক পৃথক সমাবেশে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের বেশ্যাদের স্বার্থে অপর সম্প্রদায়ের বেশ্যাদের কাছে যাবে না। এরা আসলেই গুণ্ডা ও চরিত্রহীন। ধর্মের সাথে তাদের এ সিদ্ধান্তের কী সম্পর্ক ? অথচ তারা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবেই চিন্তা করেছে।

ইসলামী আদর্শ এ জাতীয় ধার্মিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। মানুষের কল্যাণের জন্যই ইসলাম এসেছে। ইসলামের দোহাই দিয়ে মন্দ লোকেরা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু এমনটা হওয়া সত্যিকার ধার্মিকদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। জামায়াতে ইসলামীকে যারা সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেয়, তারা রাজনৈতিক হীন স্বার্থেই তা করে থাকে। কারণ, আদর্শের দিক দিয়ে তারা জামায়াতের বিরোধিতা করতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত গালির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।–[অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী, গোলাম আযম, প্রকাশক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৮-১৭]

মাহমুদুল হাসান "ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংখ্যালঘু নিরাপত্তা" শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। আমার ভাল লাগে এটি। এটি উদ্ধৃত করলাম।

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে একশ' ভাগ নাগরিক ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে মুসলিম হবে তা জরুরী নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক নাগরিকই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া বেশ স্বাভাবিক কিন্তু প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র সেসব অমুসলিম নাগরিকের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে ?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ। কারণ, ইসলামের বয়স এখন প্রায় দেড় হাজার বছর। এ দীর্ঘ সময়ে ইসলামের সুন্দর নীতির আলোকে পৃথিবীর বিশাল অংশ জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সে রাষ্ট্র বলবৎ ছিল। কাজেই ইসলাম সংখ্যালঘুর সাথে কি ধরনের আচরণ করে? তার তত্ত্বীয় জবাব নয় শুধু, বাস্তব ও ব্যবহারিক জবাব আমরা ইতিহাসের বিশ্বস্ত গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় খুঁজে পাই।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হল—বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া তারা মুসলমান নাগরিকের মত সমান সুযোগ ভোগ করবে, তাদের সর্বপ্রথম প্রাপ্য অধিকার হল—তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভোগ করবে। এ নিরাপত্তা যেমন হবে আভ্যন্তরীণ শোষণ, যুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্ত তেমনি তা হবে আন্তর্জাতিক আক্রমণের ক্ষেত্রেও। তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিরাপদ জীবন যাপন করবে। মুসলমানরা আন্তজার্তিক চাপের মুখোমুখি হলে ইসলামী সরকারকে যেমন তা প্রতিহত করতে হবে তেমনি সংখ্যালঘু নাগরিকদের উপর কোন বহিঃশক্তি আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। সামরিক শক্তি ব্যয়ে হোক বা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় হোক তাদের নিরাপত্তা কোনভাবে বিঘ্নিত হতে দেয়া যাবে না। এ সংক্রান্ত ইসলামী আইন বা ফেকাহর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল।

মাতালেবু উলুন্নহা গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, রাষ্ট্রপ্রধানের জরুরী দায়িত্ব হল সংখ্যালঘুদের হেফাযত করা, তাদের কষ্টদানকারীদের প্রতিহত করা, তাদের বন্দীদের মুক্ত করা যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করে না।-[২য় খণ্ড/৬০২-৬০৩ পৃ.]

'আল-ফরুক' গ্রন্থে ইমাম কুরাফী বলেন, কোন মুসলিম দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘুর প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে যদি কোন বহিঃশক্তি এগিয়ে আসে তবে তাদের রক্ষা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জীবনবাজি রেখে লড়তে হবে। [২য় খণ্ড/১৪-১৫ পৃ.] ইসলামের এ উদার চিন্তাধারার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ) বক্তব্যে সিরিয়ার উপর যখন তাতারীরা বিজয়ী হলো শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ) কেতলো শাহের সাথে বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনায় মিলিত হলেন। তাতারী নেতা মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত হলেন কিন্তু অমুসলিমদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

www.pathagar.com

করলেন। শায়খ ইবনে তাইমিয়া প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সাথে বললেন, ইহুদী খৃস্টানসহ সব বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। স্বধর্মী-বিধর্মী কাউকেই আমরা বন্দী হিসেবে ছেড়ে যেতে পারি না। কেতলো শাহ তাঁর অবিচলতা টের পেয়ে সব বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে নির্যাতন করবে তারা আল্লাহর গযবে পতিত হবে। আল্লাহর নিকট তারা অপ্রিয়, ঘৃণিত। সংখ্যালঘুদের উপর যুলুমকারীদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় নবীজী (সাঃ) বলেন, যে কোন সংখ্যালঘুকে অত্যাচার করল বা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করলো বা তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করাল বা তার অমতে কিছু কেড়ে নিল কিয়ামতের দিন আমি হব তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী।"–(আবু দাউদ, বায়হাকী, সুনানে কোবরা)

"যে অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হব আমি কিয়ামতের দিন জয়ী হবো।"–(তারীখে বাগদাদ)

'যে সংখ্যালঘুকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দিল।'–(তাবরানী আওসাত)

নাজরানের খৃস্টান অধিবাসীদের সাথে নবী (সাঃ) স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল—একজনের অপরাধের প্রতিশোধ অন্যজন হতে নেয়া হবে না।–(আল খারাজ ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ. ৭২-৭৩)। এ কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা। মুসলিম শাসকগণ তাদের প্রত্যেক অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে ছিলেন নিরলস। হযরত ওমর (রাঃ) দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি থেকে প্রথমেই ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইতেন, অমুসলিম নাগরিকদের হাল-হাকিকত। তিনি কোনো মুসলিম নাগরিক দ্বারা কোন অমুসলিম ব্যক্তি নির্যাতিত হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন, উত্তরে প্রতিনিধিগণ জানাত ঃ না, আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কোন ঘটনার ব্যাপারে অবহিত নই।–(তারিখ তবরী ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৮)

হযরত আলী (রাঃ) বলতেন, তারা আমাদেরকে জিযিয়া কর আদায় করে, যেন তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত, তাদের খুন আমাদের খুনের মত নিরাপদ হয়।–(আল বাদায়ে, ৭/১১১ পৃষ্ঠা)। সংখ্যালঘুদের জান-মালের হেফাযতের ব্যাপারে এবং তাদের অত্যাচারকারীদের কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে সকল মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সুস্পষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন।

www.pathagar.com

কারণ, মুসলমানরা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অনেক ফেকাহবিদের মতে, অমুসলিমকে নির্যাতন করা কোন মুসলমানকে নির্যাতন করা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত। এর যুক্তি হল, ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা সাধারণত দুর্বল হয়ে থাকে। সবল কর্তৃক দুর্বলকে অত্যাচার করা অধিক জঘন্য।

অমুসলিম নাগরিকদের ইজ্জত, সম্ভ্রম, আব্রুর নিরাপত্তা যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তাদের ন্যায্য অধিকার অদ্রূপ তাদের জানের নিরাপত্তাও অন্যতম প্রাপ্য অধিকার। সকল মাযহাবের ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো সংখ্যালঘু নাগরিককে হত্যা করা যাবে না। মুসলিম নাগরিক হত্যার মতই সংখ্যালঘু হত্যা করা কবীরা গুনাহ ও জঘন্য পাপাচার। মহানবী (সাঃ) বলেন, যে কোন সংখ্যালঘুকে হত্যা করবে সে জান্নাতের স্থানও উপভোগ করতে পারবে না, অথচ জান্নাতের সু-ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভব করা যাবে।-(বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আলী (রাঃ)-এর আদালতে সংখ্যালঘু নাগরিক হত্যাকারী এক মুসলিমকে উপস্থিত করা হল এবং সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে তার অপরাধ প্রমাণিত হলো। হযরত আলী (রাঃ) হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তাঁর রায় কার্যকর করার মুহূর্তে নিহত সংখ্যালঘুর ভাই এসে বলল, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রশ্ন ছিল লোকটির প্রতি—হয়তো তারা তোমাকে শাসিয়েছে, চোখ রাঙিয়েছে, হুমকি দিয়েছে তাই তুমি একান্ত বাধ্য হয়ে ক্ষমা করতে এসেছো ?

জবাবে সে জানাল, না, এ হত্যা ছিল অনিচ্ছাবশত। তারা রক্তপণ (দিয়াত) দিয়েছে। এতে আমি রাজি।

হযরত আলী (রাঃ) তখন তার উদ্দেশে বললেন—নিশ্চয় তুমি জান, যারা আমাদের নিরাপত্তায় থাকবে তাদের জানের মূল্য আমাদের জানের মতোই। তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মত।-(সুনানে কোবরা)। সংখ্যালঘুর জানের নিরাপত্তার মত শরীরের নিরাপত্তাও মুসলিম রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। সংখ্যালঘুকে মারধর ও দৈহিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না। অমুসলিম নাগরিকদের উপর আরোপিত কর, খাজনা, জিযিয়া আদায়ে বিলম্ব করলে বা আদায়ে অস্বীকার করলে তাদেরকে শারীরিকভাবে আঘাত করা যাবে না। ফেকাহবিদগণ অমুসলিম নাগরিককে ইসলামী আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডের ঊর্ধ্বে অন্য কোন শাস্তিদানের অনুমতি দেননি। এমনকি সশ্রম কারাদণ্ডের অনুমতিও দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রিয় নবী (সাঃ) নাজরান অধিবাসী খৃস্টানদের সম্পর্কে বলেছেন—নাজরান ও তদসংশ্লিষ্টদের জন্য রয়েছে আল্লাহর আশ্রয় এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাদের ধর্ম-কর্ম, ধন-সম্পদ ও ছোট-বড় সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা।–(আল খারাজ ইমাম আবু ইউসুফ ৭২-পৃষ্ঠা)

হযরত ওমর (রাঃ) বিশিষ্ট সেনানায়ক আবু ওবাইদা ইবনুল জাররাহর নিকট এ মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন তাদের ক্ষতিসাধন এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ দখল থেকে মুসলমানদের বিরত রাখ।

মুসলমানদের সম্পদ চুরি করলে ইসলামী আইনে যেভাবে চোরের হাত কাটা হয়, সংখ্যালঘুর সম্পদ চুরি করলেও চোরকে অনুরূপ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সংখ্যালঘু নাগরিক হতে ঋণ নিলে সময়মত ফিরিয়ে দিতে হবে। অযথা কালক্ষেপণ করা যাবে না, যদি কেউ ঋণ পরিশোধ না করে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে অন্তরীণ থাকবে। ইসলাম মহত্বের ধর্ম, শান্তির ধর্ম, উদারতার ধর্ম। ইসলামের শিক্ষা হল—কোনো মুসলমানকে যেমন অন্যায়ভাবে গালাগাল করা যাবে না, তার গীবত বা অবর্তমানে নিন্দা করা যাবে না, অপবাদ দেয়া যাবে না তদ্রূপ কোন সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রেও করা যাবে না। সংখ্যালঘুর সাথে এমন কোন আচরণ করা যাবে না যা তার মান হানিকর। বিশিষ্ট ফেকাহ্ বিশারদ আল্লামা শেহাবুদ্দীন আল কুরাফী তাঁর আল ফরুক গ্রন্থে বলেছেন—মুসলিম রাষ্ট্রে যেসব সংখ্যালঘু আনুগত্য স্বীকার করে বসবাস করছে মুসলমানদের উপর তাদের প্রচুর হক রয়েছে। যে কোন সংখ্যালঘুর উপর আঘাত করল যদিও সামান্য কটূক্তি বা গীবতের মাধ্যমে হোক সে আল্লাহ-রাসূল ও ইসলামের সম্মান ক্ষুণ্ন করল।

ইসলামের উদার নীতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণও গবেষণা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষার 'দৈনিক নিরোত্তম'-এর প্রখ্যাত সম্পাদক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, লেখক নিরূপম আড়িয়ারে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের তুলনামূলক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশেষে তিনি ইসলামের স্বরূপ সন্ধানে অবতীর্ণ হন। ব্যাপক অধ্যয়ন ও চর্চার ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, দুনিয়ায় শান্তি এবং পরকালে মুক্তি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। তিনি এখন ইসলামের মহান আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেন, পিতৃ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে মাদ্রাজের

www.pathagar.com

নিরূপম আড়িয়ার হয়ে গেলেন আবদুল্লাহ আড়িয়ার। সময়টা ১৯৮৭ সাল হবে। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসলাম জিস্‌মে মুঝে পিয়ারে হ্যায়"-এর অনুবাদ হয়েছে "ইসলাম আমার ভালোবাসা" (প্রকাশক ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১) নামে।

ইসলাম সম্পর্কে তিনি অনেক ভাল ভাল কথা লিখেছেন। তিনি নারী অধিকার, ইসলাম প্রচার সম্পর্কে লেখেন ঃ

"সকল পুরুষের ক্ষেত্রে একথা আশা করা যায় না যে, সে নিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যের সাথে থাকবে এবং যতক্ষণ তার স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত হবে না ততক্ষণ তার কাছে আসবে না—সে নিজেকে জৈবিক কর্ম থেকে বিরত রাখবে। পুরুষ বৈধ পথে নিজ জৈবিক অভাব পূরণ করতে পারে এরূপ আবশ্যকীয় রাস্তা খুলে রাখা দরকার এবং এরূপ সংকীর্ণ করা ঠিক নয় যার ফলে সে হারাম রাস্তায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়। স্ত্রী তো একজন ঠিক আছে, কিন্তু উপপত্নী বেহিসাব। এতে সমাজ যেভাবে ক্লেদাক্ত হবে, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড যেভাবে বরবাদ হবে তা অনুমান করতে আপনাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।"

জেনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা দিয়ে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দানকারী বিজ্ঞজনোচিত দীন হলো ইসলাম। সীমা নির্ধারণ করে একদিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে ইসলাম প্রকারান্তরে নারী ও পুরুষের শারীরিক যোগ্যতা, তাদের রীপুর তাড়ন, সাংসারিক আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এমনিভাবে আমাদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনাদর্শে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে একথা বলা নিছক একটা ভ্রান্ত দাবি এবং ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আসুন, এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করি। ঈসায়ী ধর্ম ও ইসলাম স্ব স্ব প্রাথমিক স্তরে নিরব প্রচারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। ঈসায়ী ধর্মের প্রচার হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে তাঁর হাওয়ারীরা করেছিল। কিন্তু ইসলামের প্রচার কিছুদিন চুপে চুপে চলছিল অতঃপর প্রকাশ্যভাবে এর দাওয়াত দেয়ার হুকুম আসলো।

ইসলামে জোরজবরদস্তি নেই সুস্পষ্টভাবে এর ঘোষণা দেয়া হলো—এ কারণেই বলা হচ্ছে, "দীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।" কোনো ব্যক্তি বলতে পারে যে, যদি তাই হয় তবে নবী (সাঃ) কেন যুদ্ধ করলেন, তাঁকে তলোয়ার কেন উত্তোলন করতে হলো ? বাস্তব অবস্থা হলো, তিনি যে সমস্ত

www.pathagar.com

যুদ্ধ করেছেন এগুলোকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলা যেতে পারে না। তাঁর যুদ্ধসমূহ আক্রমণাত্মক নয় বরং প্রতিরোধক যুদ্ধ ছিল। মক্কাবাসীরা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র খতম করার বাসনায় বের হয়েছিল। এই মদীনা সেই মদীনা যেখানে নবী (সাঃ) আশ্রয় পেয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র খতম করার জন্য কুরাইশরা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিল তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হলো। ইতিহাসের পরবর্তী যুগে মুসলমান রাজা-বাদশাহরা যে সমস্ত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর সংগে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

হিন্দু রাজা রাজেন্দ্র জাভা ও সুমাত্রায় সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। সেখানে এখনও হিন্দু সভ্যতা বিরাজমান, কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না যে, রাজা রাজেন্দ্র হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য সামরিক অভিযান চালিয়েছিল।

ইউরোপের খৃস্টানরা সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সাম্রাজ্যে ঈসায়ী ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু আপনারা কি বলতে পারেন এই সমস্ত দেশে খৃস্টবাদ তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে ? সামরিক অভিযান তো সাধারণত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য হয় এবং যে দেশে যাদের রাজ্য কায়েম হয় সেই শাসকগোষ্ঠীর অনুকরণে সে দেশের সাধারণ মানুষ গড়ে উঠে এবং তাদের ধর্মগ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে একটা ধর্মীয় শাখা ছিল সেমিনর, যখন এই শাখার লোকেরা তামিলনাড়ুতে রাজ্য বিস্তার করলো তখন সেমিনর মতবাদ এখানে বিস্তার লাভ করলো। হিন্দুস্তানে যখন বৌদ্ধরা শাসক হলো তখন বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করলো। এমনিভাবে শিউমুর ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা যখন শাসক হয়ে আসলো, তখন এই মতবাদ সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করলো এবং যখন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেরা শাসক হলো তখন এ মতবাদ আবার সাধারণ মানুষের মতবাদে পরিণত হলো। এই থেকে বোঝা যায় যে, যেমন রাজা তেমন প্রজা এই ছিল আসল ব্যাপার। নতুবা ধর্ম বিস্তারে এই শাসকদের না কোনো আকর্ষণ ছিল, না এই কারণে তারা করেছিল যুদ্ধ।

ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যাবে না যে, যদি কেউ ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করেছে তো তাকে ইসলাম কবুল না করার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।

অথচ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাইনদের বিরোধে ধর্মীয় মূলনীতির ব্যাপারে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। দূরে কেন যাবো, তামিলনাড়ুর

www.pathagar.com

ইতিহাসে দেখি, মাদ্রাজে জ্ঞান সমুদ্রের যুগে আট হাজার সেমিনর ধর্মাবলম্বীকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, এই হলো আমাদের ইতিহাস।

আরবে নবী স. রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সেখানে ইহুদীও ছিল, খৃস্টানও ছিল, কিন্তু তাদের সাথে কোনো বিরোধ লাগানো হয়নি।

হিন্দুস্তানে মুসলমান বাদশাহদের যুগে হিন্দু ধর্ম পালনকারীদের ধর্ম পালনের পূর্ণ অনুমতি ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাদশাহরা মন্দিরের হিফাযত করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন।

মুসলিম সামরিক অভিযান যদি ইসলাম প্রচারের জন্য হতো তাহলে দিল্লীর মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বাবর কখনও সামরিক অভিযান চালাতেন না। রাজ্য দখলই সে যুগে মুসলমানদের রাজনৈতিক পলিসি ছিল। রাজ্য বিস্তারের সংগে ধর্ম প্রচারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনেক মুসলমান আলেম ও সুফী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে এসেছেন এবং তাঁরা নিজস্ব তরিকায় এখানে ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পাদন করেছেন। মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নাগরে সমাহিত হযরত শাহ আল হামিদ এবং আজমীরে সমাহিত হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) প্রমুখ হলেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইসলাম এর নিজস্ব নীতিমালা এবং নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য দ্বারা একটি অসীম আকর্ষণ রাখে, আর এটাই কারণ যে, মানুষের অন্তঃকরণসমূহ আপনা আপনিই এদিকে চলে আসে। অনন্তর ইসলাম এমনি একটি দীন, এর প্রচারের জন্য তরবারি উত্তোলনের কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

## কমিউনিজমের চেয়ে ইসলাম শ্রেষ্ঠ

পুঁজিবাদের মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত প্রদানকারী মতবাদ দুটো হলো ঃ কমিউনিজম এবং ইসলাম। ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে অল্প কিছু ব্যক্তি দাসকেপিটাল গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। মার্ক্স-এর একটি থিউরি যার নাম হলো Serplus value (অতিরিক্ত মূল্য)। এ থিউরিটি ব্যাখ্যা করতে মার্ক্স এর গ্রন্থ তিনটি বড় খণ্ডে লিখিত হয়েছে।

কমিউনিজমের দাবি হলো যে, পুঁজিপতি পুঁজি খাটায়, শ্রমিক এই পুঁজিতে শ্রম দিয়ে লাভ সৃষ্টি করে। এই লাভ আসল পুঁজি থেকে অতিরিক্ত ; এ অতিরিক্ত আমদানি দিয়ে পুঁজিপতি আরো একটি কারখানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

কমিউনিজম সামনে অগ্রসর হয় এবং পুঁজিবাদের আসল শক্তি এই অতিরিক্ত মূল্য খতম করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সে পুঁজিবাদকে মিটিয়ে দিয়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ জাতীয়করণ করে ফেলে।

চিন্তার বিষয় যে, কারখানাগুলো জাতীয়করণ করলেই কি সমস্যার সমাধান হতে পারে ? জাতীয়করণকৃত কারখানাগুলোতেও অতিরিক্ত মূল্য অথবা লাভ আসবে। প্রশ্ন হলো, এই লাভ কোথায় নেয়া হবে এবং এটাও দেখতে হবে যে, বাস্তবে এই লাভ কি হচ্ছে ? কোনো কারখানার লভ্যাংশে শুধু সেখানকার কর্মরত শ্রমিকরাই অংশ পেয়ে থাকে। অন্য কারখানার শ্রমিক বা দেশের দারিদ্র জনসাধারণ সেখানে কোনো অংশ পায় না। জাতীয়করণের উদ্দেশ্য এটা হওয়া উচিত ছিল না। লাভ গোটা জাতির মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিত।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র আইনের জোরে লাভ কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়। এর বিপরীত ইসলাম অতিরিক্ত মূল্যকে অন্যের নিকট খরচ করার জন্য উৎসাহিত করে ; তাকিদ দেয়। এ কাজের পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজ করে না বরং বিশ্বাসের শক্তিই এখানে কার্যকর।

কমিউনিস্ট দেশে কারখানাগুলোকেই শুধু জাতীয়করণ করা হয়। লভ্যাংশের বণ্টন ব্যবস্থা যা কিছু হয়, তাদের মধ্যেই হয়। এখন থাকলো ঐ সমস্ত সম্পদ যা ব্যক্তির কব্জায় থাকে, এখান থেকে প্রাপ্ত লাভ বণ্টনের কোনো ধারণাই নেই এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোনো ব্যবস্থাও নেই। অথচ ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্য অন্যদের জন্য খরচ করার তাকিদ প্রদান করেছে। অতিরিক্ত মূল্যের একটি অংশ জনকল্যাণের জন্য বের করে খরচ করাকে 'যাকাত' নাম দেয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় জাকাত অর্থ পাক ও পবিত্র। নিজস্ব উৎপাদন থেকে একটা অংশ বের করা হলো জাকাত। এ জাকাত বের করে মানুষ যেন তার সম্পদকে পাক করে ফেলে। যদি এটা না করে তবে সমস্ত সম্পদ নাপাক হয়ে যায়। এ উন্নত শিক্ষা দুনিয়ায় দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। এখানে কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, নিজ সম্পদ থেকে জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করার শিক্ষা দেয়া তো ধর্মের একটা সুপারিশ ; কোনো ধনশালী যদি ধোঁকা দিতে চায়, এমনকি ধোঁকা দিয়েই ফেলে তবে তাকে এ থেকে কে বিরত রাখবে ?

এই আপত্তির জবাব আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তলোয়ার ধারণ করেছিলেন। অথচ এই জাকাত অস্বীকারকারীরা আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান এবং ইসলামের অনুসারী ছিলেন। দীন ইসলাম পালনকারী,

www.pathagar.com

নবী (সাঃ)-এর উপর ঈমান পোষণকারী নামায আদায়কারীদের বিরুদ্ধে এই তলোয়ার উত্তোলিত হয়েছিল। যে অপরাধে তারা অপরাধী হয়েছিলন, তা ছিল এক ভয়ংকর অপরাধ। আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর যে বিষয়ের উপর ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, তা হলো জাকাত। অর্থাৎ নিজ সম্পদের একটা অংশ বের করে নিজের অক্ষম ভাইকে সাহায্য করা।

এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তি তার মূল সম্পদ ও মূল পুঁজি থেকে অন্যের জন্য খরচ করবে। এই শিক্ষা কমিউনিজম দেয় না। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে শক্ত তাকিদ করছে যে, আবশ্যিকভাবে এ খরচ করতে হবে। কেউ যদি এ খরচ না করে ইসলাম তার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করবে যদিও সে মুসলমান হয়।

সাধারণত পুঁজিপতিদের মনে এ ধারণা বিরাজ করে যে, তার সম্পদ তার আরাম আয়েশের জন্যই ; এ সম্পদ অন্যের জন্য খরচ করলে নিজের দারিদ্রই ডেকে আনা হবে। এ আশংকাই সাধারণত মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ইসলাম সবার আগে এ আশংকা নির্মূল করে দেয়। আল কুরআন প্রকাশ্যভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, "খরচ করলে দারিদ্র্য নয় বরং স্বচ্ছলতা আসে।"

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কৃপণতার দিকে উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী ও সর্বজ্ঞানী।"

কার্পণ্য কি ? নিজ প্রয়োজন, পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন, অন্যান্য মানুষের প্রয়োজনে খরচ না করে সম্পদ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখাই কার্পণ্য। তামিল ফিল্মজগতে একজন বড় গায়ক ছিল। যে ছিল বড় কৃপণ। তার ছেলের পায়ে জখম হলো, এর চিকিৎসার জন্য পয়সা খরচ করতে সে বিব্রতবোধ করলো। ফল দাঁড়ালো যে, তার ছেলে মারা গেল। এই হলো কৃপণতার ফল। এই ধরনের কুঞ্জুসী ও কৃপণতার ঘোরতোর বিরোধী হলো ইসলাম।

ইসলাম শুধু খরচ করার শিক্ষাই দেয়নি বরং সাথে সাথে খরচ করার শালীনতাও শিক্ষা দিয়েছে। কোনো কোনো মানুষ অন্যের জন্য খরচ করে ঠিক কিন্তু তাদের এই খরচ হয় নিজস্ব কৌলীণ্য জাহির করার জন্য অথবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য। এই ধরনের সমস্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপকে ইসলাম নাজায়েয সাব্যস্ত করে এবং এর মূলোৎপাটন করে। ইসলাম বলে খরচ করা ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় বিধান এবং নামাযের পর এটা হলো দ্বিতীয় বড় রোকন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া খরচ করার অন্য উদ্দেশ্য যাতে তোমাদের না থাকে, এটাই আল কুরআনের তাকিদ।

আমি কোনো এক শহরে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি কোনো একটি সংস্থাকে টিউবলাইট উপহার দিয়েছিল এবং এর উপর দাতার নাম এত বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিল যে, এর মধ্য দিয়ে আলো বের হতে পারছিল না। ইসলাম বলে, এ ধরনের দানের পদ্ধতি শুধু ভ্রান্তই নয় বরং নেকীসমূহকে বরবাদ করে দেয়। কোনো কোনো ব্যক্তি অন্যকে অর্থ অথবা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য তো করে কিন্তু দান গ্রহীতার উপর নিজ সাহায্যের চাপ ও খোঁটা এমনভাবে প্রয়োগ করে যে, তার অন্তরকে ছিন্ন করে দেয়। এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে ইসলাম নিষেধ করে থাকে। আল কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

"একটি মিষ্টি কথা এবং কোনো কটু কথা থেকে সামান্য বিরতি সে খয়রাত থেকে উত্তম যার পশ্চাতে রয়েছে কষ্টদায়ক কথা।"

বিনোবা ভাবে যখন ভূদান আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন কিছু মানুষ উত্তম ভূমি দান করছিলেন। তার বহু লোক অনুর্বর পাথুরে জমি দান করেছিল। নিজ বাড়ীর ছেঁড়া কাপড়, বাসী খাদ্য, ভাংগা বাসনপত্র দানকারী দাতাও দুনিয়াতে পাওয়া যায়। ছেঁড়া নোট, অচল পয়সা দানকারীও দুনিয়ায় পাওয়া যাবে। কিন্তু ইসলাম সবচেয়ে উত্তম জিনিস খরচ করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। নিজের পসন্দসই পোশাক, নিজ রুচি মত খাদ্য, মনমতো ধন সব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য তাকিদ প্রদান করে। আপনার আয়ের মধ্যে যেটা সবচেয়ে উত্তম সেটা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ইসলামের শিক্ষা। আল কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط

"হে ঈমানদারেরা, যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ এবং আমরা যা মাটি থেকে উৎপন্ন করেছি এর মধ্যে উত্তম অংশটি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার জন্য খারাপ জিনিস বেছে বেছে রাখবে।"–[সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭]

আপনি কাউকে খাদ্য, কাপড় অথবা আর্থিক সাহায্য যাই দেন, ইসলাম তা গোপনে দেয়াকে উত্তম বলে অভিহিত করে। যদিও প্রয়োজনের খাতিরে প্রকাশ্যেও দেয়া যায়। কুরআনে আছে ঃ

www.pathagar.com

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط

"যদি তুমি তোমার সাদকা প্রকাশ্যে দাও তবে তা ভালো, কিন্তু গোপনে অভাবী জনের কাছে যদি দাও তাহলে আরো উত্তম।"

–[সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১]

আল্লাহর পথে খরচ করা সম্পর্কে আর একটি অবস্থা এই হতে পারে যে, একজন অপব্যয়ী, মদ্যপ আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এলো, আপনি কি তাকে সাহায্য করবেন ? যদি সাহায্য করেন তবে এটা কোন্ ধরনের সাহায্য হবে ? ইসলাম এ সমস্যারও সমাধান দিয়েছে। বিভ্রান্ত ও স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে পয়সা দেয়া যাবে না, এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন বলে ঃ "এবং তোমার সম্পদ যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়েছে, নির্বোধ লোকের কাছে হস্তান্তর করো না; অবশ্য তাদের খাওয়া পরা দেবে, সৎ রাস্তার দিকে হেদায়াত করবে।"

তাদের মৌলিক প্রয়োজন খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হওয়ার পর ইসলাম এ পর্যায়ে যে হেদায়াত দেয় এবার আসুন এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি।

(এক) তোমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করার পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর।

(দুই) নিজ শক্তির বাইরে খরচ করবে না, আবার কার্পণ্যও করবে না— তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

(তিন) খরচ না করে নিজ হাতকে গুটিয়ে রেখ না, আবার এমন খোলা হাতে খরচ করো না যে, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই সাহায্যের প্রত্যাশী হতে হয়।

(চার) তোমাদের গরীব আত্মীয়-স্বজন, অভাবী ফকির-ইয়াতীম এবং মুসাফির এসবই তোমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী। নিজ সম্পদের জাকাত দেয়া মুসলমানের উপর ফরয। এ ফরয আদায় থেকে বিমুখ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত। একদা নবী (সাঃ) একজন নারীর হাতে একখানা সোনার বালা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর জাকাত দিয়েছ ? মেয়েটি বললো, না। নবী (সাঃ) বললেন, আখিরাতে তোমাকে আগুনের বালা পরানো হবে। (মেয়েটি সেই বালাখানি দান করে দিলেন)।

www.pathagar.com

জাকাতের টাকা কোথায় খরচ করতে হবে কুরআন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছে ঃ গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত, ইয়াতীম ও মুসাফিরদের সাহায্য ছাড়াও জাকাতের টাকা মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্যও খরচ করা যেতে পারে। দাসমুক্ত করার জন্যও খরচ করা যেতে পারে। এছাড়া জাকাত আদায়ে লিপ্ত কর্মচারীদের বেতন হিসেবেও এই তহবিল থেকে খরচ করা যেতে পারে। জাকাত ব্যয়ের খাতের মধ্যে 'ফি সাবিলিল্লাহ' একটা খাত আছে। ফি সাবিলিল্লাহ-এর অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে একটা ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। কল্যাণমূলক সকল কাজ এই ফি সাবিলিল্লাহর আওতায় পড়ে। বিশেষ করে দীনের প্রচার ও প্রসার এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ইত্যাদিও 'ফি সাবিলিল্লাহ'র মধ্যে শামিল।–[পৃষ্ঠা-৫৬-৬৪]

আবদুল্লাহ আড়িয়ার লেখেন, সমস্ত মুসলিম দেশ অত্যন্ত গরীব ছিল, কিন্তু আরবের মরুভূমি থেকে দুনিয়া আলোকিত হবে—এই ছিল নবী (সাঃ)-এর ঘোষণা। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, আজ সেখানে পাথরের মধ্যে পেট্রোল। আরবরা ইসলামী আকীদার উপর যতবেশী বিশ্বাসস্থাপন করবে ও কাজ করবে দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাদের প্রতি অফুরন্ত হবে।

নবী (সাঃ)-এর জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক। আর এমনিতর ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনেরও।

ইতিহাসের পরবর্তী যুগসমূহে কিছু কিছু নবাব ও বাদশাহর পদস্খলন হয়েছিল, কিছু কিছু বিভ্রান্তিও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল ; কিন্তু মুসলিম জাতির দীনের উপর ও তার নীতিমালার উপর অনড় বিশ্বাস থেকেই গেছে। প্রাথমিক যুগে এদের সংখ্যা ছিল লক্ষ্যে আর বর্তমানে তা পৌঁছে গেছে সোয়াশ' কোটিতে।

এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মুসলমান ও মুসলিম বাদশাহদের পদস্খলন ও দুর্বলতার জন্য আকীদা-বিশ্বাসে নড়চড় হওয়ার প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে না। ব্যক্তির ভুলে নীতি বাতিল হয় না, পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয় না।

আসল কথা হলো ঃ দুনিয়ার জটিল সমস্যাবলীর সমাধান এবং দুনিয়ার বিপদোদ্ধার একমাত্র ইসলাম। সূর্য যদি ম্লান হয়ে যায় তবে আলো কোত্থেকে আসবে ? সমুদ্র যদি নোনতা বন্ধ করে দেয় তবে লবণ কোত্থেকে আসবে। সাগর শুকিয়ে গেলে পানির ধারা কিভাবে আসবে ? ইসলাম পরাজিত হলে সারা বিশ্ব ও মানবজাতি দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি কোথায় পাবে ?

www.pathagar.com

## ইসলামের সাজাসমূহ

সাধারণত অমুসলিম ভাইদের মাঝে একথা বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত যে মুসলমানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং তাদের মধ্যে বর্বরোচিত সাজা চালু আছে। চোরের হাতকাটা ও ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এটাও বলা হয় যে, মুসলমানেরা সামরিক অভিযান চালিয়ে মন্দির ধ্বংস করেছে এবং যুলুম নির্যাতনের ধারা চালু করছে। এসব বিভ্রান্তির ফলে বিরুদ্ধ বাদীরা বলে যে, মুসলমানরা জালিম এবং নির্দয়।

এ অভিযোগ উত্থাপনের আগে মানুষের নিজের দিকে একটু তাকানো দরকার তবেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতে পারে।

- পুত্র হস্তিনী শাবককে জবেহ করলে মনুমূর্তি আইনে পিতা পুত্রকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। এ কাজকে তাহলে কি বলা যাবে ?
- বাদশাহর বাগানের একটি ফল নদীতে পড়ে ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় আসলে একটি মেয়ে তা কুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল সেই অপরাধে নুন্নান নামে এক বাদশাহ তাকে হত্যার শাস্তি দিল।
- প্রসিদ্ধ কবি কংগীর পায়ের একখানা কংকন এক স্বর্ণকার চুরি করলে এই অপরাধে সমকালীন সকল স্বর্ণকারকে হত্যা করা হলো।
- জ্ঞানসমুদ্র নামে এক পুরোহিত একটি মঠে বসবাস করতো। সেমিনর গোত্রীয় লোকেরা সেই মঠে আগুন লাগাবার চেষ্টা করলে এই অপরাধে তাদের আট হাজার লোককে শূলে চড়ানো হলো।
- 'আপ্পর' নামে এক ব্যক্তি, ধর্মান্তরিত হলে এই অপরাধে তাকে পাথরের সাথে বেধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। সেখান থেকে সে বেঁচে ফিরে আসলে তাকে তখন উত্তপ্ত চুনের ভাটিতে ফেলে দেয়া হলো।
- তানালীরামন ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা এও পাওয়া যায় যে, শাহী হুকুম না মানার অপরাধে মানুষকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, আবার কোনো কোনো ব্যক্তিকে হাতীর পায়ের নীচে পিষ্ট করা হতো।
- তামিলনাড়ুর তিরমুলাই এবং মহীশুরের এক রাজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, যুদ্ধে মানুষের নাক কেটে দেয়া হয়েছিল। মহীশুরের রাজা তামিলনাড়ুর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং মানুষের কান ও ঠোঁট কেটে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এর প্রতিশোধে তামিলনাড়ুর রাজা মহীশুর আক্রমণ করলো এবং দুশমনদের নাক ঠোঁট কেটে দিল।-(নায়েক বাদশাহদের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে)

www.pathagar.com

- শিশুদের বলিদান, মানুষের অংগ-প্রত্যংগের মানত করার প্রচলন আজও ভারতের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, দয়া ও দয়াদ্রতার নাম কি এটাই ?
- পশ্চিমী দুনিয়ায় শূলে চড়ানো একটা সাধারণ ব্যাপার। হযরত মসীহকে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেন্ট পিটারকে উল্টিয়ে লটকিয়ে শূলে দেয়া হয়েছিল।
- 'জান আফ আরক'-কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।
- প্রোটেস্টাইন্ট ধর্ম গ্রহণকারীদের মাথা ফেঁড়ে মগজ টুকরা টুকরা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।
- জন্তু-জানোয়ারের মতো আফ্রিকা থেকে মানুষ নিয়ে আসা হতো এবং ইউরোপের বাজারে দাস হিসেবে নিলামে বিক্রি করা হতো।—এই হলো পশ্চিমী সভ্যতা।
- হিটলার গ্যাস চেম্বারে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছিল।

এখনও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসে যে, উচ্ছৃংখল জনতাকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আলীপুর, জামশেদপুর, ভেলসার ঘটনাবলী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এমনিভাবে দুনিয়ার প্রতিটি দেশের ইতিহাস জুলুম-নির্যাতনের কলঙ্কময় কাহিনী দিয়ে ভরে আছে। বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালু রাখা হয়েছে। এটাই হলো তাদের দয়া ও অনুকম্পার বহিঃপ্রকাশ।

পাশবিক ও নির্যাতনমূলক ধ্যান-ধারণাকে মিটিয়ে সে স্থলে সঠিক অর্থে দয়া ও অনুকম্পার শিক্ষাদানকারী কোনো সত্য ধর্ম যদি থাকে তবে তাহলো ইসলাম।

কোনো কোনো ধর্মে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকে বিভক্ত করে প্রতিটি গুণের জন্য একটা আলাদা রব মানা হয়। কোনো কোনো ধর্মে আবার আল্লাহকে গুণাবলী বিমুক্ত সত্তা মনে করা হয়। অথচ ইসলামে আল্লাহ সরাসরি রহমত হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। রসূল (সাঃ)-এর আগমনকে রহমত হিসেবে বিভূষিত করা হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রহমান ও রহীম হিসেবে আল্লাহ তাআলার পরিচয় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নিকট তা অত্যন্ত পসন্দসই। তার গুণ রহমতের প্রতিকৃতি তার বান্দাদের মধ্যেও প্রতিফলিত হোক।

ইসলামের শিক্ষা হলো, প্রতিটি কাজ দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করবে। ইসলাম সালাম প্রথার যে প্রচলন করেছে সেখানেও প্রেম-

www.pathagar.com

প্রীতি ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। প্রকৃত মুসলিম অন্যের প্রতি দয়ালু, মেহেরবান এবং দয়াদ্র হয়ে থাকে। এটাই আল কুরআনের শিক্ষা। নবী (সাঃ)-এর চরিত্র ও আদর্শ হলো এটাই।

কিছু কিছু ব্যক্তি যদি এ দয়াদ্রতার পথ থেকে বিচ্যুত হয় তবে ইসলাম তাদেরকে এ পথে ফিরিয়ে আনার দিকে তাকিদ প্রদান করে।

তুরস্কের এক বাদশাহ সুলতান সেলিম। তিনি তাঁর অধিনস্তদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর দেশের সকল ভাষা ও সকল ধর্মকে মিটিয়ে দিয়ে এক ভাষা ও এক ধর্ম চালু করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় শায়খুল ইসলামের তীব্র বিরোধিতার মুখে সুলতানকে শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে হয়।

চিত্তবিনোদনের জন্য আজও বিভিন্ন দেশে জন্তু-জানোয়ার ও পাখীদের মধ্যে পরস্পরে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়ার ঘটনা দেখা যায়, ইসলাম এ ব্যাপারে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছে।

আদী বিন হাতেম পিঁপড়াদের খোরাক পৌছাতেন—এ ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রভাব। রাস্তায় চলাচলের অধিকার পশুদেরও আছে—তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেয়া নিষেধ। সিরাজী এই ঘোষণাই দিয়েছিল। এই ধরনের ঘটনাবলী মুসলমানদের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

উটের উপর যদি তিন ব্যক্তি চড়তেন এবং উট এ কারণে বোঝার চোটে যদি দাবিয়ে যায় তাহলে জোরপূর্বক একজনকে নামিয়ে দাও, এই হেদায়াতও ইসলামে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে, দয়া ও অনুকম্পার শিক্ষা ইসলামই দেয়। আবার কঠিন অপরাধের অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেয়ার শিক্ষাও ইসলামই দেয়। চোরের হাত কাটার শাস্তি ইসলাম দিয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু এর পরিণাম ও প্রভাব দেখুন, যে সমস্ত দেশে এই আইন চালু আছে সে সমস্ত দেশে চুরির ঘটনা অতি বিরল।

আরব দেশে খুনীর মস্তক তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়, যেখানে অন্যান্য দেশে ফাঁসি দেয়া হয় অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। শূলে অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে কঠিন আযাবের ভেতরে জান বের হয় এজন্য তলোয়ার দিয়ে মৃত্যুদণ্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

## মুসলমানেরা কি মন্দির ভেঙ্গেছে ?

এরূপ আর একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ হলো যে, মুসলমানেরা হিন্দুস্তানে মন্দির ভেঙ্গেছে। এ রকম অপবাদ দেয়ার সময় আমরা ভুলে যাই যে, এ

www.pathagar.com

ধরনের ঘটনাবলী স্বয়ং ভারতে অন্যান্য লোকেরাও ঘটায়। আমাদের এখানে সেমিনর সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলোকে ভাঙ্গা হয়েছে। আমরা এটাও ভুলে গেছি যে, নাগাতিনম-এর মূর্তিগুলো লুট করা হয়েছে এবং সেখানে যা সোনা ছিল তরু মঙ্গী এলাকার লোকেরা তা উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

আমরা তো বলি যে, মুসলমানেরা মন্দির ভেঙ্গেছে অথচ আমরা ভুলে যাই যে, তারা হিন্দু মন্দিরের জন্য জমিও ওয়াক্‌ফ করেছে।

মুসলমানেরা যদি কিছু মন্দির ভেঙ্গেও থাকে তবে সেগুলোর কারণ অন্য কিছু। ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে, অন্যের ইবাদাতখানাগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।

এই প্রসংগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছেন, হিন্দুস্তানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলমানেরা মন্দির ও মূর্তি ভেঙ্গেছে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানের যে ইতিহাস আমাদের হাতে এসেছে, তা কোনো সত্যনিষ্ঠ ও সততার নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়নি। মুসলমানদের এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য পশ্চিমী ফেতনাবাজরা এই ইতিহাস লিখেছেন। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করেছে এবং মূর্তি ভেঙ্গেছে তাহলে আমার জবাব এই হবে যে, ইসলামে অন্য ধর্মের মন্দির ভাঙ্গার অথবা মূর্তি ধ্বংস করার কোনো অনুমতি নেই। এ কাজের ভাগীদার সে মাহমুদ গজনবীই হোক অথবা তার সেনাপতিই হোক, তাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্র তো অমুসলমানদের ইবাদাতখানাগুলোর হিফাযতকারী।

মূর্তিগুলোর পূজা ভ্রান্ত। মানুষের মধ্যে এই ধারণা ইসলাম সৃষ্টি করে এবং এ ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করে। ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। ইসলাম এ ই ঘোষণা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে। সে চায় মানুষের অন্তরের জগত শিরক ও কুফর থেকে পাক ও পবিত্র হোক। তাদের মধ্যে সত্যের আলো ছড়িয়ে পড়ুক। এজন্য সে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যবস্থা করেছে ; জোর-জবরদস্তির পথ এর সম্পূর্ণ মেজাযের খেলাফ। নবী (সাঃ) কা'বাকে মূর্তি থেকে পবিত্র করেছেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু এখানে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, কা'বার মর্যাদা আল্লাহর ঘরের মর্যাদা। একে মূর্তিঘর তো লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বানিয়েছে। কা'বা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল। একথা আরবের মূর্তিপূজকেরাই স্বীকার করে। পরবর্তীকালে আল্লাহর ঘরে অনেক মূর্তিস্থাপন করা হয়। যা একেবারেই ভ্রান্ত। এই সমস্ত মূর্তিকেই নবী (সাঃ) কা'বা থেকে

www.pathagar.com

সরিয়ে ফেলেছিলেন। এবং তাকে পূর্বের ন্যায় নিরঙ্কুশ আল্লাহর ইবাদাত গৃহে পরিণত করেন। নবী (সাঃ) খৃস্টান ও ইহুদীদের ধর্মশালাগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এরূপ নযির পেশ করা সম্ভব নয়।

## ইসলামের প্রচার ও তরবারি

এটাও প্রশ্ন করা হয়, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও সুষমায় দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেনি।

এটা শুধু একটা দাবি মাত্র। এর কোনো প্রমাণ নেই। আল কুরআন তো জোর-জবরদস্তি করে কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকারীরা দুনিয়ার ইতিহাস বেমালুম ভুলে থাকে। তাদের মুখ খুলে কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে। যুক্তি বিহীন অপবাদ তালাশ করার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তারা। বিশ্বের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বুঝা যাবে যে, অনেক দেশ নিজস্ব পন্থা ও ধর্মকে শক্তির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। দূরে কেন যাব, বৌদ্ধধর্ম অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে হিন্দুস্তানে রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে। সেমিনর ধর্মেরও ইতিহাসে এ রকম একটা যুগ গেছে, যে সময় হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা সেমিনর ধর্মাবলম্বী ছিল এবং হিন্দুস্তানে এই ধর্মই ছেয়ে গিয়েছিল। এরপর বৈদিক ধর্ম (হিন্দু ধর্ম)-এর যুগ আসলো। এই ধর্ম রাষ্ট্রের সাহায্যে শক্তির জোরে অন্যান্য ধর্মের লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং এ পর্যায়ে মানুষকে শূলে পর্যন্ত চড়ানো হয়েছিল। এমনি ধরনের পন্থা গ্রহণ করে সারা হিন্দুস্তানকে একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এরপরও হিন্দুস্তানী রাজা-রাজন্যরা সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্যান্য দেশেও নিজ ধর্ম বিস্তার করেছিল। জাভা, সুমাত্রা, কম্বোডিয়ায় আজও হিন্দু ধর্মের ও মূর্তিপূজকের প্রভাব দেখা যায়। খৃস্ট ধর্মাবলম্বী রাজা-বাদশাহরা যখন অন্যান্য দেশে সামরিক অভিযান চালালো, তখন সেখানে তারাও খৃস্টধর্ম আরো অধিক বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছিল।

এখন যদি একথা প্রমাণ হয় যে, কিছু কিছু মুসলমান শাসক ইসলাম প্রচারে নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যবহার করে থাকে, তবে তা কোনো এমন দোষণীয় নয় যে, এর ভিত্তিতে ইসলামের বদনাম করার চেষ্টা করতে হবে।

আজ শিক্ষিত সমাজে বার বার এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে যে, ইসলাম নিজস্ব শক্তির জোরে নয় বরং তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই অভিযোগ উত্থাপনের মধ্যে এমন শক্তিধর ব্যক্তিও নযরে পড়ছে, যারা বন্দুকের নল দেখিয়ে নিজেদের নীতি ও আদর্শকে বিস্তার লাভ করানোর

www.pathagar.com

জন্য নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অথচ তাদের দৃষ্টি একবারও নিজেদের দিকে পড়ছে না।

আজকের যুগে ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তির কোনো প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার উপর ঠিক থেকে অন্যের কাছে এটা পৌঁছানোর অধিকার প্রত্যেকের আছে। আজকেও ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা মোটেও কম নয়। তবে এটা কোন্ তলোয়ারের জোরে ? সেটা কোনো লোহার তলোয়ার নয়। ইসলামের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের মহান আদর্শই দুনিয়ার সচেতন মানুষকে এর প্রতি প্রবল বেগে আকৃষ্টি করেছে।–[পৃষ্ঠা ঃ ৬৬-৭২]

"ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা" গ্রন্থে কুরআন-হাদীস রিসার্চ সেন্টার অমুসলিমদের অধিকার নিয়ে গবেষণা করেছে। তারা অতীত ইতিহাস থেকে মুসলিম শাসকদের উদার নৈতিক নীতির উল্লেখ করেছে।

## অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি—মানুষ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে অথবা যে কোনো আকীদাভুক্ত হতে পারবে। অনুরূপভাবে সে কোনো ধর্ম বা আকীদা গ্রহণ না করেও থাকতে পারবে। অর্থাৎ কোনো ধর্ম বা আকীদা অবলম্বন করায় বা না করায় তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এতে তাকে কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারবে না। তবে তাকে বেহেশতের সওয়াবের আশা ও দোজখের ভয় দেখিয়ে এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা ইসলামের দিকে আহ্বান করা যাবে।

ইসলাম একদিকে যেমন মানুষকে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছে অপরদিকে তাকে যে কোনো মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকারও অধিকার দিয়েছে। কিন্তু জোরপূর্বক কাউকেও ধর্মে প্রবেশ করানো হারাম করেছে। অনুরূপভাবে কারো ধর্ম ও আকাদী নিয়ে অন্যকে ঠাট্টা-তামাশা করা এমনকি এর ক্ষতি সাধন হতেও প্রতিরোধের অধিকার দিয়েছে। কেননা ধর্ম ও আকীদা মানুষের নিকট তার জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান। আর এর মধ্যেই তার ইহ-পরকালের সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে।

তাওহীদ হলো আল্লাহর ধর্ম। এতে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে বলা হয়েছে। আর বাতিল মাবুদদের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে,

www.pathagar.com

যা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য মানব সন্তানরা প্রতিষ্ঠা করেছে। যা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো এক নায়কত্ব প্রচার করা এবং মানব জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা।

পক্ষান্তরে নাস্তিকতা ও মূর্তিপূজা অবাধ্য ও অত্যাচারীদের ধর্ম। যা দ্বারা ঐ অত্যাচারীরা মানুষকে তাদের ও তাদের মূর্তিদের পূজা-অর্চনা করতে বাধ্য করে। ফলে সাধারণ মানুষ ঐ অত্যাচারীদের ভৃত্যরূপে পরিগণিত হয় এবং তাদের এক নায়কত্বের পথ সুগম হয়। এজন্য বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ হলো স্বাধীনতা আর নাস্তিকতা হলো পরাধীনতার ধর্ম। মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য ধর্ম ফরয বা অবশ্য করণীয় করেছেন। এটা হচ্ছে তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। এমতাবস্থায় পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং সওয়াবের প্রতি আকাংখা সৃষ্টি করে তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। কেননা এটাও তাদের মুক্তির দাওয়াত। এ সুফল তারাই ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন ঃ "যে নেক কাজ করলো বস্তুত সে তার আত্মার কল্যাণার্থেই তা করলো। তার সুফলও তার আত্মার উপরই আপতিত হবে। আর যে মন্দ কাজ করলো, তার কুফলও তার আত্মার উপরই নিপতিত হবে।"

আরব পৌত্তলিকদের মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি চরম অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে জোর-জবরদস্তি কোনো পন্থাই অবলম্বন করেননি। কেননা তিনি তার নিজের ও অন্যান্যদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ নবীকে নির্দেশ করে বলেন ঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

"হে নবী! আপনি পৌত্তলিকদেরকে বলুন, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।"–[সূরা কাফিরুন ঃ ৬]

উক্ত আয়াতের শানেনুযূল বা অবতীর্ণ হবার কারণ হলো ঃ একদা কুরাইশ বংশীয় লোকেরা এসে মহানবী (সাঃ)-কে বললো, আপনি এক বছরকাল আমাদের মাবুদদের উপাসনা করুন, তাহলে আমরাও এক বছরকাল আপনার মাবুদের পূজা করবো। এতদশ্রবণে আল্লাহর নবী ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তৎপর উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বহু আয়াত আছে। পাঠক সমীপে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো ঃ

প্রথম আয়াত ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

www.pathagar.com

"আল্লাহ বলেন, ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করা চলবে না। কেননা অসৎপথ থেকে সৎপথ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"–[সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬]

উল্লিখিত আয়াতের শান-ই-নজুল দেখলেই এটা সহজে বোধগম্য হবে যে, ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ করা চলবে না। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হলো ঃ মদীনার আনসারগণের মধ্যে এক ব্যক্তির দুই পুত্র মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পুত্রদ্বয় মদীনায় আগমন করলে তখন তাদের পিতা তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করাতে চাইলে তারা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় আয়াত ঃ

আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে বলেন, হে নবী! আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকল লোকই ঈমান আনয়ন করতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয় যে, সকলে ঈমান আনয়ন করুক (এর মধ্যে বিশেষ হিকমত ও গূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে)। তবে কি হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন ? প্রকৃতপক্ষে আপনি কাউকেও জোরপূর্বক মুমিন করতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতে শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে ঈমানে প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই।

তৃতীয় আয়াত ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ج اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ج

"আল্লাহ তার নবীকে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী! আপনি বলুন, সৎপথ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা সে কুফরী করতে পারে। আমি অত্যাচারীদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত রেখেছি।"–[সূরা আল কাহফ ঃ ২৯]

উপরোক্ত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈমান আনয়ন বা কুফরী করা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য মানুষের এ ইচ্ছা আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ সকল বিষয় বা বস্তু সৃষ্টিকারী। মানুষ তার কতৃকর্মের দরুনই পাপ পুণ্যের অধিকারী হবে। তার কাজ কল্যাণময় হলে সে পুণ্যের অধিকারী হবে আর পংকিলময় হলে শাস্তিভোগ করবে।

www.pathagar.com

কেউ প্রশ্ন করবে যে দুনিয়াতে কাফের বা আল্লাহতে অবিশ্বাসী হলে যদি পরকালে আযাব বা শাস্তি ভোগ করতে হয় তবে এটা কোন্ ধরনের স্বাধীনতা ? কেননা এতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের জন্য মানুষদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধর্মাবলম্বনের ব্যাপারে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে।

উত্তরে বলা যায় যে, দুনিয়াতে কুফরী করলে পরকালে শাস্তি ভোগ করার ভীতি প্রদর্শন মানুষের অন্তরে দূরদৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনার রেখাপাত করে। এটা জোর-জবরদস্তির মধ্যে শামিল নয়। আর এ দূরদৃষ্টি মানুষকে ফলাফলে পৌছালে সে ইচ্ছাকৃত ঈমান আনবে এবং আযাব থেকে মুক্তি পাবে। আবার কখনও তার চিন্তাশক্তি তাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌছাবে না। ফলতঃ সে কুফরীর উপর অটল থেকে যাবে এবং পরকালে পরিত্রাণ পাবে না।

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ও পর্বসমূহ পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমনভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি পালনের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছে। অবশ্য এটা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গণ্ডি সীমার মধ্যে হতে হবে। এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলমানদের সকল প্রকার লেনদেন ও কাজ-কারবারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের জিম্মাদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণের সনদই তাদেরকে তাদের আকীদার উপর ছেড়ে দেয়ার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং তাদের কোনো আকীদা পালনে বাঁধা দেয়া যাবে না।

মহানবী (সাঃ) ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে তাদের উপাসনালয়সমূহে তাদের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদি পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন।

অমুসলিমদের উপর ইসলামের বদান্যতার উদাহরণ এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে যে, যদি কোনো মুসলমানদের স্ত্রী খৃস্টান বা ইহুদী হয়, তবে মুসলমান স্বামী ঐ স্ত্রীকে তাদের গীর্জায় যেতে নিষেধ করতে পারবে না। বরং বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে তার নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে।

এছাড়া মুসলমানদেরকে খৃস্টান ও ইহুদীদেরকে শূকর বধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও তাদের মদের পাত্রও ঢেলে ফেলতে বারণ করা হয়েছে। কেননা তারা শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানে অভ্যস্ত। অনুরূপভাবে ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ক্রিয়া-কর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন তাদের বৈবাহিক বন্ধন, তালাক, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও মতবাদ অন্যান্যদেরকেও মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রতিফলন দেখা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে অমুসলিমরা সুন্দরভাবে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। মুসলিম বিশ্ব ছাড়া অন্য কোথাও অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়নি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মুসলমানগণ যখনই কোনো দেশ জয় করতেন, তখন অমুসলিমদের তাদের ধর্মে থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিতেন। মুসলমানগণ অমুসলিম বিজয়ীদের ন্যায় পরাজিতদের জোরপূর্বক তাদের ধর্মে আনবার চেষ্টা কখনো করেনি। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানে সর্বদাই অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। অবশ্য মুসলমানগণ আটশ' বছর হিন্দুস্থান শাসন করেছেন।

পক্ষান্তরে স্পেনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ লাখ। কিন্তু অমুসলমানদের হাতে স্পেনের শাসনভার চলে যাওয়ার পর এখন সেখানে মুসলমান নেই বললেই চলে। তখনকার দিনে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিনায়ক প্রথম সুলতান সলিম খৃস্টানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেন। তখন মুসলিম পণ্ডিতরা এর ঘোর বিরোধীতা করলেন যে, ইসলামী শরীয়তে এটা অবৈধ। অতঃপর সুলতান সলিম তার অভিপ্রায় হতে পিছু হটলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত দেশসমূহের অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির চুক্তিনামা পড়লেই সহজে মুসলমানদের বদান্যতা ও পর ধর্ম সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের এ বদান্যতা ও সহনশীলতার দ্বারাই ইসলামের এত বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে।

## মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ধর্ম গ্রহণ বা না গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকলে মুরতাদের কঠিন শাস্তি হয় কেন ? আর যদি মুরতাদের কঠিন শাস্তি ইসলামে বৈধ হয়ে থাকে তবে ইসলামে স্বাধীনতা রইলো কোথায় ?

উত্তরে বলা যাবে, ইসলামে মানুষের কোনো ধর্ম বা আকীদা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। জোরপূর্বক কোনো মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করানো যাবে না। তবে মুসলমান ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডিসীমায় থাকতে হবে ও এর আইন-কানুন মেনে চলতে হবে।

দুনিয়াতে দেখা যায় যে, মানুষের মনগড়া ও নব আবিষ্কৃত আইন বা ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে ঐ আইন বা ধর্মের আওতায় ও এর গণ্ডিসীমার মধ্যে থাকতে হয়। এবং তার রীতি-নীতির বশ্যতা স্বীকার করতে হয়।



www.pathagar.com

পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং মুসলমান ব্যক্তিকে ইসলামের সকল প্রকার আইন-কানুন মেনে নিতে হবেই। এর আকীদা ও মূল বিশ্বাস কোনোটাই অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং মুরতাদের কঠিন শাস্তি হবে। কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরতাদ হওয়া ভয়াবহ পাপের সমতূল্য। আর এর শাস্তি হলো কতল বা শিরোচ্ছেদ।

অবশ্য মুরতাদকে তাওবার প্রস্তাব দেয়া হবে, তাওবা না করলে শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

## অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক

দীন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আচার-আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও আদর্শকে সংক্ষেপে বলতে হলে কুরআন মজীদের দুটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট। এ আয়াত দুটি এ পর্যায়ে ব্যাপক সংবিধান হওয়ার উপযুক্ত। তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভাল ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ তো সুবিচারাকারীদের পসন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুত্ব করবে না তাদের সাথে, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে, তারাই জালেম।"–[সূরা মুমতাহানা ঃ ৮-৯]

যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বা কোনোরূপ শত্রুতা নেই, যারা দীনের ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের প্রতি শুধু সুবিচার ও

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা গ্রহণেরই উৎসাহ দেয়া হয়নি ; বরং তাদের প্রতি ভাল ও শুভ আচরণ করা ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কথা হলো ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণকারীদের ভালবাসেন।' আর ঈমানদার লোক মাত্রই সবসময় সে কাজ করতে অধিক ভালবাসে, তৎপর হয়, যা আল্লাহ পসন্দ করেন—ভালবাসেন একথা সর্বজনবিদিত।

'আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করছেন না' কথায় ভাল আচরণ গ্রহণ ইপ্সিত হওয়াটার বিপরীত কিছু বোঝায় না। কথা বলার এই ধরনটি গ্রহণ করা হয়েছে এজন্যে যে, মুসলমানরা হয়ত মনে করতে পারেন যে, দীনের বিরুদ্ধপন্থীরা বুঝি ভাল আচরণ ও ন্যায়পরায়ণতা পাওয়ার অধিকারী নয়। এই ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলা হলো যে, আল্লাহ বিরোধীদের সাথে ভাল আচরণ গ্রহণ, বন্ধুত্বতা ও সুবিচার করা থেকে বিরত রাখেন না—তা করতে নিষেধ করছেন না। তিনি শুধু সেসব লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন গ্রহণ করছে।

## আহ্‌লি কিতাবের প্রতি বিশেষ সুবিধা দান

ইসলাম যখন দীন ইসলামের বিরোধীদের সাথেই সর্বোচ্চ মানের ভাল ব্যবহার ও ন্যায়পরায়ণতা গ্রহণ থেকে নিষেধ করে না, মূর্তি পূজারী মুশরিক হলেও নয়—যেমন প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, যা আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, তখন আহলে কিতাব ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি যে ইসলাম বিশেষ সুবিধাদি দান করবে—তারা ইসলামী দেশের অধিবাসী হোক কি তার বাইরে—তা তো অতি স্বাভাবিক।

কুরআন মজীদে এই ইহুদী খৃস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছে 'আহলে কিতাব'—সেই লোক যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে বলে। এ থেকে বুঝাতে চেয়েছে যে, আসলে এরা আল্লাহর নাযিল করা দীনের ধারক লোক। অতএব মুসলমান ও তাদের মাঝে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যে মৌল দীন ও বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আসলে তা এক ও অভিন্ন। একটি আয়াত উল্লেখ্য ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের জন্যে সেই দীনই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করে পাঠিয়েছি, আর তার পথনির্দেশ করেছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা সকলে এই দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।"–[সূরা আশ শুরা ঃ ১৩]

মুসলমানদের তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাযিল করা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্যে। তাই সব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ মুসলমানের কর্তব্য। এছাড়া তাদের ঈমান সত্য ও যথার্থই হতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

"তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতি—আমরা তাদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করি না, আমরা তো সেই এক আল্লাহরই অনুগত।"

–[সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৬]

আহলে কিতাবের লোকেরা যখন কুরআন পাঠ করে তখন তারা দেখতে পায়, কুরআনে তাদের ধর্ম গ্রন্থের ও নবী-রাসূলগণের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। অতএব মুসলমানরা যখন আহলে কিতাবের লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হবে, তখন অবশ্যই এমন সব কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে যা পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

"আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না—তবে উত্তম পন্থায়, তাদের ছাড়া, যারা ওদের মধ্যে জালেম। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেই জিনিসের

www.pathagar.com

উপরও যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ এক ও অভিন্ন। আর আমরা তাঁরই অনুগত-আত্মসমর্পিত।"

–[সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬]

আহলে কিতাবের সাথে পানাহার করা ও তাদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া এবং তাদের মেয়ে বিয়ে করা—যদিও বিয়েটা পরম প্রীতি ও ভালবাসার লীলা কেন্দ্র জায়েয করে দিয়ে ইসলাম উদার নীতি অবলম্বন করেছে। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ্য ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ-

"আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খাবারও হালাল তাদের জন্যে। আর সুরক্ষিতা পবিত্রা নারী মুসলমানদের ও তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের—তাও হালাল।"

–[সূরা আল মায়েদা ঃ ৫]

আহলি কিতাবের ব্যাপারে এ হচ্ছে ইসলামের সাধারণ নীতি। তবে খৃস্টানদের প্রতি একটা বিশেষ ধরনের নীতি অবলম্বিত হয়েছে। কুরআন তো তাদের সম্পর্কে বলেছে, তারা মুসলমানদের দিলের নিবিড় নৈকট্যে অবস্থিত। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ ○

"তোমরা ঈমানদার লোকদের বন্ধুত্বে নিকটবর্তী পাবে সেই লোকদের, যারা বলেছে ঃ আমরা নাসারা-খৃস্টান। তা এজন্যে যে, তাদের মধ্যে বহু পণ্ডিত বিজ্ঞজন রয়েছে, আর তারা অহংকার করে না।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮২

## আহলি কিতাব নারীদের সাথে বিবাহ

কুরআন মজীদ ইহুদী ও খৃস্টান এই দুই আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের দিয়েছে। তাদের সাথে বিশেষ

www.pathagar.com

আচরণ গ্রহণ করারও নির্দেশ রয়েছে। তারা যদিও নিজেদের দীনের অনেক কিছুই রদ-বদল করে ফেলেছে, তবুও তারা যে আসমানী দীনের অনুসারী তা অবশ্যই মানতে হবে। তাই তাদের যবাই করা জন্তু খাওয়া যেমন মুবাহ করেছে তেমনি তাদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط

"আহলি কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খাদ্য তাদের জন্যে হালাল। আর পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সম্পন্ন মুমিন স্ত্রীলোক এবং তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সম্পন্ন স্ত্রী লোকও যদি তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দাও, পবিত্রতা রক্ষাকারী হিসেবে, যেনাকার হিসেবে নয় বরং বন্ধুত্বতার সূত্র গ্রহণকারী হিসেবেও নয়।"–[সূরা আল মায়েদা ঃ ৫]

এটা ইসলামের উদার নীতিসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ দিক। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও ধর্মসমূহে এর দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। এসব আহলি কিতাবকে কুফর ও গোমরাহ বলা সত্ত্বেও এসব ধর্মাবলম্বী নারী নিজ নিজ ধর্মে অবিচল থেকেও মুসলমানের স্ত্রী ও তার ঘরের রাণী হতে পারে বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। তারা হতে পারে মুসলিম ব্যক্তির মনের সান্ত্বনা, তার গোপনীয়তার সাক্ষী এবং তার সন্তানের মা।

## সতর্কতা

এ পর্যায়ে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া একান্তই অপরিহার্য। একজন দীনদার—দীনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আকর্ষণ সম্পন্ন মুসলিম মহিলা কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক মুসলিম মহিলার তুলনায় অনেক উত্তম। রাসূলে করীম (সাঃ) আমাদের একথা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"দীনদার নারীকে বিয়ে করো, সেই তোমার সাফল্যের কারণ হবে। (তা না করা হলে) তোমাদের হাত মাটি মিশ্রিত হোক।"

www.pathagar.com

এ থেকে জানা গেল যে, যে কোনো আহলি কিতাব নারীর তুলনায় যে কোনো মুসলিম নারী মুসলিম পুরুষের জন্যে স্ত্রীরূপে উত্তম হতে পারে।

তাছাড়া এ ধরনের স্ত্রী গ্রহণ করা হলে তার সন্তানের উপর তার আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাব পড়বে এবং তাদেরও বিভ্রান্ত করবে, এ আশংকা যখন তীব্র ও নিশ্চিত তখন দীন রক্ষার উদ্দেশ্যেই এসব আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়া ও এ ধরনের স্ত্রী গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়।

## যিম্মী

উপরে যেসব উপদেশ উদ্ধৃত হয়েছে, তা সকল আহলি কিতাবকেই শামিল করে নেয়। তারা যেখানেই বসবাস করুক, কারো ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নেই। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্যে ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুসলিম পরিভাষায় তাদের বলা হয় 'যিম্মী'। 'যিম্মী' শব্দের অর্থ 'চুক্তি'-ওয়াদা। এ শব্দটি জানিয়ে দেয় যে, এদের জন্যে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের একটা ওয়াদা রয়েছে। মুসলিম জামায়াত সে ওয়াদা পালনে বাধ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবে।

আধুনিক ব্যাখ্যায় এরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী-নাগরিক। প্রথম দিন থেকেই মুসলিম সমাজ এ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্যে যে অধিকার, অমুসলিমদের জন্যেও সেই অধিকার। তাদের যা দায়-দায়িত্ব এদেরও দায়-দায়িত্ব তা-ই। তবে শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও দীন সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে কোনো মিল বা সামঞ্জস্য নেই। কেননা ইসলাম তাদেরকে তাদের দীন ধর্মের উপর বহাল থাকার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

যিম্মীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) খুব কড়া ভাষায় মুসলমানদের নসীহত করেছেন এবং সেই নসীহতের বিরোধিতা বা লংঘন হলে আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত বলে জানিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"যে লোক কোনো যিম্মীকে কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল, সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল।"

www.pathagar.com

"যে লোক কোনো যিম্মীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলায় লড়বো।"-(আবু দাউদ)

"যে লোক কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপর জুলুম করবে কিংবা তার হক নষ্ট করবে অথবা শক্তি-সামর্থের অধিক বোঝা তার উপর চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া তার কোনো জিনিস নিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো।"

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর খলীফাগণ এসব অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষায় সবসময় সচেতন-সতর্ক থাকতেন। ইসলামের ফিকাহবিদগণ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এসব অধিকার ও মর্যাদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মালিকী মাযহাবের ফিকাহবিদ শিহাবুদ্দীন আল কিরাফী বলেছেন ঃ

যিম্মীদের সাথে কৃত চুক্তি আমাদের উপর তাদের কতিপয় অধিকার ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে আমাদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার অধীন এসে গেছে। আল্লাহ, রাসূল ও দীন ইসলাম তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। কাজেই যে লোক তাদের উপর কোনো রকমের বাড়াবাড়ি করবে সামান্য মাত্রায় হলেও তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দীন ইসলামের দেয়া নিরাপত্তা বিনষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের খারাপ কথা বলা, তাদের মধ্য থেকে কারো গীবত করা বা তাদের কোনো রূপ কষ্ট-জ্বালা দেয়া অথবা এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি সব এ নিরাপত্তা বিনষ্টের দিক।

যাহেরী মাযহাবের ফিকাহবিদ ইবনে হাজম বলেছেন ঃ

যেসব লোক যিম্মী, তাদের উপর যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদের পক্ষ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হওয়া ও তাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাহলেই আমরা আল্লাহ ও রাসূলের নিরাপত্তা দেয়া লোকদের সংরক্ষণ করতে পারবো। কেননা এ রূপ অবস্থায় তাদের অসহায় ও সহজ শিকার হতে দেয়া নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব পালনের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকারক হবে।

### অমুসলিমের কাছে সাহায্য চাওয়া

মুসলিম অমুসলিমের কাছে দীনী ব্যাপারাদি ছাড়া চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে সাহায্য চাইতে পারে, তাতে কোনো দোষ

www.pathagar.com

নেই। শাসন কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই এ অনুমতি রয়েছে। তবে একথা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ যেমন এসব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের স্বনির্ভরতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা একান্তই কর্তব্য।

নবী করীম (সাঃ) নিজে অমুসলিমের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে মজুরীর বিনিময়ে সাহায্য নিয়েছেন, কাজ করিয়েছেন। হিজরত করার সময় পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরীকতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আলেমগণ বলেন ঃ কেউ কাফের হলে যে কোনো বিষয়েই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কথা জরুরী নয়। মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার মতো কাজে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্যে একজন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করায় এ পর্যায়ের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহজেই দূর হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানের নেতার পক্ষে অমুসলিমের কাছে সাহায্য চাওয়া—বিশেষ করে আহলি কিতাবের লোকদের কাছে—সম্পূর্ণ জায়েয বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধে এদের শরীক করা ও বিজয় লাভ হলে মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গণীমতের অংশ দেয়ায়ও নাজায়েয কিছুই নেই। জুহরী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সাঃ) যুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য নিয়েছেন ও মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গণীমতের মাল দিয়েছেন। হুনাইন যুদ্ধে ছওয়ান ইবনে উমাইয়া মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

তবে শর্ত এই যে, যে অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, মুসলমানদের ব্যাপারে তার ভাল মত ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। যদি তাদের বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে অবশ্য সাহায্য গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা বিশ্বাস অযোগ্য মুসলমানের সাহায্য গ্রহণই যখন নিষিদ্ধ, তখন বিশ্বাস অযোগ্য কাফেরের সাহায্য গ্রহণের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

মুসলিম অমুসলিমকে হাদিয়া তোহফা দিতে পারে, তাঁর দেয়া হাদিয়া তোহফা গ্রহণও করতে পারে। নবী করীম (সাঃ) অমুসলিম রাজা-বাদশাহের দেয়া হাদিয়া-তোহফা কবুল করেছেন। এ পর্যায়ে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন ঃ

'আমি নাজ্জাশী বাদশাকে রেশমী চাদর ইত্যাদি তোহফা পাঠিয়েছিলাম।'

"বস্তুত ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দেয়, সম্মান করে। তাহলে আহলি কিতাব, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কোনো মানুষের সাথে অনুরূপ

www.pathagar.com

মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বিত হবে না কেন ?"–'ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা,' [পৃষ্ঠা-৫৪-৬৩]

**মদীনা সনদ**

রাষ্ট্রের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) মদীনার খৃস্টান, ইহুদী, পৌত্তলিক সম্প্রদায়, প্রস্তর পূজকদের নিয়ে একটি সনদ প্রস্তুত করেছিলেন। এটাই মদীনা সনদ নামে খ্যাত।

সনদটি নিম্নরূপ ঃ

১. মদীনার ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, মুসলমান সকলেই এক দেশবাসী।

২. সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিনানুমতিতে কারো সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না।

৪. নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর মীমাংসার উপর সকলেরই নির্ভর করতে হবে।

৫. বাইরের কোনো সম্প্রদায়ের সাথে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না।

৬. বাইরের শত্রুর দ্বারা মদীনা যেন আক্রান্ত না হয় সেদিকে সকলকেই লক্ষ রাখতে হবে।

৭. যদি কেউ মদীনা আক্রমণ করে সকলকেই মিলিতভাবে শত্রুকে বাধা দিতে হবে।

৮. যুদ্ধকালের ব্যয়ভার সকলকেই বহন করতে হবে।

৯. কেউ বিদ্রোহ করলে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

১০. এই সনদ যারা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত।–সিরাতুন নবী

**মদীনার ইহুদীদের ধর্মীয় অধিকার**

মদীনার ইহুদীরা সবসময় বিরোধীতা করতো তথাপি তাদেরকে ধর্ম পালনের অধিকার হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বঞ্চিত করেননি।–বালাজুরী ঃ ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-৭১

www.pathagar.com

**'ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই'**

বার বার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইহুদী বনী নযির গোষ্ঠীকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত করে দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণের যে সকল সন্তান ইহুদী ধর্মে ছিল, তাদের পিতামাতা জোর করে তাদের মুসলমান করতে চেয়েছিল। কিন্তু নবী করীম স. এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন–

"ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।"–আবু দাউদ শরীফ

একজন মুসলমানের দুই পুত্র খৃষ্টান ছিল। সে পুত্রদের বলপূর্বক মুসলমান করতে হযরত নবী করীম স.-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন—'ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।'–তাফসীরে ইবনে জরীর

**বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের সাথে ব্যবহার**

খায়বারের ইহুদীদের সাথে মদীনার বনী কাইনুকা ও বনী নযির গোত্রের ইহুদীরা সংঘবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করেছিল। ইসলামের চির শত্রু গাতফান গোত্রও তাদের সাথে মিলিত হয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমান নিধনে অগ্রসর হয়েছিল। মুসলিম সৈন্যের নিকট ইহুদীদের বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। নিরুপায় হয়ে ইহুদীরা হযরত নবী করীম স.-এর নিকট আত্মসমর্পণ করলো।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী বিধর্মী বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শত্রুকে একেবারে নির্মূল করা হলো না। জোর করে মুসলমান করা হলো না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তে ক্ষমা করলেন ঃ

১. ইহুদীরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না।
২. মুসলমানদের ন্যায় তাদেরকে যুদ্ধ করবার জন্য বাধ্য করা হবে না।
৩. তাদের ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদ পূর্ববৎ তাদেরই স্বত্বাধিকারে থাকবে।
৪. উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ রাজস্ব স্বরূপ মদীনায় পাঠাতে হবে।
৫. অন্য কোনো কর তাদেরকে দিতে হবে না।–(আল নাদির ঃ ৩৩৯)

**নাজরানের খৃস্টান**

নাজরানের খৃস্টানদের একটি ডিপোটেশন পাঠিয়েছিলেন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট। তিনি তাদের মেহমানদারী করেন এবং মসজিদে নববীর মধ্যে খৃস্টধর্মের প্রথা মত উপাসনা করতে দেন।

www.pathagar.com

উদারতা ও সহিষ্ণুতার নিদর্শন এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে ? নিউ টেস্টামেন্টে যীশুর এরূপ উদারতার কোনো সাক্ষ্য নেই।

**নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সনদ**

১. আল্লাহ তাআলার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ প্রতিজ্ঞা করছে যে, সর্ব প্রকার সম্ভবপর চেষ্টা দ্বারা তাদেরকে নিরাপদে রাখা হবে।
২. তাদের দেশ, জীবন ও ধন-সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখা হবে।
৩. তাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না।
৪. কোনো ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হবে না।
৫. কোনো সন্ন্যাসীর ধর্ম কার্যের ব্যাঘাত ঘটানো হবে না।
৬. তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করা হবে না।
৭. যে পর্যন্ত তারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে, সে পর্যন্ত এই সনদের শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকবে।–বালাজুরী, ফতহুল বুলদান, ৭১-পৃষ্ঠা।

**সৈন্য বাহিনীর প্রতি নবী (সাঃ)-এর নির্দেশ**

সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠাবার সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সৈন্যদের নির্দেশ দেন ঃ

১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, ২. ইহুদী, খৃষ্টানদের শিশু, মহিলা, ধর্মস্থানে বসবাসকারী লোকদের হত্যা করবে না, ৩. কোনো ফলবান বৃক্ষ বা দালান ধ্বংস করবে না।–(সিরাতুন নবী)

ইসলামের এইসব উদারতার তুলনা খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয় ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নির্দেশ**

খলীফা হযরত আবু বকর রা. সিরিয়ার প্রথম অভিযানের সময় সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন

ন্যায়পরায়ণতার সাথে চলবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছের কোনো ক্ষতি করবে না, খাদ্যের জন্য ছাড়া গৃহপালিত পশু বা উট হত্যা করবে না। যারা মঠ, মন্দির, গির্জাতে নির্জন জীবনযাপন করে তাদেরকে শান্তিতে ধর্মের কাজ করতে দিবে।

www.pathagar.com

### জেরুজালেম শহরের খৃষ্টান অধিবাসীদের প্রতি হযরত ওমর রা.-এর সনদ

এই সনদ আল্লাহ তাআলার গোলাম আমিরুল মুমেনীন জেরুজালেমের অধিবাসীদের দান করেছেন।

১. এই সনদ জেরুজালেমবাসীদের জীবন, সম্পত্তি, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ লোক এবং তাবৎ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য।

২. তাদের গির্জা কখনও দখল করা হবে না। সন্ন্যাসীদেরকে গির্জা থেকে বিতাড়িত করা হবে না। তৎসংক্রান্ত জমির উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৩. ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করা হবে না।

৪. জেরুজালেমবাসীদের মধ্য হতে যারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি সমেত গ্রীকদের সাথে চলে যেতে চায়, তাদের জীবন ও ভজনালয় এবং ক্রুশসমূহ রক্ষা করা হবে।

সনদের শর্তগুলো খলীফা এবং সমস্ত মুসলমান জাতি পালন করতে বাধ্য থাকবে।

হযরত ওমর (রাঃ) জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দেস) দখল করে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায়তঃ স্বার্থ ও ধর্মগত অধিকার পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে প্রত্যেকের সীমা নির্দেশ করে দেন। বিরোধী ধর্ম এবং বিজিত জাতির প্রতি এরূপ উদারতা ও সহিষ্ণুতা ইহুদী বা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

## মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের এবং খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার

### জেরুজালেমে দুটি ঐতিহাসিক দিন

জেরুজালেম নগরী। ১০৯৯ খৃস্টাব্দ। ১৫ জুলাই। বিকেল ৩টা। খৃষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিম নগরী জেরুজালেমের পতন ঘটল। খৃস্টান বাহিনী বন্যা স্রোতের মত প্রবেশ করলো নগরীতে। খৃষ্টান অধিনায়ক গডফ্রের নির্দেশে নরবলির মাধ্যমে বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা করা হলো। নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও ইহুদী নাগরিকদের নিধন যজ্ঞ চললো তিন দিন ধরে। বীভৎস সে দৃশ্য। কারো মাথা ছিঁড়ে ফেলা হলো, কারো

www.pathagar.com

হাত-পা কাটা হলো, কাউকেও তীর বিদ্ধ করে মারা হলো, কাউকে মারা হলো পুড়িয়ে। অনেক মুসলমান গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উমার মসজিদে, মসজিদের ভেতরেই তাদেরকে হত্যা করা হলো। ৩০০ মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আল আকসা মসজিদের ছাদে, তাদেরকেও রেহাই দেয়া হলো না। হত্যা করা হলো প্রত্যেককে। রাজপথ দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল সে রক্তে। তিন দিনের হত্যাকাণ্ডে জেরুজালেম নগরীতে ৭০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হলো।

## সেই জেরুজালেমে আর এক দৃশ্য

১১৮৭ খৃস্টাব্দ। ২রা অক্টোবর। ৮৮ বছর পর মুসলিম বাহিনী গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে বিজয়ী বেশে জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশ করলো। নগরীর আতংক উদ্বেগ, খৃষ্টান নাগরিকদের চোখে-মুখে মৃত্যুর ছাপ। কিন্তু শান্ত সুশৃংখলভাবে মুসলিম বাহিনী নগরে প্রবেশ করলো। সকলের আগে চলছেন গাজী সালাহউদ্দীন। মুখ তাঁর প্রশান্ত, চোখে কোনো উত্তাপ নেই। ৮৮ বছর আগে যারা জেরুজালেমকে কসাইখানায় পরিণত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণাও তাঁর চোখে মুখে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিজয়ের পর ক্রুসেডারদের মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে গাজী সালাহউদ্দীন অপরিসীম উদারতার পরিচয় দিলেন। প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ, নারীর জন্য পাঁচ ও শিশুর জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ নির্ধারিত হলেও নামমাত্র মুক্তিপণ গ্রহণ করে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিলেন। পরিশেষে দরিদ্র, বৃদ্ধ ও নারীদের তিনি বিনা পণে মুক্তি দিলেন। সহায় সম্বলহীন নারীদের তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থও দান করলেন।

## তাইবেরিয়াসে সালাহউদ্দীন

ক্রুসেডের ৯০ বছর পার হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে তৃতীয় ক্রুসেডারদের নতুন দল এসে ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ওদিকে সুলতান সালাউদ্দীন খণ্ড-বিখণ্ড মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তুলছেন।

১১৮২-৮৩ সন। মিসর সহ সমগ্র এশিয়া-মাইনর ও তুর্কী অঞ্চল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহউদ্দীনের পতাকাতলে আশ্রয় লাভ করলো। অতপর এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতান এবার মনোযোগ দিলেন ক্রুসেডারদের দিকে। সমগ্র ফিলিস্তিন তখনও তাদের করতলগত। ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটি শহরে হাজার হাজার মুসলিম বন্দী অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। প্রায় ৮৪ বছর ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের মিনার শীর্ষ থেকে

www.pathagar.com

মুয়াযযিনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়নি। জেরুসালেমের উমর মসজিদের অভ্যন্তরে খৃষ্টানরা যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, তার রক্তের দাগও হয়তো মুছে ফেলা হয়নি তখনও। সুলতান সালাহউদ্দীন অধীর হয়ে উঠেছেন। একদিকে তাঁর এই অধীর চিত্ততা, অন্যদিকে খৃষ্টান ক্রুসেডারদের অত্যাচারও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। শান্তির সময়েও মুসলিম বণিকদের কাফেলা বার বার লুণ্ঠিত ও মুসলিম বণিকরা নিহত হচ্ছিল তাদের হাতে। ১১৮৬ সনেও খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনাল্ড অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল সুলতান সালাহউদ্দীনের। ৯০ বছরে পুরাতন খৃষ্টান ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দীন জিহাদ ঘোষণা করলেন। সময়টা ছিল ১১৮৭ সনের মার্চ মাস। জিহাদ ঘোষণার পর সুলতান সালাহউদ্দীন আতারায় শিবির সন্নিবেশ করলেন। সালাহউদ্দীনের প্রাথমিক প্রধান লক্ষ ছিল ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস।

তাইবেরিয়াসের রাজা গেড়ি লূসিগনানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে, রিমণ্ড বিলিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত ক্রুসেড অধিনায়করা সালাহউদ্দীনের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের অধীনে ১২০০ নাইট সহ অর্ধ লক্ষ সৈন্য সমবেত হলো। সুলতান সালাহউদ্দীন ১২ হাজার ঘোড় সওয়ার ও অনুরূপ সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাইবেরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিত্তিনের দু মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া গ্রামের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে খৃষ্টান ও মুসলিম সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়াল। সুলতান সালাহউদ্দীন প্রথমবারের মতো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হলেন। লুবিয়া প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ক্রুসেডার সেই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়ক সহ স্বয়ং রাজা ও তাঁর ভাই বন্দী হলেন। যুদ্ধে ৩০ হাজার খৃষ্টান সৈন্য মৃত্যুবরণ করলো। ১১৮৭ সনের জুলাই মাসে সুলতান সালাহউদ্দীন তাইবেরিয়াস পুনরুদ্ধার করলেন। প্রথম জিহাদে জয়ী হয়ে সুলতান সালাহউদ্দীন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে আজ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা নেই। কিংবা নেই কোনো প্রতিহিংসার আগুন। ক্রুসেডাররা ১০৯৬ সনে তাদের প্রথম বড় রকমের সাফল্য অর্থাৎ এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা থেকে এ মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধ নয়, বরং জনৈক মুসলিম নামধারী বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর আত্মসমর্পণকারী দশ হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে তারা হত্যা করেছিল। আর সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর প্রথম জিহাদে সাফল্য লাভ করার পর কোনো খৃষ্টানের গায়ে আঁচড়ও লাগলো না।

www.pathagar.com

অগণিত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের নায়ক রেজিনাল্ডকেই শুধু তার দু'শ সাঙ্গ-পাঙ্গসহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীদ আমীরদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য নৃত্য করে বেড়িয়েছিল, সেখানে সুলতান সালাহউদ্দীন তাইবেরিয়াসের খৃষ্টান রাজাকে হাতে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে ঠাণ্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মহান শিক্ষা থেকে এ সহনশীলতার সম্ভব হয়েছিল।

ক্রুসেড ছিল খৃষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ। ৬৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে মুসলমানেরা একে একে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, স্পেন ও সিসিলিয় হতে খৃস্টান শাসন উচ্ছেদ করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খৃষ্টান শক্তি ও সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। পরমত সহিষ্ণু ও উদার ইসলামের নীতির প্রতি দিন দিন সকল শ্রেণীর খৃষ্টান আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হচ্ছিল। ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য খৃষ্টানদের পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য আহ্বান করলেন ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে। ইহা ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। তার ফলে সকল খৃষ্টানই এ যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১০৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১১২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খৃষ্টানেরা মুসলমানদের উপর বর্বরজনচিত নির্যাতন করেন। একর নামক স্থানের যুদ্ধে খৃষ্টান নরপতি রিচার্ড জয়লাভ করে মুসলমানদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন তা ঐতিহাসিক হিট্টির মন্তব্য থেকে তুলে দিচ্ছি—

When at the end of a month the money was not paid, Richard ordered the twenty seven hundred captives to be slaughtered-an act that stood in conpicuous contrast with Salah's treatment of prisoners at the capture of Jerusalem.

ইসলামের জ্যোতিতে আলোকিত সালাহউদ্দীন সম্বন্ধে লেনপোল লিখেছে–Secret of Saladin's power lay in the love of his subjects. When others sought to attain by severity, by majesty, he acomplished by kindness.

## মূর্তির নাকের বদলে মানুষের নাক

একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খৃষ্টান পল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কে একজন গত রাতে যীশু খ্রীষ্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খৃষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ধরে নিল তারা যে, এটা একজন মুসলমানেরই কাজ। খৃষ্টান নেতারা মুসলিম সেনাপতি আমরের কাছে এলো বিচার ও অন্যায় কাজের প্রতিশোধ দাবী করতে। আমর সব শুনলেন। শুনে অত্যন্ত দুঃখিত

www.pathagar.com

হলেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খৃষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তাদের সংকল্প প্রকাশ করে একজন খৃষ্টান নেতা বললো, "যীশু খৃষ্টকে আমরা আল্লাহর পুত্র বলে মনে করি। তাঁর প্রতিমূর্তির এরূপ অপমান হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অর্থ এর যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়। আমরা চাই আপনাদের নবী মুহাম্মদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তার অসম্মান করি।" একথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন আমর। ভীষণ ক্রোধে মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি খৃষ্টান বিশ্‌পকে লক্ষ করে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি। আমাদের যে কোনো একজনের নাক কেটে আমি আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।" খৃষ্টান নেতারাও সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। পরদিন খৃষ্টান ও মুসলমান বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর সবার সামনে হাজির হয়ে বিশ্‌পকে বললেন, "এ দেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাসিকা ছেদন করুন।

একথা বলেই তিনি বিশ্‌পকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খৃষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বললো, "আমিই দোষী —সিপাহসালারের কোনো অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছি, এই তা আমার হাতেই আছে!" সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশ্‌পের তরবারির নীচে নিজের নাসিকা পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশ্‌প। নির্বাক সকলে। বিশ্‌পের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্‌প বললেন, "ধন্য সেনাপতি, ধন্য এ বীর সৈনিক, আর ধন্য আপনাদের মুহাম্মদ যাঁর মহান আদর্শে আপনাদের মত মহৎ, উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি গড়ে উঠেছে। যীশু খৃষ্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান করা অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এ সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সেই মহান ও আদর্শ নবীকেও আমার সালাম জানাই।"

ইসলামের মহান নবীর আদর্শে গড়া মুসলমানের চরিত্র উজ্জ্বল করে রেখেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে।

www.pathagar.com

### আপনাদেরকে অধিক পসন্দ করি

মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দা যখন সিরিয়ার নগরের বাইরে শিবিরস্থাপন করেছিলেন, তখন উক্ত নগরের খৃষ্টান প্রধানগণ আরজ করলেন—হে মুসলিম অধিনায়ক! আপনাদেরকে আমরা অধিক পসন্দ করি ও বিশ্বাস করি। কারণ আপনারা শর্ত রক্ষা করেন, আপনারা অধিকতর দয়াশীল, আপনারা অবিচার করা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকেন। আপনারা সংযত, আপনারা লুঠ-তরাজ করেন না। আপনারা আমাদের স্বধর্মী বাইজেন্টাইন শাসকগণ থেকে অধিক উত্তম।

### ইমেসের মজলুম খৃষ্টান

ইয়ারমুকের বিখ্যাত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন ইমেস ত্যাগ করেন, তখন সেখানকার খৃষ্টান অধিবাসীগণ মুসলিম বাহিনীকে জানিয়েছিল যে, তারা স্বধর্মী খৃষ্টান শাসকদের অবিচার, অত্যাচার ও কুশাসনে অতিষ্ঠ। তারা মুসলিম শাসক ও সুবিচারকে অধিক পছন্দ করেন। ইসলামের শিক্ষার কারণে মুসলমানগণ এত সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন।

### স্পেনে যা ঘটেছিল

৭১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ইসলাম স্পেনে প্রবেশ লাভ করে। ধীরে ধীরে খৃষ্টানদের উপর ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ সময় স্পেনে রাষ্ট্রধর্ম ছিল ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম। এ সময় টলেডোর ৬ষ্ঠ কাউন্সিল আইন করেছিলেন যে, প্রত্যেক খৃষ্টান রাজাকে একটি শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, রাজ্যে ক্যাথলিক খৃষ্টান ছাড়া অন্য ধর্ম চালু থাকতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সম্মতি রক্ষা করে আদেশ লঙ্ঘনকারীর কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করবে। ক্যাথলিক ও এপজলিক চার্চ, ধর্ম প্রচারকারী এভেঞ্জেলিক সংঘ, পাদ্রীদের ব্যাখ্যা, হলি স্যাক্রামন্টের ডিক্রীকে কার্যকরী করার জন্য বাধ্য থাকবে। এক কথায় রাজাদের উপর ছিল ক্যাথলিক গির্জা।

ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক ইহুদীগণের উপর অসহ্য জুলুম করতো রাজার লোকেরা। স্পেনের নির্যাতিত দাস-দাসীগণ খৃষ্টান ধর্মের কিছুই জানতো না, বুঝতোও না। তারা ছিল রাজাদের নিগ্রহের ক্ষেত্র। ক্যাথলিক গির্জার হাতে নিদারুণভাবে পীড়িত হচ্ছিল সমাজের মধ্যবৃত্ত জনসাধারণ। পাদ্রীদের দুশ্চরিত্রতা ও অনুপযুক্ততার জন্য সর্বত্রই খৃষ্টানগণের একাংশ চরিত্রবত্তা ও উন্নত জীবনের আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। লুই দি পায়াসের রাজসভায় উকনবদুর মত বহু লোক খৃষ্টান সমাজের ঘৃণ্য জীবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। বদু ৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ঘৃণ্য জীবন পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করে উন্নত জীবনের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।-(আলভেরী কডিউ ভেনসিস ১৯শ খণ্ড)

এইরূপ সময় সাম্য ও মনুষ্যত্বের বাণীবাহক ইসলাম স্পেনের খৃষ্টান ইহুদীদের সান্ত্বনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদয় নতুন আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো। দলে দলে খৃষ্টান ও ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করছে দেখে সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা স্পেনে ইসলাম ধর্ম পালনকে নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু সে আদেশ কার্যকরী হয়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্পেনের ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। নব দীক্ষিত মুলমানগণ খৃষ্টানদের দ্বারা অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন। স্পেন-রাজ রডারিকের সময় খৃষ্টানদের অন্যায়-অত্যাচার, উৎপীড়নে অধিবাসীগণ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্পেনের আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলার দিনে জনসাধারণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে মূসা সেনাপতি তারেককে দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ স্পেনে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। গুয়াডিলা নদীর তীরে মেডিনা সিডোনিয়া নামক স্থানে স্পেন রাজা রডারিক এবং মুসলিম সেনাপতি তারেকের যুদ্ধ হয়। অত্যাচারী খৃষ্টানগণ পরাজিত হয় এবং তাদের রাজাও নিহত হন।

তারেকের সৈন্যগণ একে একে কডোভা, মালাগা, গ্রানাডা, এলভিরা ও টলেডো, অধিকার করে। টলেডোতে মূসা ও তারেক একত্রিত হয়ে উভয়ের সেনাদল একত্রিত করে তাঁরা আরাগণ, সারাগোসা, তারাগোনা, বারসেলোনা, লঙ্গেডক প্রদেশ এবং কতিপয় দ্বীপপুঞ্জ স্মেয়ারিক, মেজরকা, মহিনরকা, হকা, সিসিলি, সাহরাকিউস মুসলমানেরা অধিকার করে অসভ্য মানুষকে সভ্য করেন। সমগ্র স্পেন, পর্তুগাল, গ্যালিসিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্স জয় করে বীর মূসা পীরেনীজ পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হয়ে যখন সমগ্র ইউরোপ জয়ের পরিকল্পনা করছিলেন, তখন খলীফার ডাক এলো স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের। ইউরোপ অভিযানের এখানে যবনিকাপাত হয়।

আরবী প্রাচীন পুথিতে আছে—বীর সেনাপতি মূসা একটি স্তম্ভগাত্রে নিম্নলিখিত লাইনটি দেখতে পেয়ে অভিযান শেষ করেন—

'Sons of Ismil-Hither to and further Return!

মুসলমানদের উদার নীতির স্পেনে খৃষ্টানেরা শান্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করতেন। খৃষ্টানদের অপরাধের বিচার খৃষ্টানদের নিজস্ব কোর্টেই হতো। তাদের ধর্ম-কর্ম ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হতো না।

www.pathagar.com

খৃষ্টানদের মাস (Mass) উৎসবের কুরবানী, ঘণ্টা ধ্বনি প্রভৃতি ক্যাথলিক পদ্ধতি, ক্রিয়াকাণ্ডের কোনোটি নিষিদ্ধ করা হতো না। সেখানে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে দেওয়া হতো। গির্জার বক্তৃতা (Sermon) দেয়া চলতো। তাদেরকে নতুন গির্জাও স্থাপন করতে দেওয়া হতো।-(ইউলিজিয়াস)

সংসার বিরাগী ও বিরাগিনী খৃষ্টানদের জন্য স্পেনে যথেষ্ট সংখ্যায় ধর্মশালা মুসলিম শাসন আমলে বিদ্যমান ছিল। সংসার বিরাগী খৃষ্টানগণ তাদের পশমী পোশাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন। এমন কি সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও পোশাক নিষিদ্ধ ছিল না।-(বাওদিসিন)

মুসলিম সরকারের উদারনীতি এবং এই দুই জাতির সহাবস্থানের ফলে তারা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পৌঁছে ছিল। অথচ কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টানদের শাসন আমলে দুই জাতি বহু দূরে দূরে ছিল। মুসলিম শাসন আমলে খৃষ্টানেরা অনেকের ছেলের নাম মুসলমানদের অনুকরণে রাখতেন, খাতনা করাতেন। মুসলমানদের চিন্তাধারা খৃষ্টানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ফল স্বরূপ টলেডো বিশপ এলিপান্দুজ যীশু খৃষ্টকে খোদার হাতে পুত্রের মর্যাদা দিতে নারাজ হলেন। এটা হলো প্রচলিত খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহের ঘোষণা। তাঁর মতে যীশু খৃষ্টের প্রতি আরোপিত ঈশ্বরের পুত্রত্ব মানবীয় ধরনের জৈবিক নয় বরং পুত্রই প্রতিপালন বা আপদ-বিপদ থেকে রক্ষার দিক দিয়ে এ চিন্তাধারা নিসন্দেহে মুসলমানদের ধর্ম পুস্তক পাঠের ও তাদের সাথে সাহচর্যেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। এ ভাবধারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিশপ ফেলিকস ফ্রান্সে এ মত প্রচার করলেন। সম্রাট শার্লিমান খৃষ্টান কাউন্সিলের সভাপতিরূপে তাকে এ তথ্য প্রচার করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। দুর্বার গতিতে খৃষ্টানগণ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং খৃষ্টানেরা মুসলিম চিন্তাধারা অনুসরণ করতে লাগলো দেখে ৯৩৬ খৃষ্টাব্দে টলেডোতে অনুষ্ঠিত ক্যাথলিক কাউন্সিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, খৃষ্টান ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের মেলামেশা বন্ধ করে দিতে হবে।-(পিসিডি ও সুর্হৎগ্রাণ্ডি)

খৃষ্টান বা ইহুদীদের প্রতি অত্যাচারের কথা স্পেনীয় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নেই।

স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের পর স্পেনের ক্যাথলিক রাজার নির্দিশে 'জিসহট মিশনারীগণ' স্পেনের অবশিষ্ট মুসলমানদের জোর করে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতো। এ মুসলমান খৃষ্টানদের নামকরণ করা হয়েছিল 'মরিস্কাস'।

www.pathagar.com

১৬১০ খৃষ্টাব্দে মরিস্কাসদের স্পেন হতে বিতাড়ন আরম্ভ হয়। একদল মরিস্কাস মুসলমান শাসকদের পরধর্মমত সহিষ্ণুতার উল্লেখ করে খৃষ্টান শাসকদের মরিস্কাস বিতাড়ন আদেশের কঠোর সমালোচনা করে বলেন—

'মুসলমানেরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন কি তারা কখনও স্পেন থেকে খৃষ্টান ধর্মকে বা ধার্মিককে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন ? তাদের হাতে আমাদের পূর্ববর্তী খৃষ্টানগণ কি পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেননি ?'

স্পেনের মাটিতে গভীরভাবে প্রবিষ্ট ছিল ইসলামের শিকড়। ধর্মান্ধ খৃষ্টানগণ স্বমূলে তা উপড়িয়ে ফেলেছে । স্পেন থেকে মুসলিম নিধন পর্ব সমাপণের পর যে অবস্থায় মুসলমান মাটির গর্তে, পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোটরে অবশিষ্ট ছিল তারা উপায়ন্তর বিহীন হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মরিস্কাস উপাধিতে আখ্যায়িত হয়েছিল।

মুসলমানেরা মরিস্কাস খৃষ্টান হয়েও জগতে রেহাই পায়নি। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ভ্যালেনসিয়াব খৃষ্টানদের আর্ক বিশপ মরিস্কাসদের ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী সন্দেহ করে স্পেন থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেন—রাজা তৃতীয় ফিলিপের নিকট।

## যুদ্ধের ময়দানে অমুসলিম প্রতিপক্ষের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার

### উত্তোলিত তলোয়ার কোষবদ্ধ হলো

যুদ্ধের এক ময়দান। মুসলমানদের সাথে কাফেরদের ভীষণ যুদ্ধ চলছে। হযরত আলী (রাঃ) জনৈক বিপুল বলশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধে মত্ত রয়েছেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর তাকে কাবু করে ভূপাতিত করলেন এবং তাকে আঘাত হানার জন্য তাঁর জুলফিকার ঊর্ধ্বে উত্তোলন করলেন। কিন্তু আঘাত হানার আগেই ভূপাতিত শত্রুটি তাঁর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করলো। ক্রোধে হযরত আলীর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হলো, এই বুঝি তাঁর তরবারি শত্রুগুণ বেশী শক্তি নিয়ে শত্রুকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে। কিন্তু তা হলো না। যে তরবারিটি আঘাত হানার জন্য ঊর্ধে উত্তোলিত হয়েছিল এবং যা বিদ্যুৎ গতিতে শত্রুর দেহ লক্ষে ছুটে যাচ্ছিল, তা থেমে গেল। শুধু থেমে গেল না, ধীরে ধীরে তা নীচে নেমে এলো। পানি যেমন আগুনকে শীতল করে দেয়, তেমনি ভাবে আলী (রাঃ) ক্রোধে লাল হয়ে যাওয়া মুখমণ্ডলও শান্ত হয়ে পড়লো।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ)-এর এই আচরণে শত্রুটি বিস্ময় বিমূঢ়। যে তরবারি এসে তার দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলার কথা, তা আবার কোষবদ্ধ হলো কোন্ কারণে? বিস্ময়ের ঘোরে শত্রুর মুখ থেকে কিছুক্ষণ কথা সরল না। এমন ঘটনা সে দেখেনি, শোনেওনি কোনোদিন। ধীরে ধীরে শত্রুটি মুখ খুলল। বললো, "আমার মতো মহাশত্রুকে তরবারির নীচে পেয়েও তরবারি কোষবদ্ধ করলেন কেন?"

হযরত আলী রা. বললেন, "আমরা নিজের জন্য কিংবা নিজের কোনো খেয়াল খুশী চরিতার্থের জন্য যুদ্ধ করি না। আমরা আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করি। কিন্তু আপনি যখন আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন তখন প্রতিশোধ গ্রহণের ক্রোধ আমার কাছে বড় হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় আপনাকে হত্যা করলে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হতো না। বরং তা আমার প্রতিশোধ গ্রহণ হতো। আমি আমার জন্য হত্যা করতে চাইনি বলেই উত্তোলিত তরবারি ফিরিয়ে নিয়েছি। ব্যক্তি স্বার্থ এসে আমাকে জিহাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করুক, তা আমি চাই না।"

শত্রু বললো, "আমি দূর থেকে এতদিন আপনাদের উদারতা, মহানুভবতা ও সত্য নিষ্ঠার কথা শুনেছি, আজ তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।"

শত্রুটি ভূমি শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ইসলাম কবুল করলো। এমন অদম্য অতুল্য বীরের ক্ষুব্ধ হৃদয়েও এতবেশী ক্ষমা এবং স্বস্তি গুণ বিদ্যমান থাকে, এতবড় যোদ্ধা চরম মুহূর্তেও এমন ভীষণ শত্রুকে এতটুকু কর্তব্যবোধে ছেড়ে দিতে পারেন, এতবড় জিতেন্দ্রীয় এতবড় ক্ষমাশীলের ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি—একথা শত্রু অকুণ্ঠ চিত্তেই স্বীকার করে নিল।

## সুলতান সালাহউদ্দীন এবং এক শত্রু শিশু

মুসলিম এবং খৃষ্টান ক্রুসেডারদের মধ্যে আক্রায় তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল। এ সময় একদিন একজন খৃষ্টান মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে সুলতান সালাহউদ্দীনের তাঁবুর দিকে ধাবিত হলো। কিন্তু তাঁবুতে পৌঁছার আগেই প্রহরীরা তাকে থামিয়ে দিল। মহিলাটি প্রহরীর প্রতি করুণ আবেদন জানিয়ে বললো, 'আমাকে সুলতানের নিকট নিয়ে চলুন।' প্রহরী মহিলার আবেদনে নরম হয়ে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল।

ক্রন্দনরত মহিলাকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে। মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "আমার শিশু সন্তানকে মুসলিম সৈন্যরা ধরে

www.pathagar.com

এনেছে।" একথা শুনে সুলতান খুব ব্যথিত হলেন এবং শিশুটিকে খুঁজে এনে দেয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন। সহজে শিশুটি পাওয়া গেল। সন্তানকে ফেরত পেয়ে মা আনন্দিত হলো। প্রহরীরা তখন সন্তানসহ মহিলাকে খৃষ্টান তাঁবুতে পৌঁছে দিল।

## ঈসা খাঁ ও মানসিংহ

ঈশা খাঁকে দমন করার জন্য বাদশাহ আকবর মহারাজ মানসিংহকে বাংলায় পাঠালেন। ঈসা খাঁ খিজিরপুরে হেরে গিয়ে এগার সিন্ধু নামক স্থানে আশ্রয় নিলেন।

মানসিংহও সেখানে এসে হাজির হলেন। দু' দিন লড়াই হলো। প্রথম দিন মানসিংহের জামাই (মতান্তরে পুত্র) দুর্জ্জণ সিংহ মারা পড়লেন। পরদিন শুধু ঈসা খাঁ ও মানসিংহের মধ্যে যুদ্ধ হলো। ঠিক হলো, ঈসা খাঁ হারলে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করবেন, আর তিনি জয়ী হলে মানসিংহ বাংলা থেকে চলে যাবেন।

ভোর হতে দুপুর পর্যন্ত লড়াই হলো। দু দলের লোক দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখতে লাগলো। হঠাৎ ঈসা খাঁর তরবারির আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার দু' টুকরো হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হলেন। তাঁর সৈন্যদের হাহাকার উঠলো। পাঠান সৈন্যরা বিজয়-বাজনা বাজাতে লাগলো।

কিন্তু ঈসা খাঁ ছিলেন অতি মহৎ। তিনি নিজের তরবারিখানা মানসিংহের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নিরস্ত্র শত্রুকে কতল করা কাপুরুষের কাজ। আপনি এ তরবারিখানা নিন। পাঠান বিনা অস্ত্রেও লড়তে জানে।

তার মহত্ব দেখে মানসিংহ তো অবাক। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ঈশা খাঁর সাথে কোলাকুলি করে বলেন—"পাঠান রাজ তুমিই খাঁটি বীর। যুদ্ধে শত্রু হত্যা করতে অনেকেই জানে। কিন্তু অস্ত্রহীন শত্রুর হাতে নিজের তলোয়ার তুলে দিতে ক'জন পারে ? আর যুদ্ধের দরকার নেই, আমি তোমার মহত্বের কাছে হার মানলাম।"

## শত্রুকে নিজের তরবারি দান

চতুর্থ খলীফা বীরবর আলী (রাঃ)। বিস্ময়কর তাঁর শক্তি, সাহস ও ঔদার্য। এক যুদ্ধের ময়দানে বিপুল বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করছেন। একজন বলিষ্ঠ ও সাহসী সৈন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রচণ্ড বেগে তাঁকে আক্রমণ করলো। তুমুল যুদ্ধ চললো। অকস্মাৎ আলী রা.-এর আঘাতে শত্রুর তরবারি

www.pathagar.com

ভেঙ্গে গেল। শত্রুকে অসহায় দেখে আলী তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। শত্রু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আলীকে ক্ষান্ত হতে দেখে সে বিস্মিত হলো। সে আলীর কাছে আর একখানি তরবারি চাইতেই আলী তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনচিত্তে নিজের তরবারিখানা তাকে দিয়ে দিলেন। শত্রু অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। এভাবে আপনাকে অরক্ষিত করে যে বীর অন্যের প্রার্থনা পূর্ণ করে, তাঁর সাথে তো যুদ্ধ অসম্ভব। শত্রু জিজ্ঞেস করলো, "হে বীর শ্রেষ্ঠ আলী, আপনি কেন এভাবে নিজেকে বিপদের মুখে ফেলে আপনার তরবারি দান করলেন ?" আলী রা. উত্তর দিলেন, "কিন্তু আমি যে কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিনে।" শত্রু অম্লান বদনে আলী (রাঃ)-এর এ মহত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। সত্যের কাছে অসত্য এমনিভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে যুগে যুগে। সত্যের মহিমা মিথ্যার গর্বকে জয় করেছে।

সত্য-ন্যায়ের শক্তি পশুত্বকে জয় করেছে, অস্ত্রের চাকচিক্য, মৃত্যুর ভ্রুকুটিকে ম্লান করেছে—উপেক্ষা করেছেন।

## গাজী সালাহউদ্দীনের অপূর্ব আত্মত্যাগ

অজেয় মহাবীর গাজী সালাহউদ্দীন মানবতার মাধুর্য দিয়ে জয় করেছেন শত্রু মিত্র সকলকে। ইতিহাসের চেয়েও বড়ো সত্য তাঁর মানবতাময় মুজাহিদ জীবন যার সবটুকু ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ইসলামের সৌন্দর্যে আলোকিত।

সারা ইউরোপ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের প্রতাপে মুসলিম জাহান টালমাটাল। মক্কা মদীনা, আরবের মুসলমানরা বিপর্যস্ত।

মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার গাজী সালাহউদ্দীন তবু অকুতোভয়। সেই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। উপর্যুপরি সতের বার সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী পরাভূত হয়েছে।

তারপরও ইউরোপের রাজন্যবর্গ হাজার হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আসছে। তাদের শৌর্যবীর্য–শক্তি অসীম। আধুনিক সমরাস্ত্রে তারা সুসজ্জিত।

ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর অধিপতি গাজী সালাহউদ্দীন অবশেষে আহ্বান জানালেন—অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করো। লাখে লাখে লোক খুন করে কি লাভ।

অবশ্য তিনি জানালেন যদি সম্মানজনক সন্ধি না হয়, যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। মোকাবিলা করবেন দুশমনদের।

www.pathagar.com

সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি শুনে শুধু হেসেছেন। সিপাহসালার সালাহউদ্দীনের কথাকে তিনি দম্ভ বলে ভেবেছেন। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা— যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলবে। আমরা কাপুরুষের মতো হার মানবো না। ইসলামের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।

মহাবীর সালাহউদ্দীন মরিয়া হয়ে উঠেছেন, মুষ্টিমেয় মুজাহিদ দল নিয়ে বিরাট বাহিনীর সাথে লড়ছেন। ক্রমাগত পিছু হটছে দুশমন দুরাচার হানাদার। আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত। হঠাৎ খবর এলো খৃষ্টান নরপতি রিচার্ড গুরুতর অসুস্থ। মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

গাজী সালাহউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না। হেকিমের ছদ্মবেশে শত্রু শিবিরে হাজির হলেন। দিনের পর দিন খেদমত আর এলাজ করলেন। গোপনে স্বীয় সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ স্থগিত রাখতে। নিজের দেশে নিজের মাটিতে মুমূর্ষু শত্রুকে প্রাণে বধ করবেন না। পবিত্র ইসলামের বিধান তা নয়। ইসলাম বলে দুশমন যদি নিজের দেশে আসে, তাকে আপ্যায়ন করো। আপন আবাসে দুশমনের দেখা পেলে তাকে আপন করে নাও। আর দুশমন যদি বিপদাপন্ন হয় তাহলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা মুমিনের জন্য মুস্তাহাব।

খৃষ্টান নরপতি রিচার্ড সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চান। আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। হাসিমুখে অভিবাদন জানান। বলেন, হে বুজর্গ দরবেশ! আপনাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি? সমস্ত প্রশংসা আপনার প্রাপ্য। বলুন কি পুরস্কার পেলে আপনি খুশী হন?

মহামতি সালাহউদ্দীন বিদায় বেলায় জানালেন তিনি কিছুই চান না। সম্রাট সুস্থ হয়েছেন এতেই তিনি সুখী। এর চেয়ে বড়ো পাওনা তাঁর কাম্য নয়। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরেই নরপতি রিচার্ড জানতে পারলেন সব। এমাত্র যিনি চলে গেলেন তিনি অন্য কেউ নন। স্বয়ং সিপাহসালার সালাহউদ্দীন। যাঁর সেবা শুশ্রূষায় নিশ্চিত নব জীবন পেয়েছেন। বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাঁচার আশা ছিল না। সেনাবাহিনী ধরেই নিয়েছিল, তিনি মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যু ছিল এক রকম অবধারিত।

সব জেনে শুনেই গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। অক্লান্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর চিকিৎসা ও পরিচর্যা করেছেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে হেকিমের ছদ্মবেশ ধরেছেন। এমন ত্যাগের মহিমা কোথাও নেই।

www.pathagar.com

শেষে সম্রাট রিচার্ড ছুটে আসেন সিপাহসালার গাজী সালাহউদ্দীন সমীপে। সহাস্যে বলেন, আমি যার প্রাণ সংহার করতে চেয়েছি সে সশরীরে এসে ধরা দিয়েছে। তখন কিছুই টের পাইনি। এখন হাতে পেয়ে আর ছাড়ছি না। অতপর সম্রাট রিচার্ডের মুখে প্রশংসার ফুলঝুরি ফুটলো। খৃষ্টান নরপতি প্রশংসার পুলকে ফেটে পড়লেন।

গাজী সালাহউদ্দীন হাসতে হাসতে জবাব দেন—আল্লাহর দরবারে হাজার হাজার শোকর। আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

মুখোমুখি সেদিন দুই সৈনিক পুরুষ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দু'জনের হৃদয় জয়ের উল্লাসে ভরপুর। কাল যে ছিল পরম দুশমন, আজ সে সত্যিকারের দোস্ত।

সম্রাট রিচার্ড দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর সামনে তুলে ধরেছেন ইসলামের সৌন্দর্য। রিচার্ড মনে-প্রাণে মুগ্ধ। আর যুদ্ধ নয়, তিনি সৌহার্দ স্থাপন করবেন। মুসলিম জাহান তাঁকে মহান প্রেরণা দিয়েছে। ত্যাগের দীক্ষা দিয়েছে দীন-ইসলাম। ইসলামের অপার সৌন্দর্যেই তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন। সিপাহসালার সালাহউদ্দীনের সাথে দেখা না হলে তিনি কোনো কিছুই অবহিত হতেন না। এতোদিনে তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

## ইয়ারমুক যুদ্ধে জর্জার ইসলাম গ্রহণ

রোম রাজ্যে ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধের সময় সেনাপতি জর্জ সৈন্যদল হতে বহির্গত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ারমুক মাঠে উভয় পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল আদেশের অপেক্ষা ; এমন সময় রোম বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি অশ্ব ছুটিয়ে সৈন্য শ্রেণী থেকে বাইরে এলেন এবং মুসলিম সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদ রা.-কে আহ্বান করলেন। তৎকালীন যুদ্ধ প্রথা অনুযায়ী এ রকম আহ্বান মল্ল যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরা হতো। সুতরাং হযরত খালেদ (রাঃ) দ্রুত সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে জর্জার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। জর্জা হযরত খালেদের অতি নিকটে এসে বললেন, 'আমি আপনার সাথে যুদ্ধভিলাষী হয়ে আসিনি, কয়েকটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আশা করি আপনি প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে দ্বিধা করবেন না।' খালেদ বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করুন, যথাযথ উত্তর দিতে আমার কোনোই আপত্তি নেই।"

www.pathagar.com

জর্জা–আল্লাহ কি আপনাদের পয়গম্বরের উপর কোনো তরবারি অবতীর্ণ করেছেন ? আর সেই তরবারি কি আপনাকে অর্পণ করা হয়েছে ? আমার ধারণা এ রকম তরবারি দ্বারাই আপনি সর্বত্র জয়ী হয়েছেন।

খালেদ–আল্লাহ কোনো তরবারি নাযিল করেননি।

জর্জা–তবে আপনাকে "সাইফুল্লাহ" কেন বলা হয় ?

খালেদ–আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ রাসূলকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। প্রথমত আমরা সকলেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম, পরে কেউ কেউ তাঁকে মান্য করলো, আবার কেউ কেউ বৈরী ভাবেই বহাল রইলো। আমি বিরুদ্ধ দলেই ছিলাম কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের অন্তরে সত্যের আলো স্থাপিত করায় আমরা ঈমান আনলাম। আল্লাহর রাসূল স. আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এ উপাধি দান করেছেন এবং অজেয় হওয়ার জন্য দোআ করেছেন। সেদিন থেকেই আমি সাইফুল্লাহ নামে পরিচিত হয়েছি।

জর্জা–আপনার মুখে সত্য কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম। এখন বলুন, আপনারা আমাদেরকে কি কথার দিকে আহ্বান করছেন ?

খালেদ–আমরা একথার প্রতি আহ্বান করছি যে, আপনারা কালেমা শাহাদাত পড়ুন। আল্লাহর একত্ব ও শেষ নবীর প্রেরিতত্বে স্বীকারোক্তি করুন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক আনীত বিধি ব্যবস্থার অনুবর্তী হউন।

জর্জা–কেউ যদি এটা মানতে বাধ্য না হয় ?

খালেদ–তবে সে জিযিয়া ট্যাক্স প্রদানে আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নির্বিঘ্নে স্বধর্মে বহাল থাকতে পারে। এরূপ করলে আমরা আমাদের ধন-প্রাণের মত তার ধন-প্রাণেরও রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

জর্জা–ইহাও যদি মান্য না করে ?

খালেদ–তবে আমরা প্রথমে তাকে যুদ্ধের ঘোষণা জানাব এবং পরে তার সাথে যুদ্ধ করবো।

জর্জা–যদি কেউ আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হয় ?

খালেদ–এ রকম ব্যক্তি আমাদের ভাই এবং সমান। সাম্যবাদই ইসলামের লক্ষ্য ; এখানে ছোট বড়, আশরাফ-আতরাফে কোনোই ভেদাভেদ নেই।

জর্জা–একথা আমার নিকট খুবই অসম্ভব বলে অনুমিত হয় যে, নব দীক্ষিত ব্যক্তিও আপনাদের সম শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে। আপনারা বহু পূর্বে ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করতঃ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। অতএব, নবী দীক্ষিতেরা আপনাদের সমান কিরূপে হতে পারে ?

খালেদ–একথা সত্য যে, আমরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী হয়েছি ; কিন্তু আমরা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছি, তার সংস্রব লাভ করেছি, অলৌকিক ঘটনাবলী অবলোকন করেছি, এরূপাবস্থায় আমাদের ইসলাম গ্রহণ বিশেষ গৌরবের বিষয় নয়। কারণ, এই সমস্ত ঘটনা দেখা দ্বারা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা খুবই সহজ। আর এখন যারা কেবল যুক্তি-প্রমাণের ভিতর দিয়ে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি পরিচালনা করতঃ ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভের সমর্থ হয়, এক হিসাবে তাদের ফযীলতই বেশী।

জর্জা- আপনার সকল কথাই সত্য এবং যুক্তিপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে।

হযরত খালেদ রা.-এর পরিষ্কার অতিরঞ্জিত কথাবার্তায় জর্জার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হলো। তিনি হযরত খালেদ রা.-এর নিকট ইসলামে দীক্ষিত করার অনুরোধ করলেন। খালেদ রা. তাকে নিয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন, বিধিমত মুসলমান করলেন। যে অন্তর ক্ষণকাল পূর্বে বৈরীভাবে পরিপূর্ণ ছিল, পবিত্র কালেমার সংস্পর্শে এসে তাতেই আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিল। জর্জা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। কিছু সময় পূর্বে তিনি যাদের দলপতি ছিলেন, এক্ষণে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করতঃ শহীদ হলেন।

## পরাজিত দুশমনদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার

### কনস্টানটিনোপল যখন মুসলমানরা জয় করলো

তুরস্ক সবসময় মুসলমানদের অধিকারে ছিলো না। এক সময় তুরস্কের বুকে রাজত্ব করতো রোমানগণ। তখন তুরস্কের রাজধানী ছিল কনস্টানটিনোপল— যার বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল। এখানে বসেই রোমান সম্রাটগণ রাজ্যশাসন করতেন।

সুলতান মুহাম্মদ প্রথম রোমানদের হাত থেকে পরাধীন দেশকে মুক্ত করেন। দেশের আযাদী দুশমনের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য তিনি বহুদিন থেকেই লড়াই চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে বহু ত্যাগ, বহু খুন-খারাবীর পর স্বাধীন দেশের বুকে তিনি উড়িয়ে দিলেন হেলালী ঝাণ্ডা।

www.pathagar.com

এজন্যই তাঁকে বলা হয় সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ। ফাতেহ শব্দের অর্থ বিজয়ী। তিনিই তুরস্কের আযাদী সংগ্রামের প্রথম বিজয়ী সৈনিক।

সুলতান মুহাম্মদ বিজয়ীর বেশে যখন কনষ্টানটিনোপলে প্রবেশ করলেন, তখন প্রথমেই খোঁজ করলেন এর আগের রাজাকে। বহু খোঁজা খুঁজির পর তাঁর লাশ পাওয়া গেল। যুদ্ধে সুলতানের সিপাহীদের হাতে তিনি মারা গেছেন।

দুশমনের লাশ দেখে সুলতানের মনে কিন্তু একটুও ঘৃণা হলো না। এতো দীর্ঘদিন লড়াই করে তিনি জয়ী হয়েছেন, কতো মানুষের জীবন এজন্য দিতে হয়েছে। এতে দুশমনের লাশ দেখেও গোস্বা হওয়া উচিত। কিন্তু মহৎপ্রাণ সুলতান তাজীমের সাথে রাজার লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করলেন। অত্যন্ত দামী কাপড়ের কাফন পরানো হয়েছিল তাঁকে।

এ ব্যাপারে একদিন সুলতান বলেছিলেন—'রাজার সম্মান রাজার মতোই করতে হয়। তিনি সাহসী বীরযোদ্ধা ছিলেন, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। দেশ এখন আমাদের অধীন। সুতরাং তাঁকে রাজকীয় মর্যাদায় দাফন করা আমাদের কর্তব্য।'

এরপর সেই দুশমন রাজার মন্ত্রী এলেন সুলতানের সাথে দেখা করতে। তিনি অনেক ধন-সম্পদ ও দামী উপহার পেশ করলেন সুলতানের খেদমতে। এসব দেখে সুলতান হাসিমুখে বললেন—দেখুন, এসব ধন-দওলতের জন্য কিন্তু আমি লড়াই করিনি। দুশমনের হাত থেকে দেশের আযাদী ও ধর্ম রক্ষার জন্যই আমি লড়াই করেছি।

আরও অনেক কথাবার্তা হলো মন্ত্রীর সাথে। কথায় কথায় সুলতান জানতে পেলেন, মন্ত্রীর স্ত্রী কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। সুলতান তক্ষুণি মন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলেন তাঁর স্ত্রীকে দেখতে। সেখানে তিনি বহুক্ষণ ধরে মন্ত্রীর অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করলেন তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে শহরময় ঘোষণা করে দিলেন ঃ

'অমুসলমানদের কারো ভয়ের কোনো কারণ নেই। এখন থেকে তাঁরা শহরে আগের মতোই নিরাপদে বসবাস করবেন। আগের মতোই গীর্জায় যাবেন। নির্ভয়ে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবেন।'

পরাজিত দুশমনের প্রতি উদারতা দেখানোই তো ইসলামের শিক্ষা। সুলতান মুহাম্মদ ইসলামের সেই মহান শিক্ষাকে পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। আসলে সাচ্চা মুসলমানতো তারাই—যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মহান শিক্ষা অনুসরণ করে, আল্লাহ-রাসূলের পাবন্দী করে।

www.pathagar.com

## আরমেনিয়া প্রান্তরে আল্‌প আরসালান

১০৬৩ সন। সুলতান আল্‌প আরসালানের হাত থেকে আরমেনিয়া কেড়ে নেবার জন্য কনষ্টানটিনোপলের সম্রাট রোমানাস ছুটে এলেন। ফ্রান্স, ম্যাসিডনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সেনাদলও তাঁর সাহায্যে ছুটে এসেছেন। সুতলতান আরসালান ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ছুটে গেলেন সম্রাট রোমানাসকে বাধা দিতে। সুলতান আরসালান শান্তির প্রস্তাব দিলেন রোমানাসকে। সমুদ্র তরঙ্গমালার মত বিশাল বিক্ষুব্ধ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রোমানাস শান্তির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে সুলতান আরসালান রোমানাসের মুকাবিলার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনা সন্নিবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর কত মুসলিম ভাই যে এ যুদ্ধে প্রাণ দেবে, সেটা চিন্তা করে সুলতান আরসালানের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি উচ্চস্বরে গম্ভীর কণ্ঠে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে যদি কেউ চলে যেতে চাও, যেতে পার। কাউকেই আমি জোর করে যুদ্ধে যোগদান করতে প্ররোচিত করবো না।"

কিন্তু যে সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের জন্য এত দরদ পোষণ করেন সে সেনাপতিকে তাঁর সৈন্যরা মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যেতে পারে না। সুলতান আরসালানের ক্ষেত্রেও তাই হলো। সকলেই এক বাক্যে সুলতানের অনুগামী হতে চাইলো।

সুলতান গোসল করে শুভ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সৈন্য পরিচালনার জন্যে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। সংগীদের তিনি বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেখানে আমার মৃত্যু হবে, সেখানেই আমাকে যেন কবর দেয়া হয়।" বস্তুত শাহাদাতের দুর্লভ পিয়ালা পানের আশায় যুদ্ধে যাচ্ছেন সুলতান আরসালান। তাঁর প্রতিটি সৈন্যও এই মন্ত্রে দীক্ষিত।

যুদ্ধ শুরু হলো আরমেনিয়ার প্রান্তরে। রক্তের প্রবাহ ছুটছে যুদ্ধের গোটা ময়দানে। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী অকুতোভয়ে মুকাবিলা করে যাচ্ছে বিশাল-বিপুল শত্রু বাহিনীকে। এক সারি শহীদ হয়ে ঢলে পড়ছে মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি সামনে এগিয়ে সে স্থান পূরণ করছে। শত্রু নিধন করে শাহাদাতের পিয়ালা পানের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে তারা। দুঃখ নেই, কাতরোক্তি নেই। অশ্বের গতিবেগের সাথে সাথে তাদের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা উঠছে আর পড়ছে। অবশেষে বদর, খন্দক, ইয়ারমুক, আজনাদাইনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। দিনান্তে মাগরিবের সময় সমাবেশের শুভ মুহূর্তে আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার আকারে বিজয় নেমে এলো। জয়ী হলেন সুলতান আরসালান।

www.pathagar.com

যুদ্ধ শেষে বন্দী রোমানাসকে সুলতান আরসালানের সামনে নিয়ে আসা হলো। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জায়গায় আপনি হলে আমার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করতেন ? রোমানাস বললেন, নির্মম বেত্রাঘাতে আপনার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতাম।' সুলতান হাসলেন। বললেন, 'আপনার বাইবেল বলে—শত্রুকে ক্ষমা করো। আমি আপনার সে বাইবেলের উপদেশ অনুসারেই আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। যান আপনি মুক্ত।'

**কথার দাম**

খলীফা হযরত ওমর রা.-এর সময়ের একটি ঘটনা।

পারস্যের নিহাওয়ান্দ প্রদেশের শাসনকর্তা হরমুযান। পর পর অনেকগুলো যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াবার পর এবং অগণিত মুসলমানকে নিজ হাতে হত্যা করার পর তিনি অবশেষে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। হরমুযান ভাবলেন, খলীফা ওমর (রাঃ) নিশ্চয় তাঁর প্রাণ দণ্ডের হুকুম দেবেন, না হয় অন্তত তাঁকে গোলাম হিসাবে কোথাও বিক্রি করে ফেলবেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষ কর দেয়ার ওয়াদার বদলাতে হরমুযানকে ছেড়ে দিলেন।

হরমুযান নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে ওয়াদার কথা ভুলে গেলেন। অনেক টাকা-পয়সা ও বিরাট সৈন্য সমাবেশ নিয়ে তিনি আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। অবশেষে হরমুযান পরাজিত হয়ে আবার মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। তাঁকে হযরত ওমর রা.-এর দরবারে হাজির করা হলে খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ঃ আপনিই কি কুখ্যাত নিহাওয়ান্দ শাসনকর্তা হরমুযান ?

ঃ হাঁ খলীফা, আমিই নিহাওয়ান্দ-এর অধিপতি হরমুযান।

ঃ আপনিই বার বার আরবের মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং বার বার অন্যায় যুদ্ধের কারণ ঘটিয়েছেন ?

ঃ একথা সত্যি যে, আমি আপনার অধীনতা স্বীকার করতে রাযী হইনি, তাই বার বার আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

ঃ কিন্তু একথা কি মিথ্যা যে, আপনাকে পরাজিত ও বন্দী করার পরও আপনার প্রস্তাবানুসারে সোলেহ্নামার শর্ত মতে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বার বারই আপনি সোলেহ্নামার শর্ত ভঙ্গ করেছেন এবং অন্যায় যুদ্ধে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন ?

ঃ একথা মিথ্যা নয়।

ঃ আপনি কি জানেন আপনার কি সাজা হতে পারে ?

www.pathagar.com

ঃ জানি, আমার সাজা মৃত্যু এবং সে জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

ঃ এবং এই মুহূর্তেই ?

ঃ তাও বেশ জানি।

ঃ তাহলে আপনার যদি কোনো শেষ বাসনা থাকে তা প্রকাশ করতে পারেন।

ঃ খলীফা, মৃত্যুর আগে আমি শুধু এক বাটি পানি খাব।

খলীফার হুকুমে বাটিতে পানি এলো। হরমুযানের হাতে দেয়া হলে খলীফা বললেন ঃ

ঃ আপনি সাধ মিটিয়ে পানি খেয়ে নিন।

ঃ আমার শুধুই ভয় হয় পানি খাওয়ার সময়েই জল্লাদ না এক কোপে আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে।

ঃ না হরমুযান, আপনার কোনোই ভয় নেই। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই পানি খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আপনাকে কতল করবে না।

ঃ খলীফা, আপনি বলেছেন এই পানি পান করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমায় কতল করবে না। (বাটির পানি মাটিতে ফেলে দিয়ে) সত্যি এ পানি আর আমি খাচ্ছি না এবং তাই আপনার কথা মত কেউ-ই আমাকে আর কতল করতে পারে না।

চমৎকৃত হযরত ওমর (রাঃ) খানিক চুপ করে থেকে হেসে ফেললেন। বললেন ঃ

ঃ হরমুযান, আপনি সত্যিই একটি নয়া উপায় বের করেছেন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু ওমরও আপনাকে যে কথা দিয়েছে তার খেলাপ হবে না। আপনি আযাদ, আপনি নির্ভয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

হরমুযান চলে গেলেন। অল্পদিন পর বহুসংখ্যক লোক নিয়ে আবার এলেন। খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন,

ঃ আমিরুল মুমিনিন! হরমুযান আবার এসেছে। এবার সে এসেছে বিদ্রোহীর বেশে নয়, এক নব জীবনের সন্ধানে। আপনি তাকে তার অনুচরবর্গসহ ইসলামে দীক্ষিত করুন। হরমুযান আর বলতে পারলেন না। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

হযরত ওমর (রাঃ) দেখলেন, লৌহ মানব হরমুযানের দু চোখে পানিতে হলহল করছে। হরমুযানকে তিনি আলিংগন করলেন।

www.pathagar.com

# অমুসলিম যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার

## হাওয়াজিন গোত্রের কয়েদী

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে সর্বপ্রথম হাওয়াজিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করে। তখন তিনি 'জিরানা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট হাওয়াজিন প্রতিনিধি দল তাদের সম্পদ ও কয়েদীদেরকে ছাড়িয়ে নিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল। ঐ দলে খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুধ শরীক চাচাও ছিলেন। আর হযরত হালীমা সাদিয়া ছিলেন এ গোত্রেরই অন্যতম সদস্যা।

হাওয়াজিন গোত্রের যুহাইর ইবনে সুরাদ সাদী জু'শামী প্রমুখ নেতৃবর্গ রাসূলের দরবারে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বন্দীদের মধ্যে আপনার সেই খালা ও দুধ-শরীক ফুফুগণ রয়েছেন, যারা এক সময় আপনাকে কোলেপিঠে করে প্রতিপালন করেছেন। আমরা যদি হারিষ, গাস্‌সানী, নুমান ইবনে মুনযির প্রমুখ সরদারকে দুধ পান করাতাম, তবে এ বিপদের সময় আমরা অবশ্যই তাদের সদয় দৃষ্টি আশা করতাম, অথচ আপনি তো পৃথিবীর সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মানব (সুতরাং সঙ্গত কারণেই আজ আমরা আপনার নিকট অনেক কিছু আশা করি)।

প্রতিনিধিদলের উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে পিয়ারা নবী স. বললেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তোমরা না আসায় আমি সকল কয়েদী ও যাবতীয় সম্পদ গনীমত হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। এখন তোমরা দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পার। হয় তোমরা তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করো, নতুবা তোমাদের বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। তারা জবাব দিল, সম্পদের তুলনায় স্বজনরাই আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ স. তখন বললেন আমার এবং আমার গোত্র বনী আবদুল মুত্তালিবের অংশে যারা পড়েছে আমি তাদেরকে তোমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিলাম। কিন্তু অবশিষ্ট যারা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে তাদের জন্য আমি কেবলমাত্র সুপারিশ করতে পারি।

শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর সুপারিশক্রমে আনসার ও মুহাজিরগণ কোনো প্রকার 'বিনিময়' ছাড়াই হাওয়াযিন গোত্রের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু বনী সুলায়ম ও বনী ফাজারা গোত্রের কাছে এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে, আক্রমণকারী প্রতিপক্ষ, যারা পরাজিত হয়ে

www.pathagar.com

মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে, তাদের প্রতি কেন এতটা অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শন করা হচ্ছে ?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এ আপত্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেন না, বরং তাদেরকে ডেকে পাঠিয়ে প্রতি কয়েদীর বিনিময় ছয়টি উট নির্ধারণ করে নিজের পক্ষ থেকেই সমুদয় বিনিময় প্রদান করে তাদের নিকট থেকে সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দেন। অতপর নিজের পক্ষ থেকে সকল কয়েদীকে পোশাক পরিয়ে দিয়ে বিদায় দেন।

## আওতাস যুদ্ধের কয়েদী

আওতাস যুদ্ধের কয়েদীদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুধ বোন হযরত শায়বাও ছিলেন। মুসলিম যোদ্ধারা তাকে গ্রেফতার করার সময় তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের পয়গম্বরের বোন।" যোদ্ধারা মহিলার এ দাবী সত্যায়নের জন্য তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এনে হাজির করেন। মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজের পিঠের একটি দাগ দেখিয়ে বললো, "শৈশবে একবার আপনি এখানে আমার পিঠে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং এটা তারই চিহ্ন।" অতীতের সেই ঘটনা মনে পড়তেই পিয়ারা নবী (সাঃ)-এর চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি নিজের গায়ের চাদর মুবারক বিছিয়ে বোনকে বসতে দিলেন। অতপর দুই ভাই বোন একত্রে বসে শৈশবের মিষ্টি দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন।

পরে তিনি বোনকে বললেন, "তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় তবে এখানেও থাকতে পার। আর যেতে চাইলে আমি সে ব্যবস্থাও করে দেব। হযরত শায়বা নিজের দেশে চলে যাওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। তখন পিয়ারা নবী (সাঃ) বোনকে সসম্মানে তার স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং যাওয়ার সময় তাকে কয়েকটি উট ও বকরী হাদিয়া স্বরূপ দান করেন।"

## মেহমানের মর্যাদা পেলো যুদ্ধ বন্দীরা

বদর যুদ্ধে বিজয়ী মুসলমানদের হাতে অনেক কুরাইশ বন্দী হলো। এরা সেই তারা, যারা মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর তের বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে এবং তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন। সেই যুগের নীতি অনুসারে হয় তাদের সকলকে হত্যা অথবা তাদেরকে দাস বানিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদের সাথে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার করলেন।

www.pathagar.com

তিনি তাদের সাথে মেহমানের মত ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের নিজেদের খাওয়ার ব্যাপারে কষ্ট হলেও বন্দীদের ভাল এবং পেট পুরে খাবার দেয়া হতো। মুসলমানরা দু চারটা খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন, কিন্তু বন্দীদের রুটি খাওয়ান হতো। বন্দীদের একজন পরবর্তীকালে বলেছেন, "মদীনাবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ওরা আমাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে পথ চলতো। তারা প্রায় না খেয়ে আমাদের খাওয়াতো।"

## অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বা সন্ধির মর্যাদা রক্ষা

### প্রয়োজন চুক্তির চেয়ে বড় হলো না

বদর যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলছিল তখন মদীনায়। মক্কার দিক থেকে অহরহ খবর এসে পৌঁছেছে, বিপুল সজ্জা আর বিরাট বাহিনী ছুটে আসছে মদীনার দিকে। কিন্তু সে তুলনায় মদীনায় যুদ্ধ প্রস্তুতি কিছুমাত্র নেই। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যেমন স্বল্প, তেমনি মুসলিম যোদ্ধা সংখ্যাও নগণ্য। প্রতিটি সাহায্য প্রতিটি সহায়তাকারীকেই তখন সাদরে স্বাগত জানানো হচ্ছে সেখানে। এমন সময়ে হুযাইফা মরুভূমির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি গাতফান গোত্রের আবস খান্দানের লোক। মুসলিম তিনি। কুফরের সাথে ইসলামের শক্তি পরীক্ষার প্রথম মহাসাগরে অংশ নেয়ার আকুল বাসনা নিয়ে তিনি মদীনায় এসেছেন। পথের কত বিপদ মাড়িয়ে, বাধার কত দুর্লভঘ দেয়াল পেরিয়ে তিনি এসে পৌঁছেছেন মদীনায়। মদীনায় যুদ্ধ আয়োজন দেখে তাঁর চোখ মন জুড়িয়ে গেল।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পরম প্রশান্তি নিয়ে হুযাইফা দরবারে নববীতে গিয়ে বসলেন। কুশল বার্তা দিতে গিয়ে মহানবী (সাঃ)-কে তিনি পথের বিপদ আপদ ও অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বললেন, "পথিমধ্যে কুরাইশরা আমাকে আটক করে বলে মুহাম্মদের কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমি বললাম, "মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে নয়, মদীনায় যাচ্ছি।" অবশেষে তারা বললো, "ঠিক আছে, তোমাকে ছাড়তে পারি। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে, মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধে যোগ দেবে না।"

"আমি তাদের এ শর্তে রাজী হয়েই তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মদীনায় এসেছি।"

www.pathagar.com

হুযাইফার শেষ কথাটি শুনেই মহানবী (সাঃ) চোখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন। বললেন, "তুমি কথা দিয়েছ তাদের যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবে না তুমি ?"

হুযাইফা স্বীকার করলেন। মহানবী (সাঃ) তখন তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো। গৃহে ফিরে যাও। সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর হাতে। আমরা তাঁর কাছেই তা চাইবো।"

হুযাইফার চোখে নেমে এলো আধার। আশা ভংগের দুঃখ, জিহাদে যোগ দিতে না পারার বেদনায় মুষড়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু উপায় নেই। মহানবী (সাঃ)-এর কাছে প্রতিশ্রুতি ভংগের প্রশ্রয় পাবার নেই কোনো সামান্য উপায়। হুযাইফার চোখের সামনেই মদীনা থেকে যুদ্ধযাত্রা হলো বদরের দিকে। আর মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ শিরে নিয়ে হুযাইফা পা বাড়ালেন বাড়ীর পথে।

### ভৃত্যের কথার মর্যাদা রক্ষা

যখন মুসলমানগণ 'খোজাস্তানের' বিখ্যাত শহর সাবুর উপর আক্রমণ করলো, তখন শহরবাসী শহরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং দুর্গ বন্ধ করে উপর থেকে তীর বর্ষণ শুরু করলো। মুসলমানগণ শহরকে অবরোধ করে রাখল। এই অবরোধ কয়েকদিন পর্যন্ত ছিল। অবশেষে একদিন মুসলমানগণ ইহা দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয় পড়লো যে, শহরবাসী নিজেরাই নিজেদের শহরের দরজা খুলে দিয়েছে এবং অত্যন্ত নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজ কারবার করে যাছে। মুসলমানগণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললো, "তোমরা নিজেরাই আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছ। এজন্য আমরা নির্ভয়ে শহরের দরজা খুলে দিয়েছি।' মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু মূসা (রাঃ) এ নিরাপত্তা চুক্তি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অন্যান্য সেনানায়কের কাছেও জিজ্ঞেস করায় তারাও সে সম্পর্কে অনুরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত বহু তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের পরে জানা গেল যে, এক ভৃত্য বিনা পরামর্শে নিজেই গোপনভাবে একখানা ছোট্ট কাগজের টুকরা লিখে শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিয়েছে। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বললেন, 'একজন ভৃত্যের অঙ্গীকারের কোনোই মর্যাদা নেই। আমরা এটা মেনে নিতে বাধ্য নই। শহরবাসীরা বললো, 'আমরা ভৃত্য অভৃত্য সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমাদের কাছে মুসলমান সেনাদের তরফ হতে এই কাগজ এসেছে এবং আমরা এই চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র রেখে দিয়েছি এবং শহরের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছি।' অবশেষে সেনাপতি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে চিঠি

www.pathagar.com

লিখে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি জবাবে লিখলেন, 'যদিও সৈন্যদের মধ্যে সন্ধি এবং যুদ্ধের শর্তাবলী চূড়ান্ত করা ও নিরাপত্তা দেয়ার অধিকার একমাত্র সেনাপতিরই রয়েছে। তথাপি যদি বাহিনীর মধ্য হতে কোনো একজন সিপাহী নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে দেয়—তবে উহা সমস্ত মুসলমানের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দেয়া হয়ে যায়। মুসলমানদের ভৃত্যও মুসলমান। সেনাপতি ও অন্যান্য সেনানায়কের এই নিরাপত্তা চুক্তি মেনে চলা উচিত।'

## দামেশকের সন্ধি

তারিখটা ছিল তের হিজরী সালের এগারই জমাদিউস্ সানী। দামেশক শহর। আজনাদাইনের যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা।

মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ প্রায় শেষ। রোমীয়রা ভাবল, পূর্ব দরজায় যুদ্ধরত মুসলিম সেনাপতি তেজস্বী, সুনিপুণ মহাবীর ও অত্যন্ত চতুর। সন্ধি করতে হলে বাবে জারিয়ায় যুদ্ধরত কোমলপ্রাণ সেনাপতি আবু ওবায়দার নিকট যেতে হবে।

তারা তখন রক্তপাতে অনিচ্ছুক হযরত আবু ওবায়দার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলো, আমাদের গির্জাগুলো মুক্ত করে দিলে আমরা সন্ধি করবো। পরে আরো কিছু সাধারণ শর্তে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হলো।

ঐ সন্ধিপত্রে আবু ওবায়দা নিজের নাম স্বাক্ষর করেননি বা অন্য কারো নামও ব্যবহার করেননি। কারণ ঐ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বা সিপাহসালার হলেন খালেদ বিন ওলীদ।

আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে মাত্র একশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আবু ওবায়দা নির্ভয়ে শহরে ঢুকে পড়লেন। তাঁর পুরাভাগে, পাদ্রীরা ইঞ্জিল কিতাব পড়ছে আর খোশবু ছড়াচ্ছে। কী অপূর্ণ দৃশ্য।

পূর্ব দ্বারে তখন হযরত খালেদের নেতৃত্বে চলছে মরণপণ যুদ্ধ।

রাতে ইউশ ইবনে মায়কান নামে এক শহরবাসীর সহায়তায় পূর্ব দরজা ভেঙ্গে খালেদ সসৈন্যে শহরে প্রবেশ করেন এবং রোমীয় সেনাপতির থমাসের পশ্চাদ্ধাবন করে মরিয়াম গির্জায় উপস্থিত হন।

হঠাৎ তিনি দেখতে পান বিপরীত দিক থেকে আবু ওবায়দা প্রধান পাদ্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত এক শোভাযাত্রাসহ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। এদিকে হযরত খালেদ যুদ্ধরত। এমন সময় আবু ওবায়াদা উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা সন্ধির মাধ্যমে এ শহর আমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যুদ্ধ বন্ধ করুন। হযরত খালিদও অবাক।

www.pathagar.com

তিনি বুঝতে পারলেন না, প্রধান সেনাপতির উপস্থিতিতে তাঁরই অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমতিতে কি করে সন্ধি হতে পারে। বিশেষত মুসলমানরা যখন প্রচুর লোকক্ষয়ের বিনিময়ে শহরে শহরে প্রবেশ করেছে এবং তা জয় করেছে, সেখানে তো সন্ধির কোনো প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু মহানুভব খালিদ অধস্তন সেনাপতি আবু ওবায়দার সম্পাদিত এ সন্ধির প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দান করেন।

## ওয়াদা পালনের অনুপম নমুনা

মুসলমানরা আদর্শ জাতি।

নীতি-নিষ্ঠতা এই জাতির প্রাণ।

ওয়াদা পালন ও শপথ রক্ষা মুসলমানদের অনঢ় একটি নীতি।

এমনকি কোনো চুক্তি বা ওয়াদা পরোক্ষ বা প্রকৃত দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে না হলেও তাকে মুসলমানরা সম্মান দেখায়।

খলীফা উমার (রাঃ)-এর শাসনকালের একটি ঘটনা।

মুসলিম বাহিনী পারস্যের শুহরিয়াজ নামক একটি শহর অবরোধ করে। নগরটির পতন নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় মুসলিম বাহিনীর একজন গোলাম শহরবাসীর নামে নিরাপত্তা সনদ লিখে তীরের সাথে বেঁধে শহরে ছুঁড়ে দেয়।

পরদিন যখন মুসলিম বাহিনী আক্রমণ চালায়, তখন শহরবাসী দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে এবং বলে, 'একজন মুসলিম আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, এখন তোমরা কি জন্য যুদ্ধ করছো ?'

নিরাপত্তা সনদটি পড়ে দেখা গেল একজন গোলামের লিখা।

এ সম্পর্কে খলীফা উমর (রাঃ)-এর মতামত চেয়ে তাঁকে জানানো হলো যে, 'নিরাপত্তা সনদটি গ্রহণযোগ্য কিনা ?'

জবাবে খলীফা লিখলেন, 'সনদটি নিরাপত্তার বৈধ দলিল, শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে হবে।'

## আমি যে শান্তির বার্তাবাহক

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তগুলো স্থির হয়েছে, কিন্তু স্বাক্ষর তখনও হয়নি। এমন সময় মক্কার একজন মুসলমান পালিয়ে হুদাইবিয়ায় মুসলমানদের কাছে পৌঁছল। নাম আবু জান্দাল। সে ইসলাম গ্রহণ করায় মক্কাবাসীরা তার

www.pathagar.com

উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে। হুদাইবিয়ার মুসলমানদের আসার কথা শুনে সে বন্দীদশা থেকে কোনো রকমে পালিয়ে এসেছে। তার দেহে নির্মম আঘাতের চিহ্নগুলো জ্বলজ্বল করছে। সে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আশ্রয়ের আবেদন জানাল।

মহানবীর দরবারে উপস্থিত কুরাইশ নেতা সাহল বললো, 'সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এই লোককে অবিলম্বে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে।' উত্তরে একজন মুসলিম বললো, 'সন্ধি এখনও স্বাক্ষর হয়নি, সুতরাং এ লোককে ফেরত দিতে এখনই আমরা বাধ্য নই।' সাহল বললো, 'যদিও সন্ধি এদিক থেকে অসম্পূর্ণ তবু সন্ধির শর্ত সম্পর্কে আমরা একমত হয়ে গেছি। সুতরাং লোকটিকে অবশ্যই আমাদের হাতে ফেরত দিতে হবে।'

মহানবী স. গম্ভীরভাবে বসেছিলেন, অবশেষে তিনি সাহলকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

তারপর তিনি আবু জান্দালের দিকে স্নেহদৃষ্টি তুলে বললেন, 'আবু জান্দাল, ফিরে যাও, আল্লাহর নামে ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহই তোমার মুক্তির একটা ব্যবস্থা করবেন।'

ক্রন্দনরত আবু জান্দাল মুসলমানদের সামনে দিয়ে মক্কায় চলে গেল। তার কান্না অস্থির করে তুললো মুসলমানদের।

উমর (রাঃ) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অদম্য আবেগে গোটা দেহ কাঁপছিল তার। বললেন, 'হে রাসূল! আপনি কি আল্লাহর সত্যিকার রাসূল নন ?'

মহানবী (সঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। উমর (রাঃ) বললেন, 'আমরা হকের উপর আছি, তারা নাহক পথে আছে এটা কি সত্য ?'

মহানবী (সঃ) বললেন, 'অবশ্যই সত্য। উমর (রাঃ) বললেন, 'তাহলে কেন আপনি অপমানকর সন্ধির অমর্যাদাকেই ধরে রাখতে চাইছেন ? আমার আবেদন, সন্ধির শর্ত থেকে আমাদের মুক্তি দিন। তলোয়ারই ফায়সালা করুক।'

মহানবী (সঃ) হেসে বললেন, 'কিন্তু উমর, আমি যে শান্তির বার্তাবাহক। ধৈর্য ধর। তুমি যাকে অমর্যাদাকর বলছ, তার মধ্যেই করুণাময় আল্লাহ এক মহাপুরস্কার লুক্কায়িত রেখেছেন, যা সামনেই দেখতে পাবে, এই বলে মহানবী (সঃ) সন্ধিপত্রে তাঁর সীলমোহর লাগালেন এবং তা তুলে দিলেন সাহলের হাতে।

www.pathagar.com

# অমুসলিম প্রজাদের সাথে মুসলমান বাদশাহদের ব্যবহার

## মানবতার মহান প্রতীক বাদশাহ নাসিরুদ্দিন

বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েও বাদশাহ নাসিরুদ্দিন ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। বাদশাহর দরবার ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। সবসময় তিনি সুযোগ দিতেন অন্য ধর্মাশ্রয়ীদের। সব রকমের সাহায্য-সুবিধা তাদের দিতেন।

একদিনের ঘটনা। একজন লোক এসেছে। তার সাথে আর একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু। খোদ বাদশাহের সাথে দেখা করতে চায়, দেখা না করে কিছুতেই যাবে না।

বাদশাহ তড়িঘড়ি হুকুম দিলেন, ওদের খাবার দিতে। বেগমকে এসে বললেন, তাঁর নিজের জন্য যে রান্না তা এক্ষুনি দিয়ে দাও। বেচারীরা বহু দূর থেকে বুঝি এসেছে। ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে কোলের শিশুটি।

কিন্তু আগন্তুক সে খাবার খেতে রাজী নয়। সে জানালো, সে জাতিতে হিন্দু। বাদশাহ-বাড়ির পাক খেলে তারা বিপাকে পড়বে।

বাদশাহ বললেন, বেশ তাহলে তোমরা রান্না-বান্নার আয়োজন করো। যা যা প্রয়োজন লাগে হাজির হবে। একটুখানি শুধু কষ্ট করতে হবে।

আগন্তুক আবার বললো—তাও হয় না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। আর আপনি দাস মুসলমান। আপনার ঘরে খাওয়া মানে আমার জাত যাওয়া।

বাদশাহ এক মুহূর্ত ভাবলেন। পরে বললেন—আচ্ছা ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি আনুক। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর কথা হবে।

খাওয়ার পর অবশেষে আগন্তুক তার আরজি পেশ করলো। তার নালিশ জনৈক রাজপোষ্যের বিরুদ্ধে। তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। তার বাড়িঘর ছারখার করে ফেলেছে। রাজ দরবারে এর সুবিচার চাই।

বাদশাহ তখনি তৈরি হয়ে নিলেন। সরেজমিনে তিনি সব জানতে চান। তারপরে কথিত আসামীকে কঠোর সাজা দেবেন।

আগন্তুক হয়তো এতোটা ভাবতে পারেনি। বাদশাহ নিজে যাবেন বিচার করতে, এ তার কল্পনার অতীত।

বাদশাহ সেখানে পৌঁছে সাথে সাথে সাক্ষ-প্রমাণ নিলেন। জনে জনে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার কি ঘটেছে।

www.pathagar.com

লোকে বললো—ও লোকটা শঠ। শয়তান। পরের সাথে প্রতারণা করা ওর পেশা। এমনি করে ওর দিন গুজরান হয়।

স্বয়ং বাদশাহকে তকলিফ দেয়ার জন্য লোকে ততোধিক ধিক্কার দিলো। বাদশাহর কাছে তারা করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী, বাদশাহ যেন ক্ষমা করেন।

তাদের সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে বাদশাহ বললেন—চলো ভাই, তোমার বাড়িতে বসি। সেই সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তোমার বাড়িতে দুটো মুখে দিই।

বেশিক্ষণ বাদশাহ অবশ্য অপেক্ষা করলেন না। তাঁর যে এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া চাই।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে বসে বাদশাহ তাকে নিরিবিলি বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই। দোষ তোমার নয়, আমার। আমি বাদশাহ হয়ে তোমার অভাব মেটাতে পারিনি। আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন কিনা জানি না। তবে তুমি আমাকে মাফ করো।

ব্রাহ্মণ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাদশাহর পায়ে। বাদশাহ তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছিঃ ভাই, ওঠো। আমার যে কিছুই খাওয়া হয়নি। কই কিছু খেতে দাও। ঘরে যা আছে তাই আমি খাবো। আর বসবার সময় নেই।

ব্রাহ্মণ কেঁদে কেটে বলে—আমি অশুচি-অপবিত্র। আমার হাতে আপনি খাবেন।

বাদশাহ হেসে বলেন—ছিঃ ভাই মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করে। ইনকার করে। ইসলাম তা বলে না। ধর্মের বিধান তা নয়।

বাদশাহ তারপর সংগে নিয়ে আসলেন সেই ব্রাহ্মণকে। তাকে বুঝিয়ে বললেন—সে যেনো আর কোনো গর্হিত কাজ না করে। তার যখন যা প্রয়োজন বাদশাহর কাছে পাবে।

## বখতিয়ার খিলজীর মহানুভবতা

বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী তখন বাংলা শাসন করছেন। রাজা লক্ষণ সেন পালিয়ে গেছেন। মুসলমানদের শাসনে রাজ্যের হিন্দুরা বেশ সুখেই আছে।

রাজ্যের সুখের সংবাদ চাপা থাকলো না। সর্বত্র সুখের সংবাদ ছড়িয়ে গেল। পৌঁছলো রাজা লক্ষণ সেনের কানে। রাজমাতা শুনলেন, রাণী শুনলেন। নিতান্ত অবিশ্বাসের মাঝেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। এরই মধ্যে বিশ্বস্ত প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। বিশ্বাস না করে পারেন ?

www.pathagar.com

লক্ষণ সেনের একমাত্র কন্যা শুনে উতলা হয়ে উঠেছেন। তাঁর স্থির সংকল্প তিনি ফিরে যাবেন সাধের নবদ্বীপ ধামে। রাজবাড়ি না হোক, রাজ পথেই বাসা বাঁধবেন।

একদিন সত্যি সত্যিই দেখা গেল রাজবাড়িতে কে যেনো চুপিসারে ঢুকছে। প্রহরী রুখে দাঁড়ালো, কে, কি তার পরিচয়। রাজ-দুহিতা নির্ভয়ে জানালেন—যা বলার তিনি রাজার কাছে বলবেন। তাঁর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান।

দ্বার রক্ষক তাঁকে সসম্মানে নিয়ে চললো রাজ সন্দর্শনে। সংবাদ নিয়ে বললো একটু অপেক্ষা করতে। একটু পরে উনি আসছেন।

রাজ-দুহিতা দেখতে পেলেন কে যেন নামায পড়ছেন। খোলা দরজা দিয়ে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। সৌম্য প্রশান্ত বদন। সুললিত কণ্ঠস্বর।

এরপর রাজ দুহিতার আরো অবাক হবার পালা। নামায শেষে সেই ব্যক্তিই তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন। তিনি বিনম্রভাবে তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন অন্দরে আসতে।

অসংকোচে রাজদুহিতা বললেন—তিনি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

সরদার ঘোড়-সওয়ার আবার আপ্যায়ন জানালেন—আসুন, ভিতরে আসুন।

সে কণ্ঠে কি যাদু ছিল কে জানে। রাজদুহিতা সম্মোহিতের মতো তাঁর পিছু অনুসরণ করলেন। এ বাড়ির সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। সব অলিগলি, আনাচকানাচ তাঁর কতো চেনা। কতো না আপন।

সেই বিশাল হলঘরে বসে রাজদুহিতা অবাক হলেন। সেই আগের মতোই সব সাজানো গোছানো আছে। সবকিছু পরিপাটি ছিমছাম।

একথা সে কথার পর রাজদুহিতা তাড়া দিলেন—রাত হয়ে এলো। আমি এবার ফিরে যাব। একবার শুধু রাজার দেখা চাই।

কথায় কথায় রাজদুহিতা অবশ্য মুগ্ধ হয়ে গেছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিচয়। আনন্দের আতিশয্যে এতটুকু গোপন রাখেননি।

কথার পিঠেই কথা দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার দুঃখ প্রকাশ করলেন সত্যিই রাত হয়েছে তাঁর খেয়াল হয়নি। তিনি অনুতপ্ত।

এবার সাদর আহ্বান এলো—আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আর আপনার আহারের আয়োজন হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

তারপর রাজদুহিতাকে হতচকিত করে দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার তাঁর হাতে তুলে দিলেন চাবীর গোছা। পরম প্রত্যয়ের সুরে বললেন—যে ঘরে ইচ্ছা আপনি থাকতে পারেন। যে ঘর আপনার পছন্দ, সেই ঘর বেছে নিন। আর যে পাচক-পাচিকাকে প্রয়োজন তাকে দিয়েই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করুন। এ ঘর-দোর আপনাদের। আমি রক্ষণাবেক্ষণ করছি মাত্র।

বিনয়ে বিগলিত রাজদুহিতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যাকে খুঁজছেন তাকে পেয়েছেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যিনি সবার হৃদয় জয় করেছেন, এ সেই বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী। নদীয়া নবদ্বীপ ধাম অভিযানের সরদার ঘোড়-সওয়ার, যার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

তারপরে একথা সে কথার পরে রাজদুহিতা সহাস্যে বলেন—আমরা যে অলক্ষে বলি আপনি যবন, তা জানেন ?

তেমনি হাসিমুখেই বখতিয়ার খিলজী জানালেন—জানি।

রাজদুহিতা বললেন—আপনি মুসলমান। আর আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে। বরং বলতে পারেন আপনার চির শত্রুর কন্যা। তবু আমরা নতুন করে জানলাম—আপনি সত্যি মহান, মহানুভব। আপনার তুলনা হয় না। আপনি খাঁটি মানুষ। খাঁটি মুসলমান। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

বখতিয়ার খিলজীর চোখে মুখে তখন জয়ের গৌরব। পবিত্র ইসলামের পূত বাণী স্মরণ করে তিনি বলেন—আল্লাহর কাছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সব মানুষকে সমান ভাবে ভালবাসার নাম ইসলাম। আমি তাঁরই একজন নগণ্য খাদেম। ইসলামের শিক্ষাই আসল শিক্ষা।

## হিন্দু রাণীর সাহায্যে এগিয়ে গেলেন বাদশাহ হুমায়ুন

মোগল সম্রাট বাদশাহ হুমায়ুনের চরিত্রে মহৎ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বাদশাহ হুমায়ুনকে বলা হতো জালিমের শত্রু। মজলুমের মিত্র। অতি বড়ো আপনজন, অন্যায় করলেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। যে কোনো জাতি-ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল সমান মহানুভবতা। যে কোন জাতি বা যে কোন ধর্মের মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। তাদের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাতে নিজের ক্ষয়-ক্ষতি হবে ভেবে ভয়ে ভীত হননি। যে কারণে বাদশাহ হুমায়ুনের জীবন বিপন্ন হয়েছে বারবার, সে অবিচল আদর্শের মূল্য দিতে যেয়ে তাঁর সিংহাসন পর্যন্ত হাত ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। স্বজাতি স্বধর্মের লোকের চোখে বিরাগভাজন হয়েছেন।

www.pathagar.com

চিতোরের রাণী এত্তেলা পাঠিয়েছেন। বাদশাহ হুমায়ুন পত্রখানা পড়লেন। রাণী কর্ণবতীর সেই প্রথম আর শেষ পত্র। তাঁর আকুল আরজ, পত্রপাঠ মাত্র আসুন।

কর্ণবতী স্বহস্তে লিখেছেন, এই আমার রাখী পাঠালাম। আজ থেকে আমি আপনার ছোট বোন। আপনি আমার আদর্শ অগ্রজ। শীগগির এসে বোনের প্রাণ বাঁচান।

দিল্লীর দরবারে তখন সাজসাজ রব পড়ে গেল। উজীর-নাজির পাত্র-মিত্র পারিষদ রণ-সজ্জায় সাজছে। বাদশাহ তলব করেছেন সিপাহসালারকে। তাঁর কড়া হুকুম—এ অভিযানে বিলম্ব করলে চলবে না। এই মুহূর্তে সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হওয়া চাই।

চিতোর অবরোধ করে বাদশাহ তখন সসৈন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। বাদশাহ স্বয়ং সেনাপতি-সিপাহসালার।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। বাদশাহ পৌঁছানোর অনেক আগেই রাণী কর্ণবতী জহর পান করেছেন। বিজয়ীর বেশে বাদশাহ হুমায়ুন চরম পরাজয় বরণ করলেন।

রাণী কর্ণবতীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বাদশাহ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন—আমার কর্তব্য আমি করেছি। আমার দায়িত্ব আমার ওয়াদা আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তা পালন করেছি। সে বিধর্মী হলেও আমাকেই ভাই ডেকেছে। মুসলমান কখনো জালিমকে ক্ষমা করে না। হোক না সে জালিম মুসলমান।

কোথায় সে বেঈমান বাহাদুর শাহ। হোক সে আমার জ্ঞাতি—তাকে সমুচিত সাজা দাও। বন্দী করো বাহাদুর শাহকে। একজন সম্মানিতা রাণীকে সে অপমান করেছে। রাণী তার কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। এ আঘাত আমি ভুলতে পারি না।

বাহাদুর শাহ জানতেন না যে, মোগল সম্রাট হুমায়ুন সসৈন্যে ছুটে আসবেন। মোগল অধিপতি মুসলমানের কর্ণধার। অন্যদিকে রাজপুত রাণী বিধর্মী। মুসলমানের চিরশত্রু রাজপুত। বাহাদুর শাহ সেসব সম্যক বুঝে আক্রমণ করেছিলেন। চিতোর রাণী কর্ণবতী সহজে পরাজয় বরণ করবে তা তিনি জানতেন। শুধু জানতেন না বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন।

www.pathagar.com

## মহান উদার বাদশাহ আলমগীর

### প্রথম ঘটনা

একবার মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট বাহিনী সমর-সজ্জায় প্রস্তুত। পুরোভাগে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে রেকাবে এক পা দিয়েছেন। আর এক পা তখনো মাটিতে রাখা।

এমন সময় সেখানে দাঁড়ালো এক দীন-হীনজন। জরাজীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। গায়ে পায়ে ধূলি ধূসরিত। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছে।

হুকুমদার হায়দী হাঁক ছাড়ে, হঠ যাও। হুঁশিয়ার! বাদশাহ নামদার রওয়ানা হবেন। যে যেখানে আছে—সরে দাঁড়াও।

ভীষণ ভয় পেয়েছে আগন্তুক। পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। পালাবার পথ খুঁজছে।

বাদশাহ আলমগীর তাকে দেখে ঘোড়া থেকে পা নামালেন। আগন্তুককে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন তার কি প্রয়োজন। কি জন্যে এসেছে সে।

আগন্তুকের আড়ষ্টতা তখনো কাটেনি। এতোক্ষণ ভয়ে প্রায় কাঠ হয়ে যাবার মতোন অবস্থা। বাদশাহর কথা শুনে ধড়ে প্রাণ এলো বুঝি।

বাদশাহ ওর কাছে এসে দাঁড়ান। মুখোমুখি হয়ে বললেন—যা বলার নির্ভয়ে বলো। আল্লাহর কসম আলমগীর সুবিচার করবে।

ব্রাহ্মণ আভূমি নত হয়ে জানালো তার নালিশ। তার ফরিয়াদ। সদূর দাক্ষিণাত্য থেকে সে এসেছে, বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। হাজার কষ্ট হোক তবু তাকে আসতে হলো। দাক্ষিণাত্যের রাজকর্মচারী তার একমাত্র কন্যাকে অপহরণ করেছে। কারণ রাজকর্মচারীর বিপুল প্রতাপ। সবার মুখ তিনি বন্ধ করে রেখেছেন।

বাদশাহ আলমগীর আর বিলম্ব করলেন না। ব্রাহ্মণকে সাথে নিয়ে চললেন। সদলবলে সিপাই-শান্ত্রী, লোক-লস্কর ছুটে চললো।

দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে বাদশাহ হুকুম করলেন আসামীকে এক্ষুণি পাকড়াও করে আনতে। কারো কোনো সুপারিশ তিনি শুনতে রাজি নন। বিচার না করা পর্যন্ত তিনি পানি স্পর্শ করবেন না। বাদশাহর প্রতিনিধির বিচার বাদশাহ নিজে করবেন।

বাদশাহ আলমগীর স্বয়ং এসে উঠেছেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। সেখানেই তাঁর বিচারালয় বসেছে। বাদশাহ আলমগীর নিজে বিচার করছেন। তাঁর

www.pathagar.com

সৈন্য-সামন্তরা ধরে এনেছে রাজকর্মচারী শরাফ খানকে। সেনাবাহিনী উদ্ধার করতে পেরেছে ব্রাহ্মণ কন্যা রাজিনীকে। কুমারী রাজিনী এখন রাহুমুক্ত।

রাজ কর্মচারী শরাফ খানকে বাদশাহ নিজে বেত্রাঘাত করছেন। জনগণ চোখের সামনে দেখছে। তারা স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছে সব। বাদশাহ বলছে—তুমি মুসলমান নও, মুনাফিক। তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

পরক্ষণেই বাদশাহ আলমগীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলেন—বলো বোন, তুমি কি বিচার চাও। ওই পাষণ্ডটার হয়ে তোমার কাছে আমি মাফ চাই। আজ থেকে তুমি আমার বোন। তোমার যা অভিযোগ অসংকোচে বলতে পার। আমি তোমার মান রাখবো।

রাজিনী আর স্থির থাকতে পারলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে লুটিয়ে পড়েছে বাদশাহর পায়ে। বাদশাহ নামদার স্বয়ং এসে তাকে মুক্ত করেছে। এ যে কল্পনার অতীত !

বাদশাহ আলমগীর সস্নেহে তাকে বললেন—যাও বোন, তুমি নির্ভয়ে থাক। তোমার কোন ভয় নেই। এই নাও আমার পাঞ্জা নিশান। যখন প্রয়োজন হবে আসবে। কেউ তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এ এলাকায় আমি তোমাকে বরগাদারী দিয়ে গেলাম। ভাইয়ের এ সামান্য দানটুকু মাথায় পেতে নাও।

বিদায় বেলায় রাজিনী দাবী জানালো—বোনের বাড়িতে এই বেলাটা থাকতে হবে। খালি মুখে ফিরিয়ে দেবো না। পরম প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণ মিনতি করলো—বাদশাহ নামদার দু দণ্ড অপেক্ষা করুন। আপনার আহারের আয়োজন করছি।

সে দৃশ্য দেখে তখন চারপাশ থেকে আনন্দের সোরগোল উঠেছে। জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।

**দ্বিতীয় ঘটনা**

আর একবার বিজাপুর অভিযানে চলেছেন আলমগীর। সারি সারি সৈন্য-সামন্ত দাঁড়িয়ে আছে। পুরোভাগে বাদশাহ। সে যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সিপাহসালার। তাঁর হুকুম হলেই সেনাবাহিনী এগিয়ে যাবে। এক পায়ে সব খাড়া।

বিজাপুরে আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ওদিকে মারাঠা দস্যু শিবাজী আবার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে। জাঠ শিখরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জয়সিংহ আর যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার খবর এসেছে। গোপনে গোপনে তারা বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

www.pathagar.com

বাদশাহ নিজেই সে জন্যে যাচ্ছেন। সরেজমিনে সব তদন্ত করবেন। স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। বিজাপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর যাবেন আরো দূর দাক্ষিণাত্যে। এই শেষবারের মতো মারাঠা দস্যু শিবাজীর বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দেবেন।

বারবার শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে মাফ করে দিয়েছেন। শিবাজী বার বার শপথ করেছে আবার শপথ ভেঙ্গেছে।

বাদশাহ সেই কারণে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে চলেছেন। অভিযানের আগে সেনাবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন। প্রতিটি অভিযানের সময়ই তিনি সেনাবাহিনীকে সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেন। আল্লাহর কসম থাকে তারা যেন কোনো অন্যায় কাজ না করে। যত্রতত্র অত্যাচার থেকে তারা যেন বিরত থাকে। বিশেষ করে শিশু আর নারীর কোনো ক্ষতি যেনো না হয়।

নকীবের মুখে শেষ মুহূর্তে বাদশাহ জানতে চাইলেন কোনো খবরাখবর আছে কি না। কারো কোনো প্রয়োজন। কিংবা কারো কোনো ফরিয়াদ।

বাদশাহ আলমগীরের বরাবরের অভ্যাস যাবার বেলায় সব জেনে যান। তাঁর হুকুম তামিল করে নকীব। যে কোন ব্যাপার তাকে বিদায় মুহূর্তে জানায়।

বাদশাহ শুনলেন বারানসী থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে। নকীব তাকে সাথে নিয়ে এসেছে। বাদশাহ নামদারকে সে কিছু বলতে চায়।

বাদশাহ বললেন—যা বলার নির্ভয়ে বলো। কোনো ভয়ের কারণ নেই।

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনে বাদশাহ বেশ বুঝতে পারলেন বেচারীরা বিব্রত। বড্ডো বিপাকে পড়েছে। তা না হলে অতোদূর পথ পাড়ি দিয়ে আসতো না।

বিজাপুর বিজয় আর হলো না। দাক্ষিণাত্য অভিযানও স্থগিত থাকলো। বাদশাহ মোড় ঘুরালেন বারানসীর দিকে। সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন বারানসী অভিযানের। সাথে নিয়ে চললেন বাদী ব্রাহ্মণকে। তাকে আশ্বাস দিলেন সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকতে। সব ব্যবস্থা তিনি করবেন।

বারানসীর দ্বারপ্রান্তে পা দিয়ে বাদশাহ তলব করলেন সেখানকার শাসনকর্তাকে। মীর্জা হাসান হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো।

বাদশাহ ফরমান দিলেন বারানসীর মন্দিরগুলো মেরামত করার। কোনো মন্দিরের কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হলে তা যেন সংগে সংগে ঠিক করে দেয়া হয়। বাদশাহ স্বচক্ষে সব দেখবেন। যতোদিন পর্যন্ত মন্দির মেরামত না হয়

www.pathagar.com

বাদশাহ্ ততোদিন সেখানেই অবস্থান করবেন। বারাণসীর প্রবেশ পথ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না।

মীর্জা আবুল হাসান করজোড়ে জানালো, কোনো মন্দিরেরই কোনো ক্ষতি হয়নি। সবগুলো অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করছে। কেবল পূজার পূর্বে সেগুলোর নামমাত্র সংস্কারের দরকার। যথারীতি ঠিক সময়েই সে ব্যবস্থা করা হয়। সেই মোতাবেক কাজ করবেন।

বাদশাহ তার কোনো কথাই শুনলেন না। বললেন ঃ এক সপ্তাহ সময় দেয়া গেল। এর মধ্যে যদি সব ঠিকঠাক না হয় তাহলে গর্দান থাকবে না।

মীর্জা হাসান হতভম্ব। তার কোনো কথাই বাদশাহ মানতে রাজি নন। সে বিব্রতবোধ করছে।

বেচারী ব্রাহ্মণও এতবড়ো অভিযোগ করেনি। বাদশাহ অল্পেই অনেক বেশি অনুমান করে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়তো বা মন্দির ভেংগে-চুরে ফেলেছে। মন্দিরগুলোর সর্বনাশ হয়েছে।

অবশেষে ব্রাহ্মণ সবিনয়ে জানালো তার আরজ। বাদশাহকে বললো ঃ মন্দিরের ক্ষতি সাধনের কথা সে বলেনি। মন্দিরের পুরোহিত বদলানোর ব্যাপারে সে আবেদন জানিয়েছে। মন্দিরসমূহের প্রধান পুরোহিত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার মতো কোনো গুণ তার নেই।

বাদশাহ শুনে মন্তব্য করলেন ঃ সে দোষও আমার সুবাদারের। এই কর্তব্য তার অনেক আগেই সমাধা করা উচিত ছিল। সে পারেনি। সুতরাং তার সমুচিত সাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাদশাহর আগমনবার্তা পেয়ে তখন দলে দলে লোক আসছে। বারাণসীর উপকণ্ঠ লোকে লোকারণ্য। বাদশাহ তাদের মুখেও সেই একই কথা শুনলেন। হিন্দুরা দল বেঁধে বাদশাহর কাছে পুরোহিতের বিরুদ্ধে নালিশ করলো।

বাদশাহ তলব করলেন পুরোহিতকে। তার বক্তব্য শুনলেন। বুঝতে পারলেন সে নির্দোষ নয়।

বাদশাহ তাকে বললেন ঃ বেশ তোমাকে সপ্তাহখানেক সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমার সৎ গুণাবলীর প্রমাণ দাও। যদি তাতে ব্যর্থ হও তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।

সমবেত হিন্দু জনতা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলো—বাদশাহ আলমগীর জিন্দাবাদ। বাদশাহ নামদার জিন্দাবাদ।

সবশেষে বাদশাহ সেই ব্রাহ্মণকে আবার কাছে ডাকলেন। তাকে কানে কানে বললেন কি করতে হবে। ব্রাহ্মণ আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

সেই মুহূর্তেই পুরোহিত-প্রধান ভেবে-চিন্তে তার প্রার্থনা জানালো। বাদশাহর দরবারে তার আকুল আবেদন আজ থেকেই সে পুরোহিতের পদত্যাগ করেছে। যথার্থই এ কাজের সে অনুপযুক্ত। বাদশাহ নামদার যেন তার অন্য ব্যবস্থা করেন। রুজি-রোজগার তার যেন বন্ধ না হয়। গ্রাসাচ্ছদনের অন্য কোনো অবলম্বন তার নেই।

বাদশাহ জানতে চাইলেন—সে কোন কাজ করতে পারবে নিজ মুখেই বলুক—বাদশাহ তাতেই রাজী।

পুরোহিত জানালো তার পক্ষে সুবিধা হয় রাজকর্মচারীর কাজ। এক সময় সে জয়সিংহের সেনাদলে ছিল। পরে অনন্যোপায় হয়ে পালিয়ে এসেছে। কোনো কিছু না পেয়ে বাধ্য হয়ে পুরোহিতগিরি করছে। এ তার পেশা নয়।

পুরোহিত আরো বললো ঃ বাদশাহ আলমগীরের মহানুভবতার পরিচয় পেয়েই সে অকপটে সব স্বীকার করছে। বাদশাহর সম্পর্কে আগে যা সে শুনেছে সব মিথ্যা। সব ফাঁকি। সে নিসন্দেহে প্রমাণ পাচ্ছে বাদশাহ কতো মহান ! কতো উদার !

বাদশাহ আলমগীর তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিলেন নিজের তরবারি। বললেন ঃ এ নাও তোমার পুরস্কার। হুকুম জানালেন তাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে। এ অভিযানে সে হবে অন্যতম অগ্রনায়ক।

সে সংবাদ শুনে ব্রাহ্মণ দলবলসহ আবার আরজ জানালো ঃ হুজুর কি সর্বনাশ করছেন। ও লোকটা নেমক হারাম। বেঈমান। সব জেনে-শুনে আপনি ওকে এহেন পদমর্যাদা দেবেন না।

সেদিন সমবেত হিন্দু জনতার সামনে বাদশাহ আলমগীর বিদায়ী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি আজ আছি কাল নেই। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, এখানে মানুষ থাকবে। এখানে মন্দিরও থাকবে। হিন্দুরা আমার প্রজা। আমার কারণে তারা যদি বিপাকে পড়ে সে দোষ আমার। তারা যদি পথভ্রষ্ট হয় তার জন্যেও আমি দায়ী। বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের নীতি। আল্লাহর বিধান। তার বরখেলাফ আমি করবো না।

### স্বামীর বদলে স্বামী

এক মোগল সম্রাজ্ঞী তীরন্দাজী শিখতে গিয়ে তীর নিক্ষেপ করলে তা গিয়ে লাগে এক গরীব হিন্দুর গায়ে। লোকটি সাথে সাথে মারা যায়। তার স্ত্রী বাদশাহর দরবারে নালিশ দায়ের করে। বাদশাহ মেয়েলোকটির হাতে তীর ধনুক দিয়ে বললেন—আমার স্ত্রী তোমার স্বামীকে যেভাবে হত্যা করেছে

www.pathagar.com

তুমিও তার স্বামীকে অর্থাৎ আমাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করো। বাদশাহর এরূপ বিচারে মেয়েলোকটি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাজ্ঞীকে মাফ করে দেয়।–[পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-১১২]

ড. তারা চাঁদ তাঁর "দি ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম নন ইন্ডিয়ান কালচার" (বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক অনুবাদ "ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব") গ্রন্থে মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেন ঃ "বাওল্যাণ্ডসন বলেন যে, আরবীয় মুসলমানগণ সপ্তম শতকের শেষের দিকে মালাবার উপকূলে প্রথম তাদের বসতিস্থাপন করেন। ফ্রান্সিস ডে পরম্পরাগত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে একমত সমর্থন করেন। স্টারক মোপলহ্দের সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর বিবরণে এ মতকে অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, এটা সুপরিজ্ঞাত যে, সপ্তম শতকের পর থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় বিভিন্ন বন্দরে পারসিক ও আরব বণিকরা বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতে শুরু করেন ও স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করেন। মালাবারের বসতিই ছিল বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। সে অঞ্চলের বন্দরসমূহে বণিকদের সকল প্রকার উৎসাহদানের রীতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। মুহম্মাদ বিন কাসেমের অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণাবলী সম্পর্কে বিলাধুরী যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এসব দেশে তখন মুসলমানরা বসবাস করছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শ্রীলঙ্কার রাজা উপহার রূপে হাজ্জাজ-এর কাছে কতিপয় মুসলিম বালিকা প্রেরণ করেন। এরা শ্রীলঙ্কায় জন্মগ্রহণ করে। এ বালিকারা ছিল সেখানে মৃত্যুবরণকারী বণিকদের অনাথ সন্তান। বওয়ারিজ নামক কচ্ছ অঞ্চলের উপজাতীয় জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করে মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়। হাজ্জাজ দাহিরের কাছে মেয়েদের মুক্তি দাবি করেন। কিন্তু দাহির তাদের মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পরিণামে হাজ্জাজ কাসিম-এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানে নৌবহরের সমর্থন ছিল এবং দবুল আক্রমণে তা সহায়ক হয়।

দক্ষিণ ভারতে আরব বসতিস্থাপনের সংগেও হাজ্জাজ-এর নাম যুক্ত। লব্বেদের উৎপত্তি সম্পর্কে উইলক্স যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে উদ্ধৃত করেন রাইস। তাঁর মতে 'অষ্টম শতকের প্রথম দিকে হিজাজ বেন গুসফ (হাজ্জাজ বিন ইউসুফ) ছিলেন ইরাকের গভর্নর। তার নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি মুসলমানদের মধ্যে অপ্রিয় ছিলেন। তিনি হশম বংশের কতিপয় ব্যক্তিকে চিরতরে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের পশ্চিম উপকূলের কঙ্কন অঞ্চলে অবতরণ করেন, অন্যেরা অবতরণ করেন কুমারিকা অন্তরীপের পূর্বদিকে। কঙ্কন অঞ্চলে অবতরণকারীদের

www.pathagar.com

বংশধরগণ নেওয়ায়ত এবং কুমারিকার পূর্বদিকে অবতরণকারীদের বংশধরকে লব্বেরূপে খ্যাত হন।

অষ্টম শতকে আরব নৌবহর রোচ কাথিয়াওয়াড় উপকূলের বন্দরসমূহ আক্রমণ করে। আরবদের ব্যবসা ও বসতিস্থাপন ক্রমে বিস্তারলাভ করতে থাকে। ভারতে তাদের বসতিস্থাপনের প্রথম প্রত্যক্ষভাবে নথিভুক্ত প্রমাণও অষ্টম শতক থেকেই পাওয়া যায়। কোল্লম-এর সমাধিক্ষেত্র ময়য়ত কন্নুতে বহু প্রাচীন সমাধি স্তম্ভ আছে। এদের একটিতে এ লেখন উৎকীর্ণ আছে যে আলী ইবনে উদথোরমান নবী মুহাম্মদ স.-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত থেকে প্রচলিত হিজরী সালের ১৬৬তম বর্ষে এই জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

এরপর থেকে মুসলিম প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিঞ্চিদধিক একশত বছরের মধ্যে মালাবার উপকূলে মুসলমানগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বণিকরূপে তাদের স্বাগত জানানো হয় এবং দৃশ্যত বসতিস্থাপন, ভূমিলাভ ও প্রকাশ্যে ধর্মাচরণের ব্যাপারে তারা সুযোগ পান। বসতিস্থাপনের অব্যবহিত পরেই তারা ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়ে থাকবেন। কেননা ইসলাম অপরিহার্যভাবে একটি প্রচারব্রতী ধর্ম এবং প্রতিটি মুসলমানই আপন ধর্মের প্রচারক স্বরূপ। তাদের অনেকেই সশ্রদ্ধ মর্যাদাও লাভ করেন। সিরিয়াস্থ খৃষ্টান বসতিস্থাপনকারীদের মতো উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে দেশ ত্যাগী হয়ে তারা ভারতে আসেননি। তারা এসেছিলেন নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের উদ্দীপনা এবং বিজয়ের মর্যাদা ও গৌরব বহন করে। নবম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই তারা ভারতের সমগ্র পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মপ্রচার ও পালনের উৎসাহ দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে গভীর সাড়া সৃষ্টি করেন।

দক্ষিণ ভারতে তখন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘর্ষ চলছিল। নব-হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল অস্থিরতা ও উত্থান-পতনের কাল। চেররাজ বংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল এবং ক্ষমতায় আসছিল নতুন রাজবংশ। স্বাভাবিকভাবে জনগণের মানসিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিচলিত এবং যে কোনো সূত্র থেকেই আসুক না কেন, নতুন ধারণাবলী গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত অনুকূল। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের অজটীল তত্ত্ব, সুবর্ণিত মতবাদ ও অনুষ্ঠান এবং সমাজ সংগঠনের গণতান্ত্রিক তত্ত্ব বহন করে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং এর প্রভাবও হয় অত্যন্ত বিপুল। নবম শতকের প্রথম চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কোদুনগল্লু থেকে রাজ্য

www.pathagar.com

শাসনকারী মালাবারের চেরামন পেরুমাল বংশীয় শেষ রাজা এ নবধর্মে দীক্ষিত হন। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী তার ধর্মান্তরণ ছিল একটি স্বপ্ন দর্শনের ফলশ্রুতি। রাজা স্বপ্নে দেখেন যে, চাঁদ দু ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সে সময় শ্রীলঙ্কা থেকে প্রত্যাগত একটি মুসলিম ধর্ম প্রচারব্রতী দলের সাথে তার দেখা হয় এবং দলনেতা শইখ সেক্কে উদ্দীন এ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন। তিনিই রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন ও তার নাম রাখেন আবদুর রহমান সামরী। ধর্মান্তরের পরে রাজা মালাবায় থেকে আরব যান ও শাহর-এ অবতরণ করেন। চার বছর পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সেখান থেকে তার রাজ্যশাসন ও মুসলমানদের প্রতি দেয় সংবর্ধনা সম্পর্কে নির্দেশ সংবলিত পত্র দিয়ে সপরিবার মালিক ইবনে দীনার, শরীফ ইবনে মালিক ও মালিক ইবনে হাবীবকে মালাবার পাঠান। তাদের প্রতি মালাবারে অত্যন্ত সদয় আচরণ করা হয় এবং তাদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়। তারই ফলশ্রুতিরূপে মালাবার উপকূলের এগার স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

রাজার ইসলাম ধর্মগ্রহণ জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। মালাবারে সেই ঘটনার স্মৃতিকে অদ্যাপি সজীব রাখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, জামুরিনের অভিষেকে তাঁকে মস্তক মুণ্ডন করে মুসলমানী পোশাক পরানো হয় ও একজন মপিল্ল তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। অভিষেকের পর জামুরিনের সাথে আচ্ছুৎতুল্য আচরণ করা হয়, তার নিজের পরিবারের লোকদের সাথেও তিনি বসতে বা খেতে পারেন না এবং কোনো নায়ার বংশীয় ব্যক্তি তাঁকে স্পর্শও করেন না। ধরে নেয়াও হয় যে, জামুরিন আরব থেকে চেরামন পেরুমাল-এর প্রত্যাবর্তনাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি রূপে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজারা অভিষেক উৎসবে তরবারি গ্রহণ করে অদ্যাপি শপথ নেন যে, 'আমার মক্কাগত পিতৃব্যের ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এ তরবারি সংরক্ষণ করবো।' একথা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজ্য চেরামন পেরুমাল-এর ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনী কিংবদন্তীরূপেই প্রচলিত এবং প্রচলিত অনেক আখ্যানেই ঘোরতর সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। কাহিনীতে উদ্ধৃত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ঐতিহাসিকভাবে সনাক্ত করা যায় না। চেরামন পেরুমাল উপাধিমাত্র, সেক্কে উদ্দীন সম্ভবত নবম শতকের কোনো রাজার সমকালীনও হতে পারেন না। কেননা হিজরী পঞ্চম শতক থেকেই কেবল মুসলমানদের মধ্যে দীন পদবী ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং সাধক মালিক ইবনে দীনার এর ভারতে আগমন সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু ইনস্-এর মতে 'এ বিবরণ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কোনো এক পেরুমাল-এর সম্ভবত নবম

www.pathagar.com

শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও সিংহাসন ত্যাগের সাথে করনগনোর এর শাসক রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।'

মুসলমানগণ দৃশ্যত এ সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেন। তাঁরা সম্মানসূচক মপ্পিল্ল নাম ধারণ করতেন। মপ্পিল্ল দ্বারা বুঝাত 'মহান সন্তান বা বর।' কতিপয় খৃস্টানরাও এ পদবী ধারণ করতেন। তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্য খৃস্টানদের বলা হতো নুস্মরণী মপ্পিল্ল। তারা অন্যান্য বিশেষ সুবিধাও উপভোগ করতেন। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের পাশে একজন মুসলমান বসতে পারতেন, কিন্তু কোনো নায়ার তা পারতেন না। মপ্পিল্লদের ধর্মীয় নেতা থঙ্গল জামোরিন-এর পাশাপাশি পাল্কী চড়ে যেতে পারতেন।

জামোরিন-এর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরব বণিক তার রাজ্যে বসতিস্থাপন করেন। তাদের বাণিজ্য দ্বারা তিনি তার শক্তি ও সম্পদই শুধু বৃদ্ধি করেননি, তার আধিপত্য বৃদ্ধির দাবী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করেন। জামোরিনরা ছিলেন এরান্দ-এর নেদিউইরুপ্প-এর অধিবাসী। তারা পার্শ্ববর্তী পোরলট্টি রাজার পলমাদ অঞ্চল জয় করেন। বেলাপুরম দুর্গ এ বিজয়ে বিশেষ সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে লোক শ্রুতি এই যে আরবের সাথে বাণিজ্যকারী জনৈক বণিক যে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন তা সমৃদ্ধি লাভ করে ও কালিকট বন্দরে পরিণত হয়। তিনি কালিকটের কাজী হন এবং তার বংশধরগণ পার্শ্ববর্তী নদ রাজাদের বিরুদ্ধে জামোরিন-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন। ওয়লবন্দ-এর রাজা বল্লুবকোন পরাজিত হন এবং তিরুমবয়ির মহমখম উৎসবের ব্যবস্থাপনা ও সেই সাথে দক্ষিণ মালাবারের আধিপত্য জামোরিনদের হাতে চলে যায়। কোলত্তিরি রাজাদের মন্ত্রী ও নৌ অধ্যক্ষ পদে যে আলী রজ পরিবার অধিষ্ঠিত ছিলেন, একটি লোকশ্রুতি অনুসারে তারা জনৈক আরবীয় মুসলমানের বংশধর। চেরামন পেরুমলের আমন্ত্রণক্রমে তিনি আরব থেকে আসেন ও তার বংশধরগণ কন্নানূর-এর শাসক নিযুক্ত হন। অন্য প্রকার লোকশ্রুতি অনুসারে এ পরিবারের প্রধান ছিলেন জনৈক নায়ার। তিনি ছিলেন কোলত্তিরির রাজাদের মন্ত্রী। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যোগ্যতার জন্য তাকে এ পদে রেখে দেয়া হয়।

মুসলমানদের সম্পর্কে জামোরিনের ধারণা এত উচ্চ ছিল যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। কেননা ধর্মান্তরিতদের তিনি আরব জাহাজে নিযুক্ত করতেন এবং আপন আধিপত্য রক্ষার ব্যাপারে আরব নৌশক্তির উপর তাকে নির্ভর করতে হতো। তিনি এ আদেশ দেন যে, তার রাজ্যের প্রতিটি জেলে পরিবারের এক বা একাধিক পুরুষ সদস্যকে মুসলমানরূপে লালিত পালিত হতে হবে।

www.pathagar.com

পরবর্তী শতকসমূহে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদদের বিবরণ তারই সাক্ষ্য দেয়।

মাসুদী দশম শতকের প্রথম দিকে (৯১৬ খৃস্টাব্দে) ভারত সফর করেন। তিনি সেয়মোর-এ (বর্তমান চৌল) সিরফ, ওমান, বসরা ও বাগদাদ থেকে আগত দশ সহস্রাধিক মুসলমান দেখতে পান। এছাড়া ছিলেন সেখানে জন্মগ্রহণকারী আরবদের বহু সন্তান। তাদের প্রধান ছিলেন একজন। তার পদবী ছিল হযম (সম্ভবত হুনরমন্দ)। তিনি হিন্দু রাজার কাছ থেকে তার কর্তৃত্ব লাভ করেন। আবু দুলফ মুহলহিল সেয়মোর বন্দরে মসজিদ দেখতে পান। ত্রয়োদশ শতকে ইবনে সঈদ উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় উপকূল অঞ্চলে মুসলমানগণ বাস করছিলেন। মার্কোপোলা দেখতে পান যে শ্রীলঙ্কার জনগণ প্রয়োজনবোধে বিদেশী বন্দর থেকে মুসলমান সৈন্য সংগ্রহ করতেন। আবুল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১) কৌলমের চমৎকার মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা (চতুর্দশ শতক) ক্যাম্বে থেকে পশ্চিম উপকূল ধরে তাঁর ভ্রমণ পথে সকল বন্দরে অবতরণ করেন। সকল স্থানেই তিনি তাঁর সমধর্মাবলম্বীদের দেখতে পান। তিনি তাদের সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় দেখেন। মুসলিম রাজ সভাসদগণ কন্দবার-এ এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। কোঙ্কতে তিনি খিযর ও ইলিয়াস কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত প্রাচীন মসজিদ দেখতে পান। তাদের শেখ সহ হায়দরী ফকীরদের একটি দলের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সেন্দাপুর-এ হিনৌর-এর (ওনোর) শাসক সুলতান জামাল উদ্দীন মোহাম্মদ অলহিনৌরীর পিতা ও নাবিকদের পৃষ্ঠপোষক হাসান বাগদাদী রীতিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ওনোরে একজন মুসলিম শাসক, একজন মুসলিম জুরী ও কাযী এবং একজন মুসলিম দরবেশ ছিলেন। সেন্দবৌর থেকে কৌলম পর্যন্ত সমগ্র মালাবার উপকূলে, পথি মধ্যেকার সকল বিরামস্থলে মুসলমানদের বাড়ি ছিল। সেখানে তাদের সমধর্মীরা বাস করতে পারতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। বরচেলোর, ফচনৌর (বচ্চনৌর) প্রভৃতি স্থানে কাযী ও মুফতীসহ মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করতেন। ম্যাঙ্গালোর-এ চার হাজার মুসলমান বাস করতেন, তাদের মধ্যে ফারস ও ইয়েমেন-এর বণিকরাও ছিলেন। তাদের মসজিদের প্রভূত ধন-সম্পদ ছিল এবং মসজিদে বেশ কজন শিক্ষার্থী ও আশ্রিত ছিল। ফত্তন ত্রয়েরই মসজিদ ছিল এবং ফন্দরিন-এ মুসলমানগণের যে তিনটি আবাসিক গৃহ ছিল তাদের প্রতিটিতেই উপাসনার স্থান ছিল। কালিকট-এর প্রধান বণিক বহরইন-এর ইবরাহীম শাহ বন্দের ছিলেন মুসলমান। কৌলম-এ বহু মুসলমান বণিক ছিলেন। সেখানে বেশ কয়েকটি মসজিদ ছিল এবং

www.pathagar.com

সেখানকার প্রধান মসজিদটি ছিল স্থাপত্যগুণে প্রশংসনীয়। রাজাও মুসলমানদের সমীহ করতেন। আবদুর রাযযাক (১৪৪২) পর্তুগীজদের আগমনের প্রাক্কালে ভারত ভ্রমণ করেন। কালিকট সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখানে যথেষ্ট সংখ্যক স্থায়ী মুসলমান অধিবাসী রয়েছেন। এখানে তাঁরা দুটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। প্রতি শুক্রবারে নামায পড়ার জন্য তাঁরা মসজিদে মিলিত হন।' এ বন্দরের ব্যস্ততা ও পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে আগত বণিকদের সম্পর্কে তিনি প্রশংসাসূচক বিবরণ দিয়েছেন।

এসব বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলমানরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন, এবং সেখানেই সংখ্যায়, সম্পদে ও দক্ষতায় তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। একথা সত্য যে, নবম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণকারী সুলাইমান জানান যে, তিনি মুসলমান বা আরবী ভাষী কাউকে সেখানে দেখতে পাননি। কিন্তু তার এ বিবৃতি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সিন্ধু, গুজরাট বা ক্যাম্বে উপসাগর অঞ্চলে তিনি আরবদের সহায়-সম্পদ বা তার স্বদেশবাসী বণিকরা যে বিপুল বাণিজ্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা তিনি দেখতে পাননি। কেননা র‍্যানু (Reinaud)-র মতো অনুসারে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল চীন যাওয়া এবং চারদিকে চেয়ে ভারতীয় উপকূলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না। কেরলপট্টিতে রক্ষিত তথ্যাবলী, মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী, উৎকীর্ণলিপি, মুসলিম ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকদের বিবরণ, প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সাথে আরবদেশের ক্রমাগত বাণিজ্য—এসব থেকে একটিই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মুসলমানগণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেন এবং শীঘ্রই মালাবারের হিন্দু শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হন।

পূর্ব উপকূলেও আরবগণ বহু পূর্বে আগমন করেন। দরিয়ুস (৫১৯-৪৮৪ খ্রিঃ পূঃ) যখন ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর প্রণালীসমূহ বেঁধে দেন ও মিশরীয় বাণিজ্যকে ধ্বংস করেন তখন ইয়েমেনের বণিকগণ দুই-এরই উত্তরাধিকার লাভ করেন। খৃস্টীয় গণনায় প্রথম দিককার শতকসমূহে আরব ও ইহুদীরা শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতে বসতিস্থাপন করেন। গ্রিস ও রোমকরা পূর্ব উপকূলের সাথে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য করতেন। কোয়েম্বাতে-এ রোমক সম্রাটদের প্রচুর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কলখই বা আধুনিক কয়ল সম্পর্কে গ্রিকরা অবহিত ছিলেন। টলেমি চোলদের প্রাচীন রাজধানী উরইয়ুর-এর উল্লেখ করেছেন। গ্রিক ও রোমকদের নৌযানসমূহ অধিকাংশতই আরবদের দ্বারা পরিচালিত হতো। আরব বণিকগণ চীন যাওয়ার পথে

www.pathagar.com

করোমণ্ডেল উপকূল হয়ে যেতেন। ক্যান্টনে প্রাক-মুসলিম আরবদের নিদর্শন এখনো দেখা যায়। কাস্ট-এর মতো অনুসারে 'নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইয়েমেন ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমাগত বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

মুসলমানগণ প্রাচীন আরবদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। আরবের বন্দরসমূহ বা পারস্য উপসাগর থেকে চীন যাবার সচরাচর পথ ছিল সাত সমুদ্র হয়ে। এই সাত সমুদ্রের মধ্যে ছিল পক উপসাগর ও বঙ্গোপসাগর। আরবরা এদের বলতেন শেলহথ বা কলহবর ও কেরদেনজ। নবম শতকে সুলায়মান ও আবু যইদ এবং দশম শতকের প্রথম দিকে মাসুদী এই জলপথ ও সেখানকার সামুদ্রিক ঘটনাবলী এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন এসব সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা অন্তরঙ্গভাবে অবহিত। এই পথ ধরে অগণিত অভিযান পরিচালিত হয়ে থাকবে এবং মুসলিম দেশসমূহ ও ভারতের মধ্যে ক্রমাগতভাবে বিপুল বাণিজ্যিক যোগাযোগ সাধিত হয়ে থাকবে, কেননা অষ্টম শতকেই ক্যান্টনে বহু মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়েছিল। ৭৫৮ খৃস্টাব্দে তাদের বিদ্রোহ যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

পূর্ব উপকূলের প্রধান বসতি তাম্রপণী নদীর মোহনার সন্নিকটে তিন্নেবেল্লি জেলার কয়লপট্টনম-এ অবস্থিত ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে লব্বেগণ এখনো সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কড়ওয়েল সেখানে মৃৎকর্মের প্রচুর ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করেছেন এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, সেখানে তিনি সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ খৃস্টীয় শতকের মুসলিম মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন।

মুসলমানগণ কিছু সংখ্যায় বসতি স্থাপনের পরপরই তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেছেন। দক্ষিণ ভারতের অনেক ইসলামী সম্প্রদায় সেই সময় থেকেই তাদের সূচনা বলে উল্লেখ করেন। মাদুরা ও ত্রিচিনোপোলির রবুওনগণ মনে করেন যে, নথদ বলি তাদের ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপারে প্রণোদিত করেন। ত্রিচিনোপোলিতে নথদ বলির সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে। সেখানে তার মৃত্যু সাল ৪১৭ হিজরী (১০৩৯ খৃস্টাব্দ) বলে উৎকীর্ণ রয়েছে। নথদ সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, তিনি সৈয়দ বংশীয় যুবরাজ ছিলেন। তুরস্কে তার রাজ্য ছিল। কিন্তু রাজ্যত্যাগী তাপসরূপে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। আরব, পারস্য ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করে তিনি ত্রিসূর বা আধুনিক ত্রিচিনোপোলি নগরে উপনীত হন এবং সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে জীবনের অবশিষ্ট সময় তিনি প্রার্থনা, দান ও বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে অতিবাহিত করেন। সৈয়দ ইবরাহীম শহীদ ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী। ১১৬২ খৃস্টাব্দের

www.pathagar.com

দিকে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি পান্দ্যয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে এক জঙ্গী অভিযান পরিচালনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি পান্দিয়া রাজাকে পরাজিত করে বার বছরের উপর রাজত্ব করেন। কিন্তু অবশেষে তিনি রাজচ্যুত ও নিহত হন। এরবাদীতে তার সমাধি আছে। দুদেকুলগণ জানান যে, পেন্নুকোন্ড-এর দরবেশ বাবা ফখর উদ্দীন-এর কাছে তাঁরা ধর্মান্তরিত হন। তিনি নযদ বলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পেন্নুকোন্ড-এর রাজাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। থারসটন-এর মত অনুযায়ী ৫৬৪ হিজরী সালে তিনি মারা যান।

মালিক উল মুল্‌ক-এর নেতৃত্বে ১০৫০ খৃস্টাব্দে মুসলমানগণ মাদুরায় প্রবেশ করেন। মালিক উল মুল্‌ক-এর সাথে ছিলেন বিখ্যাত দরবেশ হযরত আলীয়ার শাহ সাহিব। মাদুরার হুজুর কাচেরীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। গোরিপলেইয়ন গ্রামে একটি মসজিদ আছে। একাদশ বা দ্বাদশ শতকে এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কুন পাণ্ডা ছয়টি গ্রাম দান করেন। বিরপন্না নায়কন-এর আমলে এ দান সম্পর্কে তদন্ত হয় এবং ১৫৭৩ খৃস্টাব্দে তা অনুমোদন লাভ করে।

পূর্ব উপকূলের শাসকগণ বণিকদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের যে বিশেষ বিধি মোতাবেক আবহাওয়ার দুর্যোগে কোনো জলযান তীরে ঠেকে গেলে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হতো, পূর্ব উপকূলে তা পালিত হতো না এবং নিয়মিত বাণিজ্য শুল্ক (কূপশুল্ক) বা বহিঃশুল্ক ব্যতীত সকল প্রকার বন্দরকর সেখানে প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সে অঞ্চলে ব্যাপক বাণিজ্যকর্মের সূত্রপাত হয় ও শাসকদের বিশেষ সংরক্ষণমূলক নীতির ফলে ব্যাপক বাণিজ্যিক স্থাপনার পত্তন হয়।

কোরোমণ্ডেল উপকূল মুসলিম বণিকদের মাবর বা পথে পরিণত হয়। ওয়াসসাফ-এর মতানুসারে তা কৌলম থেকে নিলওয়ার (নেল্লোর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে দেশের ভাষায় রাজাকে বলা হয় দেওয়ার, যার অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যের প্রভু। চীন ও মাচীন-এর দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী এবং হিন্দ ও সিন্দ-এর উৎপন্ন দ্রব্য বোঝাই করে জাংক নামক বৃহৎ জাহাজসমূহ সর্বদাই সেখানে ভিড়ত। পারস্য উপসাগরের দ্বীপসমূহের সম্পদ এবং ইরাক, খোরাসানসহ দূরবর্তী রুম ও ইউরোপের বাহারি ও অলংকরণ দ্রব্যাদি আসতো মাবর থেকে। মাবর ছিল হিন্দের প্রবেশপথ স্বরূপ।

দ্বাদশ শতকে মুসলমানগণ এতদঞ্চলে সম্প্রদায়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে বলে মনে হয়। কেননা, দেখা যায় যে, বৈশ্যদের

www.pathagar.com

মতো তারাও ১১৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্য রাজ্য বিজয়ী সিংহলী সেনাপতিকে উপহার প্রদান করেছিল।

ত্রয়োদশ শতকে ব্যবসা, বিশেষত ঘোড়ার ব্যবসা এত প্রসার লাভ করে যে, কিস-এর শাসক এবং পরে ফারসের মহা-অশ্বপাল মালিক উল ইসলাম, জামাল উদ্দীন কয়লে ব্যবসায়িক প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। ওয়াসসাফ-এর মতো অনুসারে ফারস থেকে মাবর ও ভারতীয় বন্দরসমূহে বার্ষিক দশ হাজার ঘোড়া রপ্তানি করা হতো। এর মূল্য ছিল ২,২০০,০০০ দিনার। জামাল উদ্দীনের ভাই তকীউদ্দীন আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ উল তিবি ছিলেন ব্যবসায়িক প্রতিনিধি। কয়ল ছাড়া ফিতন ও মালী ফিতন বন্দর এঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

রশীদ উদ্দীনের মতে, ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্য শাসকের মৃত্যুতে জামাল উদ্দীন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁর ভাই হন তাঁর সেনাপতি। নেলসন এ সময়ে মুসলমানদের মাদুরা আক্রমণ সম্পর্কে প্রচলিত অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। মার্কোপোলো তকীউদ্দীনকে রাজা সুন্দর পাণ্ড্যার উপমন্ত্রী ও উপদেষ্টারূপে বর্ণনা করেন। তাঁর পুত্র সিরাজউদ্দীন এবং পৌত্র নিযাম উদ্দীনও একই পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। জামাল উদ্দীনের পুত্র ফখর উদ্দীন ছিলেন কুবলাই খাঁর দরবারে (১২৮৬ বা ১২৮৭ সালে) পাণ্ড্য দূত। তিনি চার বছর চীনে অবস্থান করেন এবং সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে দেহত্যাগ করেন। তাঁর চাচার সমাধির পাশে তাঁর সমাধিও বিদ্যমান।

তামিল অঞ্চলে আরো মুসলিম বসতি ছিল। মালিক কাফূর সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে আমীর খসরু কন্দুর (কান্নানুর) বাসী মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তারা যেহেতু কালেমা আওড়াতে পারতো এবং যদিও তারা মৃত্যুদণ্ড ভোগের যোগ্য ছিল, তথাপি মুসলমান হওয়ার জন্য তাদের ক্ষমা করা হয়।' ইবনে বতুতা আক্রমণ পরবর্তীকালে এসব অঞ্চল ভ্রমণ করে জানান যে, তাঁর সময়ে গিয়াস উদ্দীন আল দমঘানী ছিলেন মাদুরার শাসক ; রাজা বীর বল্লাল-এর ২০,০০০ মুসলমান সৈন্যের এক বাহিনী ছিল এবং হোনওয়র-এর মুসলিম শাসক তাঁর প্রতিনিধি হরিয়াপ্পা ওদয়র-এর প্রতি আনুগত্য পোষণ করতেন।

এভাবে দক্ষিণ ভারতে মালিক কাফূরের সৈন্যদল পৌঁছানোর পূর্বেই মুসলমানগণ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের চারপাশে বসবাসকারী জনগণের সাথে সম্পর্ক রচনায় সমর্থ হয়। আরব ও তামিলদের এ সংযোগের ফলে রবুর্তন ও লব্বে-র মতো বেশ কয়েকটি সঙ্কর গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী বিবরণসমূহে দেখা যায় যে, আরো পূর্বে না হলেও অন্তত অষ্টম শতকে মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে আগমন করে। তারা পূর্ব উপকূলে আসে দশম শতকে। শীঘ্রই তারা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ে রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। একদিকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্ত্রী, নৌ-সেনাপতি, দূত প্রভৃতি পদ লাভ করেন ও লাভজনক কৃষিকার্যে নিয়োজিত হন। অন্যদিকে তারা অনেককে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন, নিজস্ব ধর্মচিন্তা প্রচার করেন, মসজিদ ও সমাধি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। মসজিদ ও সমাধি স্তম্ভসমূহ দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃত ঘটনার উপর অতিরিক্ত জোর না দিয়েও একথা বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের বিকাশে সপ্তম শতকের পর থেকে যদি কোনো বিদেশী উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যাকে হিন্দু ধর্মের স্বাভাবিক পরিবৃদ্ধির ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে তা ইসলামের প্রভাবের ফলে ঘটার সম্ভাবনাই অত্যধিক এবং এ নিরিখে তা ইসলামের অবদান বলে গণ্য হতে পারে। অবশ্য তা ইসলামের প্রাণবস্তুর বহির্ভূত কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের উপর খৃস্টীয় প্রভাবের কথা আসতে পারে না, কেননা যদি কোনো খৃস্টীয় প্রভাব সংক্রমিত হয়ে থাকে, তা হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, দক্ষিণ ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই। এটা পরিজ্ঞাত যে, দক্ষিণ ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে বন্ধ হয়ে যায় এবং তৃতীয় শতকের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া খৃস্টীয় প্রচারের কেন্দ্র পরিণত হতে পারেনি। কেননা, এ্যান্টোনাইন যুগে খৃস্টধর্মে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়। তখন খৃস্টসভা বা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হতো গোপনে। পরবর্তীকালে মিশর ও ভারতের মধ্যে যখন বাণিজ্য পুনরারম্ভ হয় এবং সিরিয়া ও পারস্য থেকে খৃস্টানগণ দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করতে থাকেন, তখন তাদের পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ, সম্প্রদায় হিসেবে তারা ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরিয়া, পারস্য ও মিশর মুসলমানদের দখলে চলে যায় এবং খৃস্টানগণ সেখানে তাদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। তাই যদি অষ্টম শতকে মালাবার উপকূলে তারা বসবাস করছিল, তথাপি 'হিন্দুধর্মের উপর খৃস্টধর্মের প্রভাব বিস্তার করার মতো কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিরাজিত ছিল না।

খলিফা ওমরের আমলে উত্তর ভারতে মুসলমানগণ তাদের অভিযান শুরু করে। উত্তর উপকূলের বন্দরসমূহের উপর সর্বপ্রথম অভিযান পরিচালিত

www.pathagar.com

হয়। পারস্য ও মাকরান তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হলে তারা সিন্ধু আক্রমণ করে। সপ্তম শতাব্দীতে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু সীমান্তে বহু আক্রমণ পরিচালিত হয় এবং স্থলপথে গমনাগমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চলে। পরিশেষে খলীফা ওয়ালীদের আমলে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ তরুণ ও সপ্রতিভ মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর নেতৃত্বে এক অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি সকল প্রকার বিপত্তি উত্তরণ করেন, সিন্ধুর হিন্দু শাসকদের পরাভূত করেন, সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন এবং মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানেই অবশ্য মুসলিম অগ্রাভিযান প্রতিহত হয় এবং পরবর্তী তিন শতাব্দী যাবত মুসলমানগণ ভারত বর্ষের এ প্রান্তেই অবস্থান করতে থাকে। এ সময়ে তাদের প্রভাববলয় তাদের শাসনাধীন সিন্ধু ও মুলতানের অন্তর্গত রাজ্যসমূহের উপর বিস্তৃত হয়। এছাড়া সিন্ধু, কাথিয়াওয়ার, গুজরাট ও কঙ্কনের উপকূলীয় নগরসমূহে তাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এসব নগরে মুসলমানগণ বণিকরূপে বসতিস্থাপন করেছিল। একাদশ শতক পর্যন্ত এ অঞ্চলের বাইরে পৌঁছার সুযোগ তারা পায়নি। অবশ্য উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে তারা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সম্ভবত তাদের কোনো কোনো দুঃসাহসী অধিনায়ক মালব ও কনৌজ পর্যন্ত আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। যাই হোক, দবুল, সোমনাথ, ব্রোচ, ক্যাম্বে, সিন্দন, চেউল প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম বসতি গড়ে উঠে এবং প্রায় প্রতি স্থানেই মসজিদ নির্মিত হয়। অধিকাংশ হিন্দু শাসকই তাঁদের রাজ্যে মুসলমানদের স্বাগত জানান ও তাদের প্রতি উষ্ণ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। মুসলমানদের প্রতি বলহার (গুজরাটের বলভী শাসক) যে সৌহার্দ প্রদর্শন করেন, তার জন্য সুলায়মান, মাসুদী, ইবনে হওকল, আবু যায়েদ প্রমুখ সকলেই তাঁর প্রশংসা করেন। সুলায়মান লেখেন, শাসকদের মধ্যে এমন কোনো রাজপুরুষ নেই, যিনি 'বলহার-এর চেয়ে আরবদের বেশি ভালবাসেন এবং তাঁর প্রজারাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থাকে। মাসুদী তাঁর সহধর্মীদের সর্বত্রই মুক্ত পরিবেশে তাদের ধর্মপালন করতে দেখেন। গুজরাটের রাজা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর রাজ্যে ইসলামকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করা হয়, রাজ্যের সর্বত্রই চমৎকার উপাসনালয় ও মসজিদ নির্মিত হয়, যেখানে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ে থাকে। আল ইসতখরী (৯৫১ খৃঃ) বলহারের রাজ্যের নগরসমূহে মুসলমানদের দেখতে পান এবং 'মুসলমানরাই বলহারের রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন।'

ইবনে হওকল (৯৬৮) ফমহল, সিন্দন, সাইমুর, কমবায়া প্রভৃতি স্থানে জামে মসজিদ দেখতে পান। একাদশ শতকে ইদ্রিসী জানান, 'বিপুল সংখ্যক

www.pathagar.com

মুসলমান বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে অনহিলওয়ারা নগরে যাতায়াত করতেন। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীগণ তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাতেন ও নিরাপত্তা বিধান করতেন।

গজনীর মাহমুদ-এর আক্রমণের ফলে মুসলমানদের প্রবেশের জন্য ভারতের তোরণ উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বেই পশ্চিম ভারতে তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু শাসকদের আনুকূল্য লাভ করে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত হন। মুহাম্মদ উফী তৎপ্রদত্ত বিবরণে হিন্দু রাজাবর্গ ও মুসলমান বণিকদের মধ্যেকার সম্পর্কের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। ক্যাম্বের হিন্দুরা মুসলমান বণিকদের আক্রমণ করলে সিন্ধুরাজ (১০৯৪-১১৪৩) সমগ্র ঘটনার তদন্তের ব্যবস্থা করেন, আক্রমণকারীদের শাস্তি দেন ও একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের অর্থ প্রদান করেন। কোনো কোনো হিন্দু রাজা বেতনভোগী মুসলমান সৈনিকদের নিযুক্ত করেন বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোমনাথের রাজা বেশ কিছু মুসলমান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। এবং আহমদাবাদের কসবাতীরা নিজেদের পূর্বপুরুষরূপে বাঘেলা প্রধানদের দ্বারা নিয়োজিত খোরাসানী সৈন্যদের কথা উল্লেখ করেন।

যেখানেই মুসলমান সৈন্যরা অভিযান পরিচালনা করেছে বা বণিকরা বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা উপস্থিত হয়েছেন। নবম শতকে সন্ত আবু হিফস রাব্বী বিন সাহিব আল আসাদি আল বসরী সিন্ধুতে আগমন করেন। সেখানে ১৬০ হিজরী সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। দশম শতকে মনসুর আল হাল্লাজ সমুদ্র পথে ভারতে আসেন এবং স্থলপথে উত্তর ভারত ও তুর্কিস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সহযাত্রী দরবেশদের সাথে নিয়ে বাবা বীহান বাগদাদ থেকে ব্রোচ উপনীত হন। কথিত আছে, তিনি এক রাজপুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি তাঁর পিতাকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হন। প্রায় একই সময়ে (১০৬৭) শীয়া বোহরা বণিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ইয়েমেন থেকে গুজরাট এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এবং নূর আল দীন বা নূর সতাগর (১০৯৪-১১৪৩) গুজরাটের কুম্ভী, খারওয়া ও কোরীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

মাহমুদের আক্রমণসমূহের পর বিপুল সংখ্যক মুসলমান পণ্ডিত ও ধর্মবিদ ভারতে এসে উপনীত হন। এঁদের সবার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নয়, তবে কয়েকজন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থ প্রণেতা আলী বিন ওসমান আল হুজউইরী। তিনি ছিলেন গজনীবাসী। মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপক ভ্রমণের পর তিনি লাহোরে বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ৪৬৫ বা ৪৬৯ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন। একাদশ শতকে শাইখ ইসমাঈল বুখারী ও বিখ্যাত 'মানতিক উত-তয়ির' ও 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থ প্রণেতা ফরীদ উদ্দীন আত্তার দ্বাদশ শতকে ভারত পরিদর্শন করেন। খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী ১১৯৭ সালে আজমীরে আগমন করেন এবং সেখানেই ১২৩৪ সালে পরলোক গমন করেন। ত্রয়োদশ শতকে শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দি (প্রাচ্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা)-এর শিষ্য শাইখ জামাল উদ্দীন তাবরীযী বঙ্গদেশ সফর করেন। ১২৪৪ সালে সাঈদ জালাল উদ্দীন বুখারী বাহাওয়ালপুর-এর উছ-এ এবং বাবা ফরীদ পাকপত্তন-এ বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী শতকে ইবনুল আরাবী-এর ভাষ্যকার সুফি দর্শনের উপর রচিত বিখ্যাত 'ইনসান-ই-কামিল' গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল করীম আল জীলী ভারত ভ্রমণ করেন (১৩৮৮) এবং সাঈদ মোহাম্মদ গিসূদরায পুনা ও বেলগাম জেলায় অনেককে ধর্মান্তরিত করেন। পঞ্চদশ শতকে খোজাহ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পীর সদর উদ্দীন মোমনহ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ ইউসুফ উদ্দীন এবং পীরান-এর ইমাম শাহ পঞ্চদশ শতকে ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ সন্ত, যাঁরা ভারতে ভ্রমণে আসেন বা ভারতে বসবাস করেন, তাঁরা হচ্ছেন কাদেরী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদির জিলানীর পুত্র সাঈদ শাহ মীর, দিল্লীতে সমাহিত এবং বিখ্যাত কুতুব মিনার-এর সাথে তাঁর নাম যুক্ত সেই কুতুব-উদ-দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (মৃত্যু ঃ ১২৬৬), মুলতান ও উছ-এ বসবাসকারী জালাল উদ্দীন সুরখপোশ (মৃত্যু ঃ ১২৯১), শত্তরীপন্থী ও সম্রাট হুমায়ুন-এর গুরু মুহম্মদ গওস (মৃত্যু ঃ ১৫৬২)। এঁরা ছাড়াও রয়েছে শাহ মাদার (একাদশ শতাব্দী), সখী সারওয়ার (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক) প্রমুখ দরবেশ।

বহু শীর্ষস্থানীয় মুসলিম ধর্মবিদ এবং তাঁদের সাথে তাঁদের চেয়ে কম খ্যাতিমান বহু ধর্মজ্ঞ ভারতে বাস করতেন, এবং ধর্মপ্রচার কাজ করতেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জনসংযোগ ও প্রভাবের মাধ্যমে ইসলামী দর্শন ও মরমিভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তার ফলাফল মূল্যায়ন করা হবে।–(পৃষ্ঠা ঃ ২১-৩১)

এসব তথ্য থেকে আমরা কি দেখছি? আদর্শ হিসাবে ইসলাম অমুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতনের বিরোধী। বরঞ্চ সবার সাথে ইনসাফ করার জন্য ইসলাম তাগিদ দেয়। তাই তো দেখা যায় অতীতে মুসলমানরা যেখানেই গেছে

www.pathagar.com

সেখানে অমুসলিম নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। যদি হয়েও থাকে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। যেমন ইহুদীদের ও শিবাজী উভয়ের সেনাবাহিনীতেই মুসলিম, হিন্দু সেনানায়ক মিশ্রিত ছিলেন। তা হলো কেন ? এজন্য যে তাঁদের ভিতরের দ্বন্দ্ব ছিল রাজনৈতিক—ধর্মীয় নয়।

মুসলমান শাসকরা উদার নৈতিক নীতি অবলম্বন করলেও, মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের পরে অন্য ধর্মাবলম্বীর শাসকরা মুসলমানদের সংগে অনৈতিক ব্যবহার করা শুরু করলেন। স্পেনে মুসলমান ও সেই সংগে ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করা হলো। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক সময় পর্যন্ত ইহুদীরা পাশ্চাত্যের হাতে গণহত্যার শিকার হলো। ইহুদীরা পরবর্তীতে মুসলিম এলাকা ফিলিস্তিন দখল করে মুসলমানদের উপর পশ্চিমাদের ব্যবহারের প্রতিশোধ নিল—উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। অথচ কে না জানে যে মুসলিম (স্পেন) তুর্কী সাম্রাজ্যে ইহুদীরা সম্মানের আসনে ছিল। এরপরে আধুনিক ইউরোপে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের উপর বর্বর ব্যবহার করা হলো। ভারত, চীন, ফিলিস্তিন, মায়ানমার, রাশিয়া ইত্যাদি দেশেও মুসলমানরা জুলুমের শিকার হলো। আফগানিস্তান, ইরাক দখল করে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে ক্রমাগত। ভারতে মুসলমানরা যে জুলুমের শিকার তা সম্পূর্ণ অনৈতিক। মুসলমানরা খণ্ড খণ্ড ভারতকে একত্র করেছিল—এক মহান আধুনিক ভারতকে সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে ভারতের পোশাক, ভাষা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সংগীত, ধর্মীয় ও সামাজিক উদারতায়, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। মোগল আমলে ভারত ছিল বিশ্বের একটি সুপার পাওয়ার, যার সাথে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক করতে পাশ্চাত্য ছিল উদগ্রীব। মুসলমানদের তৈরি তাজমহল, ভারতের স্থাপত্যকে করেছে বিশ্বখ্যাত। মুসলমানদের হাত থেকে ভারতকে পশ্চিমারা কেড়ে নিলে ভারত হয়ে পড়লো গরীব। আর সে পরাধীনতাকে রুখতে মুসলমানরা সেই ১৮৩০ সাল থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে। ১৮৫৭ সালে তাকে প্রচণ্ডতা দেয়। কত মুসলমান ঢাকা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত জান দিয়েছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। এমনকি নেতাজি সুভাস বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃহত্তম অংশই ছিল মুসলমান জওয়ানরা।

এতকিছু করেও মুসলমান আজ ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা শতকরা ১৫ ভাগ হলেও চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র এক ভাগও নয়। শুধু তাই নয়, তাদের জীবনের নিরাপত্তাই নেই। গুজরাট সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করেছে উগ্রপন্থী সংঘ পরিবারের নীল নকসা। আদভানীর রাজ্যে যা শুরু হয়েছে তা যদি অব্যাহত থাকে, ভারতে স্পেনের মত মুসলমান বিহীন হয়ে

www.pathagar.com

পড়বে। আর এটি একটি সত্য তথ্য যে ভারতীয় গোয়েন্দারা স্পেনে ও ইসরাঈলে ট্রেনিং করতে যায় কিভাবে দেশকে মুসলমান শূন্য করা যায় তা শিখতে।

তবে আশার কথাকে ভারতে উদার নৈতিক মানুষও বহু রয়েছে৷বরঞ্চ তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র, কট্টর গোষ্ঠী, একটি মাফিয়া চক্র কূটকৌশলে কলকাঠির নিয়ন্ত্রণে। ভারত যখন বুঝবে যে, তারা মুসলিম নিধন করে আত্মহত্যা করছে, তখন হয়তো পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। পনর কোটি ভারতীয় মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে কি ভারত তার প্রতিবেশী দেড়শ' কোটি মুসলমানদের নিকট গৃহীত হবে ? ভারতকে আবার চীনকে মোকাবিলা করতে হবে। আর মুসলিম সমর্থন ছাড়া ভারত চীনকে কোনোক্রমেই মোকাবিলায় সক্ষম নয়।

❐

www.pathagar.com

# কাঁদো, আরো কাঁদো ঃ কান্নায় ভিজছে গোটা দেশ

## –হর্ষ মান্‌দার

তীব্রতম বিভীষিকা আর আতংকের বিহ্বলতা তখন আমাকে বিবশ করে ফেলেছে। নারকীয় সন্ত্রাস এবং গণহত্যার দশদিন পরে মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত গুজরাত থেকে আমি ফিরছি।

আহমদাবাদে দাঙ্গার ছোবল থেকে যারা বেঁচে গেছে, সেই মৃত্যুতাড়িত মানুষদের ত্রাণ শিবিরের মধ্য দিয়ে যদি যান, ২৯টি শিবিরে ৫৩ হাজার নারী, পুরুষ আর শিশুর (এটা গুজরাতে গৈরিক সন্ত্রাস শুরু হওয়ার একেবারে প্রথম দিককার পরিসংখ্যান। পরবর্তীতে শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় লক্ষাধিক।) দলপাকানো নিদারুণ অস্তিত্ব চোখে পড়বে। অস্বাভাবিক আঘাতে প্রস্তরীভূত শোকবিহ্বল জনসমষ্টির বিকট প্রদর্শনী।

অকিঞ্চিৎকর ত্রাণ সামগ্রী, সম্বল বলতে পৃথিবীতে ওইটুকুই তাদের অবশিষ্ট আছে। শুকনো নেভা বাতির মতো চোখ। কেউ খুব অস্ফুটে কথা বলছে। অন্যরা ত্রাণ শিবিরের অনাত্মীয়, অনভ্যস্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার দৈনন্দিন কাজে খুব নীরবে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য একটু দুধ, বড়দের জন্য যা হোক কিছু একটু খাবার, আহতদের ক্ষতে আশা ভরসার প্রলেপ।

কিন্তু একবার এই ত্রাণ শিবিরের যে কোনো জায়গায় বসলে ওই ত্রস্ত মানুষগুলো কথা বলতে শুরু করবে। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে মনে হবে বিশাল এক ক্ষত মুখ থেকে রক্ত পুঁজের উদ্‌গীরণ। যে অবর্ণনীয় বিভীষিকা আর আতংকের কথা তাঁরা বলেন, তা এত তীব্রভাবে পীড়াদায়ক যে, মানুষের স্নায়ু সহ্য করতে পারে না।

গত শতাব্দীতে বিভিন্ন দাঙ্গায় এই দেশ লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হয়ে নারী আর শিশুদের উপরে নির্দয় বর্বরতার যা কিছু দেখেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত সশস্ত্র যুব বাহিনীর এবারের নৃশংসতা। এ পাশবিকতার কোনো নজির নেই।

যাকিছু দেখেছি আর শুনেছি তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ আমি লিখছি। আদতে নিজেকেই নিজে বাধ্য করছি সেই অসহনীয় নরক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা কিছুটা লিপিবদ্ধ করতে। কেননা অন্তত কিছু মানুষকে তা জানাতেই হবে। কিংবা এও হতে পারে যে, আমি সেইসব স্নায়ুবিদারক পাশবিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ গ্লানি আর বেদনার বোঝাটা একা বহন করতে সত্যিই অক্ষম।

www.pathagar.com

## জঠর চিড়লো গর্ভবতীর

৮ মাসের পূর্ণ গর্ভবতী সেই আসন্ন-প্রসবা মায়ের আর্তি আপনি বিশ্বস্ততার সাথে কীভাবে অন্যের বোধিতে ঢোকাতে পারেন, যে মা তাঁর সন্তানের জন্ম দিতে চেয়ে পৃথিবী কাঁপানো আর্তনাদে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল ? হ্যাঁ, দুটো প্রাণের ভিক্ষা ! পরিবর্তে যাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, তারা সেই গর্ভবতী জননীর পেট চিরে বের করে এনেছিল গর্ভস্থ সন্তান। পরিপূর্ণ অবয়বের মনুষ্য শিশুকে। আর কী আশ্চর্য, তখনও সেই আদিম ভয়াল, শল্যবিদদের অস্ত্রের অহমিকা এড়িয়ে সেই শিশুর দেহে প্রাণ ছিল, যেন শুধু পৃথিবীর চেয়ে নিরাপদ, সুরক্ষিত গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে সূর্যের মুখ দেখার জন্যই সেই মরণজয়ী শিশুর বেঁচে থাকা। আকাশ আর পাতাল-ছোঁয়া যন্ত্রণায় জীবন মৃত্যুর মাঝে দুলতে থাকা অপরিমেয় রক্তক্ষরণে পাণ্ডুর জননী তখনও জীবিত ছিল সন্তানকে বাঁচানোর জন্য সিংহীর মতো ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের নিষ্ফল চেষ্টা। কেননা ছিন্ন জরায়ু আর উদরের মধ্যেকার পাকস্থলী, অন্ত্র, বৃক্ক, নাড়িভুড়িসহ সবকিছু তখন ধুলো মাটিতে মেশামেশি। ক্রমশ বুজে আসা অক্ষপল্লবের বোরকা দিয়ে শিশুর মুখ দেখেছিল। নরকের মাঝখানে আহ্লাদিত সব পাশব চিৎকারের মধ্যে শুনেছিল শিশুর প্রথম ক্রন্দন। এত কিছুর পরেও সেই ভুলণ্ঠিতা জননীর ভাগ্য অবশ্যই সুপ্রসন্ন ছিল—কেননা, চোখ বোজার পরেই ধারালো ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়েছিল সেই শিশুর কচি হৃৎপণ্ডি। তাতেও শান্তি নেই, তলোয়ারের এক কোপে সেই শিশুকে দ্বিখণ্ডিত করতে ভুলেননি সশস্ত্র যুববাহিনী।

## বিদ্যুতের ছোবল, বলি ১৯

স্থিরমস্তিষ্কে খুবই পরিকল্পিত এই পদ্ধতির কথা সুস্থ মনের মানুষ কীভাবে চিন্তা করবে—যেখানে প্রথমে ১৯ জনের পরিবারকে তাদেরই ঘরের উঠোনে অবরুদ্ধ করে, হোস পাইপের তীব্র স্রোতধারায় হাঁটু অব্দি ডোবানো হলো। তারপর হাইটেনশন বিদ্যুৎ প্রবাহের চালানে সেই অবরুদ্ধ জলরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান, অজানা আতংকের ভয়ঙ্কর আঘাতে প্রস্তরবৎ নারী-শিশুসহ ১৯জনকে হত্যা করা হলো। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া মৃত্যু অভিযানের এ অভাবিত কৃৎকৌশল এত সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় কীভাবে ? এই প্রশ্নের মুখে মনুষ্যত্ব কত নিদারুণভাবে অসহায়, তার কোনো উত্তর নেই।

জুহাপাড়ার, ৬ বছরের সেই অভিব্যক্তিহীন পাথুরে চোখের ছেলেটির কথা শুনুন। যন্ত্রের মতো সেই নারকীয় হত্যার বর্ণনা, শুধুমাত্র লাঠি আর বন্দুকের বাঁটের আঘাতে তার মা আর ৬ ভাইবোনের হত্যাকাণ্ডের প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যপথে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার দরুন মৃত ভেবে যাকে ফেলে রেখে প্রমত্ত উল্লাসে ফিরে গিয়েছিল হত্যাকারীর দল।

www.pathagar.com

আহমদাবাদের সবচেয়ে উপদ্রুত বসতি অঞ্চলের অন্যতম, নারদাপাতিয়া থেকে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছোবল এড়িয়ে ত্রাণ শিবিরে আসা অপ্রকৃতিস্থ, অবিশ্বাসী পরিবারটির কাছে সেই যুবতী মেয়ে আর তার ৩ মাসের শিশুর পরিণতির কথা শুনুন। যে নাকি আজন্মলালিত বিশ্বাসে পুলিশকে রক্ষাকারী ভেবে তারই নির্দেশিত নিরাপদ স্থানের দিকে যেতে গিয়ে সোজা পৌঁছেছিল অপেক্ষমান ত্রিশূলধারীদের বেষ্টনীর মধ্যে। খুব দ্রুত কেরোসিন তেলের প্রস্রবনে অবগাহনের পর ৩ মাসের শিশুসহ সেই যুবতী-জননীকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করতে সময় লেগেছিল খুবই সামান্য।

## বর্বরতার পৈশাচিক রূপ

আমি এমন কোনো দাঙ্গার কথা জানি না, যেখানে দাঙ্গার হিংস্র হাতিয়ার হিসেবে অকল্পনীয় যৌন বর্বরতার অস্ত্রে অবিশ্বাস্য ব্যাপকতায় নারীদের ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত করে আমুল বিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাতের আকাশে এখনও ভয়াবহ আবিল প্রশ্বাসের পাশব-শব্দ আপনাকে সেই অন্তহীন বর্বরতার সন্ধান দেবে।

গুজরাতের দশদিক থেকে আসছে গণধর্ষণের অকল্পনীয় পাশবিক সন্ত্রাসের সংবাদ। কিশোরী বালিকা থেকে যুবতী নারীদের তাঁদেরই পরিবারের পুরুষদের সামনে ফেলে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ, আর ছুরি, ভোজালি কিংবা ত্রিশূলে বিদ্ধ থাকা বাবা, দাদা, দাদু, স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার মধ্যে গভীরতম আরেক যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ যন্ত্রণা। মৃত্যুরও তো কিছু সম্ভ্রমের দাবি থাকে। শবদেহে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়, নিজের জীবন আর বেঁচে থাকার আকুতি। অথচ গুজরাতের দাঙ্গার শবগন্ধী যৌনতা সেই অধিকারটুকু পর্যন্ত মৃত্যুপথযাত্রীর দেয়নি।

এদিকে কন্যা কিংবা পুত্রবধু, জায়া কিংবা জননীকে মাটিতে ফেলে ত্রিশূলধারীদের তীব্র চিৎকার, অন্যদিকে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ করে প্রতিরোধের নিষ্ফলা চেষ্টার পর গভীর অবসানের মাঝে অপেক্ষমান ধর্ষণকারীদের হাতুড়ির ঘায়ে স্বামী, পিতা কিংবা ভাইয়ের মাথার খুলি ফাটার স্নায়ু-বিদারক ভয়ঙ্কর শব্দ। অনেক ক্ষেত্রে পেট কিংবা মাথা স্ক্রু-ড্রাইভারে বিদ্ধ করে কুশলী প্রযুক্তিবিদদের মত যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকে নিংড়ে আনার প্রলম্বিত সফল চেষ্টা।

ত্রাণ শিবিরে, আমানচক থেকে বেঁচে ফিরে আসা মেয়েদের কাছে যদি যান আপনাকে শক্ত স্নায়ুর মানুষ হতে হবে। কেননা, সেই মহিলারা আপনাকে শোনাবে সেই অবিশ্বাস্য নিদারুণ ঘটনার কথা—যেখানে গণধর্ষণে

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের বিবস্ত্র রেখেই বিশ্রাম দেয়া হয়েছে। আতঙ্কে, চলৎ শক্তি রহিত যূথবদ্ধ জন্তুর মতো তাঁরা তখন দ্বিতীয় আঘাতের আশংকায় জড়োসড়ো জীবনান্ত মাংসস্তূপের মতো এক কোণে অপেক্ষমাণ। তাঁদের কাপড় দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর সভ্যতা এবং মনুষ্য অনুভূতির সবচেয়ে বড় উদ্দীপক লজ্জাকে কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানেই দলবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লীবত্ব আর অপরিমেয় বিকৃতির সশস্ত্র জানোয়ারেরা। নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। তারপর মাতৃসমাকে ধর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়সী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়সী সংঘী কুকুরের মতো রমণ করেছে কন্যাসম কিশোরীকে। মধ্যবয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে বালিকাকে প্রৌঢ়—পর্যায়ক্রমে চলেছে অবর্ণনীয় যৌনসন্ত্রাস।

একথাগুলো আপনাদের শুনতেই হবে। আপনি কানে হাত চেপে সেই অবসন্ন, রক্তক্ষরণে, ধর্ষণে ধ্বস্ত, মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মহার্ঘ উপকরণ, আব্রু কিংবা বসনভূষণ হারানো মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না।

## দাঙ্গা নয়, পরিকল্পিত সন্ত্রাস

আহমদাবাদে যাঁদের সাথে আমার দেখা হয়েছে সমাজকর্মী, সাংবাদিক, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফিরে আসা ত্রাণ শিবিরের মেয়ে-পুরুষ, সকলেরই নিশ্চিত ধারণা যে, গুজরাটে যা ঘটেছে তা কিছুতেই দাঙ্গা নয়। সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠিত বর্বরতা। সুসংবদ্ধ, পরিকল্পিত গণহত্যা, নিশ্ছিদ্র প্রস্তুতির অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা।

সকলের স্পষ্ট এবং দৃঢ় অভিমত—সর্বস্ব লুঠ করে অচিন্তীয় বর্বরতার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে, অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হচ্ছে। যে নৃশংসতা শুধুমাত্র বাইরের সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানেই চালানো হয়।

প্রথমেই ট্রাকে করে ভয়ঙ্কর প্ররোচনার বিস্ফোরক ঘোষণা করতে করতে এলাকা প্রদক্ষিণ করা। পেছনে আরও ট্রাক, তাতে উন্মত্ত হিংস্র সশস্ত্র যুব-বাহিনী। স্নায়ু বিদারক প্ররোচনায় যাদের আগে থেকেই মানবিক সব বিচারবোধকে ভোঁতা করে প্রস্তুত করা হয়েছে গণহত্যার অভিযানের জন্য।

প্রত্যেকের পরনে খাঁকি হাফ প্যান্ট। মাথায় বাঁধা গেরুয়া কাপড়ের হেডব্যাণ্ড, কিংবা কোমরে গামছার মতো বাঁধা গেরুয়া কাপড়। প্রত্যেকে অত্যাধুনিক বিস্ফোরক উপকরণ বহন করছে। দেশীয় অস্ত্র, ভোজালি, ছুরি, তলোয়ার আর ত্রিশূল। দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের ধকলে যাতে ক্লান্ত না হয়,

www.pathagar.com

তার জন্য প্রত্যেকের কাছে জলের বোতল। নেতাদের প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পোড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সদর দপ্তরে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের উল্লসিত ব্যস্ততা। নতুন অঞ্চলে আক্রমণের ঘনঘন নির্দেশ। নির্দেশ পালনের পর সমন্বয়-কেন্দ্রে ফলাফল, মৃতের সংখ্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুট, ধর্ষণের সংখ্যাতত্ত্বের বার্তা পাঠানো। সবকিছু আশ্চর্য নিয়মবদ্ধ সময়ানুবর্তিতায় গ্রন্থিত, যেমন আধুনিক সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে থাকে।

এদেরই সংগে কম্পিউটারে বিশ্লেষিত তালিকা, সম্প্রদায়গত সম্পত্তির সরকারী নথির কপি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী। তারাই চিহ্নিত করছে মুসলিমদের বাসস্থান, দোকানপাট, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো। তাদের কাছে এ সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাড়ি, ব্যবসার সুনির্দিষ্ট হদিস আছে। কোন্ হিন্দু রেস্টুরেন্ট মালিকের ব্যবসার অংশীদার মুসলিম, কোন্ মুসলিম বাড়ির পুত্রবধূ হিন্দু—হিন্দু মালিকদের যেন আর অংশীদারিত্বের বোঝা বহন করতে না হয়, মুসলিম বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার আগে হিন্দু-বউটিকে যাতে বার করে নেয়া হয়—ওই উন্মত্ততার মাঝেও সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক।

এটা কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের অভ্যুত্থান হতে পারে না। নিরঙ্কুশ সতর্কতায় গৃহীত গণহত্যার পরিকল্পনা ছাড়া এত হিসেবী হয় না হঠাৎ ক্রোধের উদগীরণ।

### গ্যাস সিলিণ্ডারে অগ্নিসংযোগ

ট্রাকে করে গ্যাস সিলিণ্ডার আনা হয়েছে। প্রথমে ধনী মুসলিমদের বাড়ি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি লুট করা হয়েছে নিঃশেষে। বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়েছে যাতে মূল্যবান কোনো কিছু না ভাঙে। অপচয় কিংবা নষ্ট না হয়। এমনকি দামী জামা-কাপড়, গয়না, ঘড়ি, জুতো পর্যন্ত খুলে বিবস্ত্র করা হয়েছে রোবটের মতো যান্ত্রিক নির্লিপ্ততায়। সব সারা হলে সিলিণ্ডারের গ্যাস রিলিজ করা হয়েছে বেশ কয়েক মিনিট ধরে। তারপর, বিশেষজ্ঞ খাঁকি প্যান্টরা আগুন লাগানোর কাজটা সেরেছে নিরাপদে। মুহূর্তে লেলিহান শিখা আর নিকষ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সুউচ্চ অট্টালিকা, দোকান, অফিস ঘরগুলো। বুক ফাটা আর্তনাদ, জ্বলন্ত মানুষের মাংস মজ্জা, শিরাতন্ত্র ও রক্ত পোড়ার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনে কার্যসিদ্ধির সেই বার্তা নিমেষে চলে গেছে গেরুয়াবাহিনীর সদর দপ্তরে।

www.pathagar.com

শহরের সব মসজিদ ও দরগাগুলি ভেঙে ধূলিসাৎ করে সেখানে হনুমান মূর্তি বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আহমদাবাদ শহরের ক্রসিংগুলিতে বেশ কিছু দরগা ছিল। রাতারাতি সেগুলি ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে, ইট-পাথর দিয়ে মুছে পিচ ঢেলে সেই ধ্বংসাবশেষকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে রাস্তার সাথে। এখন আর সেই দরগাগুলিকে চিহ্নিত করা তো দূরের কথা, পাকা অ্যাসফল্টের মসৃণ রাস্তায় কোনো কালে দরগা ছিল তা মনে হবার কোনো উপায়ই নেই।

### সন্ত্রাসের নেপথ্যে পুলিস

এই অকল্পনীয় সন্ত্রাসের নেপথ্যে রাজ্য প্রশাসন আর রাজ্য পুলিশের হৃদয়হীন সক্রিয়তার প্রসঙ্গটি এখন সবার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

জানা গেছে যে, পুলিসই প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের রক্ষা করার নামে সরাসরি দাঙ্গাবাজদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রতিটি লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণ আর গণহত্যা নির্বিঘ্নে সমাধা হবার গতিপথে পুলিসই ঢাল হিসেবে নিরাপত্তা দিয়েছে দাঙ্গাবাজ-সন্ত্রাসবাদীদের। মুসলিমদের, তাঁদের মধ্যে নারী আর শিশুদের আকুল আবেদনও অবিচলিত থেকেছে মূক বধিরের মতো।

বহু ঘটনা আছে সেখানে, পুলিস প্রাণভয়ে পালাতে থাকা সংখ্যালঘুদের গুলি করেছে। যাঁরা আবার হিংস্র এবং সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

যে বিশাল সংখ্যক গ্রেফতার হয়েছে, তাদের সিংহ ভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষ। তাঁরাই ছিল গণহত্যার প্রধান লক্ষ্য।

একজন যে নাকি ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে দু দশকের বেশি কাজ করছেন, পুলিস আর সাধারণ প্রশাসনে, তাঁরাই সমপদমর্যাদার সহকর্মীদের এই অবিচলিত নিষ্ক্রিয়তা আর ক্লীবত্ব, লজ্জায় আর অপরিসীম গ্লানিতে তাঁকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে।

অথচ এঁদের কারোরই মাথার উপরে রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিদের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকার আইনী বাধ্যবাধকতা ছিল না।

তাঁর আগেই রক্ষাবাহিনীকে দ্রুত সংগঠিত করে ক্রমশ বাড়তে থাকা বর্বরতার বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যেত। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভিয়ে ফেলা যেত উন্মত্ত হিংসার আগুন। সংগঠিত হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচানো যেত অসহায় নারী আর শিশুদের।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতাদের অভিসন্ধি যাই থাক, আইনের নির্দেশ ছিল নিরপেক্ষভাবে, অকুতোভয়ে পক্ষপাতহীন নির্দেশাত্মক সাহস আর সহমর্মিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের। এমনকি যদি আহমদাবাদে একজনও এমন করতো, আইনের নির্দেশ মেনে পুলিস বাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থেকে সেনাবাহিনীকে তলব করে এই হিংসা বন্ধের এবং আক্রান্ত মানুষদের রক্ষা করার তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করে বলতো—এক্ষুণি থামাও এসব, দাঙ্গার আগুন নিভে যেত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

আঞ্চলিক পুলিস আর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছাড়া কোনো দাঙ্গার আগুনই কয়েক ঘণ্টার বেশি জ্বলতে পারে না।

অথচ গুজরাতে পুলিস আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হাতেই এখন খুন হওয়া নিরপরাধ কয়কশো মানুষের রক্তের দাগ। এবং তাদের আশ্চর্য নীরবতার চক্রান্তে শামিল হবার দায়ে এদেশের উচ্চতর আমলা বাহিনীর হাতও সমানভাবে কলুষিত।

## ব্যর্থতা প্রশাসনেরই

এই হৃদয়বিদারক হিংস্রতায় যুক্ত থাকার জন্য অনেক পদস্থ পুলিস অফিসারকেই পুলিস বাহিনীর অধস্তনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে দায়ী করতে শুনেছি। এত নিম্নস্তরের অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না।

সুতরাং ব্যর্থতাটা নিশ্চিতভাবেই পুলিস বাহিনী আর প্রশাসনের নেতৃত্বের নিচের তলার সেই অধস্তন উর্দিধারী পুরুষ কিংবা মহিলা রক্ষী বাহিনীর নয়, তাদের উপর তলার আদেশ পালন করার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা হয়েছে।

## গান্ধীবাদীরা কোথায় ছিলেন

এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা, অন্যায় আর মানবিকাতার অপরিমেয় লাঞ্ছনার সময় সেই নাগরিক সমাজ কোথায় ছিল ? কোথায় ছিল শান্তি আর অহিংসার প্রচারক গান্ধীবাদীরা ? কোথায় ছিল উন্নয়ন কর্মী, এনজিও-রা ? কোথায় ছিল পৌরাণিক গল্প কথার মানবপ্রেমী অহিংস, নিরামিষাশী, গুজরাটি লোকহিতবাদীরা, যাঁদের মহানুভবতার কথা কচ্ছ আর আহমদাবাদের ভূমিকম্পের পরে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল জনপ্রিয় উপকথার মতো ?

সংবাদপত্র খবর করেছে—গণহত্যার ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে শুধুমাত্র নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার অজুহাতে সবরমতি আশ্রমের মজবুত গেটটাও

www.pathagar.com

তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল ভেতর থেকে। অথচ উন্মত্ত হত্যা, ধর্ষণ আর নির্বিচার অগ্নিকাণ্ডের দিনগুলিতে তাড়া খাওয়া সংখ্যালঘুদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ অভয়াশ্রম হতে পারতো এ সবরমতিই।

কোন্ গান্ধীবাদী নেতা, এনজিও-ম্যানেজার সেই উন্মত্ত মৃত্যু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ?

## সরকারী সাহায্য নেই ত্রাণ শিবিরে

এই দেশের নাগরিক হিসেবে আর এক অসহনীয় লজ্জা, অপরাধ এবং গ্লানির বোঝা আমাদের ন্যুজ কাঁধে বহন করতে হবে।

আহমদাবাদ দাঙ্গার সব হারানো মুসলিম সম্প্রদায়ের ছিন্নমূল মানুষদের ত্রাণ শিবিরের সবকটাই চালাচ্ছে মুসলিম সংগঠনগুলো। যে অন্তহীন বেদনা, সব হারানোর সীমাহীন উদ্বেগ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা আর অন্যায়ের ভয়ঙ্কর পীড়নে মুসলিম জনগণ পীড়িত হয়েছে সেসব হৃদয় নিংড়ানো ব্যথায় সমব্যথী শুধু অন্য মুসলিমরাই। আর আমাদের কোনো দায় নেই। সেই যন্ত্রণা লাঘবে, ক্ষত নিরাময়ে, ধ্বস্ত জীবনের পুনর্নির্মাণে সেই অসহনীয় অপরাধে অনুতপ্ত হওয়ার! যেন এক আশ্চর্য নির্বিকল্প ক্লীবত্বের সুরঙ্গে সরীসৃপের মতো আমাদের তৃপ্ত জীবনের বাস।

একটা রাজ্যের আক্রান্ত সম্প্রদায়ের জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তার দায় প্রধানত রাষ্ট্রের সরকারের। অথচ ২৯টি অস্থায়ী শিবিরের কোনো একটাতে গিয়েও আপনি সরকারের ন্যূনতম অস্তিত্ব টের পাবেন না। গুজরাত সরকার কোথাও কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা কিংবা শুধু খুন কিংবা জ্যান্ত পুড়ে মরা পিতামাতার অনাথ শিশুদের জন্য দু' বেলা দু' ফোটা দুধের ব্যবস্থাও করেনি। এক বস্তা গম কী চালও দেয়নি ৫৩ হাজার অরক্ষিত স্বজন হারানো আতঙ্কে সিঁকটে থাকা ছিন্নমূল মানুষদের জন্য—যারা একটু নিরাপত্তার খোঁজে শুধু বেঁচে থাকার ভরসাটুকু পাবার জন্য এ ত্রাণ শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন।

## অনুভূতিতে জীবনের জয়গান

এই ভয়াবহ নৈরাজ্যের নরক পরিক্রমায় আমার মানুষ হিসেবে গর্বিত আর আশবাদী হবার মতো একমাত্র অভিজ্ঞতা হলো—আমি মজীদ আহমদের মতো মানুষ আর রোশন বহেনের মতো জন্ম-জননীকে দেখেছি। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ঘুরে সুগভীর মানবিকতার ক্লান্তিহীন, ছেদহীন তাড়নায় এঁরা অহোরাত্র কাজ করে চলেছেন। চারিদিকে পোঁড়া মাটি আর রক্তক্ষরণের

www.pathagar.com

চিহ্ন। চারিদিকে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী ধ্বংসের ইতস্তত ভগ্নস্তুপ। অথচ এঁদের অনুভূতিতে শুধুই জীবনের জয়গান। মনুষ্যত্বকে এত তীব্র, সনিষ্ঠ অথচ মগ্ন বিভঙ্গে আমি কখনও দেখিনি। আমনচকের ত্রাণ শিবিরের আশ্রিতারা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে যে, স্বেচ্ছাচারী বাহিনীর তরুণ সদস্যদের তাঁরা প্রত্যেকেই ভোর চারটের সময় উঠে রাত এগারটার পর শুতে যান। যেন কোনো শিশুই ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে না পড়ে। যেন প্রতিটি দুধের শিশু দুধ পায় দু' ফোটা। যেন প্রতিটি ক্ষতে পড়ে নিরাময়ের প্রলেপ।

এঁদের নেতা মজীদ আহমদ একজন স্নাতক। একটা ছোট কেমিক্যাল ডাইস ফ্যাক্টরি ছিল তাঁর। সেটা এখন ছাইয়ের গাদা। কিন্তু নিজের সর্বস্ব হারানো নিয়ে তাঁর এখন হা-হুতাশ করার সময় নেই। কারণ এখন প্রতিনিধি সকালে ১৬০০ কেজি চাল অথবা গম যাই হোক, তাঁকে যোগাড় করতেই হবে। ৫০০ মানুষ এ শিবিরে আছেন। তাঁদের পেট ভরাবার জন্য এটা চাই-ই।

এ চ্যালেঞ্জটা রোশন বহেনের কাছে আরও কঠিন। বয়স ৬০। জুহাপাড়ার ক্যাম্পে ছিন্নমূল মানুষ আর মেয়েরা এসে তাঁদের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে বসলে প্রতিবার রোশন বহেনের চোখ জলে ভরে যায়। হাতের উলটোপিঠ দিয়ে জল মোছেন, আবার উঠে দাঁড়ান। ক্রোধ কিংবা শোকে বিলাপ করার মতো বিলাসী সময় তাঁর মোটেই নেই। কার্যত কোনো রাতেই রোশন বহেন চোখের পাতা এক করতে পারেন না।

তাঁর স্বেচ্ছাসেবীরা মূলত শ্রমজীবী মুসলিম মহিলা আর পুরুষ, ক্যাম্পের কাছে দুস্থতার চিহ্নমাখা বস্তিতে তাঁদের বাস। তাঁরাই মেয়েদের স্নানের ঘর, প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য নিজেদের বস্তিটা ছেড়ে দিয়েছেন।

সামান্য পেট ভরাবার মতো খাবার আর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত সান্ত্বনায় তাঁরা বুকে টেনে নিয়েছেন এ প্রাইমারী স্কুলে জড়ো হওয়া কয়েকশো শরণার্থীকে।

## পাশবিকতাকে বৈধতা দিতে নিউটনের সূত্র

এইসব ক্যাম্পের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে আমি মনে মনে উত্তর খুঁজি— এমন একটা অন্ধকার মুহূর্তে বেঁচে থাকলে গান্ধীজী কী করতেন ?

কলকাতা রায়টের সেই ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে। গান্ধীজী তখন শান্তির জন্য অনশন করছেন। একজন হিন্দু পিতা তাঁর কাছে এসে জানালেন যে, তাঁর কিশোর ছেলেকে মুসলিমদের এক উন্মত্ত জনতা হত্যা করেছে। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ পিতা তাঁর প্রতিশোধ নিতে চায়। শোনা যায় যে, গান্ধীজী

www.pathagar.com

পুত্রশোকে অন্ধ সেই পিতাকে বলেছিলেন—যদি সত্যিই তুমি এই যন্ত্রণা ভুলতে চাও, এমন একটি ছেলেকে খুঁজে বের করো, যে তোমারই সন্তানের বয়সী একটি মুসলিম ছেলে যার পিতামাতা খুন হয়েছে হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে। নিজের সন্তানের মতো স্নেহ মমতায় বড় করে তোলো সেই ছেলেকে। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে সে জন্মেছে, সেই মুসলিম বিশ্বাস নিয়েই তাঁকে বড় হতে দাও। তাহলেই তুমি পুত্রশোক থেকে, ক্রোধ, প্রতিশোধের তীব্র দাহ থেকে মুক্তি পাবে।

আজকে গান্ধীজীর মতো মানবিকতার গভীর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। উল্টো দাঙ্গা আর বদলা নেবার পাশবিকতাকে বৈধতা দেবার জন্য নিউটনের পদার্থবিদ্যার সূত্র আওড়ানো হয় নির্লজ্জভাবে।–গণশক্তি, হর্ষ মান্‌দার একজন আই এ এস অফিসার। গুজরাট ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেন 'Cry the Beloved Country' নিবন্ধে।

❐

www.pathagar.com

# চাইলে পুলিশ দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারতো

## –হর্ষ মান্দার

গোধরা-কাণ্ডের পর তখন অসম্ভব দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ছে ঘৃণার বিষ : ভাবনগরে সদ্য পুলিস সুপার হয়ে আসা রাহুল শর্মা সেই সময় হিন্দু পরিষদের ডাকা বন্‌ধ বরবাদ করে দেয়ার হিম্মত দেখালেন। হঠাৎ খবর এলো, ত্রিশূল, তলোয়ার, মশাল, পেট্রলবোমায় সজ্জিত ২ হাজার সদস্যের গেরুয়াবাহিনী একটি মাদ্রাসা দখলে রওনা হয়েছে। সেই মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছিল শ'চারেক মুসলিম কিশোর। হানাদারদের লক্ষ ছিল এ হতভাগ্যরা! অবিলম্বে জনাপঞ্চাশ সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ছুটে যান রাহুল। দুষ্ট দমনে অস্ত্র ব্যবহার গণতন্ত্রসম্মত কিনা, সম্ভবত এ সংশয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য পুলিস কর্মীরা ছিল দ্বিধাবিহ্বল। অগত্যা পুলিস সুপার নিজেই কনস্টেবলের বন্দুক কেড়ে নিয়ে পটাপট কয়েকজন গৈরিক দস্যুকে পেড়ে ফেললেন। বাকিরা চম্পট দেয়। দপ্তরে ফিরে রাহুল লগ বুকে লিখে রাখেন; এতগুলো নিরপরাধ কিশোরের প্রাণ বাঁচাতেই বন্দুক ব্যবহার করেছি। পুলিস কর্মীদের তিনি কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন, 'বন্দুক হাতে থাকলে যেমন করেই হোক দাঙ্গাবাজদের কবল থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। তা না হলে সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্মীর বিরুদ্ধে খুনিকে মদদ দেয়ার অভিযোগ আনা হবে।' ভাবনগরের পুলিস প্রধান কতটা দায়িত্ব সচেতন, তা বুঝতে দেরি হয়নি সহকর্মীদের। ফলে উপর মহলের আন্তরিক তদ্বিরে অচিরেই বদলির নোটিশ পান রাহুল শর্মা। মাথা নোয়ানি। বরং জানিয়ে দেন, 'বদলির নোটিশ ধরিয়ে আমাকে কাবু করা যায় না। আমি দাঙ্গা থামিয়েছি, কোনো অপরাধ করিনি।' একই সময়ে প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থানের আজমেঢ়ে এ ধরনের বিবেকপ্রসূত সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখান পুলিস সুপার সৌরভ শ্রীবাস্তব। একজন তরুণ মহকুমা শাসক ও ক্ষুদ্র পুলিস বাহিনীর সাহায্যে ১ মার্চ কিষেনগড়ে একটি ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা তিনি সমূলে বিনষ্ট করেন। 'রাষ্ট্রের জন্য যা করেছি, ওঁরা জানেন'—এ ধরনের ওথেলীয় ঔদ্ধত্য বর্তমান দেশকালে অচল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহস অথবা বিবেচনা কোনোটারই স্বীকৃতি পান না পুলিস ও আমলারা। তবু, রাহুল শর্মা ও সৌরভ শ্রীবাস্তবের মত অফিসারেরাও আছেন। অতএব এখনও আশার কিছু আছে।

সুস্থ বিবেকবান নাগরিক হিসেবে গুজরাট-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। আশা করি এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এ হিংসার পুনরাবৃত্তি রুখতে

www.pathagar.com

প্রথমেই প্রয়োজন দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করে শূলে চড়ানো। তবে এ ধরনের সুসমঞ্জস্য সমাধান ভারতে ইতিপূর্বে কমই ঘটেছে। মনুষ্যত্বের শত্রুকুল শুধু বুক ফুলিয়ে ঘুরেই বেড়ায়নি, কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতি রীতিমত প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। আর হিংসার শিকার যারা, তাদের কপালে বিচার তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহানুভূতিটুকুও জোটেনি। গুজরাটের সূত্র ধরে এমন নৃশংসতারই প্রসার ঘটলে ভবিষ্যত প্রজন্মের অভিসম্পাত কুড়োতে হবে আমাদের।

গুজরাটে সাম্প্রতিক দুষ্কর্মর জন্য দায়ী একাধিক মানুষ, বহু গোষ্ঠী। আমার আপাতত লক্ষ পুলিস ও প্রশাসনের হর্তাকর্তারা। কারণ, এঁদের মূল কাজই হলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে বাঁচানো। ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্তা বা আমলারা এখানে ব্যর্থ হলে সেটা মারাত্মক অপরাধ। শল্য চিকিৎসক রোগীকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে খুন করে ফেললে যা হয়, সে রকমই। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ৮০-র দশক পর্যন্ত পুলিস ও আমলাদের ভূমিকা ছিল আজকের তুলনায় অন্য রকম। রাজনীতিকরা সাম্প্রদায়িকতার চুল্লিতে ইন্ধন জোগালে, পুলিস ও আমলাদের কাজ হতো সেই আগুনে জল ঢালার। এক রকম অলিখিত চুক্তিই ছিল। পুলিস, প্রশাসনের নিরপেক্ষ, পেশাদারি মনোভাবের ফলে দাঙ্গার আগুন ছড়াতো কম।

ব্যতিক্রম যে ঘটতো তা নয় (সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংহারের লক্ষ্যে কুৎসিত দাঙ্গা তখনও ঘটেছে) তবে নিয়ম মানার দায়টা কিছু বেশিই ছিল। দেশের সংহতি ও বৈচিত্র্য রক্ষায় তৎকালীন বিবেকসম্পন্ন পুলিস ও প্রশাসন কর্তাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

৮০-র দশক থেকেই এ ব্যবস্থায় ঘুণ ধরতে শুরু করে। পুলিশ প্রশাসনের ইস্পাত কাঠামোয় ক্রমশ রাজনীতিকদের নাক গলানো বাড়তে থাকে। মূলত এ ধরনের জননেতাদের নির্দেশেই সম্প্রদায়-সংহারে কখনও কখনও পরোক্ষভাবে অংশ নিতে বাধ্য হন পুলিস ও প্রশাসন কর্তা। বাধ্য হন দাঙ্গা শুরুর মুহূর্তে পুলিস বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখতে।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে পুলিস ও প্রশাসনের ভূমিকাটা আমাদের স্পষ্ট করে বুঝা প্রয়োজন। গণবিক্ষোভের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শ্রমিক, ছাত্র অথবা কৃষক আন্দোলন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যূনতম শক্তিতে মোকাবিলা করার কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বলপ্রয়োগেই দমন করা উচিত। অবধারিতভাবেই সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয় সবচেয়ে দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম মানুষ। যুক্তিহীন পক্ষপাতের ফলে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিষ মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। অনেকটা সময় ধরে, প্রজন্ম অতিক্রম করেও সেই

www.pathagar.com

বিষ থেকে যায়। উদাহরণ দেশ ভাগ। অর্ধশতক পরে আমাদের চেতনার এক স্তরে পারস্পরিক বিদ্বেষ আজও অটুট। আরেকটি উদাহরণ, ১৯৮৪ সালের শিখ নিধনযজ্ঞ। পাঞ্জাবে এর ফল হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী।

গুজরাটে মা-হারানো একটি ৬ বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে বিগত দিনের দুঃস্বপ্নগুলো আচমকাই মনে পড়লো। ত্রাণশিবিরের আপাত-নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায় বালকটি আমাকে শোনাচ্ছিল কীভাবে তার মা ও ৬জন ভাইবোনকে দাঙ্গাবাজরা হত্যা করেছে। প্রচণ্ড বেদনার মধ্যেও প্রশ্ন জাগল, বড় হলে এ বালকের জমে থাকা রোষ কীভাবে ফুটে বেরোবে ! গোধরা কাণ্ড নিজস্ব নিয়মেই রক্ত বীজের বংশ সৃষ্টি করবে নিশ্চিত। একটা ব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া ভাল। গোধরার ট্রেনের কামরায় যে হিংসার জন্ম, গুজরাটের রণভূমিতে তার ইতি ঘটবে না। এ হিংসার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে পুলিস প্রশাসনের সামান্য গাফিলতি এর জন্য দায়ী হয়ে থাকবে। ইদানীং স্বতঃপ্রণোদিত কাজের পরিবর্তে রাজ্যস্তরে আমলা ও পুলিস কর্তারা মন্ত্রীদের, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী। অধিকাংশের বিশ্বাস, উপর মহলের অনুমতি না মেলা পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। আইন বলছে, হাঙ্গামা দমনে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রয়েছে স্থানীয় অসামরিক কর্তৃপক্ষের। প্রয়োজনে সেনা নিয়োগের এখতিয়ারও আছে। নিজস্ব বিচারবোধ ও বিবেকী সিদ্ধান্ত প্রয়োগে আইন কখনই অন্তরায় নয়। ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ সালে দাঙ্গার সময়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে রাজনৈতিক কর্তাদের পরামর্শ ছাড়াই সেনা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা থাকলে, কোনো দাঙ্গাই কয়েক ঘণ্টার বেশি চলতে পারে না।

দাঙ্গার সময়ে সাধারণ পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে ইদানীং আরও একটি যুক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। অনেকের মধ্যে নাকি ঢুকে পড়েছে সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু। মানছি, আমাদের পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনীকে নানারকম চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধে, প্রেরণাহীন প্রশিক্ষণ—এসবই সমস্যাগুলোকে নিসন্দেহে ঘোরালো করে তোলে। তবুও বার বার দেখা গেছে, সংবেদনশীল, দুশ্চরিত্র নেতৃত্ব পেলে এঁরাই অসাধ সাধন করেন। সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতায় শান্তির হাল ধরেন। ইদানীং আরেকটা তর্ক উঠে, পুলিস কর্তা ও আমলা মহলের গোটাটাই রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালন আজ অসম্ভব। আমি অবশ্য এ মতের কট্টর বিরোধী। জীবনের সেরা ২০ বছর উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মে নিযুক্ত

www.pathagar.com

থেকে দেখেছি, জনজীবনে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক অবনমন সত্ত্বেও বহু গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আপস ছাড়াও কাজ করা সম্ভব। দৃঢ় চিত্ত অফিসারেরা এর ফলে নানা নির্যাতনের শিকার হন। যেমন অকারণে বদলি অথবা কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হওয়া। এ নিবন্ধের শুরুতেই সে উদাহরণ দিয়েছি। তবে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এটাও বুঝেছি, যে সমস্ত অফিসার বিবেকের তাড়নায় কাজ করেন, তাঁদের প্রকৃতপক্ষে দমিয়ে রাখা অসম্ভব।

সত্য অনুসরণের মত কর্তব্য পালনও কঠিন। পথ মসৃণ হলে অনেকেই সে পথে হাঁটত খুব সহজেই। সরকারি কর্মীদের এ কঠিন পথে চলতে কঠিন মূল্যই দিতে হয়। যেমন ঘন ঘন বদলি, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অপসারণ প্রভৃতি। রাজনৈতিক নেতারা চেষ্টা করেন গোটা আমলাতন্ত্রকে এ ধরনের মূল্যের টোপে গেঁথে ফেলতে।

গুজরাট গণহত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী হিসেবে আমি এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছি যে, আমাদের প্রশাসন ও পুলিস কর্তারা এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মুখে পড়েছেন। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যে কোনো রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি অসংকোচে উন্মত্ত হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়, দায়হীনভাবে নাগরিকদের মৃত্যু ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়, তবে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সেই প্রশ্নের অধিকার রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের। কেননা আমরা প্রত্যেকেই সেই নির্লজ্জ অবিচারের শিকার। (হর্ষ মান্দার গুজরাটের দাঙ্গায় পুলিস প্রশাসনের ভূমিকায় ব্যথিত হয়ে ছেড়েছেন আই এ এস-এর চাকরি।)

❐

www.pathagar.com

# মুষল পর্বই চলছে

–মহাশ্বেতা দেবী

গুজরাট প্রসঙ্গে যত জানছি, তত বুঝছি এবং আমরা যারা ভাবছি ওই মাটিতে হিন্দুত্বের চাষ দীর্ঘকাল চলছে বলেই এটা ঘটল, সেই আমরাও সকল তথ্য জানিনি। সম্প্রতি এক প্রবীণ গুজরাটি সজ্জনের কাছ থেকে চিঠিটা পেয়ে তা বুঝলাম। এঁর চিঠির সবটা বলা যাবে না, এঁর নাম তো নয়ই। ভোলা উচিত হবে না উনি ওই আমেদাবাদেই কোথাও আছেন। এখন এমনই ভয় ধরিয়েছে গুজরাট, যে কারও নাম করতে গেলে দু'বার ভাবতে হয়। তার ক্ষতি করছি কি না। আবার এটাও অস্বীকার করতে পারি না মনুষ্যত্ব, সভ্যতা সবকিছুর উপর আগুন নামল কেন। কী করে তা সম্ভব হলো, সে প্রশ্ন বিদ্ধ করেই চলেছে। এর চেয়ে সংশপ্তক বাহিনী নামাও অনেক ভাল। তারা কোথায় ? যা আজকের গুজরাট, মহাভারতে সেখানেই ছিল দ্বারকাপুরী। যদু বংশ ধ্বংস হয়, এ-ওকে হত্যা করে। মুষল পর্ব আবারও পড়লাম। মুষল পর্বের অনেক কিছুই এখন খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

আসলে মন থামতে পারছে না। একটা মন এ পৈশাচিকতা, কীভাবে এই হত্যাকাণ্ড এত সহজে ঘটানো গেল, কেন পুলিসসহ রাজ্য প্রশাসন এমত মদত দিল ঘাতকদের—এসব কিছুর জন্য মন তো উত্তর খুঁজবেই। আমি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসের দ্বারস্থ হলাম। উত্তরগুলো আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি। আমি তো স্বঘোষিত 'গোলা' লোক। গোদা কথাই বুঝি। দেখে দেখে যা শিখেছি, তা-ই মানি। তত্ত্ব ইত্যাদি বুঝি না। এটা আমার বিনীত স্বীকারোক্তি।

## বর্ণাধিপত্য

জানলাম, গুজরাটে জাতিবিদ্বেষ এতই প্রাচীন এবং রক্তে নিহিত যে, আমেদাবাদে হাউসিং সোসাইটি যেইসব আবাসন তৈরি করে সেখানে ওবিসি বা তফসিলি জাতির প্রবেশ প্রায় নিষেধ। এ ছুঁৎমার্গটা এতই প্রবল যে, উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীদের আবাসন সোসাইটি ঘিরে পাঁচিল বা অন্য কোনো বেড়া তোলা শুরু হয়েছে। প্যাটেলরা ওখানে অতি ধনী, জমি মালিক। ওঁদের জল সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে বলে মেধা পাটকরকে 'গুজরাটের শত্রু' বলে বলা হয় এবং সেটা দীর্ঘকাল ধরে। ওখানে 'দলিত' গুজরাট জনসংখ্যার যে অংশ তাঁরা হলেন—(আন্দাজি খবর, আমার সংবাদদাতার

www.pathagar.com

কথামত) আদিবাসী, ১৫%, তফসিলি জাতি ৭% এছাড়া ওবিসি ২৮% এবং মুসলিম ১৩-১৪%। বলা দরকার, মুসলিমরা ওখানে 'দলিত' বলে গণ্য হন না।

ওইসব 'সোসাইটি'তে আদিবাসী ও তফসিলি মানুষরা থাকবেন এমন ভাবা বেঠিক। কলকাতা বা জেলার হাউসিং হয়ত নমনীয়, অথবা নয়, আমি জানি না। যা হোক, ৫০-৫৫ বছর ধরেই আমেদাবাদের আবাসন ব্যবস্থা এ রকম। বর্ণ হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য। ওখানকার চাকরি, ব্যবসা, কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অসম্ভব বর্ণাধিপত্য। কুবের নগর ছারানগরে অনেক হাজার ছারা-ওবিসিদের জানি। প্রত্যেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। গ্রাজুয়েট, ল-এর ডিগ্রি আছে, এমন মানুষ ১৫-২০ হাজার। কিন্তু কেউই চাকরি পান না।

এ রকম বর্ণ-জাতি ও শ্রেণী বিদ্বেষ গান্ধী আশৈশব দেখেছেন। সে জন্যই বোধহয় অস্পৃশ্যতা বর্জনে জীবনের অন্ত্যপর্ব অবধি এত উদ্বিগ্ন ছিলেন। মুসলিমরা দাঙ্গার শিকার হয়েছেন বারবার। আর গুজরাটে দাঙ্গা এ পর্যন্ত কতবার হয়েছে তার হিসেবও আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়।

## বুটলেগিং

যা বলতে চাইছি। এ শ্রেণী, বর্ণ, জাতিবিদ্বেষ গুজরাটে চিরকালই বিদ্যমান থেকেছে। বিজেপি এবার এদের মধ্যে হিংসার রাজনীতি ঢোকাল। ২০-২৫ বছর ধরে মদ তৈরি ও বিক্রয়ে বাধ্য থাকে তফসিলি এবং ওবিসি-রা। এ লাভজনক ব্যবসাটি দীর্ঘকাল চলে রাজ্য পুলিস এবং পুলিসের বাবার বাবাদের সন্ত্রাসে। এ 'বুটলেগিং' এবং হিন্দু-মুসলিমে লড়াইয়ের ইতিহাসও পুরনো। যা আশ্চর্য, এসব বিষয়ে গুজরাটের সমাজের সোচ্চার অংশ কমই লিখেছে যা বলেছে। এ নিপীড়ন ও ঘৃণার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এমত মানব জমিনেই হিংসার আবাদ করতে রামনাম বীজ রোপিত হয়ে চলেছে।

## প্রতিবাদ নেই

জ্বালিয়ে মারার ঐতিহ্যও বহুদিনের। নইলে নয় বছর সময়সীমায় ঊনিশ হাজার বধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা হয় কী করে ? ঊনিশ বছরে নয় হাজার, না নয় বছরে ঊনিশ হাজার, কোন্‌টা সহনীয় ? এ বিষয়ে জাতীয় সংবাদ মাধ্যম বা গুজরাটি-অগুজরাটি গুজরাটবাসী বা অন্য রাজ্যবাসী জনসমাজ এতদিন প্রতিবাদে সোচ্চার হননি কেন ? এমত ঘটনা ওখানে ঘটছে। অথচ তারপরেও গুজরাটবাসীরা কেন এ বিষয়ে একেবারে বিচলিত হচ্ছেন না ?

www.pathagar.com

বুটলেগিংটি চলে পুলিস তথা প্রশাসন নির্দেশে। এবং এসব হাতে-কলমে যারা করে, তারা লেখাপড়া জানলেও কোনো সরকারি-বেসরকারি চাকরি পায় না, থাকে আমেদাবাদের বুকে আক্ষরিক অর্থে 'ঘেটো'তে। জল, রাস্তা ও স্বাভাবিক শৌচব্যবস্থা সেখানে নেই। আমেদাবাদের পুর প্রশাসন বা সেখানকার সম্মানিত নাগরিকরা কোনো কেয়ারও করেন না। ব্যতিক্রম মল্লিকা সারাভাই।

**জল ঘোলা হচ্ছে ৫০ বছর ধরে**

এমন রাজ্যের নাগরিকরা মুসলিমদের বিষয়ে কী মনোভাব পোষণ করবেন। একটি সত্য গল্প বলি, হাবিব তনবীর বরোদার বিখ্যাত এম এস বিশ্বদিল্যালয়ে এক বছর অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হন ১৯৮৬ সালে। বরোদায় তাঁকে বাড়ি ভাড়া দেননি কেউ। শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত শিল্পী গুলাম শেখ, জি এন দেবীসহ শহরের ২-৪জন মানুষকে নিয়ে অনেক চেষ্টায় কোনো একটা ব্যবস্থা করেন। তিনি বরোদায় থাকলেন ঠিকই। কিন্তু was not allwoed to perform.

এমন রাজ্যেই বিজেপি বিস্ফোরণটি ঘটাল, ঘটিয়ে চললো। এবং রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরের গুজরাটি সমাজ এ ব্যাপারে মদত জোগাল। নীরব থাকা মানেও তো সমর্থন।

গুজরাটে এমনটা ঘটে চলার পিছনে যে মানব জমিন ব্যবহৃত হলো তা কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই হিংস্র। কিন্তু অতপর কী করার আছে ? এনডিএ-র বিরোধী রাজনীতিক দলগুলোও জানে কী কার্যসূচি নিয়ে ভীষণ চেহারার আন্দোলন গড়া এ ক্ষণিক কাজ, কিন্তু তা তারা করছে না। পরিস্থিতি সামলানোর পথ একটাই, রাজ্য প্রশাসনকে দিয়ে চাবকে কাজ করানো। সেজন্য প্রয়োজন গুজরাটে বারবার যাওয়া এবং সারা দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা। গুজরাটিদের এবং এ নারকীয় কাণ্ডের মহা পার্শ্ব নেপথ্য নায়কদের হৃদপরিবর্তন অন্তত এখন হবে না। জল পঞ্চাশ বছরে ধরে ঘোলা হয়েছে। এখন এরা মাছ ধরবেই। রাজনীতির দলগুলোও মজা দেখছে। কী জন্য এ অপেক্ষা ? বাকি ভারতে দাঙ্গা লাগার জন্য ? অবশ্য তাই যাতে হয়, সেজন্য এনডিএ তো খুবই সচেষ্ট।

**এফ আই আর বদলাও**

এফআইআর বিষয়ে বলি। প্রথম কাজ তো ধর্ষিতা মেয়েদের দিয়ে এফআইআর লেখানো। এবং তারা যাদের চিনেছে, তাদের এক্ষুণি ধরা।

www.pathagar.com

যেখানে ব্যাপারটা ধর্ষণ নয়, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট—সেই গ্রামীণ গুজরাটে পুলিস দেখিয়ে দিচ্ছে কাজ কাকে বলে। যে মুসলিমরা ফিরে যেতে পেরেছে বা যাবে বলে উন্মুখ, তাদের বেলা রীতিমত কাজ দেখাচ্ছে। সরকারি নির্দেশ—আর ক্যাম্পে নয়। এটাও সত্য। অত্যাচারিতদের বলা হচ্ছে, এফআইআর বদলাও। কারা আগুন লাগায়, মানুষ পোড়ায়, লুটপাট করে, তাদের চিনেছে—একথা কিছুতেই লেখা চলবে না।

না বদলালে ?

এফআইআর থাকবে না। তোমরাও চুলোয় যাও।

রাজ্য প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে বলতে হবে—সঠিক এফআইআর লিখাতে দাও। দোষীদের গ্রেফতার করো। শাস্তি দাও। যেখানে কোনো আন্দোলন নেই, কায়েমি স্বার্থের খুঁটি গভীরে প্রোথিত, সেখানেও প্রশাসনকে সক্রিয় করলে কাজ হয়। এ আমি অতীব ক্ষুদ্র সাধ্যসীমার বৃত্তে ঘটতে দেখেছি। তাই বিশ্বাস করি এখানেও হবে। নীতি ও সত্যের প্রত্যাবর্তন ? তার জন্য বলতে চাই—উদ্যত চাবুকের নিচে মাথা পেতে দিও না। চাবুক ধরা হাতটাই ভেঙে যাবে। এটা কারা শেখাবে, আমি জানি না। যারা ভোটের স্বার্থে স্বার্থান্ধ, তারা অন্তত এ কাজ পারবে না।

❐

www.pathagar.com

# কোথায় শেষ ?

–মহাশ্বেতা দেবী

গুজরাটের আচার-আচরণ বোধকরি পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় এক অদ্ভূত ব্যতিক্রম। গত রবিবার ৫ মে, ২০০২ আমেদাবাদে আবার যে খুন, জখম ও অগ্নিকাণ্ড হলো, তা বোধহয় প্রকাশ সিং গিলকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। যেন দেখিয়ে বলা—ভেবেছ আমরা দমে যাব ? যা করছিলাম, তাই করবো।

তারা ক্রমাগত তা-ই করছে। গুজরাটে গিয়ে মূলত বরোদার গ্রামীণ অঞ্চলের কথা জেনে ও দেখে এসেছিলাম। বরখা দত্তের প্রোগ্রামেও একটি মেয়ে বললেন বরোদার রিলিফ ক্যাম্পগুলোর ভয়াবহ নিঃসহায়তার কথা। শরণার্থীদের উপর প্রতিনিয়ত পরকারী সন্ত্রাস আসছেই—শিবির ছেড়ে চলে যাও। শরণার্থীরা কোথায় যাবে, কীভাবে যাবে, কোথায় থাকবে, শিশু, বালক ও বালিকাদের কী হবে—সব চিন্তার দায়িত্বই রাজ্য সরকার এই অবস্থাতেও শরণার্থীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছে। যেন সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই।

ছোটে উদেপুর একটি ব্লক বা তালুকা শহর। সেখানকার প্রাক্তন রাজাও আদিবাসী, অঞ্চলটিও আদিবাসী-গরিষ্ঠ। সংখ্যায় গরিষ্ঠ কিন্তু সামাজিক অবস্থায় অত্যন্ত অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। ছোটে উদেপুরে শরণার্থী শিবিরে (ইনসাফ-এর সদ্য প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন) আছেন মূলত পানভাদ, তেজগড়—এসব গ্রামের মুসলিমরা। সারা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সেখানে শিবির চালাচ্ছে সরকার প্রদত্ত চাল, গম, আটা ইত্যাদি দিয়ে। এখন প্রধান সমস্যা পুনর্বাসনের। শুধু ছোটে উদেপুরে কেন, শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেও এ সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। তান্‌জালাদা জাতীয় জায়গায় শহরের উপকণ্ঠ ও বস্তি থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অবস্থাও একই রকম। অথচ সরকারের হুঙ্কার চলছে—শিবির ভেঙে দাও, ফিরে যাও।

যেখান থেকে এসেছেন, সেখানকার সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের রক্তের রং গেরুয়া। বাতাসেও বিদ্বেষ ও হিংস্রতার গন্ধ। ফিরে যাওয়া কি এতই সহজ ? আদিবাসীদের সাথে মিলে এসব গ্রামে গ্রামে লুট হয়েছে, বাড়ি ও সম্পত্তি জ্বলেছে। কিন্তু ধর্ষণ ও জ্বালিয়ে হত্যার ঘটনা নেই বলেই জানাচ্ছেন 'ইনসাফ'।

এরই মধ্যে অন্তত আমি যত খবর নানা সূত্রে পাচ্ছি, তার মধ্যে একটি খবর সত্যিই বিস্ফোরক। তেজগড় পঞ্চায়েতের চল্লিশটি মুসলিম পরিবার

www.pathagar.com

ফিরে গেছে তেজগড়ে। ৩৯টি বাড়ি পুড়েছিল। একটি বাড়ি আক্রান্ত হয়নি। বড় বড় ঘরদোর, সম্ভবত শস্য সংরক্ষণ হতো সেখানে।

গুজরাট ব্যাপারে সবচেয়ে (এ অবধি) ইতিবাচক ঘটনাটি নিঃশব্দে ঘটে গেল। ছোটে উদেপুর-এর ক্যাম্প থেকে প্রায় ৭০টি পরিবার চলে গেছে তেজগড়ে। প্রথমে শুনেছিলাম সংখ্যা ৪০, পরে জানলাম ৭০।

সরকার তো চায় এই কাঁচা দগদগে ঘা-সদৃশ শিবিরগুলো উঠে যাক। 'উঠে যাও' হুমকি জারিই ছিল। আর শহরগুলো বাদ দিলে গ্রাম-গুজরাটে ব্লক অফিসার সর্বেসর্বা। তারা প্রায় সকলেই ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী। 'শরণার্থী হটাও' হুমকি ওরাও পাচ্ছিল। তারপর বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর পতিশ্রুত 'প্যাকেজ'ওই লোকদের হাত দিয়েই বিতারিত হলো। এই ৭০টি পরিবার জানে না তাদের কত টাকা পাওয়ার কথা ! তবু তারা পনেরো হাজার থেকে ৪০/৪৫ হাজার পেয়েছে। যা থেকে নতুন করে ঘর তোলা, বাসনকোসন-বিছানাপত্র-কাপড়চোপড় কেনা এবং তাদের যে ব্যবসা-কারবার ছিল তা গুছিয়ে নেয়া একেবারে অসম্ভব।

গুজরাটের গ্রামে গ্রামে দেখেছি, আদিবাসীদের মাটির ঘর, ইট ও কাদার গাঁথনির ঘর। কিন্তু অন-আদিবাসী ঘর সবই পাকা, গ্রামের রাস্তা বাঁধানো, এসটি ডি বুথ থাকে, মোবাইল ফোনও অনেক। সাধেই কি গুজরাট ধনীতম রাজ্য হয়।

তেজগড়ে যাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দরকার। যাঁরা এ লেখা পড়বেন, তাঁদেরই বলছি, আমি এ রাজ্যের কোনো সংস্থার কথা আলাদা করে বলবো না। যাঁরা ফোনে প্রাণনাশের হুমকি খাচ্ছেন, তবুও কাজে করছেন, ওখানকার সেসব জায়গার কথা বলবো, এঁরা সপ্তাহে ৩/৪ বার ১০০ কিলোমিটার দূরে যান। ওই সন্ত্রস্ত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান। কলকাতায় বসবাসরত সকল ক্যালকাটান অর্থাৎ কলকাতাবাসী বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, মারোয়াড়ি—সকলের কাছেই এ আবেদন রাখলাম।

পাঠাবার ঠিকানা ঃ 'ভাষা রিসার্চ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন'/৬, ইউনাইটেড অ্যাভিনিউ, নিয়ার দীনেশ মিলস/বরোদা-৩৯০ ০০৭ (টেলিফোন ০২৬৫-৩৩১ ১৩০। আমি এঁদের সাথেই তেজগড়ে আদিবাসী আকাদেমি গড়ে তোলার কাজে যুক্ত, সেজন্যই গুজরাট যাই বারবার। প্রসঙ্গত দুটি দু' রকম খবর জানাই—

www.pathagar.com

১. গ্রাম-গুজরাটে শরণার্থীদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কঠিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়তো হয়ে যেতে পারে। গ্রাম-গুজরাটের শিবিরগুলোর বিশদ পরিচয় অনেক এনজিও লিখেছেন।

গুজরাট সরকার হয়তো এ মুহূর্তেই এঁদের ঘরে আবার আগুন না দিতেও পারে, কিন্তু আমেদাবাদ-সহ সব শহর থেকে এদের উপড়ে ফেলে দেবে। জমি-ভূমির দখল নেবে। নেবেই। সেখানে পুনর্বাসন অত্যন্ত কঠিন হবে। রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে লড়া কঠিন হবে।

২. গুজরাট, তথা ভারত, তথা বিশ্বের অন্যতম মহান মানুষ মহাত্মা গান্ধীর পন্থায় আজ অনেকেই ফিরে যেতে চাইছেন। অম্লান দত্তের অনশন মনে করছি। আরও জানছি, শিবপুর বি ই কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় —এসব জায়গায় ছাত্ররা ১/২ দিনের অনশনে বসেছেন। বরোদায় পুলিস অলিগলিতে ঢুকে কিছু শরণার্থী হত্যার পর থেকে পিইউসিএল-এর সাথে জড়িত যে ক'জন হিন্দু মুসলিম কাজ করছেন, তাঁরা সংখ্যায় বড়জোর ৫০জন হবেন—মুখে কালো কাপড় বেঁধে তাঁরা সদর কোতোয়ালিতে যাচ্ছেন। কাগজ নামিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন—'আমাদের খোঁজে পুলিস হয়রান হবে কেন ? আমরা তো এসেছি, গুলি করো।'

পুলিশ ওদের সকালে থানা হাজতে ঢোকাচ্ছে, বিকেলে ছেড়ে দিচ্ছে। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে, এ অনশন, এ পিকেটিংই বোধহয় প্রতিরোধের এক শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমি ডায়াবেটিসেব কারণে পারি না, পারলে আমেদাবাদের রাস্তায় নামতাম, সেখানে গিয়ে আমৃত্যু অনশন করতাম।

❐

www.pathagar.com

# এমন নিদান আছে নাকি হিন্দুশাস্ত্রে ?

–অরুন্ধতী রায়

বরোদা থেকে ফোন এলো এক বান্ধবীর। অঝোরে কাঁদছে। ওর এক বান্ধবী সঈদা একদল উন্মত্ত জনতার হাতে পড়ে গিয়েছিল। সঈদার পেটটা চিরে লোকগুলো ঢুকিয়ে দেয় জ্বলন্ত কাপড়ের ফালি। তারপর আর কী, সঈদা মরে গেল। তখন ওর কপালে ওরা খোদাই করে দিল ঃ ওম্।

আছে নাকি কোনো হিন্দুশাস্ত্রে এ রকম নিদান ?

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি, গোধরায় ৫৮ হিন্দু ট্রেনযাত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছিল মুসলিম জঙ্গিরা, এসব তারই পাল্টা। গোধরায় যাঁরা পুড়ে মরেছেন, তাঁরাও তো কারও না করাও ভাই, মা, সন্তান। সত্যিই তো।

কোরআনের কোথায় আছে পুড়িয়ে মারার বিধান ?

এই পাস্পরিক হনন-উৎসাহে দু' পক্ষের ঘাতকরা নিজেদের ধর্মের ভিন্নতা যতই তুলে ধরতে চায়, ততই মুছে যেতে থাকে তাদের ফারাক। আসলে দু' পক্ষই এখানে একই খুনে-দেবতার সেবক, অবশ্য তেমন কোনো দেবতা যদি থেকে থাকে। এই রকম এক দুষিত হাওয়ায় চক্রের উৎস নিয়ে আলটপকা তত্ত্ব হেঁকে দেওয়া যে কারো পক্ষেই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। প্রমানমন্ত্রীর পক্ষে তো বটেই।

এ হল বিষপানের মুহূর্ত। আমরা পান করছি ভেজাল গণতন্ত্রের সাথে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ মেশানো বিষ। নির্ভেজাল আর্সেনিক।

কী করার আছে আমাদের ? কী করতে পারি ?

আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে ঘুণ ধরা এক শাসক দল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বরে, পোটা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাল ঠোকা (অস্ফুট পরমাণু-হুমকি সহ) সীমান্তে লাখ লাখ ফৌজ পাঠানো, এমনকি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বিকৃত করার বিপজ্জনকতার উদ্যোগ—সব সত্ত্বেও এদের নির্বাচনী বিপর্যস্ত অব্যাহত। পুরনো খেলা ছিল অযোধ্যা নিয়ে। তাতেও শিকে ছেঁড়েনি। অগত্যা গুজরাট।

দেশের বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে গুজরাটই শুধু হাতে ছিল বিজেপি-র। গত কয়েক বছর ধরেই এখানে বেশ গুছিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে হিন্দু ফ্যাসিবাদের। তার ফলাফল এখন সবার চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করছে।

www.pathagar.com

গোধরাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সুচারু ব্যবস্থাপনায় চালু হয়ে যায় গণসংহার যন্ত্র। সরকারি হিসেবে মৃত ৮০০, নিরপেক্ষ সংস্থাগুলোর হিসেবে ২০০০ ছাড়িয়ে। দেড় লাখেরও বেশি মানুষ ঘরদোর হারিয়ে মাথা গুঁজেছে ত্রাণশিবিরে। মহিলাদের বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করা হয়েছে। গণধর্ষণ। সন্তানের চোখের সামনে বাবা-মাকে হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ২৪০টি দরগা, ১৮০টি মসজিদ। আমদাবাদে আধুনিক উর্দু কাব্যের পুরোধা ওয়ালি গুজরাটির সমাধি রাতারাতি মসৃণ রাস্তায় পরিণত। সঙ্গীতসাধক উস্তাদ ফৈয়াজ আলি খানের সমাধিও রেহাই পায়নি, ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে জ্বলন্ত টায়ার। পুড়ে গেছে, লুট হয়ে গেছে দোকানের পর দোকান, হোটেল, কাপড়ের কল, গাড়ি। লক্ষ লক্ষ মানুষ সহসা বেকার। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল একদল জনতা। তিনি ফোন করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিস কমিশনার, মুখ্য সচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বরাষ্ট্র), সবাইকে। কেউ তাঁর ফোনকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেসব মোবাইল পুলিস ভ্যান, তারাও উন্মত্ত জনতাকে সামাল দিতে এগিয়ে আসেনি। জনতা চড়াও হয় জাফরির বাড়িতে। তাঁর মেয়েদের বিবস্ত্র করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। জাফরির শিরশ্ছেদ করা হয়, কেটে নেয়া হয় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অবশ্যই এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা যে, ফেব্রুয়ারীতে রাজকোট বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কড়া সমালোচনা করেছিলেন জাফরি।

গুজরাট জুড়ে হাজার হাজার মানুষ ঘাতক বাহিনীতে জড়ো হয়েছে। কী নেই তাদের হাতে ? পেট্রল বোমা, বন্দুক, ছুরি, তরোয়াল, ত্রিশূল সবই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের নিয়মিত যে গুণ্ডাবাহিনী, তার বাইরে, দলিত আর আদিবাসীরাও যোগ দিয়েছে ঘাতক দলে। মধ্যবিত্ত নেমে পড়েছে লুটতরাজ, (এক জায়গায় তো মিৎসুবিশি ল্যান্সারে চেপে লুট করতে আসে একটি গোটা পরিবার)। এই ঘাতকদলের নেতাদের হাতে ছিল কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। তাতে মুসলিমদের বাড়ি, দোকান, ব্যবসা, অংশীদারি—সব তথ্য আলাদা করে উল্লেখ করা ছিল, যাতে কোনও ভুল না হয়। আক্রমণে, হত্যায়, লুটপাটে সমন্বয় আনার জন্য মাতব্বরদে হাতে ছিল মোবাইল ফোন। ট্রাক বোঝাই গ্যাস সিলিণ্ডার ছিল এক সপ্তাহ আগে থেকেই মজুত। মুসলিম বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলো উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতেই এত আয়োজন। এদের নিরাপত্তা দিয়েছে পুলিস, প্রয়োজনে নীরব, অন্ধ হয়ে থেকেছে, এদের কাজ কর্ম নিরুপদ্রব করতে গুলিও চালিয়েছে।

www.pathagar.com

গুজরাট যখন জ্বলছে, প্রধানমন্ত্রী তখন এক টিভি চ্যানেলে পড়ে শোনাচ্ছিলেন তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার ক্যাসেট ভালই বিক্রি হয়েছে। গুজ রাটে পৌঁছতে প্রধানমন্ত্রীর লেগে গেল এক মাসেরও বেশী সময়। তার মধ্যে পাহাড়ে ছুটি কাটিয়েছেন দু বার। যখন গেলেন গুজরাটে, নির্বিকার ছায়াসঙ্গী নরেন্দ্র মোদি, শাহ আলম ত্রাণশিবিরে বললেন দু-চার কথা। তাঁর মুখ নড়ল, উদ্বেগ প্রকাশের চেষ্টা করলেন, কিন্তু দগ্ধ, রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন এক বধ্যভূমিতে শব্দের কিছু কাঁপন ছাড়া আর কিছুই যে উচ্চারিত হলো না। তারপরই আমরা জানলাম, তিনি গলফ কোর্সে অবসর যাপন করছেন, প্রয়োজনীয় বাণিজ্য-ভ্রমণে যাচ্ছেন সিঙ্গাপুর।

ঘাতকরা গুজরাটের রাস্তায় রাস্তায় এখনও বিজয়ীর মত তৎপর। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিও তারাই চূড়ান্ত নিয়ন্তা। কে কোথায় থাকছে, কে কী বলছে, কে কার সাথে কোথায় কখন দেখা করছে, সব তাদের নখদর্পণে। এদের জবরদস্তি নির্দেশের এখতিয়ার কেবলই বাড়ছে। ধর্মীয় বিষয় থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সম্পত্তি-বিবাদ, পারিবারিক কলহ, জলসম্পদ নিয়ে পরিকল্পনা বা বণ্টন (না হলে মেধা পাটকর কেনই বা নিগৃহীত হলেন)। মুসলিম ব্যবসাপত্রের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁয় খাবার দেয়া হচ্ছে না মুসলিমদের, ওদের পরিবারের শিশুদের স্কুলে যেতে নিরুৎসাহ করা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখানো হচ্ছে স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার ব্যাপারে। মুসলিম বাবা-মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের পাখি পড়ার মত করে শেখাচ্ছেন। তবু ভরসাও করতে পারছেন না, যদি কচি কচি ছেলেমেয়েরা একবার প্রকাশ্যে 'আম্মা' বা 'আব্বা' বলে ডেকে বসে, তাহলে তো আচমকাই নেমে আসবে নিষ্ঠুর মৃত্যু।

সামনে স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি ঃ এ শুরু।

এই কি সেই 'হিন্দু রাষ্ট্র', সামনের যেদিকে তাকানোর কথা আমাদের সবাইকে বলা হচ্ছিল ? একবার যদি মুসলিমদের 'রাস্তা দেখিয়ে দেয়া' যায়, তাহলে কি সমগ্র চরাচর জুড়ে দুধ আর কোকাকোলার বন্যা বয়ে যাবে ? একবার যদি তৈরিই হয় রামমন্দির, তাহলেই কি সমস্ত খালি গায়ে উঠবে জামা কিংবা প্রতিটি খালি পেট ভরবে রুটিতে ? কান্নাভেজা সমস্ত চোখ থেকে কি মুছে দেয়া যাবে জল ? আগামী বছর কি আমরা আজকের ঘটনাবলির বার্ষিকী উদযাপন করবো ? নাকি নতুন কোনো প্রতিপক্ষকে দেখতে পাব, ঘৃণার অভিমুখ হিসেবে ? ইংরেজি অক্ষরবিন্যাস অনুযায়ী, এরপর কি আদিবাসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দলিত, পার্সি, শিখদের নিধনপর্ব ? যাঁরা জিনস পরেন, অথবা কথা বলেন ইংরেজীতে, কিংবা যাঁদের পুরু ঠোঁট অথবা কোঁকড়া চুল ? যে কোনো

www.pathagar.com

নিরিখেই যে শুরু হতে পারে আক্রমণ, যে কারো বিরুদ্ধে ? আমরা যে আর দেরি করতে পারবোই না। শুরুটা বেশ জোরদারই হয়েছে। এ রকমই কি তবে চলতে থাকবে ? মানুষকে গলা কেটে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে হত্যা করা হবে ? তাদের গায়ে পেচ্ছাপ করে দেওয়া হবে ? মায়ের গর্ভ ছিঁড়ে টেনেহিঁচড়ে বের করা হবে গর্ভের সন্তানকে, আর হত্যা করা হবে তাঁকে ? কী ধরনের অধঃপতিত দৃষ্টিভঙ্গি হল ভারতের প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের বিস্তার ভুলে এমন এক পাশবিক সংস্কৃতির ভেতর এ দেশকে কল্পনা করা যায় ? ভারত হয়ে উঠছে এমন এক স্মৃতিসৌধ, শ্মশানের গন্ধ ছড়াচ্ছে দেশময়।

যাঁদের হত্যা করা হলো, তাঁরা কারা, কীভাবেই বা করা হলো হত্যা, এসব কোনো কথা নয়, গুজরাটে গত কয়েক সপ্তাহে যাঁরাই নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য শোক জানানো জরুরী। তাঁরা প্রত্যেকে সেই শোকের, শ্রদ্ধার যোগ্য। কাজগপত্রে প্রতিদিন প্রচুর হিংস্র চিঠি বেরুচ্ছে, জানতে চাওয়া হচ্ছে কেন ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজন গোধরায় সাবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানোর ততটা কড়া ভাষায় নিন্দা করছেন না, যতটা করছেন গুজরাটের অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা। তাঁরা একটা কথা বুঝতে পারছেন না যে, গুজরাট জুড়ে এখনও যে নিধনযজ্ঞ চলছে, তার সঙ্গে গোধরায় সাবরমতী এক্সপ্রেসের কামরায় আগুন লাগানোর ঘটনার কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা এখনও জানি না গোধরায় হত্যাকাণ্ডের জন্য ঠিক করা দায়ী। কোনো প্রমাণ ছাড়াই সরকার জানিয়েছে, এটা আইএস আইয়ের চক্রান্ত। নিরপেক্ষ রিপোর্টে জানা গেছে, ট্রেনে আগুন লাগিয়েছে একদল উন্মত্ত জনতা। যেই করুক, গোধরার ঘটনা অপরাধমূলক, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট জানাচ্ছে, গুজরাটে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিধনযজ্ঞ, যাকে সরকার বলেছে, 'স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাঘাত' তা আসলে সংঘটিত হয়েছে সরকারি প্রশাসনের ছত্রছায়ায়, নিষ্ক্রিয়তায়, কখনও সরকারের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সহযোগিতায়। যে কোনো দিক থেকেই, সরকারই গুজরাটে প্রধানতম অপরাধী। সরকার এই গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে নাগরিকদের নামে। একজন নাগরিক হিসেবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, গুজরাট গণহত্যায় দায়ী সরকার। গুজরাট ক্রোধের জন্ম দিয়েছে। গোধরা আর বাকি গুজরাটের ঘটনার তফাতরেখা তো সেখানেই, আমার কাছে।

❐

www.pathagar.com

# বহুরূপী

–অরুন্ধতী রায়

গুজরাটে হাঙ্গামা বাধতেই বাঙ্গালোরে আর এসএসের অধিবেশনে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ফরমান জারি হলো ঃ 'সংখ্যাগরিষ্ঠদের আস্থা অর্জন করুন।' বিজেপি-র নীত ও সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর এই আরএসএস সদস্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীও। গোয়ায় বিজেপি-র কর্ম সমিতির বৈঠকে প্রকৃতপক্ষে নায়কের সম্মান পেয়েছেন শেষোক্ত ব্যক্তিটি। প্রচুর নাটক করে মুখ্যমন্ত্রীত্বে ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন নিজেই। গোটা দল পরিকল্পিতভাবেই তুমুল হইচই করে সে প্রস্তাব নাকচ করলো। তা বেশ, সম্প্রতি এক ভাষণে এই নরেন্দ্র মোদি গুজরাট-কাণ্ডের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি যাত্রার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে দুটি ঘটনাই স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত !

ভারতের সমকালীন ইতিহাস ও যুদ্ধপূর্ব জার্মানির ইতিহাসের সাযুজ্য রোমহর্ষক। তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা প্রকাশ্যেই হিটলার ও হিটলারি পদ্ধতির প্রতি তাঁদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তফাত এটুকুই যে, ভারতের কোন হিটলার নেই। তার বদলে আছে গ্রিক পুরাণ কথিত হাইড্রার মত বহুশির, 'সংঘ' দানব। সংঘ পরিবারের অনেক মুখ—বিজেপি, আসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল। এসব নানা মুখের সুর গান মিলে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্যা ঐকতান। সব মিলিয়ে গোটা সংঘ পরিবারের প্রতিভার চেহারাটা বেশ স্পষ্ট। আর যাই হোক, সব ধরনের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একাধিক মুখোশের অভাব একেবারেই নেই।

অভাব নেই অবস্থা বুঝে সামনে এগিয়ে দেওয়ার মত লোকেরও। আছেন বক্তৃতাপটু বৃদ্ধ পদ্যকার। জনতা খেপাতে সক্ষম কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপাত ভদ্র বিদেশমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমে বিতর্ক সামাল দিতে মসৃণ ইংরেজীভাষী আইনজীবী। আছেন ঠাণ্ডা রক্তের সরীসৃপ মুখ্যমন্ত্রীও। তদুপরি বজরং দল ও হিন্দু পরিষদের তৃণমূল স্তরের সেই সব কর্মী—যারা গণহত্যার শারীরিক পরিশ্রমে উদ্দীপ্ত হয়। আরও একটি আশ্চর্য অঙ্গ আছে সংঘ পরিবারের। টিকটিকির লেজের মতই, যা সময় বুঝে খসে পড়ে, যথাকালে আবার গজিয়ে উঠে। সমাজবাদী জামা-পরা এই প্রতিরক্ষামন্ত্রীটিকে ব্যবহার করা হয় যুদ্ধ, ঘূর্ণিঝড় বা গণ্যহত্যাজনিত ক্ষতির সামাল দিতে। পরিবারের আশা, উনি ঠিক মুহূর্তে ঠিক বোতাম টিপে সঙ্কটমোচনে সহায়তা করবেন।

www.pathagar.com

একাধিক মাথার মত একাধিক কণ্ঠ সংঘ পরিবারের। ফলে একই সময় পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করতে তাদের একটুও আটকায় না। যেমন, হিন্দু পরিষদ যখন তাদের গেরুয়া বাহিনীকে 'চরম সমাধানের' প্রস্তুতি নিতে বলে, প্রধানমন্ত্রী সেই মুহূর্তেই দেশবাসীকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি শোনান! এরই পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি অবমাননার দায়ে সংঘের রোষে পোড়ে ছবি। নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে শ্বাস উঠে বই বা চলচ্চিত্রের। একই সাথে গোটা দেশের গ্রামোন্নয়ন খাতে ব্যবহার্য তহবিলের ৬০ শতাংশ অর্থ বহুজাতিক এনরন সংস্থার কাছে বন্ধক রাখতে পারে এরাই। দ্বিধাহীনভাবে। এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতাও অক্লেশে ধূনিত হয় পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের কণ্ঠে। যা হতে পারতো দুই রাজনৈতিক দলের দ্বৈরথ, তা পর্যবসিত হয় নেহাত পারিবারিক কলহে। সে ঝগড়া যতই তিক্ত হোক, তার পুরোটাই হয় সাধারণ্যে, লোকচক্ষুর সামনে। স্বাভাবিক কারণেই এই নাটুকে ভুল বুঝাবুঝির ইতি হয় পারস্পরিক আলিঙ্গনে। দর্শকের মনতুষ্টির খোরাক জোগানো ছাড়া এইসব ঝগড়াঝাঁটির অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। পয়সা উসুল যাতে হয়, সেদিকে সংঘের সদাসতর্ক নজর। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র, বেদনা, কবিতা, নৃশংসতা—যাবতীয় উপাদানে ঠাসা জমজমাট নাটক। আর এরই অন্তরালে, অপেক্ষাকৃত শান্ত মুহূর্তে স্পষ্ট শোনা যায় একটি মাত্র দানবের হৃদস্পন্দনের শব্দ।

ভারতে ইতিপূর্বে গণহত্যা ঘটেছে। সব ধরনের গণহত্যা। মারা হয়েছে নির্দিষ্ট জাতি-বর্ণ-ধর্মের মানুষকে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুজনিত দাঙ্গায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্রেফ দিল্লিতেই প্রাণ হারান তিন সহস্র শিখ। সেই দাঙ্গার চেহারা গুজরাট কাণ্ডের তুলনায় কম ভয়ঙ্কর নয়। বাকপটু হিসেবে তেমন খ্যাতি না থাকলেও, সেই মুহূর্তে রাজীব গান্ধীর মন্তব্য ঃ 'মহীরুহ পতনে ভূমিকম্প স্বাভাবিক।' পরের ভোটেই কংগ্রেসের বিরাট জয়। সহানুভূতির ঝড়। ১৮ বছর পরেও ৮৪-র দাঙ্গার দোষীদের শাস্তি হয়নি।

পরমাণু পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তহলকা কেলেঙ্কারি, ভোটের জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি—সব ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাতেই বিজেপি-র পূর্বসূরি হিসেবে কাজ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস বীজ বপন করে গেছে, বিজেপি ফসল তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে ভোট দিতে গিয়ে আমরা কি কংগ্রেস ও বিজেপি-র মধ্যে পার্থক্য দেখব ? উত্তরে দ্বিধা আসবে, তবু বলবো, হ্যাঁ। কংগ্রেস কয়েক যুগ ধরে পাপ করেছে। কিন্তু তারা যেটা রাতের অন্ধকারে করতো, বিজেপি সেটা দিনের বেলাতেই করে। কংগ্রেস দুষ্কর্ম করতো চুপিচুপি, অন্তত লজ্জার আব্রুটুকু থাকতো। বিজেপি দুষ্কর্ম করে

www.pathagar.com

স্পর্ধার সঙ্গে। এই পার্থক্যটা জরুরী। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো সংঘ পরিবারের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। বহু বছর ধরে পরিকল্পিত। খুব ধীরে ধীরে সমাজের রক্তস্রোতে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশজুড়ে শয়ে শয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা আর সরস্বতী শিশু মন্দিরে হাজার হাজার বালক ও কিশোরের মগজ ধোলাই হচ্ছে। ঠেসে দেয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর ভুল ইতিহাস। এরা তালিবানের জন্মদাতা, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের সেসব মাদ্রাসা থেকে একচুল আলাদা নয়। গুজরাটের মত রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন আর রাজনৈতিক ক্যাডার—সর্বস্তরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে বিষ। এ তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। একে উপেক্ষা বা এর ভুল ব্যাখ্যা করা মূর্খামিই হবে। ধর্মীয়, আদর্শগত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে রীতিমত সমীহ জাগানো শক্তি। রাষ্ট্রীয় মদত ছাড়া এতটা শক্তি সংহত করা সম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িকতা চাষের মুসলিম সংস্করণ মাদ্রাসাও উন্মাদনা ছড়ায়, বিদেশি অর্থও পায়। কিন্তু তাদের পেছনে নেই রাষ্ট্রীয় মদত। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির চমৎকার পরিপূরক এরা। এতো নিখুঁতভাবে একে অন্যের কাজে লাগে, মনে হয় যেন দলবেঁধে কাজ করছে।

এই অবিরাম নরকযন্ত্রণার চাপের মুখে খুব স্বাভাবিকভাবেই যা হতে পারে, তা হল ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেটোয় বাস করতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মত, নোংরায়, অপরিচ্ছন্নতায় আত্মসমর্পণ করে, অবিরত ভয় তাদের সঙ্গী, কোন সভ্য সমাজের স্বাভাবিক সামাজিক অধিকার তাদের জুটবে না, ন্যায়ের পথও তাদের কাছে থাকবে অজানাই। কেমন কাটে বা কাটতে পারে তাদের দৈনন্দিন জীবন ? খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে, সিনেমার লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া বা ট্রাফিক সিগনালে আটকে পড়া হট্টগোল থেকে হিংস্রতার চর্চা ছড়িয়ে পড়তে পারে হানাহানিতে। ফলে, তারা যেন আত্মবন্দী এক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে ধীরে, নিশ্চিতভাবে।

কিন্তু এই ম্লান, বিধ্বস্ত, শঙ্কাময় জীবনকে মেনে নিয়ে সমাজের এক প্রান্তে চলে যাওয়া ছাড়া তাদেরই বা ভবিষ্যৎ কী ? তাদের আতঙ্ক ছড়িয়ে যাবে সমাজের অন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যেও। কিশোর, তরুণ, যুবকরা কেবলই হয়ে উঠবে জঙ্গি মানসিকতায় অভ্যস্ত। ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটাবে তারা। সমাজ তাদের নিন্দা করবে। প্রেসিডেন্ট বুশের উচ্চারণ ফিরে আসবে আমাদের কাছে, নির্মম, 'হয় তুমি আমাদের সঙ্গে, না হয় তো সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে।'

এসব শব্দ বা উচ্চারণ যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতো শক্ত, ধারালো হয়ে উঠতে থাকে, হৃদয়ে গেঁথে যাওয়ার নিরিখে। যেসব বছরগুলো সামনে

www.pathagar.com

আসছে, সেইসব অনাগত দিনে মুখাবয়বের ভয়াল হিংস্রতায় খুনেরা নিজেদের খুন, হত্যা, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে।

শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে, তিনি আবার অতি সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদির বীরত্বের কাছে ম্লান হয়ে গেছেন। অন্তিম মীমাংসাসূত্রের মতই তিনি গৃহ যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। একদিক থেকে এটা তো সত্যিই উচিত কাজ। তখন আর পাকিস্তানের দরকার হবে না আমাদের দিকে বোমা ছোঁড়ার। আমরা নিজেরাই নিজেদের দিকে বোমা ছুঁড়তে পারব। গোটা দেশটাই হয়ে যাবে কাশ্মীর অথবা বসনিয়া অথবা প্যালেস্টাইন অথবা রোয়াণ্ডা। চলুন, আমরাই আমাদের রক্তপাত আর যন্ত্রণাকে চিরকালীন চেহারা দিই। আমরা অস্ত্র কিনি আর বিস্ফোরক আমদানি করি, নিজেরাই নিজেদের হত্যার আয়োজনে মাতি। ব্রিটিশ আর আমেরিকান অস্ত্র ব্যবসায়ীরা আমাদেরই রক্ত আর হত্যার বিনিময়মূল্যে আরও ফুলেফেঁপে উঠুক। আমরা কার্লাইল গোষ্ঠীকে ডেকে বলতেই পারি; প্রচুর অস্ত্র কিনব, আমাদের ছাড় দিন আরও বেশি। মনে আছে তো, সেই কার্লাইল গোষ্ঠী, একই সাথে বিন লাদেন আর বুশ পরিবার যার শেয়ারহোল্ডার। আর যদি সব ঠিকঠাক চলে, অচিরেই আমরা আফগানিস্তানে পরিণত হব। যেমন প্রচার ওরা পেয়েছে, আমাদেরও তেমনই জুটবে। আমাদের ধান-গমের সমস্ত খেতখামার ভরে উঠবে মাইনে, আমাদের ঘরবাড়ি মিশে যাবে ধুলোয়, সব পরিকাঠামো হয়ে যাবে ধ্বংস্তূপ, আমাদের সন্তানেরা হবে বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী, নিজেদেরই সৃষ্ট ও পরিবেশিত ঘৃণায় আমরা নিজেরাই নিজেদের শেষ করে ফেলতে পারব তাহলে। আমরা হয়ত আমেরিকার কাছে আবেদন করতে পারি, এই সমবেত আত্মঘাতের কাজে, প্লিজ, আমাদের সাহায্য করুন। আর না হলে কে আছে, আকাশ থেকে পড়া খাবারের প্যাকেটের দিকে আমাদের ঊর্ধ্ববাহু দৌড়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ?

আত্ম-ধ্বংসের কতটা কাছে আমরা আছি ? আর হয়ত একটা পদক্ষেপ, তার পরই আমাদের আত্মনাশের পথ পরিচ্ছন্ন, অবাধ হয়ে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, গোয়ায় বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে ইতিহাস রচনা করলেন। তিনি হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্রকাশ্যে সৌজন্যের সমস্ত সীমালংঘন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিবেকহীন, অযৌক্তিক ধর্মান্ধতা উস্কে দিলেন, যা এমনকি জর্জ বুশ বা ডোনাল্ড রামসফেল্ডও বলতে অস্বস্তিবোধ করতেন। কী বললেন অটল বিহারী ? তাঁর কথায়, 'যেখানেই থাকে, মুসলিমরা কোথাও শান্তিতে বাস করতে চায় না।'

www.pathagar.com

তাঁকে ধিক্কার। কিন্তু তিনিই যে একা নন, তাঁর প্রতি একক ধিক্কারের তাই কোন মীমাংসাই নেই। গুজরাটের এই নিধনযজ্ঞের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আত্মবিশ্বাসী বিজেপি চাইছে ভোট হোক সে রাজ্যে, এখনই। বরোদা থেকে আমার বন্ধুই জানাল, 'ভদ্রতম মানুষজন, সুভদ্রতম ভাষায়, ভঙ্গিতেই বলছে, মোদিই আমাদের নায়ক।'

নিছক ভাল মানুষের মত আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম, গুজরাটের ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো রাগে, দুঃখে নিজ নিজ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে একটি জায়গায় এসে দাঁড়াবে। এককভাবে দেশ চালানোর জনাদেশ বিজেপি-র নেই। নেই হিন্দুত্বের প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার জনাদেশ। সাতাশ শরীককে নিয়ে এরা সরকার চালাচ্ছে। আমরা বোকার মত আশা করেছিলাম, এই শরীকরা সমর্থন তুলে নেবে। মূর্খের মত আমরা আশা করেছিলাম, এই দলগুলির সামনে এটাই হবে নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধতার ন্যূনতম পরীক্ষা। সময় দেখিয়ে দিল, শরীকরা শরীক হয়েই আছে। তাদের চোখে খেলা করে গণিতের আঁকিবুকি— কটা আসন বাড়বে বা কমবে, কোনো মন্ত্রক হাতে আসবে বা ফসকে যেতে পারে, শুধু এইসব হিসেব নিকেশ। দেশের একমাত্র অবশিষ্ট মুসলিম নেতা ফারুক আবদুল্লাহর নজর উপরাষ্ট্রপতি পদের দিকে। আর দলিত নেত্রী মায়াবতী ? উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটাই তাঁর বড় কথা। দেখলাম এটাও, এইচডি এফসি-র দীপক পারেখ ছাড়া দেশের কোনো কোম্পানি কর্তা গুজরাটের কাণ্ডকারখানার নিন্দায় মুখ খুলতে পারলেন না।

❐

www.pathagar.com

# কাঠের রুটি

–অরুন্ধতী রায়

নরেন্দ্র মোদির অপসারণ চেয়েছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। এটুকুই যথেষ্ট ? কাদের কাছে বোধবুদ্ধি বন্ধক রেখেছি আমরা ? কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষীদের দস্তুরমত বিচার ও কঠোরতম শাস্তি চাই। গোধরায় যারা ট্রেন পুড়িয়েছে তাদের শাস্তি চাই। গুজরাট জুড়ে যারা অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষদের হত্যার কাজে মত্ত সেই সমস্ত মানুষ, পুলিশ ও দায়ী প্রশাসন কর্তাদের শাস্তি চাই। যারা গণ উন্মত্ততায় ইন্ধন জুগিয়েছে, তাদের শাস্তি চাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে নরেন্দ্র মোদি, বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে এখনই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করতেই পারে সুপ্রিম কোর্ট। সকলেই জানেন সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্টই আছে।

যত জঘন্য অপরাধই করুন না কেন, ভারতে রাজনীতিকদের সাতখুন মাফ। নির্মম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েও তাঁরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান। বেড়াতে পারেন। একজন রাজনীতিকের শাস্তি হবে বা হচ্ছে, এ পোড়া দেশে এতটা কেউ আশাই করে না। নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সঙ্গীদের শাস্তি দাবি করলে অন্য নেতারা নিজেরাও যে ফাঁদে পড়তে পারেন। এঁদের ক'জনের অতীত নিষ্কলুষ ? তাই, চাচা আপন পরান বাঁচা! সংসদে তুলকালাম করে, অধিবেশন ভেস্তে দিয়ে এঁরা তদন্ত কমিশন গঠন করেন। ফলাফল, পর্বতের মূষিক প্রসব ! আসল ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রত্যেকেই ব্যস্ত। স্বার্থের অচলায়তন যাতে ধসে না পড়ে, সেদিকেই যে নজর সকলের। কী হবে, এর প্রতিকার, কার হাতে, কবে ?

গুজরাট নিয়ে একটা বিতর্ক কেবলই দানা বাঁধছে। ভোট হবে কি হবে না ? নির্বাচন কমিশনই কি ঠিক করবে সেটা ? না, সুপ্রিম কোর্ট ? ভোট এখনই হোক বা না হোক, নরেন্দ্র মোদিকে শাস্তি না দিয়ে রাজনীতিতে থাকার সুযোগ দেওয়াটা হবে গণতন্ত্রের হত্যা। গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বের পরাভব নয়, নিষ্ঠুর নির্মম অন্তর্ঘাত। সেটাই আরও গভীরতম সমস্যার আঁতুরঘর। গণতন্ত্রের গভীরতা বাড়বে কি বাড়বে না, সে প্রশ্ন এই মুহূর্তে একেবারেই অর্থহীন। গণতন্ত্রের চেহারা যেভাবে দুমড়ে, মুচড়ে অপরিচয়ের প্রান্তবর্তী করে তোলা হচ্ছে, তাতে এই সংশয় খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিক।

ভোট হলে যদি বিজেপি জেতে ? আশ্চর্য (একটি জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই হবে বিজেপি-র ভোট জয়ের কৌশল)

www.pathagar.com

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এরই মধ্যে জর্জ বুশের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ৮০ শতাংশ। প্যালেস্টাইনে অভিযান চালিয়ে কট্টরপন্থী এরিয়েল শ্যারনের জনপ্রিয়তাও ঊর্ধমুখী। এটাই কি তবে সমাধানের পথ ? যদি হয়, তবে বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি উঠে গেলেই বা কী আসে যায় আমাদের ? নৈতিকতার সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে গেলে, উবে গেলেও ক্ষতি নেই। ভোটেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হোক। গণহত্যা দিয়ে বড়জোর হতে পারে জনমত সমীক্ষা। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বীভৎস অসহিষ্ণুতা নিয়ে বিপণনমূলক প্রচার শুরু হতে পারে যে কোন দিন ! ফ্যাসিবাদের পদচিহ্ন ভারতের মাটিতে এখন স্পষ্টতর। সেই দানবীয় পদক্ষেপের চূড়ান্ত মুহূর্তটা ঘনিয়ে উঠলো ২০০২ সালের বসন্তে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সন্ত্রাসবিরোধী আন্তর্জাতিক জোট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লাগিয়ে দুনিয়া জুড়ে শান্তির অদ্ভুত আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছেন। হয়তো তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই শুরুর দিনগুলোতে ওঁরা আমাদের জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা দিলেন, কী বলবো তার প্রত্যুত্তরে ? কী জানাব ?

১৯৯৮ সালে পোখরান বিস্ফোরণেই ইংগিত জুটেছিল স্বদেশ চেতনা এবার রক্ত তৃষ্ণার চেহারায় জনজীবনে স্বীকৃতি পাবে। সময়ের চেয়েও দ্রুততায় তা প্রকাশ্য রাজনীতির মূলস্রোতও হয়ে উঠবে। 'শান্তির অস্ত্র' (পড়ুন পরমাণু অস্ত্র) ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের কিনারায়। হুমকি, পাল্টা হুমকি, বিদ্রূপ, পাল্টা বিদ্রূপের অজগর সদৃশ পাকে জড়িয়ে পড়েছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। একটি দ্বৈরথ ও অজস্র মৃত্যুর পর দুই রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ রক্তচক্ষু জওয়ান এখন মুখোমুখি সীমান্ত রেখায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেবলই বেড়ে চলা শত্রুতার মনোভাব সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে পড়েছে দেশের রাজনীতির উঠোনে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সহনশীলতা ছিল একদিন, তা বিদ্বেষের দু মুখো তলোয়ারে আজ আক্রান্ত। এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্তেই জনগণের কল্পনার সবটুকু দখল করে নেয় ঈশ্বর পরিত্যক্ত নরকের প্রাণীরা। আমরাই তাদের ডেকে আনি সাদরে। প্রতিবার। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা মাথাচাড়া দিলেই ভারতে মুসলিমরা নির্মমভাবে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিটি রণহুঙ্কারে আসলে আমরা নিজেদের উপরেই আঘাত হানি, আমাদের বিচিত্র ও প্রাচীন সভ্যতাকেও ছাড়ে না সেই আঘাত। আক্রান্ত হয় সেইসব কিছু, যার নিরিখে পাকিস্তান আর ভারত পৃথক দুটি দেশ। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও হিন্দু জাতীয়তাবোধ কেবলই সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই জাতীয়তাবোধে নিজের প্রতি সম্মানের চেয়ে অপরের প্রতি ঘৃণাই মিশে থাকে বেশি। এই 'অপর'

www.pathagar.com

আপাতত শুধু পাকিস্তানই নয়, তা 'মুসলিমও'। জাতীয়তাবোধ যেভাবে ফ্যাসিবাদে পরিণত হচ্ছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। ফ্যাসিস্টদের কাছে রাষ্ট্র শব্দটার অর্থ, তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা আমরা গ্রহণ করব না ঠিকই, পাশাপাশি এটাও তো মনে রাখতেই হবে যে, জাতীয়তাবাদই (সে সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী বা ফ্যাসিবাদী যাই হোক না কেন) বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি সংগঠিত গণহত্যার উৎস। 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটা শুনলে সতর্ক যে থাকতেই হয় আমাদের।

আধুনিক কোনো রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসেবে আমরা নিজেদের চিহ্নিত না করে যদি প্রাচীন সভ্যতার শরীক ভাবতে থাকি, তাহলে কেমন হয় ? একটি অঞ্চলের দখলদারির চেয়ে ভূখণ্ডের প্রতি আমাদের আবেগঘন ভালবাসা গড়ে তুললে কেমন হয় ? সভ্যতার কোন অর্থ সংঘ পরিবার বোঝে না। আমাদের স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই সঙ্কীর্ণ করে, ছোট করে, কলুষিত করতে চায় ওরা। কী ধরনের ভারত চায় শেষ পর্যন্ত, ওই সংঘ পরিবার ? মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, হৃদয়হীন, রক্তাক্ত অসম্পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর অবয়ব —পতাকা লাঞ্ছিত কসাইয়ের ছুরির আঘাতে যার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আমরাও কি সেই রকমই কোন উদ্দেশ্য আর আকাঙ্ক্ষায় বাঁচি ? আমরাই কি হতে দেব, সেই সর্বনাশ ?

ফ্যাসিবাদের যে ভ্রূণ গত কয়েক বছর ধরে বিকশিত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রবলতর হয়ে উঠলো, তা তো লালিত হয়েছে আমাদেরই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সকলেই ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে গণতন্ত্রের সাথে। সংসদ, সংবাদমাধ্যম, পুলিস, প্রশাসন, জনগণ, কে নয় ? 'ধর্মনিরপেক্ষ'রাও দায়ী এমন উত্তপ্ত পরিবেশ গড়ে উঠার জন্য। যখন কোন প্রতিষ্ঠান, অপরিমেয় কোনো ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যেতে চায় প্রশ্ন চিহ্নহীন আনুগত্যের আবহে, সেই প্রতিষ্ঠানের অধিকার রক্ষায় যদি নেমে পড়েন আপনি, তা হলেও হ্যাঁ, আপনি ধরে ফেললেন ফ্যাসিবাদের হাত। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। আসলে, প্রথম পদচিহ্নগুলি চিনে উঠা সবার পক্ষেই কঠিন, বেশ কঠিন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলি অদ্ভুত সাহসের সাথে গুজরাটের ঘটনাবলীর নিন্দা করে চলেছে। বিজেপি-র অনুগামীরা অনেকেই খাদের কিনারায় পৌঁছে হলেও নরকের গন্ধ পেয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, এই ক্রমাগত নিন্দারই জেরে। কিন্তু তাঁদের লড়াই কত দিন, কত দূর, কত জোর ? এটা তো আসন্ন ক্রিকেট মরসুমের জন্য তৈরি কোনও প্রচার কৌশল নয়। সব হত্যাই তো খবর হওয়ার মতো উপযুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

উঠে না সবসময়। রাষ্ট্র ক্ষমতার সবটুকু জুড়ে, ধীর, নিশ্চিত বিষ ছড়িয়ে দেওয়াও তো ফ্যাসিবাদেরই কৌশল। নাগিরক স্বাধীনতার ধীর সংকোচন, দৈনন্দিন অদৃশ্য অন্যায়কেও ফ্যাসিবাদই নিয়ে আসে, আবহ হিসেবে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা আসলে মানুষের হৃদয়, মন জয় করার লড়াই। স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা আর মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করে এ লড়াই হয় না। এই লড়াইয়ের মানে, জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে শিকারি ঈগলের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা। তাদের জবাবদিহির দায় আদায় করা। এই লড়াইয়ের তাৎপর্য, মাটিতে কান পেতে শোনা, প্রকৃত ক্ষমতাহীনদের সুদীর্ঘ শ্বাসপতনের শব্দ। কৃষকের উদ্বেগ, তাঁতির যন্ত্রণা, মেয়েদের আয়, বিবাহোত্তর ধর্ষণ, মুচলেকা দেওয়া, শ্রমিক, যৌন অগ্রাধিকার, ইউরেনিয়াম মজুত, অবৈধ উত্তোলন— এসব বাস্তব বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে যে অজস্র প্রতিবাদ আন্দোলনে অগণন স্বর, তার সঙ্গে গলা না মেলালে এই লড়াইয়ে অংশই নেয়া যায় না। দারিদ্রের সাথে লড়াই আর উচ্ছেদের প্রাত্যহিকতায় নিজেকে না মেলালে আপনি কী করে ভাববেন, এই লড়াইয়ে আপনিও একজন সহযোদ্ধা, সহকর্মী ? আসল ঘটনা থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে সদাব্যস্ত, চঞ্চল, অস্থির, আবেগ-উসকানো, নাটুকে টিভি প্রোগ্রাম আর খবরের কাগজের লেখাপত্রের বিরুদ্ধে নিজেকে, নিজের চেতনাকে না দাঁড় করালে আপনি কোন্ নিরিখে লড়বেন ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের সঙ্গে ?

দেশের বেশির ভাগ মানুষ গুজরাটের ঘটনায় শিহরিত, আতঙ্কিত। অনেকেই কিন্তু এই শিহরনের আরও কাছে যাওয়ার জন্য নিজেদের মগজধোলাই করে নিয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন পার্কে, ময়দানে, ছোট খোলা মাঠে, গ্রামের প্রান্তরে মার্চ করছে আর এস এস। তুলছে গেরুয়া পতাকা। কীভাবে যেন চারদিকে শুধুই গেরুয়া, গেরুয়া, গেরুয়া, খাকি প্যান্ট, তারা কুচকাওয়াজ করছে, করছে, করছেই সর্বত্র। কীসের জন্য ? কোথায় যেতে চায় তারা ? ইতিহাসের প্রতি স্বাভাবিক অসম্মান তাদের এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখেছে, আকস্মিক এসে পড়বে ফ্যাসিবাদ আর আত্মবিলোপের পথে অবধারিত হাঁটতে হবে তাদেরও। নিজেদেরই মূর্খতায়, হায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মত, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বিকলাঙ্গ হয়েই বাঁচবে। সে কি কোন আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ? তাহলে, কী সেই আকাঙ্ক্ষা ? কোন্ আত্মপ্রতিষ্ঠার ? যার উৎসে থাকে ঘৃণা ? ক্রোধ ও ঘৃণার এই মাত্রাকে প্রকাশ্য নিন্দায় বা নিষেধাজ্ঞায় কখনও প্রশমিত করা যায় না। দূরে সরানোর কথা তো ভাবতেই পারা যাচ্ছে না। ভ্রাতৃত্ব বা

www.pathagar.com

ভালবাসার স্তবগুলো, গাথাগুলি নিশ্চয়ই মহান, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে তা যে মোটেই যথেষ্ট নয়।

জাতীয় মোহভঙ্গের বোধ থেকেই যে ফ্যাসিবাদী শক্তি আর আন্দোলন তার সর্বগ্রাসী আগুনের যাবতীয় রসদ কুড়িয়ে নেয়, সে কথা তো ইতিহাস থেকেই জেনেছি আমরা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যগুলো একটু একটু করে অপচয় করে, উড়িয়ে দিয়ে যে স্বপ্ন ভেঙে ফেলা হয়, সেই ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে জুড়েই তো ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদের শরীর আর মন উঠলো গড়ে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে গান্ধীজির সেই বিখ্যাত শব্দবন্ধ, 'কাঠের রুটি', মানে অভুক্ত দশাতেও যা খাওয়া যায় না, সেই তো স্বাধীনতা আমাদের তাৎপর্যে, বাস্তবেও। দেশ ভাগের সময় যে হাজার হাজার মানুষ নিহত হলো, তাদের রক্তে কলঙ্কিত যে স্বাধীনতা, সে তো এক ধারণাই কেবল, ভাবা যায়, স্বাধীনতারই ধারণা। অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে ঘৃণা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা যেন রাজনৈতিক নেতাদের অলস মনোরঞ্জনেরই বিষয় হয়ে থেকেছে। কোনো রাজনৈতিক নেতা সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ারও চেষ্টা করেননি। এই তৎপরতার সূত্রপাতে ও নেতৃত্বে সেই নেত্রী, ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের হাড়মজ্জা পর্যন্ত শুষে নিয়েছে, ভোটের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটার অর্থ নিয়ে যেন খেলা করেছে। যেমন সুড়ঙ্গ বানায়, অথবা ভূগর্ভস্থ কোনো পথ বানাতে যেমন খুঁড়ে চলে পাহাড়, সে রকমই ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে শব্দটাকে। এখন চারপাশেরই চাপে চাপে নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে আছে ওই একদা কী বিপুল প্রতিশ্রুতিময়, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। সংবিধান, সংসদ আর বিচার বিভাগকে জুড়ে আমাদের যে কাঠামো, তার ভিতটাই দুর্বল হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলোর ওই শুষে খাওয়ার অবিরাম তৃপ্তি ও প্রাপ্তিতে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড তো ওই তিনটি বিভাগেরই সমবায়ে, সমন্বয়ে, তাদের ভারসাম্যে ও নিয়ন্ত্রণে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন রাজনীতিকদের দোষ দেওয়া বা তাঁদের কাছে নৈতিকতা আশা করা অর্থহীন, কোন মানে নেই তার। তাঁরা যে অক্ষম— সত্যিই। সেই জনগণ তো সত্যিই করুণারই পাত্র, যে কেবল তার নেতাদের জন্য হাহাকার আর বিলাপ করে। যদি সত্যিই নেতারা, রাজ নীতিকরা আমাদের দাবিয়েই থাকে, তবে তা আমাদেরই জন্য। আমরাই তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছি। এই যুক্তি তো দেখানোই যায় যে, নাগরিক সমাজ ব্যর্থ হয়েছে নেতাদের সুবাদে, নেতারা ব্যর্থ তাদের সমাজের সুবাদে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এক বিপজ্জনক অথচ ব্যবস্থাজাত

www.pathagar.com

গলদ আছে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে। সে গলদের ফোকর গলেই রাজনীতিকরা ঠকিয়ে যেতে পারেন সাধারণ মানুষকে, দশকের পর দশক। গুজরাটে যা ঘটেছে, তা ওই বহমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই কুৎসিততম ফলাফল। গাছের শিকড়গুলো জুড়ে এখন আগুন। এই আগুন আমাদের নেভাতেই হবে। আগুনের চরিত্র ভুলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? এই দুঃসময়ে ? কিন্তু রাজনীতিকরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই আবহ থেকে ফায়দা তুললেন বা তোলার নিরন্তর চেষ্টা করে গেলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দরজায় ফ্যাসিবাদের এই কড়া নাড়ার সেটাই এক ও একমাত্র কারণ।

গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে, দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার আশা-প্রত্যাশাগুলি সযত্নে ছেটে ফেলা হয়েছে, তাদের অনুভব আর উপলব্ধি থেকে। মর্যাদার সাথে জীবনযাপন, প্রতিদিনের নিরাপত্তা, দারিদ্রময় দিনযাপনের থেকে রেহাই—কোন কিছুই জোটেনি তাঁদের। দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি, মানে যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উপর টিকে আছে ভারত বর্ষের গণতন্ত্র, তার কোনটিরই সাধারণ মানুষের কাজে না লাগার মত বাস্তবতা ও আবহ তিলে তিলে তৈরি করা হয়েছে। কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতাই নেই প্রতিষ্ঠানগুলির। হায় ! কখনও সেগুলি অক্ষম, কখনও অনীহার ভারে জর্জরিত। সামাজিক ন্যায়ের কোনো কাজেই কোনো ভূমিকা নেই সেগুলির। প্রকৃত সমাজ পরিবর্তনের সমস্ত প্রয়াস, যাবতীয় কৌশল, পদ্ধতি—যেমন ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সমবণ্টন, যেসব বিভেদ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় তার ঠিকঠাক রূপায়ণ—সব কটিকেই চতুর, নিষ্ঠুর, ধারাবাহিকভাবে হয় ছেঁটে ফেলা হয়েছে, নয়ত ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। কারা দিয়েছে ? রাজনৈতিক ক্ষমতার বারান্দায় যাদের দাম্ভিক, বাস্তব পদচারণা—তারাই। এখন তো বাণিজ্যের ভুবনীকরণের নিরন্তর, একতরফা প্রবেশকাল। কোথায় ? এক আশ্চর্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যেখানে সামাজিক বুননটাই জটিল, ভেদনিব্যাসে ঠাসা। কোথায় তার সংহতি ? এখন যেন সে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আরও বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত হওয়ার দিকে চলেছে।

❐

www.pathagar.com

# আমরা কি আদৌ তৈরি ?

–অরুন্ধতী রায়

সত্যিই, এখানে অনেক বাস্তব ক্ষোভ আর যন্ত্রণা আছে। ফ্যাসিবাদী শক্তি কিন্তু সেগুলো গড়ে উঠার পেছনে কোথাও দায়ী নয়, কোনোভাবেই নয়। তারা শুধু এসব ক্ষোভ আর যন্ত্রণাকে কাজে লাগাচ্ছে সুগভীর নৈপুণ্যে, চতুর কৌশলে, ভিন্নখাতে বইয়ে দিচ্ছে ক্ষোভ আর যন্ত্রণার অভিমুখ, বদলে দিতে চাইছে এক অর্বাচীন, কুৎসিত, জঘন্য গর্ববোধে। তারা মানুষকে জমায়েত করছে, ব্যবহার করছে এক অদ্ভুত সাধারণ গোষ্ঠী বিভাজনকে, সেই বিভাজিকার নামই তো ধর্ম। যেসব মানুষ নিজেদের জীবনের উপর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, যেসব মানুষ নিজেদের বরাবরের বাসভূমি থেকে উৎপাটিত, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত, তাদের তো কোনো একটা কিছুর গর্বে গর্বিত করে তুলতে হবে। না হলে সে বাঁচবে কোন গর্বে বা অহংকারে, ওই শতচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত জীবনে ? সেটা তবে হোক সত্যিই এমন কিছুর গর্ব, যা সে অর্জন করেনি, পারবেও না, হোক তবে এমন কিছুর গর্ব যা সে ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রয়াসে অর্জন করতে অক্ষম, হোক এমন কিছুর যেটা বায়বীয়, অবাস্তব, রক্তমাংস থেকে দূরবর্তী। ওই গর্বের অসারতা, ভিত্তিহীনতা, মিথ্যাই শেষ পর্যন্ত গড়ে দিচ্ছে, কী আশ্চর্য ক্রোধ, আর রণক্ষেত্র বানিয়ে নিচ্ছে মানুষ, নিজের জীবন, সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশী, সংসারটাকেই। খুঁজে নিচ্ছে, তৈরি করছে শত্রু, যার বিরুদ্ধে ব্যবহারে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে হাতের অস্ত্র। অ্যাক্ষি থিয়েটারে ষাঁড়টিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে তাকে খেপিয়ে তোলার দৃশ্য কি মনে পড়ে না আমাদের ?

দেশের দ্বিতীয় দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে পথ দেখতে বলার বা অধিকার বঞ্চিত বেঁচে থাকার হুমকির এই কর্মসূচীকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি ? আর সেই কাজে কেন লাগানো হচ্ছে দেশেরই দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী, ওই দলিত ও আদিবাসীদের ? কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন যে গুজরাটে হাজার হাজার বছর ধরে উচ্চবর্ণের হাতে শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত দলিতরা এখন তাদের সেই শোষকদের সাথেই হাতে হাত মিলিয়ে নেমে পড়েছে মহল্লায় মহল্লায় মুসলিমদের হত্যা করতে ? কারা বেশি ভাগ্যবান, দলিতরা না মুসলিমরা ? তারা কি শুধুই টাকার জন্য, মজুরির জন্য ভাড়া খাটছে মহল্লায় মহল্লায় ? এই পৃষ্ঠপোষকতা কি কোথাও সংগত, স্বাভাবিক ? তাদের নিজের

www.pathagar.com

কাছেও কি আছে নিজেদের কাজের কোনো ব্যাখ্যা বা যুক্তিসংগতি ? নাকি আমিই হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি দিন দিন ? দুর্ভাগ্যবানদের কাছে এটা বোধহয় খুব স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের চেয়ে একটু বেশি দুর্ভাগাদের উপরেই তারা নিজেদের যাবতীয় ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ উগরে দিতে চায়। কারণ তাদের প্রকৃত শত্রু বা শোষকরা যেসব প্রতিক্রিয়ার আওতার বাইরে। প্রকৃত শোষকদের কাছে কীভাবেই বা তারা পৌঁছে দেবে নিজেদের জীবন যন্ত্রণা আর ক্ষোভের, প্রতিবাদের বার্তা ? তাদের নিজেদের নেতারা তো ইতিমধ্যেই উপর তলার সাথে চমৎকার সমঝোতায় বদলে নিয়েছেন নিজেদের জীবন যাত্রা, আর বাকিদের মাতিয়ে রেখেছেন প্রবলতর, অন্ধ হিন্দুত্বের উপাসনায়। (প্রথম ধাপ, একটা পৃথিবীব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্যের ডাক দেওয়া, ইতিহাসে যেমন আমরা দেখেছি, ব্যর্থতায়, ফ্যাসিবাদীদের গলায়, রোমান গৌরব ফিরিয়ে আনার, জার্মান জাতির বিশুদ্ধিকরণের অথবা ইসলামি সুলতান রাজ তৈরির প্রয়াসে)।

১৩ কোটি মুসলিম ভারতবর্ষে বাস করে। হিন্দু ফ্যাসিবাদীরা মনে করে, এই মুসলিমরা তাদের আক্রমণ ও নিধনের বৈধ অভিমুখ। মোদি এবং বাল ঠাকারের মত মানুষজন কি মনে করেন যে তাঁরা 'গৃহযুদ্ধ' বাধিয়ে দিয়ে মুসলিমদের শেষ করে দেওয়ার ব্রত নিলে সারা পৃথিবী তা চুপচাপ বসে দেখবে ? খবরের কাগজে দেখছি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্য বেশ কিছু দেশ গুজরাটের ঘটনার নিন্দা করেছে। তুলনা করেছে নাৎসি জমানার সংগে। ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়াটা কেমন আরও মজাদার, আকর্ষক। সরকার জানিয়েছে, ভারতের সংবাদ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভারতেরই অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয় বিদেশিদের। যেমন, কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও হয়, তাই না ? এরপর কী করা হবে তা হলে ? সেন্সরশিপ ? ইন্টারনেট বন্ধ করা ? আন্তর্জাতিক ফোন ঠেকিয়ে রাখা ? ভুল জঙ্গিদের মেরে তাদের 'ডি এন এ' রিপোর্ট জোড়াতালি দেওয়া হবে ? আসলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সমতুল কোন সন্ত্রাসের জন্ম হয়নি মানব সভ্যতায়।

কে এসবের মোকাবিলার দায়িত্ব নেবে ? ফ্যাসিস্টদের ভাষা, সংকেত বা বাক্ষ-রীতির বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ হয়ত রক্ত ও বজ্রপাতে কিছু ধাক্কা দেবে, কী হবে সেই ধাক্কায় ? কে বসবে নড়েচড়ে অথবা কুঁচকে উঠবে তার ভ্রূযুগল। একমাত্র আবেগ মথিত সাড়া দিতে দেখলাম সেই লালুপ্রসাদ যাদবকে। নিজস্ব বাচনে তাঁর সাফ কথা, 'কোনো মায়ের ছেলে বলছে যে এটা হিন্দু রাষ্ট্র ? তাকে পাঠাও আমার কাছে, আমি তার বুক চিরে দেব ?'

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসবের কোন চটজলদি সমাধান নেই কোথাও। ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা একমাত্র তখনই করা সম্ভব, যখন এইসব ক্রোধ আর ঘৃণায় আক্রান্ত মানুষগুলোকে সামাজিক ন্যায়ের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা যাবে। সামাজিক ন্যায়ের জন্যই গড়ে উঠবে সব আন্দোলন, সব প্রতিবাদ, সব সমাবেশ, সব মিছিল। আজকের হানাহানির চেয়েও অনেক বেশি মানসিক তাগিদেই গড়ে তুলতে হবে ওই আন্দোলন, প্রতিবাদ, সমাবেশ আর মিছিল। তবে, একমাত্র তবেই হবে।

আমরা কি সত্যিই তা শুরু করতে প্রস্তুত ? প্রতিজ্ঞা কি প্রস্তুত ঘরে ঘরে ? কোটি কোটি ভারতবাসী, আমরা কি আদৌ তৈরি, শুধু পথে নামতেই নয়, স্কুলে কলেজে, কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ও সমবেত সিদ্ধান্তে, প্রতিটি পসন্দে, প্রতিটি সংলাপে, প্রতিটি মন্তব্যে, ওই কাজের জন্য ? হয়তো এখনই তা নই।

যদি না হই, তবে আজ থেকে বহু পরে, বাকি পৃথিবীর মানুষ এড়িয়ে চলবে আমাদের, যেমন হিটলারের জার্মানির সাধারণ মানুষকে চলে এড়িয়ে। আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে সেই পরিবর্তনের জন্য, যখন এ পৃথিবীরই মানুষজন আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। আমরা আমাদের অক্ষমতায়, অপদার্থতায়, দেখতেই পাব না, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে, নিজেদেরই চোখ, লজ্জায় বন্ধ হয়ে আসবে আমাদেরই চোখের পাতা, যা আমরা করেছি আর যা আমরা করিনি, সে সবের জন্য। যা আমরা হতে দিয়েছি, সেই জঘন্যতার জন্য, লজ্জায়।

এই আমাদের বর্তমান। এ ভারতবর্ষে। এই আমাদের সময়। এই রাতের গভীরতর অন্ধকার পার থেকে কে পথ দেখাবে আমাদের, কোথায় সেই পরিত্রাণ ? কোথায়, কার কাছে ?

❐

www.pathagar.com

# নিষ্ক্রিয়তার মাশুল শুনছি আমরা

–অরুন্ধতী রায়

মধ্যরাত্রে বরোদা থেকে ফোনটা এলো। আমার এক বান্ধবীর। কাঁদছে। কি ঘটনা শুধু সেটা বুঝাতে সময় নিল ১৫ মিনিট। যদিও তেমন কিছু জটিল বিষয় ছিল না সেটা। শুধু তার এক বান্ধবী সইদা, এক উন্মত্ত দাঙ্গাবাজদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারপরে আর নতুনত্ব কিছু নেই, শুধু পেটটা চিড়ে নাড়িভুড়ি বের করে পেট্রোলে ভেজানো ন্যাকড়া তার পাকস্থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারা। এবং কেউ একজন কোনো যন্ত্রণা দেবে না বলেই হয়তো সঈদা মরার পর তার কপালে ছুরি দিয়ে খুদে লিখে দিয়েছিল ওঁ।

সঠিকভাবে কোনো হিন্দুশাস্ত্র এ নাদব্রহ্মকে ছড়িয়ে দিতে চায় সর্বভূতে ?

গোধরায় সবরতমী একস্‌প্রেসের মুসলিম 'সন্ত্রাসবাদী' যারা ৫৮ জন হিন্দু যাত্রীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল, সেই ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিবর্তক্রিয়া হিসেবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের সাম্প্রতিক গণহত্যার ঘটনাবলীকে বৈধতা দিয়েছেন।

এ নারকীয় ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকেই ছিল কারো ভাই, কারো মা, কারো সন্তান। স্নেহ মমতার বন্ধনে আত্মার আত্মীয় ছিল কারো না করোর—এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই।

এইভাবে জ্যান্ত মানুষকে ঝলসে হত্যা করার জন্য নির্দিষ্টভাবে কোরআনের কোন স্তবকের অনুমোদন লাগে ?

যতই দু' পক্ষ তাদের ধর্মের পার্থক্য বোঝানোর জন্য পরস্পরকে জবাই করছে, ততই পৃথকভাবে উভয়কেই চেনাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু পূজার একই বেদীতে তারা শব সাধনায় মত্ত। যে নামেই ডাকুন না কেন, উভয়েই নির্বিকার গণহত্যায় একই মৃত্যু দেবতার নিষ্ঠাবান প্রচারক।

আর এরকম ব্যধিগ্রস্থ ক্লীন্ন সময়ে, যে কোনো মানুষের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গণহত্যায়, এমন স্বেচ্ছাচারী বৈধতার বিধান জারি করার এই ছেদবিন্দু থেকেই গুজরাটে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার যাত্রা শুরু।

ঠিক এই মুহূর্তে বিষের পানপাত্রে চুমুক দিচ্ছে সারা দেশ। সহস্র ছিদ্রময় গণতন্ত্র, তারই গভীরে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের ঘনীভূত গাদ। বিশুদ্ধ আর্সেনিক।

আমরা কী করবো ? কী করতে পারি আমরা ?

www.pathagar.com

শাসক দল অপরিমেয় রক্ত ক্ষরণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অতি নাটকীয় বাগাড়ম্বরে পোটা আইন জারি করা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই সামরিক মস্তানদের মতো অহর্নিশি ভয়ঙ্কর তড়পানি, সংগে পারমাণবিক পেশী শক্তির আস্ফালন। রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে সীমান্তে ১০ লক্ষ সেনানীকে অতন্দ্র প্রহরায় দাঁড় করিয়ে অসহনীয় ক্লীবত্বের নিরাপদ সুড়ঙ্গে মেকি উত্তেজনার আগুন পোহানো। এরই সাথে স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের চরম বিকৃতি—প্রতিটি নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত, পরাজিত হওয়ার অসম্মান থেকে এসব কোনো কিছুই তাদের বাঁচাতে পারছে না। এমনকি এদের দলের পুরনো বহু ব্যবহৃত কৌশল, প্রয়োজনে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কর্মসূচীকে মাঝে মাঝে হিমঘর থেকে বের করে আনার কোনো ধূর্তামিও আর কাজে লাগছে না। এমন গভীর বিপন্নতা থেকে ভেসে উঠার মরিয়া চেষ্টাতেই গুজরাটের জীবনদায়ী মরণ অভিযান।

গুজরাটই হচ্ছে ভারতের একমাত্র এবং অন্যতম প্রধান রাজ্য, যেখানে বিজেপি সরকারে আছে। যেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে মরণ ব্যধির চাষ হচ্ছে। যেখানে হিন্দু ফ্যাসিবাদের তীব্র সংক্রমণে নির্বাচনী রাজনীতিতে ধারাবাহিক বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে বিজেপি।

গত মাসে তার প্রাথমিক ফলাফলটা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শনীর জন্যই প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

গোধরার মর্মান্তিক ঘটনায় এক ঘন্টার মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে পরিকল্পিত গণহত্যার অভিযান শুরু করে দেয়। সরকারি মতে মৃতদের সংখ্যা ৮০০। অন্য সূত্রের রিপোর্টে এই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে ২০০০-এর অনেক উপরে। দেড় লক্ষ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি, আশ্রয় থেকে তাড়ানো হয়েছে। এখন উদ্বাস্তু শিবিরগুলিই তাদের ঠিকানা। মেয়েদের জামা-কাপড় খুলে বে-আব্রু করে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। সন্তানদের সামনে বাপ-মাকে মারা হয়েছে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে ২৪০টি দরগা, ১৮০টি মসজিদ।

এখন আর কেউ আহমেদাবাদে গিয়ে ওয়ালি গুজরাটির সমাধি সৌধের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাবে না। রাতারাতি অ্যাসফল্টে পাকা রাস্তার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে আধুনিক উর্দু কবিতার জনকের শেষ শয্যার সব স্মৃতিচিহ্ন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মহৎ শিল্পী ওস্তাদ ফৈয়াজ আলি খানের সমাধি-সৌধ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তারপর যেন পরম কৌতুক গোলাকৃতি পুষ্প স্তবকের মতো জ্বলন্ত টায়ারের অগ্নি বলয়ে ঢাকা হয়েছে সেই ধ্বংসাবশেষ।

www.pathagar.com

লুট আর আগুন লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট বাহিনী। দোকান, হোটেল, কাপড়ের মিল, বাস, প্রাইভেট গাড়ি নিঃশেষে লুট করে পোড়ানোর কাজটা বেশ সুচারুভাবেই সম্পন্ন করেছে তারা। কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কে ডুবে যাচ্ছে।

কংগ্রেস সাংসদ ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি এক উন্মত্ত দাঙ্গাবাজদের ঘেরাও-এ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ডিরেক্টার জেনারেল অব পুলিশ, পুলিশ কমিশনার, চিফ সেক্রেটারি, অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি (হোম) প্রত্যেকের কাছেই এহসান জাফরির টেলিফোন মর্মান্তিক আর্তির মত বেজে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই ঘাকতদের অবরোধে বন্দী জাফরির বেঁচে থাকার মরিয়া আহ্বানকে উপেক্ষা করেছে অসহনীয় ঔদাসিন্যে। ভ্রাম্যমান পুলিশ বাহিনীর গাড়ি ঘাতক বাহিনীর হিংস্র অবরোধ ছত্রভঙ্গ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। হত্যাকারীরা সব দরজা, লোহার গেট ভেঙে জাফরির বাড়িতে ঢুকেছে। বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মেয়েদের একে একে নগ্ন করে ক্ষতবিক্ষত,খণ্ড বিভাজনে পেট্রোলে ভিজিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। এহসান জাফরির মাথা কেটেছে এক কোপে। তারপর দেহের প্রতিটি উপাঙ্গ কেটেছে।

এই অতলস্পর্শী বর্বরতা কী নেহাৎই কাকতালীয়, যে রাজকোট উপনির্বাচনে এহসান জাফরি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কঠোর সমালোচক ছিলেন?

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দলের লুম্পেন বাহিনী ছাড়াও গুজরাটের সর্বত্র জনগণ ঘাতক বাহিনীতে সংগঠিত হয়েছে। পেট্রোল বোমা, বন্দুক, ছুরি, তলোয়ার, ত্রিশূলে সশস্ত্র হয়েছে নিজেরাই। এই বেহেড মাতাল বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে দলিত এবং আদিবাসীরা। মধ্যবিত্তরা লুটের অভিযানে অংশ নিয়েছে সংঘবদ্ধভাবে। এমনও ঘটনা আছে যে, একটি বৃহদায়তন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যখন লুট চলছে, তখন মিৎসুবিসি ল্যান্সারে চেপে সপরিবারে হাজির হয়েছে সম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত, লুটের মাল নেয়ার জন্য।

সেইসব লুটেরা বাহিনীর নেতার কাছে কম্পিউটারে বিশ্লেষিত সম্পত্তির বিস্তৃত তালিকা। মুসলিম বাড়িগুলিতে কি কি দামী জিনিস আছে, কার বাড়িতে কোন কোন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আছে, কোন দোকানে মহার্ঘ পণ্যের মজুত কতটা, কোন ব্যবসায় আর্থিক সামর্থ কী, কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর সংগে মুসলিম অংশীদারিত্ব আছে—এসব তথ্যের কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট নিয়েই তারা এই সর্বাত্মক অভিযানে নেমেছে। সংগে সব খুনে লুটেরা বাহিনী এবং সদর দপ্তরের সংগে সমন্বয় সাধনের জন্য আছে মোবাইল ফোন। আর আছে ট্রাক ভর্তি গোলাবারুদের মতো হাজার হাজার গ্যাস সিলিন্ডার। কয়েক সপ্তাহ ধরে আগাম সংগ্রহ করে এগুলি জমানো হয়েছে। মুসলিমদের

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এগুলিই ভয়ঙ্কর কার্যকরী বিস্ফোরকের কাজ করেছে।

তারা শুধু সুরক্ষা কিংবা গণহত্যার অভিযানে বিশ্বস্ত সাথী হিসেবে পুলিশকে পায়নি। প্রতিটি অভিযান সফল করার জন্য পুলিশের কভারিং ফায়ারেই আগাম শত্রু নিধনের সুযোগটা পেয়েছে তারা।

যখন গুজরাট পুড়ছে, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এম টিভিতে তাঁর নতুন কবিতা নিয়ে গানের অ্যালবামগুলির দৃশ্যায়ন উপভোগ করছিলেন (সংবাদ জানাচ্ছে ইতিমধ্যে লক্ষাধিক ক্যাসেট বিক্রি হয়ে গেছে, বিরতিহীন গণহত্যায় বিধ্বস্ত গুজরাটের ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখতে তিনি ঘটনার মাসাধিক কালের মধ্যেও সময় করে উঠতে পারেননি। যদিও এই সময়েই দু' দুবার পাহাড়ে ছুটি কাটিয়ে এসেছেন তিনি)।

যখন বাজপেয়ী গুজরাট সফরে গেলেন, নরেন্দ্র মোদিও তাঁর সফর সঙ্গী হলো। তিনি শাহ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ঠোঁট নড়েছিল, তিনি ব্যথিত হওয়ার ভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আন্তরিকভাবে। কিন্তু গুজরাটের রক্তাক্ত বধ্যভূমিতে, নিদারুণভাবে ভগ্ন বিশ্বাসের অনির্দিষ্ট বাতাসে কিছু শূন্যগর্ভ শব্দের কাঁপন ছাড়া হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত গভীরতম সমবেদনার কোনো বাক্যই গঠিত হয়নি।

এরপর আমরা জেনেছিলাম গল্‌ফ কার্টে চেপে মখমল সবুজ পাহাড়ি ঢালে মৃদুমন্দ দোদুলদোলায় কিছুটা অবসর উপভোগ, আবার সিঙ্গাপুরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্পর্কিত আলোচনাতেও ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

হত্যাকারীরা গুজরাটের পথে পথে এখনও বিজয়ীর গর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গণ বিচার আর গণহত্যার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান ঘাতক বাহিনীর অভিযানও প্রতিদিনের নিয়মবদ্ধ কাজের মতোই চলেছে।

কঠোর নজরদারীর মধ্যে সবকিছু একেবারে নখদর্পনে—কে কোথায় এখনও বেঁচে থাকতে পারে, কে কী বলতে পারে, কে কার সাথে কোথায়, কখন দেখা করতে পারে ; এদের ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পরিধি-পরিসর সবকিছু দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

ধর্মীয় বিরোধ এখন দ্রুত সম্পত্তির বিরোধ, পারিবারিক সংঘাত, জল সম্পদ কাকে কতটা দেয়া হবে, কারাই বা পাবে না এক ফোঁটা জল ; সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ারও দ্রুত হাত বদল হচ্ছে (নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকার এজন্যই তো আক্রান্ত হয়েছিলেন)।

মুসলিমদের সব কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলিম কর্মীরা আর রেস্টুরেন্টে খাবার দিতে পারবে না। মুসলিম শিশুদের আর বিদ্যালয়ে স্বাগত জানাবে

www.pathagar.com

না কেউ। মুসলিম শিক্ষার্থীরা মনোজগতের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সন্ত্রাস এখনও ভুলতে পারছে না বলে পরীক্ষায় বসতে অক্ষম।

মুসলিম পিতামাতারা পাখি পড়া করে তাঁদের বাচ্চাদের শিখিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তবুও আতঙ্ক তাঁদের ছাড়ে না। কে জানে কখন সবার সামনে তাঁদের শিশুরা ক্ষণিক বিস্মরণে 'আম্মি', 'আব্বা' বলে ডেকে আচম্বিতে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ডেকে আনে।

ইতিমধ্যে নোটিশও দেওয়া হয়েছে ঃ এটা সবে শুরু।

এটা কি সেই হিন্দু রাষ্ট্র, যেখানে আমাদের সকলকে সামনের দিকে দেখতে বলা হয়েছিল ? মুসলিমদের একবার যখন "তাদের জায়গাটা দেখিয়ে রওয়ানা করে দেওয়া হবে" তখন সত্যিই কি দুধ আর কোকাকোলা বয়ে যাবে সারা দেশে ? একবার রামমন্দির নির্মাণ হলে প্রত্যেকের শরীরে জামা, প্রতিজনের পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আয় জুটবে ? প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে যাবে প্রত্যেকের চোখ থেকে ? আগামী বছরে এতসব কিছুর বার্ষিকী উদযাপন করতে পারব, এমনটি কি প্রত্যাশা করতে পারি ? নাকি ঘৃণা করার মতো অন্য কাউকে খুঁজে নেওয়া হবে ?

বর্ণানুক্রমে আদিবাসী, বৌদ্ধ, খৃস্টান, দলিত, পার্সি, শিখ ? যারা জিনিস পরে, যারা ইংরেজীতে কথা বলে কিংবা যাদের পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল ?

এসবের জন্য আমাদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। ইতিমধ্যে সবই শুরু হয়ে গেছে। তবে কি প্রচলিত ধর্মীয় আচারেই সবকিছু সম্পন্ন হবে ? মানুষের মাথা কি এক কোপে ছিন্ন হবে ধড় থেকে ? দেহের সমস্ত প্রত্যঙ্গ খণ্ডবিখণ্ড করে কেটে সেই সব দেহের উপর কি মূত্রত্যাগ করা হবে ? অর্ধস্ফুট মনুষ্য সন্তানকে মায়ের পেট চিঁড়ে বের করে এনে জবাই করা হবে কি এভাবে ?

কী ধরনের অধঃপতিত দৃষ্টিভঙ্গি হলে ভারতবর্ষে আর তার মহাবিস্তৃত অপরিমেয় সৌন্দর্য, সবকিছু ভুলে, এমনকি কল্পনার মধ্যেও এভাবে ভাবা যায়। এ কোন অন্তহীন নৈরাজ্য আর পাশবিকতার সংস্কৃতি ? তাহলে ভারতবর্ষ কি স্মৃতিসৌধে পরিণত হবে। আর শ্মশানে কিংবা গোরস্থানের শবগন্ধী বাস উঠবে তার রক্ত মজ্জায় কর্দমাক্ত মাটি থেকে ?

যারা মরলো তারা কারা, কীভাবে, কত নৃশংসতায় হত্যা করা হয়েছিল তাদের—এটা মোটেই প্রশ্ন নয়। অতিক্রান্ত সপ্তাহগুলোতে গুজরাটে যারা মারা গেল তাদের প্রত্যেকের জন্য শোক জ্ঞাপনের কারণ আছে।

প্রতিদিন শয়ে শয়ে হিংস্র চিঠি আসছে। প্রতিটি চিঠিতে প্রশ্ন—কেন মেকী 'ধর্মনিরপেক্ষ'রা গোধরায় সবরমতী একসপ্রেসের ঘটনাকে অবশিষ্ট গুজরাটের হত্যাকাণ্ডের সংগে একই ভাষায় তীব্র ঘৃণা নিয়ে নিন্দা করছে না ?

www.pathagar.com

তারা যেটা বুঝতে চাইছে না যে গণহত্যা, যেটা গুজরাটে চলছে তার সাথে সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না যে, গোধরার অগ্নিকাণ্ডের পেছনে কারা ছিল। কার্যত ন্যূনতম কোনো প্রমাণ ছাড়াই সরকার এটাকে আইএসআই চক্রান্ত বলে জানিয়েছে।

অথচ অন্যান্য নিরপেক্ষ সংবাদসূত্র জানাচ্ছে যে—এক উত্তেজিত জনতা ট্রেনটা জ্বালিয়েছে। সে যাই হোক না, এটাও এক চূড়ান্ত অপরাধমূলক ঘটনা। যদিও সরকারী অনুসন্ধানেই জানা গেছে সেটা পূর্বপরিকল্পিত নয়।

কিন্তু নিরপেক্ষ রিপোর্টেই জানা গেছে, গুজরাটে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ গণহত্যার অভিযান যেটাকে সরকারী প্রচারে 'স্বতস্ফূর্ত' প্রত্যাঘাত' বলা হচ্ছে, সেই ভয়াবহ বর্বরতা সংগঠিত হয়েছে একদিকে সরকারের বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা এবং একই সাথে ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো ঘটেছে সরকারের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সবদিক থেকে এই ঘটনার প্রধান অপরাধী সরকার-ই। এবং সরকার-ই এ গণহত্যা চালিয়েছে তার নাগরিকদের নামে। আর আমি একজন নাগরিক হিসেবে প্রমাণ হাতে নিয়েই গুজরাট গণহত্যাকে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগসাজশের ফল বলেই চিহ্নিত করছি। আর এটাই আমাকে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ করছে। আর এটাই দুটি বিপর্যয়ের পার্থক্যটা গড়ে দিয়েছে।

## দুই

গুজরাটের গণহত্যার পরে বাঙ্গালোর কনভেনশনে বিজেপির নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিভাবক আর এস এস, প্রধানমন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মোদী যে সংগঠনের সদস্য, এরা সকলেই গণহত্যায়, ধর্ষণে, অগ্নিকাণ্ডে সব হারানো মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাস এবং শুভেচ্ছা অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

গোয়ায় বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নরেন্দ্র মোদীকে সকলেই বরণ করে নিয়েছিল বীরের মর্যাদায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর পদত্যাগের ছেলে ভোলানো সস্তা নাটুকে প্রস্তাব সকলে হৈ হৈ করে বাতিল করে দিয়েছিল। সম্প্রতি এক জনসমাবেশে বক্তৃতায় মোদী গুজরাটের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাকে গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযানের সংগে তুলনা করেছেন। দুটি ঘটনাই তাঁর মতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সমান্তরাল খাতে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব জার্মানীর তুলনার প্রশ্ন এলে সমস্ত অস্তিত্ব হিম হয়ে যায় আতঙ্কে। যদিও এই তুলনায় বিস্ময়ের কিছু নেই (আর এসএস-এর প্রতিষ্ঠাতারা খুব উদারভাবে হিটলারের

www.pathagar.com

প্রতি, হিটলারের নিধনযজ্ঞের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ; এসব কথা তাঁদের রচনায় লিখে গেছেন)।

একটা তফাত হচ্ছে ভারতবর্ষে আমাদের কোনো হিটলার নেই। তার বদলে আছে সারা ভারত চষে বেড়ানো গণহত্যার স্নায়ুবিদারক এবং বিষাক্ত প্ররোচনার আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারাভিযান। শব সাধনার ভ্রাম্যমান বৃন্দগান। লক্ষ ফনা বিশিষ্ট তীব্র বিষধর সামুদ্রিক সরীসৃপের মতোই বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো সংঘ পরিবার। বিজেপি'র সাথে আরএসএস ভিএইচপি বজরঙ দল। প্রত্যেকেই মৃত্যুযজ্ঞের আলাদা যন্ত্রী। সব বিষয়ে, সব মানুষের কাছে সবসময় পৌঁছে যাওয়ার আপাত বিস্ময়কর দক্ষতার অধিকারী এরা।

প্রতিটি উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন করে প্রধান আছে সংঘ পরিবারের। প্রতি ঘটনায় বাগাড়ম্বরের জন্য একটি করে প্রধান কণ্ঠ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জন্য জনতার বোধশক্তি লুপ্ত করে নির্মম পাশবিকতায় উন্মত্ত করার মতো একজন নীতিহীন নীতিবাগিশ। বিদেশ মন্ত্রকের জন আছেন সুভদ্র, নম্র কিন্তু অগভীর হৃদয়হীন একজন। একজন সপ্রতিভ ইংরেজী বলা আইনজীবী আছেন টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নেয়ার জন্য। একজন ঠাণ্ডা রক্তের প্রজাতি মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত। আর বজরঙ দল, ভিএইচপি,র তৃণমূল কর্মীরা গণহত্যার মতো কঠোর পাশবিক শরীরী পরিশ্রমের জন্য তো আছেই। আর সব মিলিয়ে আছে সহস্র ফনাবিশিষ্ট সেই বিষাক্ত সরীসৃপের লেজ, সমস্যা দেখা দিলে যেটি খসে যায় টিকটিকির মতো। আবার অনুকূল সময়ে গজিয়ে উঠে। আছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বেশে এক বর্ণচোরা সমাজতন্ত্রী। যুদ্ধ, সাইক্লোন, গণহত্যা, দলত্যাগ, যে কোনো বিপর্যয়ে মলম লাগানোর স্থায়ী আড়কাঠি। সংঘ পরিবারের খুবই বিশ্বস্ত। কখন কোন সুরে বেজে উঠতে হয়, সে ব্যাপারে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং করিৎকর্মা ব্যক্তি তিনি।

তীক্ষ্ণ ফলা ত্রিশূলের মতো বহু কণ্ঠে সংঘ পরিবার কথা বলে। একই সাথে পরস্পর বিরোধী বহু বক্তব্যের সমাবেশ ঘটাতে পারে তারা। যখন সহস্র ফনার একটি (ভি এইচ পি) তাদের কয়েক লক্ষ কর্মীর কাছে 'শেষ মীমাংসা'র প্রস্তুতিতে ভয়ঙ্কর প্ররোচনার নির্দেশ পাঠায়, তখন সরকারের দায়িত্বে থাকা কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি প্রধানমন্ত্রী "সব ধর্মের মানুষের স্বার্থই সমানভাবে দেখা হবে" বলে জাতিকে আশ্বস্ত করেন। এবং একই সাথে যারা ভারতীয় সংস্কৃতির 'অবমাননার' অপরাধে বই আর চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে পারে, পুড়িয়ে দিতে পারে অনিন্দ্য সুন্দর চিত্রকলা, তাদেরও আশ্বস্ত করেন।

এরা সারা দেশে গ্রামোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাজেটের ৬০ শতাংশ বন্ধক রাখতে পারে এনরনের মুনাফার জন্য। এরা নিজেদের সমধর্মী বহু রাজনৈতিক

www.pathagar.com

মতামতকে ধারণ করতে পারে। যা নিয়ে দুই আপাতভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলের অনুগামীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সব বিরোধ পারিবারিক সমস্যার সংকীর্ণ বৃত্তে আটকে থাকে। সে বিবাদ যত তিক্ত ঝাঁঝালো হোক, সেটা সবসময় জনসমক্ষে টেনে আনে, সবসময় পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে মীমাংসা হয় বিরোধের। আর মুগ্ধ দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলী খেলা শেষে ঘরে ফিরে যায় প্রসন্ন চিত্তে।

সাজানো ক্রোধ, মারামারি, প্রতিশোধ, গোপন ষড়যন্ত্র, তীব্র অনুশোচনা, কাব্যরস, অপরিমেয় রক্তক্ষরণ আর চড়া সুরের নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সব ক্ষোভ বিক্ষোভ উসুল হয়ে যায় নগদে।

জর্জ বুশের সারা দুনিয়ার দখলদারীর সাংকেতিক পরিকল্পনা 'Full Spectrum Dominance'-এর মতো এ সবই আমাদের বিরোধ মীমাংসার নিজস্ব ভাষ্য।

কিন্তু যখন এসব বিবাদ মেকী সংঘর্ষ প্রশমিত হয়, তর্জন গর্জন থেমে যায়, তখনই শুধু হিম শীতল আতঙ্কে অনুভূত হয় যে এত বিবাদ, বিরোধ, বিতর্কের নীচে আসলে একটাই হৃদস্পন্দন, এক অভিন্ন নির্মম তীব্র গরলে সিক্ত গেরুয়া রন্ধ্রপথের প্রাণশক্তি বিরতিহীনভাবে কাজ করে চলেছে অহর্নিশি।

এর আগেও ভারতবর্ষে গণহত্যা হয়েছে। জাতপাত, উপজাতি, ধর্মবিশ্বাস; সবকিছুর বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের গণহত্যা। ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধী নিধনের সংগে সংগে দিল্লীতে ৩ হাজার শিখ হত্যার ভয়াবহ মৃত্যু অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিটি খণ্ড দৃশ্যই গুজরাটের গণহত্যায় লুকিয়ে আছে। সেই সময় রাজীব গান্ধী সেই অসামান্য শব্দ বন্ধের অর্থ না বুঝেই বলেছিলেন—'বৃহৎ বৃক্ষ পতনে মাটি কেঁপে উঠে।' ১৯৮৫ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতেছিল সহানুভূতির হাওয়ায়। তারপর ১৮ বছর কেটে গেছে, এ নৃশংসতম গণহত্যার অপরাধীদের একজনেরও সাজা হয়নি।

অতীতের যে কোনো উত্তেজক ঘটনার কথা ধরুন, নিউক্লিয়ার টেস্ট, বাবরি মসজিদ, তহেলকা স্ক্যাম, নির্বাচনে জেতার জন্য দাঙ্গা ; তেমন প্রতিটি ঘটনায় কংগ্রেসের উপস্থিতিটা প্রথমে দেখতে পাবেন। প্রতিটি ঘটনায় সর্বনাশের বীজ বুনেছে কংগ্রেস। আর দুবর্ত্তের মতো নরকের সেই ফসল চুরি করে কেটে নিজের গোলায় তুলেছে বিজেপি।

সুতরাং নির্বাচনের প্রশ্নে সত্যিই কি কোনো পার্থক্য আছে এ দু-এর মধ্যে ? যতই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাক, উত্তরটা খুব স্পষ্ট উচ্চারণেই বলি—হ্যাঁ, আছে।

www.pathagar.com

কেননা এটা ঠিকই যে, কংগ্রেস বেশ কয়েক দশক ধরে শোচনীয় সব অপরাধ করেছে। কিন্তু প্রতিটি অপরাধই সংগঠিত হয়েছে রাতের অন্ধকারে। অন্যদিকে অপরাধ যত নারকীয় হোক না কেন বিজেপি তা করে মধ্য দিনের হাটের মাঝে। কংগ্রেস যা করে ছদ্মবেশে, চোরের মতো। অবিশ্বাস্য ভণ্ডামীর কৌশলে, অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে, লজ্জাবতী লতার মত ব্রীড়াবনত হয়ে—সেইসব অপরাধ সংগঠিত করে প্রকাশ্যে গর্ববোধ করে বিজেপি। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

তীব্র সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগিয়ে তোলা সংঘ পরিবারের নির্দেশিকারই একটা অংশ। এই পরিকল্পনাই করে আসছে তারা বহু বছর ধরে। সভ্য সমাজের ধমনীতে অতি ধীর বিলম্বিত প্রক্রিয়ায় সরাসরি বিষ মিশিয়ে আসছে তারা।

আরএসএস-এর অসংখ্য শাখা। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সরস্বতী শিশু মন্দির এ ভংঙ্কর ঘৃণার বিষে জারিত মতবাদকেই হাজার হাজার শিশু আর কিশোর-যুবকদের সংবেদনশীল বোধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। শৌর্যমুগ্ধ, রোমাঞ্চপ্রিয় এ বয়ঃক্রমের মননে মিশিয়ে দিচ্ছে বিকৃত ইতিহাসবোধ আর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অতলস্পর্শী ঘৃণা।

পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অসংখ্য মাদ্রাসায় অপাপবিদ্ধ শিশুদের তীব্র ধর্মান্ধতা আর নির্মম হত্যার নিরবচ্ছিন্ন প্ররোচনায় জর্জরিত করে যেমন অগণন তালিবান তৈরি করা হয়েছে—তুলনায় কোনো পার্থক্য নেই এদের। কোনো অংশে কম বিপজ্জনক নয় এরা।

গুজরাটের মতো রাজ্যে পুলিস, প্রশাসন, রাজনৈতিক কর্মী ; অত্যন্ত সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের গভীরে ঢুকে তৈরি করা হয়েছে ভয়ঙ্কর দাহ্যতা। বিপুল জনপ্রিয় এবং স্নায়ু বিদারক আত্মহননের আবেদনে মথিত করা হয়েছে জনমতকে। এ ভয়ঙ্কর বিপদকে খাটো করে দেখা, ভুল বোঝাবুঝি মনে করার মূর্খামিতে যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়।

এই সর্বগ্রাসী উদ্যোগ অর্জন করেছে সর্বাত্মক এক ধর্মীয়, মতাদর্শগত রাজনৈতিক সমর্থন। জনজীবনের তলদেশ পর্যন্ত এ বিষভাণ্ড নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার পরিকল্পনা রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মদদ ছাড়া কিছুতে সফল হতে পারে না।

একই রক্তে গড়ে উঠা মুসলিমদের মাদ্রাসা। যেখানে বিদেশী তহবিলে শিশু, কিশোর আর যৌবশক্তির মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষকে ধর্মান্ধতা আর ঘৃণার বিষ ঢেলে এভাবেই পাশবিক উন্মত্ততায় গড়ে নেয়া হয়, এদের একমাত্র পার্থক্যের জায়গাটা হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য এরা পায় না। এছাড়া এরা হিন্দু

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতারই অবিকল প্রতিরূপ। গণ-মনোবিকল আর অন্ধ ঘৃণার উন্মত্ত নৃত্যের এরা সহচরী। আদতে একই উদ্দেশ্য সাধনে এত আশ্চর্য ছন্দবদ্ধ তায় এরা কাজ করে যে, মনে হয় এই একই দলের কাজই সম্মিলিতভাবে যেন সম্পন্ন হচ্ছে পরম নিষ্ঠায়।

এই বিরতিহীন নরক যন্ত্রণার মধ্যে সম্ভাব্য যেটা হতে পারে তা হল, মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আত্মসমর্পণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের ভয়ার্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, ঘেটোগুলিতে লুকিয়ে রাখবে নিজেদের সদা ত্রস্ত অস্তিত্বকে। কোনো সভ্য নাগরিক অধিকার, ন্যায় বিচারের কাছে কোনো প্রত্যাশা, কোনো কিছু নেই, কিছু থাকবে না। শুধু থাকবে একটানা মৃত্যুভীতি আর আতঙ্কে রোগাক্রান্ত জীবন।

তাদের প্রতিদিনের জীবনটা কেমন হতে পারে ? যে কোনো ক্ষুদ্র ঘটনা, সিনেমার লাইনের তুচ্ছ বাদানুবাদ, ট্রাফিক লাইটের নির্দেশ নিয়ে যে কোনো বচসা যখন তখন ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী বিপর্যয়ে পাল্টে যেতে পারে। ফলে শামুকের মতো কোটর বন্দী, প্রতিবাদহীন মুক-বধিরের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তারা।

এই মলিন, হতশ্রী জীবনকে মেনে নিয়ে সমাজের একেবারে প্রান্তিক সীমানায় চলে যায় তারা। তাদের আতঙ্ক সংক্রামিত হয় সংখ্যালঘুদের অন্য অংশের মধ্যে।

আর এ অসহনীয় অবদমনের পীড়নেই অনেকে, বিশেষ করে কমবয়সীরাই সম্ভাব্য জঙ্গী হয়ে যায়। যেহেতু তারা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাবে, এই আশংকা থেকে সভ্য নাগরিক সমাজকে ডাকা হয় সম্মিলিতভাবে আক্রান্তদেরই বিচ্ছিন্ন করার জন্য। অতপর প্রেসিডেন্ট বুশের ভয়ঙ্কর অনুশাসন নির্দেশিত হয়— "হয় তোমরা আমাদের সংগে, নয়তো সন্ত্রাসবাদীদের সংগে।"

এইসব শব্দাবলী সময়ের সাথে সাথে তুষার শলাকার মতো জমে উঠতে থাকে। যে বছরগুলি আসছে সে সময়ে ভয়াল মুখব্যাদানে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কসাই আর গণহত্যার খুনেরাই নৃশংস হত্যালীলাকে বৈধতা দেয়ার জন্য তাদের ঘিরে থাকবে।

শিবসেনাপ্রধান বাল থ্যাকারে যিনি অতিসম্প্রতি নরেন্দ্র মোদীর বীরত্বের কাছে কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন। অন্তিম মীমাংসার সূত্রটা কিন্তু তাঁর কাছেই আছে।

তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। পরিস্থিতির সংগে সংগতি রাখতে হলে এটাই যথার্থ আহ্বান। তাহলে আমাদের উপর বোমা বর্ষণের আর দরকারই



www.pathagar.com

হবে না পাকিস্তানের। আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর বোমা মারতে পারবো। ভারতবর্ষের সকলকে এজন্যই কাশ্মীরের দিকে ফেরানো দরকার। কিংবা বসনিয়া, প্যালেস্তাইন অথবা রাওয়ান্ডার দিকে।

নরক যন্ত্রণা সকলের জন্য চিরস্থায়ী হোক। ভীষণ অমোঘ সব মরণাস্ত্র আর বিস্ফোরক কেনা হোক নিজেদেরই নিকেষ করার জন্য। আমাদের রক্তক্ষরণে বৃটিশ আর মার্কিন অস্ত্র বিক্রেতারা পুষ্ট হয়ে উঠুক দ্রুত। আমরা কার্লাইল গ্রুপকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারি বুশ আর বিন লাদেন পরিবার সম্মিলিতভাবে বাঙ্ক ডিসকাউন্টের জন্য কোন লাভজনক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার।

যদি এমন মসৃণভাবে সবকিছু সেরে ফেলা যায়, তবে আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সংগে আফগানিস্তান হয়ে যাব। যখন আমাদের কৃষি জমিতে নিবিড়ভাবে মাইন পাতা সম্পন্ন হবে। আমাদের ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের পরিকাঠামো পরিণত হবে জঞ্জালের স্তূপে। আমাদের শিশুরা শরীর আর মনে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। নিজেদের সৃষ্ট আত্মহননের ভীষণ ঘৃণায় যখন আমরা নিজেদেরই প্রায় নিঃশেষ করে আনতে পারবো, তখন হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে আমেরিকানদের কাছে সাহায্যের করুণ আবেদন জানানোর জন্য। বিমান থেকে ফেলা খাদ্য সামগ্রী কিংবা তৈরি খাবার ; যাই হোক যে কোনো সাহায্য।

আত্মধ্বংসের বড় কাছে চলে এসেছি আমরা। আর এক পা এগোলেই অভিকর্ষের নিয়মে সব শেষ। তবু সরকার সর্বনাশের দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

গোয়ায় বিজেপি'র ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের সভায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ইতিহাস তৈরি করলেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি অধঃপতনের শেষ দরজাটাও পেরোলেন নিঃসংকোচে। ধর্মান্ধ, বিবেকহীন বাজপেয়ী নিজেই মুখোশ টেনে নিজেকে উন্মোচিত করলেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে।

যে কথা বলতে জর্জ বুশ এবং ডোনাল্ড রামস্‌ফিল্ডও তীব্র অস্বস্তিবোধ করবেন, বাজপেয়ী সেই কথাটাই বললেন, নির্দ্বিধায়—"যেখানে মুসলমানরা থাকে, তারা কোথায়ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে না।" সীমাহীন এই নির্লজ্জতাকে কীভাবে ধিক্কার জানানো যায় ? কিন্তু এই অধঃপতনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠা বিজেপি এখন স্ন্যাপ পোল দাবি করছে। বরোদা থেকে আমার এক বন্ধু জানিয়েছে—সুভদ্র শালীন মৃদুভাষী

www.pathagar.com

ভদ্রমহোদয়রা সকলেই নম্র এবং বিনীত কণ্ঠে বলেছেন—"মোদী আমাদের হিরো।"

আমাদের অনেকেই মনে মনে এই আশা পোষণ করছে যে, গত কয়েক সপ্তাহে ভয়াবহ মাত্রার বিভীষিকায়—যতই আত্মসর্বস্ব হোক না কেন ধর্মনিরপেক্ষ পার্টিগুলো এই আকাশচুম্বী অপরাধের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াবে। একার শক্তিতে বিজেপি ভারতবর্ষের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন পায়নি। তাদের হিন্দুত্বের সর্বনাশা মতাদর্শকে এগিয়ে নেয়ার কর্মসূচীকে অনুমোদন দেয়নি জনগণ। আমরা আশা করি ২৭ সহযোগী ; যাদের নিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি কোয়ালিশন তৈরি হয়েছে, তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

মূর্খের মতোই আমরা ভেবেছিলাম যে তাদের নৈতিকতা, তাদের স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠুক এটা তারা কিছুতেই চাইবে না।

অথচ এ অভিশপ্ত সময়েরই প্রমাণ যে বিজেপি সহযোগী একটি পার্টিও সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। বরঞ্চ প্রতিটি ধূর্ত চোখের দিকে চোখ রাখুন, দেখবেন প্রত্যেকেই মনে মনে অংক কষছে যে, কোন কেন্দ্র আর মন্ত্রীত্বের দপ্তরটা তার কব্জায় থাকবে। সমর্থন প্রত্যাহার করলে ক্ষতি হবে কতটা।

## তিন

HDFC-র দীপক পারেখ ছাড়া ভারতবর্ষের কর্পোরেট কমিউনিটির কোনো CEO-ই গুজরাটের ঘটনার ধিক্কার জানায়নি। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ ভারতবর্ষের অবশিষ্ট মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্বের একমাত্র নেতা। তিনিও সরকারের সংগে থেকে যাচ্ছেন এই ক্ষীণ প্রত্যাশায় যে, দেশের আসন্ন নির্বাচনে উপরাষ্ট্রপতির শিকেটা তাঁর কপালেই ছিঁড়তে পারে।

আর সবচেয়ে ঘৃণ্য ঘটনা নিম্ন বর্গীয়দের আশা-ভরসা, 'মনুবাদী'দের মহাশত্রু, বিএসপি নেত্রী মায়াবতী বিজেপির সমর্থনে সরকার গড়তে চলেছেন।

কংগ্রেস এবং বাম দলগুলি গণ বিক্ষোভের ডাক দিয়ে মোদীর পদত্যাগ দাবি করছে। পদত্যাগ ? আমরা কি মাত্রা জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি ? অপরাধিদের পদত্যাগের প্রশ্ন উঠে কি করে ? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বিচার বসিয়ে কঠোর শাস্তি দিতে হয়। যারা গোধারায় ট্রেন জ্বালিয়েছিল তাদেরও এভাবে বিচার করা উচিত। ঠিক যেমন উন্মত্ত ঘাতক বাহিনী, পুলিশ এবং প্রশাসনের সেইসব অপরাধীরা যারা পরিকল্পিতভাবে

www.pathagar.com

গুজরাটের গণহত্যায় অংশ নিয়েছে, বিচারের কাঠগড়ায় তাদের সবাইকে টেনে আনতে হবে।

গুজরাটে যাদের হিংস্র প্ররোচনায় গণহত্যা এত ব্যাপক চেহারা পেল, অবশ্যই তাদের বিচার করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতায় আছে মোদী, বজরঙ দল, ভিএইচপি'র বিরুদ্ধে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেবার (যেখানে কোর্ট নিজেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছে)। অসংখ্য সাক্ষ-প্রমাণ আছে, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ধ্বংস, ধর্ষণ আর হত্যার অসংখ্য চিহ্ন।

ইতিমধ্যে ঘটনার ভয়াবহ তাৎক্ষণিকতার আঘাতটা সহনীয় হয়ে আসছে। নির্বাচন করতে দেবে, কি দেবে না, নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া উচিত স্পষ্ট করেই ? সে যাই হোক না কেন, নির্বাচন হোক বা না হোক, মোদীকে ছেড়ে রাখলে, অবাধে ঘুরতে দিলে, সম্মানিত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জীবন যাপন করতে দিলে, গণতন্ত্রের মৌল নীতিই শুধু বিপর্যস্ত হবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিপজ্জনক অন্তর্ঘাত চালানো হবে।

এ ধরনের গণতন্ত্র, সমাধান তো দূরের কথা নিজেই মূর্তিমান সমস্যা। যখন গণতন্ত্রকে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে মেরুদণ্ড দুমড়ে, ঐতিহ্যকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে অন্য কিছুতে পাল্টে ফেলার চক্রান্ত হয়, তখনই তো আমাদের শক্তির মহত্তম উৎসকে বাঁচানোর জন্য ঐ ভয়ঙ্কর শত্রুর দিকে বিপুল বিক্রমে ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

নির্বাচনে জেতার জন্য বিজেপি কী করতে পারে ? বাতাসে গুঞ্জন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে জনসমর্থনের হাওয়াটা নিজের পালে টেনে নিতে ছক কষছে বিজেপি।

যাই হোক না কেন জর্জ বুশ তাঁর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' ৮০ শতাংশ সমর্থন পেয়েছিলেন। অ্যারিয়েল শ্যারন একই সমর্থন পেয়েছিলেন প্যালেস্তাইনের দখলদারীর নারকীয় অভিযানের সমর্থনে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকলেই ভয়ঙ্কর পাশবিকতার সব অপরাধ কী বৈধতা পেয়ে যায় ?

এই অপরাধ সম্পর্কে আইন, সংবিধান, প্রেস, কে কি বলে ; কেন আমাদের গণতন্ত্রের এই স্তম্ভগুলিকে যাচাই করা হবে না ? প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতার কাছে প্রশ্ন রাখা হোক। সবকিছুতে নাড়াচড়া পড়ুক। গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকে ছুঁয়ে-ছেনে তবেই ভোটের প্রশ্নটা উঠুক। কেন গণহত্যা মতামত সমীক্ষার বিষয় হতে পারে না ? নারকীয় গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পেতে পারে না দেশব্যাপী প্রচারের আনুকূল্য ?

www.pathagar.com

ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। নির্দিষ্টভাবে তার দিনটা চিহ্নিত করা হোক ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২। এই উত্থান পর্বের জন্য আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাতে পারি। বিশ্বজুড়ে সর্বত্র সবার মধ্যে গণহত্যার সংক্রমণে সবাইকে গভীরভাবে প্রাণীত করতে পেরেছে তারা।

কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের ব্যক্তি জীবন আর জনজীবনকে চোরাই করা মদের মতো ক্রমশ বিষিয়ে তোলা এ মতাদর্শের কৃতিত্ব বিজেপির।

১৯৯৮ সালে পোখরান বিস্ফোরণের হাওয়ায় এই বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর থেকে ঘনীভূত পাশবিকতায় রক্ত পিপাসু দেশপ্রেম প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ধারা হিসেবে গৃহীত হয়ে গেছে।

এই শান্তির অস্ত্রই ভারত-পাকিস্তানের উভয়কেই বিধ্বংসী জুয়াখেলার মরণফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছে। হুমকি, প্রতি হুমকি, অপমানের বিরুদ্ধে তীব্রতর অপমান অব্যাহত ধারায় চলছে। আর এখন, একটা যুদ্ধ কয়েকশো সৈনিকের মৃত্যু, অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো উভয় দেশের ১০ লক্ষের বেশি সেনাবাহিনী অর্থহীন পারমাণবিক দম্ভে বন্দী বিকারগ্রস্ত দানবের মতো সীমান্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্রুত বাড়িয়ে তোলা আগ্রাসী শত্রুতা সীমান্তে ঘা খেয়ে আমাদের রাজনীতির মধ্যে ধারালো ধাতু খণ্ডের মতো দেশ শক্তিতে তীব্র বিষক্রিয়ায় ছিঁড়ে ফেলেছে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহনশীলতা আর সহবস্থানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের গ্রন্থিকে। নরকের এইসব ধর্মযোদ্ধারা মানুষের মনোজগতকে বিষ আর ঘৃণার শৃঙ্খলিত উপনিবেশে পরিণত করছে। আর আমরা তা অনুমোদন করেছি। যতবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আগ্রাসী উন্মত্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে ততবারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ভারতবর্ষের মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে উঠেছে বৈরী আচরণ। পাকিস্তান বিরোধী প্রতিটি রণধ্বনি আমাদেরই ক্ষতবিক্ষত করেছে, আমাদের জীবন যাত্রার ঐতিহ্যকে দুর্বল করেছে, আমাদের বহু বর্ণময় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতা, আমাদের মনন আর বোধের সম্পদ, ঔদার্য আর সহনশীলতার ঐতিহ্য—এসব কিছুই তো পাকিস্তান থেকে আমাদের স্বতন্ত্র করেছে। সেই শক্তি আজ দুর্বল অপুষ্ট হচ্ছে ক্রমশ।

অতি দ্রুত জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতিতত্ত্বের আত্মঘাতী গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই জাতীয়তাবোধ নিজের মহিমান্বিত প্রাণশক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নয়। বরঞ্চ অন্যের প্রতি তীব্র ঘৃণার মধ্যে দিয়েই নিজের বিকৃত ভাবনাকে

www.pathagar.com

সর্বোত্তমভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এই 'অন্যরা' এই মুহূর্তে শুধু পাকিস্তান নয়, সমগ্র মুসলিম সমাজ।

জাতীয়তাবাদ কী অক্লেশে ফ্যাসিবাদের সমার্থক হয়ে পড়েছে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করাও কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।

জাতি কি? কাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে জাতি—ফ্যাসিবাদের কাছ থেকে তার সংজ্ঞা আমরা কিছুতেই শুনবো না। তবু এটা মনে রাখা দরকার জাতীয়তাবাদের নানা অবতার আছে। বিশ শতকের ভয়ঙ্কর সব গণহত্যার উৎসে আছে এ উদ্দীপক শব্দটি। তাই জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন উঠলে, খুব সতর্কতার সাথে এগুতে হয়। সদ্যোজাত একটি জাতি নয়, আমরা এক প্রাচীন সভ্যতার অবিভাজ্য অংশ—নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে আমরা তার প্রাণ স্পন্দন টের পাই না? একটা ভূখণ্ডের পাহারাদারীর মধ্যে শুধু জাতীয়তাবোধ গচ্ছিত থাকে না, নিজের মাটিকে গভীরভাবে ভালবাসা—এভাবে ভাবা যায় না?

সভ্যতার প্রকৃত অর্থ কী সংঘ পরিবার আদৌ জানে না, বোঝেও না। এরা আমাদের সভ্যতাকে সংকীর্ণতা আর অবক্ষয়ের নতুন অর্থে ব্যাখ্যা করতে চায়।

আমাদের সভ্যতাকে বহু খণ্ডে টুকরো করে, তার গর্ভে পুষ্ট হয়ে উঠা নৈতিকতা, মূল্যবোধ আর মানবিক নির্যাসকে মুছে দিতে চায় নিঃশেষে।

আমরা এক সুমহান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলাম। আমাদের আজকের আত্মপরিচয়ের সমস্ত বোধ, ভবিষ্যতে পূর্ণতার কোনো লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে চাই—সংঘ পরিবার বিকাশের এ জীবন্ত প্রক্রিয়ার বিস্মরণ ঘটাতে চায় চূড়ান্ত বিকৃতি দিয়ে।

কোন্ ভারতবর্ষকে চায় তারা? বিকলাঙ্গ, মস্তিষ্কহীন, মেধাহীন, যার কোনো আত্মা থাকবে না, মনীষার উত্তরাধিকার থাকবে না, শুধু থাকবে ঘাতকের ভয়ঙ্কর শানানো কৃপাণের নীচে রক্তের কর্দমাক্ত ভূমি শয্যায় শায়িত কবন্ধ শরীর, বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্ন, যার হৃদপিণ্ডে প্রোথিত সেই ভয়ঙ্কর ঝাণ্ডা?

আমরা কি এটা হতে দিতে পারি? আমরা কি ইতিমধ্যেই তা হতে দিয়েছি? বিগত কয়েক বছর ধরে সবার অজান্তে যে ফ্যাসিবাদ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে, আমাদের অনেকেই 'গণতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাকে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কামনা করেছে গোপনে, প্রকাশ্যে। সংসদ, প্রেস, পুলিশ প্রশাসন, জনগণ এমনকি 'ধর্মনিরপেক্ষ'রা প্রত্যেকে আজকের সংঘ পরিবারের অনুকূলে জমি তৈরি করে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী। যতবার আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

একচ্ছত্র অধিকারের সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়েছি, যে কোনো প্রতিষ্ঠান (সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়সহ) যখন অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, দায়হীন ক্ষমতা ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, যাদের সীমাহীন কর্তৃত্ব কখনও প্রশ্নের মুখে পড়েনি, যাদের জবাবদিহি করতে হয়নি কখনও—তখন আমরা কার্যত ফ্যাসিবাদের দিকেই এগিয়েছি। যদি নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে হয়, তাহলে বলবো সম্ভবত অনেকেই সংঘ পরিবার আদতে কি, সেটা ধরতে পারেনি।

## চার

জাতীয়স্তরের সংবাদপত্রগুলি বিগত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলী সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত সাহসের সংগে ভর্ৎসনা করেছে। বিজেপি'র অনেক সহযাত্রী যারা ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কিনারা পর্যন্ত এক সংগে হেঁটেছে এখন বিপুল রক্তক্ষরা ক্ষত চিহ্নের দিকে তাকিয়ে সুতীব্র বেদনা আর ভয়ার্তচিত্তে তারা সেই বধ্যভূমিকে সঠিকভাবেই চিনতে পারছে; এটাই এক সময় ছিল গুজরাট।

কিন্তু এক কঠিন কঠোর লড়াইয়ে কতক্ষণ তারা টিকতে পারবে ? এটা আসন্ন চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট মরশুমের চটকদার প্রচার অভিযান নয় ; আর খবর করার মতো স্নায়ু বিদারক গণহত্যার ঘটনাও থাকবে না সবসময়।

ফ্যাসিবাদ সবসময় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি উপাঙ্গকে গিলে খায় অতি ধীর বিলম্বিত অথচ দৃঢ় প্রক্রিয়ায়। নাগরিক অধিকারের অপহৃতি ঘটে আস্তে আস্তে। প্রতিদিনের চমকহীন নিরুচ্চারিত আগ্রাসনে অন্যায় সংগঠিত হয়। এখানে লড়াই মানে মানুষের মন আর হৃদয়কে পুনর্বার শুভবুদ্ধির স্পর্শে জয় করা। এখন এ লড়াই মানে আরএসএস-এর শাখা আর মাদ্রাসাগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি তোলা।

এর অর্থ ঈগলের দৃষ্টি নিয়ে সরকারী প্রতিটি সংস্থার উপর সতর্ক নজর রাখা। প্রতি মুহূর্তে তাদের দায়বদ্ধতা যাচাই করা। এর মানে মাটিতে কান পেতে প্রকৃত ক্ষমতাহীনদের অস্ফুট গুঞ্জন শোনা। এর অর্থ সারা দেশে অসংখ্য প্রতিরোধ-আন্দোলনে উচ্চারিত কণ্ঠস্বরকে সম্মিলিত প্রতিবাদের এক মঞ্চ দেওয়া।

যখন ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষ গুজরাটের ঘটনায় আতঙ্কে শিউরে উঠছে, তখন সংঘ পরিবারের মতাদর্শে প্রাণীত কয়েক হাজার ঘাতক কিন্তু সর্বনাশের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত নামতে প্রস্তুত।

নিজের চারপাশেই তাকিয়ে দেখুন, নিকটবর্তী ছোট পার্কটায় বসে যারা আড্ডা মারে, বড় মাঠে যারা প্রাতঃভ্রমণে যায়, যারা নির্জনে একটু সময় কাটায় ; শহরে-গ্রামে সর্বত্র কুচকাওয়াজ আরএসএস-এর পদনিক্ষেপের ভারী শব্দ। সর্বত্র গেরুয়া ঝাণ্ডা উত্তোলনের গাম্ভীর্যপূর্ণ সমারোহ। হঠাৎ যেন

www.pathagar.com

তাদের উপস্থিতি নজরে আসবে। খাকি প্যান্ট পরিহিত বয়স্ক পুরুষদের অবিরত কুচকাওয়াজ, হত্যা অভিযানের জন্য প্রতিদিন সামরিক শৃঙ্খলায় কুচকাওয়াজ।

কোথায় যেতে চায় তারা ? কিসের জন্য ? ইতিহাসের প্রতি অন্ধ বিতৃষ্ণাই তাদের অজ্ঞ করে রাখে। জানতে দেয় না যে, ফ্যাসিবাদের গর্বোদ্ধত উত্থান সব অর্থেই ক্ষণজীবী। প্রমত্ত শক্তিতে মাথা তোলে, অথচ তার দর্শন, আর মতাদর্শের মধ্যে আত্মহননের ধ্বংসাত্মক উপাদান সুপ্ত থাকে। নিজেরই অন্তর্গত অজ্ঞতা তাকে চিবিয়ে খায়। যেমন পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে উঠা ধূলিঝড়ের পরেও তেজস্ক্রিয়তার অর্ধেক জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু সেই অর্ধেকেই অনাগত প্রজন্মের জন্য প্রক্রিয়া পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

এত তীব্র মারার হিংসা আর ঘৃণাকে ধারণ করা যায় না। মানুষ একে প্রত্যাখ্যান করে, ভর্ৎসনা করে তীব্রভাবে। সৌভ্রাত্র আর ভালবাসা সত্যি মহৎ এক শক্তির উৎস। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেটাই যথেষ্ট নয়।

ঐতিহাসিকভাবে জাতীয়তাবাদের কাছে যা প্রত্যাশা, তার অপূর্ণতার রন্ধ্রপথেই ফ্যাসিস্ট আন্দোলন মাথা তোলে। যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয় ক্ষেত্রে সেই স্বপ্ন ভঙ্গের নিদারুণ নৈরাশ্য থেকেই ভারত বর্ষে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার সুফলগুলি এত অপচয়, এত বিশাল বিপুল ব্যর্থতা, আকাশচুম্বী বৈষম্য, এত নির্মম দারিদ্র—তাপ্পি দিয়ে, ভণ্ডামি দিয়ে কিছু লোক ঠকানো পরিবর্তন আর সংস্কার দিয়ে এ ক্ষত নিরাময় হয় না।

আমাদের কাছে স্বাধীনতা এসেছিল, যে সম্পর্কে গান্ধীজির বিখ্যাত উক্তি, 'শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের রুটির অধিকার'। এক বিমূর্ত অস্পৃশ্য স্বাধীনতা। দেশ ভাগের অভিঘাতে হাজার মানুষের শবদেহ মাড়িয়ে, রক্ত মজ্জার কর্দমাক্ত পথে এসেছিল স্বাধীনতা। অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি, এখনও সেই পারস্পরিক অবিশ্বাস, প্রবল জীবনী শক্তি নিয়ে দেশ ভাগের গভীর ক্ষত টিকে আছে। দ্বিখণ্ডিত দেশ, দ্বিখণ্ডিত স্বপ্ন ; সীমান্তের দু' ধারে শুধু হিন্দু আর মুসলিম। যেন মাঝে কোনো মাউন্টব্যাটেন নেই, বৃটিশদের দেশ ধর্ম আর ভাষা নিয়ে বিভাজনের পুরনো ধূর্তামিও অদৃশ্য।

সেই গভীর বেদনা আর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে রাজনীতিবিদরা নিয়মিত খেলাধুলা করেছেন। নিজেদেরই সংকীর্ণ স্থূলস্বার্থে তার নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থা করেননি। এবং এই স্বপ্ন ভঙ্গের প্রক্রিয়াকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের রক্তমজ্জা নিয়ে বিপজ্জনক কৌশল করেছেন, এর ভিতকে খুঁড়েছেন নির্বাচনে

www.pathagar.com

জেতার জন্য। উই আর ঘুনপোকা যেমন গভীর ক্ষয়ের কারুকাজ চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় ভিত্তিপ্রস্তরের মাটিকে, তেমনই আমাদের গণতন্ত্রের বেদীমূলে অসংখ্য সুড়ঙ্গ, অপরাধের অন্ধকার পাতাল পুরীতে গমন-নির্গমনের রন্ধ্রপথ খুঁড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মকেই অর্থহীন করে দিয়েছে এই পঞ্চাশ বছরে। এভাবেই গণতন্ত্রকে শূন্যগর্ভ আঁধারে পরিণত করে ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের বাস্তবতাই নির্মাণ করেছে তারা।

সংবিধান সংসদ এবং বিচার ব্যবস্থার মেলবন্ধনে, ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলকাঠামোকে মজবুত করে রাজনৈতিক শক্তিকে যাচাই করে—তার অধঃপতন আর নীতিহীনতাকে বাতিল করার সেই ভিত্তিটাই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গত পাঁচ দশকে।

এ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। নীতিহীন ভণ্ডদের কাছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রত্যাশা করে কিছু মিলবে না। সেসব কিছু আর তাদের অবশিষ্ট নেই।

আমাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের সভ্য নাগরিক সমাজও সেই নেতৃত্বকে ঘাড় ধরে প্রত্যাশ্যা পূরণে বাধ্য করতে পারেনি। সেই ব্যর্থতার ভয়ঙ্কর ফলাফলই প্রত্যক্ষ করছি গুজরাটে।

পূর্বাপর এই ব্যর্থতার দায়ভার ফ্যাসিস্তদের নয়। তারা শুধু স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণাকে বিষের পাত্রে ধারণ করেছে। দখল নিয়েছে মানুষের হতাশার। তারা সংগঠিত করেছে একেবারে অস্তিত্বের পাকে পাকে জড়িয়ে থাকা এক অমোঘ অস্ত্র দিয়ে, সেটি হলো ধর্ম।

যে মানুষ নিজের জীবনের দায় বহন করতে ব্যর্থ, সে মানুষ তার আজন্ম পরিচিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে, নিজের সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে, প্রাণপ্রিয় মাটি থেকে ছিন্নমূল হয়েছে, নিজের সংস্কৃতি আর ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে কোনোকালে ; আত্মপরিচয়ের কোন্ অবলম্বনে তারা বাঁচবে? কোন পরিচয়ে গর্ববোধ করবে তারা ? যা কিছু পাওয়ার জন্য প্রবল সংগ্রাম করেছে তারা, যা কিছু অর্জিত হয়েছে—সেসব এতই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ যে তাতে গর্ববোধের কিছু নেই। বেঁচে থাকার সার্থকতা বুঝে নিতে চায়, প্রতিটি প্রত্যাখান আর অপূর্ণতার বদলা নিতে চায় তারা।

আর এই দিশেহারা লাথি খাওয়া মানুষকে যদি অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা অর্থহীন গর্ববোধে আপ্লুত করা যায়, এ অবরুদ্ধ ক্রোধ আর অনির্দিষ্ট ঘৃণাকে যদি শরীরী আক্রোশে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার ভাষা দেওয়া যায়, তবে কার্যকারণের সাথে সম্পর্কহীন যে কোনো শক্তিকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে সরাসরি বধ্যভূমিতে পৌঁছে দেওয়া যায়।

www.pathagar.com

নিজেরই আজন্ম প্রতিবেশী সহোদর, সন্ততিকে হত্যা করা যায়, বলাৎকার করা যায় যে কোনো নারীকে—আর এর মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের আত্মঘাতী গর্ববোধের গোলক ধাঁধায় ঢোকানো যায় তাকে।

এছাড়া আর কীভাবেই বা এই চক্রান্তকে বোঝা যাবে ? দেশের দ্বিতীয় দরিদ্রতম সম্প্রদায়কে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল, আত্মীয়-পরিজন সব সংলগ্নতা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, এমনকি সার্বিকভাবে নিকেশ করার চক্রান্তেও ধর্মযোদ্ধা হিসাবে দরিদ্রতম আদিবাসী-দলিতদের লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশের দরিদ্রতমরাই সমূলে ধ্বংস করছে দরিদ্রতরদের।

গুজরাটে দলিতরা উচ্চবর্ণের শাসনে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে। ঘৃণা অবজ্ঞা ছাড়া সমাজের কাছ থেকে পায়নি কিছুই। আবহমান কালের ভয়ঙ্কর অত্যাচারী উচ্চবর্ণের ভূস্বামী, যাদের পায়ের তলায় দলিত আদিবাসীরা পিষ্ট হয়েছে, আজ তারাই তাদের চেয়ে তুলনায় সামান্য কম দুর্ভাগ্যের হত্যা আর ধ্বংসে অংশ নিচ্ছে ঐ হাজার বছরের অত্যাচারী রক্তচোষাদের নির্দেশে!

তারা কি মজুরিদাস ? তারা কি ভাড়াটে হত্যাকারী ? তাদের এ মৃত্যু যজ্ঞে টেনে এনে নিজেদের অপরিমেয় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে ? নাকি আমরাই বোধবুদ্ধিহীন স্থূলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি ? এটাই চলে আসছে। সমাজের কাছে লাথি খাওয়া হতশ্রী দুর্ভাগাদের অবরুদ্ধ সব জ্বালাযন্ত্রণা, ক্রোধ আর আক্রোশকে তাদেরই সবচেয়ে কাছের, তাদেরই মত দুর্ভাগাদের দিকে চালান করে দেওয়া।

কেননা, তাদের ক্রোধ প্রকৃত শত্রুদের নাগাল পায় না, তাদের প্রকৃত শত্রুরা আশ্চর্য কৌশলে সব অপরাধের পরেও হাত ধুয়ে বসে থাকে ক্ষমতার সিংহাসনে। যেখানে দরিদ্রতম দলিতরা অস্পৃশ্য। অনতিক্রম্য দূরত্ব তাদের পৌঁছানোর ক্ষমতা নেই।

কেননা, তাদের নিজেদের নেতারাই এখন অভিজাত হয়ে উঠেছেন। উঁচু টেবিলে এক আসনে বসে পানাহারে প্রতারিত হয়েও তৃপ্ত থাকছে। প্রকৃতি যাদের আরাধ্য সেইসব আরণ্যক বনস্পতির স্মৃতিভ্রংশ হয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে তাঁরা ঢুকে যান হিন্দুদের আস্তিনের নীচে।

১৩ কোটি মুসলিমদের বাস ভারতবর্ষে। হিন্দু ফ্যাসিস্তদের এরা বৈধ শিকার।

মোদি কিংবা বাল থ্যাকারের মত মানুষরা কি মনে করে, তারা যখন মুসলিমদের নিকেশ করবে, সারা বিশ্ব নিষ্ক্রিয়ভাবে সেই গণহত্যা প্রত্যক্ষ করবে ?

www.pathagar.com

সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশ গুজরাটের গণহত্যা সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করে একে নাজি-শাসনের সাথে তুলনা করেছে। ভারত সরকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব হচ্ছে—ভারতীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করে তার আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বিদেশীদের মতামত জানানো উচিত নয় (রক্ত হিম করা যে ঘটনা কাশ্মীরে ঘটছে, সে বিষয়েও নয় ?)।

এরপরে কি ? সেনসরশিপ, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া ? আন্তর্জাতিক টেলিফোন আটকানো ? ভুল সন্ত্রাসবাদীদের নির্বিচারে হত্যা করে সঠিক লোক মরলো কিনা, তা প্রমাণ করতে ডিএনএ স্যাম্পেল জাল করা ? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের চেয়ে হিংস্র কোনো সন্ত্রাসবাদ হয় নাকি ?

ফ্যাসিবাদকে সংযত রাখার কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেই। একে খাঁচায় বন্দী করার একমাত্র উপায়, যারা এর ভয়ঙ্কর নৃশংসতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, গভীরতম অপমান যাদের বিপর্যস্ত করেছে একইভাবে, তারা সবাই মিলে যদি সামাজিক ন্যায়ের জন্য আন্তরিক দায়বদ্ধতা দেখায়, তবেই সেটা সম্ভব।

উঠে দাঁড়াবার জন্য আমরা সকলে কি প্রস্তুত ? লক্ষ মানুষের সমাবেশ নিয়ে শুধু মিছিলে হাঁটলেই হবে না। স্কুল, প্রত্যেকের বাড়ি, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, রুচিবোধ, পসন্দ—সবকিছুর মধ্যে টান টান ছিলাছেঁড়া সতর্কতা আনতে হবে।

আর এক্ষুণি যদি উঠে না দাঁড়াই, তবে অতিদ্রুত সারা বিশ্বের আত্মীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব আমরা। হিটলারের জার্মানীর সাধারণ নাগরিকদের মতো। স্বধর্মচ্যুতির জন্য অবশিষ্ট মানবজাতির কাছে ক্ষমারও অযোগ্য হয়ে যাব। আমরা যা করেছি আর যা করিনি, নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদহীন থেকে যা ঘটতে দিয়েছি, সব কিছুর জন্য আমাদের সন্তানদের কাছে জবাবদিহিও করতে পারব না।

এ হচ্ছে আমরা। ভারতবর্ষ। তীব্র তমসার মধ্যেই শুরু হোক আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

গুজরাটে হিংসার আগুন পুড়িয়ে ছারখার করেছে সারা দেশের বিবেককেও। স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রেরও এ বিবেকের কান্না ফুটে উঠেছে বিশিষ্ট লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের কলমে।

–'Outlcok' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধটির ভাবানুবাদ করেছেন ঃ দেবু দত্তগুপ্ত।

www.pathagar.com

# 'হিন্দুরাষ্ট্রে'র দিকে পঞ্চম পদক্ষেপ

–জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

'অহিন্দুদের হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে .... তাদের অবশ্যই হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা কিছুতেই (তারা) পোষণ করতে পারবে না এবং তারা হিন্দু জাতির কাছে সম্পূর্ণ অবনত হয়েই এ দেশে থাকতে পারে।-(গোলওয়ালকর (আরএসএসের প্রয়াত নেতা ও তাত্ত্বিক)

এনডিএ'র সভা চলছিল প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে। বিজেপি খুব একা। শিবসেনা ছাড়া আর কোনো দল নেই তার পাশে। আগের দিনই লোকসভায় দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক. প্রায় সমস্ত শরীকই গুজরাট নিয়ে বিজেপি-র সাথে মতপার্থক্য প্রকাশ করে দিতে খুব আগ্রহী। দুই. তাদের বিরক্তি ও ক্ষোভ এতই প্রবল, বিজেপি-র বিনয় কাটিয়ার এবং জনতা দলের (কোন জনতা তা মনে রাখা বেজায় কঠিন) দেবেন্দ্র যাদব হাতাহাতিই শুরু করে দিয়েছিলেন প্রায়। নেহাত মেঝেতে প্রমোদ মহাজন আর মঞ্চে ডেপুটি স্পীকার মহম্মদ সাঈদ ছিলেন, নইলে কী হতো কে জানে !

শরীকদের ক্ষোভ এতটাই যে, বিজেপি-শিবসেনা ছাড়া বাকি সব দল আলাদা সভা করে ঠিক করে এসেছিল কী বলবে, কী করবে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর মিটিংয়ে। করতে হলো না কিছুই। বলতেও হলো না প্রায় কিছুই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আদভানি দেশের সব খবরই পেয়ে যান অগ্রিম। তিনি সভায় জানালেন, গুজরাট থেকে খবর এসেছে, ভিএইচপি-র 'অস্থিকলস যাত্রা' হচ্ছে না! সভা থিতু। প্রাজ্ঞ শরীকরা গলে জল। কারো কোনো ক্ষোভ নয়, আলোচনার বিষয় হয়ে গেল এনডিএকে কেমন করে আরও সক্রিয় করা যায়। কী করে সবার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীকদের কেউ জানতে চাইলো না, কেন 'যাত্রা হচ্ছে না। ভিএইচপি-র হৃদয় কেন উদার হলো হঠাৎ! কী মূল্যের বিনিময়ে হলো! আসলে শরীকরা প্রায় সবই গলে জল হওয়ার জন্য হাত ধুয়েই বসেছিল। অজুহাত হিসেবে একটা খড়কুটো চাইছিল শুধু। 'অস্থিকলস যাত্রা' স্থগিত সেই খড়কুটো। অথচ তাদের ক্ষোভের গোপন কারণগুলি বাদ দিলেও (যেমন কাউকে কাউকে এখনও মন্ত্রী না করা) ঘোষিত কারণই ছিল অনেক। তবুও .....

www.pathagar.com

যে কারণটা তারা জানতে চায়নি, সেটা জানিয়ে দিলেন এখন বিশ্বময় পরিচিত হয়ে যাওয়া দুর্ধর্ষ মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। রীতিমত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেই জানিয়ে দিলেন। তিনি হিন্দুদের (ভিএইচপি তো পঁচাশি কোটি হিন্দুর একমাত্র প্রতিনিধি।!) এবং মুসলমানদের 'বাধাই' দিলেন রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে হিন্দুরা 'যাত্রা' বাতিল করেছে বলে এবং মুসলমানরা মহরমের মিছিল বের করবে না ঘোষণা করেছে বলে। তার পরিতৃপ্ত মুখ, প্রশান্ত ধন্যবাদ এবং স্মিত হাসি দেখেই বুঝা গেল, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হিন্দুরাষ্ট্র হয়ে উঠার দিকে এগোনো গেছে আরও এক পা।

প্রথম পা পড়েছিল প্রায় দেড়শো বছর আগে, যখন ১৮৫৭ সালে প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল বাবরি মসজিদ। ইংরেজরা সামলেছিল কোনোক্রমে। একই ধরনের আক্রমণ সংগঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে। তার দশ বছর আগেই (১৯২৫) জন্ম হয়েছে আরএসএসের। তাদের উদ্যোগেই আক্রমণ, খানিকটা ক্ষতিসাধন এবং মসজিদের মধ্যে রামলালাকে বসিয়ে দিয়ে আসা। সেবারও ইংরেজরাই সামলেছিল পরিস্থিতি। তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল মসজিদে। তার এক প্রকোষ্ঠে পড়েছিলেন রামলালা।

দ্বিতীয় পা পড়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যখন হিন্দু ভোট ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস রাজত্বে সেই তালা খুলে দেয়া হয়েছিল। শুরু হয়েছিল রামলালার পূজো স্থান মসজিদ, সেখানে হচ্ছে এক 'হিন্দু দেবতার' পূজো!

তৃতীয় পা পড়লো আমাদের চোখের সামনে টেকনোলজির বিপ্লবের যুগে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সারা পৃথিবী দেখল আরএসএস-ভি-এইচপি বজরং দল নেতাদের উদ্যোগে, উৎসাহে ও সংগঠনে এবং বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো বাবরি মসজিদ। সেখানে অস্থায়ী মন্দির বানানো হল। শুরু হল নিয়মিত দর্শন ও পূঁজো। ছিল মসজিদ, হয়ে গেল হিন্দু মন্দির। 'সেকুলার' ভারত এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কীভাবে এগোতে পারে হিন্দুরাষ্ট্রের দিকে? তখন কিন্তু দিল্লীতে কংগ্রেস রাজত্ব আর কংগ্রেস তো দল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষই!

এরপর থেকেই বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির গড়ার কথাটা এসে গেল আলোচ্য বিষয়ে। আলোচ্য বিষয় থেকে আন্দোলনের শ্লোগানে। শ্লোগান থেকে জঙ্গি লড়াইয়ে।

বর্তমান ভারতের কাহিল, অত্যন্ত কাহিল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে যে বিষয়টা আলোচনাতেই আসতে পারে না, সেটাই হয়ে উঠলো প্রধানতম রাষ্ট্রীয় ভাবনার বিষয়। রাষ্ট্রের শরীর থেকে হিন্দু চরিত্রের গন্ধ পাওয়া যেতে লাগলো স্পষ্ট।

www.pathagar.com

চতুর্থ পা প্রকাশ্য হল গোধরার নৃশংস ও করুণ ঘটনাকে উপলক্ষ করে গুজরাটের গণহত্যায়। গুজরাটে যা ঘটলো এবং এখনও ঘটে চলেছে, তার সাথে কোনো 'দাঙ্গার'ই তুলনা চলে না। কারণ ১. সবই ঘটেছে সরকারী সমর্থনে। বহু ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতিতে ও সহযোগিতায়। সরকারী আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে লরি লরি খুনি ও লুটেরা ঢুকেছে আহমেদাবাদে। ভোটার তালিকা ধরে ধরে চিহ্নিত করেছে মুসলমানদের দোকানপাট, বাড়ীঘর। লুণ্ঠনের পর অগ্নি সংযোগ এবং সেই সংগে নির্বিকার হত্যালীলা চলেছে। শুধুমাত্র একটি মুসলমান মহল্লা, অভিজাত পাড়া, গুজরাট সোসাইটি আক্রমণ করে ২০,০০০ জনতার একটি 'মব'। প্রথম রাতেই (২৮ ফেব্রুয়ারী) অন্তত ১৮০টি ব্যবসাস্থল লুট ও পুড়ে ছাই হয়। নিহত হয় ২০০-র উপর। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা সহস্রাধিক। হত্যা চলেছে এখনও। এ পর্যন্ত ২০০০ কোটি টাকার উপর সম্পত্তি হারিয়েছে মুসলমানরা। শুধু উদয়পুর-মুম্বাই হাইওয়ের উপরই ৫০০-র উপর হোটেল শেষ হয়ে গেছে। এখন এসব জায়গা দখল করতে উদ্যত করসেবকরা। তাদের সব রকম সাহায্য দিচ্ছে ভিএইচপি। উদ্দেশ্য, মুসলমানরা আর যাতে ফিরে আসতে না পারে রাজধানীর বাণিজ্যে।

অন্যদিকে, ত্রাণশিবিরে যে হাজার হাজার মানুষ পড়ে আছে নরকতুল্য অস্তিত্বে, তাদের দেখতে যাচ্ছেন না কোনো রাজপুরুষই। ২. অন্যসব দাঙ্গার সংগে গুজরাট কাণ্ডের তফাত, সব দাঙ্গাতেই দু পক্ষেরই হাত থাকে। দু পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় আক্রমণ প্রতি আক্রমণে। গুজরাটে সব আক্রমণই একতরফা, কোনো প্রতি আক্রমণ নেই। যেসব বাড়ী, দোকান পোড়ানো হচ্ছে সবই মুসলমানের। নিহত সকলেই মুসলমান। এটা তাই দাঙ্গা নয়, গণহত্যা। এ পরিস্থিতিতেই মস্ত অধিবেশন বসেছিল আরএসএসের বাঙ্গালোরে। সেখানে শান্তির আবেদন নয়, সহনশীলতার কথা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সংযত করা নয়, এক প্রস্তাবে সোজাসুজি বলা হলো, 'মুসলমানদের বুঝে নিতে হবে, তাদের নিরাপত্তা সংখ্যাগরিষ্ঠের শুভ ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল।

গোলওয়ালকরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল স্পষ্টই। পাছে কারো বুঝতে অসুবিধা হয় আরএসএস চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল গুজরাট কাণ্ড আসলে হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে এগোনোর সুচিন্তিত পরিকল্পনারই অঙ্গ। সেদিকেই পড়লো পঞ্চম পা। গুজরাটেই। প্রতি বছর সেখানে ৬০০০ গ্রামে ৪২টি শহরে মহরমের মিছিল বেরোয়। শুধু আহমেদাবাদেই সরকারীভাবে ৯২টি তাজিয়া মিছিল করা হয়। এছাড়া সংগঠিত হয় ২৫০০-র মতো মান্নত তাজিয়া। তিন লক্ষের উপর মানুষ তাতে অংশ নেয়। এবারে গুজরাটে 'বিষাদ সিন্ধুর' পানি পৌঁছাতে পারলো না। হাসান-হুসাইনকে স্মরণ করে শোক প্রকাশ করতে পারলো না সেখানকার মুসলমানরা।

www.pathagar.com

এনডিএ-র সভাতে আদভানি জানালেন, গোধরায় মৃতদের ভস্ম নিয়ে 'অস্থিকলস যাত্রা' স্থগিত করে দিয়েছে ভিএইচপি। কিন্তু বললেন না, মহরমে এবারে সেখানে কোনো তাজিয়া মিছিল হবে না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে না। তাজিয়া কমিটির পক্ষে ভিজে মোমিন বলেছেন, এ প্রথম গুজরাটের গ্রামাঞ্চলেও কোনো তাজিয়া মিছিল বেরোল না। এটিই হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের দিকে পঞ্চম পা। এর আগেও তিনবার তাজিয়া মিছিল বাতিল হয়েছিল গুজরাটে। একবার জাতীয় শোকের কারণে, ভুজে ভূমিকম্পের পর। তার আগে ৮৫ সালে দাঙ্গা এবং ৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর। তিনবারই হিন্দু দাঙ্গাবাজদের কারণে আরএসএসের উদ্যোগে ও সমর্থনে। কোনো কারণেই কি গুজরাটে বন্ধ হয়, কখনও হয়েছে কোনো হিন্দু পূজো ? কৃষ্ণলীলা থেকে বাঙালিদের কালীপূজো ?

এসব ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পদক্ষেপের লক্ষ্য শুধু মুসলমানরা নয়, সমস্ত অহিন্দুরা, কারণ সব পদক্ষেপেরই লক্ষ্য গোলওয়ালকরের প্রতিজ্ঞা পূরণ, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। 'দল খালসা' আরএসএসের প্রস্তাবের সারমর্ম সঠিকভাবে বুঝেই বলেছে, 'এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সংখ্যালঘুর শোষণের কাজ .... আজ ওরা মুসলমানদের ধমকাচ্ছে, কাল ওদের লক্ষ হবে শিখরা।' এবং তার পরের দিন হিন্দুদের মধ্যেই দলিতরা। ওরা হিন্দি ভাষায় যে হিন্দুরাষ্ট্র গড়তে চায়, তা শুধুই বর্ণহিন্দুদের রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই সেখানে। ধর্মনিরপেক্ষতার তো নেই-ই।

❐

www.pathagar.com

# গুজরাতে দাঙ্গার নামে হয়েছে পরিকল্পিত গণহত্যা

–অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

২৮ ফেব্রুয়ারীর বিকেল। আহমদাবাদের লাগোয়া নরোদা পাতিয়ার নিজের ঘরে সপরিবারে ছিলেন আইয়ুব কুরেশি। হঠাৎ তিনি শুনতে পান বাইরে 'জয় ভারতমাতা কি' চিৎকার। কিন্তু কিছু বুঝার আগেই একদল লোক তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে ছুরি, তলোয়ার, পেট্রোল বোমা। আইয়ুব সপরিবারে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আইয়ুব-এর ভাষায় "তারা আমার কোল থেকে সাত বছরের মেয়ে এবং পাঁচ বছরের ছেলেকে ছিনিয়ে নেয় এবং আমার চোখের সামনে তাদের আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। আমার ছেলেমেয়ের অসহায় চোখ দুটো এখনও আমি ভুলতে পারছি না, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ভুলতে পারবো না। এর থেকে আমার মরে যাওয়া ভাল ছিল।"

১৮ বছরের আফসানার অভিজ্ঞতাও খুব মর্মান্তিক। নরোদা-পাতিয়ায় তার বাড়ীতে আক্রমণকারীরা হত্যা করেছে তার বাবা-মা, চার ভাই ও তিন বোনকে। আফসানার ভাষায় "লোকগুলো কেরোসিন ছুঁড়তে থাকে এবং বিরাট আগুন লেগে যায়।" চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে সে তার ভাইকে কোলে নিয়ে একটি পাঁচিলের উপর উঠে পালাতে যায়। কিন্তু আফসানার বর্ণনায় "আমার হাত ফসকে যায় এবং ভাই পড়ে যায় আগুনের মধ্যে।" আহমদাবাদ সিভিল হাসপাতালে শুয়ে কথাগুলো বলছিল সে।

উপরোক্ত ঘটনা দুটি আউটলুক পত্রিকার ১০ই মার্চ সংখ্যা থেকে নেয়া। প্রতিবেদক রঞ্জিত ভূষণ। তিনি লিখছেন, "এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ২৮ই ফেব্রুয়ারী গুজরাতে যা হয়েছে, তা রাজ্য প্রশাসন ও শাসক দল বিজেপি-র যোগসাজশ ও এমনকি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হতো না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা একের পর এক মুসলিমদের ঘর, দোকান, বাড়ী জ্বালিয়েছে লুটপাট করেছে। সমস্ত নিরপেক্ষ সূত্রগুলি থেকে তথ্য যাচাই করে বুঝা যাচ্ছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই গণহত্যা সংগঠিত করা হয়েছে। বহু প্রত্যক্ষদর্শী এই সাংবাদিককে জানিয়েছেন যে, পুলিশ বাহিনী প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সংখ্যালঘুদের বাড়ী চিহ্নিত করে, উন্মত্ত জনতাকে সমবেত করে, 'কাজ সম্পন্ন করেছে।' .... সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকান ঘর,

www.pathagar.com

ঘরবাড়ী, শোরুম, হোটেল পরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত করে ধ্বংস করা হয়েছে। যেসব মুসিলমরা আলাদা না থেকে হিন্দু এলাকায় থাকতেন তাঁদের খুঁজে বের করা হয়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাঁচমহল, বরোদা, বাহরুচ, সুরাত, খেদা, আনন্দ, নাদিয়াদ, সবরকণ্ঠ, বনসকণ্ঠ, রাজকোট, ভাবনগর, পাট্টান, মেহসানায় ও অন্যত্র যেভাবে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে তা কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচিত চিত্র নয়।"

রঞ্জিত ভূষণ লিখেছেন, "আগেকার দাঙ্গার মতো মন্দিরে মরা গরু বা মসজিদে শুয়োর ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটেনি। ..... উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আহমদাবাদে এক অফিসার জানালেন, কীভাবে গত কয়েক মাসে আহমদাবাদে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে পরিকল্পিতভাবে মুসলিম ব্যবসায়ীদের ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বলছেন, তখন বুঝতে পারিনি কেন এসব হচ্ছে। আজ বুঝতে পারছি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন পেশাদারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মুসলিম ছাত্রদের নাম যোগাড় করেছে। কিছু সরকারী সূত্র থেকে জানা গেছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সদস্যরা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে (যেমন, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া) ও তাদের সহযোগী সংস্থাগুলোতে 'অবাঞ্ছিত' লোকজনদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। এই তালিকা ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী কতটা কাজে লেগেছে বলা কঠিন, কিন্তু ব্যাখ্যা মেলে না যে কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৫০টি বা ১০০টি দোকানঘরকে এক সাথে বেছে বেছে আগুন লাগানো হলো।"

১০ই মার্চ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় অঞ্জলি মোদী লিখেছেন, "আহমদাবাদের হিংসায় যে নৃশংসতা দেখা গেছে তা এ শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এর আগে দাঙ্গা হয়েছে ১৯৬৯, ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯২ সালে। কিন্তু এবারে যা ঘটলো তা যে অন্যরকম সে বিষয়ে সকলেই একমত। এক সিনিয়র পুলিশ অফিসার আমাদের বললেন, 'এবারের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের গণহত্যা।' আরেক পুলিশ অফিসার বললেন, এবারে গুজরাতে যে হিংসা হয়েছে তা 'দাঙ্গা' নয়। 'যদি দাঙ্গা হয় তবে দু' তরফের মধ্যে সংঘর্ষ হবে। এর আগে যতগুলো দাঙ্গা হয়েছে তাতে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উভয় পক্ষই সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু এবারে একমাত্র মুসলিমরাই আক্রান্ত এবং রাষ্ট্রের মদদেই তা হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে।"

অঞ্জলি মোদী আরও লিখেছেন, "আহমদাবাদের বাদুনগরে মনসা মসজিদে এবং হরদাসনগরে নূর মসজিদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে 'মহা আরতি' সংগটিত হয়েছে এবং ভিতরে হনুমানের মূর্তি বসানো হয়েছে।

www.pathagar.com

এখনও বিভিন্ন পরিত্যক্ত মসজিদে গৈরিক পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে। কারোর সাহস নেই তা সরিয়ে দেবার। এমনকি পুলিশেরও নেই। কেন ? এক পুলিশ অফিসার বললেন, "এখানে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে গোটা সম্প্রদায়কে অপমানিত করা হয়েছে।" .... 'আহমদাবাদ রক্তাক্ত হয়েছে, কারণ পুলিশের উচ্চপদস্থরা ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা রক্তাক্ত হতে দিয়েছেন বলেই।'

গুজরাতে যা হয়েছে তা দাঙ্গা নয়, তা পরিকল্পিত গণহত্যা একথা প্রায় সমস্ত সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাই লিখেছেন। ১১ই মার্চ টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে দীপঙ্কর গুপ্তও একই কথা লিখেছেন। তিনি ঐ ঘটনার সামাজিক বিশ্লেষণ করার আবেদন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এ ঘটনা ঘটেনি বরং ঘটানো হয়েছে। ইতিহাসে দেখা গেছে, গুজরাটেও দেখা গেল, সরকারী মদত ছাড়া দাঙ্গা কখনও ছোটখাটো সংঘর্ষের বেশি ছড়াতে পারে না। হত্যাকারীরা তখনই সাহস পায় যখন দেখা যায় যে, কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

তবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর গৈরিক বাহিনীর হয়ে কি কোনো সংবাদপত্র বা পত্রিকা লিখছে না ? 'ইন্ডিয়া টু-ডে'পত্রিকার ১৮ মার্চ সংখ্যাটি পড়লেই বুঝা যাবে গণহত্যার বিবরণ দিয়েও তারা নরেন্দ্র মোদীকে আড়াল করার জন্য কি চেষ্টাই না করেছে। আর তা হবে না-ই বা কেন ? পত্রিকার সম্পাদক প্রভু চাওলা তো একজন পুরোপুরি বিজেপি-র ধামাধরা ব্যক্তি। দূরদর্শনের পর্দাতেও তাঁকে প্রায়ই বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সামনে দন্ত বিকশিত অবস্থায় হেঁ হেঁ করে হাত কচলাতে দেখা যায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। অতএব ঐ পত্রিকার সাংবাদিক উদয় মহুরকর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, 'গুজরাটের অভ্যন্তরে চিত্রটা বিপরীত'। উদাহরণ হিসাবে তিনি লিখেছেন, 'গত ৫ মার্চ যখন নরেন্দ্র মোদী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এক সভায় ভাষণ দিলেন, তখন কেউ তাঁকে সমালোচনা করেননি। আহমদাবাদের এক কলেজ ছাত্র বিশাল প্যাটেল বললো, 'যেভাবে তাঁর আমলে জাতীয়তা বিরোধী শক্তিকে উচিত শিক্ষা দেয়া হলো, তার জন্য তাঁকে স্যালুট করা উচিত।' প্রতিবেদকটি নানা রকম ধানাইপানাই করে একথা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন যে, গণহত্যা ঠেকানো পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নরেন্দ্র মোদীকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু হায় ! ঐ পত্রিকার এক সাক্ষাতকারে নরেন্দ্র মোদী নিজে কী বলছেন ? তিনি বলেছেন, 'যা হয়েছে তাকে কেবল

www.pathagar.com

একটি দাঙ্গা বললে ঠিক হবে না, এ ছিল গণবিক্ষোভ। সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মানুষ ক্রুদ্ধ হয়েছিল।'

অর্থাৎ গুজরাটে যা হলো তাকে একটি ইতিবাচক ঘটনা হিসাবেই মনে করেন নরেন্দ্র মোদী। একই কথা বলেছেন, বজরং দলের সহ-সভাপতি হর্ষভাই ভাট। আউটলুক পত্রিকায় ১০ই মার্চ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এখানে যা হয়েছে তা দাঙ্গা নয়। সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। এ হলো হিন্দু 'সমাজের' প্রতিক্রিয়া। মানুষ গোধরার বদলা নিতে চেয়েছে এবং সেটাই করেছে।'

❐ ❐ ❐

২৭ই ফেব্রুয়ারি গোধরায় বর্বরেরা ৫৭জনকে সবরমতী এক্সপ্রেসে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনার নিন্দা করেছেন সকলেই। দোষীদের ধরতে সকলেই দাবি জানিয়েছেন। তবু বিজেপি নেতারা বলছেন, ঐ ঘটনায় হিন্দুরা মারা যাওয়ার কারণেই নাকি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি মোটেই হামলার নিন্দা করেনি। তাই নাকি ? আউটলুক পত্রিকার সম্পাদক বিনোদ মেহতা প্রশ্ন তুলেছেন, 'কেন রিখটার স্কেলে ধরা পড়েছে যে, গোধরার জঘন্য ঘটনাকে যথেষ্ট নিন্দা করা হয়নি ? শত শত মুসলিম যারা নিহত হয়েছে তাদের মতোই গোধরায় নিহত করসেবক ও তাঁদের পরিবারও সমান সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু গুজরাটের বীভৎস সংঘর্ষ নিয়ে কি এভাবেই বিতর্ক তোলা হবে ?'

এবারের পিপলস ডেমোক্র্যাসি পত্রিকায় (মার্চ ১০তম সংখ্যা) একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এটি উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ থেকে প্রকাশিত জনমোর্চা পত্রিকার প্রতিবেদন। পত্রিকাটির সম্পাদক শীতলা প্রসাদ। গোধরা ঘটনার ২ দিন আগে অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি ঐ পত্রিকা প্রতিবেদনটি ছাপিয়েছিল। তাতে প্রতিবেদক বিস্তারিত লিখেছেন, কীভাবে বজরং দল কর্মীরা সবরমতী এক্সপ্রেসে নিরীহ মুসলিম যাত্রীদের উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা মুসলিম যাত্রীদের ত্রিশূল দিয়ে লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করেছে, মহিলাদের বোরকা খুলে দিয়েছে, তাদের মারধরও করেছে। বেশ কিছু মহিলা সকাল ৮টায় রক্তাক্ত অবস্থায় রুদৌলি স্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপও দিয়েছেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলিম ব্যক্তিদেরও আক্রমণ করা হয়েছে। আহতরা জানেন না কেন তাঁদের উপর হামলা করা হলো। প্রতিবেদক বলছেন, এতে উত্তেজনা বাড়ছে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিরা এ ঘটনার নিন্দা করেছেন।

এ সাংবাদিকের আগাম হুঁশিয়ারী কেউ কি শুনেছিলেন ?

www.pathagar.com

# গুজরাতে যা দেখে এলাম ঃ
# 'হিন্দুত্ব'র নামে সংগঠিত হত্যা

–শর্মিলা বসু

রাম রাজ্য বুঝি এসেই গেছে গুজরাতে। এবং অগ্নি পরীক্ষায় মুসলিমরা যে ফেল করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠিক কতজন যে প্রাণ হারিয়েছেন তা ত্রাণকারী সংস্থাগুলো বলতে পারছে না, গ্রামাঞ্চলে হতাহতের সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে সর্বত্রই রামের নাম করে বহু মুসলিম নারী-পুরুষ শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বড়োদারা-আহমদাবাদ-আনন্দ জেলার পথেঘাটে বার বার প্রতিধ্বনির মতো ফিরে ফিরে এলো কিঞ্চিৎ অস্ফুটে বলা কথাটা, 'জ্বলা দিয়া গয়া'।

বড়োদরা থেকে আহমদাবাদের রাস্তায় অনেক গাড়িই চলছে এতদিনে, চলছে মালবাহী ট্রাক। আহমদাবাদের কাছাকাছি এসে নতুনত্বটা চোখে পড়লো, এ যেন এক নতুন ধরনের 'পাবলিক আর্ট, রাস্তার দু' ধারে দুমড়ানো-মুচড়ানো সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ লরি, গাড়ি, মোটরবাইক। পরিবহণ শিল্পে বেশ জমিয়ে বসেছিলেন মুসলমান উদ্যোগীরা। মুসলিম মালিক, কি মুসলিম ড্রাইভার, কি মুসলিম কারখানার মালপত্র, দেখলেই ধ্বংস করা হয়েছে। গ্যারাজ চালানোতেও অনেক ছিলেন, সেগুলোও গেছে।

মুসলিম প্রধান জুহাপুরা অঞ্চলে ঢুকে প্রথম পুলিশ নজরে এলো, গাছ তলায় ঝিমোচ্ছে। একখানা টহলধারী সেনাদের ট্রাক। পরদিন এ এলাকায় আর ঢোকা যায়নি, আবার কার্ফু জারি হয়ে গেছে। এক সময় নেহরু ব্রিজ পেরিয়ে পুরনো শহরের দিকে গিয়েছিলাম চেনা জায়গার সন্ধানে, কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল। সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য শহর, যেন এক নিথর মৃত্যুপুরী। কিছুদূর অন্তর দলে দলে পুলিশ, তারা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়ে তাকাল উড়ো অতিথিদের দিকে। এলাকা ছেড়ে যেতে হলো। আমি থাকাকালীন আর পুরনো শহর থেকে কার্ফু উঠেনি।

তবে ব্রিজের ওপারে আহমদাবাদের নতুন দিকের অনেকটাই নরেন্দ্র মোদীর ভাষায় 'নর্মাল'। লোকজন চলছে ফিরছে, দোকানপাট খোলা। যেমন কোথাও দশটা দোকানের সারির মধ্যে সাতটা ব্যবসার জন্য খোলা, বাকি তিনটে ফোকলা দাঁতের মতো শূন্য এবং ভস্মীভূত। ওঃ ওই গুলো মুসলমানদের

www.pathagar.com

ছিল তবে ? 'স্বাভাবিক' অঞ্চলগুলোর সর্বত্রই একই ছবি। পাশাপাশি বহুতল হোটেলের মধ্যে একটি লুট করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তো অন্যটি দিব্যি ঝকমক করছে। পুরনো ব্যবসায়িক রাস্তা আশ্রম রোড বা নতুন ফ্যাশনেবল সিজি রোডও এবার রেহাই পায়নি। আগেকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সাধারণত পুরনো শহরের গরীব মানুষই হিংসার বলি হতেন। কিন্তু এবার তো অন্য রকম। দু পক্ষে তো মারামারি হয়নি, অন্তত এখনও নয়। বজরংবলীর হুঙ্কারের সাথে আক্রান্ত হয়েছে মুসলিম পরিবার, মুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্য, মুসলিম গ্রাম।

আহমদাবাদে ত্রাণকারী সংস্থাগুলোর মিটিং বসেছিল, আরও সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার উপায় ঠিক করতে। গুজরাতে দীর্ঘদিন কর্মরত এনজিও-রা এতে শামিল। মার্টিন ম্যাকইউয়ানের 'নবসারং' গগন শেঠির, 'জনবিকাশ' ছোট বড় আরও বহু স্বেচ্ছাসেবী দল। দিল্লি, মুম্বাই থেকে আগত মানবাধিকার কর্মীরা, তিস্তা সেতলবাগ, আইনি বিশেষজ্ঞরা। দেখলাম হিন্দু ও খ্রিস্টান স্বেচ্ছাচারী সংস্থাই জড়ো হয়েছে। ত্রাণশিবিরগুলো মুসলিম সংস্থারাই চালাচ্ছে, অন্যেরা ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে তাদের সহায়তা করছে। ত্রিশ-বত্রিশটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক সাথে হয়ে গঠন করেছে 'সিটিজেনস ইনিশিয়েটিভ'। সকলেই বললেন, ত্রাণের কাজে সরকারী 'ইনিশিয়েটিভ' বিশেষ দেখা যায়নি, তাণ্ডব শুরু হওয়ার এক মাস পরেও কোনো 'রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ' ঘোষিত হয়নি।

গোধরাকাণ্ড যে ঠিক কীভাবে ঘটেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তারপরের দিনগুলোতে কী ঘটেছিল তা নিয়ে দেখলাম কোনো সংশয় নেই, না মুসলিম সম্প্রদায়ে, না ত্রাণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে। যা ঘটেছে তাহল একতরফাভাবে মুসলিম নিধনযজ্ঞ। একতরফা আক্রমণও নতুন নয়— ১৯৮৪ সালে নির্দোষ শিখেরা হয়েছিলেন এমন অন্ধ বিদ্বেষের শিকার। তখনও প্রশাসন ছিল দায়িত্বে ব্যর্থ, রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, মহীরুহের পতনে ধরণী তো কাঁপবেই। অ্যাকশন হলে রি-অ্যাকশন হবে, ওমলেট বানাতে হলে ডিম তো ভাঙবেই—এমন কত উক্তি শোনা হয়ে গেছে আমাদের।

কিন্তু এবার গুজরাট অন্য রকম। নতুন মাত্রাগুলোর কথা সকলেই বললেন, কিন্তু 'সিটিজেন্‌স' ইনিশিয়েটিভ'-এর ফাদার মোসেস-এর মৃদু কণ্ঠের বিশ্লেষণ কানে বাজছে। এবার নারী ও শিশুদের যেভাবে অত্যাচার ও হত্যার লক্ষ্য করা হয়েছে তেমন আগে কখনও দেয়া যায়নি। হিন্দু ধর্মের নামে অসংখ্য মুসলিম নারীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে পৈশাচিক ভাবে। তবে মানবাধিকার কর্মীরা ধর্ষিতাদের পক্ষে জবানবন্দি নিতে পারছেন না, কারণ ধর্ষণের পর

www.pathagar.com

তাঁদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব অধিকাংশই মৃত। শিশুদের প্রতি এমন নির্মম আচরণও গত বিশ বছরের বিবিধ দাঙ্গায় নাকি দেখা যায়নি। চারতোড়ার ত্রাণশিবিরে ঘিরে ধরে ভিড় করেছিলেন নানা বয়সের নারী, ঠাকুরমা-দিদিমাদের থেকে অল্প বয়সী—আসমা বিবি, সাহেবা বিবি, মুবিনা বিবির মতো গরীব ঘরের মেয়েরা। তাঁদের কাহিনীতে ত্রাস, হতাশা, হাহাকার। ছেলেদের থেকে আলাদা পেয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে হতভাগ্যেরা পালাতে পারেনি। তাঁদের কপালে কী জুটেছে, ভিড় করা শিশুদের দেখিয়ে জানিয়েছেন অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার কথা। সংঘ পরিবারের কার্যকলাপের সাথে জার্মানীতে নাতসিদের উত্থানের তুলনা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু গুজরাট পর্বের পরিকল্পনাকারীরা বসনিয়া-ক্রোয়েশিয়া থেকে প্রচুর শিক্ষা নিয়েছে মনে হলো।

আর এক নতুন মাত্রা হলো মধ্যবিত্ত, এমনকি বড়লোক এলাকাতে মুসলমানের উপর আক্রমণ। হিন্দুত্বের কল্যাণে গুজরাটের মুসলমানরা আজ 'ক্লাসলেস সোসাইটি'। তাতই সিজি রোডেও দোকানপাট পুড়েছে, পালডি এলাকায় ফ্ল্যাট পুড়েছে, বাংলা বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন শিক্ষিত, মধ্যবিত্তেরা। সেখানে একটি পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখা মিললো এক ডজনের। আশপাশ থেকে হাজির হলেন বাংলো-বন্দি মুসলিম উদ্যোগী পরিবারের শিক্ষিত, মার্জিত সদস্যেরা। কারও ফ্লাট পুড়েছে, কারো দোকান, কারো বা কারখানা। ১৩০০-র বেশি হোটেল পুড়েছে। অধিকাংশেই মুসলিম মালিকানার কোনো প্রকাশ্য চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আমার-আপনার যা জানার উপায় নেই, তা বজরঙিদের জানা ছিল বিলক্ষণ। এ এলাকার এমএল এ হরেন পাণ্ড্য। ত্রাণ শিবিরের বাসিন্দারা যেমন ভয়ে বাইরে পদার্পণ করছেন না, সুলতানা-ফাউজিয়-ইফতিকার-তালাতের মতো 'প্রফেশনাল'রাও নিজেদের এলাকায় বন্দি। এলাকার পোড়ানো বাড়ি ও দোকানপাট দেখতে বেরুলাম যখন, কেউ কেউ সেই প্রথম বাইরে এলেন, মধ্যবিত্ত এলাকায় হঠাৎ হঠাৎ একটা করে পোড়ানো বাড়ি। একটা চার তলার ফ্লাটবাড়ির ভিতরে ঢুকে মনে হয় আফগানিস্তান বুঝি। নীচ তলায় ভস্মীভূত গাড়ি, বাইক। বাড়ী আগে লুট করে পরে আগুন লাগানো হয়েছে। গোটা ব্যাপার সম্পন্ন করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগেছে, শহরের সর্বত্রই তাই। প্রশাসনিক সাহায্য আসেনি। নরেন্দ্র মোদী বড়াই করেছেন, তাঁর পুলিশ ৯৮জনকে গুলি করে মেরেছে। তেমন অন্তত দুটি 'কেস'-এর সাথে তো শহরের হাসপাতালেই পরিচয় হলো—একজন মৃত, অন্যজন পেটে গুলি খেয়ে গুরুতর আহত। দুজনেই মুসলমান। রেলস্টেশনে যেতে গিয়ে আক্রান্ত। বস্তি থেকে

www.pathagar.com

বাংলো, সব স্তরের মানুষেরই বক্তব্য, বজরঙিরা একা এলে তবু তাঁরা লড়ে যেতেন, কিন্তু পুলিস ওদের সাথে থাকায় পেরে উঠেননি। প্রত্যেকেরই অভিযোগ, পুলিস আক্রান্তদের গুলি করেছে, আক্রমণকারীদের নয়। এ সংগঠিত আক্রমণে সরকারের ভূমিকাও এবার গুজরাটের নতুন মাত্রা।

ফাদার মোসেস-এর ভাষায় শেষ নতুন মাত্রাটি হলো হিন্দু সমাজের ঔদাসীন্য। আহমদাবাদেই ৬০,০০০ মানুষ নিজেদের শহরেই শরণার্থী। অথচ হিন্দুরা 'স্বাভাবিক' ভাবেই কাজে যাচ্ছেন, রেস্টুরেন্টে খাচ্ছেন, আমোদ-আহ্লাদ করছেন। তাঁরা নিরাপদ। আনন্দ জেলার ত্রাণ কমিটির ইলিয়াস হিসেব দেখালেন, ২৩টি শিবিরে ১৮,০০০ ঘরপোড়া গ্রামবাসী। ফিরে যাওয়া দূরের কথা, পুলিস নিয়েও ধ্বংসের হিসেব করতে গ্রামে ঢুকতে পারেননি তাঁরা। আহমদাবাদে চারতোড়ায় ১৫০০ বাসিন্দার ঘিঞ্জি বস্তি সংলগ্ন কবরখানায় ৬০০০ উদ্বাস্ত মৃতদের সাথেই দিন কাটাচ্ছেন। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে প্রবীণা জান্নাতউন্নিসার আকুতি, আমরা গরীব মানুষ, কোনো সরকারই আমাদের জন্য কিছু করে না, শুধু 'শ্বাস লেনেকা অধিকার' চাইছেন তাঁরা। রাম জন্মভূমির প্রবক্তাদের প্রতি তার হতভম্ব জিজ্ঞাসা, গুজরাট তো আমারও 'জন্মভূমি', তা-ই না ?–আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ ২৮-৩-২০০২

❐

www.pathagar.com

# মহাত্মা গান্ধীর ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার এক পরিকল্পিত চক্রান্ত

–রফীক যাকারিয়্যা

এতে একটু সন্দেহ আছে যে, পকেটমার, জুয়াড়ী ও কট্টর অপরাধী কুখ্যাত বিলাল হাজী ওরফে বিলাল সালীজা হতভাগ্য সবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকদের পোড়ানোর মতো ভয়ংকর সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে এবং লোমহর্ষক ওই অপকর্ম কতিপয় সমাজবিরোধীর সহযোগিতায় পরিচালনা করেছে গোধরা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হুসাইন কলুটা। বলা হচ্ছে, ওই ঘৃণ্য কাজের জন্য আইএসআই মোটা অংকের অর্থ দিয়েছিল।

পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখা অন্য কিছু আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের সাথে দু' ক্রিমিনাল স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছে এবং ওদেরকে এই ঘৃণ্য কাজের জন্য উস্কেছে। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, ওরা এমন কাজ কেন করেছে ? কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার, ওরা জানতো, ওদের ওই কাজের ফলশ্রুতিতে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া হবে এবং ওদের ধর্মের হাজারো মানুষের মৃত্যু ও সর্বনাশ ঘটবে।

যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাতে নিহত হয়েছে হাজার হাজার মুসলমান। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এটা ঠিকই বলেছেন যে, এই দাঙ্গা কলংকের তিলক, এর দ্বারা ভারতের ভাবমূর্তি বিগড়েছে। গুজরাতের বিভিন্ন এলাকায় গরীব, নিরপরাধ ও হতভাগ্য মুসলমানদের গণহত্যা করা হয়েছে। ওদের মধ্যে কারোরই গোধরা কাণ্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। না বিলাল হাজী আর না অন্য কোনো ক্রিমিনাল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে। ওদের বেশির ভাগই অজ্ঞ এবং কুরআনের শিক্ষা বা নবীর আদর্শ সম্পর্কে অনবগত। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ওদেরকে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে এবং কুরআনের বক্তব্য অনুসারে মৃত্যুর পর ওদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে।

মধ্যযুগের আফগান ও মুঘল শাসনকর্তারা যা করেছেন, যেমনটা বলা হচ্ছে, তার জন্য লাগাতার টার্গেট করা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের। ওই শাসকদের মধ্যে দু-একজন নিসন্দেহে মন্দির ধ্বংস, মূর্তি ভাঙ্গা এবং উপাসনালয়ে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ব লুণ্ঠন করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন

www.pathagar.com

সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যে, কোনো মুসলিম শাসক নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করেছেন। তাইমুর লঙের হাতে তো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে।

তাহলে কেন বর্তমান প্রজন্মের মুসলমানদের—তাদের তথাকথিত উত্তরাধিকারের জন্য, যাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে একজনও হিন্দুর জীবন নেননি —নিহত হতে হচ্ছে ! ওদের এই কীর্তিকলাপ মধ্য যুগের অন্ধকার পর্বের সাথে মিল রাখে। একুশ শতকের এই উজ্জ্বল যুগে গুজরাটের বিভিন্ন এলাকায় যা ঘটছে তাকে বলা হচ্ছে মানবীয় সময়ের সবচেয়ে সংগীন পর্ব।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের নির্বিচারে যে গণহত্যা করেছে, যার খবর প্রিন্ট ইলেকট্রনিক ও মিডিয়ার মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা হচ্ছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নেই।

দুঃখজনক বিষয় হলো, মৃতদের সংখ্যা হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে এবং গুজরাটে মুসলমানদের সম্পদ-সম্পত্তি, ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্রগুলো দক্ষ হাতে ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে লুট করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া।

যেসব রিপোর্ট আসছে তা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে বদ নসীব মুসলমানদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। তাদের বংশ ধ্বংস করা হচ্ছে। আনুমানিক চল্লিশটি শহর এবং দু'শ গ্রাম থেকে মুসলমানদের সাফাই করা হয়েছে। তাদের চার হাজার কোটি টাকার সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। এগুলো বলা হয়েছে স্রেফ অনুমান করে।

এর ফলশ্রুতিতে পঁচিশ হাজার মুসলমান রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বহু মানুষ এমন আছেন যারা কঠোর মেহনত করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যে ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংযজ্ঞ চলেছে তার মধ্যে রয়েছে এক হাজার বেকারি, পান ও মিষ্টি দোকান, গ্যারেজ, সেলুন, হকার প্রভৃতি। এর ফলে দশ হাজার মুসলমান বে-রোজগার হয়ে গেছেন এবং এভাবে তাঁরা হয়ে পড়েছেন রুটি-রুজির মুখাপেক্ষী।

সুরাত ও আহমদাবাদে মুসলমানদের ষাটটিরও বেশি ফ্যাকটরি ছিল যেগুলো পুরোপুরিই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শহরে তাদের ছোট-বড় সমস্ত ব্যবসা কেন্দ্র লুট করা হয়েছে। এর ফলে তাদের ক্ষতি হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

www.pathagar.com

মুসলমানদের সমস্ত রেস্টুরেন্ট, হোটেল ও বোর্ডিং পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য বাড়ী, ফ্লাট, হল ও বিল্ডিং ধ্বংস করা হয়েছে। সে সবের মালিক, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর ও বাসিন্দারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। শত শত মুসলমান পুরুষ, মহিলা, শিশু তথা দুগ্ধপোষ্য শিশু আশ্রয়ের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরছে। ওদের মধ্যে কিছু ভাগ্যবানদের আশ্রয় মিলেছে, যারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে।

মুসলমানদের অসংখ্য স্কুল, মাদরাসা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য যুবক-ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁরা বেঁচে গেছেন তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে নিজেদের জখমের চিকিৎসা করাচ্ছেন। মুসলমান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার মানুষরাও নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য পালাচ্ছেন। তাঁরা নিজেদের বিবি-বাচ্চাদেরকে গুজরাটের বাইরে আপন আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেইসব হিন্দুকেও নিহত হতে হয়েছে, যাঁরা মুসলমানদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমানরা এতটাই আতঙ্কিত যে, মুসলিম পুলিশ অফিসাররা পর্যন্ত নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে নিজেদের নাম বদলে দিয়েছেন। বহু মুসলমান নিজেদের বাড়ী ও অফিস থেকে তাঁদের নেমপ্লেট বদলে দিয়েছেন। গুণ্ডারা ব্যাংক ও হাউসিং সোসাইটিগুলোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছেন যাতে শরণার্থীরা ঋণ পেতে না পারে।

হিন্দুদের বলা হয়েছে, তারা যেন মুসলমানদের সাথে মেলামেশা না করে এবং তাদের সাথে কোনো ব্যবসাও যেন না করে। ওদের উদ্দেশ্য, আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানদের কোমর ভেঙে দেওয়া।

এর আগে এই দেশে এভাবে এত ব্যাপকহারে পরিকল্পিত জাতি সাফাই হয়নি যা এখন চলছে গুজরাটে। এটা সেই ভূখণ্ড, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য।

আমার সন্দেহ হয় যে, গুজরাটে যেসব ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। প্রচার মাধ্যমও মুসলমান বিরোধী দাঙ্গাবাজদের মূল উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে তুলে ধরেনি, যারা চায় রাজ্যে মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দিতে।

❐

www.pathagar.com

# গুজরাট ঃ গ্রামাঞ্চলও ধ্বংসের শিকার

–দিওনি বুনশা

"গোমাংস ভক্ষণকারীদের গ্রামগুলো সাফাই করো, সমস্ত মুসলমানকে হঠাও, ওদের পিছনে ধাওয়া করো এবং ওদেরকে খতম করে দাও।" গুজরাতের পঞ্চমহল জেলার পানঢেরওয়াঢ় গ্রামে বিশ্বহিন্দু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় প্রচারিত হয়েছে ওই নির্দেশ। স্থানীয় পুলিস অফিসাররা এবং ওখানে উপস্থিত থাকা জনৈক জেলা আধিকারিক একধারে বসেছিলেন ও চা খেতে খেতে পরস্পর গালগল্পে ব্যস্ত ছিলেন। পানঢেরওয়াঢ়ের মুসলমানরা ওখানে ছিলেন না। তাঁদের সভাস্থল থেকে দূরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁরা আতঙ্কিত ছিলেন এ বিষয়ে যে, তাঁদের কোনো সামান্য হস্তক্ষেপও কোনো সমস্যার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। ওই জনসভায় তিন সপ্তাহ পরে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সমর্থকরা তাই করেছে, যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে। গ্রামের মুসলিম পাড়ায় আগুন লাগালে নিহত হয়েছেন কমবেশি একুশজন মানুষ। বাস্তবায়িত হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের পরিকল্পনা।

সাইয়িদ আখতার হুসাইন—যিনি পানঢেরওয়াঢ় গ্রামের হামলা থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন—আশ্রয় নিয়েছেন পঁচাশি কিলোমিটার দূরে গোধরায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। তাঁর পরিবারের দুজন সদস্য নিখোঁজ। তাঁর মা ও এক বোন যদি পালাতে সফল না হতেন, তাহলে পুড়ে মরতেন ওই নেকড়েদের হাতে, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিজেপি-র এক স্থানীয় কর্মী।

শেখ নাথুভাই যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ। তিনি নিজের চোখে তাঁর দুই ছেলেকে খুন হতে দেখেছেন। একদল উন্মত্ত জনতা পানঢেরওয়াঢ়ের মুসলমান পাড়ায় হামলা চালালে শেখ নাথুভাই জান বাঁচাতে কোনো রকম দৌড়ে পালান ক্ষেতের দিকে। ওই ক্ষেতেই তাঁর দুই ছেলেকে খুন করা হয় তলোয়ারের কোপে। তাঁর তৃতীয় পুত্র নিখোঁজ। শেখ নাথুভাই-এর কথায়—কয়েক দিন যাবৎ আমি লুকিয়েছিলাম জঙ্গলে। ওখান থেকে মিলিটারিরা আমাকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়েছে লুনাওয়াঢ় ত্রাণশিবিরে। এখান থেকে আমার এক আত্মীয় গোধরায় এনেছেন আমাকে।"

সবরমতী এক্সপ্রেসের একটি বগি পোড়ানোর পর বড় মর্মান্তিক সময়ের মুখোমুখি হয়েছে গুজরাটের গ্রাম্য এলাকার মুসলমানরাও। পঞ্চমহল ও সবরকণ্ঠের মতো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (পড়ুন,

www.pathagar.com

মুসলিম নিধনযজ্ঞ) হয়েছে এ ই প্রথম। ১৯৯০ ও ১৯৯২-এর দাঙ্গায় গুজরাতের অন্যান্য গ্রাম্য এলাকা অবশ্য প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু এ দুটি জেলা (পঞ্চমহল ও সবরকণ্ঠ) দাঙ্গার থাবা থেকে মোটামুটি বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু এবারের দাঙ্গা যেহেতু সংঘ পরিবারের পরিকল্পিত ধর্মান্ধ চক্রান্তের ফলশ্রুতি, তাই মুসলিম নিধন অভিযান ছড়িয়েছে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত। দাঙ্গার কয়েকটি ঘটনা থেকে বুঝা যায়, সেগুলি ছিল পরিকল্পিত আক্রমণ, দু' সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংঘর্ষ নয়। মুসলমানদের রীতিমতো ধাওয়া করে খুন করা হয়েছে।

পঞ্চমহল জেলার এসপি রাজু ভার্গবের বক্তব্য—"আমার মনে হয় এই দাঙ্গা হয়েছে পরিকল্পনা মাফিক, যাতে বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনকে পরিকল্পিতভাবে জড়ো করা হয়েছে, তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) এবং তারপর তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ময়দানে।" রাজু ভার্গব একথা বলেছেন যে, ঘটনার সময় এমন কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের বাড়ী কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দূরের কোনো গ্রামে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পঞ্চমহল জেলা যার মধ্যে পড়ে গোধরা। এরপর আছে অন্যান্য জেলা, যেমন দাহুদ, সবরকণ্ঠ, বনসকণ্ঠ, মেহসানা প্রভৃতি।

পানঢেরওয়াঢ়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে ন'বছরের মেহরুন্নিসাকে। তার আব্বা আবদুর রাজ্জাকের দুটো আঙুল কেটে গেছে এবং মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। আবদুর রাজ্জাকের কথায়—"আমরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম দুদিন ধরে। তিন দিনের মাথায় পুলিশ আসে। কিন্তু তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।" এরপর আবদুর রাজ্জাক চিকিৎসাধীন থাকেন গোধরার জেনারেল হাসপাতালে। এভাবে মুসলমানদেরকে এলাকা থেকে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং আগুন লাগানো হয়েছে তাদের দোকান-পাট ও বাড়ী-ঘরে।

হামলার পর গোটা গ্রামকে খালি করে দেওয়া হয়েছে। এসব হামলায় কত মানুষ নিখোঁজ হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে কত পরিবার সেসব হিসেব হয়নি এখনও।

দাঙ্গাবাজরা মহিলা এবং শিশুদেরও রেহাই দেয়নি। পঞ্চমহল জেলার অঞ্জনওয়া গ্রামে কুয়োয় ফেলে খুন করা হয়েছে এগারোজনকে, তাদের মধ্যে চারজন ছিল শিশু। মাকসুদা বিবি ও হানীফ রহীমের তিন বছর ও দু' বছর বয়সী দুটি সন্তানকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুটি শিশুকে কুয়োয় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে মাকসুদার সাথে। খোদ মাকসুদা বলছেন—

www.pathagar.com

"অন্য অন্য গ্রামের মানুষরা এসে আমাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাতে শুরু করে। আমরা সবাই তখন পালাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে ওরা ধরে ফেলে কুয়োয় ফেলে দেয়।" মাকসুদা বেঁচে গেছে এজন্য যে, পুলিশ তাকে বাঁচাতে সফল হয়েছে। বাকি সবাই পুলিশ আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। মাকসুদার মাথায় চোট লেগেছে। সেও চিকিৎসাধীন থাকে গোধরা জেনারেল হসপিটালে। হানীফ ও মাকসুদার সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আজ না হয় কাল হসপিটাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর তারা গিয়ে উঠবে কোথায় ?

কয়েকটি গ্রামের মুসলমানদেরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল সংঘ পরিবারের স্থানীয় সদস্যরা। মেহসানা জেলার সুন্দরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হিম্মৎখান বলেন—"বিশ্বহিন্দু পরিষদের বন্‌ধের একদিন আগের রাতে গ্রামের সর্‌পঞ্চ (পঞ্চায়েত সদস্য বা মোড়ল) এবং আরএসএস প্রধান আমার বাড়ীতে এসে বলেন যে, আমরা যেন সকাল হওয়ার আগে আগে এখান থেকে চলে যাই, তা নাহলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে।" সুন্দর পাড়ার মুসলমানরাও বিপদের গন্ধ টের পেয়েছিলেন। তবুও ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গ্রাম ছেড়ো না—যাওয়ার। হিম্মৎখানের ভাষায়—"পরের দিন বন্‌ধ পালিত হয়। আমরা এ আশঙ্কায় ছিলাম যে, কোনো না কোনো বিপদ এসে পড়তে পারে। সন্ধেবেলা একদল লোক এসে আমাদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগাতে থাকে। আমরা পালিয়ে যাই এবং কাছের সরদারপুরা গ্রামে নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেই। কিন্তু তাদের উপরেও হামলা হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। সরদারপুরা গ্রামে গুজরাতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভয়ংকরতম ঘটনা ঘটেছে সেই সময়, যখন ঘাতকদের নজর ফাঁকি দিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকা ঊনত্রিশজন মানুষকে একটা ঘরে বন্দি করে বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ ন্যক্কারজনক কীর্তির কৃতিত্ব প্যাটেল গোষ্ঠীর লিডারদের। আগুনে পুড়ে নিহত হওয়া ঊনত্রিশজন মানুষের মধ্যে কয়েকজন মহিলা এবং শিশু ছিল। কুড়ি বছরের শামীম হুসাইন কোনো রকমে বেঁচে গেলেও আগুনের খোরাক হয়েছে তার মা ও এক বোন। "আমি জ্বলন্ত বাড়ী থেকে পালিয়ে এক গোসলখানায় লুকিয়ে ছিলাম।"—একথা শামীমের, যে কাজ করে প্যাটেল গোষ্ঠীর জমিওয়ালাদের ক্ষেতে। তার অসুস্থ বাপ আশ্রয় নেয় তিরিশ কিলোমিটার দূরের সাওলা গ্রামে।

সরদারপুরা'র সাবেক 'সরপঞ্চ'কে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু সংঘ পরিবারের বহু কর্মী অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার

www.pathagar.com

সময় এক পুলিশ অফিসার স্বীকার করেন—"অ্যারেস্ট করার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হয়, কারণ ক্ষমতাসীন দলের কাউকে গ্রেফতার করলে আমাদের উপর চাপ আসবে।" ওই পুলিশ অফিসার কিছুটা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু এটা জান ও মালের হিফাযতে পুলিশের ব্যর্থতার বৈধ অজুহাত নয়। পঞ্চমহল জেলার দেকওয়া গ্রামের বোহ্‌রা (মুসলিম) সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি বলেন—"গত দু'মাস ধরে বজরং দলের লোকেরা আমাকে হুমকি দিচ্ছিল। আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই এটাই চাইছিল ওরা। আমি পুলিসি সুরক্ষা পাই। তা সত্ত্বেও গোধরা দুর্ঘটনার পর, আমার দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দোকানে আগুন লাগানোর সময় খোদ পুলিস ইন্সপেক্টর ওখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু করেননি। দেকওয়া গ্রামের ওই বোহ্‌রা মানুষটির কথায়, পুলিস একটু পদক্ষেপ নিলে বহু মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচানো সম্ভব হতো।

এই দাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনার পিছনে আর্থিক ফায়দার উদ্দেশ্য কাজ করেছে। সরদারপুরার হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া মুনসিফ পাঠান বলছেন—"বিষয়টা বিলকুল পরিষ্কার। আমাদের জমি খুবই উর্বর ও দামি। এতে বোরওয়েলের মাধ্যমে জলসেচ হয়। প্যাটেল খানদানের লোকেরা আমাদের ওই জমিগুলো জবর দখল করতে চায়।" মুনসিফের পেশা চাষবাস।

লুটপাটের সময় মুসলমানদের সেসব দোকানপাটকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে যেগুলো ছিল বাসস্টপ বা রেলস্টেশনের কাছে। তাদের প্রতিবেশী হিন্দু মালিকদের দোকানগুলো যেমন ছিল তেমনই রয়েছে, সে সবের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগানো হয়নি। পরিস্থিতির বিচারে মুসলমানদের ফিরে আসা এবং ওইসব দোকানপাটে ফের কাজ কারবার করা বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। সমাজসেবী রোহিত প্রজাপতির বক্তব্য—পঞ্চমহল ও সবরকণ্ঠের উপজাতি এলাকাগুলোয় বোহরা (মুসলিম) সম্প্রদায় ও উপজাতিদের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল ছিল না। এটাকে কাজে লাগিয়ে এতে সাম্প্রদায়িক রং ছড়িয়েছে হিন্দুত্ব ব্রিগেড।" কয়েক জায়গায় উপজাতিভুক্ত মানুষদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে মুসলমানদের দোকানপাট লুট করতে। রাজু ভার্গব (পঞ্চমহলের এসপি) বলছেন—"এই এলাকার ভীল উপজাতিরা যথেষ্ট গরীব। তাছাড়া গত দু' বছর জেলাটি দুর্ভিক্ষেরও শিকার হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে লুটতরাজের বেশ ভাল সুযোগ ওদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।"

আর্থিক ফায়দা হাসিলের মতলব তো ছিলই, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ রেখার ভিত্তিতে আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করা। গত

www.pathagar.com

দশ বছরে আরএসএস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল গুজরাতের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছাতে সফল হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের চিরাচরিত পৃষ্ঠপোষক থাকে, 'বেওসায়ী গোষ্ঠী' কিন্তু এবারে সংঘ পরিবার গেরুয়া বানিয়ে দিয়েছে অন্যান্য পিছড়ে বর্গ, দলিত ও উপজাতিভুক্ত মানুষজনকেও। কেননা প্রথা-পরবের দিক দিয়ে এরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানকার হিন্দুদের খুব কাছের। এ তত্ত্ব বুঝিয়েছেন মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবী গিরীশ প্যাটেল।—বিশ্বহিন্দু পরিষদ গুজরাটে সমর্থন পেতে শুরু করেছিল ১৯৯০-এর সেই সময় যখন শুরু হয়েছিল রথযাত্রা। ওদের সাম্প্রতিক ত্রিশূল আন্দোলন—যার উদ্দেশ্য মানুষকে হিন্দুইজমের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং ধর্মান্তরের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা–বেশ সাফল্য পেয়েছে। ১৯৯৫-এ বিজেপি রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হাসিল করে। সুতরাং ওই রাজ্যে ওদের ফোলা-ফাঁপার পথ সুগম করেছে কিছুটা শাসন ক্ষমতা আর কিছুটা টাকার ক্ষমতা।

সাম্প্রতিক আক্রমণ ছিল সংঘ পরিবারের এক পরিকল্পনার অংশ, যা সফল হয়েছে যথেষ্ট। একাধিক মুসলিম এলাকা এখন শ্বসান হয়ে গেছে। মানুষ টেনশনের চোটে এবং আর্থিক কারণেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ মুসলমানদের কাছে এখন লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। মনে হচ্ছে, 'কাজ ব্যাপক পরিমাণে হাসিল হয়েছে।' তা সত্ত্বেও সংঘ পরিবার ত্রিশূলটাকে তুলে রাখতে তৈরি নয়। তারা তৈরি নয় লাউড স্পীকার বন্ধ করতেও।

❐

www.pathagar.com

# আরএসএস প্রধানমন্ত্রী ও গুজরাট সফর

–আবু রিদা

গুজরাতে আগুন ও রক্তের হোলী খেলা শুরু হওয়ার এক মাস পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী গুজরাত সফর করার অবকাশ পান। তার এ সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মনে হয়েছিল যে, অব্যাহত লাশ গণনাকারী বেঁচে যাওয়া আত্মীয়-স্বজন এবং সাম্প্রদায়িক বর্বরতার শিকার লোকদের গভীর বেদনার নিরাময়ী মলম ও নিরীহ মানুষদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার পয়গাম এই সফর। কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। গুজরাত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্তি কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ১৫ মিনিটের আবেগপ্রবণ ভাষণ। এই ভাষণ এক বৃহৎ প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। যথারীতি তার ভাষণ ও শাসনে বিস্তর ফারাক। প্রমাণিত হয়েছে তিনি প্রকৃতপক্ষে আরএসএসরেই প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষ বা ভারতের আপামর জনগণের নয়।

একদিকে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী গুজরাতের শরণার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে অশ্রু ঝরাচ্ছিলেন। সংখ্যালঘুদের অগণিত মৃত ও ধ্বংস্তুপের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছিলেন। আর অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করা হচ্ছিল সংখ্যালঘু জনগণের তরফ থেকে। পুলিসের কড়া পাহারাদারী সত্ত্বেও দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা রাস্তায় নেমে আসেন বাজপেয়ীর সামনেই এবং লাগাতার স্লোগান দিচ্ছিলেন নয়েন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে।

আহমদাবাদের দরগাহ শাহ আলম ক্যাম্পের লোকদের ধৈর্য, ক্ষোভ ও ক্রোধ তখনই নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যায় যখন দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা প্রথমবারের মত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখেন। এ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী একবারও তাদের খোঁজ খবর নেননি। অথচ এদিন দুপুর বেলায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সাথে এখানে আসেন। এবং খুবই গাম্ভীর্যের সাথে ঘুরছিলেন তার পাশে পাশে।

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের হৃদয় বিদারক কাহিনী শোনার পরেও রক্ত পিপাসু মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি আগুন ও রক্তের হোলী খেলাকে 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' এবং 'গণ আন্দোলন' আখ্যা দিয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করেন—তাকে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কেবল এতটুকুই বলতে সমর্থ হন,

www.pathagar.com

'এখন সময় এসেছে যে অফিসার ও রাজনীতিবিদরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হোন এবং সঠিকভাবে তা পালন করুন।' এটা বড়ই বেদনার। গভীর আফসোসের।

এরপর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, যেখানে আবারও নরেন্দ্র মোদী তাঁর পাশে ছিলেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রীকে আমার একটি পয়গাম যে তিনি 'রাজধর্ম' পালন করুন। একজন শাসকের জাত-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্বয়ংই তার 'রাজধর্ম' পালন করতে পারেননি। কারণ আরএসএসের প্রতি আনুগত্যে তার হাত-পা বাঁধা। তিনি এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি গুরুজীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আরএসএসের নির্দেশনার বিরুদ্ধে চলতে পারেন না এক পাও।

স্বয়ং সেবক প্রধানমন্ত্রীকে তখনই এক মহা বেকায়দায় পড়তে হয় যখন শাহ আলম ক্যাম্পে লুণ্ঠিত সর্বস্বহারা মুসলিমদের কাছে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। হঠাৎই ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নরেন্দ্র মোদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে ওঠেন, 'গুজরাতে অব্যাহত মৃত্যুর তাণ্ডবের জন্য দায়ী এই ব্যক্তিই। যদি আপনি আমাদের ক্ষত নিরাময় করতে চান তাহলে প্রথমেই এই ব্যক্তিকেই কিছু করুন।'

এটা ছিল বাজপেয়ীর মুখে একটি সজোর চপেটাঘাত। এমন পরিস্থিতির কথা হয়তো প্রধানমন্ত্রী ভাবতেও পারেননি। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বাজপেয়ীর মুখে চপেটাঘাতকারী এ ব্যক্তির নাম নানু মীর্যা রাসূল খান। নারোদা পাতিয়ার মুসলিম নিধন অভিযানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় তার পরিবারের ১২জনকে। তিনি হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে। হিংসা বন্ধ করার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের ভিক্ষা প্রার্থনা করছিলেন তিনি। কিন্তু এর জবাবে কোনো শব্দ ছিল না প্রধানমন্ত্রীর কাছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত আইনমন্ত্রী অরুণ জেটলী হস্তক্ষেপ করেন এবং ওই মযলুমকে সান্ত্বনা দিতে দিতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

বাজপেয়ীর সামনে আসেন রাইহানা পাঠান ও তার ছোট ছোট ইয়াতীম শিশুরা। তখন তার আঁখিযুগল অশ্রুসজল হয়। মনে হচ্ছিল যেন এবার জেগে উঠেছে তার ভেতরের মানুষটি। যে মানুষটি বেরিয়ে আসতে পারে রাজনৈতিক স্বার্থের পরিবেষ্টন ভেঙে। কিন্তু মনে হওয়া কথাটির অঙ্কুরটি নিঃশেষ হয়ে যায় মনের গহনেই। কারণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়

www.pathagar.com

সেই মানবাত্মাটিকে আঙ্কুরোদগম হতে দেয়া। অন্য কথায়, মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখে তার যে আত্মাটি কেঁপে উঠে সেই মানবাত্মাকে গলা টিপে শেষ করে দেয় দানবীয় রক্তখোর আর এসএসের প্রচারক হিসাবে তার অন্য বৃহত্তর পরিচয়টি।

দাঙ্গায় তামাম ক্ষতিগ্রস্তরা নরেন্দ্র মোদীকে হটানোর দাবি করছিলেন একই সুরে। বিক্ষোভকারীরা জোরেসোরে স্লোগান দিচ্ছিলেন গুজরাত পুলিস ও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীরা হাতে প্লাকার্ড তুলে ধরে রেখেছিলেন। যাতে লেখা ছিল, 'মুসলিমদের রক্ষা করুন', 'আমরাও ভারতের নাগরিক', 'আমাদেরও শান্তি ও নিরাপত্তা চাই' ইত্যাদি। এসবের মধ্যে একটি প্লাকার্ড সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যাতে লেখা ছিল, 'আপনি তখনই এখানে এসেছেন যখন মুসলিমদেরকে কবরে দাফন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।' কিন্তু এসব সত্ত্বেও 'রাজধর্ম' বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারেননি। কারণ রক্তপিপাসু আরএসএস তার মাথায় কুঠার উঁচিয়ে রেখেছে। সর্বক্ষণের জন্য।

❐

www.pathagar.com

# বাজপেয়ীর গুজরাত দর্শন

## –মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন

বাজপেয়ীর রাষ্ট্রীয় দর্শন, সমাজ ভাবনা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। রঘুপতি রাজারামের রাজধর্ম, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' শম্বুক হত্যা, সীতার নির্বাসন, সোনার লঙ্কা ছারখার, বালি বধ এসব কীর্তি রাজা রামের। সেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে আরএসএসের ঠেঙাড়ে বাহিনীতে যোগ দেন বাজপেয়ী। যাদের হাতে গান্ধীর হত্যার রক্ত, সেই সংগঠনটি তার আত্মা। সেই আত্মার আত্মীয় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী আরএসএসের প্রচারক নরেন্দ্র মোদী। রাজধর্মে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী গুজরাট সফরে গিয়ে বললেন, মোদী রাজ ধর্ম পালন করছেন। বাজপেয়ীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জী বলেন—'যে পরিস্থিতিতে বাজপেয়ী মন্তব্য করছেন তাতে মনে হচ্ছে ধরে ধরে সংখ্যালঘুদের হত্যা করাই রাজধর্ম।' প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর গুজরাত ঘুরে যাওয়ার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই সবরমতী গান্ধী আশ্রমের শান্তি বৈঠকে হামলা চালাল বাজপেয়ীর দল বিজেপি। হামলাকারীরা রেহাই দেয়নি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকরকেও। নিগৃহীত হন সাংবাদিকরাও। গান্ধী আশ্রমের ৫০ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। গান্ধী হত্যায় যাদের হাত কাঁপেনি তাদের গান্ধী আশ্রমে হামলা করতে বুক কাঁপবে ? এখনও গান্ধী হত্যাকারীর ভাই গোপাল গঠসে বলেন, আরএসএস নাথুরাম গঠসেকে দিয়ে গান্ধীকে হত্যা করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে। কেন এই গান্ধী হত্যা বইটি প্রথমে গুজরাতে অভিনীত হয়। বাবরী মসজিদ ভাঙাকে বাজপেয়ী মনে করেন জাতীয় আবেগ। এই হচ্ছে বাজপেয়ীর রাষ্ট্রীয় দর্শন, জাতীয় আবেগ। আদভানীর রামরথ যাত্রা শুরু গুজরাত থেকে। সেই রাষ্ট্রীয় দর্শন, ভাবনার শুরু গুজরাত থেকে। এই হচ্ছে বাজপেয়ীর গুজরাত দর্শন। মোদীর রাজধর্ম।

গুজরাট হিন্দুত্বের গবেষণাগারে পরিণত। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সব বাধাকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। গুজরাত মৃতদেহের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপির কার্যসমিতির জাতীয় বৈঠকে। গুজরাত যখন রক্তাক্ত, যখন সংখ্যালঘুদের একটি বিরাট অংশের জীবন জীবিকা বিপন্ন, আশ্রয় শিবিরগুলোতে যখন কার্যত পশুর মত দিন কাটাতে হচ্ছে, তখন মৃতদেহের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে স্বজনহারা মানুষের বিলাপে ভারী হয়ে যাওয়া বাতাসের মধ্যে বিজেপি তাদের জয়ের স্বপ্ন

www.pathagar.com

দেখছে। সুপরিকল্পিত গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ঢালাও, লুটপাট, ধর্ষণ দিয়ে গুজরাতকে হিন্দুত্বের গবেষণাগারে পরিণত করেছে। মোদীর অবস্থান এবং গুজরাতে তাঁর দলবলের কার্যকলাপকে প্রকাশ্য সভার মাঝেই সমর্থন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাজপেয়ী গুজরাতকে হিন্দুত্বের গবেষণাগারে পরিণত করে একটি দর্শনের জন্ম দিচ্ছে যাকে এবং এক কথায় বলা যায়, 'বাজপেয়ীর গুজরাত দর্শন'।

এবারের দাঙ্গার পরে আর কোনো মিশ্র এলাকা রইল না আহমদাবাদে। হিন্দু আহমদাবাদ তৈরি হবে। পরে হয়তো নামও পাল্টে দেওয়া হবে। আর মুসলমান আহমদাবাদকে পুরাতন দিল্লীর মত করা হবে। মুসলমান বিতাড়নের ব্যবস্থা করা হবে। এবারে গুজরাতে তারই মহড়া হয়ে গেল। মুসলমান পুলিস অফিসার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। তিনিই কিছুদিন আগে নিজস্ব প্রচেষ্টায় মন্দির তৈরি করেছেন। হিন্দু অফিসারের নির্দেশে তার গাড়ীর মুসলিম ড্রাইভারকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে মুসলিমদের সন্ত্রস্ত করে পুলিসের চাকরি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে করে তারা চাকরি ছেড়ে চলে যায়। আর পুলিসের মধ্যে যদি হিন্দুকরণ করা যায় তবে হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি অভিযানে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে। এভাবে চলছে হিন্দু রাষ্ট্রের মহড়া।

গুজরাত হচ্ছে সারা ভারতে বিজেপির মডেল। বাজপেয়ীর গোয়া ভাষণ এবং তাঁর দলের কর্মসমিতি থেকে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট বিচার করলে ধরা পড়ে আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিজেপির অশুভ প্রয়াস। গুজরাত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আরএসএস-এর হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনার ল্যাবরেটরী। বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসে পূর্বপরিকল্পিত-ভাবে গুজরাতের নাগরিক সমাজকে গৈরিকীকরণের সবরকম প্রয়াস চালিয়ে আসছে। শুধু মুসলিমরা নয়, খৃস্টানরাও এখানে আক্রান্ত হয়েছে। দেশব্যাপী খৃস্টান বিরোধী অভিযান শুরু হয় গুজরাত থেকেই। দলিত দলনও কম নয়। প্রশাসনের গৈরিকীকরণে গুজরাত সরকারই সরকারী কর্মচারীদের প্রকাশ্যেই আরএসএস-এর কাজকর্মে যুক্ত থাকার অনুমতি দিয়ে সার্কুলার দিয়েছিল। ১৯৯৮ সালেই গুজরাতের জাতীয় সড়কগুলোতে বিশ্বহিন্দু পরিষদ হোর্ডিং টাঙিয়ে ছিল 'ওয়েলকাম টু হিন্দু রাষ্ট্র'। আজ আমরা দেখছি গুজরাত হিন্দু রাষ্ট্রের নমুনা। আজকে যে গণহত্যা চলছে তা গুজরাতের পূর্ব-পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িককরণের পরিণাম। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের, গোপাল মেনন বলেছেন গোধরা কারণ নয় উপলক্ষ মাত্র। তিস্তা শীতলবাদ ও শাবানা আজমীর কণ্ঠে একই কথা। গোধরা না হলেও গুজরাত হতো।

www.pathagar.com

গুজরাতে হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মুসলিমদের শবের উপর বসে কাপালিক বাজপেয়ী এ্যাণ্ড কোং গণ দহনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের সাধনায় বিড়াল তপস্বী সেজেছেন। তাইতো বিজেপি শবদেহের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে গুজরাতের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচনকে পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশলে মেতেছে। হিন্দুত্বকে পুরোদস্তর বজায় রেখেই দিল্লী দখলের খেলায় নামবে বিজেপি। গুজরাতের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেবে। প্রায় রামরাজ্য এসেই গেছে গুজরাতে। গৈরিকীকরণের পরীক্ষায় গুজরাত সফল। গুজরাত প্রশ্নেও বিজেপি জোট ভাঙাতো দূরের কথা বিএসপি মত দলিতদের দল বিজেপি-র পাশে দাঁড়াচ্ছে। সেক্যুলাররা একই মঞ্চে আসতে পারছে না।

গুজরাত হচ্ছে আগামী দিনের হিন্দু ভারতের সুতিকাগার। আর্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শনের স্তম্ভ। আর্য সভ্যতা তথা রাম রাজ্যের সংস্কৃতি জ্যান্ত মারার সংস্কৃতি, জীবন্ত দগ্ধের সংস্কৃতি। রামচন্দ্র সোনার লঙ্কা আগুন ধরিয়ে ছারখার করেছিলেন। সতী প্রথার নামে মেয়েদের অগ্নিদাহ করা হয়। নেলির মুসলিম শিশুদের হত্যা করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। শিখদের জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারা, গ্রোহম স্টেইনকে শিশু-পুত্র সহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গণদগ্ধ করার অভিজ্ঞতায় আর্য সংস্কৃতি ভরা আর আজকে প্রতিবেশীকে জীবন্ত জ্বালাবার জন্য মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের হাতে কেরোসিন, পেট্রলের টিন এগিয়ে দেয়। এই সেই রামের অগ্নি সাক্ষীর সংস্কৃতি বা দর্শন, যে দর্শনের প্রয়োগ স্থল আজকের গুজরাত। রামভক্ত বাজপেয়ীর গুজরাত দর্শন।

❐

www.pathagar.com

# এক ভারতীয় পত্নী ও আরএসএসের স্বপ্নের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

–আবু রিদা

'আমার স্বামীর জন্য আমি সীমাহীন খুশী। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এবং এটা আমার আন্তরিক বাসনাও যে আমার স্বামী ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হোন এবং দেশকে তিনি ওই পথে পরিচালিত করুন যে পথে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন গুজরাতকে।'

এ আর্তি এক পতিব্রতা ভারতীয় নারীর। প্রকাশিত হয়েছে এক সর্বভারতীয় সাপ্তাহিকে। এ আর্তি আর কারো নয়। শ্রীমতী যশোধার। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পত্নী। যে মুখ্যমন্ত্রী একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্বের কুখ্যাততম নর হত্যাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। যদি নরহত্যায় নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তাহলে এ বছর বিচারকদের এই পুরস্কারের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচন করতে এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগার কথা নয়।

মহান ভারতের মহানতম খুনীর যথাযথ মহান পত্নী যশোধা। মহানতম স্বামীকে তিনি দেখতে চান ভারতের মহানতম আসনে। ভারতীয় হিসাবে এই মহান ভারতীয় নারীটির জন্য আমাদের সমবেদনা না থেকে পারে কি ? কিন্তু এ যথার্থ ভারতীয় নারীটির জন্য আমাদের আরও সীমাহীন সমবেদনা এজন্য যে তার স্বামী এখনো পর্যন্ত সমর্থ হয়েছেন কেবলমাত্র গুজরাতকে গণহত্যার কারখানায় পরিণত করতে। আর তার অন্তরে গভীর বাসনা যে, গুজরাতের মত তার স্বামী গোটা ভারতকে পরিণত করুন গণহত্যার বৃহত্তম কারখানায়।

হে মহান ভারতীয় নারী ! আপনার এ উচ্চতম বাসনার জন্য আমাদের দুঃখ কিসের ! আপনার স্বামী মাত্র গুজরাতের মত একটি রাজ্য নরবলির কসাইখানায় পরিণত করে ভারতের নাম সমুজ্জল করেছেন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে। এরপর যদি আপনার মহানতম বাসনাটি পূরণ হয় অর্থাৎ ভারতকে বিশ্বের সেরা নরবলির কসাইখানায় পরিণত করা যায় তাহলে নিসন্দেহে 'ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

কিন্তু এ বাসনা কি কেবলমাত্র শ্রীমতী যশোধার ? না। এ বাসনা আজকের ভারতের পরিচালিকা শক্তি আরএসএসেরও। এ বাসনা বিজেপির। বিশ্বহিন্দু

www.pathagar.com

পরিষদের। এ বাসনা দেশের তামাম ফ্যাসিস্ট শক্তির। এ বাসনা তাদের যারা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করে চলেছে অহরহ। এ বাসনা তাদেরই যাদের মিছিলের অগ্রভাগে সেক্যুলারিজমের শবাধার। এ কণ্ঠস্বর ওই নাৎসী ও হিটলারী শক্তির অনুগামীদের যারা মনে করে অটল বিহারী বাজপেয়ী তাদের স্বপ্নের ভারত উপহার দিতে পারেননি। এ গোষ্ঠীবর্গ এমন এক ব্যক্তিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চান প্রতিটি প্রশ্নে যার জবাব, 'সব ঠিক হ্যায়'। 'মাত্র ৭২ ঘণ্টায় দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করার নযীর স্থাপন করেছি।' অথচ গোটা দুনিয়া দেখতে থাকে দাঙ্গা শুরু হওয়ার মাসের পর মাস গুজরাট মানুষের রক্তে অন্তঃসলিলা নদী। গোটা গুজরাত জুড়ে জাহান্নামী আগুনের দাপাদাপি।

গুজরাতের গণহত্যা শুরু হওয়ার পরে আরএসএসের এ প্রচারক নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সংঘ পরিবার। এই প্রচারক আরএসএসের পাশবিক স্বপ্নাবলীর বাস্তবায়নের পথে তার নিজের অবস্থানটি এমন মার্গে অধিষ্ঠিত করে নিয়েছেন যে, এর আগে এমন মর্যাদা মিলেছে সম্ভবত ড. হেডগেওয়ার ও বীর সাভারকারের। আরএসএস সভ্যদের আইডিয়েল এখন আর হেডগেওয়ার বা সাভারকার নয় বরং নরেন্দ্র মোদী। তিনি তার কাজকর্মে এটা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার চেয়ে শ্রেয় নেতা আরএসএসের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়।

আরএসএসের চোখে নরেন্দ্র মোদীর চেয়ে বাজপেয়ী ও আদভানী ভাল নেতা নয়। আরএসএসের এক সদস্যের মতানুযায়ী, এঁরা যখন ক্ষমতাসীন হন তখন সেক্যুলার সাজেন। কিন্তু আসলে তারা সেক্যুলার নয়। দেশের লোক তাদের সম্পর্কে জানেন যে, তারা কোথা থেকে এসেছেন। কোন পার্টির প্রতিনিধি তারা। এজন্য যখন তারা নিজেদেরকে সেক্যুলার প্রমাণ করতে যান তখন হিন্দুত্ববাদীদের নযরে তারা অধঃপতিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে জনগণও তাকে সেক্যুলার হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। কাল পর্যন্ত যিনি আরএসএসের প্রচারক ছিলেন আজ তিনি নিমেষে কিভাবে সেক্যুলার হয়ে গেলেন ? আরএসএসের শিবিরে বাজপেয়ী আদভানীর কদর নেই। বিপরীত পক্ষে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে আরএসএসের নিজস্ব হয়ে উঠছেন। এজন্যই আরএসএসের অন্য আর একজন সদস্য বুকে হাত রেখে ঔদ্ধত্য সহকারে মন্তব্য করেন— নরেন্দ্র মোদীর মত দু'চার জন আরো পাওয়া গেলে আমরা গর্বের সাথে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবো।

www.pathagar.com

কোনো একদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার খাস কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এমন সময় ভারতীয় জনতা পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকখানায় মোদীর সামনে হাতজোড় করে ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেন। তিনি তার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। খুবই গর্বের সাথে তিনি মন্তব্য করেন, 'কার্যালয়ে তো কেবলমাত্র একজন দাড়িওয়ালাই আছেন।' তিনিই কেবলমাত্র প্রকৃত পুরুষ। আর সকলেই হিজড়ে।

নরেন্দ্র মোদীর এ ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে গুজরাত দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরেই। আর এসএসের এমন একজন রক্তপিপাসু নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি ভারতকে সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধতে পারবেন। নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে রয়েছে এ তামাম গুণাবলী। তিনি হেডগেওয়ার ও সাভারকারের প্রকৃত প্রতিনিধি। উত্তরাধিকারী। দিল্লীতে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী যখন একটু সতর্কবাণী শোনান তখন চোখ উঁচিয়ে নরেন্দ্র মোদী ধমক দিয়ে বলেন গুজরাতে ফিরে গিয়ে তিনি আর দিল্লী মুখো হবেন না। এমন ধমক দেয়ার হিম্মত কোথা থেকে পেলেন মোদী? দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করার সাহস তাকে কারা জোগালো? আরএসএসই জুগিয়েছে তার এ হিম্মত। তার যাবতীয় শক্তির উৎস এ আরএসএসই। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর পদযুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে আরএসএস। ফলে তিনি কেবল অশ্রুপাত করতে পারেন। কিন্তু আরএসএসের অনুমোদনের বাইরে আধা পদক্ষেপ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

একটি গোপন পয়গামে বাজপেয়ীকে আরএসএস সতর্ক করে দেয় যে, তিনি যদি মোদীর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে তাকে হটিয়ে দেওয়া হবে ক্ষমতার মসনদ থেকে। নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে আরএসএস পরিবেশ এমন অনুকূল করে তুলেছে যে যদি মোদীকে বরখাস্ত করা হয় তাহলে গুজরাতে আরো বেশী গণহত্যা সংগঠিত করা হবে। নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চায় আরএসএস। যাতে ফ্যাসিস্ট এজেণ্ডা বলবৎ করা যায় গোটা দেশে সে জন্য তাদের চাই নতুন রক্ত। নয়া প্রজন্মের আবেগ-উন্মাদনা। সংঘ পরিবারের পুরানো নেতৃবৃন্দের আবেগতাড়িত বক্তব্য আরএসএসকে আর সন্তুষ্ট করতে পারছে না। কারণ তারা রামমন্দির নির্মাণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ। কিন্তু গুজরাতের পরীক্ষাগারে দারুণভাবে সফল নরেন্দ্র মোদী। তিনি গভীর দক্ষতার সাথে আরএসএসের যাবতীয় স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে চলেছেন আরএসএসের এজেণ্ডা মতই।

www.pathagar.com

# শত কোটি ভারতবাসী আর কতদিন দাঁড়িয়ে দেখবে এ অব্যাহত গণহত্যা ?

–আবু রিদা

মুম্বাই দাঙ্গার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একমাত্র যার সাথে সাদৃশ্য খোঁজা যেতে পারে গুজরাতে মুসলিম নিধনযজ্ঞের। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে নৃশংসতম দাঙ্গা হলো এই মুম্বাই দাঙ্গা। কিন্তু গুজরাতে 'জাতি নির্মূলকরণ অভিযান' ছাপিয়ে যায় যাবতীয় নৃশংসতাকে। ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়ার পরে মুম্বাইয়ে প্রায় এক মাস যাবৎ যে মুসলিম নিধনকারী দাঙ্গা হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেস পার্টির সুধাকর নায়েক। দাঙ্গা দমনে তার অপদার্থতার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। গদিতে অধিষ্ঠিত হন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব শারদ পাওয়ার। কিন্তু এরপর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঙ্গা হয় তা আরো নৃশংস। আরো পরিকল্পিত মুসলিম নিধন অভিযান।

সুতরাং অশুভ শক্তির কোলে লালিত পালিত ব্যক্তির পরিবর্তনে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ মানবতাবিরোধী কাজকর্মই তাদের মূলমন্ত্র। বরং আমাদের মূল আন্দোলন হওয়া উচিত এই অশুভ শক্তির মূলোৎপাটন করা। এমনভাবে শত কোটি ভারতবাসীকে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে যেন আমরা এ অশুভ শক্তিকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত শান্ত না হই। অথবা এমনভাবে এই অশুভ শক্তিকে কোণঠাসা করে দিতে হবে যেন তারা আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। এসব যদি আমরা না পারি তাহলে আমাদের প্রতিবাদ শূন্য ঘরে চেঁচামেচির সমতুল্য।

❐

www.pathagar.com

# শুধু কথা ? শুধুই কথা ?

–দেবেশ রায়

বিজেপি-কে আর বিশ্বাস করা যায় না, জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা ছত্রখান, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লোকজন শক্তি ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের পদত্যাগ, জনতা দলের (ইউনাইটেড) দুই এম পি পার্লামেন্টে আসেননি, তেলেগু দেশম সভাকক্ষ ত্যাগ করে, এনডিএ-র শরীকরা টানা বিজেপি বিরোধী কথা বলে যাচ্ছে এক শিবসেনা বাদে—এটা হচ্ছে ২ মে বৃহস্পতিবার সকালের খবর।

বিজেপি কারো পরোয়া করছে না, শিবসেনার মনোহর যোশি স্পিকার হিসেবে সর্বসম্মত প্রার্থী, রাষ্ট্রপতি পদে পি সি আলেকজাণ্ডারকে ওই সর্বসম্মত প্রার্থীই করা হবে, ওমর আবদুল্লাহ মন্ত্রী সভায় ফিরে গিয়েছেন, তেলেগু দেশমের ওয়াক আউট এখন ওয়াক-ইন-হয়ে গেছে, তারা এনডিএ-প্রধান নির্ভর, চন্দ্রবাবু নাইডুই এখনও এনডিএ-র আহ্বায়ক—এটা হচ্ছে ১২ মে রবিবার সকালের খবর যখন লেখাটি লিখছি।

২ থেকে ১২—মাত্র দশ দিনের গুজরাটের রাস্তায় কংক্রিটের চাঙড় দিয়ে একজন ভারতীয় নাগরিককে হত্যার ছবি ক্যামেরায় তোলা গেছে। ২ থেকে ১২–মাত্র দশ দিনের মধ্যে গুজরাতের একটি শহরে একটি মুসলমান মহল্লায় আগুন লাগাবার ছবি টিভিতে দেখা গেছে, যেন সারি দেয়া চিতা জ্বলছে। ২ থেকে ১২–মাত্র দশ দিনের মধ্যে গুজরাত পরিস্থিতিকে এতদূর পর্যন্ত মাত্র অস্বস্তিকর ভাবা হয়েছে যাতে এসপিগিল নামক এক আইপিএস অফিসারকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা করে পাঠানো হলো। ২ থেকে ১২–গুজরাত সরকার গিলের উপদেশের প্রয়োজন অস্বীকার করে। ২ থেকে ১২ মাত্র দশ দিনে সুপ্রিম কোর্ট আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলো বন্ধ করে দেয়ার নির্ধারিত শেষ তারিখ ৩১ মের পর সম্প্রসারণের ব্যক্তিগত এক আবেদন নাকচ করে দেয়। ২ থেকে ১২ মে, মাত্র দশ দিনে হত্যার নতুনতর পদ্ধতি পরীক্ষিত হচ্ছে গুজরাতের পথেঘাটে। গুপ্তঘাতকের মত রাস্তার একটা মোড়ে অপেক্ষা করা ও তারপর একক কোনো পথচারীকে পেলে তাকে আক্রমণ করে মেরে পুড়িয়ে ফেলা। গুজরাত এক উদ্ভট থেকে উদ্ভটতর হত্যা ভূমি, যেখানে খুনি জানে তার খুনের বিবরণ, অথচ কে খুন করছে আর কে খুন হচ্ছে তা কেউ জানে না। গুজরাত নিয়ে রাজ্য সরকার কোনো হোয়াইট পেপার বের করেনি, নিহতদের নামের তালিকা অসম্পূর্ণতও বের করা হয়নি। কিন্তু

www.pathagar.com

পুলিসের গুলিতে কারা মারা গেছে তাদের ধর্ম পরিচয় বের করে দেওয়া হয়েছে এটা প্রমাণ করতে যে গুজরাত সরকার ধর্মনিরপেক্ষ।

অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য ও মন্ত্রীসভার মিটিঙের মিনিটসে প্রমাণিত যে সেই ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে এ ১২ মে পর্যন্ত গুজরাত মন্ত্রীসভার কোনো বৈঠকে দাঙ্গা বা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, কোনো দিনও না—এটুকু প্রমাণ করতে যে তেমন আলোচ্য কিছু গুজরাতে ঘটেইনি। ১০০০ থেকে ২০০০ ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু ও প্রায় ২ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের উদ্ভাসন ও কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তিনাশ মন্ত্রীসভার আলোচ্য ঘটনা হয়নি। যদ্দুর মনে পড়ছে, ৯ বা ১০ মে প্রথম গুজরাত মন্ত্রীসভার একটা বৈঠকে আইন-শৃঙ্খলা আলোচ্য ছিল। তাও দাঙ্গা নিয়ে নয়। গিল সাহেবের পদমর্যাদা সাব্যস্ত করতে।

গুজরাতে যখন খুনি হিন্দু দঙ্গল বাসস্থান ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে গেছেন যাঁরা তাঁদের ফিরে আসার সব সম্ভাবনা ঠেকাতে রাতারাতি স্টিমরোলার চালিয়ে মুসলমান মহল্লাকে বানিয়ে ফেলেছে খোলা ময়দান বা রাস্তাঘাট-ঘেরা বাজার যখন আবার অন্যদিকে সেই একই হিন্দুদঙ্গল সচিবালয়ে মন্ত্রীসভায় বসে বসে আশ্রয় শিবির ছেড়ে সবাইকে নিজের নিজের জায়গায় ফিরতে বাধ্য করছেন—সেই সময়, ঠিক তখনই, আমাদের এমপিরা, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তর্ক করছেন, পার্লামেন্টে হল্লা তুলছেন গুজরাত নিয়ে আলোচনা লোকসভা পরিচালনা আইনের ১৮৪ ধারায় হবে না ১৮৫ ধারায় হবে। কারণ, একটি ধারার আলোচনার শেষে ভোট নেই, আর একটি ধারায় আলোচনার শেষে ভোট আছে। সে ভোটে হারলেও সরকার পড়বে না বটে কিন্তু হারবে তো। আবার এক এক দল এমপি রাজ্যসভায় সরকারকে ভোটে হারানোর নিশ্চয়তা সত্ত্বেও সরকারের সাথে একমত হয়ে প্রস্তাব আনলেন যেম, গুজরাটে সংবিধানের ৩৫৫ ধারা ব্যবহার করা হোক। তাতে ৩৫৬ ধারায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দায় থেকে বিজেপি সরকারকে বাঁচিয়ে দেওয়া হলো। এখন অনন্তকাল পার্লামেন্টারী বিতর্ক চলতেই থাকবে যে ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী গুজরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে 'উদ্যোগ' (ইনিসিয়েটিভ) নেয়ার কথা, তার মানে কী বা কী কী। ইতিমধ্যে শিবসেনার প্রার্থী হয়ে গেলেন সর্বসম্মত স্পিকার। আর পার্লামেন্টের বিধি-উপবিধি রীতি-পদ্ধতিকে কাঁচকলা দেখিয়ে লোক সভার নেতা বাজপেয়ী প্রকাশ্যে লোক সভার ডেপুটি স্পিকারের রুলিংয়ে অসন্তোষ জানালেন।

তাহলে ওরা, গুজরাটের হিন্দু দঙ্গলের যারা রাজনৈতিক নেতা ও কেন্দ্রের ওই মন্ত্রীসভা যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১০ বছর আগে বাবরী মসজিদ ভেঙে হিন্দুত্বের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন ও যার প্রধানমন্ত্রী এক এক জনসভায় এক-এক রকম বক্তৃতা করে এখন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচী গোপন করতে চাইছেন, ওরা সংবিধান, লোক সভার নিয়মাবলি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে, রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতির সংযোগ—এইসব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রকরণ থেকে তাদের নিজেদের পক্ষে সবগুলো প্রয়োজনীয় অর্থ বের করে নিচ্ছে, আখ থেকে রসের মত। আর কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষ ও তেলেগু দেশম সহ সরকারী পক্ষের ভিতরের বিরোধীরা শব্দের মানে আর ধারা উপধারার প্যাচ খুঁজছেন ? যেন, তাদের আর কিছু করার নেই। যেন, ওইটুকুই তাদের কারবার। নিশ্চয়ই পার্লামেন্টই গণতন্ত্রের প্রধানতম নির্ভর আর সেখানে কথা বলাই একমাত্র কাজ। পার্লামেন্টে রাতভোর করে আলোচনা গুজরাত সম্পর্কে খবর প্রকাশ করে দেয়ার সবচেয়ে বড় অবলম্বন নিশ্চয়ই। কিন্তু গুজরাতের রাস্তায় যখন রক্তাক্ত নীরবতা লুপ্ত করে দিচ্ছে মানুষের কথা বলা ও শ্বাস নেয়ার ক্ষমতা, শ্বাস নিতে না পারলে কথা বলে ওঠা যাবে কী করে, তখনই ভারতের পার্লামেন্টে শুধু কথা, রক্তহীন কথা, কুশলী কথা, পাল্টা কথা চলতেই থাকবে আর হিন্দু-ফ্যাসিস্টরা শুধু বদলে-বদলে একটার পর একটা দান জিতেই যাবে ? গুজরাতের রাজ্য সরকার এখনও একটা কোনো দোষেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দোষী প্রমাণ হয়নি, কেন্দ্রীয় সরকারও একটি কোনো দোষে পার্লামেন্টের কাছে দোষী প্রমাণ হয়নি। তাহলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার মধ্যেই ওরা কি জিততে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে ? বা, ইতিপূর্বেই ? ওদের ব্যবহার থেকে একথা মনে আসছে না। ভয় করছে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী পার্লামেন্টারী দলগুলির ব্যবহার দেখে।

❐

www.pathagar.com

# জবাব কী হবে মহাত্মাজি ?

–দিলীপ রায়

ছবিটা আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি। মহাভারতের পরশুরাম। হাতে কুঠার, ক্রোধে বিস্ফারিত চক্ষু। লক্ষ্য ধরণী অর্থাৎ মহাভারতকে নিক্ষত্রিয় করা। এমনকি ক্ষত্রিয় গর্ভধারিণীকেও শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর পূর্ণ হয়নি। ক্ষত্রিয়রা বর্তমানেও বর্তমান! আর 'মহাভারত' নেই, আছে খণ্ডিত ভারত। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' কিন্তু খণ্ডিত ভারত কথা বিষাক্ত সমান। বিষাক্ত ভারতের এক অংশ গুজরাট। ভারতে এখন আর পরশুরাম নেই, আছে কিছু 'প শু রা ম'। গুজরাটে তারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লালিত পালিত হচ্ছে। যথার্থভাবেই হচ্ছে। এবং 'রাষ্ট্রশক্তি' পূর্ণ মদত দিয়েছে, এক শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিককে ধনে এবং প্রাণে নিশ্চিহ্ন করতে। সেই নিধন-যজ্ঞে প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল। দেখেও এলাম গুজরাটে।

গিয়েছিলাম 'নবজাগরণ'-এর পাঁচজন বা পাঁচ পাণ্ডব। এ পাঁচের কেউ আগে ও রাজ্যে যাইনি। তাই আমাদের 'গাইড' হিসেবে সঙ্গী হলেন মহাশ্বেতা দেবী—আমাদের দিদি।

মহাশ্বেতাদি তাঁর কাজে প্রায়শই যান গুজরাট। এ বছরের ১৮ এপ্রিল নামলাম আহমদাবাদের সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বিমান বন্দরে। কলঙ্কিত আহমদাবাদ। কলঙ্কের শুরু হয়েছিল গোধরায়। সেখানে 'করসেবক'দের, ট্রেনের বগিসমেত পুড়িয়ে মারা দিয়ে শুরু। কিন্তু শুরুরও শুরু আছে—যেমন বাপেরও বাপ হয় আর কী ! অকারণে কারণ হয় না। আবার কারণে অকারণ হয় কি ? যাক, সেই ইতিহাসে যাচ্ছি না। যাচ্ছি বরোদায়। মানেকাবাদ থেকে ১২৫ কিমি পথ।

পথের দুধারে অসংখ্য জতুগৃহ, দেখছি আর দেখছি। দোকান, ঘর, বাড়ী, গ্যারেজ, এমনিতর কত চিহ্ন! 'রামলাল'দেরই 'রামলীলা'র চিহ্ন! গাড়ি চালক দলপতি সিং সজ্জন। অত্যন্ত সপ্রতিভ মানুষটি। সে-ই আমাদের দেখাচ্ছিল 'উয়োঁ দেখিয়ে সাব।' ইয়ে দেখিয়ে ক্যায়া হাল বানায়া ইয়ে মোকান্ কো'। উন সবকো মহল্লা হ্যায় ইয়ে। 'উয়ে দেখিয়ে সাব কাফি হ্যায়'।

আমাদের সবার সম্মিলিত চাপে, বেচারি দলপত শেষে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। সত্যি 'উয়োঁ সব্' মানে মুসলমানের এলাকাই বটে। গাড়ির চারধারে অল্প বয়সী গুজরাতি মুসলমানেরা। ওদের চোখেমুখেও আতঙ্ক। আতঙ্কের কারণ 'গাড়ি'। এমনি বড় বড় গাড়ি করেই তো ওরা আসে। হিন্দু গুজরাতি

www.pathagar.com

'রামলাল'রা পুলিসকে সাক্ষী রেখে, জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, ধর্ষিয়ে, খতম করে যায়। ওরা ভাবছে, আমরাও বুঝি সেই দলের। তাই আমাদের দেখছে। কথা শুনছে। বাংলা কথা। বোধহয় খানিকটা দ্বন্দ্বে পড়ে ওরা। আর বেচারি দলপতের হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাওয়ার অবস্থা। বাহারউদ্দিন 'দিয়াশলাই' নিয়ে ফেরে। আবার চলা শুরু। দলপত যেন যমের দুয়ার থেকে ফেরে।

**'... রাজহংস দেব তোমায় হিংসা ভুলে যাও।'**

গুজরাতি ধনী, নির্ধনী হিন্দুরা খাঁটি নিরামিষাশী। একমাত্র অহিন্দুরা মাছ-মাংস খান। পাঁচতারা, চারতারা হোটেলে আমিষ খাবার পাওয়া যায়। বিষয়টা আগে গভীরভাবে আমরা ভাবিনি। যে হোটেলে আগেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল, সেটা তিনতারা 'যুবরাজ'। বঙ্গ সন্তানেরা শাক্ত-ভক্ত। রাতের খাবার নিয়ে আমরা সমস্যায় পড়ি। সমস্যা যখন তীব্র, তখন আবির্ভাব ঘটে দিলীপ চাটুজ্যের। দুর্গাপুরের ছেলে। রসুই ঘরের দায়িত্বে আছে। পেলাম বটে এক বঙ্গ সন্তানকে, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছুই হলো না। পরিষ্কার বললো, 'যুবরাজে মাছ, মাংস, ডিম ঢোকা নিষেধ।' দিলীপ এখন এখানে নিরামিশাষী—দুর্গাপুরে গেলে যথারীতি আমিষ খায়। নানা কথার মধ্যে দুর্গাপুরের দিলীপ, যে প্রায় পাঁচ বছর বরোদার, 'যুবরাজে' চাকুরি করছে সে, সেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কথাটা এরপরেই বললো। 'ওরা শুধু শুধু এখানে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কেন? দেশে চলে গেলেই পারে।'

অশোক—'আরে কী বলছেন? এটাই তো ওদের দেশ! ওরা তো গুজরাতি।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু আসল দেশ তো ওদের পাকিস্তানে!'

হায় ধর্মনিরপেক্ষ (?) বিজেপি! কত ছলচাতুরি-ধূর্ততাই না তোমরা জান। কত মিথ্যা, ভুল তথ্য যত্ন করে শেখাচ্ছ মানুষকে। পশুরাজ সিংহও হয়তো প্রয়োজনে হিংসা ভুলতে পারে—কিন্তু নিরামিশাষী বিএইচপি, আরএসএস, বজরঙ এবং ওদের মুখোশ বিজেপি 'সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসীরা' কখনো হিংসা ভুলবে না। সমস্যার কী সহজ সরল সমাধান! মুসলমানরা চলে যাবে পাকিস্তানে। হিন্দুরা থাকবে এখানে। ভারত হবে হিন্দুরাষ্ট্র।

**ঘৃণাই দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখে**

ওকে দেখিছিলাম, 'হিংসায় উন্মত্ত' গুজরাতের বরোদা শহরে। যুগলওওয়াড়া—কুরেশ জামাতখানায়। জামাতখানা এখন শরণার্থী শিবির। নরমেধ যজ্ঞের আগে, এখানে বিয়ে-সাদির আসর বসত। ভাড়ায় পাওয়া যেত কুরেশ জামাতখানা। এখন সর্বস্বান্ত মানুষরা বিনে ভাড়ায় আশ্রয়

www.pathagar.com

পেয়েছে। উঠোনঘেরা বারান্দায় কয়েকজন মহিলা আটা মাখছেন, তার একটু দূরে আরেক দল মহিলা আনাজ কুটছেন। ব্যাটা ছেলেরা বিশাল আকারের ডেকচি, হাঁড়ি ইত্যাদি ধোয়াধুয়ি করছেন। প্রাণপণে প্রাণে বেঁচে থাকার আয়োজন চলছে।

দোতলায় বেশ কয়েকজনের হাতে-পায়ে প্লাস্টার। শুয়ে, বসে আছেন। দৃষ্টিতে বিষাদ সিন্ধু। মহাশ্বেতাদি, আমি ট্রাঙ্ক জাতীয় উঁচু জায়গায় বসে বিভীষিকার কথা শুনছি। সিদ্দিক ইসমাঈল তাঁর বিভীষিকার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। রডের আঘাতে আঘাতে ওর হাত-পায়ে প্লাস্টার। পরপর দুদিন ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১ মার্চ—উর্দি পরা পুলিসকে সাথে নিয়ে কী রকম সুশৃঙ্খলভাবে, 'রামলালারা' ওদের মহল্লায় 'রামলীলা' করেছিল। তাই বর্ণনা করছিলেন ইসমাঈল সাহেব। শুনতে শুনতে ভাবছিলাম জটিলের (জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানের কথা)–'এ কোন্ সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার।'

হঠাৎ চোখ গেল ওর দিকে। একমাথা রুক্ষ চুল। আহ্লাদি মুখে, বিষাদমগ্ন দুটি হরিণী-চোখ! আপন মনেই নিজের হাতের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। মায়া হচ্ছিল ওকে দেখে। জিজ্ঞেস করে ফেলি,

–ক্যায়া নাম হায় তুমহারী।

কোন উত্তর নেই। বার তিনেক প্রশ্নের পর জবাব পাই।

–সুলতানা।

উমর কিতনা ?

দশ বরস!

কোন প্রস্তুতি ছিল না। কোনো ভাবনা ছিল না। হঠাৎই জানতে চাই।

–ক্যায়া তুম হিন্দু কো নফরত (ঘৃণা) করতে হো।

নিচু মাথা কিন্তু দৃঢ়তার সাথে, প্রত্যয়ের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ, জানায়। আমি অশিক্ষিতের হিন্দিতে, ওর মাথায় হাত রেখে বলি—আমি তো হিন্দু, উনিও (পাশে বসা মহাশ্বেতাদিকে দেখিয়ে) তো হিন্দু। ওই যে টুপি মাথায়, কাগজে লিখছে (দেবজ্যোতিকে দেখাই) ও-ওতো হিন্দু ...। তিন জনকেই ও দেখে। আমি দেখি ১০ বছরের সুলতানাকে। সে মুখে কত রং! আতঙ্ক, ঘৃণা ভয়—কী নেই! তারপর হেঁট মাথায়, জমাটবাঁধা ভিঁড়ে সুলতানা হারিয়ে গেল। হরিণী চোখ সুলতানার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা জেনেছিলাম পাশে দাঁড়ানো গিয়াসুদ্দিন সাহেবের কাছে।

ওদের মহল্লায় ১ মার্চ রাতে হামলা হয়। গোলমাল, চিৎকার, 'জয় শ্রী রাম'-এর আকাশ ফাটানো শব্দে ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল গমের বস্তা আর মুরগির

www.pathagar.com

খাঁচার আড়ালে। অন্ধকারে। একদল আম্মাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আরও ঘন অন্ধকারে। আম্মার গলার চিৎকার শুনেছিল দশ সালের সুলতানা।

দেখেছিল প্রাণেয় ভয়ে ওর আব্বাজান পালাতে যাচ্ছিল, পারেনি। ওই 'শ্রীরাম' নামে ঘাতকেরা পেছন থেকে, আব্বার লুঙ্গি টেনে ধরে ফেলেছিল। তারপর গায়ে কী ঢেলে দিল—। তারপর একদল আগুন, ছুটতে ছুটতে বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনি। বাড়ীর পাশের মাঠে পড়ে জ্বলতে লাগল বীভৎস ! এরপর আমাদের প্রতি, ওর-ওদের ঘৃণা, আতঙ্ক ছাড়া দেওয়ার কী আছে ! কী থাকতে পারে ?

২০ এপ্রিল। আহমদাবাদের শাহ আলম দরগা। এই ত্রাণশিবিরে সে সময় ১২ হাজার নর-নারী, শিশু আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থী শিবিরের বিশাল উঠোনে পুরুষ-মহিলা, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীতে ঠাসা। আহত মানুষের মেলা যেন।

দেখি, এক মহিলার পিঠের থেকে পেছনের সবটাই পুড়েছে। রান্নার গ্যাসে মানুষকে পোড়ানো কেন ? 'রাজধর্ম' পালনের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সশস্ত্র পুলিস দিয়েছিল। দিয়েছিল আক্রমণকারীরা, যাতে আক্রান্ত না হতে পারে! বলা তো যায় না, ওরা আবার নাকি বড় হিংস্র হয়। আমাদের মত নিরামিষ তো ওরা খায় না। ওরা আমিষ—'বড় আমিষ' ভক্ষণ করে যে।

মহাম্মদ হানিফ। একজোড়া ভাঙা পা নিয়ে, চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে এপ্রিল মাসের জ্বলা আকাশ দেখছেন। বাড়ীর অন্যদের খবর জানে না। ফাতেমা বিবির ছোট বোন ১৯ বছরের খুরশিদ। মাধ্যমিক পাস করেছিল। ছোটদের জন্যে একটা স্কুলে ছবি আঁকা শেখাত। পেটে তার প্রথম সন্তান বাসা বেঁধেছিল। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে—পেটে ত্রিশূলের অনুপ্রবেশ—সর্বাঙ্গে তলোয়ারের আলপনা!

**গোধরার প্রতিশোধ ! জয় শ্রীরাম!!**

২০র শেষ বিকেল। আমরা গুজরাতের নতুন রাজধানী, 'সিটি অফ ফ্লাওয়ার' (জঘন্য) গান্ধীনগর এলাম। 'ফুলের শহরে' বাস করেন নরেন্দ্র মোদী। এখানেই তিনি যত্ন সহকারে ওঁর দাড়ির যথাযোগ্য ছাটাই কর্মে সময় ব্যয় করেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নবাব 'মামুদ শা'-র মতই কি উনি গোলাপের গন্ধ নিতে নিতে, স্মিত মুখে জানতে চান—কটা গেল। কটা বস্তি পুড়লো!! কটা আগুনে ঝলসাল!!! আমার এই কল্পনায় আমি নিজে অবাক হই না।

www.pathagar.com

এই গান্ধীনগরে একটা 'মিঠাই কা দুকান' (এই নামটা কিন্তু আমার বানানো)–অন্য কিছু গুজরাতি ভাষায় লেখা ছিল সাইন বোর্ডে। তামাম গুজরাতের কোথাও হিন্দিতে সাইন বোর্ড দেখতে পাবেন না। আছে গুজরাতি আর ইংরেজী ভাষায়! বরোদা, আহমদাবাদ, হাইওয়ে—না একটাও দেখিনি।

মিষ্টির দোকানে কাঁলাকাঁদ কিনে দাম দিয়ে বললাম—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ ফিরে এলো অন্য স্বরলিপি নিয়ে, 'জয় শ্রীরাম'।

**কথা বলো না, কোনও শব্দ করো না,**
**ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন ...**

২০ এপ্রিল। সকাল। সাবরমতী আশ্রম। এই সেই আশ্রম, যেখানে ধূতিতে প্রায় নেংটির মত পরে, শীর্ণকায় একটি মানুষ 'রামধুন' শুনতেন। যাঁর স্বপ্ন ছিল খণ্ডিত এই ভারতবর্ষকে 'রাম রাজ্য' বানাবেন। গান্ধীবাবা!! বাপু!! মহাত্মাজি!!!

আচ্ছা, আপনার স্বপ্ন তো প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে, নাকি ? আপনার জন্মরাজ্যে তো এখন 'রাম নামই কেবল্‌ম।'

আপনার এই সাবরমতী আশ্রমেই তো, এই সেদিন মেধা পাটকরের কেশ সজোরে আকর্ষণ করেছিল দুঃশাসনেরা। দেখেছিলেন কি আপনি ? ওহো ! আমারই ভুল। আপনার এখানেই তো দেখলাম তিন বানর! দেখে না, বলে না, শোনে না ! তাই আপনিও তো কিছুই দেখেননি, শোনেননি—তাই বলবেনও না। বলার প্রশ্নই উঠে না। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আপনার বুকে যেদিন নাথুরাম তিনটে গুলি করেছিল, সেদিন রাতে রেডিও বেজেছিল আসানসোলের অদূরে নিয়াতপুরে। পরদিন মেজদি, সেজদি, আর সে সময়ের এক কিশোর উপবাস পালন করেছিল। কেন উপবাস করেছিলুম আমরা ?

সাবরমতী আশ্রমের গান্ধীজির ঘর। তালা বন্ধ। লোহার তারের জালি দেওয়া জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা। জানালা বরাবর, সাদা চাদরে ঢাকা একটি আসন। পেছনে সাদা একটা বালিশ দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে। সামনে ডেক্‌স। আসনে বসলে ডান হাতে সেই বিখ্যাত চরকা। সামনে ডেক্‌স। বাঁ দিকে আসনের ওপর রাখা, আগের দিনের ঢাকা দেওয়া পকেট ঘড়ি। পাশে চশমা ছিল কি ? তা না থাকুক। একটা চঞ্চল কাঠবেড়ালি কিন্তু ছিলই। সে সারা ঘরময় ঘুরছিল। আমার পেছনে সাবরমতী নদী। নামেই নদী, জলের 'জ'-ও নেই। দূরে একটা ব্রিজ। প্রহরী জানাল 'সুভাষ ব্রিজ'। ফের ঘরে তাকাই।

www.pathagar.com

## দয়াহীন সংসারের প্রশ্ন

কাঠবিড়ালি কী যেন বলছে আপনাকে ! কী বলছে মহাত্মাজি ? মনে মনে আমি ভেবে নিই, ও বলছিল—বাপু, আপনার দেশে কেন মানুষকে মানুষ প্রাণে মারছে ? মানুষকে কেন পোড়াচ্ছে মানুষ ? ঘর, বাড়ী, দোকান ? আপনারা নাকি সভ্য ? আমরা যারা অসভ্য প্রাণী, জন্তু, জানোয়ার—পশু। কই তারা তো পরস্পর পরস্পরকে মেরে ফেলি না ? বাঘ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ, ভাল্লুক ! না, কেউ তার নিজের শ্রেণীকে আক্রমণও করে না—প্রাণেও মেরে ফেলে না। বুঝেছি। এইজন্যে আপনারা বলেন—'পশুরও অধম'। তাই না ? বাপুজি, সত্যি কি আপনারা তাই ?

আহমদাবাদ শহরের মাঝখানে ছোট্ট একটা পার্ক। যেখানে বিশাল একটা মূর্তি। এক জোড়া হাত, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। দেখে মনে হয় কোন বৃদ্ধের হাত। কারণ শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। কার হাত ? কার কাছে ক্ষমা চাওয়া ? কেন ক্ষমা চাইছে এক জোড়া হাত ? রহস্য!.

## সেতুবন্ধের কাঠবেড়ালির শেষের কথা

বাপুজি, তখনও ভারতের সর্বনাশ হয়নি। ধর্মের হিসেবে দেশ তিন ভাগ হয়নি। পরাধীন ভারতে, পরে স্বাধীন ভারতে আপনার প্রার্থনা সভায় রামধুন হতো। কেন করীম রাম নয় ? গান হত 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম/পতিত পাবন সীতা রাম'। আপনি ভাষণে 'রামচন্দ্রের' কথা মাঝে মাঝেই বলতেন। কেন শুধু রামচন্দ্রেরই কথা ? মহম্মদের কথা নয় কেন ? আপনার স্বপ্ন ছিল অখণ্ড এবং খণ্ড ভারতকে 'রামরাজ্য' করার। কেন 'রাম-রহীম' এর রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন না ? এমনকি মরণকালেও বলেছিলেন, 'হায় রাম'। তখনও রাম ? কেন ?

আপনি নিজে কোন 'সাধু', 'সন্তু', 'বাবা' ইত্যাদি ছিলেন না। ছিলেন পুরোপুরি এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অহিংসার পূজারী। কিন্তু একজন সর্বভারতীয় নেতা। রাজনৈতিক নেতা। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নেতা। তাহলে এত রাম রাম কেন ? এখন যদি কেউ আপনাকে অভিযুক্ত করে যে, আপনিই এই দেশের রাজনীতিতে 'রাম ধর্ম'র বীজ বপন করেছিলেন ? আপনার জবাব কী হবে মহাত্মাজি ? সেই 'সেতু বন্ধের' কাঠবেড়ালি আমি। আপনার উত্তর শোনার অপেক্ষায় থাকলাম এই সাবরমতী আশ্রমে।

আপনার ঘরে ! এমনিতে চারদিকে আলো-ছায়ার সাদা-কালো ছবি, তবুও আমি দেখছি সবই অন্ধকার। এখানে, এই আশ্রমে স্বপ্ন দেখার সব পর্দা ছিঁড়ে গেছে।-আজকাল ২৬-৫-২০০২

www.pathagar.com

# গুজরাট ঃ যতটুকু বুঝেছি

## –অশোক দাশগুপ্ত

গণহত্যা শুরুর দ্বিতীয় দিন থেকেই মহাশ্বেতা দেবী বলে চলেছেন—গুজরাত চলো। এখন বিধ্বস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোটাই বড় কাজ। সামান্য অর্থ, কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা, নবজাগরণ সংগঠনের পক্ষে। আহমদাবাদ বিমানবন্দরে নেমে প্রবীন অভিনেতা দিলীপ রায় বললেন, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ওড়িশায় গিয়েছিলাম, এবার গুজরাতে এরপর 'নবজাগরণ'কে কেউ সংকীর্ণ প্রাদেশিক বলতে এলে কান মুলে দেব। মহাশ্বেতা দেবীর জবাব তীক্ষ্ণ ; 'বাজে লোকদের কান মুলে কেন, ছিঁড়েও দিতে পার। কিন্তু এখন কান খোলা রাখো, চোখ খোলা রাখো, প্রাণ খেলা রাখে ।। বাহাত্তর ঘণ্টার সফরে ঘুরেছি প্রায় হাজার কিলোমিটার, গিয়েছি বড় বড় ত্রাণশিবিরে, শুনেছি কয়েকশো মানুষের কথা। বর্ণনার মধ্যে যাচ্ছি না, যা বুঝেছি, সোজা কথায় সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

(এক) গোধরা-কাণ্ড নিন্দানীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু রেল-পুলিসই তদন্ত করে জানিয়েছে পূর্বপরিকল্পিত নয়। ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বাজপেয়ী, আদবানি, মোদী—সকলেই বলে দিলেন, পেছনে আইএসআই। ব্যাপারটা স্থানীয় ও তাৎক্ষণিক হতেই পারে না, অবশ্যই পাক চক্রান্ত—এইকথা বলে ওঁরা চ্যালাচামুণ্ডাদের গেরুয়া সঙ্কেত দিলেন, এবার যা করার কর। গোধরা না হলেও গুজরাতে গণহত্যা হতো। ভোটার লিস্ট সংগ্রহ করেছেন হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সংগঠকরা, গত ডিসেম্বর মাস থেকে। একই মহল্লায় বেছে বেছে মারার জন্য, পোড়ানোর জন্য। আহমদাবাদ থেকে বরোদা যাওয়ার পথে এমন জায়গাও পেয়েছি, যেখানে তিনটি বাড়ী পুড়েছে, মাঝে দুটি বাদ, তারপর আবার তিনটি। সংঘ পরিবারের সমর্থক 'সন্দেশ' পত্রিকা গত নভেম্বর মাসেই একটি তালিকা প্রকাশ করে, অ-মুসলমান নামের আড়ালে কোনগুলো আসলে মুসলমানদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সে তালিকা ধর্মগুণ্ডাদের কাজে লেগেছে। ১৫ মার্চ অযোধ্যায় শিলাপূজা, ১২ মার্চ গুজরাত জুড়ে বজরং দলের আঞ্চলিক শাখাগুলোর বৈঠক ডাকা ছিল। গোধরা কাণ্ডের অনেক আগে, ১৭ ফেব্রুয়ারী বজরং দলের প্রচারপত্রে বলা হয়, ধর্মযুদ্ধ আসন্ন, এবার শেষ যুদ্ধ, 'ওদের' শেষ করার যুদ্ধ। দু' মাস ধরে সংগ্রহ করা হয়েছে অঢেল পেট্রোল, গ্যাস সিলিণ্ডার এবং হ্যাঁ—বুলডোজার। গোধরা কাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসব সংগ্রহ করা সম্ভব ?

www.pathagar.com

(দুই) এই গণহত্যায় যে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছিল, তা আড়ালে স্বীকার করছেন একাধিক পুলিসকর্তাও। ৩ মার্চ পর্যন্ত পুলিসের ওপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যা হচ্ছে হোক, মাথা গলাবে না। থামাবে না। কিন্তু এটাও অর্ধসত্য। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুলিস গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেছে। বজরং বাহিনীর আক্রমণের আগে বহু বাড়ী তল্লাশি করেছে পুলিস, যেন আত্মরক্ষার কোনো উপাদানই ঘরে না থাকে। রান্নাঘর থেকে হাতাখুন্তিও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বাহাত্তর ঘণ্টা পর পুলিস পথে নামল। গুলি চালাল। এবং সেই গুলিতে মারা গেলেন আক্রান্তরাই। আহমদাবাদে স্কুটারে চড়ে যাচ্ছিলেন এক মুসলমান পুলিস কর্মী, তাঁকে চিনিয়ে দেয় কিছু কিছু পুলিস কর্মীই, তারপর দাঙ্গাবাজরা পুড়িয়ে দেয় স্কুটার ও স্কুটারের আরোহীকে, প্রকাশ্য রাজপথে। প্রথম এগার দিনে পুলিশ কোনো অভিযোগ গ্রহণ করেনি। 'পুড়িয়ে দিচ্ছে বাড়ী, এবার আমাদের পুড়িয়ে মারবে'—এমন অসংখ্য ফোনের জবাবে থানা থেকে ভেসে এসেছে দুটি জবাব। কেউ কেউ অসহায় ; কিছু করার নেই। অন্যরা বীর—জয় শ্রীরাম!

(তিন) নানা দোষত্রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে ভারতবর্ষের নানা রাজনৈতিক দল। গুজরাতে ভয়ঙ্কর শক্তিমান দলটি সরাসরি সাম্প্রদায়িক। বামপন্থীরা কার্যত অস্তিত্বহীন। বরোদায়, আহমদাবাদ, আনন্দনগর, 'বামপন্থী' খুঁজতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে। একটু ভুল বলা হলো। গলদঘর্ম হয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনো বামপন্থী সংগঠনের একটি পোস্টারও চোখে পড়েনি। সিপিএম গত বিধানসভা নির্বাচনে এক-শতাংশ ভোটও পায়নি। কিন্তু, আধ-শতাংশ ভোট পেতেও, কিছু প্রার্থী দাঁড় করাতেও তো ন্যূনতম সংগঠন লাগে। কোথায় সে সংগঠন ? গুজরাতের বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের কথা শুনেছি মল্লিকা সারাভাইয়ের মুখে। সেই কর্মীরা কোথায় ? সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য গুজরাতে আছেন। তাঁর সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কারো সংশয় নেই। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে ন্যূনতম একটা সংগঠনও তো সক্রিয় থাকবে এ দুঃসময়ে। কোথায় ? প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। আহমদাবাদ পুরসভা ওদের দখলে। দুঃসময়ে কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়াও কঠিন। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পাওয়া গেল সাবরমতী আশ্রমের সামনে নিরাপদ বৃক্ষতলে, চব্বিশ ঘণ্টার অনশনে মাধব রাও সোলাঙ্কি। যদি প্রত্যাখ্যাত হয় বিজেপি আহা, তাহলে আবার মুখ্যমন্ত্রী! রাজনৈতিক শূন্যতা। নিষ্প্রাণ বিরোধী শিবির। বজরং তলোয়ার সন্তান সম্ভবা মায়ের পেট চিরে দেখবে তো গুজরাতেই!

(চার) এ গণহত্যার নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক লক্ষ্য আছে। মুসলমান দেখলেই এলোপাথাড়ি হত্যা হয়েছে, ঠিক তা নয়। তালিকা ধরে ছোট ও মাঝারি

www.pathagar.com

মুসলমান শিল্পোদ্যোগীদের মারা হয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। মুসলমান স্বত্বাধিকারীদের প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও বিশ্বস্ত অন্তত ২০০ হিন্দু কর্মীকেও হত্যা করা হয়েছে। প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, মুসলমান মালিকের দোকান থেকে কিছু কিনবেন না, কর্মী মুসলমান হলেও সেই দোকান থেকে কিনবেন না, কিনলে আপনি বিশ্বাসঘাতক, সেই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। এমন সাতটি প্রতিষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে, যেখানে অংশীদার হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দু অংশীদারদের বলা হয়েছে, আলাদা হয়ে যান, না হলে আপনাদেরও ছেড়ে কথা বলবো না। কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণ করেননি আনন্দ নগরের বিনীত প্যাটেল। তাঁর বাড়ী পোড়ানো হয়েছে, তাঁর বড় ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। আহমদাবাদের বাণিজ্য কেন্দ্রের একাংশে ছিল গরীব শ্রমিকদের বসবাস। সেখানে আগুন লাগানোর সময় হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করেনি বজরং সেনা, কারণ গোটা জমিটাই যে তাদের দরকার, যারা গণহত্যা তহবিলে মোটা চাঁদা দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ব্যবহার করেছে কিছু কিছু ব্যবসায়ী, যারা এখন বলছে, দাঙ্গা থামুক, এভাবে চললে তো ধান্দাই বন্ধ হয়ে যাবে!

(পাঁচ) ভোগবাদ সর্বত্র ডানা ছড়িয়েছে। বামপন্থী সংগঠনগুলোয় ঘুণ ধরেছে, দক্ষিণপন্থী সংগঠনেও ভোগবাদের রমরমা। 'শুকনো' রাজ্য গুজরাত। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর গুজরাত ধর্মপ্রাণ গুণ্ডারা মদ খেয়ে মারণযজ্ঞে নেমেছে, মদ খাইয়ে কিছু গরীব মানুষকে নামিয়েছে। ধর্মগুণ্ডারা দেদার লুটতরাজ চালিয়েছে। পুড়িয়ে মারার আগে ঘড়ি খুলে নিয়েছে, পকেট থেকে টাকা সরিয়েছে। ধর্মগুণ্ডাদের মা-বোনেরা মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন লাগানোর সময় হাজির থেকে শাড়ি ও গয়না গাড়িতে তুলে নিয়েছে। ধর্মপ্রাণ গুণ্ডারা যথেচ্ছ ধর্ষণ করেছে। শাঁসালো চাকরিতে যেমন থাকে, ধর্মীয় গুণ্ডামির সাথেও এমন দেদার 'পার্কস'। এবং অশোক সিংঘল বলেছেন, এঁরা গুজরাতের গর্ব, ভারতের গর্ব। এঁদের মত লক্ষ লক্ষ 'যোদ্ধা' চাই গোটা দেশে। দেশে বেশি রাজ্যের সরকার এদের হাতে নেই। ঝাড়খণ্ডে ভোট ছাড়াই এখনও ক্ষমতায়, কিন্তু বিহার ও বাংলার প্রভাবে নিরঙ্কুশ দাঙ্গা-হাওয়া তোলা মুশকিল। হিমাচল প্রদেশের এক নম্বর বিজেপি নেতা শান্তাকুমার ইস্তফা চেয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীর। তবে, হাতে রাজ্য সরকার পেলে, নরেন্দ্র মোদীর মত উপযুক্ত নেতা পেলে এবং অকর্মণ্য বিরোধীদের পেলে মজায় ভরা ধর্মগুণ্ডামি একটা লোভনীয় পেশা হয়ে উঠতে পারে।

(ছয়) আতঙ্ক কোথায় পৌঁছাতে পারে, দেখেছি গুজরাতে পৌঁছানোর এক ঘণ্টার মধ্যেই। আহমদাবাদ থেকে চলেছি বরোদার দিকে, দানি লিমডায়

www.pathagar.com

আটকে গেলাম। কার্ফু। একটু ঘুরে যেতে হলো। শাহ আলম দরগার দেড় কিলোমিটার দূরে গিয়ে দেখি ছোট ছোট জটলা। দেশলাই কেনার ছুতোয় নামলাম, সঙ্গী বাহারউদ্দীন। সাতজনকে নিয়ে চলা বড় গাড়ি থামতে দেখেই ছিটকে গেলেন মানুষজন। দেশলাইয়ের দাম নিতেও হাত কাঁপছে দোকানির। গাড়ির চালক দলপৎ সিং বললেন, এ রকম গাড়ি তো এখানে গত কয়েক দিনে অনেকবার থেমেছে এবং গাড়ি থেকে নেমেছে গুণ্ডারা। আগুন। হত্যা। তাই চোখ মুখে আতঙ্ক। আতঙ্কিত অসংখ্য চোখ দেখলাম সেদিন, পরদিন বরোদায় মুঘলওয়াড়া ত্রাণশিবিরে, তার পরদিন শাহ আলম দরগা ত্রাণশিবিরে, তিনদিন ধরে নানা জায়গায়। আতঙ্ক, অবিশ্বাস, অসহায়তা। যে দেওয়াল এবার তুলে দেয়া হলো গুজরাতে, তো ভেঙে দেয়া সহজ কাজ নয়। সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, অসম্ভব। আনন্দ নগরের তরুণ ইশাক আনন্দওয়ালা গুজরাতিও ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত। বললেন, 'এরপরেও যদি গর্বিত থাকি, আমি এক ঘরে হয়ে যাব। গোধরার নামই শোনেনি আমার ভাইবোনরা, ওদের পুড়িয়ে মারল কেন ? বাবা-মার সামনে দাঁড়িয়ে কী করে বলবো যে, হিন্দুরা আমাদের বন্ধু, কোনো রকম ঘৃণা বা অবিশ্বাস ধরে রাখা চলবে না ?' হাত ধরে চুপ করে থাকলেন মহাশ্বেতা দেবী। সেই হাতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর মুখে একটা শব্দও ছিল না। কী বললেন ? কী বলবো ? কী বলার আছে ?

(সাত) গান্ধীজীর রাজ্য ! সাবরমতী নদীর ধারেই বিখ্যাত আশ্রম। নদী খটখটে, এক ফোঁটা জল নেই। রাজনীতির কথা ছেড়ে যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহাদূত হিসেবে মেনে নেই গান্ধীকে, তাঁর রাজ্যে এ কী হলো ? কী হচ্ছে ? গুজরাতের রাজধানীর নাম গান্ধীনগর। ইতস্তত কিছু মূর্তিও গান্ধীর। শান্তিপ্রিয় হিসেবে এক সময় নামও ছিল গুজরাতিদের। তবু কেন এমন হলো ? কারণ সংঘ পরিবার কঠোর পরিশ্রমে সংগঠন বাড়িয়েছে এবং অন্যরা ঘুমিয়েছে। 'গান্ধীজির রাজ্য' বলে কিছু হয় না। যখন সেখানে যারা শক্তিশালী, তখন সেখানে তাদের 'রাজ্য'। রাশিয়া তো লেনিনের দেশ, 'লেলিনের দেশ' থাকলো কি ? থাকে অথবা থাকে না মানুষের জন্য। মানুষের তৈরি সংগঠনের জন্য। সংগঠনের তৈরি চেতনার জন্য। ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রগামী গুজরাতে আজ হৃদয়হীন রাজনীতির রমরমা। পাল্টা রাজনীতিই পারে হাওয়া বদলাতে। দুটি নিবন্ধ, তিনটি বিবৃতি, পাঁচটি শোক-সমাবেশ, একশো একটি দীর্ঘশ্বাস যথেষ্ট নয়। কিছুই নয়।

www.pathagar.com

# প্রতিটি দাঙ্গার বিষময় উপহারে আক্রান্ত হচ্ছে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর

–দেবাংশু দাশগুপ্ত

আজকাল-এর প্রথম পাতায় ছাপা ছবিটি অনেকেরই দেখা। আহমদাবাদের পুলকিত স্কুলের ক্লাস রুমে সারি সারি ফাঁকা বেঞ্চের সামনে বসে আছেন এক শিক্ষিকা। মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের একজনও আসেনি পরীক্ষা দিতে। শুধু আহমদাবাদ নয়, ১৮ এপ্রিল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন সবরকণ্ঠ, ভাদোদা, রাজকোটসহ প্রায় সমগ্র গুজরাতেই এমন ছবি দেখা গেছে। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের ১৪ হাজার মুসলিম পরীক্ষার্থীর ৯০ শতাংশই পরীক্ষায় বসেনি।

অথচ পরীক্ষার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদীর সরকার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়ার ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি সশস্ত্র প্রহরায় বিশেষ বাসে চড়িয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছিল। কিন্তু যে সরকার আর তার মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি গণহত্যা ও আদিম হৃদয়বিদারক হিংস্রতায় যুক্ত থাকে, খুব স্বাভাবিক কারণে তাদের আশ্বাসে আস্থা রাখার কোনো কারণ খুঁজে পাননি মুসলিম জনতা। তাই গুজরাতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ছিল শূন্য।

প্রায় দু' মাস ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন এক তরফা আক্রমণে আহত, বিক্ষত, নিঃস্ব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসবে, এমন আশা করা বোধহয় শুধুমাত্র ঘাতক, ধর্ষকদের মদতদাতা, ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষেই সম্ভব। পাঁচ থেকে আঠারো বছরের ওই শিশু-বালক, কিশোর-নব যুবকদের চোখের সামনে তাদের বাবা-মা-কাকা-জেঠাকে নৃশংস অমানবিক খুন করা হয়েছে। ওরা জীবন্ত দগ্ধ হতে দেখেছে পরিচিত প্রিয়জনদের। ত্রিশূলধারী জল্লাদের যৌন সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখেছে মাকে, দিদিকে, বোনকে। জল্লাদরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে ওদের ঘরবাড়ি। সাইকেল, বই, খেলনা, ব্যাট, বলসহ যাবতীয় প্রিয় উপকরণ। সব হারিয়ে ওরা 'ত্রাণশিবির' নামক নরকে আশ্রয় নিয়েছে। অস্বাভাবিক আঘাতে পাথর হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে এখন নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। পুলিস প্রহরায়

www.pathagar.com

পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, সেই পুলিস, যারা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা মানুষদের 'রক্ষা' করার বদলে সরাসরি তাদের দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দিয়েছে। আক্রমণকারীর বদলে আক্রান্তকেই গুলি করে মেরেছে। সেই পোড়খাওয়া দাগী অপরাধীরা এখন আবার বন্ধু সাজতে চাইছে। অতীতের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, দাঙ্গা নামক 'উত্তপ্ত সামাজিক অগ্নিবলয়' ঘুরে ঘুরে বার বার আসে। আর সবচেয়ে বড় থাবাটি বসিয়ে দিয়ে যায় শৈশব, বাল্য আর কৈশোরের কোমল বুকে। জগত ও জীবন সম্পর্কে বাস্তবিক ধারণা গড়ে ওঠার মুখেই যদি কিশোর-কিশোরীদের এমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাহলে তাদের চিন্তা-ভাবনায় স্বপ্নের আর স্থান থাকে ? থাকা সম্ভব ? বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে, জাতপাত-বর্ণের নামে দাঙ্গা বাধানোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যও তাই। মূলত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত সংগঠিত দাঙ্গার মধ্য দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায় মৃত্যুর কারবারিরা। একদিকে বর্তমান প্রজন্মকে নিঃশেষ করে দেয়া, অন্যদিকে পরের প্রজন্মের মৃত্যুর দুঃসহ ক্ষতের চিহ্ন এঁকে দেওয়া। যাতে ওরা মানসিকভাবে নুয়ে থাকে। এ এক পরোক্ষ হুমকি। গুজরাতের ক্ষেত্রে সংঘী পিশাচেরা নিখুঁতভাবে এ কাজটি করতে পেরেছে।

কিন্তু মানব সমাজের নিষ্পাপ নিরপরাধ এ অংশটিকে এভাবে আহত করার মধ্য দিয়ে একদল মানুষের স্বার্থসিদ্ধি হলেও বাকি পৃথিবীর বুকে প্রোথিত হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক তমসা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হিংসা, মৃত্যু, রক্ত, সন্ত্রাসের পটভূমিতে বার বার দাঁড় করিয়ে ডেকে আনা হচ্ছে চরম সর্বনাশ। আধুনিক মনোবিজ্ঞান জানাচ্ছে, বংশধারা ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্যেই বেড়ে উঠে শিশু প্রকৃতি। বাড়তে বাড়তে এক সময় বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে সমাজ মননের অংশীদার হয়ে উঠে। সঙ্গীদের দেখেই কোন মানুষকে জানা যায়—একথাটা কিশোর-কিশোরীদের বেলায় আরও বেশি সত্য। এ মাঝখানের সময়টুকু বংশগত বিশেষ করে পরিবেশগত প্রবাহমানতা তার মানস জগতে গভীর ছাপ রেখে যায়। তার আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ওই পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার অনুসারী হয়ে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বিরুদ্ধতা, অসঙ্গতি আর ভীতির মধ্যে যে শিশু বেড়ে উঠে সে হয় বিবাদ, কিংবা ঔদ্ধত আচরণ করতে শেখে, নয়তো শেখে সংকুচিত হয়ে থাকতে। আর সমমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মধ্যে যে শিশু বেড়ে উঠে সে শেখে বিশ্বে ভালবাসা খুঁজে নিতে, জীবনের শিল্পময়রূপ কোনো না কোনো শিল্প সংস্কৃতির পথে হাজির হয় তার সামনে। তাহলে দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যে বেড়ে উঠা শিশু কী শিখছে ? ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে মুম্বাই দাঙ্গার

www.pathagar.com

সময় 'মুম্বাই সমাচার' পত্রিকার সম্পাদক জেহান দারুওয়ালা দাঙ্গার পরিণতিতে সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা আট থেকে চৌদ্দ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ের মর্মস্পর্শী কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। ওদের মধ্যে কেউ কেউ শত প্রশ্নেও একটাও উত্তর দিতো না। অভিব্যক্তিহীন পাথুরে চোখ মেলে শুধুই সামনের দিকে চেয়ে থাকতো। কেউ কেউ সদাসর্বদা ক্ষিপ্তের মত আচরণ করতো। দু' হাতে কল্পিত অস্ত্র নিয়ে অদৃশ্য শত্রুকে আক্রমণ করে চলতো। কেউ কেউ বা কথা বলতো অস্ফুট স্বরে। দারুওয়ালার ভাষায় ..... 'The unholy alliance of politicians and armed anti-social elements have tarnished the basic image of humanity. ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতব্যাপী দাঙ্গার ইতিহাসেও লেখা হয়ে আছে আক্রান্ত-শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের অগণিত হৃদয়বিদারক কাহিনী। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পোড়া মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়া বালকের প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার শোনা গেছে অ্যান্টনি জেসিসটনের কবিতায়।

বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করা আইএএস অফিসার হর্ষ মান্দারের CRY, THE BE-LOVED COUNTRY নিবন্ধে উল্লেখিত গুজরাতের জুহাপাড়ার সেই ৬ বছরের ছেলেটি, যে 'যন্ত্রের মত' এক নারকীয় হত্যার বর্ণনা দিচ্ছে, জানাচ্ছে, শুধুমাত্র লাঠি আর বন্দুকের বাঁটের আঘাতে তার মা আর ৬ ভাইবোনের হত্যাকাণ্ডের প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মাঝপথে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার দরুন তাকে মৃত ভেবে তাকে ফেলে রেখে প্রমত্ত উল্লাসে ফিরে গিয়েছিল হত্যাকারীর দল। সেই ছেলেটির হাতেই যদি কোনো একদিন প্রতিশোধের অস্ত্র উঠে আসে, সেও যদি পরিস্থিতি বুঝে, হিসেব করে নিজস্ব বদলা বাহিনী গড়ে তোলে তার জন্য কাকে দায়ী করা হবে ? কিংবা দিল্লীর স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে উল্লেখিত আহমদাবাদের সাত বছরের মেয়ে শাহিন। 'দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়' পিষ্ট হতে দেখেছে তার সাধের ডল পুতুলকে, দেখেছে হাতুড়ির ঘাঁয়ে থেঁতলে যেতে তার আব্বাজানের মাথা। সেই শাহিনের 'শুকনো নিভে যাওয়া বাতির মতো চোখে' যদি আর কোনো দিন ভাষা ফিরে না আসে ?

এইসব প্রশ্নের মুখে মনুষ্যত্ব আজও কী নিদারুণভাবে অসহায়। তথাকথিত নেতা, সরকারে থাকা, 'ক্ষমতাবান' মানুষদের কাছে এই প্রশ্ন, এই প্রসঙ্গ এখনও কী মূল্যহীন হয়ে আছে। অথচ সেই অতীতে, ১৯২৪-এ অর্থাৎ রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠার বহু আগে 'লিগ অফ ন্যাশনস' ঘোষণা করেছিল 'শিশু ও কিশোর নিরাপত্তা বিষয়ক' সনদ। ১৯৪৮ সালে আত্মপ্রকাশের পর রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত বিশ্ব মানবাধিকার সনদের ২৫ (২) ধারায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল শিশুর

www.pathagar.com

নিরাপত্তার অধিকারকে। অনেক পরে ১৯৫৯-এ শিশুর মর্যাদা, নিরাপত্তা রক্ষা, তার জন্য ভয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় শিশুরা যাতে কোনোভাবেই আক্রান্ত না হয়, তার জন্য গৃহীত হয়েছে আন্তর্জতিক আইন। তারপর ১৯৮৯-তে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে শিশুর অধিকারকে সামগ্রিক নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী দাঙ্গা, যুদ্ধ, সংঘর্ষের নির্মম আঘাতে শৈশব ও কৈশোরের চরম লাঞ্ছনার আবহমান ধারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, বহু ডঙ্কা নিনাদিত ওই সনদ, আইন বা নীতি নিছকই বাস্তব গুরুত্বহীন ভাবাত্মক আদর্শ হিসেবেই রয়ে গেছে। অঙ্গীকার ও প্রয়োগের মধ্যে থেকে গেছে দুস্তর ও দুঃখময় ব্যবধান।

তবুও ক্রোধ, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, বিদ্বেষের সীমানা ছাড়িয়ে আজও রয়ে গেছে এক আলাদা জগত। সেখানে আজও ধ্বনিত হয় জীবনের, মানবতার জয়গান। মনুষ্যত্ব আজও সেখানে তীব্র, ঘনিষ্ঠ, আর মগ্ন। গুজরাতের জুহাপাড়া, আমনচকের ত্রাণশিবিরে দেখা পেছে সেই আলাদা মানুষদের, যারা চারদিকের আগ্রাসী ধ্বংসস্তুপ, হৃদয়হীন রক্তক্ষরণের মধ্যেও মানবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সান্ত্বনার হাত রেখে চলেছেন আর্ত শিশু, কিশোর আর মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছোবল এড়িয়ে বেঁচে থাকা বয়স্ক মানুষের পিঠে। মানবতার এই উৎসারিত তরঙ্গেই একদিন ভেসে যাবে দাঙ্গাবাজ হত্যাকারীর দল। সাফ হয়ে যাবে অপরিমেয় বিকৃতির সব জঞ্জাল। গড়ে উঠবে শিশুর বাসযোগ্য এক সবুজ পৃথিবী। কিন্তু সে শুভদিন আর কত দূরে ? তা কি এ গুজরাত অভিজ্ঞতার পর দ্রুত কাছে ডেকে আনবেন না এ দেশের সচেতন মানুষরা ?

–আজকাল ০৮.০৫.২০০২

❐

www.pathagar.com

# গুজরাতের পথে-ঘাটে শয়তানের নগ্ননাচ

## –রাজ্য সভায় মুহাম্মদ আজম খানের ভাষণ

স্বাধীনতার জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সুযোগ্য আলেমকে ফাঁসীতে চড়ানো হয়েছে। এসব কি এজন্য হয়েছে যে, পঁচিশ হাজার মানুষ মিলে আট বছর, বারো বছর বয়সী বাচ্চাদেরকে তলোয়ার চালিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করবে এবং গোটা মহল্লাকে পুড়িয়ে দেবে ? এটাই কি হিন্দুস্তানের ধর্ম। এরই জন্য আমরা গর্ব করি ? এসব হওয়ার কারণ দ্বিজাতি তত্ত্বের রূপরেখা তুলে ধরা। আরও একবার দেশ ভাগ হবে কি ? প্রধানমন্ত্রী কি ফের একবার এ বিষয়ে বিতর্ক করাবেন। আরএসএস বলছে, মুসলমানদের জন্য আছে সমুদ্র। গুজরাত বলছে, মুসলমানদের জন্য রয়েছে আগুনের সমুদ্র। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, মুসলমানদের ভোট নেয়া উচিত নয়, ওদের ছাড়াও সরকার গঠিত হতে পারে। আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব ? আমরা কী ভাববো ? আমাদের জন্য দেশের রায় কী ? দেশের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের বিষয়ে কী বলেন ? আমরা চাই, সবাই বসুন এবং এ বিষয়ে আলোচনা হোক।

যদি এক সাথে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে উপায় কী ? আমার কথাকে খারাপভাবে নেবেন না—আরএসএস বলছে সমুদ্র, গুজরাত বলছে আগুন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন, মুসলমান ভোটের দরকার নেই। মুসলমানরা দেশের ইউনিট নয়।—এ রকম পরিস্থিতিতে দেশকে ভাবতে হবে যে, এতবড় জনগোষ্ঠীর পরিণতি কী হবে ? আমাদের আশ্রয় দেবার জন্য কোনো রাষ্ট্র প্রস্তুত আছে কি ? আমাদের কাছে 'হিজরত' করা সুন্নাত। আমাদের নবী হিজরত করেছে। নবী (সঃ) জন্মভূমি ছেড়েছেন। আমরা জানতে চাই, ভারত আমাদের কাছে কী চায় ? জানতে চাই, সরকার কী চায় ? আমাদের হিজরত চায় ? আপনারা পৃথিবীর সাথে কথা বলুন। কোন্ কোন্ দেশ ভারতের মুসলমানদের নিতে ইচ্ছুক। হতে পারে, আপনারা এ রকম পরিকল্পনা করেছেন এবং এজন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৈনিক ইসরাঈলে যান এই সবক নিতে যে, স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে কীভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে। ওভাবে আমাদের মারবেন না। প্লীজ, তিলে তিলে মারবেন না আমাদেরকে।

অযোধ্যায় মন্দির বানাতে মানা করেছিল কে ? সাড়ে পাঁচ বছর আপনাদের সরকার ছিল, কে বাধা দিয়েছে ? কোথায় সুপ্রিম কোর্ট ? মসজিদ ভেঙেছে, তাতে কার কী হয়েছে ? মন্দির হয়েছে, কোন্ আইন কাজ করেছে ? বেয়াল্লিশ ব্যাটেলিয়ন ফোর্স থাকা সত্ত্বেও অশোক সিংঘল ভিতরে ঢুকে গেছেন,

www.pathagar.com

কোথায় আইন ? ওটাও আইন, যেটা গুজরাতে হচ্ছে। ট্রেনে সফর করতে আমাদের ভয় লাগে। আমরা সরকারী আবাসনে ঘুমাই না এজন্য যে, পুলিস এসে আমাদের জিজ্ঞেস করে, এটা কি মুসলমানদের ফ্লাট ?—নিরাপদ নয় ! এই আমাদের ভারত। ফায়সালা হওয়া উচিত, ভারতে যদি আমাদের ঠাঁই না হয়, তবে কোথায় হবে ? সমুদ্রে, আগুনে, না কি অন্য কোনো দেশে ? কোন্ দেশ আমাদের নেয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে ? এমন কোনো দেশ যদি না থাকে, তাহলে সরকারের দায়িত্ব এটা জানিয়ে দেওয়া যে, আঠারো-কুড়ি কোটি সংখ্যালঘুর বাসস্থান কোথায় ? কোথায় তাদের স্বদেশ ? কোথায় তারা থাকবে ? এর উত্তর আজ আপনারা না দিলে, রাজ্যসভার এই অধিবেশনে আমি বলতে চাই, আঠারো-কুড়ি কোটি মানুষকে একদিন তাদের স্বদেশের বিষয়ে ভাবতে হবে। এটা বড় কটু বিষয়। কিন্তু এই বিষয়ে বিতর্ক তুলছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী।

আমরা পঞ্চান্ন বছর ধরে পাকিস্তানের যখম সয়েছি। দেশ ভাগের যতটা আঘাত, যত যন্ত্রণা ভারতীয় মুসলমানরা সহ্য করেছে, কেউ তা করেনি।

মুসলমানরা যখন তাড়াহুড়ো করে পাকিস্তানে পালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় দিল্লি শহরে জামে মসজিদের সামনে, উর্দু পার্কে ভাষণ দিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেছিলেন ঃ 'মুসলমানরা! দাঁড়াও। এই জামে মসজিদের পবিত্রতা তোমাদের আওয়াজ দিচ্ছে, দাঁড়াও। কুতুব মীনারের উচ্চতা তোমাদের ডাক দিয়ে বলছে, দাঁড়াও। তাজমহলের সৌন্দর্য তোমাদের বলছে, থেমে যাও।' ফলে পালাতে থাকা মুসলমানরা থেমে গিয়েছিল। এবং সেই মুসলমানরা কারো কথায় নয়, কারো চাপে নয়, স্বেচ্ছায় এ দেশকে নিজেদের দেশ বলে মেনে নিয়েছিল। আজ গুজরাতের পথে পথে হাজারো মানুষকে পোড়ানো হয়েছে এই স্বদেশেই।

জনাব, আমি গুজরাত বলছি। মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করিনি। মানুষদের মধ্যে প্রভেদ করিনি। তাই এ পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো অধিকার নেই গৃহমন্ত্রী থাকার। 'গৃহ' তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর কোনো অধিকার নেই নিজের আসন আঁকড়ে থাকার। আমি তো রাষ্ট্রপতির কাছে দাবী জানিয়েছিলাম যে, দেশের কোনো অংশে জরুরী অবস্থা জারী করার অধিকার তাঁর রয়েছে, সুতরাং গুজরাতে জরুরী অবস্থা জারী করা হোক। এ অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। আমি এই দাবী করছি এবং এজন্য করছি যে, এখনও সংবিধান-শৃঙ্খলা বর্তমান। আর এই শৃঙ্খলায় যে কজনও এটাকে সঞ্চালন করছেন, সকলের উপরেই এই দায়িত্ব বর্তায়। এমনটা হলে, আমি আশা করি, জ্বলন্ত দেশ শীতলতাবোধ করবে।–৭ মার্চ ২০০২ তারিখে রাজ্য সভায় গুজরাত দাঙ্গা বিষয়ক বিতর্কে উত্থাপিত ভাষণ।

www.pathagar.com

# অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে গুজরাটের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

—দেবু দত্তগুপ্ত

সমগ্র পশ্চিম, উত্তর ভারতকে হিটলার-মুসোলিন দাগী জারজদের হাতে ছেড়ে রেখে তাদেরই নেতা সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন নিজের দেশের অবশিষ্ট সম্পদ বিক্রির বাবু ধরতে।

১০৩ কোটি জনসংখ্যা আর ৩২৮৭২৬৩ স্কোয়ার কিলোমিটারের ভূখণ্ড ভারত। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের কর্ণধার সেই ভারতেরই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তখন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সিঙ্গাপুরে ভ্রমণ করছেন। ৬৭৬ স্কোয়ার কিলোমিটারের ভূখণ্ড আর ৩০ লক্ষ মানুষের নগর রাষ্ট্র সেটি।

(২)

ভারত বর্ষের শিল্পক্ষেত্র বৃদ্ধির দ্রুততম হার গুজরাটেই। বৃহত্তম বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবেও সরকারী নথিতে প্রথম নাম এ রাজ্যের। ২৭ ফেব্রুয়ারীর পর ব্যবসা-বাণিজ্যের দৈনিক ক্ষতি ২০০ কোটি টাকা। কারখানাগুলো বন্ধ থাকলে অতি রক্ষণশীল হিসাবেও প্রতি ৪ দিনে ক্ষতি ১০০০ কোটি টাকা। এর সাথে মাল পরিবহন, যানবাহন পোড়ানের ক্ষতি, উৎপাদিত মাল ডেলিভারি এবং নতুন চাহিদা উৎপাদন করতে না পারার দৈনিক ক্ষতি যে কোনো হিসাবেই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

ভারত বর্ষের মোট জনসংখ্যায় গুজরাটের অংশ ৫ শতাংশ। কিন্তু জাতীয় পণ্য উৎপাদনের ১০ শতাংশ হয় গুজরাটে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ২০ শতাংশ, স্টক মার্কেটের ৩০ শতাংশ পুঁজি গুজরাটের। প্রেট্রোকেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার, রং, প্রসাধনী দ্রব্য, ওষুধ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল—দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত শিল্প-কারখানাই গুজরাটে অবস্থিত। টেক্সটাইল, অটোমোবাইল এবং তার অনুসারী শিল্প, কেমিক্যাল, ডাইস, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট, দামি পাথর, জুয়েলারি ; অধিকাংশ রপ্তানি পণ্য ; এই সমস্ত ক্ষেত্র-গুলিই চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারত বর্ষের হীরেকাটা ৮০ শতাংশ, পালিশের কাজে ৫৫ শতাংশ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোর উৎপাদন হয় গুজরাটে।

২০০১ সালে গুজরাট রাজ্যে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল ১১০০০ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান বছরে এই ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটবে বলে প্রতিটি সমীক্ষায় জানাচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সবচেয়ে চাকচিক্যময়

www.pathagar.com

আর বিপুল সমৃদ্ধির আড়ালে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদেশী লগ্নি আকর্ষণের চৌম্বক ক্ষেত্র গুজরাট রাজ্যের প্রকৃত আর্থিক অবস্থাটা বিগত কয়েক বছর ধরে অধোগামী হয়ে চলেছে। উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ যাই থাক, সরকারী পরিসংখ্যান জানাচ্ছে গুজরাট রাজ্যের আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন প্রকৃত অর্থে গত কয়েক বছরে ক্রমান্বয়ে কমছে। এই অধোগমনের কারণ হচ্ছে, কৃষি ক্ষেত্রের দুর্দশা, যা আবার বিপর্যয়ের চেহারা নিয়েছে কম বৃষ্টির কারণে।

আবার একই সময়ে কৃষি উৎপাদনের এই ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে যে গতির প্রয়োজন তাও দেখা যাচ্ছে না। যদিও গুজরাট বিনিয়োগকারীদের স্বর্গরাজ্য ; এ রকম একটা ধারণাকে জনপ্রিয় চেহারা দেবার জন্য নিরন্তর প্রচার তো আছেই। এগ্রিগেট ফিগার থেকে এ রকম একটা অতিরঞ্জিত মোহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। বেশ কিছু বড় মাপের প্রকল্প আছে, যেমন রিলায়েন্স পেট্রোকেমের ২৭ মিলিয়ন টনের রিফাইনারির মত প্রকল্পগুলোর কারণে মোট বিনিয়োগের অঙ্কটাকে অনেক বাড়িয়ে দেখানো যায়। গত কয়েক বছর ধরে শিল্প উৎপাদনও নিম্নগামী। খামখেয়ালী মরশুমি বৃষ্টির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হচ্ছে উত্তর ও মধ্য গুজরাট আর সুরাট। আর এ প্রকৃতির রোষানলে বিপর্যস্ত অঞ্চলটাই সাম্প্রতিক ভয়াবহ গণহত্যার আগুনে ঝলসে যাচ্ছে।

## ৩

দুর্ভিক্ষে পুড়তে থাকা এ পরিস্থিতিতে বেশ কিছু গ্রামবাসী যারা ক্ষুধা, অনাহার, নিজের সন্তানদের মৃত্যু, দু'আটি খড় আর জলের অভাবে প্রাণপ্রিয় পশু সম্পদের শুকনো কাঠের মতো মৃতদেহ দেখতে দেখতে হতাশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে, তাদের একমুঠো খুদকুড়োরও কী মর্মান্তিক প্রয়োজন হতে পারে সেটা মালুম হবে গুজরাটে গেলে।

অনাহারে মৃত সন্তানদের এসব গ্রাম্য সরল পিতা কিংবা পিতৃব্যদের শূন্য জঠরে যদি আগুন ধরানো যায়, যদি তারই মত ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনাহারী, আজন্ম-প্রতিবেশী, আত্মীয়ের চেয়েও বড় আত্মার আত্মীয়দের দিকেই আঙুল তুলে বলা যায়—ঐ, ওরাই হচ্ছে তোমার ক্ষুধা আর দারিদ্রের কারণ, ওরাই ভাগ বসাচ্ছে তোমার গম, জোয়ার, বাজরা, শিক্ষা, চাকরি আর ভবিষ্যতের সুদিনে—তবে ক্ষুধা আর চরম হতাশা কী ভয়াবহ দাহ্য বিস্ফোরক হতে পারে তারই এক ট্রায়াল রান চলছে গুজরাটে। হ্যাঁ, এ সর্বনাশা বাজার অর্থনীতির রন্ধ্রপথেই সুখ-দুঃখের আজন্ম সাথী হঠাৎ শত্রু হয়ে যায় শুধুমাত্র ভিন্ন

www.pathagar.com

ঈশ্বরের উপাসক হওয়ার কারণে। এ ভয়ঙ্কর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষুধাকেই লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যার প্রধান ইন্ধন করা হয়েছে গুজরাটে, বৃষ্টি-অভাবী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামাঞ্চলে। আবার এ ক্রোধ থেকে মুসলিম নিধনের অভিযান, এটাও হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়।

গোধরার পেছনে কোনো পরিকল্পিত ঘৃণা ছিল না। ছিল না অভিজ্ঞ, হত্যাকারী দাঙ্গাবাজ কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের পাকামাথার কাজ। সংঘ পরিবারের নেতৃত্বে কয়েক মাস ধরে ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি করা এক পরিকল্পিত সার্বিক পটভূমিতে গোধরার স্বতস্ফূর্ত ঘটনা শুকনো পাতায় একটু আগুনের ফুলকির কাজ করেছিল। আর এ স্ফুলিঙ্গটাও ছিল মৌলবাদের যজ্ঞাগ্নি থেকে উড়ে আসা। গোধরাকে অজুহাত করে গ্রামাঞ্চলেও শুরু হয়েছিল বহিরাগতদের অকল্পনীয় বর্বরতার অভিযান। যুক্তি, ন্যায়বোধ আর মানবিক সমস্ত বিচারবুদ্ধিকে ভয়ঙ্কর গুজবে পুড়িয়ে অবিশ্বাস্য পাশব হিংসায় গ্রামের মানুষকে অন্ধ করে দেয়ার আশ্চর্য নিখুঁত পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়েছিল, যার কেন্দ্রে ছিল তীব্র নগ্ন ক্ষুধা আর দারিদ্র।

আর এরও পেছনে ছিল বিগত একদশক ধরে একটানা ছেদহীন, মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করা উন্মত্ত প্রচার অভিযান। প্রায় প্রতি মাসে করসেবকদের অযোধ্যা অভিযান। যাত্রা পথের প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে করসেবক নামের আড়ালে দাগী অপরাধী সমাজবিরোধীদের অবর্ণনীয় তাণ্ডবের প্ররোচনা।

## ৪

কেউ সংস্কৃতির কথা বললে আমার হাতটা আপনিই রিভলবারের দিকে চলে যায়—বলেছিলেন তৃতীয় রাইখের অন্যতম পাণ্ডা হেরম্যান গোয়েরিং। ফ্যাসিবাদের এ দর্শন কোন্ সাংস্কৃতিক সমতল থেকে উত্থিত হয়—গুজরাট গণহত্যা তারও নিদর্শন তৈরি করেছে। শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য-সংগীত, স্থাপত্য শিল্পের সমস্ত ঐতিহাসিক চিহ্নকে ধ্বংস করা হয়েছে অভাবনীয় নির্দয়তায়। সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই সীমাহীন আক্রোশ ফ্যাসিবাদী প্রবণতারই ধ্রুপদি উদাহরণ। আফগানিস্তানে তালিবানরাই শুধু বামিয়ান বুদ্ধ ধ্বংস করেনি, আফগান সংস্কৃতির অসামান্য কেন্দ্র কান্দাহার, হেরাতকে ধ্বংস করেছে মার্কিনীরা। ধ্বংস করেছে গান্ধার শিল্পের সমস্ত সাক্ষ্যকে। তাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীন সুমেরিয় সভ্যতার প্রত্নভূমি ইরাকের সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস করেছে মার্কিনীরা। সাথে সহযোগী ছিল বৃটেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ, জেনিভা কনভেনশন এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক ফোরামে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদগুলো রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সমস্ত ফোরামে এখন 'Cultural Property' বলে কিছু নেই। মানব সভ্যতার যাকিছু শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ, তার সবকিছু উত্তরাধিকারই সমগ্র বিশ্বের। 'কালচারাল প্রপার্টি এখন হেরিটেজ'।

১৯৫৪ সালে হেগ কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়েছিল (Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed conflict,) "Presevation of Cultural heritage is of great importance for all peoples of the world."

হেগ কনভেনশনে আরও বলা হয়েছিল যে, 'damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind."

বিশ্ব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রক্ষা করার প্রশ্নে ১৯৯৯ সালে হেগ কনভেনশনের দুটি প্রোটোকলে বিশ্বের সমস্ত দেশ স্বাক্ষর করেছে। ভারতবর্ষও অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ।

১৯৭২-এ ইউনেসকো (United Nations Educational, Seientific and Cultural Organization) শুধু যুদ্ধের পটভূমিতে নয়, আরও বৃহৎ পরিসরে সর্বকালের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইউনেসকো কনভেনশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, "Cultural heritage as being among other thing 'monuments' architectural works of monumental sculptere and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outsanding universal value from the point of view of history, art or science. .... Every member state of UNESCO recognised that the duty of ensuring the identification, protection conservation, persentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage situated on its territory ... belongs primarily to the state."

গোধরা হত্যাকাণ্ডের সাজানো ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ২৪০টি দরগা, ১৮০টি মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলোই হেরিটেজ' হিসেবে চিহ্নিত, এখন আর কেউ আহমেদাবাদে গিয়ে ওয়ালি গুজরাটির সমাধি সৌধের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাবে না। রাতারাতি অ্যাসফল্টের

www.pathagar.com

পাকা রাস্তার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে আধুনিক উর্দু কবিতার জনকের শেষ শয্যার সব স্মৃতিচিহ্ন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম গর্বের কোনো কোনো সিংহ পুরুষদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুকেও বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল ভয়ঙ্কর আক্রোশে মুছে দিয়েছে নিঃশেষে ; একটু সংক্ষেপে সেইসব মহীরুহদের মধ্যে থেকে দু' একটি নাম দেখা যাক।

ওয়ালি মহম্মদ ওয়ালি, ১৬৬৭ সালে ঔরাঙ্গবাদে জন্ম। আধুনিক উর্দু কবিতার জনক। উর্দু কবিতাকে গযলের রূপ দিয়েছিলেন তিনি। ১৭০৭ সালে আহমেদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন গুজরাটের শিল্প রসিক সমাজ এ মহান শিল্পীকে গুজরাটের বৌদ্ধিক সম্পদ হিসেবে 'ওয়ালি গুজরাটি' বলে গর্ববোধ করতেন। সুফি সন্ত ওয়ালি মহম্মদ ওয়ালি প্রথম গুজরাটি উর্দু অভিধান রচনা করেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মহৎ শিল্পী উস্তাদ ফৈয়াজআলি খান সাহেবের সমাধিও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তারপর যেন পরম কৌতুকেই গোলাকৃতি পুষ্প স্তবকের মতো জ্বলন্ত টায়ারের অগ্নিবলয়ে ঢাকা হয়েছে সেই ধ্বংসাবশেষ।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ভাদোদরায় গুজরাটের প্রাক্তন রাজপরিবারের উদ্যোগে উস্তাদ ফৈয়াজ খান সাহেবের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে সারা ভারতের মার্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুণিজনেরা সর্বকালের ভারত শ্রেষ্ঠ অন্যতম এই শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। ৪ এপ্রিল উস্তাদ ফৈয়াজ খার সমাধি সৌধ ভি এইচ পি বজরঙ দল ধ্বংস করে দেয় বুলডোজার দিয়ে। অথচ ১৯১২ সালে গুজরাটের রাজপরিবার ফৈয়াজ খানকে যখন 'ভারত শ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তার জন্য গুজরাটের আপামর জনগণ গর্ববোধ করতেন।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ করার কাজে মহাপণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতকে পুনরাবিষ্কার করা, সুসংবদ্ধ প্রয়োগরীতি এবং অসামান্য সৃষ্টিশীলতায় সমৃদ্ধ করার কাজে উস্তাদ ফৈয়াজ খানকে 'Last of the Mohicans' বলা হয়ে থাকে। জিনিয়াস এবং ট্রাডিশনের সম্মিলিত রূপ ছিলেন তিনি। আঞ্চলিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির এইসব সম্পদ, যার অধিকাংশই 'Heritage' হিসাবে চিহ্নিত 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' ও বজরং দলের সম্মিলিত পাশব আক্রোশ এই স্মৃতি চিহ্ন-গুলোকেই নিঃশেষে ধ্বংস করেছে।

(৫)

দেশের সবচেয়ে বেশি নগরায়িত রাজ্য হিসেবে ১ লক্ষ জনসংখ্যার বেশি ৩০টি শহর আছে গুজরাটে। সবচেয়ে ঘনীভূত রাষ্ট্রীয় পুঁজির কেন্দ্র।

www.pathagar.com

জনসংখ্যার প্রধান ক্ষমতাশালী ৫০ শতাংশই পারিবারিক সূত্রে অনাবাসী আয়ের সাথে যুক্ত। বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা গুজরাটের অর্থনীতিতে নিয়মিত যোগান আসে এই সূত্রে। কিন্তু সরকারী অর্থনীতির নথিতে তার কোনো প্রতিফলন ঘটে না। দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা বহির্বিশ্বের সঙ্গে গুজরাটের নেভিগেশনাল রুট প্রায় ২০০০ বছরের। ফলে সুদীর্ঘকাল ধরেই বৈদেশিক মুদ্রার বিপুল সম্পদ অবৈধ হাওলা পথে নিয়মিত আসছে গুজরাটে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ দল দাতব্য, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিকৃত। ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী যেহেতু তারা রাজনৈতিক কর্মসূচীতে যুক্ত, ফলে 'ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (FCRA) অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে সমগ্র বিদেশী সাহায্যের হিসাব দাখিল করতে হবে। অথচ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে যেই বিশ্বহিন্দু পরিষদ কিংবা বজরঙ দল কেউ FCRA ক্লিয়ারেন্স নেয়নি। ভি এইচ পি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—তারা বিদেশ থেকে ফুটো পয়সা পর্যন্ত সাহায্য নেয় না। কিন্তু সরকারী তথ্যই বলছে—৭০টি দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে ভিএইচপি সেই অর্থ সংঘ পরিবারের সবসিডেয়ারি এনজিও 'ভারত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান' 'সেবা ভারতী এবং সংঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের তহবিলে চালান করে দেয়, যে সংগঠনগুলোর FCRA ক্লিয়ারেন্স আছে। এই বিপুল অর্থ আবার ফেরত যায় ভিএইচপি-র কাছেই। 'অরাজনৈতিক' দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভিএইচপি, বজরঙ দল কত টাকা উঠলো, কত খরচ হলো, কী কী খাতে খরচ হলো, তার কোনো হিসেব ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরকে দেয় না।

১৯৮৯ সালে ভিপি সিং সরকারের সময় আয়কর দপ্তর এই দুটি সংগঠনের আয় ব্যয় সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট চায়। সংঘ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো এনজিও-কে তারা টাকা দেয়, তারও হিসেব চাওয়া হয়। রিপোর্ট দেয়া না পর্যন্ত তহবিল তোলা বন্ধ করতেও নির্দেশ দেয় আয়কর দপ্তর।

ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার বিশ্ববন্ধু গুপ্ত জানতে চেয়েছিলেন রামমন্দির নির্মাণের জন্য কী ভাবে এবং বিদেশে কাদের কাছ থেকে এ উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় বিশ্ববন্ধু গুপ্তকে চেন্নাই ট্রান্সফার এবং পরে বরখাস্ত করা হয় তাঁকে।–(সূত্র ঃ In the Name of God' আনন্দ পট্টবর্ধন।)

অথচ এই ভিএইচপি-বজরঙ দলই দাবি তুলেছে খৃষ্টান ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে FCRA -কে আরও কঠোর করা দরকার।

www.pathagar.com

যদিও FCRA-এর মাধ্যমে যারা বিদেশী টাকা পায় তাদের অধিকাংশই এনজিও। মাত্র ছ' শতাংশ বিদেশী তহবিল আসে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর কাছে, মহাঋষি, সাইবাবা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে। খৃষ্টিয় কোনো সংগঠনের কাছে নয়। হিন্দু কিংবা মুসলিম কোনো মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনই FCRA-এর মাধ্যমে বিদেশী অর্থ পায় না। বেশির ভাগ অর্থই আসে হাওলা রুট দিয়ে। ২০টি দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শাখা আছে। ৫০টি দেশে ছড়িয়ে আছে ভিএইচপি-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলো।

১৯৭৪ সাল থেকে VHP America ট্যাক্স এক্সেমটেড নন প্রফিট অর্গানাইজেশন' হিসেবে নিবন্ধিকৃত। সেই সময় থেকেই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য।

VHP America-র সংগঠন সদস্য ৫০ হাজার। তাদের যুব শাখা 'হিন্দু স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল'-এর সদস্য ২০ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যোগাযোগ এবং প্রচার ব্যবস্থাসহ অত্যাধুনিক দপ্তর আছে। আছে ম্যানেজমেন্ট কর্মচারী। অথচ কাগজে পত্রে সকলেই অবৈতনিক কর্মী। কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিধারীরা কাজ করছেন ; VHP International Division এর যুগ্ম সম্পাদক বালকৃষ্ণ সরলভাবে এমনটিই জানিয়েছেন। যদিও প্রতি বছর 'গুরুদক্ষিণা' হিসেবে কোটি কোটি টাকা আরএসএস তহবিলে জমা পড়ে। সে অর্থের বিশালত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণাও নেই।

(৬)

অনাবাসী ভারতীয়দের সিংহ ভাগই গুজরাটের। শুধু বৃটেনেই ৭০ হাজার গুজরাটি থাকে।

প্রথম বিশ্বে তৃতীয় দুনিয়ার প্রত্যেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অসম্মানজনক জীবনযাপন করে। ফলে নিদারুণ হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন থাকে তাঁরা। আত্মপরিচয়ের তীব্র বিপন্নতা নিরবচ্ছিন্নভাবে কুরে খায় তাদের।

ভারতীয় এই অনাবাসীদের সম্পর্কে ৯০ দশকেই বিদেশ দপ্তরের বিপজ্জনক সতর্কতা ছিল এই—"Expatriates are always more aggressively and pathologically nationalistic."

বিদেশে স্বচ্ছল অর্থনৈতিক জীবন কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে নিদারুণ অসম্মান ধর্মীয় জাতি সত্তার মধ্য দিয়েই আত্মপরিচয়ের গর্ব খুঁজে নেবার

www.pathagar.com

পথে ঠেলে দেয় অনাবাসী ভারতীয়দের। এই বাস্তবতা বর্ণবৈষম্যে বিভাজিত গুজরাটসহ সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই সামাজিক অবস্থানের সমীকরণের ক্ষেত্রে জটিল অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

সুদীর্ঘকাল থেকেই গুজরাতে জাতপাতের মধ্য দিয়েই সামাজিক মর্যাদার অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশে প্রথম বিশ্বের উপেক্ষা আর অসম্মানজনক সামাজিক অবস্থান অনাবাসী গুজরাতি বা ভারতীয়দের মধ্যে জাতপাতের বাধাকে দূর করে যুথযদ্ধভাবে থাকার নতুন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে। জাতপাত নয়, ধর্মই সেখানে হয়ে উঠেছে ব্যক্তি মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। হিন্দুত্বের নানান ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখার পথই অনুসরণ করছে। বিদেশে স্বচ্ছল এবং রুদ্ধশ্বাস গতিশীল জীবনের আকর্ষণ অনাবাসী ভারতীয়দের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ; জীবন যাত্রায় সমস্ত অনুষঙ্গকেও বিপন্ন করছে।

বিদেশে নিরামিষাশী গুজরাটি ম্যাকডোনাল্ডের বিফ খায়, অথচ হিন্দুত্বের ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতার অপরাধবোধ তাদের মধ্যে তীব্রভাবে ক্রিয়া করে। ফলে পাপ স্খলনের মানসিক সান্ত্বনা হিসেবে ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আপন জাতি সত্তার বৈশিষ্ট্যকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

## ৭

মুক্ত বাজার শুধু দেশের অর্থনীতিকেই অর্গলমুক্ত করে না, দেশজ সংস্কৃতির পারম্পর্যকেও ধ্বংস করে। ফ্যাসিবাদের বিপজ্জনক উত্থান ভিন্নতর সমস্যাও সৃষ্টি করছে। গুজরাটে ১ লাখের বেশি জনসংখ্যার ৩০টি শহর আছে। গুজরাট হচ্ছে ভারত বর্ষের সবচেয়ে নগরায়িত রাজ্য। নগরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলে গুজরাটে সর্বত্র এক বিরাট সংখ্যক বিত্তশালী নব্য মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে অপরিকল্পিত নগরায়নের অবিভাজ্য অনুষঙ্গ ; সন্ত্রাস, আতঙ্ক, অবিশ্বাস এবং অপরিমেয় ঘৃণা। মুক্তবাজার অর্থনীতির কেন্দ্র শহরগুলি রুদ্ধশ্বাস গতিতে পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক গ্রন্থিতে গ্রামাঞ্চলকে যুক্ত করছে দ্রুত। গ্রামেও আধুনিক সম্পন্ন জীবনযাত্রার ঢেউ পৌঁছেছে। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশকে নিজেদের বৃত্তে টেনে আনছে ফ্যাসিবাদ। তারা সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দেখা যেতে পারে।

১. আরএসএস, ২. বিজেপি, ৩. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ৪. বজরঙ দল, ৫. যুব মোর্চা, ৬. মহিলা মোর্চা, ৭. দুর্গাবাহিনী, ৮. ভারত সাধু সমাজ, ৯.

www.pathagar.com

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থি পরিষদ, ১০. ভারতীয় মজদুর সংঘ, ১১. রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি, ১২. বনবাসী কল্যাণ সমিতি, ১৩. ভারত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, ১৪. সেবা ভারতী, ১৫. সরস্বতী বিদ্যা মন্দির।

বিদেশে ১. হিন্দু স্বয়ং সেবক সংঘ, ২. স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, ৩. হিন্দু স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ৪. ভি এইচ পি আমেরিকা, ৫. Overeseas Friends of B J P, ৬. হিন্দু বিবেক কেন্দ্র, ৭. গ্লোবাল হিন্দু ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক।

(৮)

গুজরাট গণহত্যার না নেভা আগুনের ভস্মরাশি সরিয়ে ধর্ষিতা কিশোরী আর ত্রিশূল বিদ্ধ শিশুর আধাপোড়া ছোট্ট শরীর উলটিয়ে, ভস্মীভূত ঘর-গৃহস্থালী আর মৃতদেহের স্তুপ ঘেঁটে যদি প্রত্যক্ষভাবে সরকারী এই বিধ্বংসী অভিযানের অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে চান, তবে আশ্চর্য সব তথ্য সংগৃহীত হবে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত উত্তর আর আংশিকভাবে মধ্য গুজরাটের বিস্তীর্ণ পোড়া মাটি প্যাটেলদেরই আধিপত্য ভূমি। এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে এখনও জ্বলছে ভয়াবহ পাশবিকতার আগুন। গুজরাটের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশই প্যাটেল সম্প্রদায়ভুক্ত। এরাই রাজ্যের ভূস্বামী। স্বাধীনতার পর জমির সিংহ ভাগের অধিকারী এরাই। সবুজ-বিপ্লবের সবটুকু শাঁস নিঙড়ে নৃশংসতা আর পাশবিকতার নীল রক্তে প্যাটেলরা হয়ে উঠেছিল অভিজাত ভূস্বামী। ৭০ দশকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এই নব্য-জমিদার শ্রেণীর প্রমত্ত উত্থান ঘটে।

স্বতন্ত্র পার্টিতে প্রথমে দোদুল্যমান পা রেখে অভিজাত প্যাটেলরা প্রায় গোটা শক্তি নিয়ে জড়ো হয়েছিল কংগ্রেসর পতাকার নিচে। গুজরাটের প্যাটেল সম্প্রদায়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল। ৯০ দশকের দ্বিতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে চিমনভাই কংগ্রেসের ফুটো জাহাজ ছেড়ে স্থায়িত্বের সন্ধানে ভিন নৌকার যাত্রী হতে চলে যান।

কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ ভূস্বামী ছাড়াও ব্যবসায়িক চাতুর্য, বিশেষ করে লাভের জন্য যে কোনো ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রে প্যাটেল সম্প্রদায় বিগত ২০ বছরে অর্থনীতিতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহদায়তন ক্ষেত্রেও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। এদের একটা বড় অংশ বিদেশে ভাগ্যান্বেষণে অভিবাসী হয়েছে। বিদেশে তারা জনপ্রিয় 'motels of Potels' এই নামে।

www.pathagar.com

আর বর্তমানে এই ভূস্বামী প্যাটেলরাই বিজেপির শাসন এবং মতাদর্শের মেরুদণ্ড। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় জুয়াড়ি হর্ষদ মেহতার দার্শনিক পিতৃভূমি গুজরাট।

ব্রাহ্মণ এবং বানিয়া সম্প্রদায় গুজরাটের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, এর সাথে ৩৫ শতাংশ প্যাটেল ; সম্মিলিত এ শক্তির নিয়ন্ত্রণে বর্তমান গুজরাট শাসিত হচ্ছে।

কেশুভাই প্যাটেলের অপসারণের পরেই (গত নভেম্বর মাসে দলীয় নেতৃত্ব কেশুভাইকে অপসারণ করে) প্রশাসনে, সরকারী সমস্ত ক্ষেত্রে প্যাটেল সম্প্রদায়কে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পদ থেকে বিসদৃশ ভাবে সরানো হয়। সাম্প্রতিক দাঙ্গার আগে, প্যাটেল সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক শিবির পরিবর্তন করে শুরু হয় কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া।

(৯)

সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম আদিবাসী দলিতদের পরিকল্পিতভাবে জড়ানো হলো দাঙ্গায়। উত্তর গুজরাটে সবরকান্থা জেলা, মধ্য গুজরাটের দাহড়, পাঁচমহল (এই জেলারই একটা অংশ গোধরা) এবং ভাদোদরা—এইসব জেলাগুলোতে লুট, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসী দলিতদেরই সামনে রাখা হয়েছিল।

আজন্ম বঞ্চিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে যদি আগ্রাসী ধারাবাহিকতা আর মেকী সহানুভূতির ভয়ঙ্কর দ্রবণে সব শোষণ-বঞ্চনা আর অসম্মানের কারণ হিসেবে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হতে থাকে, তবে দলিতদের বিচার-বুদ্ধিকে কীভাবে অন্ধ আক্রোশে হিংস্র করে তোলা যায়, ভাদোদরা জেলার ছোটো উদয়পুর মহকুমার মর্মান্তিক ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ। এই আদিবাসীরাই হচ্ছে ধর্মান্তরিত সেইসব হতদরিদ্র খ্রিশ্চান-দলিত, যাদের সাড়ম্বরে 'হিন্দু ধর্মে দীক্ষা' দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল। হিন্দু হবার ঘুষ হিসাবে দিয়েছিল তুলনামূলকভাবে সামান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা।

কয়েকটি মহকুমা আর ব্লকে এইসব ভয়ঙ্কর লুট, অগ্নিসংযোগ আর হত্যার পরের দিন কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সরকারী অফিসার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দৈনিক ঠিকা কাজের কিছু প্রকল্প চালু করেন। দলিতদের সাম্প্রদায়িক হিংসা একফুঁয়ে নিভে যায় সেদিনই।

www.pathagar.com

(১০)

দীর্ঘস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের সংবাদও আসছে। আবহমানকাল ধরে আদিবাসী দলিত সম্প্রদায় প্রকৃতির পূজারী। নদী, অরণ্য, বৃক্ষ আর সূর্যই তাদের আরাধ্য দেবতা। আবহমান ধর্মাচরণের এই ঐতিহ্যকেও ভয়াবহ হিংস্রতায় ধ্বংস করেছে সংঘ পরিবার। এখন আদিবাসী দলিতদের মুখে রাম-সীতা-লক্ষণের নাম অনভ্যস্ত, ভয়ার্ত ভঙ্গিতে উচ্চারিত হচ্ছে। উপজাতি-দলিত অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আরএসএস-এর সংগঠন 'বনবাসী কল্যাণ কেন্দ্র'গুলোর নিরবচ্ছিন্ন বিষাক্ত প্রচারই এই নতুন ঈশ্বরের সন্ধান দিয়েছে। উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিটি সরকারী প্রকল্পকে ধর্মান্তরের কাজে ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নব্য হিন্দুত্বের পরিচয়ের রন্ধ্রপথেই সুদূর গ্রামাঞ্চলের মুসলিমদের জতুগৃহে বন্দী করে লুট, অগ্নি সংযোগ, গণধর্ষণের ব্লিৎসক্রিগ চালিয়েছে বহিরাগত ঘাতক বাহিনী। আবার শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়, ভয়াবহ হিংস্র আক্রমণে শেষ হয়েছে বস্তারে আদিবাসীদের গ্রামগুলি। কেননা, সেখানে ইস্পাত কারখানার জন্য গ্রামগুলোই চাই।

সাম্প্রতিককালে মুক্তবাজার অর্থনীতির সন্ত্রাসে কৃষির উপর চাপ যত বেড়েছে, আহমেদাবাদ, ভাদোদরার মত বড় শহরগুলোতে ততই বেড়েছে কৃষি-অর্থনীতি থেকে ছিন্নমূল গ্রামীণ মানুষের অভিবাসনের স্রোত। ৭০ দশকেও ভদোদরা শহরটা ছিল আজকের পুনে কিংবা ব্যাঙ্গালোরের মতো ছিমছাম পৌর সৌন্দর্যে মণ্ডিত শহর। আর বর্তমানে সেই ভদোদরাই এক বন্ধ্যা নগরী।

সমস্ত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ইউনিটগুলো ; ইণ্ডিয়ান অয়েল, IPCL কোনো রকমে টিকে আছে। কিন্তু প্রতিটির অবস্থাই চূড়ান্ত খারাপ। ভবিষ্যত নিদারুণভাবে অনিশ্চিত। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বাতিল করে সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে ধারাবাহিকভাবে কর্মচ্যুতির অভিযান চলছে। নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটগুলিতে অনুসারী শিল্প ইউনিটগুলি একে একে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে নতুন কর্মসংস্থানের সমস্ত সুযোগ তো বন্ধ হচ্ছেই, কর্মরত শ্রমজীবীরাই যুক্ত হচ্ছে বেকার বাহিনীতে। শহরে ভিড় করা গ্রাম থেকে আসা জমি আর কাজ হারানো চাষি, নতুন কর্মপ্রার্থী প্রজন্ম, তাদের সামনে সামান্যতম আশার আলো তো দূরের কথা, আছে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার।

www.pathagar.com

## (১১)

মুক্তবাজার অর্থনীতির সন্ত্রাসে সুতোকলগুলি জীর্ণ হয়ে পড়ার যে আহমেদাবাদ শহরকে আগে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হতো সেই শহরের বিস্তীর্ণ কারখানা অঞ্চলগুলিতে ভৌতিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ৮৪টি সুতাকলের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১৩টি কারখানা চলছে। ২ লক্ষ ৬০ সূতাকল শ্রমিকের মধ্যে কাজ হারিয়েছিল ৯৫ শতাংশই। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পালয়েস্টার তন্তুর অবাধ আমদানি 'ম্যাঞ্চেস্টার অফ দি ইসকে ধ্বংস করেছে সার্বিকভাবে। আর এ কর্মহীন সূতাকল শ্রমিকদের বড় অংশই আদিবাসী দলিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নব্য রংরুট। অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের হীরে পালিশ কিংবা পাওয়ারলুমগুলির বিপুল এবং ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রার্থীদের ধারণ করার পক্ষে গুজরাটের আর কোনো প্রাণশক্তি অবশিষ্ট নেই। খুচরো ব্যবসা বা নির্মাণ শিল্পেও কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে। উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে কর্মহীন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার হাতড়াতে থাকা অনির্দিষ্ট ক্রোধে উন্মত্ত এক যুব-প্রজন্মের ভয়ঙ্কর উত্থান ঘটছে। বিপুল প্রাণশক্তিতে চঞ্চল এক শক্তি, অথচ করার মত কোনো কাজ নেই। সুস্থ সামাজিক দায় পালনের সংগঠনগুলো তুলনায় খুবই দুর্বল। গুজরাটের সাম্প্রতিক গণহত্যায় সার্বিকভাবে অংশগ্রহণকারী ৮০ শতাংশের বয়ক্রমঃ ১৭-৩৫।

এদের কানে কানে যদি অবিরত স্নায়ু বিদারক ঘৃণায় সব সমস্যার কারণ হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা যায়, যদি আত্মপরিচয়ের তীব্র সঙ্কটে জর্জরিত, সমাজের সব দরজায় লাথি খাওয়া প্রত্যাখ্যাত এ প্রজন্মের ক্রোধ আর ঘৃণাকে ভয়ঙ্করভাবে দাহ্য এক পাশবিক মতাদর্শের রন্ধ্রপথে চালান করা যায়, তবে, সেই বধ্যভূমিতে শুধু মুসলিম শেষ হবে না, সেই বহ্নি উৎসবের ধোঁয়ায় জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ১০ শতাংশকে রক্ষা করার সর্বনাশা আর্থিক নীতিকেও আড়াল করা যাবে।

গুজরাটের গণহত্যার পেছনে তীব্র আর্থিক সমস্যার আরো কারণ আছে। মুক্ত বাজারের উন্নয়নের সন্ত্রাসে, বিশেষ করে সরদার সরোবর প্রকল্পে ছিন্নমূল অরণ্যাচারী দলিত, জলঘূর্ণিতে তলিয়ে যাওয়া প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর দরিদ্র আদিবাসী, যাদেরকে বিশ্বব্যাংক আর বাজার অর্থনীতির দালালরা একটা শোভন নামও দিয়েছে 'এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি', ফান্ডের অর্থনীতিবিদদের ধোপদুরস্ত সংজ্ঞায় আবার তারাই 'ডেভেলপমেন্টাল রিফিউজি'। এই পুনর্বাসনহীন, জমি আর আবহমানকালের অরণ্যের

www.pathagar.com

অধিকার হারানো লক্ষ মানুষ যে কোনো কাজের আশায় এসে জুটেছে উত্তর আর মধ্য গুজরাটের শহরগুলোতে।

(১২)

'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' আহমেদাবাদ সূতাকল আর ছাপা শাড়ির সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছিল একচেটিয়া বাজার। যে পাওয়ারলুমগুলোর শ্রমিকদের সিংহ ভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ছাপা শাড়ির কারবারের মালিক হিন্দু-গুজরাটি। অপূর্ব মোটিফ-এর জন্য সারা ভারতে সমাদৃত হয়েছিল গুজরাটের ছাপা শাড়ি। গণেশ, নটরাজ, স্বস্তিকা, পুরুষোত্তম রাম, অশোককাননে বন্দিনী সীতা ; এগুলিই ছিল সেসব দৃষ্টিনন্দন ছাপা শাড়ির মোটিফ।

বিশুদ্ধ শিল্পবোধ থেকে গুজরাটি ছাপা শাড়িতে গণেশ, স্বস্তিকা চিহ্ন কিংবা রামের মোটিফ ছাপা হতো এটা মনে করলে ভুল হবে। শিল্পের অনিন্দ্যসুন্দর আর্কিটাইপের মধ্য দিয়ে কার্যত চালান করা হতো বিপজ্জনক মতাদর্শকে। শুধু বোধিতে নয়, চোখের সামনে বসনে-ভূষণে সর্বত্র থাকুক সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকী রূপ। রাজ্যে এবং বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই ছাপা শাড়ি।

কিন্তু বর্তমানে মুক্ত বাণিজ্য নীতির কারণে সস্তায় পলিয়েস্টার তন্তুর অবাধ আমদানির ফলে গুজরাটের সূতাকলগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকার হয়ে যাচ্ছে বয়নশিল্পের দক্ষ কারিগররা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই সর্বনাশা আমদানি নীতিকে আড়াল করার জন্য দেয়া হচ্ছে অদ্ভুত ধর্মীয় যুক্তি।

ঐসব শাড়ি পরলে গণেশ, স্বস্তিকা চিহ্ন কিংবা পুরুষোত্তম রামের ছাপা মোটিফগুলি শাড়ির পাড়ে থাকার দরুণ মহিলাদের পায়ে লাগে। ফলে অজান্তেই গভীর 'পাপ' স্পর্শ করে। সে কারণেই এই শাড়ি আর ছাপা যাবে না—এ হচ্ছে গুজরাটের সংঘ পরিবারের যুক্তি।

(১৩)

বাজার অর্থনীতির যুক্তিতে যে কোনো প্রাকৃতিক কিংবা সামাজিক বিপর্যয়কেও আর্থিক লাভালাভের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সেভাবেই দেখছে দেশ বিক্রির দালাল-বানিয়া বিজেপি সরকার। প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের পর অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায় বলেছিলেন—গুজরাটের ভূমিকম্পে ২০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হলেও ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

ভূমিকম্পে কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন ? সেই অপরিমেয় মানব সম্পদের ক্ষতিপূরণ হবে কি কবে ? বাজার অর্থনীতির দালালদের কাছে এই প্রশ্নটা নিতান্তই তুচ্ছ বিবেচিত হয়েছিল। কেননা বাজার অর্থনীতির নিয়মে মানুষের সর্বনাশ মানেও—'net contribution to the economic output.'

ঠিক এ রকমই, ভারতে তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম প্রতিষ্ঠান উইপ্রো-প্রধান, গুজরাট-বংশোদ্ভূত আজিম হাসান প্রেমজির উদ্বেগ মানুষের মৃত্যু কিংবা সব হারানো নিয়ে নয়। তাঁর উদ্বেগের কারণ—এ রকম হলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অনেক কম হবে। এমএনসি-গুলি গুজরাটে আসবে না।

আজিম হাসান প্রেমজি গুজরাটের একটানা দেড়-মাস সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের জন্য সহস্রাধিক মৃত্যু, মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বস্ব হারানোর জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নন।

যদিও প্রেমজীর গালে থাপ্পড় মেরে গুজরাট চেম্বার অব কমার্সের মাতব্বর, হনুমান-ভক্তরা চমৎকার জবাব দিয়েছে—"We the Gujratis need no schooling from Premzi it comes to dhando (business). The Gujratis smell money the way animals smell wind.

বাতাসে গন্ধ শুঁকে স্বাদু মাংসের হদিশ পাওয়া হিংস্র হায়নার মতোই গন্ধ শুঁকে টাকার খোঁজ পাওয়ার সর্বনাশা বাজার দর্শন গুজরাটের জীবন দর্শনে রূপান্তরিত করেছে ভিএইচপি আর বজরঙ দল। গুজরাটে যারা খুন হয়েছে, ঘরবাড়ি গুড়িয়ে ধ্বংসস্তুপে হারিয়ে গেছে—তাদের পরিবারের জীবিতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে গুজরাট সরকার ১ লাখ টাকা। নগদে ৪০ হাজার আর ৬০ হাজার টাকার কাগজ, মানে সরদার সরোবর বণ্ড। এখানেও ভয়াবহ বিপর্যয়কে নিঃশেষে দোহন করে বাজার থেকে টাকা তোলার দর্শন।

(১৪)

**মানুষের মত কুকুর**

তিন তলার বাহারী বারান্দায় দাঁড়িয়ে বহ্নিমান শহরটাকে দেখছিলেন তিনি, পাশে পাঁচ বছরের বাপ-ন্যাওটা মেয়ে স্নায়ু বিবশ করা দূরাগত আর্তনাদ। মানুষের গলা থেকে গুলিবিদ্ধ কুকুরের আর্তি। আমেদাবাদের একদিকে আকাশটা কালো ধোঁয়ার আস্তরণে অন্ধকার। শহরের সবচেয়ে বিত্তবান ভদ্রজনের এলাকা এটা। সকলেই সফল, শিক্ষিত, সংবেদনশীল মানুষ।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে অস্ফুট চিৎকারে ভয় পায় পাঁচ বছরের মেয়ে। বাতাসে কত কিছু পোড়ার মিশ্র গন্ধ। ঝাঁঝালো। বাপকে জড়িয়ে ধরে আতঙ্কে। এবার সচকিত হয়ে উঠেন তিনি। দূর থেকে ছুটে আসছে কারা ? মৃত্যুপণ করে দৌড়। বেশ কিছুটা তফাতে আরও একদল। চোর ধরার গোল্লাছুট। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠে। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ১৩ থেকে ২৩ বছরের মেয়েরা মাথায় দোপাট্টা জড়িয়ে ছুটে আসছে। কুকুরের হাঁপের শব্দ। তপ্ত লোহার শিকে বিদ্ধ হতে থাকা হাত-পা বাঁধা শুয়োরের মতো চরাচর বিদীর্ণ করা আর্তনাদ।

বিকেলের রোদ্দুরে স্পষ্ট দেখা যায় নরম তুলতুলে গালে চোখের জলের হীরকবিন্দু। ভয় আর অসহায়তার এত ছন্নছাড়া চেহারা, তবুও ছুটন্ত শরীরে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের ভয়ঙ্কর দাহ্য বিভঙ্গ। সংবেদনশীল মানুষটির চোখ এড়ায় না। আকাশ কাঁপানো আর্তির সঙ্গ ধাবমান অশ্বের মতো সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনের ঘর্মাক্ত ছিরিছাঁদ। বারান্দায় দাঁড়ানো স্নেহশীল পিতার এমনটাই মনে হলো।

পাঁচ বছরের বাপ-সোহাগী মেয়েকে এক্ষুণি আসছি বলে তিনি সিল্কের লুঙ্গির গিঁটটা শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর দ্রুত নেমে এলেন নিচে, রাস্তায়। তখনও দূরত্ব হাত পঞ্চাশেক। ১২ থেকে ২৩। তিনি ৪২। ছুটন্তদের মধ্যে অপরূপা অষ্টদশীকে চিহ্নিত করতে তাঁর ভুল হলো না। অষ্টদশীই ভাল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সারা শরীর ঘেন্নায় গুলিয়ে উঠলো। সবচেয়ে সরেস অষ্টাদশীকে নির্বাচন করার পর মুহূর্তেই দেখলেন সে-ই রোরুদ্যমানার সালোয়ার রক্তে ভেজা। টাটকা রক্ত। কামিজ ছিন্নভিন্ন। তিনি স্পষ্ট দেখলেন সেই আঠারোর বুকে পরিষ্কার কামড়ের দাগ। প্রতিটি ছুটন্ত পদক্ষেপে রক্তক্ষরণ বাড়ছে।

এতো উচ্ছিষ্ট ! এটাকে ছোঁয়া যাবে না। মানুষ কি কুকুর হয়ে যাচ্ছে। অনাঘ্রাতা টাটকা একটা কুমারীকেও ছাড়ে না ?

অতপর ১৬। সামনে গ্যারেজ। আর কী আশ্চর্য! এই আর্ত মেয়েরা ৪২-কেই কি না ভেবে নিয়েছে পরিত্রাতা!

গ্যারেজের আড়ালে চলে গেলেন তিনি। সাথে পরম নিশ্চিন্তে ১৬ বছর। এখনো বাঁজ পাখির তাড়ায় কাঁপছে থরোথরো। নিজের আব্বুর মতো মনে হয় ৪২ কে। ইতিমধ্যে বাকিদের ধরে ফেলেছে। ১৩ থেকে ২৩, কোনো বাছবিচার নেই। অমার্জিত ছোটলোকদের কামনার মধ্যেও কোনো রুচি থাকে

www.pathagar.com

না। ওদের উচ্ছিষ্ট ওরাই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে খোলা আকাশের নিচে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার। একটু আড়ালের প্রয়োজনও বোধ করে না কুকুরগুলো।

মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি নির্ভার হয়ে সিল্কের লুঙ্গিটা কষে বাঁধলেন ধীরে সুস্থে। পায়ের নিচে ১৬। রক্ত বয়ে যায় অঝোরে। সংজ্ঞাহীন, নিশ্চল, চেতন-অবচেতনে ১৬ শুধু ভাবে তার আব্বুর বয়স তো এ রকমই। বাইরে তখন উন্মত্ত আনন্দ। খোলা আকাশের নিচে ছোটলোক কুকুরদের রমণের উৎসব। উন্মত্ত শরীরি ব্যস্ততার মধ্যেও তারা এক সাথে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে—পণ্ডিত জি কি পসন্দ লা জবাব !

তিন তলার গ্যালারিতে তিনি আবার দাঁড়িয়ে দূরের ধোঁয়াটে আকাশ দেখতে থাকেন শান্ত, সমাহিত দৃষ্টিতে। পাশে পাঁচ বছরের বাপ সোহাগী মেয়ে। রক্তজ সন্তান। সে শুধু বলে—পিতাজি আপকো কাপড়া মে খুন। ধো ডালিয়ে। আপকো কাপড়ামে খুন .....।

❐

www.pathagar.com

# গুজরাতের গণহত্যার সামাজিক প্রেক্ষাপট

–বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

গুজরাতে গণহত্যা শুরু হবার কয়েকদিন পরের কথা। লুটতরাজ, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি তখন প্রাত্যহিক ঘটনা। দাঙ্গাবাজরা বেপরোয়াভাবে চারিদিকে ছুটে চলেছে। আইন তখন তাদের হাতে। অন্যদিকে আইনের যারা রক্ষক তারা হয় গা-ঢাকা দিয়েছে, নয়তো দাঙ্গাবাজদের পরোক্ষ মদত জোগাচ্ছে। সৎ এবং নীতিনিষ্ঠ অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় এসে বসেছেন মেরুদণ্ডহীন জী-হুজুরের দল। রাজনৈতিক প্রভুরা প্রকাশ্যে তাঁদের বশংবদ অনুচরদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই রকম পরিস্থিতিতে, সাহসিক এক সাংবাদিক আহমদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে উন্মত্ত জনতা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে একটাই প্রশ্ন করেছিল, আপনি হিন্দু না মুসলমান ? সাংবাদিক তাঁর পাশে বসা কম্পমান যাত্রা সংগীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে দ্বিধাহীন স্বরে উত্তর দিলেন, 'হিন্দু'। দাঙ্গাবাজরা অবরোধ সরিয়ে নিয়ে তাঁদের এগিয়ে যাবার অনুমতি দিল।

সাংবাদিক শহরের দিকে যেতে যেতে যা চাক্ষুস করেছেন—আমরা সেই প্রসংগে আপাতত যেতে চাই না। কারণ, বিগত কয়েক মাস ধরে সেসব কথা অনেক জায়গায় বহুবার বলা হয়েছে। বরং কিছু সময় স্থিতধী হয়ে তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল—তার অন্তর্লীন তাৎপর্যটা বুঝার চেষ্টা করি। যদি আপনি একজন 'হিন্দু' হন—তাহলে আপনি 'আমাদের'। যদি তা না হন—তবে আপনি 'ওদের'। মেরুবিভক্ত সমাজে ধর্মীয় আনুগত্যই হবে আপনার প্রধান পরিচয়। যে বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা স্বাধীনতার সময় থেকে চলে আসছে—এই ধরনের বিভাজন তার ভিত্তিটাকেই নস্যাৎ করে দেয়। বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা বলতে বোঝায়—আত্মপরিচিতির বিভিন্ন স্তর, ধর্মীয় আনুগত্য তার অন্যতম। এইসব স্তরগুলো একে অপরের পরিপূরক হতে পারে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর প্রতিযোগিতাও করতে পারে। কিন্তু সবগুলিকে নিয়েই যে সমাজ গড়ে উঠেছে—তাকেই তো আমরা বলি ভারতীয় সমাজ এবং সেজন্যই তো ভারতীয় হিসাবে আমরা পরিচিত। বহুত্ববাদী সমাজ সমস্বরে কথা বলে না। না বলার মধ্যেই নিহিত থাকে তার প্রকৃত শক্তি। গুজরাতের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড যা বলতে চাইলো—তাহলো জাতীয়তাবাদের ব্যতিক্রমী একটি সভা—যার মূল উপাদান হলো ধর্ম। ফলশ্রুতি-সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া। একজন মুসলমানকে এই দেশ ভারতবর্ষের প্রতি তার আনুগত্য দেখাতে হবে। কি ভাবে ? হিন্দুত্ববাদীদের

www.pathagar.com

দ্বারা নির্ধারিত মাপকাঠিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করা যাচ্ছে—ততক্ষণ মুসলমানের দেশভক্তি প্রশ্নাতীত নয়। তাকে নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করা হবে।

দাঙ্গার অব্যবহিত আগে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা যেসব নির্দেশিকাপত্র, প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা আমেদাবাদ এবং গুজরাতের অনেক জায়গায় বিলি করেছিলেন—সেইগুলো থেকেও উপরোক্ত বক্তব্যের জোরালো ও পরিষ্কার সমর্থন মেলে। গুজরাতের এই ধ্বংসলীলার পরপরই 'এডিটরস্ গিল্ড' তথ্যানুসন্ধান দল (Fact Finding Mission) সেখানে পাঠায়। তারা এ ধরনের বহু প্রচারপত্র ও পুস্তকের সন্ধান পেয়েছেন। ঐ দলের প্রকাশিত রিপোর্ট (Fact Finding Report পরবর্তীতে F. F. M. R) বলেছে—"প্রচারপত্রগুলির যথার্থতা নিরুপণ করা কষ্টসাধ্য এবং আপাতদৃষ্টিতে এটাও মনে হতে পারে যে এগুলোর মধ্যে কয়েকটা হয়তো ভুল তথ্যাদি দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচার করা হয়ে থাকতে পারে।" এটা হয়তো ঠিক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, এই সকল প্রচারপত্র আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে—এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এদের মধ্যে কতকগুলিতে তো সংঘ পরিবারের ছাপও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রচারপত্র—যার বয়ান নীচে দেওয়া হলো—সেটার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রচারপত্রটির সম্বন্ধে চিনুভাই প্যাটেল—যিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোষাধ্যক্ষ—দায়িত্ব স্বীকার করেছেন (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, নিউ দিল্লী, ১১-৪-২০০২)। এটা গুজরাটি ভাষায় লেখা দু পাতার একটি প্রচারপত্র—নীল কাগজে ছাপা—যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু পোস্ট অফিস মারফতও পাঠানো হয়েছিল। এই প্রচার পত্রটি শুরু হয়েছে হিন্দুদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে—'বিশ্বাসঘাতকরা এবং সন্ত্রাসবাদীরা ট্রাক ভর্তি হয়ে আসছে। তারা আপনার বাড়ীর প্রহরীকে হত্যা করে বাড়ীতে ঢুকবে—আপনাদের খুন করবে।" এই বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে যে, 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'সন্ত্রাসবাদী' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে—তবে সে সন্দেহও নিরসন করে দেওয়া হয়েছে। মুসলমান ছাড়া আর কারাই বা তা হতে পারে ? ..... 'যেদিন তাদের জনসংখ্যা ২৫ বা ৩০ শতাংশ হবে—সেদিন হিন্দুদের খুব বিপদ ঘনিয়ে আসবে। তারা তখন ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে অনেক পাকিস্তানের সৃষ্টি করবে এবং দিল্লীর লালকেল্লায় ইসলামের সবুজ পতাকা ওড়াবে।' তাহলে এর থেকে বাঁচার পথ কি ? পথ একটাই ঃ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সব কথাবার্তা হিন্দুদের পরিত্যাগ

www.pathagar.com

করতে হবে এবং সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পতাকাতলে সমবেত হতে হবে। এটাই অবশ্য সব নয়। আর একটি চার পাতার প্রচারপত্রে অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে—'আপনার জীবন বিপন্ন—যে কোনো সময় আপনাকে হত্যা করা হতে পারে ..... আমরা হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য অর্থ সংগ্রহে নেমেছি ..... আরো হাজার হাজার গোধরা কাণ্ড ঘটানোর জন্য ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে (বিস্তৃত বিবরণের জন্য F. F. M. R পৃঃ ১৯-২০ ও পৃঃ ২১৬ এবং ফ্রন্ট লাইন, ২৪ মে, ২০০২)। অন্য প্রচার পত্রগুলিতে হিন্দুদের বলা হয়েছে মুসলমানদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একঘরে করে দেওয়ার কথা—'বিষাক্ত সাপকে দুধ-কলা দিয়ে পুষবেন না—মুসলমানদের সর্বতোভাবে পরিহার করুন—একঘরে করে রাখুন (F. F. M. R- সংযোজন ১৯, পৃ. ২১৭)। এই রকম আরো অনেক বিস্ফোরক প্রচার পত্রের কথা 'এডিটরস্ গিল্ড'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে।

গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কয়েকটি অবশ্য ঐ সকল প্রচারপত্র প্রচারকদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। দুটি গুজরাটি সংবাদপত্রের কথা বিশেষভাবে বলা যায়—একটি 'গুজরাট সমাচার' (প্রচার সংখ্যা প্রায় ৮-১০ লক্ষ) এবং অন্যটি 'সন্দেশ' (প্রচার সংখ্যা প্রায় ৭.০৫ লক্ষ)। এরা ঐ ধরনের প্রচার ঘটানোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যখন গিল্ড সদস্যরা 'সন্দেশ' এর সম্পাদকের সাথে তার আমেদাবাদের ঝাঁ তক্তকে অফিসে দেখা করলেন—তিনি তাদের স্পষ্টই বললেন, গোধরার ঘটনা ক্ষমার অযোগ্য এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ খুবই যুক্তিসংগত।' তার প্রশ্ন—"২০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে চালনা করবে ? এর একটা সীমারেখা টানা উচিত।" যখন সদস্যরা জানতে চাইলেন নিরীহ মানুষজনকে কেন মারা হচ্ছে—তার উত্তর "ব্যাপারটা হলো এভাবে মুসলমানদের উপর চাপ সৃষ্টি করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সবক্ শেখানো। এরপরে অন্যান্য মুসলমানেরা সেভাবেই কাজ করছে।" "হিন্দু-ইজম্ কে নাম পর কুছ ভি করেঙ্গে"—তার উক্তি। এটা আশ্চর্যের নয় যে—তিনি এবং আরো পনেরোজন গুজরাটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের এই ধরনের কাজের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে সংবাদপত্রের এই ধরনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

হিংসাত্মক ঘটনাবলীর বিস্তৃতি ঘটানোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্থানীয় বৈদ্যুতিন/কেবল মাধ্যমের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নামী-দামী বৈদ্যুতিন মাধ্যম

www.pathagar.com

যেমন "আজতক্" "ষ্টার টিভি", (এন ডি টি. ভি), "জি. টিভি", এবং আরো কিছু—খুবই গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে—যদিও রাজ্য সরকার তাদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, ২রা মার্চ "ষ্টার টিভি"-র প্রচার বহু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। "আউটলুক" যখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদিকে সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠ এইভাবে রুদ্ধ করে দেওয়ার কারণ জানতে চাইলো—তিনি বললেন—"সংবাদ মাধ্যমের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। আমি শুধুমাত্র একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে বন্ধ রেখেছিলাম—কারণ তারা উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছিল।" এটা একেবারেই বৈষম্যমূলক আচরণ—কারণ, স্থানীয় কেবল চ্যানেলগুলি ভয়াবহ উস্কানিমূলক প্রচার সরাসরি দেখানো সত্ত্বেও—তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভাদোদরার নগরপাল এই ধরনের চ্যানেলগুলির কাজের খুবই নিন্দা করেছেন এবং তাদেরকে সতর্কও করে দিয়েছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। PUCL, Shanti Abhiyan বরোদা 'এডিটরস্ গিল্ড'কে যে স্মরকলিপি দিয়েছেন—তাতে স্থানীয় চ্যানেলগুলির প্রচারের ঘটনাসমূহ উল্লেখিত আছে। এই রকম একটি চ্যানেল (দীপ চ্যানেল, ১৫ মার্চ, ২০০২) দেখাচ্ছে কয়েকজন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ/বজরং দলের নেতারা চিৎকার করে গর্বের সাথে বলছে—"আমরা যেভাবে চাই—মুসলমানদের সেভাবেই থাকতে হবে—নতুবা আমরা তাদের বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এসে হত্যা করবো।" (বিস্তৃত বিবরণের জন্য PUCL, Shanti Abhiyan বরোদা স্মারকলিপি বিশেষতঃ "A Brief Note on Electronic Media in Baroda" দ্রষ্টব্য)। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো—"ডিজিট্যাল" মাধ্যমের ব্যবহার–যার সাহায্যে অন্যকে ভীতি প্রদর্শন ও উত্তেজিত করা হচ্ছিল। F. F. M. R এর মতে—গুজরাটের দাঙ্গাই সম্ভবত প্রথম—যেখানে "ডিজিট্যাল" মাধ্যম এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।" দাঙ্গাবাজদের এবং লুটেরা বাহিনীকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছিল। এই দাঙ্গায় গুজব একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। কিছু কিছু মানুষের কাছে ঐ সকল মাধ্যমের সাহায্যে এমন গুজবও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল যেই দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে যোগান দেওয়া হচ্ছে। অনেককে টেলিফোনে রকেট আক্রমণের আশংকার খবরও দেওয়া হয়েছিল। "ই-মেল" এর সাহায্যে ক্রমাগত খবর পাঠানো হচ্ছিল। এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন মি. কোয়াদ্রী এবং মি. আকবর দিবেচা—দুজনই গুজরাট হাইকোর্টের বিচারক—অথবা বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এস. বন্দুকওয়ালা—এই ধরনের ভীতিকারক টেলিফোন পাচ্ছিলেন। এঁরা এদের বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বন্ধু বা সহকর্মী—যাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুও আছেন—তাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তাদের নিজ বাড়ীর লুটতরাজ ও ধ্বংসের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"ধরতি পূজা" পালন করতে হবে এবং ঐ নির্দেশের সাথে মা ভগবতীকে তুষ্ট করার জন্য কোন্ কোন্ মন্ত্র পাঠ করতে হবে—তারও তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়। আরো অনেক এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন—"বর্তমান গুজরাট কাণ্ড এই প্রশ্ন জাগায় যে গৈরিকায়িনিত বিদ্যালয় পাঠক্রম ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসহিষ্ণুতাকে ন্যায়ীকরণে সাহায্য করবে কিনা।" এই বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঙ্গাবাজরা আরো আরো আক্রমণাত্মকভাবে ইতিহাস পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে—যেমনটি তারা ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় করেছিল। ওয়ালি মহম্মদ ওয়ালি—যিনি ওয়ালি গুজরাটি নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ—আমেদাবাদে তাঁর সমাধিস্তম্ভ ধ্বংস করা অথবা ভাদোদরায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সৌধ আক্রমণ করা—এগুলি গুজরাট ২০০২ এর সাংস্কৃতিক বর্বরতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এ ধরনের দাঙ্গা ঘটানোর জন্য রাজনীতিগতভাবে মানুষকে সমবেত করার যে প্রক্রিয়া, তার একটা বিশেষত্ব হলো—কোনো বিশেষ মতবাদে শিক্ষিত করে তোলা। মনের উপর আধিপত্য জারী করে সাধারণ মানুষজনকেও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত করানোয় প্রতিষ্ঠিত করা। একবার যদি মন আদর্শে সিক্ত হয়—তখন প্রশ্ন করারও কোনো কিছু থাকে না। কোনো প্রমাণেরও তখন প্রয়োজন নেই। ঘটনা নিজেই তখন সত্যে পরিণত হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে—গুজরাটের বর্তমান গৃহমন্ত্রী মিঃ জাদাফিয়া কিভাবে গোধরার মুসলমানদের "জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের" সাথে তাদের অতীতের "দুষ্কৃতির" একটা মেলবন্ধন করে দিলেন। উনি সরাসরি মন্তব্য করলেন—গোধরার জাতীয়তা বিরোধী ইতিহাস দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ভূমিকা পালন করবে।" এই ধরনের অপবাদ-মূলক বক্তব্যের বিরোধিতা করে ডেভিড হার্ডিমান সাম্প্রতিক তার একটি লেখায় (ইপি ডাব্লুউ মে. ১১, ২০০২) বলেছেন যে, গোধরাতে হিংসাত্মক ঘটনার বিষয়ে বলতে গেলে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই তা বুঝতে হবে এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিকাশের প্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

যা হোক, হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট সমাজের দৃঢ় মতবাদ প্রচারের স্রোতে সামাজিক মতভেদ ডুবে গেলো—শহরের মানুষ অবশ্য গ্রামীণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শহরাঞ্চলে অসংখ্য জনগণের নেতৃত্বের দিকে ছুটে গেলো। এটা উল্লেখ করা জরুরী যে, এই অসংখ্য জনগণ—যারা দক্ষিণে আনন্দ থেকে পূর্বে ভাদোদরা এবং উত্তরে আমেদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত —বিশ্বায়নের প্রভাবে গুজরাটের দেশীয় শিল্পের মন্দার ভুক্তভোগী।

www.pathagar.com

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম এবং অবশ্যই আঘাত করার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল শহরতলীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। এঁরা সাম্প্রদায়িক সমাজিকরণের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল—কারণ, আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার যে মৌলিক কাঠামো তাকে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ব্যর্থতা। আরো অশুভ দিক হলো—অনগ্রসর শ্রেণী, দলিত এবং উপজাতি-আদিবাসীদের সাম্প্রদায়িক একীকরণ। একই রকমভাবে উত্তর ভারতে প্রায় একশ বছর আগে গো-রক্ষার বিষয়ে হিন্দুদের একত্রীকরণ করা হয়েছিল। গুজরাটের হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে জন ব্রেমান খুবই মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করার যে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল তা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ অতীতে আমেদাবাদের মজদুর মহাজন সংঘের মত শ্রমিক সংগঠন—যা বহুবার গরীব এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ধরনের শ্রমিক সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটেছে কারণ ১৯৮০ সাল থেকে অসংখ্য বস্ত্র শিল্পের বন্ধ হয়ে ভারী শিল্পের পত্তনের জন্য।

এই পটভূমিকার পিছনে—বিশ্বায়ন কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দিয়েছে। ফলশ্রুতি যে অসংখ্য বেকার/বেরোজগারী সম্প্রদায় যা শহরতলী অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে—তাদের মধ্যে একটা শূন্যতার পরিবেশ এসেছে এবং শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির অভাবে দাঙ্গাবাজরা ঐ শূন্যতা পূরণে সফল হয়েছে।

❐

www.pathagar.com

# গোধরাকাণ্ড ঃ ক্রিয়া ও 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'-র স্বরূপ সন্ধান

—আবদুর রাউফ

গোধরাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে। ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়ে যায় নরেন্দ্র মোদী কথিত 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'। এই 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'-র নিখুঁত পরিকল্পনা দেখে তখন থেকেই বহু মানুষের মনে এর স্বরূপ নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। গোধরাকাণ্ডের ব্যাপারটাও রহস্যাবৃত বলে মনে হতে থাকে এই সংশয়ের কারণেই। ফলে শুরু হয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নামে সংঘটিত যাবতীয় মর্মান্তিক ঘটনাবলীসহ গোধরাকাণ্ডের রহস্যোন্মচনের প্রয়াস। 'সংবাদ প্রতিদিন' দৈনিকে আমার 'দৃষ্টিপাত' কলামে যথাক্রমে ৭ মার্চ, ১৪ মার্চ, ১৮ এপ্রিল, ২৫ এপ্রিল, ৯ মে ও ১১ জুলাই তারিখে প্রকাশিত রচনাগুলি সে ধরনেরই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফসল। সেইসব বয়ানের ধারাবাহিকতায় সত্যানুসন্ধানের যে মানসিক অভিযান রয়েছে সেটা এক সূত্রে পাঠকের দরবারে হাজির করার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের পরিকল্পনা। অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য এবং পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য ধারাবাহিক বয়ানগুলি প্রয়োজনানুসারে সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত।

(১)

২০০১ সালে ডিসেম্বর মাসে একটি ইংরেজী দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাতকারে মুম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হসবেট সুরেশ পোটা-র মতো কালা কানুনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে পোটোর মতো আইনের সাহায্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল কার্যকরী গোয়েন্দা তৎপরতা ও সতর্কতা। সরকার সেদিকে বেশি মনযোগ দিচ্ছে না কেন ?' মাননীয় বিচারপতির এই ধরনের কঠোর মন্তব্য আমাদের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানিকে আদৌ ভাবিয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু গোয়েন্দা তৎপরতা ও সতর্কতার (intelligence and vigilance) প্রশ্নে আদভানিজির দপ্তর কতখানি ব্যর্থ সে সম্পর্কে আমার মনে সংশয় আছে। প্রসংগক্রমে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে কারগিল যুদ্ধের আগে আমাদের সৈন্য বাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তরের আগাম খবরের কথা। কারগিলে পাকিস্তানি তৎপরতার খবরটা আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট বিলম্বে যে সময়ে অভিযান চালালে দেশের অভ্যন্তরে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ফায়দা উঠানো সম্ভব কর্তা ব্যক্তিরা আঘাত হানার জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেই সময়টা। ফলে শত্রুপক্ষ বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল এবং আমাদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছিল। এই ধরনের নযীর থাকার কারণেই আমার সন্দেহ হয়, গোয়েন্দা রিপোর্ট ঠিক ঠিক থাকলেও আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা সাথে সাথে প্রতিরোধাত্মক তৎপরতা না দেখিয়ে হয়তো অন্য অংক কষতে বসেন।

এমন হতেই পারে সংসদ ভবনে হামলার আগাম খবর গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি এবং অন্যান্য কিছু সরকারী কর্তা ব্যক্তির কাছে ছিলই। কিন্তু তাঁরা এই হামলা থেকে অন্য ধরনের ফায়দা উঠানোর অংক কষেছিলেন। ক্ষয়ক্ষতি যাতে বেশি না হয় সেজন্য তাঁরা আঁটঘাট বেঁধে তৈরিই ছিলেন। হামলা যে মূলত পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ঘটাবে এটাও তাদের জানা ছিল। হামলার আগেই এসব সন্ত্রাসবাদীকে কব্জা করা যেত। কিন্তু সেটা না করে সংসদ ভবনে হামলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল। তারা যাতে সহজেই সংসদ ভবন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সে জন্য স্বয়ং গৃহমন্ত্রীর দপ্তরের স্টিকার তাদের গাড়ির জন্য সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে গুলিবর্ষণ শুরু করলে প্রতিটি হামলাকারীকেই তৎপরতার সাথে হত্যা করা হয়েছিল। এত বড় দুঃসাহসিক হামলার ঘটনায় যা ঘটতে পারতো সে তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। কিন্তু বিশ্বের দরবারে বিশেষ করে আমেরিকার কাছে যে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সেটা পৌঁছে দেওয়া ঠিকই সম্ভব হয়েছিল। মার্কিন কর্তাদের বুঝিয়ে দেয়া গিয়েছিল সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে পাকিস্তান কিছুতেই নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারে না। তাছাড়া পোটার মতো কালা অর্ডিন্যান্সকে কালা কানুনে রূপান্তরিত করার প্রশ্নে বিরোধী পক্ষের যে প্রবল আপত্তি তার নৈতিক ভিত্তিটাও বরবাদ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। সত্যি সত্যি এভাবেই যদি অংক কষে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আদভানিজির দপ্তরের প্রশংসা না করে উপায় থাকে না।

আমার ধারণা, গুজরাটের গোধরা রেলস্টেশন কিংবা এই ধরনের অন্য কোনো স্টেশনে রামসেবকভর্তি রেলবগি যে জ্বালানো হতে পারে এখবরও গোয়েন্দা তৎপরতার সুবাদে লালকৃষ্ণ আদভানি এবং নরেন্দ্র মোদীদের অজানা ছিল না। রামসেবকেরা যেভাবে বিগত কয়েক মাস থেকেই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা সৃষ্টি করে উত্তেজক শ্লোগান দিতে দিতে দলে দলে অযোধ্যার যজ্ঞভূমিতে যাতায়াত করছিল তাতে এর প্রতিক্রিয়ায় কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু যে ঘটে যেতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন ছিল না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাটের রামসেবকরাই দলে ভারী ছিল। হয়তো এই রাজ্য সংঘ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পরোক্ষভাবে হলেও

www.pathagar.com

রামসেবকরা বেশি উৎসাহিত হয়েছিল। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য, ভারতের ধনী মুসলমানদের একটা বড় অংশ গুজরাটি হওয়ায় তাদের প্রতি সাধারণ হিন্দু বেকার তরুণদের বিদ্বিষ্ট মনোভাবও ছিল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অধিকতর প্রকট। সংঘ পরিবার কী ধরনের প্রচার কৌশলের দ্বারা এই ধরনের বেকার হিন্দু তরুণদের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মুসলিমদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলে সে খবর ওয়াকিবহাল পাঠকদের নিশ্চয়ই জানা আছে। ফলে গুজরাটের রামসেবকদের সাম্প্রতিক প্ররোচনা সৃষ্টিকারী শ্লোগান ছিল আরও চড়া মাত্রার। অযোধ্যার যজ্ঞক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণে অতুৎসাহ সংখ্যার দিক থেকে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচারের প্রশ্নে এতটাই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়েছিল যে, কিছু একটা অঘটন ঘটার সম্ভাবনা প্রতিটি মুহূর্তে প্রকট হয়ে উঠছিল। এই রকম একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গোধরা রেলস্টেশনের কাছাকাছি কিছু মুসলিম বসতির উপর হামলা হয়েছিল, একটি মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল রেলবগি জ্বালানোর ঘটনা ঘটার কিছুদিন আগেই। এতসবের পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী কি কোনো তৎপরতাই দেখায়নি ? মসজিদ জ্বালানোর প্রতিক্রিয়ায় কিছু একটা যে ঘটতেই পারে একথা নিশ্চয়ই তারা অনুমান করতে পেরেছিল। সে অনুমানের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে রামসেবকভর্তি রেলবগি জ্বালানোর পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের আগাম খবর তারা পেয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছুই থাকতে পারে না।

বস্তুত লালকৃষ্ণ আদভানি এবং নরেন্দ্র মোদীরা যে এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের খবর আগেই জানতেন—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেইও। কিন্তু ষড়যন্ত্র যত বীভৎসই হোক, সেটাকে অগ্রিম বানচাল করার কথা তাঁরা ভাবেননি। এক্ষেত্রেও সংসদ ভবনে হামলা ঘটতে দেওয়ার মতই এই বর্বরোচিত ঘটনাটাও ঘটে যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেছেন রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোর জন্য অংক তাঁদের মাথায় ছিল বলেই। এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেল তার ব্যাকল্যাশ বা 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' হিসাবে কী কী ঘটতে পারে কিংবা কী কী ঘটালে সেগুলিকে অনায়াসেই গণরোষের স্বাভাবিক বিস্ফোরণ বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে সে অংক তাঁরা আগেই কষে ফেলেছিলেন। উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে তাদের সাম্প্রতিক পরাজয়ের মূলে মুসলিম ভোটদাতাদের বিমুখতা একটি অন্যতম কারণ হওয়ায় তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির বানানোর ব্যাপারে মুসলিম নেতাদের বাগে আনার কোনো সম্ভাবনা না থাকাটাও তাদের ক্রুদ্ধ করে তুলছিল ক্রমেই। পরবর্তী নির্বাচনে গুজরাটও যে বিজেপি-র হাতছাড়া হবেই এবং সেটা

www.pathagar.com

চলে যাবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে এবং এই পালা বদলে গুজরাটি মুসলমানদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে থাকবেই সেই সম্ভাবনাও তাঁদের ক্রোধের মাত্রাকে যারপরনাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। নির্বাচনী তহবিলে ধনী গুজরাটি মুসলমানদের টাকা বিজেপি পায় না, পায় কংগ্রেস, এটাও তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই গোধরায় রামসেব ভর্তি রেলগাড়ি জ্বালানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁরা গুজরাটি মুসলমানদের ধনে, প্রাণে বধ করে একটা যুৎসই শিক্ষা দেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, গুজরাটে মুসলিম নিধন গোধরার জঘন্য ষড়যন্ত্রের উপরে আরও উচ্চমার্গের মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের অংকটা আগে থেকে কষা ছিল বলেই শুরু থেকেই আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমানদের ব্যবসা স্থলগুলি। দাঙ্গা ফ্যাসাদের মত গোলমেলে ঘটনা ঘটতে শুরু করলে লুম্পেনরা তার সুযোগ নেয় বলে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে। কিন্তু বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করে যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে তার অংক একেবারে স্বচ্ছ। তারা খুব পরিকল্পিতভাবে রিয়েল এস্টেটের বাজারে যেগুলোকে বলা হয় প্রাইম ল্যাণ্ড সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছে। যেগুলোক বলা যায় লুক্রেটিভ ব্যবসা মুসলমানদের সেসব ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় প্রয়াস চালানো হয়েছে। রামসেবকভর্তি রেলবগি জ্বালানোর অজুহতে দেখিয়ে এবার জীবন্ত পুড়িয়ে মারার উপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। যাতে আতঙ্ক এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়কে বহুকাল গ্রাস করে রাখতে পারে। অবশ্য একথাও ঠিক যারা রেলবগি জ্বালিয়ে ছিল তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল রামসেবকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। কিন্তু ভারতের মত হিন্দু প্রধান দেশে এই আতঙ্কের তুলনায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের মনের আতঙ্ক যে অনেক বেশি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে—একথা যাঁরা গোধরার ষড়যন্ত্রটি জানা সত্ত্বেও সেটা ঘটতে দিয়ে উচ্চমার্গীয় ষড়যন্ত্রটি রচনা করেছিলেন তাঁরা ভালই বুঝেন।

উল্লেখিত উচ্চমার্গীয় ষড়যন্ত্রটির যাঁরা রূপকার তাঁদের অন্যতম কর্মসূচি ছিল গুজরাটি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরও খতম করে দেওয়া। সংখ্যায় এইসব বুদ্ধিজীবী মুষ্টিমেয় হলেও তাঁদের কার্যকরী ভূমিকার কারণে ধ্বংসস্তুপ থেকেই মুসলমানদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সবসময়েই থেকে যায়। তাই একের পর এক আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরাও। গুজরাটি হাইকোর্টের সিটিং বিচারপতি মুস্তাক কাদের থাকতেন হিন্দু এলিটদের সাথে একই পল্লীতে। হাইকোর্টের যিনি বিচারপতি, যিনি ভারতের সংবিধানের কাছে কোনও রকম ভয়ভীতির কারণে মাথা নত না করে যে কোনও মামলার সুবিচার

www.pathagar.com

করার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, তাঁকেও মাথানত করে প্রাণের ভয়ে হিন্দু এলিট এলাকা ছেড়ে মুসলিম প্রধান এলাকায় পালাতে হয়েছে। তাঁকে এভাবে পালানোর পরামর্শ দিয়েছেন গুজরাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্বয়ং। শুধু এই ঘটনাতেই প্রমাণিত হয় নরেন্দ্র মোদীর সরকার নিউটনের সূত্রের ওপর (প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবেই) সব দায় চাপিয়ে দিয়ে কতখানি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিল। ফলে সেই মুসলিম অধ্যাপক যিনি মুসলমানদের ঘেটোয় বাস করার প্রবণতার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে হিন্দু এলাকায় বাড়ি করেছিলেন তাঁকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক মূল্য অবশ্য দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন এমপি সত্তরোর্ধ্ব গান্ধীবাদী নেতা এহসান জাফরি। গান্ধীজীর শিক্ষাকে শিরোধার্য করার ফলে যিনি পালাতে শেখেননি। তাঁকে সপরিবারে বেশ পরিকল্পিতভাবেই যে হত্যা করা হয়েছে এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। রেলবগি জ্বালানোর দায়টা যে এখন যেনতেন প্রকারণে কংগ্রেসিদের উপরেই চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলছে—এর মধ্যে যে ভবিষ্যত পরিকল্পনাটা রয়েছে এহসান জাফরিকে জ্বালিয়ে মারাটা সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদের এভাবেই নেতৃত্বের দিক থেকে দুর্বল করে ফেলাটা এই ধরনের নির্বাচিত হত্যাযজ্ঞের দ্বারা বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে।

এসব ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যেসব দুষ্কৃতী রামসেবকদের মনে আতঙ্ক জাগানোর জন্য গোধরায় রেলবগি জ্বালানোর মতো মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেয়েছিল তারা কতখানি নির্বোধ। তাদের জঘন্য ষড়যন্ত্রটাকে রূপায়িত হতে দিয়ে সেটার ব্যাকল্যাশের অংক আগে থেকে কষে রেখে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার অজুহাতে দেখিয়ে গুজরাটি মুসলমানাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটিয়ে, ধনে-প্রাণে নিঃশেষ করতে করতে যারা বেঁচে রইলো তাদেরও যে মুমূর্ষ করে ফেলা হতে পারে—এসব কথা গোধরা দুষ্কৃতিদের অনুমান করতে পারার কথা না। এদিক থেকে বিচার করলে লালকৃষ্ণ আদভানি কিংবা নরেন্দ্র মোদীদের সাফল্যের কোনো তুলনা হয় না।

(২)

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগের বছর ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন'—পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'অন্যায়কারীর আত্মীয়স্বজন কিংবা তার স্বধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কাপুরুষের কাজ।' পৃ. ৪০৮, ১৭-১১-১৯৪৬ বলাই বাহুল্য, আজ ছাপান্ন বছর

www.pathagar.com

পরেও জাতির জনকের এহেন তিরস্কার। আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ কোন কাজে আসেনি। বিশেষ করে যে কোন সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে কাপুরুষের ভূমিকা নিতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। লজ্জা থাকলে গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনা ঘটতো না। সবচেয়ে বেদনার কথা, যে মহামানবের মুখ দিয়ে এই তিরস্কারের বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর জন্মভূমি এ গুজরাট রাজ্যে। তাঁকে নিয়ে গুজরাটবাসীর শ্লাঘাবোধের গভীরতা থাকলে নিধনযজ্ঞ কিছুতেই এত ব্যাপক, এত মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারতো না। একথাগুলি বলার পর স্বভাবতই পাঠকদের মনে সংশয় জাগতে পারে গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'কাপুরুষ' হিসাবে কাদের চিহ্নিত করতে চাওয়া হচ্ছে।

আমার বাকি কথাগুলি শোনার আগে যেসব বুদ্ধিমান পাঠক অনিবার্য সিদ্ধান্তটা অনুমান করে নিতে চাইবেন তাঁদের সবিনয়ে বলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আমি কিন্তু আপনাদের মত অতটা নিঃসংশয় নই। সাধারণভাবে গোধরা রেলস্টেশনে যারা করসেবক ভর্তি রেলবগি জ্বালিয়ে ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা গুজরাটি সংখ্যালঘুদের ধনেপ্রাণে নিধন করার যজ্ঞে মেতে উঠেছিল তাদের সবাইকেই কাপুরুষের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কিন্তু বিচার ধারাকে এতটাই সরলরৈখিক করে তোলা কি সম্ভব ? সম্ভব হত যদি করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাটিকে নেহাৎই ধর্মীয় বিদ্বেষের গণবিস্ফোরণ বলে চিহ্নিত করা যেত। বিগত কয়েক বছর ধরে এই বিদ্বেষটাকে অবশ্য উসকে দিচ্ছিল সংঘ পরিবারের সদস্যরাই। বিগত শতকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুজরাট যে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মাত্র সেই ধারণাটাই মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চালান হচ্ছিল। এই সময় বরোদার দিক থেকে আমেদাবাদের প্রবেশ পথে এমন একটি বিশাল হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল যাতে লেখা ছিল 'ভারতের প্রথম হিন্দুরাজ্যে স্বাগত'। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সাল থেকে এই 'আদর্শ' 'হিন্দু রাজ্যটি' বিজেপির শাসনাধীনে আসার পর সরকারী কর্মচারীদের আরএসএস-এ যোগদান নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেওয়া হয়। এই বিপজ্জনক নজির সেই সময় কি পরিমাণ রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ হয়েছিল বহু পাঠকের সে কথা স্মরণে থাকতে পারে। এই রাজ্যেই সমস্ত সরকারী এবং অনুমোদিত বেসরকারী স্কুলে সংঘ পরিবারের অন্যতম মুখপাত্র 'সাধনা'র গ্রাহক হওয়ার জন্য বিধিসম্মত সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। তাছাড়া এই রাজ্যেই প্রথম পুলিশকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সর্বত্র অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মুসলমানদের তালিকা তৈরি করে তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য। সাম্প্রতিক গণনিধন যজ্ঞে সেই নথি কাজে লাগানোর বহু প্রমাণ বেশ প্রকট।

www.pathagar.com

গণনিধন যজ্ঞের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য যাদের দায়ী করা হয়েছে তাদের প্রকৃত পরিচয় বিচার বিভাগীয় তদন্তের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় নিশ্চিত করে এই মুহূর্তে কিছু বলা হয়তো ঠিক নয়। কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে রেলবগিতে আগুন দিয়ে করসেবকদের সাথে নারী ও শিশুদের পুড়িয়ে মেরে কাপুরুষোচিত হিংস্রতা প্রদর্শন করেছিল গোধরার স্থানীয় সংখ্যালঘুরাই। সংখ্যালঘুদের সাধারণ মানুষেরা সবাই মহাপুরুষ হবে এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই কেউই করে না। তাই কোন্ পরিস্থিতিতে এই কাপুরুষদের বোধের বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেটা অনুসন্ধান না করে উপায় নেই। এই প্রসংগে আগের অনুচ্ছেদেরই উল্লেখ করেছি 'আদর্শ হিন্দু রাজ্য' হিসাবে গুজরাটকে মডেল করে তোলার অত্যুৎসাহে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ ছিল সমৃদ্ধ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র অংশের মনে বিদ্বেষভাবকে ক্রমেই তীব্রতা দেওয়া। এ কাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাদের আনুকূল্য করেছিল। সর্বত্রই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা সমালোচনা ও নিন্দার বিষয়বস্তু হয়ে উঠায় সংঘ পরিবারের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এই ইস্যুটাকে তারা চাতুর্যের সাথে ব্যবহার করে গুজরাটের হিন্দুদের মনে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিবাদের প্রশ্নেও তামাম মুসলিম সম্প্রদায়কে বাবরের আওলাদ বলে চিহ্নিত করে এই ঘৃণার ভাবকে আরও তীব্রতা প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অযোধ্যার রাম জন্মভূমিতে মন্দির বানানোর ব্যাপারে গুজরাটি করসেবকদের অতুৎসাহ এবং সংখ্যাধিক্যের মূলেও প্রকৃত রামভক্তির বদলে এই তীব্র ঘৃণা অনেকাংশে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকতে পারে। যে কারণে রেল যাত্রাকালে স্টেশনে স্টেশনে পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেলেই—'মন্দির কা নির্মাণ করো, বাবর কি আওলাদ কো বাহার করো'—শ্লোগান দেয়ার ব্যাপারে করসেবকদের উন্মাদনা ছিল যে কোনও শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। তাছাড়া বিভিন্ন স্টেশনে বিশেষ করে মুসলিম হকারদের সাথে দুর্ব্যবহার করার ঘটনা তো ছিলই। এমনকি যেদিন সবরমতি এক্সপ্রেসের কামরা জ্বালানো হয় সেদিনও আসল ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গোধরা স্টেশন থেকে ৭৫ কিমি দূরবর্তী দাহোড় স্টেশন থেকে। সেই স্টেশনে ভোর সাড়ে পাঁচটা/ছটার সময় ট্রেনটি পৌঁছলে করসেবকরা সেখানকার একটি স্টলে চা-বিস্কুক খেয়ে দাম দেওয়া নিয়ে স্টলের উপর যদৃচ্ছ ভাঙচুর চালায়। স্টল মালিক স্থানীয় থানায় নালিশ নথিভুক্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দেয়। তারপরেই সবরমতি

www.pathagar.com

এক্সপ্রেস থামে গোধরা স্টেশনে। সময় তখন সকাল সাতটা থেকে সোয়া সাতটা। করসেবকরা এবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আর একটি স্টলে চা খেতে গিয়ে সেখানকার টুপি-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কর্মচারীর সাথে ঝামেলা বাধায়। কিছুটা কথা কাটাকাটি হওয়ার পরেই করসেবকরা ওই বৃদ্ধের দাড়ি ধরে টান মারে এবং তাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধর ষোড়শ বর্ষীয় কন্যা পিতাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে এবং করসবেকদের হাতে পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। করসেবকরা সেই সুযোগে বৃদ্ধকে ছেড়ে ওই তরুণীকে টেনে নিয়ে এস-৬ কামরায় উঠে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু করে। বৃদ্ধ আকুলভাবে ওই কামরার দরজায় করাঘাত করতে করতে তার মেয়েকে ছেড়ে দেয়ার প্রার্থনা জানাতে জানাতে প্লাটফর্ম দিয়ে দৌড়াতে থাকে। এর মধ্যে ট্রেনের শেষ কামরাটি প্লাটফর্ম ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অন্য দুজন ভেণ্ডার দৌড়ে শেষ কামরায় উঠে চেন টেনে দেয়। কিন্তু ট্রেনটি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার আগে গোধরা স্টেশন থেকে কিছু কম/বেশী এক কিমি বেরিয়ে যায়। তারপর ওই দুজন ভেণ্ডার এস-৬ কামরার কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু করসেবকরা তরুণীটিকে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, কামরায় জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ওই কামরার চারপাশে স্থানীয় লোক জমা হতে শুরু করে। ঘটনাটি শোনার পর তারা ওই বন্ধ কামরার উপর ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু করে। গণরোষ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে কিছু দুষ্কৃতিও নিশ্চয়ই জনতার ভিড়ে জুটে গিয়ে থাকবে। তারা কাছাকাছি সিগনাল ফাঁড়িয়া থেকে চলতি ট্রাক অটো-রিকশা ইত্যাদি থামিয়ে পেট্রোল ডিজেল সংগ্রহ করে এনে কামরাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হয়তো এই দুষ্কৃতিরা আগে থেকেই এই রকম একটি হিংস্র ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। তারা করসেবকদের হঠকারিতার ফলে উদ্ধৃত মোক্ষম সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ফেলে। করসেবকদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কথা জনৈক পত্রলেখক স্টেটসম্যানের পত্রিকায় গত ৭ মার্চ তারিখে বিস্তারিতভাবে লিখে জানিয়েছেন।

বিচারবিভাগীয় তদন্তে ওই পত্রলেখককেও সাক্ষী করে তাঁর বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা উচিত। তবেই বুঝা যাবে লালকৃষ্ণ আদভানি এবং নরেন্দ্র মোদী কথিত 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' আসলে কোথা থেকে শুরু হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই দাবি করেছেন এই 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত' দাঙ্গাটিকে নাকি সবচেয়ে কম সময় অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে গুজরাটের কোনও দাঙ্গাই নাকি এত তাড়াতাড়ি থামেনি। যুক্তি

www.pathagar.com

হিসাবে কথাটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু একথাও ঠিক, এবার সংখ্যালঘুদের ধন ও প্রাণের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এমনটি আর কখনো হয়নি। আমেদাবাদের পুলিশকে এতখানি নিষ্ক্রিয় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাঙ্গাবাজদের এমন সক্রিয় সহযোগী)। আগে আর কখনো দেখা যায়নি। তার চেয়েও কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় প্রতিরোধহীন সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ধরনটা ছিল এতটাই নিখুঁত বিশেষ করে তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রগুলি ধ্বংস করে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। এইসব দোকানপাট, ফ্যাকটরি, বেকারি ইত্যাদি ধ্বংস করার সময় পাশ্ববর্তী হিন্দুদের সম্পত্তির যাতে ক্ষতি না হয় সে সম্পর্কে পরিকল্পনাও ছিল অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত। সমৃদ্ধ সংখ্যালঘু ব্যবসাদার ও কারখানা মালিকদের সম্পত্তি দ্রুত চিহ্নিত করার ব্যাপারে আগে থেকে থানায় নথিভুক্ত তথ্যের সাহায্য যে পাওয়া গিয়েছিল এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সংখ্যালঘুদের দেউলিয়া করে ফেলার কাজটা অতি দ্রুত সেরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই নিখুঁত পূর্ব পরিকল্পনাটা যাতে ধরা পড়ে না যায় সেজন্য কোথাও কোথাও বেছে বেছে ধরপাকড় করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় গুলিও চালানো হয়েছে। গুলি চালানোর ব্যাপারটা অবশ্য সংখ্যালঘুদের সামান্যতম প্রতিরোধটুকুও গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যার ফলে নিহতদের মধ্যে নাকি সংখ্যালঘুদের সংখ্যাই বেশি। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে ওদের মধ্যেও আধিক্য রয়েছে নাকি সংখ্যালঘুদের। অন্তত দাঙ্গায় যারা বলি তাদের অভিযোগ সেই রকমই। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী আদভানিজি এখন অন্য রকম বলেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ যে কেবলমাত্র বিশৃঙ্খল গণরোষের বিস্ফোরণের ব্যাপার হতে পারে না একথাটাই তিনি মানতেই চাইছেন না। তিনি কেবল অল্প সময়ে দাঙ্গা থামিয়ে দেয়ার ব্যাপারটাই বারবার আউড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গার উদ্দেশ্য যদি এটা হয়—গুজরাটের সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে দেওয়া এবং তাদের কয়েকশো মানুষকে ক্রমাগত আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে গোটা সম্প্রদায়টাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলা তাহলে অল্প সময়ে স্থায়ী হলেও সেই উদ্দেশ্য যে ষোলআনাই সফল এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

সংঘ পরিবারের তৃতীয় উদ্দেশ্য হয়ত ছিল দাঙ্গাবিধ্বস্ত, আতঙ্কপীড়িত মুসলমানের সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য করা। গুজরাটের সীমান্তেই রয়েছে পাকিস্তান। সেখানকার সিন্ধি মুসলমানদের সাথে গুজরাটি মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের আমাদের এখানকার ও বাংলাদেশের

www.pathagar.com

বাঙালিদের মতোই ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাযুজ্য রয়েছে গভীরভাবেই। কিন্তু তবুও গুজরাটি মুসলমানরা কখনই পাকিস্তান যেতে সম্মত হয়নি। দেশ ভাগের সূচনা পর্বেই ১৯৫০ সালে গুজরাটের আরএসএস ঘোষিতভাবে দাঙ্গা শুরু করেছিল মুসলমানদের পাকিস্তানে ঠেলে পাঠানোর জন্য। ১৯৫৩ সালেও তারা আমেদাবাদে, পুনে, নাসিক এবং মাংলিতে সম্প্রতি উৎসব ও মহররম উপলক্ষে দাঙ্গা বাধিয়েছিল ওই একই ঘোষিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এভাবে স্বাধীন ভারতে মোট ৯৮টি বড় দাঙ্গার মধ্যে ১০টি ক্রমান্বয়ে বাধান হয়েছে গুজরাটে। কিন্তু এসব দাঙ্গায় হাজার ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে, শয়ে শয়ে বলিদান দিয়েও গুজরাটি মুসলমানরা স্বদেশভূমি ত্যাগ করে পাকিস্তান যেতে সম্মত হয়নি। এবার তাদের উপর অত্যাচার আগের সমস্ত দাঙ্গার নজির ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষণস্থায়ী হলেও পূর্বপরিকল্পিত দাঙ্গায় অর্থনৈতিক দিক থেকে এবার তাদের যেভাবে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে, যেভাবে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হয়েছে, তাতে এরপরেও কোন ভরসায় তারা হিন্দুস্তানে থাকতে চায় সংঘ পরিবারের তরফে সেটা দেখে নেওয়ার একটা জিদ থাকা বিচিত্র নয়। সম্ভবত সেই কারণেই তারা আওয়াজ উঠিয়েছিল 'মন্দির কা নির্মাণ করো, বাবর কি আওলাদ কো বাহার করো'। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এতসবের পরেও ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া উন্মূলিত মুসলমানদের কেউ কেউ কাতর কণ্ঠে জানতে চেয়েছেন, 'আমরা সবাই হিন্দুস্তানী, কেন আপনারা আমাদের সঙ্গে এই রকম আচরণ করছেন?' এখন পর্যন্ত একজন মুসলমানও পাকিস্তান চলে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেনি। এরপরেও কি তাদের পাকিস্তান প্রেমী বদনামটা ঘুচবে না?

(৩)

নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগকে সম্প্রতি ইস্যু করে তুলেছেন অনেকেই। তেলেগু দেশম পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো এনডিএ-র কিছু কিছু শরীক দল তো আছেই। এ ইস্যুতে সংসদ অচল হয়ে যাচ্ছে বারবার। বিজেপি কিন্তু পিছু হঠার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। তারা নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল রাখতে পদ্ধপরিকর। অপরদিকে তথাকথিত সেক্যুলার পার্টিগুলিও এই পদত্যাগের দাবিতে অনড় থেকে সেক্যুলারিজমের প্রতি তাদের নিষ্ঠা জাহির করতে ব্যস্ত। ফলে সংসদ ভবনে নাটক এখন জমজমাট। পুরো ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক নাটক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না, বিরোধীপক্ষ যদি নরেন্দ্র মোদীকে হঠানোর নাটকে বিজয়ীর শিরোপা পেয়ে যায় তাহলে গুজরাটে পরিস্থিতির কতখানি রদবদল ঘটবে।

www.pathagar.com

বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে সরাতে বাধ্য হলে তারা তাঁর জায়গায় তাদের দলেরই অন্য একজনকে বসাবে। তিনি যে নরেন্দ্র মোদীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না তার কী গ্যারান্টি আছে ? তাছাড়া কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অন্যান্য মন্ত্রীরা, বিশেষ করে বর্তমান পুলিশ মন্ত্রী এবং ত্রাণমন্ত্রী, যাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নির্লজ্জ নিদর্শন ইতিমধ্যেই নানা ঘটনায় প্রকট হয়েছে, তাঁরা তো থাকছেনই। কারণ তাঁদের পদত্যাগ কেউ দাবি করেনি। ফলে গুজরাটি মুসলমানদের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার যেমন চলছিল তেমন তো চলতেই থাকবে। মাঝ থেকে নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের ফলে ফায়দা যে কার হবে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

বরং একথাই বলা যায়, আখেরে ফায়দা হবে বিজেপি-ইর। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে থেকে নরেন্দ্র মোদী যেভাবে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে মদত জুগিয়েছেন তাঁতে তাঁর বিরুদ্ধে সর্বত্র যে রকম ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে সেটা বিজেপি-র ভাবমূর্তির গায়ে কলঙ্ক লেপনের কারণ ঘটাচ্ছেই। মোদীকে সরিয়ে অন্য কাউকে আনলে বিজেপি নেতাদের তরফে কৈফিয়ত দেওয়ার সুবিধা হয়। তাঁরা তখন বলতে পারেন, মোদী আসলে নির্দোষ, কিন্তু ভুলভাবে হলেও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছিল বলে আমরা তাঁকে সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তিনি যদি জনতার রায়ে বিজয়ী হয়ে পুনরায় ফিরে আসেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর আসন তাঁকেই দেয়া হবে। অপরদিকে মুসলিম নিধনে মদত দিয়ে মোদী যে ঘাতক বাহিনীর কাছে হিরো হয়ে উঠেছেন তাদের বোঝানো যায় আপাতত মোদীকে সংগঠন গোছানোর দায়িত্বে ফিরিয়ে দেওয়া হল যাতে নির্বাচনে জেতাটা সুনিশ্চিত করা যায়। বিজেপি নেতারা যদি সত্যিই নিজেদের অহমিকা জয় করে এই রকম পজিশন নিয়ে ফেলেন সেই অবস্থায় মোদীর পদত্যাগের দাবিদারেরা কী করবেন ? সংসদে বাগযুদ্ধের খেলায় বিজয়ীর শিরোপা নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা ছাড়া তখন তাঁদের আর কী-ই করার থাকবে ? তাতে গুজরাটে নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়া উন্মূলিত সংখ্যালঘুদের দুর্দশায় কিছুমাত্র লাঘব ঘটবে কী ?

আসলে নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ নয়, গুজরাটে প্রথম দফা দাবি হওয়া উচিত গণ-হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদান। এক্ষেত্রে অবশ্যই গোধরাসহ সমগ্র গুজরাটের গণ-হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের জাত-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। সে জন্যে প্রয়োজনে সিবিআইয়ের মত কোন কেন্দ্রীয় আইন রক্ষক সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় আইনানুগ কাজ করার

www.pathagar.com

অবাধ সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয় দফায় দাবি হওয়া উচিত, গণহত্যা-যজ্ঞ থেকে যারা ঘটনাচক্রে রেহাই পাওয়া প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য চাই যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবে যাদের মন কলুষিত সেই গুজরাট পুলিশের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। এই রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকেই অভিযোগ নথিভুক্তকরণের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় দফার দাবি হওয়া চাই সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী, সম্পত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিসাধন করা হয়েছে তার নিরপেক্ষ বাস্তবানুগ সমীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ। চতুর্থ দফায় যেমন মসজিদ, দরগা, ইদগাহ ইত্যাদি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলির তালিকা তৈরি করে পুনর্নির্মাণের দাবি তোলাটাও বাঞ্ছনীয়। তাছাড়াও গুজরাটের সমগ্র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত সুপ্রিম কোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতির অধীনে। তা না করে বর্তমানে গুজরাট হাইকোর্টের যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির উপর এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িক বায়াসের কারণে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। একটা টাডা আইনে ধৃত ছয়জন মুসলমানকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই এই বিচারপতি শ্রী কে জি শাহ ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। যে হুকুম পুরোপুরি রদ করে সুপ্রিম কোর্ট ওই ছয়জন আবাসিককেই বেকসুর ছাড়পত্র দিয়ে দেন এবং সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে তিরস্কার করেন। (দ্রষ্টব্য A. I. R. 1991 S. C. Page 56)। এই রকম একজন বিচারপতির অধীনে তদন্ত যে নিরপেক্ষ হতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত কোনও বিচারপতির অধীনে তদন্তের দাবি হওয়া উচিত পঞ্চম দাবি।

এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি এই পাঁচ দফা দাবি না তুলে মোদীর পদত্যাগ নিয়ে মাতামাতি করাটা সেক্যুলারিজমের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শনের গিমিক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের দাবি পূরণ হলেও গণ হত্যাজনিত সন্ত্রাসকবলিত গুজরাটের সংখ্যালঘুদের মনে বিন্দুমাত্রও নিরাপত্তা বোধ জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। খেয়াল রাখা দরকার গুজরাটে তাদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত গণহত্যা এবং বীভৎস যৌন সন্ত্রাস চালিয়ে ছিল যারা তারা একটি সুসংগঠিত ফ্যাসিস্ত চরিত্রের লুম্পেন বাহিনী। তিন লক্ষ লোকের এই বাহিনী তৈরি হয়েছিল ২০০১ সালের ১ জুলাই থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে। যার মধ্যে এমন ৬৫,০০০ ত্রিশূলধারী আছে যারা বেতনভোগী সর্বক্ষণের কর্মী। এসব বেতনভুক্ত কর্মীদের নিয়ে বজরং দল দপ্তর বসিয়েছে গুজরাটের বেশির ভাগ গ্রামে, শহরের মহল্লায় মহল্লায়, থানা ও মহকুমা স্তরে এবং জেলায় জেলায়।

www.pathagar.com

তথ্যগুলি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে সরবরাহ করেছেন বজরং দলের কেন্দ্রীয় ইউনিটের ভাইস প্রেসিডেন্ট, গুজরাটে বজরং দলের প্রতিষ্ঠাতা হরেশভাই ভাট স্বয়ং। এ তো গেল শুধু বজরং দলের হিসাব। এর চেয়েও বৃহদায়তন সংগঠনের নেটওয়ার্ক রয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। সমগ্র গুজরাট জুড়ে এই সংগঠনের শাখা-প্রশাখা এবং সশস্ত্র সর্বক্ষণের কর্মী বজরং দলের তুলনায় বেশি বই তো কম নয়। যে কারণে যে কোনও মুসলিম মহল্লা আক্রমণ করে গণহত্যা চালানোর জন্য লরি এবং মেটাডোর সহযোগে দশ, পনেরো, বিশ হাজার মারমুখি সশস্ত্র লুম্পেন জড়ো করে ফেলা এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে তাদের পরিচালনা করা বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের পক্ষে কোনও কঠিন কাজ ছিল না। তারা জড়ো হত 'জয় ভারতমাতাকি' আওয়াজ তুলে এবং 'হায় রে মিঞা হায় হায়' শ্লোগান দিতে দিতে। পুলিশ প্রশাসনের প্রশ্রয় যে তারা পাচ্ছে সেটাও তারা বুক ফুলিয়েই জানান দিত 'ইয়ে অন্দর কি বাত হায় পুলিশ হামারে সাথ হ্যায়' শ্লোগানের মাধ্যমে।

গোটা গুজরাট রাজ্যজুড়ে এই রকম একটা ফ্যাসিস্ত লুম্পেন বাহিনী গড়ে তুলতে যারা সক্ষম হয়েছে তাদের হাতে শুধু যে সংখ্যালঘুরাই বিপন্ন এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। এই রকম একটা সুসংগঠিত বাহিনী যাদের হাতে আছে তাদের পিছনে পুলিশি প্রশ্রয় অব্যাহত থাকলে কেবলমাত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই তারা যে কোন নির্বাচন জিতে নিতে পারে। তাতে বাদ সাধতে চাইলে গুজরাটে সেক্যুলার পার্টিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়াটা কিছু বিচিত্র নয়। যারা সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ চালাতে পারে তারা হিন্দুত্ববাদী নেতাদের নির্দেশে সেক্যুলারপন্থী পার্টিগুলির কর্মী-সমর্থক এমন কি নেতাদেরও নিধনযজ্ঞ মেতে উঠলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। যে কোনও মুহূর্তেই তারা এই কাজে নেমে পড়তে পারে সে কথা যেসব গণমাধ্যম এবং সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা সেক্যুলার মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিয়ে চলতে চাইছে তাদের প্রতিনিধিদের উপর হামলা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। মেধা পাটেকারের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয়া নেত্রীর চুলের মুঠি ধরে যেভাবে দুঃশাসনের কায়দায় পীড়ন করা হয়েছে তাতে ধরেই নেওয়া যায় এই ফ্যাসিস্ত লুম্পেন বাহিনীর অসাধ্য কিছুই নেই।

তাই বলছিলাম, গুজরাটে গণহত্যা যজ্ঞের যারা প্রকৃত নায়ক, যারা আসল ষড়যন্ত্রকারী তাদের চিহ্নিতকরণ এবং শাস্তি বিধান অত্যন্ত জরুরি। সেটা না করতে পারলে সংঘ পরিবার দ্বারা সংগঠিত ফ্যাসিস্ত লুম্পেন বাহিনীর বর্ধমান

www.pathagar.com

বেপরোয়া মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। অথচ এ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বিজেপি বিরোধী সেক্যুলার পার্টিগুলি এবং পার্টির বাইরে সেক্যুলার মানবতাবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন কারোই নিস্তার নেই। সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও আক্রান্ত হবেই। তাই ইতিমধ্যেই যে অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেছে তার প্রতিবিধানের দাবিগুলিই বিরোধীপক্ষের মুখ্য দাবি হয়ে উঠা বাঞ্ছনীয়। মোদী অপসারণ সে ধরনের কোনও দাবিই নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন্দ্রেও গৃহমন্ত্রীর দপ্তর বিজেপি-র হাতে থাকায়, গুজরাটে বিজেপি সরকার যে অপরাধের সংঙ্গে জড়িত তার প্রতিবিধান কেমন করে সম্ভব ? এনডিএ-র শরীক দলগুলোর প্রকৃত ভূমিকা রয়েছে ঠিক এই জায়গাটাতেই। যেহেতু তারাও কেন্দ্রীয় সরকারেরই অংশ তাই উল্লিখিত পাঁচ দফা দাবির ব্যাপারে সরকারের উপর ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তারাই। বিরোধীপক্ষও ওই পাঁচ দফা দাবি মানার ব্যাপারে বাইরে থেকে চাপ দিতে থাকলে বিজেপিকে বাধ্য করার মত একটা পরিস্থিতি তৈরি করা যায়।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য করা যদি সম্ভব নাও হয় তবুও একটা নৈতিক চাপের মুখে ফেলে তাদের 'রাজধর্ম' পালনের বুজরুকি ফাঁস করে দেওয়া যায়। যে কাজটা এই দলটি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাদের দ্বারা সংগঠিত ফ্যাসিস্ত লুম্পেন বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। জনগণের ভিতর থেকে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে না পারলে সেক্যুলারিজমের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ দল কিংবা সেক্যুলার মানবতাবাদী ব্যক্তি কারোরই রেহাই নেই। মোদীর পদত্যাগের দাবি পূরণের দ্বারা জনগণের সেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব তো নয়ই, উপরন্তু তেমন সম্ভাবনার পথে বিজেপি-র বাগড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কারণ মোদী পদত্যাগ করলে গুজরাটে যে গণহত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়েছে তার নৈতিক দায় বিজেপির পক্ষে অনেকখানি ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হবে। তাই পদত্যাগ নয়, মোদীকে বিদায় করতে হবে হয় আইনি রাস্তায় শাস্তিদানের মাধ্যমে নয়তো জনগণের রায়ে।

## ৪

বিজেপি-র জাতীয় কমিটির গোয়া অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন যে, 'যে আগুনে গুজরাট আজ জ্বলছে তা প্রথমে লাগিয়েছিল কে ? গোধরাকাণ্ড যদি না ঘটতো তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে গুজরাট যা ঘটেছে তা ঘটতো না।' শুধু এটুকু বলেই তিনি থেমে যাননি। প্রধানমন্ত্রী কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন শুধু ভারতের নয় দুনিয়ার

www.pathagar.com

গোটা মুসলিম সমাজটাকেই। বলেছিলেন, মুসলমানরা নাকি কোথাও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায় না। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ফিরিস্তি আরও লম্বা ছিল।

বলাই বাহুল্য, সেদিন প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সম্পর্কে যে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন সেটা তাঁর কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ভাবনার ব্যাপার নয়। ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি বৃহদংশ মুসলমানদের সম্পর্কে যে রকম ধ্যান-ধারণা পোষণ করে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সেটাকেই ভাষা দিয়েছিলেন। তাই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তরফে জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বাস্তবভিত্তি অনুসন্ধান করার দায় এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বাস্তবভিত্তি থাকলে সেটা চিহ্নিত করা জরুরি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সারা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে যত বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটছে সে সবের একটা বড় অংশের নেতৃত্বে রয়েছে তেমন মানুষেরাই, ধর্মীয় পরিচয়ে যারা মুসলমান। তাদের কথা আলোচনার আগে দেশে দেশে যেসব অমুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

শুরু করা যায় আমাদের নিজেদের দেশ ভারত থেকে। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আলফা সদস্যদের সবাই হিন্দু। তারা ভারতের মূলধারার সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায় না কেন ? অসমের প্রসঙ্গ এলেই চলে আসে বোড়ো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা। তারা আর যাই হোক মুসলমান নয় নিশ্চয়ই। নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ত্রিপুরার উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সবাই প্রায় খৃস্টান। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই রকম দুর্মতিতে পেয়ে বসেছে কেন ? মুসলিম প্রধান ইন্দোনেশিয়ার টিমোরি দ্বীপের খৃস্টনরা তো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন করে ফেলেছে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম শাসকরা শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতায় সায় দিলেও ফিলিপাইনের খৃস্টান শাসকরা সেখানকার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার দাবি মেনে নিতে সম্মত নয় মোটেই। চীনের মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন রাজ্যটির মুসলমানরাই শুধু নয়, তিব্বতের বৌদ্ধরাও চীনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে নারাজ। এই বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। প্রসঙ্গক্রমে আবার উল্লেখ করা যায় শ্রীলঙ্কার হিন্দুদের কথা। তারা এই দ্বীপ রাষ্ট্রটির বৌদ্ধ মূল ধারার সাথে মিলেমিশে থাকতে সম্মত নয়। অথচ এখানকার মুসলিম

www.pathagar.com

অধিবাসীদের আচরণ একেবারে বিপরীত। বৌদ্ধদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে তাদের কোনও অসুবিধাই কখনো হয়নি।

(৫)

জোর করে বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ করে ফেললে মুসলমানরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে—এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে বাধাটা কোথায় ? বাধা হয়েছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় চরিত্রে এবং সংবিধানে। আমাদের মিশ্র সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মাহাত্ম রক্ষার প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি আমাদের এই বৃহত্তম গণতন্ত্রে আইনের শাসন বলবৎ রাখার খাতিরে ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের জায়গায় (এই ভেঙে ফেলাটাও বেআইনি হওয়ায় যাঁরা এই ঘটনার মদতদাতা হিসাবে সেদিন অকুস্থলে হাজির ছিলেন তদন্ত কমিশনে ও আদালতের আইনি ঝক্কি আজও তাঁদের পিছু ধাওয়া করছে) যাতে বেআইনি কিছু না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপরিচালকদেরই। তাঁদের মধ্যে কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা আইনি দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিশ্বজনমতের দরবারে দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে অপারগ। যে অপারগতার কারণে আদালতের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত কেবল বাবরি মসজিদের জায়গাটাই নয়, মথুরার মসজিদ এবং বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ রক্ষার জন্যেও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে এই হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপরিচালকদেরই। এটা তাঁদের নিজেদের মুখরক্ষার দায়, আদপেই মুসলমানদের খুশি করার দায় নয়।

কিন্তু করসেবকরা সেসব কথা বুঝতে নারাজ। তাদের বদ্ধমূল ধারণা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের পথে মূল বাধা মুসলমানেরাই। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও ঘৃণার সীমা নেই। যে সবরমতি এক্সপ্রেসের কামরা গোধরায় জ্বালানো হয়েছিল তাতে সওয়ার করসেবকরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই। অন্যান্য অত্যাচারের সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের শ্লীলতাহানির সাক্ষী আছেন অনেকেই। এমনকি গোধরা স্টেশনেও মুসলিম নারীর লাঞ্ছনার কথা, জনৈক মুসলিম তরুণীকে জবরদস্তি এস-৬ কামরায় টেনে তোলার অপপ্রয়াসের কথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এ জিডিআর বা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্য সিতাংশু চক্রবর্তী, ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাতা রামিত্র মস্তিদার এবং তাঁদের অন্যান্য সহযোগীরা সরেজমিনে অকুস্থলে পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনে এসেছেন। সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব যদি এক্ষেত্রে মান্যতা পায় তাহলে স্বীকার করতেই হয় গোধরাকাণ্ডও প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে ক্রিয়া বলতে যা বুঝায় সেটার স্রষ্টা আসলে সবরমতি এক্সপ্রেসের সেদিনের করসেবকরাই। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যে বর্বরতার চূড়ান্ত হয়েছিল—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেদিকে মনোনিবেশ না করে গুজরাটে নির্দোষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও ভয়ঙ্করতম প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেওয়া হল কেন?

এটা যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হবে তাহলে সেটা গোধরার চল্লিশ মাইলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশে ঘটলো না কেন? সেখানে কি হিন্দু নেই? গোধরা থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে আহমদাবাদে সংঘটিত নরমেধযজ্ঞ কি প্রমাণ করে না ব্যাপারটা আগে থেকেই সুপরিকল্পিত ছিল। গোধরায় যারা নিহত হয়েছেন তাঁদের নিকটাত্মীয়রা দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন এবং দোষীরা যে শাস্তি পাবেই এমন প্রত্যাশা তাঁরা করতেই পারেন। কারণ সরকার তাঁদের পক্ষে আছে। ফলে সবরমতি এক্সপ্রেসের কামরায় নিহত মানুষদের স্বজনদের মনে হলে তা প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনকে দোষীদের আইন মাফিক কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রশমিত করার একটা পন্থা খোলা আছেই। কিন্তু নরমেধ যজ্ঞের শিকার গুজরাটি মুসলমানরা কার কাছে প্রতিকার চাইবে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করানোই সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আইন রক্ষকেরাও তাদের ঘৃণা করে। এ রকম পরিস্থিতিতে ধর্ষিতা জননীর কিশোর সন্তান কোথাও কোনো বিচার না পেয়ে সন্ত্রাসবাদী হয়ে গেলে কাকে দোষ দেওয়া যাবে? গুজরাটের নরমেধ যজ্ঞকে গোধরাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যাঁরা গণ্য করেছেন এবং সেই যুক্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিরলদৃষ্ট নিষ্ঠুরতার মধ্যে যাঁরা দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, প্রশ্নটা তাঁদের একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। মুসলমানদের শিক্ষা দিতে গিয়ে যদি তাদের কিশোর এবং তরুণদের সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য করা হয় তাহলে তথাকথিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তিম পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। খেয়াল রাখা দরকার বিশ্বের দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমান, খৃস্টান কিংবা হিন্দু যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তাদের উদ্ভব ঘটেছে তেমন পরিস্থিতিতে যখন 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

(৬)

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গুজরাটে গোধরাকাণ্ডের ফরেনসিক রিপোর্টে সুগভীর তাৎপর্য অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। খেয়াল রাখা দরকার আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে গোধরাকাণ্ডের প্রভাব অপরিসীম।

www.pathagar.com

গুজরাটে গণহত্যাকাণ্ডের আগে ২৭ ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদগামী সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরাটি দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে পুড়ে মারা যায় ৫৯জন যাত্রী। যাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই ছিল ৩৮। কামরাটিতে অযোধ্যাফেরত রামসেবক কতজন ছিল কেউ জানে না। যেসব সংগঠন রামসেবক তথা করসেবকদের অযোধ্যা নিয়ে গিয়েছিল তাদের তরফে কোন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। গুজরাট সরকারও এইসব সংগঠনের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত প্রকৃত করসেবকদের নাম-ধাম সম্বলিত কোন তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে মৃত করসেবকদের সংখ্যাটা পুরোপুরি অনুমানের বিষয়। আসলে যারা মারা গিয়েছিল তাদের বেশির ভাগই হয়তো সাধারণ যাত্রী। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে করসেবার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকেও সেটাই প্রমাণ হয়, ওই সবরমতি এক্সপ্রেসের সওয়ার করসেবকদের কোন টিকিট ছিল না। তারা সংরক্ষিত আসন ও বার্থওয়ালা কামরায় উঠে বৈধ টিকিকধারীদের হয়রানির একশেষ করেছিল। রাতে তাদের সংরক্ষিত বার্থে নিজেরা শুয়ে বৈধ টিকিটধারীদের মেঝেয় ঘুমোতে বাধ্য করেছিল। দলবদ্ধ করসেবকদের দাপট এতটাই ছিল যে, গাড়ির গার্ড, টিকিট চেকার, রক্ষী বাহিনী কারোরই কিছু করার ছিল না। তারা অসহায়ভাবে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে করসেবকদের যাবতীয় অত্যাচার বৈধ যাত্রীদের মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ট্রেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ছিল এই রকম। এরই মধ্যে এক্সপ্রেস ট্রেনটি কোন স্টেশনে থামলেই করসেবকরা প্লাটফর্মে নেমে মুসলমান যাত্রী কিংবা ভেণ্ডাদের পোশাক-পরিচ্ছেদে মুসলমান বলে চেনা গেলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তার ফলে কোথাও কোথাও সামান্যতম প্রতিরোধ ঘটলেই ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের চেহারা নিচ্ছিল। সংঘর্ষ বাধলেই করসেবকদের উত্তেজনায় পারদ চড়ে যাচ্ছিল। পরবর্তী স্টেশনে তাদের চেহারা হয়ে উঠেছিল আরও মারমুখী। সবরমতী এক্সপ্রেসের ভিতরেও মুসলমান যাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছেদ চেনা গেলে তারাও ক্রমাগত অত্যাচারের শিকার হচ্ছিল।

এইভাবে চলতে চলতে সবরমতী এক্সপ্রেসের গোধরা স্টেশনে পৌঁছলে সংঘর্ষ চূড়ান্ত চেহারা নেয়। তার কারণ এই স্টেশনের চা-বিস্কুট স্ন্যাক্স ইত্যাদি ভেণ্ডারেরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তাদের কারও কারও সঙ্গে করসেবকদের ইচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের কারণে সংঘর্ষ বেধে যায়। ভেণ্ডারেরা সংখ্যায় বেশি থাকায় সেটা ব্যাপকতা লাভ করে। এরই মধ্যে ট্রেন চলতে

www.pathagar.com

শুরু করে। চেন টানা হয়। গোধরা স্টেশন থেকে কিছুদূর এগিয়েই ট্রেনটা থেমে যায়। সিগন্যাল ফালিয়া নামে যে জায়গাটায় ট্রেনটা থামে সেখানে জনতার ভিড় জমে যায়। খবরে প্রকাশ, করসেবকদের আত্মরক্ষার জন্য অনেক আগেই ট্রেনের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে এস-৬ কামরাটিতে আগুন লাগে এবং কামরাটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এতদিন সবাই জানতো, সিগন্যাল ফালিয়ায় জড়ো হওয়া জনতার ভিতর থেকেই কেউ কেউ বালতি, জেরিকেন ইত্যাদি পাত্রে জ্বালানি তেল এনে বাইরে থেকে ছিটিয়ে দিয়ে কামরাটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কথাটা বিশ্বাস না করার যুক্তি কেউ খুঁজে পায়নি। কারণ, সিগন্যাল ফালিয়া ও আশেপাশের বেশির ভাগ বাসিন্দাই মুসলমান। গোধরা স্টেশনের ভেণ্ডারদেরও বেশির ভাগই নাকি এই এলাকারই বাসিন্দা। ফলে করসেবকদের বিরুদ্ধে ক্রোধের বশে তারাই আগুন লাগিয়ে দিতে পারে—এটাই ছিল ঘটনার আপাত বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি। ফলে গোধরাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই দেশের সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও গোধরার মুসলমানদেরই নিঃসংশয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। যে কারণে গোয়ায় বিজেপি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, গোধরাকাণ্ড যদি না ঘটতো তাহলে গুজরাটের হত্যাকাণ্ড ঘটতো না। তাঁর সেই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এখনও নিশ্চয়ই অনেকের কানে বাজে—'পহলে আগ্ লাগায়া কিস্‌নে ?'

যে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশই তখন ছিল না। আগুন যে মুসলমানেরই লাগিয়েছিল একথা ধরে নিয়েই মুসলিম নেতারা এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু নেতরাও এই বলে যুক্তি দেখাছিলেন, কিছু দুষ্কৃতী টাইপের মুসলমানের দুষ্কর্মের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ? কেবল ওই দুর্কৃতীদের অপরাধ প্রমাণ করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাদের সবাই মুখে না বললেও মুসলমানদের একটু কড়া রকমের শিক্ষা দেওয়ার তাগিদ মনে মনে অনুভব করেছিলেন। যে কারণে তাদের বেশির ভাগই প্রাণ খুলে গুজরাটে গণহত্যার নিন্দা করতে রাজি হয়নি। সেখানে সুপরিকল্পিত সংখ্যালঘু নিধনের কথা উঠলেই পরিচিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের হিন্দু ভদ্র ব্যক্তিরাও গোধরার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। যাঁরা গোধরার হত্যাকাণ্ড এবং গুজরাটের সংখ্যালঘু গণহত্যার ঘটনাকে সমপর্যায় ভুক্ত করতে সক্ষম হননি সেইসব বিচারশীল মুষ্টিমেয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁরা রুষ্ট হয়েছেন। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও গুজরাট গণহত্যা ও

www.pathagar.com

গণধ্বংসের কবলে পড়া আর্ত মানুষদের জন্য রিলিফ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গুজরাট সংহতি সমিতির বহু কর্মী ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শিকার হয়েছেন। যাঁরা বিদ্রূপ করেছেন, তাঁদের মুসলমান বিরোধী অন্যান্য কথার মধ্যে মূল কথা ছিল, যারা গোধরাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের জন্য পরবর্তী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কীই বা পাওনা হতে পারে।

কিন্তু হঠাৎ ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পর এই সোজা হিসাবটা গুলিয়ে গেছে। এই রিপোর্টে স্পষ্ট প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরাটি যেভাবে পুড়েছে তাতে বাইরে থেকে আগুন লাগানোর কোনও যুক্তিই টেকে না। এ ধরনের একটি কামরা সিগন্যাল ফালিয়ার ওই একই স্থানে দাঁড় করিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় আগুন ধরানোর পুনরাভিনয় করে দেখা গেছে কাজটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাইরে থেকে বালতি, জেরিকেন ইত্যাদি ভর্তি করে এনে মাটিতে দাঁড়িয়ে সাত ফুট উঁচুতে রেলের কামরায় ছুড়লে প্রায় সমস্ত তেলটাই কামরার নিচে পড়ে যাওয়ার কথা। সেই অবস্থায় আগুন লাগালে কামরাটি নিচের অংশ এবং রেললাইন বেশি ধ্বংস হওয়ার কথা, অথচ কামরাটির এই অংশ ও রেললাইন প্রায় অক্ষত ছিল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা স্বাভাবিকভাবেই পুড়ে যাওয়া কামরার ভিতরটাও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাতে তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধাততে ধরা পড়েছে—ওই কামরায় ৭২নং সিটের কাছে দাঁড়িয়ে অন্তত ষাট লিটার জ্বালানি তেল ঢেলে কামরাটিকে ভিতর থেকে পোড়ানো হয়েছে। যারা এভাবে তেল ঢেলে আগুন দিয়েছিল তারা যে তৎক্ষণাৎ বন্ধ কামরার তিনটি দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে নেমে গিয়ে জনতার মধ্যে মিশে গিয়েছিল কিংবা অন্য কামরায় চলে গিয়েছিল সে প্রমাণও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পেয়েছেন। দগ্ধ কামরার তিনটি দরজা খোলা থাকার চিহ্ন ছিল সম্ভবত তাদের পথ অনুসরণ করেই ওই অভিশপ্ত কামরাটির কিছু কিছু সাধারণ যাত্রী বেঁচে গিয়েছিলেন। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন আমেদাবাদের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবেরেটারির অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টার ড. এম. এস. দাহিয়া।

কামরাটিতে যে ভিতর থেকেই আগুন দেওয়া হয়েছিল সেকথা বুঝতে যে কোনও সাধারণ বুদ্ধির মানুষেরও এখন আর কোনও অসুবিধা নেই। মাটিতে দাঁড়িয়ে সাত ফুট উঁচুতে দরজা-জানালা বন্ধ একটা রেল কামরাতে জ্বালানি তেল দিয়ে ভেজাতে গেলে তেল স্বাভাবিক নিয়মেই নিচের দিকেই গড়িয়ে পড়বে এবং তার ফলে কামরার নিচের অংশ এবং রেল লাইনের ক্ষতি হবে। বাস্তবে সেটা ঘটেনি। ওই অংশগুলি অক্ষত ছিল। তাই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দেওয়া ভেতর থেকে আগুন লাগানোর যুক্তি না মেনে নিয়ে

www.pathagar.com

উপায় নেই। সংঘ পরিবারের নেতারা অবশ্য বলেছেন, কামরা ভেতর থেকে নাকি বাইরে থেকে পোড়ানো হয়েছে তাতে কিছুই ফারাক পড়ে না। কিন্তু কামরার ভেতর থেকে কারা আগুন দিয়েছিল। তারা ষাট লিটার জ্বালানি তেল পেল কোথায়, এই প্রশ্নটা বিচার করতে বসলেই ফারাকটা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে কামরার ভিতরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল করসেবকদেরই। তাহলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুসারে ৭২ নম্বর সিটের পাশে দাঁড়িয়ে ষাট লিটার জ্বালানি তেল ঢালার হিম্মত কাদের হতে পারে ? এই তেল কামরার মধ্যে তারা আনলোই বা কীভাবে ? করসেবকরা যে আর কিছু না হলেও প্রত্যেকেই ধারাল ত্রিশূল নিয়ে সশস্ত্র ছিল একথাও তো সবার জানা। তাদের সমবেত প্রতিরোধের মুখে বাইরের কার পক্ষে, তারা যতজনই হোক রেল কামরার সংকীর্ণ দরজা দিয়ে ষাট লিটার জ্বালানি তেল নিয়ে প্রবেশ করা কি সম্ভব ? তারা ঢুকে ৭২নং সিটের পাশে দাঁড়িয়ে ষাট লিটার তেল ঢালবে, তারপর আগুন দিয়ে নেমে যাবে, আর মারমুখ ত্রিশূলধারী করসেবকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে—এসব হাস্যকর কল্পনা নয় কী ?

বরং নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলিই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। আসলে ওই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেলের মজুদ করসেবকদের কাছেই ছিল। তারা কামরাটায় আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রেখেছিল। বেশির ভাগ করসেবকই সে কথা জানত। তাই যথাসময়ে তারা ওই বন্ধ কামরা থেকে তিনটি দরজা খুলে সরে পড়েছিল। মারা গিয়েছিল কেবল কিছু নিরীহ নারী, শিশু ও সাধারণ যাত্রী এবং মূল পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝতে না পারা কিছু নির্বোধ ধরনের করসেবক। ২৭ ফেব্রুয়ারী সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় যারা আগুন লাগিয়েছিল সেইসব মাতব্বর করসেবকরা ঠিকই জানত এই ঘটনাটিতে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে কীভাবে গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ চালানো যাবে। সেই নিধনযজ্ঞের ব্লুপ্রিন্ট যে আগে থেকেই তৈরি ছিল সে কথা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির কল্যাণে এখন সবারই জানা হয়ে গেছে। তাই তথাকথিত 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' এতটা সুপরিকল্পিত হতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পরিকল্পিত 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'র ব্লুপ্রিন্ট দ্রুত কার্যকর করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য গোধরাকাণ্ড কেন ঘটেছিল সে কথাটাই এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট প্রকাশের পর বুঝা গেল গোধরাকাণ্ড আসলে উল্লিখিত ব্লু প্রিন্টেরই অংশ অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগের ব্যাপারটাও ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। করসেবকরাই তথাকথিত 'ক্রিয়া'র নায়ক ছিল বলেই 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'র পরিকল্পনাটা এত নিখুঁত হয়েছিল।—দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন

www.pathagar.com

# শিখে নিতেই হবে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদকে ঠেকানোর নতুন গঠনপ্রণালী

–অরিজিৎ মিত্র

৪৬'র দাঙ্গাই বলুন, ৬০'র দশকের হানাহানিই বলুন, ৯০-র দশকে বাবরি মসজিদ ভাঙাকালীন সংঘাতই বলুন, মীরাট-লক্ষ্ণৌ-মুম্বাই-এর সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণই বলুন, এগুলির সঙ্গে গুজরাট-নর সংহার মিলিয়ে দিলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। সাম্প্রদায়িকতার সাবেকী রূপ ফুটে উঠেছে ঐসব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। এ রূপ সরল একমাত্রিক, কিছুটা পরিকল্পিত আবার অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিক্রিয়ার শয়তানি অবশ্যই ছিল। কিন্তু এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনগণের পেছিয়ে পড়া অন্ধ স্থূল ভাবাবেগ, উন্মাদনা। এ দুয়ের সংশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ঘটেছে ঐসব দাঙ্গা। কেবল এক পক্ষ, যারা সংখ্যাগুরু তারাই আঘাত হানেনি। অপরপক্ষেও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা ঘা দিয়েছে। এটা ঠিক রাষ্ট্রশক্তি সবসময়ই সংখ্যাগুরু দাঙ্গাবাজদের পাশেই দাঁড়িয়েছে তাদেরই মদত দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা একতরফা ছিল না। গুজরাট গণহত্যার চরিত্র আদৌ তা নয়।

প্রথমতঃ একে দাঙ্গাই বলা যায় না। যারা 'দাঙ্গা' বলে একে চিহ্নিত করছেন, তারা সরাসরি দাঙ্গাবাজ না হলেও মনের কোণে কোথাও না কোথাও দাঙ্গাপন্থার দর্শন বহন করেন, সংখ্যাগুরুর আগ্রাসী ভাবাবেগ দ্বারা চালিত। কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখেই বলা যায়, রাষ্ট্রশক্তি, কেন্দ্রীয় শাসক দল পরিচালিত এই নরসংহার। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদেরই ঘাতক প্রতিনিধি হিসেবে 'পবিত্র দায়' পালন করেছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ এই গণহত্যায় অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে প্রচারপত্র এবং স্কুল পাঠ্যসূচীকে কাজে লাগানো হয়েছে। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার বইতে হিন্দু গৌরবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আকাশে তোলা হয়েছে এবং মুসলিমদের নীচ ঘাতক শয়তান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ৩/৪ বছর ধরে ইতিহাস মারফত মগজ ধোলাইয়ের কাজ জারি ছিল। এছাড়া একটি Handbill বা প্রচারপত্রের কথা উল্লেখ করতেই হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে এটি ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়, তখনও গোধরা ঘটেনি। প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল—'ওঠ জাগো ভাবো সংগঠিত সশস্ত্র হও, দেশ বাঁচাও, ধর্ম বাঁচাও।' আমরা টেন কমাণ্ডমেণ্ডসের কথা জানি, সিনেমায় দেখেছি। সংঘ

www.pathagar.com

পরিবারের দশ সূত্র বা টেন কমাণ্ডমেণ্ডস্ কি ভয়ঙ্কর হতে পারে ঐ প্রচারপত্রে তার আভাস মেলে।

সূত্রাকারে হাজির করছি ঃ

১. এখন থেকে আপনি/আপনারা কেউ মুসলিম দোকানির কাছ থেকে জিনিস কিনবেন না।

২. এখন থেকে আপনি/আপনারা কেউ নিজের দোকান থেকে মুসলিমদের কাছে কোনও সামগ্রী বেচবেন না।

৩. এখন থেকে আপনি/আপনারা কেউ ওদের হোটেল এবং গ্যারেজ ব্যবহার করবেন না।

৪. কেবলমাত্র হিন্দুদের গ্যারেজে গাড়ী রাখবেন। সূচ থেকে সোনা কোনও কিছু মুসলিমদের কাছে বেচবেন না কিনবেন না।

৫. মুসলিম নায়ক-নায়িকারা যেসব ছবিতে অভিনয় করেছে সেগুলি দলবদ্ধভাবে বয়কট করুন, জাতীয়তাবিরোধী বলে চিহ্নিত করুন।

৬. মুসলিমদের অফিসে কেউ কাজ করবেন না কিংবা নিজেদের কর্মকেন্দ্রে ওদের ঢুকতে দেবেন না।

৭. ওদের কোন সম্পত্তি কিনবেন না। নিজেদের সম্পত্তি ওদের বেচবেন না। আপনাদের এলাকায়, হাউজিং কমপ্লেক্সে ওদের প্রবেশ করতে দেবেন না।

৮. এখন থেকে নির্বাচনে তাদেরই ভোট দেবেন যারা হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করবে।

৯. নজর রাখবেন যাতে আপনার কোন মেয়ে বোন ওদের কোন ছেলের প্রেমে না পড়ে, ওদের সঙ্গে অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না মেশে।

১০. কোনো মুসলিম শিক্ষকের কাছে পড়বেন না বা তাদের কাছে কোনও রকম প্রশিক্ষণ নেবেন না।

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ চালু আছে—'হালারে জানে মারার আগে ভাতে মারো, পানিতে মারো।' সংগ পরিবার বুঝি এই প্রবাদটি লুফে নিয়েছে। রাজনৈতিক এবং সামরিক সন্ত্রাস নামানোর আগে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস নামাও। ঐ সন্ত্রাসের খাঁজে খাঁজে গেঁথে দাও সর্বনাশা বৌদ্ধিক ও দার্শনিক বিদ্বেষ। অনেকে মারণবীজের কথা বলেন। এই প্রচারপত্রই সেই মারণবীজ, যার ভেতর লুকিয়েছিল গুজরাট-গণহননের সকল উপাদান। অনেকে বলেন, সংঘ পরিবার ভারতীয় গোয়েবলস ভারতীয় হিটলার। এ মুহূর্তে ছকটা উল্টে নিয়ে বলা উচিত, গোয়েবলস-হিটলার এবং ইউরোপের নয়া ফ্যাসিস্টরা এই প্রচারপত্র বণ্টনকারী সংঘ শক্তির কাছ থেকে পুরোপুরি তালিম

www.pathagar.com

নিতে পারে। ভারতীয় গৈরিক বাহিনী এখন সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক কেন্দ্র।

তৃতীয়তঃ অতি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো ছুটন্ত হাইটেককে কাজে লাগানো। ইন্টারনেট, ই-মেল, আধুনিক কমপিউটারের প্রায় সমস্ত কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দ্রুত একটা প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। গৈরিক নেটওয়ার্ক সংহত এবং ভয়ঙ্কর রকম কার্যক্ষম হয়েছে। নানারকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে। যেমন তাদের আয় কত, তাদের কোন্ কোন্ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, কোথায় কত টাকা গচ্ছিত আছে, কি ধরনের ব্যবসা আছে, সেই ব্যবসায় কখন কত টাকা খেটেছে, তাদের জমি বাড়ী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কি পরিমাণ আছে, তাদের প্যান কার্ড, ভিসা, পরিচয়পত্র আছে কিনা, তারা ক'বার বিদেশ যায়, তাদের গাড়ী এবং দোকানের লাইসেন্স আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সবই জড়ো হয়েছে আয়কর, শুল্ক দপ্তর, মিউনিসিপালটি, ব্যাংক, সরকারী-আধা সরকারী দপ্তর থেকে। একদিকে বিকেন্দ্রীভূত ফ্যাসিবাদী মগজ অন্যদিকে অতি উন্নত তথ্য প্রযুক্তি। দুয়ের মেলবন্ধন নরসংহারের ছক। এমন প্রয়াস ভারতীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন এবং অভিনব। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে হাইটেকের যুগে কিভাবে গণহনন ঘটতে পারে গুজরাট তারই প্রথম সংকেত—প্রথম ইশারা।

চতুর্থতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ধন্য ভোগবাদী সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় গণহত্যা। এই হত্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ধর্ষকাম, উৎকট রিরংসা, কুৎসিৎ পণ্যলোভ, লুটেরা কৃষ্টি, নারী ধর্ষণ। কোথাও একশো কোথাও পাঁচশো কোথাও হাজার সংখ্যালঘু রমণীকে বিবস্ত্র করে সমসংখ্যক পুরুষ দিয়ে তাদের ধর্ষণ। ধর্ষণ শেষে ধর্ষকদের কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়েছে তাদেরই মা-বোন মেয়েরা। এই দৃশ্য ভাবা যায় ! অথচ এমনটাই ঘটেছে গুজরাটে। এটা বিশ্বায়নী কৃষ্টির বীভৎস প্রকাশ, যেখানে বাৎসায়ন এবং ভোগায়ন একাকার। গণলুট হয়েছে, সেলফোন হাতে হিরোহণ্ডা, মারুতি সুজুকি, বিদেশী ঝাঁ চকচকে গাড়ী চেপে সাফারি সুট পরিহিত কেবল পুরুষেরা নয়, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত লুটে অংশ নিয়েছে। ফ্রিজ, টিভি, নানান ইলেকট্রনিকস পণ্য, অন্যান্য বহু বিলাস সামগ্রী চৌপাঠ করে দিয়েছে। সেগুলি কেবল নিজের বাড়ীতে রাখেনি, বিভিন্ন অস্থায়ী বিপণনকেন্দ্র মারফত চড়া দামে বিক্রি করেছে। আর এ বিক্রির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে দলিত সম্প্রদায়ের দুস্থ যুবরা। এটা তো ভোগবাদ পণ্যলোভের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি। পণ্যলোভে ভোগবিকার মানুষকে কিভাবে আদিম পশু করে তোলে গুজরাট-গণহননের মধ্য দিয়ে যেন তারই মহড়া হল।

www.pathagar.com

পঞ্চমতঃ দলিত শক্তি এবং নারীদের কাজে লাগানো, তাদের নানাভাবে ব্যবহার করা। ভারতীয় পুরুষেরা যাই হোক ভারতীয় নারী সম্পর্কে একটা অন্য ধারণা চর্চিত। তারা নম্র, উদার, সংযত, কল্যাণকামী, নিজে দুঃখ পেলেও অন্যকে দুঃখ দেয় না, প্রয়োজনে বিপন্নকে রক্ষা করে। এটাই ভারতীয় নারীর চিরাচরিত সংস্কৃতি। গুজরাটের নরসংহার যেন এই সংস্কৃতিকে পুরো পাল্টে দিল। সাধারণ অশিক্ষিত নারী নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ঘরের নারীরা এমন কি গর্ভবতী মহিলারা পর্যন্ত এই লুটে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। বিপন্ন মানুষ আশ্রয় খাদ্য জল চাইলে দূর করে দিয়েছে, বলেছে 'ওটাই তোমাদের প্রাপ্য'। কবির ভাষা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায়—

'এরে দানবী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে!'

হিটলার কিংবা মুসোলিনী জার্মান অথবা ইতালীয় অভিজাত নারীদের দাঙ্গাবাজ লুটবাজ ধর্ষকারী করতে পারেনি। সংঘ পরিবার তা হাতে নাতে করে দেখিয়ে দিল, হ্যাম্ সবসে বড়া হায়, খতরনাক্ হ্যায়, জাঁদরেল জাঁদরেল। এই জাঁদরেলিয়ানার তুলনা নেই। তুলনাহীনরা তাই ভুলনাহী নারে। কেবল তাই নয়, দুর্গাবাহিনী দিয়ে এই তত্ত্ব ফিরি করা হয়েছে আমাদের নারীশক্তি নারীবাদ জাগতে পারে সংখ্যালঘুদের সাবাড় করেই। সংখ্যালঘু হননে প্রয়োজনে পুরুষের তুলনায় নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে। বোধ করি একেই বলে চণ্ডী চামুণ্ডা ছিন্নমস্তাতন্ত্র। গুজরাটের নরসংহার যেন সেই দিকটি সামনে এনেছে।

ষষ্ঠতঃ দলিতদের কাজে লাগানো, কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যাপকভাবে। এটা কিভাবে সম্ভব হল ? উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং বৈশ্যতন্ত্র যারা দুঃশীল সমাজ দুঃশীল রাষ্ট্র গড়ে দলিতদের জীবনকে আরও রিক্ত বিপন্ন করে তুলেছে, কেন তাদেরই ঘৃণ্য চক্রান্তে দলিতরা নিজেদের জড়ালো ? তারা হিন্দু সমাজ বহির্ভূত শক্তি। যদি জোর করে তাদের হিন্দুত্বের বৃত্তে টানাও হয়, তবুও তারা হিন্দু সমাজেরই প্রান্তিকতম শক্তি। মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাহলে ! এর প্রকৃত কারণ নিয়ে সাইকো-পলিটিশিয়ান এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানান ভাবনা আছে। হতে পারে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের অবৈরিমূলক দ্বন্দ্ব আছে। সেই দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে বৈরিমূলক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করেছে গুজরাটের নরসংহারবাদীরা। লুটে অংশ নিলে আখেরে লাভ হবে, এই তত্ত্ব তাদের গেলানো হয়েছে। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, গুজরাটে দলিতদের মধ্যে কম্যুনিস্টদের কোনো প্রভাবই নেই। সমাজতন্ত্রী, লেহিয়াপন্থী, আম্বেদকরপন্থীরাও সেখানে দুর্বল। গান্ধীবাদীরাও প্রায় প্রান্তিক শক্তি। ওখানে

www.pathagar.com

গডসে-প্যাটেল-সাভারকরের রমরমা। দলিতদের সুপথে ধরে রাখবে কে ? আপনা আপনি তো তাদের মধ্যে জাগরণ আসতে পারে না। অশিক্ষা, অভাবনীয় দারিদ্র, অকল্পনীয় বিচ্ছিন্নতা এবং নিশ্ছিদ্র অচেতনতা—হয়তো এই সমস্ত কারণ মিলেমিশে দলিতদের কুপথগামী করেছে। তবে সকল দলিতই দাঙ্গা লুটে অংশ নিয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। একটা অংশকে কাজে লাগানো হয়েছে।

## জিয়াদ আলির ঝুলি থেকে বীরভূম মুর্শিদাবাদের পথে পথে সমন্বয়ের সুর

বলতে পারেন ছড়া, অথচ তা ছড়িয়ে যায় না। বুকের গভীরে দাগ কাটে কিংবা কথকথার সুরে গানের মালা। যে গানে গেঁথে আছে সমন্বয়ের নিবিড় সংবেদনা। সেই গান হয়তো শুনেছিলাম আউলিয়া বাউলিয়া কণ্ঠে বীরভূম মুর্শিদাবাদের ধূলো মাখা রাঙা পথে। আবার তা কানে এল মনসাপুর ঘুটিয়ারি শরীফে ইমাম মুন্সির ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে। সেই গানের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

"মরুতে এলেন মহম্মদ
মথুরাতে এলেন শ্যাম
ইমাম খেলা খেলেন রসূল
লীলা খেলেন ঘনশ্যাম
শোন্‌রে ভাই হিন্দু মুসলমান
আছে বেদ কুরআনে ফরমান
কতই জ্বালা দিলেন তারে
না লাগে তার বান। .....
"বকরি ও গরু চরায়
দেখে আয়রে হিন্দু মুসলমান
ঘুরে সেই মথুরায় মদিনায়
এরা একই মায়ের দুই সন্তান
হিন্দু ও মুসলমান
একই জন্ম এদের
একই স্তন্যপান।"

এ গান শুনতে শুনতে চান বা না চান আপনার মন চলে যাবেই সামবেদ ঋকবেদের যুগে। কি আছে সেখানে ? সামবেদের সেই অপূর্ব সুরেলা সম্ভাষণ—হে নীলাকাশ, তুমি আমাকে উদার করো ; হে শীতল মলয়ানিল,

www.pathagar.com

তুমি আমাকে স্নিগ্ধ শান্ত করো; হে স্রোতস্বিনী পুণ্যবতী, তুমি আমার সকল পাপ ধুইয়ে দাও। আমাকে পবিত্র করো। হে শ্যামল সবুজ অরণ্য, তুমি তোমার ধ্যানমগ্ন আশ্চর্য নিবিষ্টতা দিয়ে আমাকে মগ্ন করো, তামসিকতা থেকে ক্লান্তিময় সাত্ত্বিক করে তোলো। হে স্বাহা হে প্রজ্জ্বলিত বৈশ্বানর হুতাশন, তুমি তোমার অনির্বাণ প্রদীপ্ত শিখা দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করো। এই সুভাষণের মধ্যে উগ্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নেই, আগ্রাসী বৈশ্যতন্ত্রশাসিত নরঘাতক হিন্দুত্বও নেই। বরং উদার কল্যাণকামী মানবিকতা আছে, মহৎ উত্তরণের সুর আছে। এই সুরই তো আমাদের আলোকিত পরম্পরা। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর কথা কি আমরা ভুলে গেছি? জনক রাজার সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমাকে বলতেই হবে ব্রহ্মলোক কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে? যাজ্ঞবল্ক্য তাকে মহাশাপের ভয় দেখান, বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন গার্গীর এই কৌতুহল কেন? গার্গীর জবাব, আমি মানব মুক্তির জন্য এই ব্রহ্মজ্ঞান রহস্য জানতে চাই। গার্গীর এই উচ্চারণের মধ্যে উগ্র অন্ধ হিন্দুত্ব কোথায়? গৈরিক হানাদারেরা কেবল গুজরাটে সংখ্যালঘু হত্যা করেনি, গার্গীর এই উদার মানবতাবাদী ভাবনাকেও নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে।

মৈত্রেয়ীর মহৎ সংবেদনাই বা ভুলি কেমনে? সংসার ত্যাগের আগে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ীর মধ্যে সম্পতি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। কাত্যায়নী কিছু বলেননি। মৈত্রেয়ীর বক্তব্য ছিল, যার দ্বারা আমার অমৃত লাভ হবে না তা নিয়ে আমি কি করবো। যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি তো নারী তুমি অমৃত চাও কি কারণে? মৈত্রেয়ীর জবাব 'আমি মরণশীল দুঃখ-রোগ-জর্জর মানুষের জন্য অমৃত চাই, অমরত্বের মন্ত্র চাই।' মানুষের জন্য অমরত্বের প্রার্থনা, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ কোথায়? মৈত্রেয়ী তো আমাদের মানবতাবাদী পরম্পরা। বিনয় কাটিহার, অশোক সিঙ্গল, জনাকৃষ্ণমূর্তি এবং তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা মৈত্রেয়ীর এই মন্ত্র জানে না, জানতে চায় না।

যম এবং নচিকেতার দীর্ঘ সংলাপের কথা তো আমরা উপনিষদে পড়েছি। যম নচিকেতাকে নানান প্রলোভন দেখায়—সুন্দরী নারী, স্বর্ণ সম্পদ, গোধন, শস্যবতী জমি, বিচিত্র অলংকার ইত্যাদি ইত্যাদি। নচিকেতা সবই প্রত্যাখ্যান করে। তার বক্তব্য এসবই আত্মভোগের জন্য। মানব কল্যাণে তা লাগবে না। মরণজয়ী মন্ত্র তার চাই। নিজের জন্য নয়, মর্ত্যমানবের জন্য। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর নচিকেতা নাকি সেই মন্ত্র ছিনিয়ে আনে। নচিকেতার এই

www.pathagar.com

প্রয়াস, এর মধ্যে মৌলবাদের কামগন্ধ নেই। সংঘ দানবেরা নচিকতাকে তিলে তিলে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে গুজরাটের পথে পথে।

চলে আসুন, মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জগতে যেখানে মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ হয়েও 'গুজরাট নগরের পত্তন' অংশে মুসলমানদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন, সম্মানের সঙ্গে তাদের ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। এটাই তো সমন্বয়ধর্ম পরম্পরা। কবি কৃত্তিবাস, কবি মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এরা হিন্দু হয়েও রামায়ন মহাভারত অনুবাদের প্রশ্নে মুসলিম শাসক এবং অমাত্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন পান। হুসেন শাহ, নুসরত শাহ, রুকনুদ্দিন মোবারক শাহ তো বটেই, এছাড়া ছুটি খাঁ, পরাগল খাঁর মতো উচ্চপদস্থ আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন হিন্দু অনুবাদকের দল। সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি এতটাই শক্তিশালী ছিল। সেই সমন্বয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে শ্রী চৈতন্যের মধ্যে। তিনি ভগবানও নন, অবতারও নন, ভেতরে কৃষ্ণ বাইরে রাধাও নন। তিনি সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত আলোকদূত। তার হাতে হাত রেখে, তার মনে মন মিশিয়ে দবির খাস, সকের মল্লিক হলেন রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী। যবন হরিদাসের নবজন্ম হলো। তার নামকীর্তন নগর-সংকীর্তন মহামানবের মিলন সংগীতে রূপ নিল। চৈতন্য যুগকে বলা হয় বঙ্গ সংস্কৃতির জাগরণ পর্ব, স্বর্ণ পর্ব। সেই জাগরণ ঘটেছিল সমন্বয়ধর্মী ভাবনাকে আশ্রয় করে। চৈতন্যকে ওরা মেরেছে, যেমন মেরেছে বুদ্ধ গান্ধী মীরাবাঈকে গুজরাটের পথে পথে। আজও গৈরিকদানবদের হাত থেকে কল্যাণময় চৈতন্যের নিষ্কৃতি নেই।

চট্টগ্রাম রোসাঙ রাজসভার সাহিত্যধারা, তার কথা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ কি ভুলে যেতে পারে ? দৌলত কাজী এবং আলাওলের রচনা 'পদ্মাবতী' 'লোরচন্দ্রানী', ইউসুফ জুলেখা, লয়লা মজনুর কাহিনী কিসের ইংগিত দেয়, উগ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতার। মোটেই নয়। বরং সকল সংকীর্ণতার উপর ঠাঁই দিয়েছে মানুষ এবং তার ভালবাসাকে। এই ভালবাসা মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতময় হয়ে উঠলো মৈমনসিংহ গীতিকায়, মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী পালায়।

❐

www.pathagar.com

# জাতীয় আবেগের মহিমা
# ভোট মেলেনি, আগুন জ্বলছে

–অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

আমরা যদি আজ নীরব থাকি/আমাদের প্রাপ্য হবে মৃত্যুর নীরবতা/প্রতিটি গৃহে আগুন জ্বলবে/প্রতিটি বাড়ী পুড়তে দেখব আমরা/তখন, সেই নীরবতার ও-পার থেকে/এক যন্ত্রণার আর্তি ফিরে আসবে/এখানে কেউ নেই আর/একজনও না। একজনও না।–সাহির লুধিয়ানভি

তোমার বাড়ীর একটি ঘরে যদি আগুন জ্বলত.
তুমি কি পাশের ঘরে ঘুমোতে পারতে ?
তোমার বাড়ীর একটি ঘরে যদি লাশ পড়ে থাকতো,
তুমি কি পাশের ঘরে বসে গান গাইতে পারতে ?
তোমার বাড়ীর একটি ঘরে যদি সারি সারি মৃতদেহ পচতে থাকতো,
তুমি কি পাশের ঘরে প্রার্থনায় বসতে পারতে ?
যদি বলো, 'হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে আমার কিছু বলার নেই, কিছুই না।

–সর্বেশ্বর দয়াল সাকসেনা

অটল বিহারী বাজপেয়ী ভাষণ দিয়েছেন। দূরদর্শনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কথামৃত সঞ্চারিত হয়েছে। আজকাল তাঁর কণ্ঠস্বর এমনিতেই স্তিমিত, উচ্চারণ তাঁর পদসঞ্চারের মতোই বিলম্বিত, নয়নযুগল সতত আনত, কখনও বা সম্পূর্ণ নিমীলিত। তাই শোকের আবহ রচনায় তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট ছিল। সেই আবহে সুস্থিত হয়ে বাজপেয়ীজি জানিয়েছেন, গুজরাটে যা ঘটেছে তা জাতীয় ভাবমূর্তির কলঙ্ক। ভাগ্যিস বললেন তিনি, তা না হলে কে-ই বা জানতো এমন গূঢ় সংবাদ ? আর এক বিরল প্রজ্ঞার বাণী শোনালেন প্রধানমন্ত্রী—এক একটা সময় আসে যখন দেশকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়, গুজরাত তেমনই এক পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। লক্ষণীয়, তিনি কেবল পরীক্ষা বলেছেন, অগ্নিপরীক্ষা বলেননি। না বলে ভালই করেছেন ; তাঁদের আরাধ্য রামলালা নিজের স্ত্রীকে যে অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করেছিলেন তাতে সীতার গায়ে আঁচ লাগেনি, কিন্তু তাঁর পতিদেবতাটির সন্দেহপ্রবণ স্বভাব জনচক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। গুজরাতে অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন হয়েছিল। পাইকারী হারে।

www.pathagar.com

'আমার কী বেদনা সে কি জানো তুমি' গোছের এই ভাষণের উপসংহারে সনাতন আশার বাণী শোনাতেও ভোলেননি আমাদের প্রবীণ নায়ক, অতীতে যে ভাবে দেশ সংকট কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এবারেও তার অন্যথা হবে না, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রধানমন্ত্রী নিঃসংশয়। আমরাও নিঃসংশয়। কি শিশু, কি তরুণ, কি বৃদ্ধ—মানুষ পুড়ে যাওয়ার পরে ছাইটুকু পড়ে থাকে এবং কে না জানে সে ছাই আর পোড়ানো যায় না।

অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁর ভাষণে 'জাতীয় আবেগ'-এর কথা বলেননি। অনেক দিন রাজনীতির কারবারে আছেন, তিনি জানেন কখন কোনো কথা বলতে নেই। তাঁর পারিষদবর্গ সকলে ঠিক তাঁর মতো বিচক্ষণ নন, ইতস্তত মুখ ফসকে জাতীয় আবেগের কথা বলে ফেলছেন। টেলিভিশনের সাক্ষাতকারে, বিতর্ক সভায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবক্তরা গত কয়েক দিন রীতিমতো নাজেহাল। কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, সাংবাদিক এবং আমজনতার প্রশ্নবাণ ছুটে আসছে তাঁদের লক্ষ্য করে, কেন তাঁরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ দলের কুসঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারছে না, কোনো পরিষ্কার বলতে পারছে না ; রামমন্দির নিয়ে বিপজ্জনক দূরাচার বন্ধ হোক ? রবিবার সন্ধ্যাবেলায় টেলিভিশনে এমনই এক বিজেপি'র প্রতিনিধি খুব লড়ে যাচ্ছিলেন এ মহান সত্য প্রতিষ্ঠা করতে যে, তাঁর দল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্বাধীন সংগঠন, তাদের হয়ে জবাবদিহি করার দায় তিনি নেবেন না। হঠাৎ এক তরুণ শ্রোতা সটান উঠে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে তাঁর দিকে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ; আমার বয়স একুশ, আমি ছাত্র, রামমন্দির নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যাথা নেই, আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই, সেজন্য দেশের সমৃদ্ধি চাই, কেন আপনারা এসব বাজে জিনিস বন্ধ করে আসল কাজে মন দিচ্ছেন না ?

ঠিক এ প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিলেন না ভারতীয় জনতা পার্টির ওই প্রতিনিধি। ফলে একটু বেসামাল হয়ে পড়লেন এবং মনের কথাটি মনের বাইরে চলে এলো। জানালেন তিনি, রামমন্দির নির্মাণ বাজে কাজ নয়, জাতীয় আবেগের প্রশ্ন। ঠিক যেমনটি একদিন বলেছিলেন তাঁর আদরের গুরুভাই, প্রধানমন্ত্রী আসন থেকেই। যেমনটি ওরা নানা উপলক্ষে বলে থাকেন, যথা উত্তর প্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনের প্রচারপর্বে।

একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতার উৎকট দাবিকে সঙ্ঘ পরিবার ও তার সহকর্মীরা কীভাবে 'জাতীয় আবেগ' বলে চালানোর চেষ্টা করে এসেছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি কীভাবে সেই জাতীয় আবেগ মন্থন করে ভোটের অমৃতকুম্ভ হস্তগত করতে তৎপর হয়েছে সে কাহিনী আজ আর

www.pathagar.com

নতুন করে বলার কোনো দরকার নেই। কাকে জাতি বলে, কাকেই বা বলে জাতীয় আবেগ, সে বিষয়েও বিস্তর কূটতর্ক শুনেছি, আরও বিস্তর শুনব, আপাতত সে আলোচনাও অপ্রয়োজনীয়। তার কারণ, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং তাঁর স্বজনবর্গ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে 'জাতীয় আবেগ'-এর যে ফানুসটি উড়িয়েছিলেন, সেটি এবার ভোটের বাজারেই পপাত চ, মমার চ। গোটা উত্তর প্রদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, ফৈজাবাদ জেলার পাঁচটি বিধান সভার আসনের মধ্যে বিজেপি'র প্রাপ্তি কেবল অযোধ্যা। সেই জয়ের কৃৎকৌশল নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন, এবং সেই পবিত্র জন্মভূমিতে—হায় রাম—অধিকাংশ ভোটদাতা ভোট দিতেই যাননি। জাতীয় আবেগই বটে।

আবেগ ভাঙিয়ে ভোট মিলছে না, আগুন জ্বলছে, তবু জাতীয় আবেগের ভজনা ছাড়তে পারছেন না ওঁরা। কে জানে, গুজরাতের ধ্বংসকাণ্ডে তাঁরা নতুন প্রাপ্তির হিসাব কষছেন কি না, সাম্প্রদায়িক হানাহানির সুধাতাসে 'হিন্দু ভোট' সংহত হবে, গুজরাতে বিজেপি'র মরা নদীতে নতুন জোয়ার আসবে। হানাহানির পিছনে সেই হিসেব সক্রিয় ছিল কিনা, তা-ই বা কে জানে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। চার বছরের মধ্যেই তাঁর অমৃতকুম্ভ নিঃশেষ হয়ে গেল, হিন্দুত্ব মন্থন করে উত্তরোত্তর গরল উঠে আসছে। এই পরিণতির দায়ভার তাঁকেই বইতে হবে। ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে এমন এক রাজনীতিক হিসেবে, যিনি আপন শিবিরের বর্বরদের নিরাবরণ ধ্বংসকাণ্ড দেখেও নিশ্চেষ্ট বসেছিলেন, হাতে ক্ষমতা থাকতেও সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি, দুর্বল ভাষণ এবং দুর্বলতার কবিতা রচনাতেই দিনগত পাপক্ষয় করেছেন।

ঋণ স্বীকার ; ভয়েসস অব স্যানিটি, কমলা ভাসিন, শ্মিতু কোঠারি ও বিন্দিয়া থাপার সম্পাদিত। লোকায়ন, দিল্লি। (৫ মার্চ, ২০০২ আনন্দবাজার।)

❐

www.pathagar.com

# আমাদের জোট বাঁধা জরুরি এই শহরেও, দাঙ্গার আগেই

–অনিতা অগ্নিহোত্রী

টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পাচ্ছি টহলদার পুলিশ বাহিনী। পিছনে, পাশে, ইতস্তত আগুন, ধোঁয়া ও ধ্বংস। আগুন নেভানোর কোনো প্রশাসনিক বা নাগরিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না। আমরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি, সেনাবাহিনী নামুক, পরিস্থিতি শক্ত হাতে সামলাক। রয়টারের তোলা ছবিতে দাঙ্গা-আক্রান্ত যুবকের অসহায় মুখ—না, ভাগ্যিস আমাদের চেনা কেউ নয়। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কেউ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে একটি আপৎকালীন পরিস্থিতি ভাবতে আমরা যারা অভ্যস্ত, তাদের এবার বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র আপৎকালীন কিছু ব্যবস্থার ভিত্তিতে দাঙ্গার মোকাবিলা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বুঝতে হবে, কেন দাঙ্গা বার বার ফিরে আসে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে চাই দীর্ঘ মেয়াদী ও নিরন্তর প্রতিরোধ, সমস্ত স্তরে। পুলিশ, সাধারণ নাগরিক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, আইনজীবী সবার নিজস্ব ক্ষেত্রে।

গুজরাতের ভয়াবহ ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের পরিচিত কিছু সত্যের সামনে পুনর্বার দাঁড় করিয়েছে।

১. আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় আবেগ দ্বারা জনরোষের বিস্ফোরণ বলে মনে হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আসলে সংগঠিত অপরাধের প্রকার বিশেষ, যা বৃহৎ পুঁজি ও কালো টাকার দ্বারা লালিত এবং সযত্নে আরোপিত।

২. দাঙ্গার নায়কেরা (যাদের মধ্যে আছে আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদির সরবরাহকারী এবং স্থানকালের নিয়ামকরা) সামনে আসে না, ধর্ম সংস্থাপনের পুণ্যকর্মে ঠেলে দেয় অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পরনির্ভরশীল শ্রেণীকে। গোধরার ঘটনার অনুপুঙ্খ এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত স্পষ্ট নয়, তবে সেখানেও অগ্নিসংযোগ ও পাথর ছোড়ার জন্য যে জনবাহিনীকে জোটানো হয়েছিল তাদের খুদকুঁড়ো ও মাদক ছড়িয়ে দিলেও পাওয়া যায়, একথা নিশ্চিত। আমেদাবাদে অগ্নিসংযোগের জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ব্যবহার করেছে হরিজনদের। এই ব্যবহারের পিছনে বৃহত্তর অর্থনৈতিক লেনদেন থাকতে বাধ্য। আশ্চর্য, এখানে হাসনাবাদেও পুলিশের উপর পাথর ছুড়তে বেরিয়ে আসেন ঝুপড়িবাসিরা।

www.pathagar.com

দাঙ্গার নায়কদের চিহ্নিত করা দরকার। তাদের ছবি ছাপা দরকার। তাদের গতিবিধির উপর সারা বছর ধরে নজর রাখা প্রয়োজন।

৩. এত অস্ত্রশস্ত্র দাহ্য পদার্থ কোথা থেকে এসে জোটে দাঙ্গার সময় ? কারা এগুলি মজুত করে, কোথায় মজুত করে, কারা সরবরাহ করে ? এইসব শাস্ত্রাগারে প্রয়োজন সারা বছরের তল্লাশি। কোথা থেকে উদয় হয় এত সমাজ বিরোধী ? এদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা অকার্যকর হয়ে থাকে কি ?

এইসব কাজ পুলিশ ও প্রশাসন তাদের স্বাভাবিক রুটিন মাফিকই করতে পারে। এর জন্য কোনো বিশেষ নির্দেশ বা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

৪. দাঙ্গায় জনরোষের বলি কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী বা নায়করা হয় না। হন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। আক্রান্ত হয় তাঁদের ঝুপড়ি, ঘরদোর, দোকান। এঁদের সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করা সোজা। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে একটি সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। দাঙ্গার বিরুদ্ধে দরিদ্র, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংগঠিত করা দরকার। এই দায়িত্ব সমস্ত নাগরিকের।

❐

www.pathagar.com

# না, ধ্বংসকে বিধিলিপি ভেবে আমরা চুপ করে থাকবো না আর

—শঙ্ক ঘোষ

আমরা বুঝতে পারিনি যে, সাম্প্রদায়িকতা আর দাঙ্গা কোনো সমার্থক শব্দ নয়, একের অভাবে অন্যের অভাব সূচিত হয় না। সাম্প্রদায়িকতা গড়ে উঠতে থাকে আমাদের প্রতিদিনের আচরণে, আমাদের ব্যবহারিক বিশ্বাসে, আমাদের মগজের গভীরে। আমরা কোনো দিনই খোঁজ নিই না দিনানুদিন সেই মানসিক দাঙ্গার, আমরা জীবনযাপনের সাম্প্রদায়িকতা। তাই আমরা জানতেই পারি না কীভাবে আমাদের অগোচরে দেশের ভিতরেই তৈরি হতে থাকে সমান্তরাল আর একটা দেশ, দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে দেখা দিতে থাকে পূর্ণ এক বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কোনো আয়োজন নেই আমাদের সমাজে, ইতিহাস আমাদের শেখায় না কিছুই।

কিছুই শেখায় না কি? একেবারে কোন আয়োজনই কি নেই? তা বলা যায় না, মৌলবাদ বা সম্প্রদায়িকতার বিপদ নিয়ে কিছুই যে আমরা ভাবি না তা নয়। বছরের পর বছর জুড়ে আমরা অনেক সভা করি, সমিতি গড়ি, গদ্য লিখি, পদ্য লিখি, বইয়ের পরে বই লেখা হয় সাম্প্রদায়িকতার সংকট নিয়ে। কিন্তু কাদের নিয়ে সেই সভা? কাদের কাছে বই? প্রায় একই রকম ভাবছি যারা, তারাই বসি এক সঙ্গে আর তারাই কথা বলি পরস্পর। সেসব সভায় জীবনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করি আমরা, ইতিহাসের বিশ্লেষণ করি, একটি বা দুটি শব্দের ব্যবহার বা অপব্যবহার নিয়ে মরণপণ লড়াই করি। আর তারপর, অনেকখানি কাজ করা গেছে ভেবে তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসি ঘরে।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার কথা বলি, অথচ দুই সম্প্রদায়ের মিলিত সমাবেশ হিসেবে পরস্পরের কথা শুনবার কোনও অবকাশ তৈরি হয় না সেখানে।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার কথা বলি, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ে মেলামেশার কোনো ব্যবস্থাই হয় না দৈনন্দিন জীবনে। আমাদের ইংরেজী-বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলো খুললে বুঝতেও পারি না যে, এ রাজ্যের জনসমাজে একটা মস্ত বড় অংশ নিয়ে আছেন মুসলিমেরা। আমাদের স্কুল-কলেজের পঠনীয় সাহিত্যে বা ইতিহাসের যোগ্য কোনো প্রতিফলন থাকে না ভিন্ন একটা সমাজের, এ ওর দিকে জানাশোনার হাত বাড়াই না আমরা। একশো বছর আগে থেকে বারে বারে এদিকে চোখ ফেরাতে বলেছিলেন একজন মানুষ

www.pathagar.com

তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কবির অলীক ভাবনা মনে করে তাঁর কথাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেছি আমরা, গ্রাহ্যই করিনি কখন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বিষয়ে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামের যে আশ্চর্য প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯০৭ সালে, ওই একই নাম দিয়ে তার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো মানুষ সেদিন বলেছিলেন যে 'সাময়িক' যে ওই মতিভ্রমের জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ তাঁরা দেখেন না। সাময়িকই নয়, সেকথা আমরা ভাবিনি কখনো। উপরন্তু, আমরা সবসময়েই ভেবেছি কোন—একটা অপরপক্ষই শুধু তৈরি করে তুলছে সেই সংকট। বিবদমান আমরা বেশ ভাল মানুষ, আধাকাল্পনিক সেই অপরপক্ষই সাময়িকভাবে আমাদের ভ্রষ্ট করে দিল। অন্যকে দোষ দিয়ে মুক্ত থাকতে চেয়েছি আমরা, তাকাইনি নিজেদের দিকে—নিজেদের অপূর্ণতার দিকে, অক্ষমতার দিকে, অসংগতির দিকে। আর তাই, আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি একেবারে ধ্বংসের এক কিনারায়, আর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করছি পরস্পরের জিঘাংসু এক মূর্তি।

ঠিক ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। এই চেতনা আজ আমাদের চাই। কিন্তু এ চেতনা যেন আমাদের নিঃসাড় করে না দেয়, হতাশায় তলিয়ে না দেয়। কেননা এখনও আমরা বলতে চাই ; এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা। এখনও আমরা স্বপ্ন দিয়ে এ দেশকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে চাই। শপথ নিয়ে বলতে চাই আজ ; দেশকে ধ্বংস করে দিতে চায় যে অবমানবেরা, তাদের হাত থেকে দেশকে আমরা উদ্ধার করে আনব, আনবই।

কেবল, সেই শপথ নেবার সময়ে আমরা মনে রাখবো যে, অনেক দিনের জমিয়ে তোলা ব্যাধি আর সংকট মাত্র কয়েক দিনের জাদুস্পর্শে দূর হবার নয়। বহুদিন ধরে কাজ করে যাবার ধৈর্য চাই আজ। মনে রাখা চাই যে, অনেক দিনের দায় আমাদের সামনে, অনেক রকম কাজের সূচির মধ্য দিয়ে এগুতে হবে আমাদের। এই মুহূর্তে অনেক মানুষকে যদি আমাদের সাথে নাও পাই সে কাজে, তবে কয়েকজন মিলেই শুরু করতে হবে কাজ। আর ভরসার কথা কেবল এই যে, দেশের কোণে কোণে তেমন কাজেরও লক্ষণ কিছু আছে। দরকার কেবল এক কোণের সঙ্গে অন্য কোণের সংযোগ তৈরি করে নেওয়া।

না, ধ্বংসকে বিধিলিপি ভেবে আমরা চুপ করে থাকব না আর।

—১৪ এপ্রিল, ২০০২, আনন্দবাজার

www.pathagar.com

# গুজরাতের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার খেলা

**–সুমন চট্টপাধ্যায়**

হিন্দুত্বকে পুরোদস্তর বজায় রেখেই দিল্লি দখলের খেলায় নামবে বিজেপি। অতএব অটল বিহারীর প্রতিধ্বনি এখন আমরা শুনবো মুহুর্মুহু। গোধরা হলে তো গুজরাত হবেই।

বিপদে পড়লে, গড়পড়তা আর পাঁচজন রাজনীতির কারবারি যা করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও ঠিক সেটাই করলেন। গোয়ার জনসমাবেশে তাঁর মুসলিম বিরোধী ভাষণ এনডিএ-র ভিতরে-বাইরে তীব্র বিদ্রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী আর কালক্ষেপ না করে মিডিয়া নামক নন্দ ঘোষের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে অটল বিহারী যা বলেছেন তার মর্মার্থ ; প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে এনে মিডিয়া তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ বা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলেননি। মুসলিমদের যে জঙ্গি অংশটি দেশে দেশে আজ জিহাদের নামে শান্তি ও সুস্থিতি বিপন্ন করে তুলেছে, তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল কেবল তারাই। প্রধানমন্ত্রীর অপার বিস্ময়, আমেদাবাদের শাহ আলম শিবিরে গিয়ে তিনি দাঙ্গার সমালোচনা করলে সেটা ধর্মনিরপেক্ষতা হয় আর জঙ্গি ইসলামপন্থীদের সমালোচনা করলে সেটা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এই অপচেষ্টা যতটা হাস্যকর প্রায় ততটাই দূরভিসন্ধিমূলক। কেননা জঙ্গি জিহাদিদের সমালোচনা করার জন্য নয়, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে দেশজোড়া প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তাহলো গোয়ার জনসভায়, যে ভাবে তিনি গুজরাতের দাঙ্গার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে রাজ্যের ধিকৃত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যাখ্যার কার্যত কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। মোদীর নির্লজ্জ, নিরাসক্ত বক্তব্য ছিল, গুজরাতের দাঙ্গা গোধরার ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এতটা ক্রুর ভাবে না হলেও প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এটাই—গোধরা-কাণ্ড না হলে গুজরাত কাণ্ডও হতো না কিছুতেই। 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' সংগঠিত করার কাজে গুজরাত পুলিশ ও প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকাটিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাননি প্রধানমন্ত্রী। তার চেয়েও বড় কথা, এ মন্তব্য করে নরেন্দ্র মোদীর মতো অটল বিহারী বাজপেয়ীও

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত গুজরাতের ঘাতকদের 'ফুটকারা' দিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এটা যে শুধু সংবিধানের অবমাননা তাই নয়, দেশের পক্ষেও চরম লজ্জা আর আশঙ্কার।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর মুখে গুজরাত দাঙ্গার এহেন অপব্যাখ্যা শুনে যাঁরা প্রবল বিস্ময়ে 'ব্রুটাস তুমিও' গোছের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে বলিহারি যাই তাঁদেরও। কেননা সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় রাজনীতির একটা মস্তবড় 'মিথ' হলো এই যে, বাজপেয়ী সঙঘ পরিবারের সবচেয়ে 'লিবারেল' মুখ লালকৃষ্ণ আদভানী বা মুরলী মনোহর যোশীর মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সাথে যাঁকে একই বন্ধনীতে ফেলা যায় না এবং পরিবারের অন্দরে কট্টরপন্থীদের চাপের কাছে যিনি নতি স্বীকার করবেন না কিছুতেই।

এইকথা ঠিক যে, ধীরে ধীরে এই 'মিথ' তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি কারণে। '৮৫ থেকে '৯২ আডবণী যখন রাম জন্মভূমি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, বাজপেয়ীকে তখন সেই মঞ্চে দেখা যায়নি কার্যত একবারও। মুলায়ম সিং-এর জমানায় প্রতীকী করসেবা করতে এসে একবার গ্রেফতার বরণ করা ছাড়া অটলবিহারী বাজপেয়ী আর আন্দোলনে অংশও নেননি। একইভাবে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে উগ্র হিন্দুত্বের লাইন থেকে দলকে সরিয়ে এনে কংগ্রেস বিরোধী, অ-বাম ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গড়ার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাজপেয়ীই। বস্তুত জোটের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিজেপি বাজপেয়ীকে তুলে ধরেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে এই কোয়ালিশন গড়াও সম্ভব হয়েছিল। বাজপেয়ীর জায়গায় বিজেপি আডবাণী বা অন্য কাউকে তুলে ধরলে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হতো না। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয়, সারা জীবন ধরে সযত্নে লালিত তাঁর স্বয়ংসেবক সত্তাটিকে বাজপেয়ী কোনো দিন অস্বীকার করেছেন কিংবা দলে হিন্দুত্বের আদর্শ বা নীতির প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস নেই। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ীর আচরণেও এই সত্যটা বে-আব্রু হয়ে পড়েছে বেশ কয়েকবারই।

যেমন, ক্লিনটন জমানায় প্রথম আমেরিকা সফরে গিয়ে নিউইয়র্কের অনতিদূরে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমাবেশে পৌরোহিত্য করেছিলেন বাজপেয়ী। শুধু তাই নয়, সমবেত সাধু সন্তদের প্রবল করতালির মধ্যে অটল বিহারী ঘোষণা করেছিলেন, আজ বাদে কাল তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব চলে যেতে পারে কিন্তু স্বয়ংসেবকের পতাকাটি তাঁর হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

www.pathagar.com

# আজও এত বিষ!

–ভীষ্ম সাহানি

ঘড়ির কাটাকেও কি কখনো পেছনে ঘোরানো যায়! আমাদের ভাঙার বীজ বপন করে উপনিবেশের চালকরা দেশ ছেড়েছিল। তারপর পঞ্চান্ন বছর কাটতে চললো। তবু কি আমরা আজ এতটুকু আলোর আশা করতে পারি না আমাদের সব পথেঘাটে, আমাদের এই সময়ে ? আমাদের এ দেশটার নাম ভারতবর্ষ। যার বহু বৈচিত্রের ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-পরিধানের মর্মকথা অনন্য সহনশীলতা। আজ এতদিন পরেও কেন আমরা বুঝতে বা বুঝাতে পারি না, ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো বিকল্প নেই এ দেশে। এর চেয়ে বেশি গুরুত্বের কোনো শব্দ ..... নেই ..... অর্থ ..... নেই আমাদের প্রিয় দেশে। কেন এখনো সোচ্চারে বলতে হবে, বুঝাতে হবে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করার মধ্যে কোনো গর্ব নেই। যার নাম সাম্প্রদায়িকতা, তার বিষ কেন আজও ছড়াবে আমাদেরই পরিবেশেই ?

প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। সঙ্গে কয়েকজন সাথী। বললাম, আমরা আতঙ্কের বিরুদ্ধে লড়বো কী করে, যদি না আতঙ্কের প্রবক্তাদের ; অন্ধকারের প্রগাঢ় প্রচ্ছায়ার ভেতর বিচরণ করছে যারা, তাদের কুৎসিত চলাফেরা রুখতে পারি ? স্পষ্ট কথায়, কেন নিষিদ্ধ করা যাবে না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বজরং দল-ওয়ালাদের, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে সমাজে ?

এরই পাশাপাশি আরও কিছু পথ আছে। সেইসব পথেও তো যেতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রগতির আলোয় উদ্ভাসিত করতে হবে, দিতে হবে তাদের প্রাপ্য শিক্ষার সুযোগ। যাতে বিভিন্ন মঞ্চে আমাদের সমাজের সব গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, মত বিনিময়ের সুযোগ বেড়ে উঠে। যৌথ প্রতিনিধিদের সংস্থা গড়ে তোলা যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, আপনি প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে সুনিশ্চিত করুন। আইনের শাসন অবিকৃত রাখতে রাষ্ট্রকে থাকতে হবে সদাজাগ্রত প্রহরী হয়ে। এছাড়া আর এই মুহূর্তে অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। যাঁরা এখনো বলে চলেছেন, কোনো কুৎসিত ঘটনার 'প্রতিক্রিয়া'য় মানুষে মানুষে হানাহানি ছড়াচ্ছে—তাদের বলার কিছু নেই। তাদের বোধোদয় হোক, এছাড়া আর কী বলবো ? একটা জায়গায় দশজনের উপর আক্রমণ হলে তার পাল্টা কুড়িজনকে আক্রমণ করতে হবে ? এটা কি সভ্য সমাজের সূত্র হতে পারে ?

www.pathagar.com

আমি ঠিক জানি না, বা হয়তো বুঝেই উঠতে পারি না অযোধ্যা নিয়ে ওঁরা কী বলতে চান। যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ, সে বিষয়ে কোনো বিজ্ঞজনোচিত মতামত দিতে চাই না। আমি জানি অন্ধকার যে কোনো ব্যাখ্যায় অন্ধ। আমি জানি অন্ধকারের ভেতর আলোর কোনো বিকল্প নেই।

–১০ মার্চ, ২০০২ আজকাল



www.pathagar.com

# রাজা তোর কাপড় কোথায় ?

–সোনিয়া জব্বার

নিজেদের কী নামে ডাকবো জানি না। কুৎসিত, বর্বর, অসভ্য—কখনো হতে পারে এ দেশেরই মানুষ। আমাদেরই সতীর্থ নাগরিক। পাকিস্তান আমাদের আক্রমণ করলে তো বুঝি, কেন। কিন্তু যখন আমরাই আমাদের ছিঁড়ে খেতে চাই, তখন ? একটা শব্দ শুনছি। নতুন নয়। বিরানব্বইতেও, অথবা আরো কখনো শুনেছি এ পরিভাষাটি। আমরা নাকি নতুন করে জেগে উঠছি, নতুন এক বিশ্বশক্তি হওয়ার দিকে নিরন্তর পা বাড়াচ্ছি। তাই কি এই শব্দটাও আবারও শুনতে হচ্ছে ? মানে, সেই 'প্রতিক্রিয়া'র কথা ? চোখ জ্বলছে। বিশ্বাস করুন, চোখের জল শুকিয়ে যাওয়া কারে বলে, যারা জানে না, তাদের জন্য প্রার্থনা, যেন কখনো জানতে না হয়। এতো ব্যাপক গণহত্যা, 'ওদের' মতে যার নাম নিউটনের 'থার্ড ল'।

হ্যাঁ, আপনারা সবাই কাগজে পড়েছেন বা টেলিভিশনে শুনেছেন, গুজরাটের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রদেশে সংবিধানের হর্তাকর্তা, বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী একথা বলেছেন। আমেদাবাদে গিয়ে দেখেছি কি জানেন ? পুলিশের জিপে করে পেট্রল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সেই পেট্রল কারা ঢালছে মানুষের ঘর পোড়াতে ?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সত্যিই ভাল মানুষ। ওঁর কাছে না গেলে, ওঁর কথা না শুনলে আমারও হয়তো অনেক কিছু জানা হতো না। জানা হতো না ভয়ঙ্কর সব তথ্যে ওঁর মতো পদস্থ এবং ভারতের জনগণ, জনগণের জন্য তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ একজন মানুষের কী প্রতিক্রিয়া। তথাকথিত সেই প্রতিক্রয়ারও প্রতিক্রিয়া সত্যিই শোনার মত। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম আমাদের গান্ধীবাদী প্রবীণা নেত্রী নির্মলা দেশপাণ্ডের সঙ্গে। ছিলেন রেভারেন্ড ভালনন থাম্পু, সঈদা হামিদ, প্রকাশ লুইস। সাত দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দিই তাঁর হাতে। বলি, আমরা জানি, আপনাকে অনেক রকম রাজনৈতিক বাধ্যতার মধ্যে কাজ করতে হয়। অনেক সময় অনেক দৃঢ়চেতা মানুষকেও রাজনৈতিক বাধ্যতার মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু মহাশয়, আমাদের ভারতবর্ষে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা থাকলেও, হাতে গোনা কয়েকজন চিরস্মরণীয়ের মধ্যে নিজের স্থান করে নিন। সব রাজনৈতিক বাধ্যতার উর্ধে উঠে দেশকে

www.pathagar.com

অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে নিন। ইতিহাস আপনাকে মনে রাখবে। কিন্তু হায়! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জবাবগুলো শুনুন।

একটুও অবাক হবে না। একবারও মনে করবেন না আমি জল মিশিয়েছি। পূর্ণ বিশ্বাস, সততা ও আস্থা নিয়ে আমি লিখছি। দাবি করবো সেই বিশ্বাস ও আস্থা। প্রধানমন্ত্রী, এনডিএ-র প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'গুজবে একদম কান দেবেন না। চারদিকে দারুণ গুজব ছড়াচ্ছে মিডিয়া। মিডিয়ার ভূমিকা যে এতটা খারাপ হতে পারে, আমি ভাবতে পারি না। মাননীয় পাঠক-পাঠিকা, আপনার কী মনে হচ্ছে জানি না। আমি কিন্তু শিউরে উঠেছি ওঁর কথা শুনে। সত্যি, রাজনীতিবিদদের, মানে সবারই কখনো নয়, কারো কারো চোখে একেবারে পর্দা নেই, আর কারো বা চোখের সামনে পুরোটাই পর্দা টানা। এই দুই জাতীয় মানুষের চোখে কুম্ভীরাশ্রু আকছার দেখেছি। কিন্তু এমন অসামান্য 'প্রতিক্রিয়া' দেখিনি। আহ্ কী দেখলাম তাঁর অভিব্যক্তি, কী শুনলাম বাচনভঙ্গী। যাঁরা কুম্ভীরাশ্রু ফেলেন তাঁরা তো ধরা পড়ে যান কখনও কখনও। কিন্তু আহা, আমি যা শুনেছি তা জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না।

আমাদের দেশের নরমপন্থী ও কবি প্রধানমন্ত্রীর উক্তি ঃ বড্ড বাড়াবাড়ি করছে মিডিয়া। বাড়িয়ে-চড়িয়ে যা নয় তাই দেখাচ্ছে। আমি বুঝলাম, নরেন্দ্র মোদীর অপসারণ চাইতে এসেছি কার কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে যে লোকটা পাঁচশো থেকে হাজার মানুষের খুন হয়ে যাওয়া ঠেকাতে পারেন না, তাঁর ওই পদে বসার অধিকার থাকে! সেই লোকই আইএএস, আইপিএস অফিসারদের ডেকে জ্ঞান দেন। সেই একই মূর্তিতে সংবিধান অনুযায়ী শপথ নিয়ে ওই লোকই বসেছেন জনতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে। কদিন আগেই গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরে গেরুয়া চাদর জড়িয়ে ঘুরতে দেখা গেছে হাত নাড়তে নাড়তে। এখন মালা ঝরে গেছে। রয়ে গেছে গেরুয়া কাপড়টাই।

প্রধানমন্ত্রী টলেননি দেখেও আমরা নাছোড়। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করুন। এমন কোনো নিষ্ক্রিয় মুখ্যমন্ত্রী গদিতে থাকতে পারেন না। বিরোধীরা কেউ অবুঝের মতো বললেন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেই বা কী হবে, নরেন্দ্র মোদির জায়গায় আসবেন তাঁরই সংঘের গুরুস্থানীয় নেতা ও অধুনা রাজ্যপাল ভাণ্ডারি। আর আদভানিই তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সুতরাং সরাসরি সামরিক বাহিনীর হাতে দেওয়াই ভাল। কিন্তু এটা ঠিক রণনীতি নয়। ভাণ্ডারি বা আদভানি যে নরেন্দ্র মোদীর গুরুস্থানীয়, তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ব্যবস্থা অনুযায়ী আদভানি বা ভাণ্ডারিকে প্রকাশ্যে পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা তো যাবে। বুঝা তো যাবে। বুঝানোও যাবে

www.pathagar.com

ওঁরা কে কী করছেন। বিরোধীদের একথা শুনে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, এই ফাঁক দিয়ে নরেন্দ্র মোদী চালিয়ে যাবেন ? মাঝে মাঝে এই কথাগুলি বলে নিচ্ছি। কারণ, আমাদের কবি প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ প্রতিক্রিয়া একাধারে পড়লে আপনাদের হতাশা বাড়বে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে।

এবার আমাদের পরবর্তী দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে নিষিদ্ধ করুন। মুসলিম উগ্র সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করলে হিন্দু উগ্রদের করা যাবে না ? আমি তো বলেই ফেললাম, সরকার তো হুরিয়তের সাথে সরকারীভাবে কথা বলতে চায় না। তাদের মধ্যে কারো কারো জাতীয়তাবিরোধী আচরণের জন্য। তাহলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের এত ঘটা করে ডেকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে কথা বলা কেন ? ওঁরা কে ? ওঁরা কাদের প্রতিনিধি ? কারা ওঁদের নির্বাচিত করেছেন ? প্রধানমন্ত্রীর মুখ ব্যাজার। তবু আমরা বলি, পাকিস্তানে জেনারেল মোশাররফ যদি গরিষ্ঠ অংশের মৌলবাদী সংগঠন নিষিদ্ধ করতে পারেন, তাহলে আপনি পারবেন না কেন ? প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে জবাব দেন, তিনি (মোশাররফ) একজন স্বৈরতন্ত্রী শাসক। একনায়ক। আর আমরা তো গণতন্ত্রের কাঠামোর ভেতর কাজ করি। তাই মোশাররফের মত যখন-তখন যাকে খুশি নিষিদ্ধ করতে পারি না। ওঁকে মুখের উপর বলতে পারিনি, কিন্তু এই সুযোগে লিখছি। আপনার গণতন্ত্রে আপনি কি দারুণ বাছাই করার সুযোগ পান। আপনি 'সিমি'-কে নিষিদ্ধ করতে কি যথেষ্ট গণতান্ত্রিক বেগ পেয়েছেন ? পেলেও কি থেমেছেন ? তাহলে ? কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করতে কি চেয়েছেন কখনো ? এমন কি হয়েছে মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী, যে আপনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করলেন আর বিরোধীরা সংসদে আপনাকে রুখে দিল ? যুক্তিটা একটু নিজের কানে শুনিয়ে দেখুন তো, কেমন লাগে ? বিনম্রভাবে যতটুকু বলা যায়, বলেছিলাম ওঁকে। কিন্তু তিনি বলেছেন, আপনাকে তো একটা ভিত্তির উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওদের নিষিদ্ধ করার ভিত্তিটা তো চাই।

অর্থাৎ এটাই আসল। যেটা বিনয় কাটিয়ারও বলেন। মানে কে নরম, কে গরম বুঝাবেন অটলবিহারী বাজপেয়ীজি ? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এবার মহামান্য আদালতের কাছেও একটা প্রশ্ন রাখছি, অরুন্ধতী রায়কে হাজতে পোরা হয়েছে। আর অশোক সিংঘল, গিরিজা কিশোর এবং আমাদের চার্জশিটগ্রস্ত আরো মহামান্যরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রকাশ্য দিবালোকে। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে এঁরা দিনে কতবার, কতভাবে, প্রকাশ্যে আদালত অবমাননা করেন ? আপনারা কী জবাব দেবেন ? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন দেখা হয়েছিল, তখনও অরুন্ধতীর ঘটনা ঘটেনি।

www.pathagar.com

আচ্ছা কবি অটলজি, আপনি অরুন্ধতীর গ্রেফতার সম্পর্কে কোনো মতামত দেবেন ? নিশ্চয়ই বলবেন, আপনি বিচার বিভাগের অধিকার, মর্যাদা, সম্মান রক্ষার শপথ নিয়েছেন। তাহলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 'আদালত'-কে 'আস্থা' দিয়ে ধামাচাপা দিতে চাইলে আপনি কী করেন ? আচ্ছা, আমি কি সেই গল্পটা শোনাতে পারতাম ওঁকে ? সেই নিষ্পাপ শিশুর গল্প, যে রাজাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাজা তোর কাপড় কোথায় ?'-১০ মার্চ, ২০০২, আজকাল

❐

www.pathagar.com

# কেন এই গরিব-মারা রাষ্ট্রীয় বাজেট ?
# কেন ধর্মের নামে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ?

–মহাশ্বেতা দেবী

গোধরার করসেবক হত্যার কল্প অথবা সত্যকাহিনী মাঝে মাঝে একটু একটু বলব, যা পড়েছি তা নয়, যা জেনেছি তা-ই। ঘটনার পর গুজরাটে ঘটনা এমনই ছিল যে, প্রথম দিকে মিডিয়া যথেষ্ট ভিতরে ঢুকতে পারেনি। জয়া জেটলি ও ডন-করসেবক আদভানি (কলিযুগে তাঁরই তো প্রথম রথ)। যত প্রশংসাপত্র দিন না কেন, গুজরাটে এই মুহূর্তেও দাঙ্গাজখম মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে কোনও পুলিশ নেই। পুলিশি সাহায্য ছাড়া ওরা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছে। পুলিশ নেই, সরকারের কেউ আসে না—পুলিশ কত সময়ে কত মানবিক আচরণ করে কিন্তু গুজরাটে তাদের এই নির্বেদ্যতার কারণের তদন্ত ও শাস্তি হবে ? নরেন্দ্র মোদীর নামই উচ্চারণ করবো না। ওঁর মুখ্যমন্ত্রী পদের আগে '—' চিহ্ন মনে মনে বসিয়েই শান্তি পাই। এখন অবশ্য কয়েকশ '—' চিহ্ন বসানো দরকার, মনে মনেই '—' লিখে দিচ্ছি।

আরব্যোপন্যাস একেবারে। সিন্দুকের মধ্যে সিন্দুক, তার মধ্যে সিন্দুক। শেষ পর্যন্ত মূল সিন্দুকে অর্থমন্ত্রী। পৃথিবীতে তুলনাহীন গরিব ও সাধারণ মানুষ বিরোধী বাজেট তিনি তৈরি করেছেন। গ্যাস, কেরোসিন, মোমবাতি, খাম-পোষ্টকার্ড, স্বল্প সঞ্চয়, ব্যাংকের সুদ, সাদা-কালো টিভি—এসব যাদের জীবনে চূড়ান্ত অর্জন, সেই ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ অথবা জনতার পকেট কেটে বাকি ১০ শতাংশের পকেট ভরবেন। এটিই তাঁর এবং তাঁর সরকারের প্রধান ইস্যু। দেশ, মানুষ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, কেন্দ্রে বসেই তহবিল ফাঁকা করে ক্ষমতাশালীদের পকেট ভরানো, রাজ্যে রাজ্যে অনুরূপ যাহে ঘটে সেই কাজে পরোক্ষ মদদ দান, বাইরের দুনিয়ার সাদা চামড়ার প্রভুদের পদলেহন, এখন এ সবই ইস্যু, সাধারণ শান্তিকামী মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা নন-ইস্যু। এই ভয়ঙ্কর বাজেট আমাদের বিনা প্রতিবাদে খাওয়ানোর জন্যে গুজরাট জ্বালানো দরকার ছিল। অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের সাফল্যে সতত গর্বিত। চিন্তা-ভাবনা এমন—এমন বাজেট নিয়েই তো রাজ্যে রাজ্যে তুফান উঠতে পারতো, উঠতে দিলাম না আমরা। উল্টো দিকে নামালাম মারণযজ্ঞ।

www.pathagar.com

এই কাজে হাত মেলাল যশোবন্ত-লালবানিদের এবং সংঘ পরিবারের সরকার। জয়া জেটলির চমৎকার বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদীর নাকি আর কিছু করার ছিল না। সবই তিনি করেছেন। আর কতজনই না বললেন, এটা গোধরার ঘটনার প্রতিক্রিয়া। রিঅ্যাকশন থেকে অ্যাকশন।

গোধরা বিষয়ক সত্য বা কল্পকাহিনী এই রকম—'ট্রেনে করসেবকরা খুবই আনন্দ-উত্তেজিত ছিলেন। গোধরার আগে দাহোদ স্টেশনে চায়ের পয়সা দেব কি দেব না থেকেই হল্লা শুরু হয় বলে ইতিশ্রুতি।' ঘটনার বিবরণ টেলিফোনেই শুনছি বেশি, তা অস্বীকার করবো না। 'গোধরা স্টেশনেও একই ঘটনা ঘটে, তবে অনেক চড়া মাত্রায়। সেখান থেকে ট্রেন যখন ছাড়ে, তখন করসেবক নন, এমন এক যাত্রীর আশংকা হয়েছিল ট্রেনের মধ্যে হাঙ্গামা হবে।' আমাকে যিনি বলেন, তাঁর বক্তব্য—'কোনো একজনকে জোর করে ট্রেনের কামরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল। তখনও তিনি জানেন না সে পুরুষ না রমণী, বালক না বালিকা।'

গোধরা ছাড়ার পর কে বা কাহারা শিকল টেনে ট্রেন থামায়, তা-ও এই ভদ্রলোক জানেন না। কিন্তু এক উত্তেজিত বিরাট জনতা ছিল বাইরে। তারা কোনো একজনকে ছেড়ে দিতে বলছিল, ইত্যাদি। তারপর আগুনও সত্যি, কেন না অতগুলো মানুষের শোচনীয় মৃত্যু তো আগুনে পুড়েই ঘটেছে। এ পর্যন্তই শুনেছি।

পাঠক উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যবর্তী কথাগুলো বক্তার। এ রকম খবর আসছে তো আসছেই, টুকরো টুকুরো। জানা যাচ্ছে, গোধরায় একদা প্রায় এক বছর কার্ফু জারি ছিল, নৈশ কার্ফু। গোধরাতেও প্রচুর ঘরবাড়ী ধুলিসাৎ হয়েছে—এগুলোও শোনা খবর। সময় ও প্রয়োজনমত যাচাই করা যেতেই পারে।

করসেবকদের হত্যার খবরে প্রতিক্রিয়া তো হয়েছেই। করসেবক হত্যা এবং গুজরাট সরকার নিষ্ক্রিয় থেকে বহু মানুষ, সম্পত্তি, দোকান, বাড়ীঘর পুড়তে দিল। লুট হতে দিল। সিন্ধিরা স্বভাবত ব্যবসা ও দোকানপাট করেন। তাঁদের দোকানপাট লুট হয়েছে। আমেদাবাদে বহু বাঙালি অলঙ্কার-কারিগর, বরোদা ও মুম্বাইতে অনেক তরুণ ফুলের গয়না, তোড়া, বাস্কেট তৈরিতে নিযুক্ত আছেন। তাঁরাও এখন বিপন্ন। তারপর ইউপি-ও মঞ্চ হয়ে উঠলো। উত্তর প্রদেশেই অযোধ্যা। বিধান সভার সদস্যের হত্যা এবং তড়িঘড়ি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি। বিধান সভার কোনো একজন সদস্যের মৃত্যু অবশ্যই দুঃখের কিন্তু সেই একটি মৃত্যুই রাষ্ট্রপতির শাসন জারির পক্ষে যথেষ্ট কারণ হয়ে গেল? এতে কি গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা, মানুষের ভোট দেওয়া

www.pathagar.com

সম্মানিত হলো ? সব ঘটনাই এই আশ্চর্য বাজেটটি থেকে দেশের মানুষের মনোযোগ সরিয়ে রাখছে। প্রত্যক্ষ মদদে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে করসেবক নন এমন ধর্মনিরপেক্ষ সকল সাধারণ মানুষই বিপন্ন। আমরা কি আবার দেখব, ভারতে রক্তোৎসব শুরু হয়ে গেল ? জাতির জীবনে সমস্যা কখন কিছু কম ছিল না। এখনো আছে। কী গোধরা, কী উত্তর গোধরাপর্ব। এ থেকে ফায়দা উঠাবে কারা ? লাভবান হবে কে ? হঠাৎ অরুন্ধতী রায়কে ধরা হলো কেন ? জলঘোলা করতে ? তার ফলে আসল বিপদ থেকে মানুষের মনোযোগ কিছু সরে যাক, সে জন্য ? যাক, সেটা সফল হয়নি। এজন্যই আবেদন জানাচ্ছি দেশের মানুষ সমস্বরে আওয়াজ তুলুন—উগ্র ও হিংস্র এবং মৌলবাদী সকল ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করা হোক। ভারত সরকারের প্রত্যহ ক্ষীয়মান বিশ্বাসযোগ্যতা, যা এখন নীচে পড়ছে তো পড়ছেই, তা কোথাও ঠেকে থাকুক। অবশ্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বোধহয় তা-ও পারবে না। এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার যাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, শুভ্র ও স্বচ্ছ, তারা কিছুই পারবে না।

❐

www.pathagar.com

# সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভগৎ সিংয়ের আদর্শ চাই

–এ. কে. রয়

দেশে আজ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি আত্মরক্ষাত্মক, সাম্প্রদায়িক শক্তি আক্রমণাত্মক। দেওয়ালে লিখে দেওয়া হল ঃ 'গর্বের সাথে বল আমি হিন্দু।' কিন্তু মার্কসবাদীরাও লিখতে পারল না, 'গর্বের সাথে বল আমি কমিউনিস্ট।' এক সময় ছিল বড় পুঁজিপতিদের পার্টি কংগ্রেসও সমাজবাদের কথা বলত, সংবিধানে 'সমাজবাদ' ভারতের নামের সঙ্গেও যুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু আজ বামপন্থীরাও সমাজবাদের নাম নেয় না এবং তাদের যুব সংগঠনের নাম 'জনবাদী' রাখে। 'শান্তির ললিত বাণী' দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে রোখা যায় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে গেলে শ্রেণী সংগ্রাম চাই, যেটা আজ মার্কসবাদীরাও ভদ্রলোক হওয়ার পরে ছেড়ে দিয়েছে একমাত্র বোনাস এবং ওয়েজ বোর্ডের লড়াই ছাড়া। কিন্তু অর্থবাদ দিয়ে সম্প্রদায়বাদকে আটকানো অসম্ভব। ভগৎ সিংয়ের মত এ বিষয়ে স্পষ্ট ছিল। শোষণ ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করেই সাম্প্রদায়িকতাকে সমাপ্ত করা যেতে পারে। ভগৎ সিং দিল্লি অ্যাসেম্বলিতে যখন বোমা ফেলেছিলেন সেখানে মজদুর বিরোধী 'ট্রেড ডিসপিউট বিল'-এর ওপর বিতর্ক হচ্ছিল। আজ তার থেকেও ভয়ানক শ্রমিক বিরোধ এবং পাবলিক সেক্টর বিরোধী বিল সংসদে পাস হচ্ছে, কিন্তু বিরোধী ভগৎ সিংয়ের অভাব।

ভগৎ সিংয়ের সাথী সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি ২৩ মার্চ, ১৯৩১-এ হয়েছিল। করাচি কংগ্রেসের ঠিক আগে এ খবর পুরো দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, যার বর্ণনা নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁর বই 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ করেছেন। এর কিছুদিন আগেই ১৮ মার্চ ১৯৩১ গান্ধী-আরউইন সমঝোতা দ্বারা 'আইন অমান্য আন্দোলন' (No Confidence Movement) সমাপ্ত করা হয়েছিল। নেতাজির মত ছিল, যতক্ষণ ভগৎ সিং এবং তাঁর সাথীদের উপর ফাঁসির সাজা রদ করা না হয়, সমঝোতা যেন না হয়। এখানে স্মরণযোগ্য এর আগে ৪ এপ্রিল ১৯২৯ অ্যাসেম্বলিতে বোমা ফেলার জন্য ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এটাও এক কঠিন নির্ণয় ছিল আর সেটাও কোনও ভাবাবেগে হঠাৎ নেওয়া হয়নি, বহন করে নেওয়া হয়েছিল। অ্যাসেম্বলিতে বোমা ফেলতে যাওয়া মানে গ্রেপ্তার হওয়া এবং ভগৎ সিংয়ের

www.pathagar.com

গ্রেপ্তার হওয়া মানে নিশ্চিন্ত ফাঁসি। কারণ স্যান্ডার্স হত্যাকাণ্ডে নামকরা আসামী। আর হলও তাই। অ্যাসেম্বলীতে বোমা ফেলার জন্য ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের আজীবন কারাবাস হয়েছিল। তারপর ভগৎ সিংয়ের ওপর স্যান্ডার্স-হত্যার মামলা চলা যাতে তাঁর ফাঁসির সাজা হয়।

এইভাবে ৪ এপ্রিল ১৯২৯ থেকে ২৩ মার্চ ১৯৩১–ভগৎ সিং জেলেই ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধর্ম এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা ভোলেননি। মৃত্যুর আগে মহান নাস্তিকও আস্তিক হয়। কিন্তু ভগৎ সিং ফাঁসির ঠিক পাঁচ মাস আগে ৬ অক্টোবর ১৯৩০-এ লিখেছিলেন ঃ কেন আমি নাস্তিক ? এতে ধর্মের ঠিকেদারদের চ্যালেঞ্জ করে যে প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং রাজনীতি, সমাজতন্ত্র থেকে ডারউইনের 'জীবের উৎপত্তি'র উপর যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যেটা আজও অনেক সমাজশাস্ত্রীর পক্ষে শিক্ষণীয়। এ রচনা কোনো লাইব্রেরীর ঠাণ্ডা ঘরে বসে লেখা হয়নি, জেলের ফাঁসির কুঠুরিতে লেখা হয়েছিল। নিজের জীবন যখন শেষ হচ্ছে তখন ভারতবাসীকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করার এই চিন্তাধারা ভগৎ সিংয়ের মানসিক শক্তি, ভারসাম্য এবং নিজের চিন্তাধারার প্রতি দৃঢ় থাকার এক বেমিশাল উদাহরণ।

আজকের আতঙ্কবাদীদের বিপরীত ভগৎ সিং এক বিপ্লবী ছিলেন, যাঁরা সবসময়ই মানবতাবাদী হন। স্যান্ডার্স হত্যার পরে লাহোরের দেওয়ালে লাল কালিতে লেখা এক পোস্টার দেওয়া হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল ঃ

"আমরা মানুষের জীবনকে পবিত্র ভাবি। আমরা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখি যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং স্বতন্ত্রতার অবসর পায়। আমরা কোনও ব্যক্তির রক্তপাতে বাধ্য হওয়ার জন্য দুঃখী। কিন্তু বিপ্লবের দ্বারা সবাইকে সাম্য, স্বাধীনতা এবং মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণ সমাপ্ত করার পথে কিছু রক্তপাত অনিবার্য।"

সব শেষে ওই দিন এল। ২৩ মার্চ, ১৯৩১। আন্দোলনের ভয়ে ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরুর ফাঁসি সময়ের আগেই হয়েছিল। ওই সময়ের আইসিএস এবং পরে রাষ্ট্রদূত কেপিএস মেনন এক রচনায় উল্লেখ করেছিলেন, শেষ ডাকের সময় ভগৎ সিং একটি বই পড়ছিলেন। লেলিনের 'রাষ্ট্র এবং বিপ্লব'। প্রহরীকে উনি বলেছিলেন, 'দাঁড়াও, এক বিপ্লবী অন্য বিপ্লবীর সাথে ভাবের আদান-প্রদান করছে।' প্রহরী তো তখন দাঁড়ায়নি, কিন্তু ইতিহাস আজ হঠাৎ হেসে ওই দিকে তাকাচ্ছে।

ভগৎ সিং থেকে লেনিন, এরই মধ্যে ভারতের সংকট মুক্তির রাস্তা নিহিত আছে।-২৩ মার্চ, ২০০২, আজকাল

www.pathagar.com

# গুজরাট নিয়ে প্রশ্ন, বাংলা নিয়ে ভাবনা

—তপন মিত্র

৫০ দিন ধরে পড়েছি গুজরাটের বিষয়। বহু প্রশ্ন জেগেছে। তার কিছু প্রশ্ন হয়ত আরও অনেকের মনে। আর কিছু প্রশ্নের সম্ভাব্য জবাব জাগায় আমার আতঙ্ক।

**গুজরাটের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন**

১. বিস্তীর্ণ তল্লাট ঘুরে, ঘর জ্বালাতে, মানুষ পোড়াতে, কারখানা গুঁড়ো করতে অনেক টাকা লাগে। সে টাকা এলো কোত্থেকে ?

২. লক্ষ লিটার পেট্রল/কেরোসিন, লক্ষ সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার হয়েছে মানুষ, ঘর, দোকান জ্বালাতে। কে দিল ? কোত্থেকে এলো ? পেট্রল-কেরোসিন-গ্যাস লুটের কোনও খবর চোখে পড়েনি।

৩. এত বুলডোজার এল কোত্থেকে। কারা ছিল দক্ষ-অভিজ্ঞ চালক। যারা ইমারত গুঁড়িয়ে তার ওপর রাতারাতি পিচের রাস্তা করে দেয় ?

৪. পঞ্চায়েত-পৌরসভা-সরকারী দপ্তরের নথি পাচার হয়েছে—ভোটার লিস্ট, পৌরকর তালিকা, মুসলিম তাঁতির নিবাসের ঠিকানা। আয়কর ও বিক্রয়কর দপ্তর থেকে জোগাড় হয়েছে দোকান/কারখানা মালিকের নাম-ঠিকানা। এই গোপনীয় বা ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করাটা বেআইনি। তদন্ত হবে ? দোষীর সাজা হবে ?

৫. গুজরাটের বড় কোম্পানিদের কী ভূমিকা গণহত্যার সময় ? আমুল, গুজরাট-অম্বুজা, আইপিসিএল, রিলায়েন্স, এশিয়ান পেইন্টস ইত্যাদিরা ত্রাণের জন্যই বা কী করেছে ?

এসব কোম্পানি, বজরং দল, দুর্গা বাহিনী ইত্যাদির কত চাঁদা দিয়েছে সম্প্রতি ?

৬. বাইরের টাকার কী ভূমিকা গুজরাটি জাতির সমাজ-সংস্কৃতির ফাটলে ? আমেদাবাদ-ভারোচ-বরোদাতে দেখেছি, গুজরাটি যৌবন উন্মত্ত মেতেছে আমেরিকান ভোগবাগে। তাই প্রশ্ন ঃ গোধরা-আমেদাবাদ-বরোদা-ভারোচের লুট-গণহত্যায় কী ভূমিকা নিয়েছে বাইরের টাকা, বাইরের উস্কানি, অমানবিক ভোগবাদ ?

www.pathagar.com

৭. বীরসিং রাঠোর, মঙ্গলভাই পাতিলরা উজ্জ্বল নজির রেখেছেন, নিজ প্রাণ বিপন্ন করে মুসলিম প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিয়ে। সেগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগ। গণহত্যা, লুট, ধ্বংসলীলা থামানোর সংগঠিত স্বক্রিয় প্রয়াস কতটা হয়েছে ?

৫০ দিন ধরে গণহত্যার সময় গুজরাটের বাম দলগুলির কী ভূমিকা ? গুজরাটের অগুনতি এনজিও-র ভূমিকা কী ? ট্রেড ইউনিয়নরা, শঙ্করাচার্যরা কোথায় গেলেন ? নরহত্যা থামানো কি তাঁদের এক্তিয়ারে পড়ে না ? মুসলিম নায়করা বার বার পাড়ি দেন অযোধ্যায়, তাঁরা কি বুক পেতে দিয়েছিলেন গণহত্যা থামাতে ? জৈনরা, মুখ ঢাকেন যাতে ছোট্ট জীবাণুরও কোনো হানি না হয়। সেই জৈন নেতারা কী করেছেন গণহত্যা থামাতে ?

৮. গুজরাটে সন্ত্রাস চলছে। পরিকল্পিত সন্ত্রাস। সন্ত্রাস চলছে ৫০ দিন ধরে ; মৃত নাকি দু' হাজারের বেশি (ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট), শরণার্থী এক-দেড়-দুই লক্ষ। সন্ত্রাস-বিরোধীদের প্রতিবাদ এত নরম কেন ? প্রতিরোধের কোনও চেষ্টা নেই কেন ?

৯. গুজরাট গণহত্যার পটভূমিতে দাবি উঠেছে ; চাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। এটা কি রাজনৈতিক চাপান-উতোরের খেলা হয়ে গেল না। অত দীর্ঘ জঘন্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি এত ঠুনকো হওয়া উচিত ?

১০. নামী-দামী বুদ্ধিজীবী থাকেন গুজরাটে, আছে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটসহ অসংখ্য পেশাদারি সংগঠন। গণহত্যার সময় তাঁরা কী করেছিলেন ?

ত্রাণের অবস্থা দেখলে, আরও প্রশ্ন হুড়মুড়িয়ে জাগে। ১০১টি ত্রাণশিবির সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে চলছে। আরও ১০০টি ত্রাণশিবির স্বীকৃতি পায়নি। ২০১টি শিবিরেই অবস্থা বেহাল। কারণ শোনা যায় যে, সরকার সেখানে ঠিকমত ত্রাণ পৌঁছতে দিচ্ছে না। (ভূকম্প ত্রাণে পাওয়া ২৬ হাজার কোটি টাকারও প্রায় ৬০-৭০ শতাংশই নাকি আজও ব্যবহার হয়নি)।

১. ভূকম্প ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুনিয়ার প্রায় ৭০-৮০টি দেশ। তাঁরা এবার কোথায় ?

২. ভূকম্প ত্রাণে বিরাট বদান্যতার দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছিল ভারত জুড়ে— কোম্পানি, ক্লাব, সরকারী বিভাগ, বিরোধী দল, সাংসদ-অভিনেতা, লেখক— হাত খুলে টাকা ঢেলেছিলেন। এবার তাঁদের ভূমিকা দেখি না কেন ?

৩. বাংলার মাননীয় রাজ্যপাল, রাজ্য সরকারকে আহ্বান করেছিলেন ভূকম্প ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তিনি এবার কী ভূমিকা নিচ্ছেন ?

www.pathagar.com

৪. কলকাতায় বিচলিত বাম-বাঙালি বিদ্বৎসমাজ। কিন্তু কলকাতার গুজরাট ব্যবসায়ীরা একেবারেই আন্দোলিত নন। অপর ব্যবসায়ীরাও কোটি কোটি টাকা তুলে পাঠিয়েছিলেন সেবার, এবার কেন নয় ? বরং পেশাদার এক গুজরাটি বন্ধু বললেন, 'বড় বাড় বেড়েছিল মুসলিমরা। খালি মেজাজ দেখাত আর ভারতকে গাল দিত। ওদের এই শিক্ষার দরকার ছিল।' তাই কি ? এটা ঘটনা যে, হুট বলতে 'জিহাদ' ঘোষণাকারীদের গলা শোনা যাচ্ছে না সম্প্রতি। এবং সেক্যুলার-চিন্তাবিরোধী পত্রিকারা, এখন সম্প্রীতি-সহবস্থান প্রচার করছে।

৫. ভূকম্পের পর ভারত সরকার ঘোষণা করে—ত্রাণের জন্য সামগ্রীতে আবগারি বা আমদানি শুল্ক লাগবে না, বিক্রয়কর মকুব, আয়করে ১০০ শতাংশ ছাড়। এবার সে দাবি কেন কেউ তুলছে না ?

সবশেষে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনটি প্রশ্ন ঃ

ক. ভারতের সেক্যুলার সংবিধানের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা টিকে থাকল ?

খ. গুজরাটি জাতি কি কখনও আবার ধর্ম ছাপিয়ে, এক হতে পারবে ?

গ. আমাদের বাংলায়ও কি অমন কিছু ঘটতে পারে ?

## বাংলা নিয়ে ভাবনা

'এখানে ? অসম্ভব!' অনেকে বলেন। আশ্বস্ত হয়েও, হতে পারি না। মাথায় ঘোরে নচিকেতার গান' .... ভয় আছে. মনে সংশয় আছে, ওই ধর্মের বাঘ শেষে, কখনও উঠোনে এসে, আশ্রয় চেয়ে নেয় মানুষেরই কাছে।'

মানছি, গর্বের সাথেই মানছি যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থামানোর দৃঢ়তা ও দ্রুততায় আমাদের বামফ্রন্ট ভারত সেরা। গত ২৫ বছরে বামফ্রন্ট শাসনের ফলে, বাঙালির সাম্প্রতিক স্মৃতি থেকে মুছে গেছে দাঙ্গা। বিরাট এই কৃতিত্ব। তবু ভয় আছে ঃ

১. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট বড় বেশি পুলিশ-প্রশাসন নির্ভর। এটা বিপজ্জনক।

২. ১৯৮৬-৮৭-তে সংঘ পরিবার ঘোষণা করে যে, তারা পুলিশ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে টার্গেট করবে। সে কাজে তারা যথেষ্ট এগিয়েছে।

তীর্থ যাত্রায় সাহায্য, মন্দির নির্মাণ, অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, দেশে ও বিদেশে বৃত্তি, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে টাকা ঢেলে, তারা কব্জা করেছে প্রচুর পুলিশ-প্রশাসন-শিক্ষক।

www.pathagar.com

৩. বাঙালির হৃদয়-মন-মগজ দখলের লড়াইয়ের বামফ্রন্টের নেই কোনও সজীব, ইতিবাচক রসদ। জনগণকে দেখানোর মতো কোন স্বপ্ন। বিপরীতে সংঘ পরিবার ও তাবলীগ জামাতের দেখানোর মত স্বপ্ন আছে। তাই দুজনেই বাড়ছে। বেশি বাড়ছে পশ্চিম বাংলা-বাংলাদেশ সীমান্তে। দুজনেরই পেছনে শুনি বিদেশি টাকার ঝঙ্কার। দুই সংগঠনই নাকি জমাচ্ছে হাতিয়ার।

৪. অস্ত্র ? আশ্চর্য হবেন না। হাজার কোটি টাকার চোরাচালান চলে সীমান্ত জুড়ে। তার সবচেয়ে লাভ অস্ত্রে আর মাদকে।

৫. চোরাচালানীরা আছে ধর্মের ভেক ধরে। স্থানীয় ক্ষমতার স্তম্ভ তারা। তাদের 'ঠেক' হয়ে গেছে কিছু আশ্রম-মসজিদ-গির্জা।

৬. বাংলার শিল্পব্যবসার শিখরে যে অবাঙালিরা আছেন, তাঁরা উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে—সংঘ পরিবারের ঘন সমর্থক। এখানে তাঁরা কী করছেন ?

৭. পশ্চিম বাংলার গোটা গা সেঁটে আছে—দেড় কোটি হিন্দুর বাংলাদেশ। সম্প্রতি তাদের ওপর দিয়ে গেছে লুট আর উৎপীড়নের এক সন্ত্রাসী পর্ব। এ বাংলায়, তার প্রতিক্রিয়া সামলে দেওয়া গিয়েছে। প্রতিবার কি যাবে ?

৮. গুজরাটে জামায়াতে-ই-ইসলামীর মতোই, পঃ বাংলায় তাবলীঘ জামাত, শহরে-গঞ্জে-গ্রাম ঘুরছে। পবিত্র তার লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবের ফল—বাঙালি জাতি সত্তায় ফাটল। কারণ, ইসলামের মর্মবস্তুর ওপর জোর নয়, গুরুত্ব পাচ্ছে দাঁড়ি-টুপি-বোরখার বাহ্যিক প্রকাশ। ফুল-চাষ-গান-ছবি আঁকা লোক সংস্কৃতির মত 'হিন্দুয়ানী' ত্যাগ করানো হচ্ছে। বাংলা ভাষাও যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা। কর্তৃত্ব করে উর্দু।

৯. বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকট তীব্র করেছে বামফ্রন্ট। অবাঙালি, উর্দু ভাষী, আত্মমুখী, বাঙালি-বিদ্বেষী কলকাতা-কেন্দ্রিক মোল্লা-মৌলবাদীদের বামফ্রন্ট বানিয়েছে তামাম মুসলিমের প্রতিনিধি। সেই সুবিধাবাদী, সংকীর্ণদের উচ্চকিত বক্তব্য প্রচার হয় 'মুসলিম মতামত' মোড়কে। বাংলায় ৯৫% মুসলমান-বাঙালির কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে থাকে।

১০. সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের বারুদ জমছে বাংলার বেকার বাহিনীতে। এদের বেশি বেশি জমায়েত দেখছি পুজায়, ঈদে, জলঢালা যাত্রা, মহরমের জবরদস্তি চাঁদা আদায়ে। বামফ্রন্ট কর্মীদের সংখ্যাও বাড়ছে তারেকশ্বরে, কালী পূজায়, তাবলীঘি 'চিল্লা'য়।

www.pathagar.com

১১. পরিসংখ্যান আছে ? পশ্চিম বাংলায় আর এসএসের কটা শাখা কোথায় ? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, দুর্গা বাহিনী—কেমন ছড়িয়েছে পশ্চিম বাংলায়। তাবলিঘ ও জামায়তি সংগঠনের ব্যাপ্তিই বা কেমন ? ঝোঁক কোন্ দিকে ? বামফ্রন্ট খবর রাখছে ? নাকি জাতপাতের মতোই, ব্যাপারটা থেকে নজর ঘুরিয়ে রেখেছে। ভাবছে পুলিশ দিয়েই চিরকাল নিয়ন্ত্রণ করবে।

১২. উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে নিরন্তর আসছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা আর সন্দেহ। এখন সে প্রচারে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার হেঁড়ে কণ্ঠস্বর। তার শিকার আমরা অনেকে—চেতনে, অবচেতনে। তারই ফল দেখি বাসে, ট্রেনে, দপ্তরে, সেলুনের কথাবার্তায়।

কয়েকটি বাস্তব বাঙালিকে বোঝাতে হবে, বুঝতে হবে। বোঝানোর দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকারের এবং বাংলার বৌদ্ধিক নায়কদের।

প্রথম ঃ বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি সক্রিয়, সজাগ আনুগত্য ছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা যাবে না।

দ্বিতীয় ঃ সংঘ পরিবারের ইপ্সিত 'গণ-বিনিময়', (মুসলিমরা যাবে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে, হিন্দুরা আসবে ভারতে) এই বাংলায় অসম্ভব।

তৃতীয় ঃ সমাজের ঘৃণা, সন্দেহকে চালিয়ে দিতে হবে বিদেশী টাকা, বিদেশি মূল্যবোধ ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে। সুশীল-সুবোধ নিরুত্তাপ নিষ্ক্রিয় সেকুল্যার চিন্তা ধরে থাকলেই শুধু হবে না। সেক্যুলার চিন্তাধারীদের আরও বেশি আগ্রাসী হতে হবে—বিশেষ করে গঞ্জ, শহর ও শহরতলিতে।

চতুর্থ ঃ এ লড়াই ভীষণ কঠিন, বিরাট চ্যালেঞ্জ সেটা জানাতে হবে বাংলার জনগণকে। 'আপনা আপনি' সেক্যুলার চিন্তা দখল করবে না জনমানসে। কোনও 'আধার' দিতে হবে। বাঙালির ছাড়া সে 'আধার' আর কি-ই বা হতে পারে ?

উঠোনে ঘুরছে ধর্মের বাঘ। মুখে তার গুজরাটি রক্তের দাগ। তাই ভয়, সে বাঘ যেন না আশ্রয় পায় বাংলার মানুষের কাছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হিন্দুত্ব ল্যাবরেটরি' নাকি গুজরাট। বাংলাকেও বানানো যাক মনুষ্যত্ব মজবুত করার পাল্টা ল্যাবরেটরি।–২১ এপ্রিল, ২০০২, আজকাল

❐

www.pathagar.com

# ফৈয়াজ খাঁর সমাধির পর
# পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত তাজমহল

—পাচু রায়

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে আজকাল-এ প্রকাশিত খবর মোতাবেক জ্ঞাত হলাম যে, বারোদায় উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সমাধি-সৌধ ধ্বংস করে দিয়েছে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী কিছু বিজ্ঞজন। দেশ জুড়ে 'নিন্দুক' মানুষজনেরা এদের গুণ্ডা-বদমায়েশ-লম্পট-নারীঘাতী-শিশুঘাতী অসভ্য বর্বর আখ্যা দিয়েছেন। সকলেই জানেন হিন্দুত্বের স্বনির্বাচিত 'ভ্যানগার্ড' এই ধ্বজাধারীদের, যাদের সাথে ভারতবর্ষের বিপুল হিন্দু জনসমষ্টির বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। বাই অ্যান্ড লার্জ হিন্দুরা মোটামুটি সেকুল্যার।

প্রথমত, ধ্বজাধারীদের ধন্যবাদ। কেন বা ফৈয়াজ খাঁ হিন্দু না মুসলমান —এ প্রশ্ন জীবিতকালে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে যেমন আলোড়িত করেনি, তেমনি তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ শ্রোতা তখন এবং এখন কখন মুহূর্তের জন্য ভেবেও দেখেননি ফৈয়াজ খাঁর জাতই বা কী, ধর্মই বা কী ? ফৈয়াজ খাঁ মুসলমান, অতএব বর্জনীয়—এই তথ্য জ্ঞাপন করে ধ্বজাধারীরা আপামর হিন্দুদের কী অশেষ উপকার সাধন করলেন তা লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু এর ফলে এই কাপুরুষ হিন্দু লেঠেলদের দায়িত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পেল। অবিলম্বে বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের সমাধি-সৌধটি ঠিক কোথায়, তা খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে ; তাঁর গাওয়া গান—'বাজু বন্দ খুল খুল যায়'—সহ অসংখ্য সব অমর গান মুছে দিতে হবে এ দেশ থেকে। একই পরিণতি ঘটাতে হবে উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ (উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁর পিতা), উস্তাদ আল্লারাখা (উস্তাদ জাকির হোসেনের পিতা), উস্তাদ মৈনুদ্দিন খাঁ ডাগর, উস্তাদ আমীর খাঁ-সহ সমস্ত শিল্পীর সমাধিস্থলগুলোর। কিন্তু কী হবে সেই শ্রদ্ধাময় স্মৃতির কি হবে সেই সব সৃষ্টির যা ভারতবর্ষে তো বটেই, বিশ্বের বহু ঘরে যা ঠাঁই করে নিয়েছে। এখন তাহলে বন্ধ করে দিতে হবে বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই (যদিও শত শত হিন্দুর বিবাহ উৎসবে বিসমিল্লাহর রেকর্ডই বেজেছে, বাজে) যৌবনে বহু হিন্দু বিয়ে বাড়ীর নহবতে বসে সানাই বাজিয়েছেন বিসমিল্লা খাঁ। এবং সেসব দম্পতি বা তাঁদের সন্তানেরা খুব স্বাভাবিক কারণে এখনও গর্ববোধ করেন। ব্যবস্থা করতে হবে উস্তাদ আলি আকবর খাঁ যাতে কিছুতেই সরোদ না বাজান। বন্ধ করে দিতে হবে আমজাদ

www.pathagar.com

আলি এবং তাঁর পুত্রদের সরোদ, স্তব্ধ করে দিতে হবে মুসলমান শিল্পী জাকির হোসেন-এর তবলা, যতই ভারতের অন্যতম সেরা তরুণ শিল্পী বলা হোক না কেন, গাইতে দেওয়া যাবে না উস্তাদ রশিদ খাঁকে।

আমি যে তালিকা দিলাম তা শৈলপর্বতের অসংখ্য শিখরের এক শতাংশও না। তথাপি দমে গেলে চলবে না। মাননীয় ধ্বজাধারীবৃন্দ। ভারতের মার্গসঙ্গীতে মুসলমান গায়ক এবং বাদকের যে পর্বত প্রমাণ অবদান, যা কিনা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ব্যাপক ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়, অকরুণ অবরোধে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আপনাদের এক্ষুনি মাইহারে যেতে হবে, আলাউদ্দিন খাঁর কবর খুঁজে বার করে তাকে ধ্বংস করতে হবে। রবিশঙ্করকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ঘোষণা করে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে অস্বীকার করতে হবে, আরও অনেক অনেক কাজ বাকি থাকছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মিয়াঁ তানসেনের স্মৃতি সৌধটি খুঁজে বার করা এবং তা ধ্বংস করা। তানসেন যেসব গান লিখেছিলেন, সেসব পুড়িয়ে ফেলা আপনাদের 'বৈদিক' কর্তব্য। তার চেয়েও একটি কঠিন কাজ আছে, যা সম্ভবত আপনাদের মত ধ্বজাধারীদের পক্ষেই সমাধা করা সম্ভব! মিয়াঁ কি মল্লার-সহ তানসেন যেসব রাগের জন্ম দিয়েছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তা লোপাট করে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, যদি কোনও হিন্দু গায়ক মিয়াঁ কি মল্লার বা ইমন কল্যাণ অথবা মিয়াঁ কি টোড়ি গায় বা বাজায়, লাফিয়ে পড়ে এক কোপে সেই গায়কের মুণ্ডু কেটে ফেলতে হবে। যাই হোক আরও কাজের কথা মনে করিয়ে দেবো না, কারণ এ সবই ওদের মনে মনে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সবই ওরা করে ফেলবে জানি। ওদের হাতে এখন অসংখ্য অসমাপ্ত কাজ। গোটা দেশটাকে গুজরাটের মডেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মহামাননীয় নরেন্দ্র মোদি মহাশয়ের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে অটল-আদবানি আশ্রমের সুযোগ্য বজরং চেলাচামুণ্ডরা আগামী দিনে যে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সপিণ্ডিকরণ সমাধা করবে, এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কেননা ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর যে, এ দেশে ওই জাতীয় সঙ্গীতের বিনাশই অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ধ্বজাধারীদের মনে রাখতে হবে, গায়কেরা তো শাসক নয়। আসল দোষী তো মুসলমান শাসকেরা। আকবর সহ একাধিক বাদশা-নবাবই তো এসব গায়ক-বাদকদের মাথায় তুলেছিলেন। অতএব তাঁদের স্মৃতি সৌধগুলো এই দেশে থাকার কোনও মানেই হয় না। কুতুবুদ্দিন আইবেক নামক মুসলিম শাসকের তৈরি করা সৌধ কুতুবমিনার। মাননীয় ধ্বজাধারীরা, আপনাদের কাছে সবিনয় নিবেদন, পারলে আজই ওটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন!

www.pathagar.com

দেশের রাজধানীতে কাণ্ডটা ঘটালে ভালই প্রচার হবে। বিদেশের টেলিভিশনে চমৎকার দেখাবে। অন্য দুই মুসলমান শাসক শেরশাহ এবং হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ আছে পুরান কেল্লায়। গুঁড়িয়ে দিন। দু-দুজন মুসলমান শাসকের কবরের পাশে বসবাস করতে করতে দিল্লির চিড়িয়াখানার পশুরা কি ঠিকঠাক আছে ?শেষ করে দিন ওদেরও। আর গোটা দেশটাই যখন চিড়িয়াখানা বানানোর শপথ নিয়েছেন হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা, তখন আলাদা আলাদা চিড়িয়াখানার কী প্রয়োজন ? তদুপরি ধ্বজাধারীদের রকমসকম দেখে পশুরা লজ্জা পেতে পারে। বলতে পারে, আমরা তো এদের কাছে শিশু! এর পর চলে আসুন ফিরোজ শাহের দুর্গ ফিরোজ শাহ কোটলায়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন। তার পাশেই আছে খুনী দরওয়াজা। যেখানে ইংরেজরা ভারতের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের দুই ছেলের কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে রেখেছিল। এই খুনী দরওয়াজা, আজমির গেট—সব শেষ করে দিন। এবং অবশেষে ধ্বজাধারীদের আসতে হবে লালকেল্লায়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানে শাহজাহান, জাহাঙ্গির, নূরজাহান, ঔরঙ্গজেবের পদ চিহ্ন। ওইসব মুসলমান শাসকের স্মৃতিমেদুর লালকেল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া ধ্বজাধারীদের, বলা যেতে পারে, পিতৃপুরুষের দায়। কিন্তু আকবর বাদ যাবেন কেন ? এই ভদ্রলোক বালক বয়সে ভারতের সিংহাসনে বসে অতপর সেই সময় সেক্যুলারিজমের মত ন্যাক্কারজনক বিষয় নিয়ে চর্চা করেছিলেন—দীন-ইলাহিতে তার কিছু স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ওঁর সমাধি সেকেন্দ্রাবাদ। আকবর-নির্মিত দুর্গ ফতেপুর সিক্রি, সেখানে সেলিম চিস্তির দরগা, বুলান্দা দরওয়াজা—সব মুসলমান শাসকের সাম্য বহন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজও। এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে ওই পথে যায়। এবং আরও দুর্ভাগ্যের ও লজ্জার হল, এই দর্শনার্থীদের মধ্যে অন্তত শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দু। সেলিম চিস্তির দরগায় যাঁরা বছর বছর ধরে সুতো বেঁধে আসছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, এখনও ওঁদের সিংহ ভাগই হিন্দু। কিন্তু সে যা-ই হোক, একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে ফতেপুর সিক্রি। দরকার পড়লে (পড়বেই), ফতেপুর সিক্রিতে একটা হনুমান মন্দির গড়া যেতে পারে। দেশে হনুমানের তো অভাব নেই। ল্যাজ -সহ এবং ল্যাজবিহীন। বজরং দলই তো আছে। ওদের সদর কার্যালয় হোক ফতেহপুর সিক্রি। রামচন্দ্রের এই খেতাবহীন সেনাপতিই প্রথম শহরে (খুড়ি, রাজধানীতে) কী করে দ্রুত আগুন লাগাতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। এই 'আগুন-গুরু'র পদ্ধতিই তো উৎসাহ জোগাচ্ছে। উৎসাহে কী না হয়। অযোধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফতেপুর সিক্রির চূর্ণ প্রাসাদের জায়গাতেই হোক পবিত্র পবননন্দন মন্দির।

www.pathagar.com

কিন্তু শেষ মারটা মারতে হবে আগ্রায়। আগ্রা ফোর্ট মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। কোথায় শাহজাহান আর জাহানারা বন্দী ছিল, তা নিয়ে আজ মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। ওটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পরমহংস রামদাস বাবাজির আখড়া বানানো যেতে পারে। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসটি কোথায় হবে ? তার যথাযথ স্থান একটাই—তাজমহলকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, সেই সাদা পাথরের গুঁড়ো দিয়ে শক্ত ভিত তৈরি করে ওখানেই নির্মিত হবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদর কার্যালয়। এক সাহেব তো সেই কবে লিখে গেছেন তাজমহল ছিল হিন্দু মন্দির, অতএব গুঁড়িয়ে দেওয়া তাজমহলের ওপর পরিষদের ইমারত খুব একটা বেমানান হবে না। সকলে তো সব ইতিহাস (!) জানে না। রামচন্দ্র পবিত্র বালী-বধ পরিকল্পনা তাজমহলের ভূমি খণ্ডের ওপরেই করেছিলেন। দিন চারেক ধরে অবিরাম লাফানোর পরই সুগ্রীব ওখানে পৌঁছেছিলেন। রাজকুমার অঙ্গদের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সবই লেখা আছে। তাহলে বিজেপি-র সদর কার্যালয় কোথায় হবে ? এই প্রশ্নটা যেমন সহজ, উত্তরও তেমন জানা। লালকেল্লা মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার পর ওই জমির মালিক বিজেপি ছাড়া আর কে হতে পারে !

তবে এতসব কাজ করার আগে দুটি কাজ সহজেই আপনারা করে ফেলতে পারেন এক লহমায়। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের কাছে এ কাজ নস্যের চেয়েও হালকা। প্রথমটি মহীশূরে। সেখানে রাস্তার ধারে একটা মাইল-ফলকের মত পাথরের গায়ে লেখা আছে ঃ এখানে টিপু সুলতানের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল। ইংরেজরা মেরে টিপুকে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওই পাথরটা নিয়ে গিয়ে আর একটা রামশিলা আরামেই বানাতে পারেন ধ্বজাধারীর। একটি অক্ষয় কীর্তি হবে তাহলে।

আর দ্বিতীয় কাজটি মুর্শিদাবাদে। সিরাজের কবর এবং হাজারদুয়ারি। একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ, জগত শেঠরা খুশি হবেন, মিরজাফররা হাততালি দেবেন। আর ওঁদের প্রেতাত্মা, বিশেষ করে মিরজাফরের প্রেতাত্মা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলবেন, হিন্দুদের মধ্যে এখনও আমার এত বন্ধু আছে, বুঝতে তো পারিনি ! মিরজাফর যুগ যুগ জিঁও! আসল কথা হলো, যুগে যুগে নতুন ইতিহাস তৈরি করার বীরপুরুষেরা যথাসময়ে আবির্ভূত হন। পামর দেশবাসীরা মূর্খ বলে এঁদের যথাসময়ে যথাযোগ্য সমাদরে ব্যর্থ হয়। গুজরাটের নাম বদলে অবিলম্বে 'মোদিয় প্রদেশ' রাখা হোক, যাতে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচয়িতাদের কিছুটা সুবিধা হয়।—২২ এপ্রিল, ২০০২, আজকাল

www.pathagar.com

# এ ভারত কি শুধুই গোবলয়ের ভূস্বামীদের ?

–আজিজুল হক

অর্থনীতিবিদ শেয়ডনের কথা একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, বিজেপি-র গোয়া অধিবেশনের পর ভারতবর্ষটি আর সেই ভারত থাকছে না। গোয়া অধিবেশনে বাজপেয়ীর ভাষণ তাঁর নরখাদক চেহারাটাই ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর যুক্তি দুর্বৃত্তদের চিরন্তন যুক্তি। ঈশপের নীতিকথার সেই কাঁচা-মাংস-খেকো জন্তুটার যুক্তি ঃ 'তুই করিসনি, তোর বাপে করেছে!' বাজপেয়ীর সরবরাহ করা যুক্তি দিয়ে ওদের এখানকার স্যাঙাতরা লম্ফঝম্প করছে। একটা বাংলা কাগজ তো সরাসরি দাঙ্গার ওকালতি করে চলেছে। ভগবানে ভীত বরাহ গর্ভজাতটা পশুযুক্তি সরবরাহ করে চলেছে।

বাজপেয়ীকে ধন্যবাদ, তিনি আমার অনেক দিনের পড়ে থাকা একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করেছেন। আমি ভাবতাম, আপাদমস্তক নিরীশ্বরবাদী ৩৭ সাল পর্যন্ত আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী মহম্মদ আলি জিন্নাহ হঠাৎ এ রকম উগ্র মুসলমান হয়ে গেলেন কেন ? ভাবতাম শরওয়ার্দিই বা এতো সঙ্কীর্ণ হলেন কী করে ? বাজপেয়ীর ভাষণ শুনে মোটামুটি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছি। বাজপেয়ীর রাজনৈতিক জন্মদাতারা একই খেলা খেলেছিলেন। তারই 'ব্যাক ল্যাপে' জিন্নাহর মতিভ্রম। শরওয়ার্দির অধঃপতন। বাজপেয়ী যা বলতে চেয়েছেন সেটা হল, দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের অতীত সেটা প্রমাণ করে। ভারতের বুকে তারা জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে ইত্যাদি।

একশো কোটির দেশের প্রধানমন্ত্রীর এ রকম পর্বত প্রমাণ মুর্খামি সত্যিই বিস্ময়কর! পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম ধর্ম এবং আরব সংস্কৃতির অবদান অত্যাশ্চর্য। বলেছেন স্বয়ং রাসেল। ইসলাম ধর্মের ব্যাপ্তিই খ্রিষ্ট পাদ্রিদের হাত থেকে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য দর্শন রক্ষা করেছে। আজকের বিশ্ব যে গ্রিক কাব্য, দর্শন পেয়েছে সেটা আরবির মাধ্যমে। বাজপেয়ী যে আধুনিক কবিতা লেখেন, সততার সঙ্গে খোঁজ নিয়ে দেখুন সেটা কোথা থেকে এসেছে। রাসেল, গিবন, কার্লাইল, এমএন রায়ের কথা বাদ দিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাজপেয়ী যাঁদের সাথে থাকেন, তাঁরা না হয় নামগুলো না-ই শুনে থাকতে পারেন, বাজপেয়ী কি শুনেছেন। অজ্ঞতা যখন দুষ্কর্মের অজুহাত হয় সেটা অন্যায়। প্রতিরোধযোগ্য

www.pathagar.com

অন্যায়। বাজপেয়ী অর্ধসত্য, অর্থ তথ্য পরিবেশন করে ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘৃণ্য ফ্যাসিস্টের মতই অন্যায় করেছেন। এখন আর তাঁকে কেবলমাত্র অসভ্য, বর্বর বললেই হবে না, আরও কিছু বলতে হবে।

বাজপেয়ীর এই ভাষণের পর যদি কোনো স্বার্থান্বেষী মহল সামান্যতম চেষ্টা চালায়, জিন্নাহর জন্ম অসম্ভব নয়। বাজপেয়ীর জানা উচিত, অতীতে দেশটা ভাগ হয়েছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একাংশের তীব্র মুসলমান বিদ্বেষের ফলে। ৩৭-এর আগে ২৬ সাল ছিল। জিন্নাহ্‌র আগে সাভারকর এসে গেছে। বাজপেয়ী বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাজপেয়ীদের মত মূর্খদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখে গেছেন, 'যদি রাজশক্তির প্রভাবে এবং বলপ্রয়োগেই এ দেশে ইসলাম বিস্তার করে থাকত, তাহলে তো রাজধানীর আশপাশেই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যেত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দিল্লি থেকে যে অঞ্চল যতদূর, সেখানে ততই মুসলমান বেশি। স্বামীজির কথা ছেড়েই দিলাম, বহুবার বহু লোকের মুখে উদ্ধৃত। অতশত কথা কেন! এ যে হিন্দুত্ব নিয়ে বাজপেয়ীর এত হম্বিতম্বি সেই 'হিন্দু' কথাটাই যে মুসলমানদের সৃষ্টি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ কোথাও তো 'হিন্দু' ধর্ম কথাটা নেই। বর্জন যদি করতেই হয়, মোদি-বাজপেয়ী অ্যান্ড কোং-এর সর্বাগ্রে ওই কথাটাকেই বর্জন করা উচিত। হিন্দুস্থান নিয়ে তাঁরা করে কম্মে খাচ্ছেন বা খাবেন বলে ভাবছেন, সেটারও সুনির্দিষ্ট রূপ এবং সীমানাটাও মুসলমানরাই নির্দিষ্ট করে দেন।

পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বাজপেয়ী চিন্তিত। হতেই হবে, প্রভুর ঘুম কেড়ে নেওয়া ঘটনাতে ভৃত্য তো চিন্তিত হবেনই। অত কথা কেন, বাজপেয়ী তাঁর প্রভুকে বলুন না, আরবভূমি ছেড়ে যাও। আরব ভূখণ্ডের ভাগ্যটা সেখানকার মানুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাজপেয়ীর হৃদয় আর মস্তিষ্কের মালিকরা চলে গিয়ে দেখুক কোনও তথাকথিত সন্ত্রাস হয় কিনা। সাভারকর সন্ত্রাসবাদী ছিল কি? ওদের বাংলার নেতা স্থপতি অধ্যাপক মনে করেন ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী ছিলেন। (বিশ্বাস করুন নজরুল, সুকান্তের পর মিডিয়াতে আসার জন্য উনি উন্মাদ হয়ে গেছেন।) বাজপেয়ী শুধু মুসলমানদেরই সন্ত্রাস করতে দেখলেন? উত্তর-পূর্ব ভারতে (ওদের ভাষায়) সন্ত্রাস করছে কারা? তারা কি মুসলমান? কাশ্মীরে মুসলমান, নাগা-মিজোতে খ্রিস্টান, বোরোল্যান্ডে হিন্দু—তাহলে? বাজপেয়ীর সবচেয়ে বড় অনৈতিক কাজ, কোনও রাষ্ট্রের গোয়েন্দাগিরি এবং অন্তর্ঘাতকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা। সিআইএ কিংবা এফবিআই-এর সৃষ্টি করা সন্ত্রাসগুলোকে

www.pathagar.com

শ্রীবাজপেয়ী (পাঁচবার চোখ পিটপিট করে, সাড়ে বারোবার হাঁটু ভেঙে বসে) বলবেন, খ্রিস্টীয় সন্ত্রাস ? জঘন্য। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে তো শাবাশ দিতে হয়। তাদের দেশের মধ্যে ভারতের কাজকর্মকে তারা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেনি ! এক কথায় বাজপেয়ী ভারতকে ভাগ করে ফেলেছেন। মরার আগে তিনি হিন্দু ভারতের একনায়ক হয়ে মরতে চান। ভারত আর এপ্রিল ২০০২ সালের আগের ভারত নেই। আমাদেরও ভাবতে হবে।

দুর্বল, লোভী চরিত্রের বাজপেয়ীকে ব্ল্যাকমেইল করে চলেছে তাঁর স্যাঙাতরা। সব থেকে বড় দ্বিচারী মমতার দল। বাজপেয়ীর এই ভাষণের পর স্যাঙাত দলগুলোর সামনে সততার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ এসেছিল। কেউ সেটা করলেন না। এতদ্দ্বারা তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মমতা বসে আছেন তাঁর 'মালপো-ভাইয়া'র বদান্যতার জন্য। এখনও চালাকি করেই চলেছেন। আজকের ভারতে গুজরাট ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মতাদর্শ থাকতে পারে না। বাজপেয়ীর ভাষণটাই আজকের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। এটাকে এড়িয়ে যাওয়া মানে পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা, চালাকি। মমতা যতদিন বাজপেয়ীর স্যাঙাত থাকছেন, একজন মুসলমানের কিংবা নিম্নবর্গীর ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। সেটা হবে দেশ এবং জাতির সঙ্গে বেইমানি ! মুসলমানি লব্জ ব্যবহার করলে বলা যেতে পারে, মমতার দলটা 'মুনাফেক'। মনে প্রাণে সাম্প্রদায়িকতা পোষণ এবং তোষণ করে মন্ত্রী হতে ব্যগ্র—বাজপেয়ীও তাঁকে রিজার্ভে রেখে (সাইড লাইনে বসিয়ে) খেলে যাচ্ছেন।

সত্যি, সত্যি ভারতবর্ষকে বাঁচানোর দায়িত্বটা আজ বামপন্থীদের ঘাড়েই চেপেছে। ভারতবর্ষটাই যদি না থাকে কোথায় তাঁরা জনগণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র গড়বেন ? বাংলার মাটিকে ব্যবহার করেই এই কাজে এগোতে হবে। ঘ্যানঘেনে মধ্যবিত্তদের মুখের ওপরই বলতে হবে, 'না, আমরা সমৃদ্ধ গুজরাট চাই না, যেখানে গর্ভবতী রমণীর পেট কেটে বাচ্চাকে ঝলসানো হয়, সেই সমৃদ্ধি নিপাত যাক! সেই সংস্কৃতি নরকের আগুনে পুড়ে মরুক ! আমরা হাজার বছর গরিব থাকবো, তবুও ওদের মত সমৃদ্ধ জন্তু হব না।'

বিজেপি-র গোয়া অধিবেশনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়তে হবে বাঙালিকেই। ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্যই প্রয়োজনে কেন্দ্রকে বয়কট করা থেকে শুরু করে, মানুষ থাকার জন্য (হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়) প্রয়োজনে স্বাধিকারের হুমকিটা আমাদেরই দিতে হবে। বাজপেয়ীর ভারতে কে থাকতে চায় ? আমাদের স্বপ্নের ভারত রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, সূর্য সেনের শৌর্যে। এটা কি দুঃখের নয়, বাজপেয়ীর ক্রিয়াতে প্রতিক্রিয়া জানাতে হচ্ছে এমন

www.pathagar.com

একজন লোককে যার নামটা আরবী। যদি না ভগবানের খাস ভৃত্য শয়তানরা জানোয়ারবৃত্তি শুরু করত, হয়ত জানাতামও না। মিঃ মোদি, এটিই কি তৃতীয় সূত্র!

কাদের সামনে যুক্তি দেব ? পশুযুক্তিকে বিশ্বাসীদের যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যদি এদের জন্য স্বামীজি যে নিদান রেখে গেছেন সেটা দেখতেন! তাঁর ভাষাতে 'বেত-ই' এদের যুক্তিতে আনে। কাকে লজ্জা দেব ? সত্যেন মজুমদার থাকলে বলতেন, 'ইঁহারা জননীর গর্ভের লজ্জা!' তাঁর শিষ্য সরোজ দত্ত লিখলে লিখতেন, 'হিটলার মুসোলিনির প্রেতের ঔরসে ভারতীয় ম্যুৎসুদ্দিদের গর্ভজাত অপগণ্ডের দল!

আমরা কী করবো ? এটাই প্রশ্ন!

মূর্খ বাজপেয়ীকে শিক্ষিত করে তোলা আমাদের কাজ নয়। বাজপেয়ী খুব ভাল করেই জানেন সব ধর্মেরই ফলিত দিক অসহিষ্ণুতা। মুসলমানদের দেয়া 'হিন্দু' কথাটার আগে বহুবিভক্ত (শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্মণ্য) আর্য ধর্মের বর্বরতার সীমা পরিসীমা নেই। মনু লোকটা কোনও মুসলমান ছিলেন না। বিরোধী মতাবলম্বীদের পুড়িয়ে মারার বিধান ছত্রে ছত্রে মনু-ই দিয়ে গেছেন। এরই 'মোডিফায়েড' ধর্ম আজকের বাজপেয়ীদের হিন্দু ধর্ম। রামচন্দ্র শম্বুক হত্যা করে পরমপূণ্য করে গেছেন।

ইতিহাস, পুরাণ, ঘটনাবলী প্রমাণ করে, ওই বাজপেয়ী মার্কা মনুশিষ্য হিন্দু, হিটলার মার্কা খিস্ট আর মাওদুদি-মার্কা মুসলমানরা ছাড়া সকলেই দিয়ে আর নিয়ে থাকতে চান। বাজপেয়ীর মনু রাজত্ব কায়েম হলে অন্যরা কি রেহাই পাবেন ? জাতিসত্তার পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরে এ 'মনু ভারতীয়ত্ব' বর্জনের আবেগ তৈরি করি আসুন। এ কোন ভারত ? এ ভারত বাঙালিদের নয়, বিহারিদের নয়, আসামীয়াদের নয়, কোনও জাতিসত্তারই নয়। এ ভারত গোবলয়ের ভুস্বামী আর পশ্চিমবর্গীদের ভারত। এ ভারত চাই না।-২৪ এপ্রিল, ২০০২, আজকাল

❐

www.pathagar.com

# গুজরাট দিচ্ছে ডাক

–অশোক দাশগুপ্ত

সাবরমতী। নামেই নদী, এক ফোঁটা জল নেই। 'নদীর ধারে' এখনও দাঁড়িয়ে আছে গান্ধীজির সাবরমতী আশ্রম। মহাশ্বেতা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন সেই সভাস্থলে, যেখানে বিজেপি-র যুবগুণ্ডারা চুলের মুঠি ধরে টেনে ফেলে দিয়েছিল মেধা পাটকরকে, শান্তি সমাবেশ করতে দেয়নি মল্লিকা সারাভাইদের। গান্ধীজির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দিলীপ রায় কাগজে লিখে নিচ্ছেন, কী কী আছে, ডেস্ক, চরকা, চশমা...। হয়ত কোনও করুণ নাটকের মঞ্চের খুঁটিনাটি। জরুরি অবস্থায় জেল-খাটা লড়াকু সমাজসেবী যশবন্ত সিং চৌহান নিয়ে গেলেন আশ্রমের প্রবেশ পথের কাছে বিখ্যাত ভাস্কর্যটির দিকে। তিনটি বাঁদর পাশাপাশি বসে। একটির দু হাতে চোখ ঢাকা ঃ কিছু দেখব না। আরেকটির দু' হাতে কান ঢাকা ঃ কিছু শুনব না। তৃতীয়টির দু' হাতে মুখ চাপা ঃ কিছু বলব না। কেন এই মূর্তিটি বসানো হয়েছিল, জানি না। বললাম, মূর্তিটা সরিয়ে ফেলে পাশাপাশি তিনটি গান্ধীমূর্তি বসিয়ে দিলে হয়। এই রকম ভঙ্গিতেই। আজকের গুজরাট দেখে হতাশ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হয়ত এ সিদ্ধান্তই নিতেন—কিছু শুনব না, কিছু দেখব না, কিছু বলব না। শুনলে বা দেখলে বলতে হবে, কিন্তু বলে কোন লাভ নেই। যশবন্ত সিং চৌহান মজবুত চেহারার শক্ত মানুষ। মুখে বিষণ্ন হাসি ফুটিয়ে বললেন, তিনটি নয়, চারটি মূর্তি লাগবে। চতুর্থ গান্ধীর হাতে নাক ঢাকা থাকবে। আবগারি ভাষায় গুজরাট 'শুকনো রাজ্য', বিশেষ পারমিট লাগে বিশেষ ক্ষেত্রে মদ পেতে হলে। প্রকাশ্যে মদ-পান তো নিষিদ্ধই, মদ বিক্রিই হয় না। কিন্তু গত কয়েক দিনে পেট্রল-কেরোসিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদের ফোয়ারাও ছুটেছে। ফেট্টি-বাঁধা ধর্মীয় গুণ্ডারা অনেকেই শয়ে শয়ে মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সময় মত্ত অবস্থায় ছিল। কিছু গরিব মানুষকে গণহত্যায় ব্যবহার করা হয়েছে মাথাপিছু এক হাজার টাকা এবং এক বোতল মদ দিয়ে।

উগ্র হিন্দু ধর্মযোদ্ধারা উত্তেজনা চড়িয়ে রাখতে অবৈধ মদ্য সেবন করেছে। হত্যার আগে মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। আগুন লাগানোর আগে যথাসম্ভব লুট করেছে। দুর্গাবাহিনীর মহিলারাও সক্রিয়, বিশেষত লুটতরাজে। আমেদবাদে মুসলিম মালিকের শাড়ির ও গয়নার দোকানে আগুন ধরানোর সময় ধর্মপ্রাণা মহিলারা দামি শাড়ি ও গয়না সরিয়ে গাড়িতে তুলেছেন। কী অপার মহিমা, জয় শ্রীরাম বলে ধর্ষণ, লুট-সবই করা যায়। এই গণহত্যায়

www.pathagar.com

কত টাকা খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে ? পেট্রল, কেরোসিন, গ্যাস সিলিন্ডার, বুলডোজার, মদ, নগদ—সব মিলিয়ে অন্তত দেড়শো কোটি টাকা এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে, হর্ষ মন্দারের হিসেব। হর্ষ মন্দার, আইএএস,যিনি গ্লানি ও ক্ষোভে ইস্তফা দিয়েছেন। কে দিচ্ছে এত টাকা ? নিশ্চয় সেই মহিলারা নয়, যারা গাড়ি করে শাড়ি-গয়না বাড়ি নিয়ে গেছেন। টাকা দিয়েছেন বিজেপি-পোষক ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা। দাঙ্গাপীড়িতদের ত্রাণে ওঁরা এক টাকাও দেননি। গুজরাট ভূকম্পের পর এই কলকাতার যে ব্যবসায়ীরা বিশেষ অর্থ সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, এবার তাঁরা নীরব, নির্বিকার। বিশিষ্ট গুজরাটি, আমাদের মহামান্য রাজপাল সেবার রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন টাকা দিতে। এবার তিনিও নির্বিকার। তবে, হয়ত আমাদের পরম সৌভাগ্য, দাঙ্গাবাজদের জন্য অর্থ সংগ্রহের কথা এঁরা প্রকাশ্যে বলেননি।

খবর তো অনর্গল আসছিল। গুজরাটে গিয়ে আবার শুনছিলাম। কয়েকটি ঘটনাস্থলে গিয়ে, বেশির ভাগই ত্রাণশিবিরে। আমেদাবাদে শাহ আলম দরগা শিবিরে দেখি ফাতিমা বিবিকে। নুরানি মসজিদের কাছে বাসগুমটির সামনে তাঁর ১৯জন আত্মীয়কে পুড়িয়ে মেরেছে। মাথায় ফেট্টি-বাঁধা হাফপ্যান্ট পরা বজরং গুণ্ডারা। মুখে কুৎসিত গালি ও মদের গন্ধ। এবং 'জয় শ্রীরাম'। অষ্টাদশী আফসানা মৃতের অভিনয় করে পার পেয়ে যান। ওঁর দুই বোনকে ধর্ষণ করে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। প্রাক্তন কংগ্রেসি সাংসদ এহসান জাফরির পোড়া বাড়ির দিকে যেতে দিল না পুলিস। জাফরিকে এবং যৌথ পরিবারের অন্য ২৯জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। বারবার থানায় ফোন করেছিলেন জাফরি, কাজ হয়নি। খবর পেয়ে এক বন্ধু ফোন করেন থানায়, জবাব পান ; 'কিছু করার নেই, জয় শ্রীরাম'। আমেদাবাদেই স্কুটার চড়ে যাচ্ছিলেন এক মুসলিম পুলিশ কর্মী। চিনিয়ে দেয় অন্য পুলিশ কর্মীরাই, ধর্মগুণ্ডারা স্কুটার থামিয়ে গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারে। বরোদার পথে একটি টাটা সুমো গাড়ি থামিয়ে তার দিয়ে দরজা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর পেট্রল, মৃত ৮। পাঁচমহল জেলায় পিটিয়ে খুন করা হয় ৩০জনকে। তারপর আগুন। পরিচয়টাও মুছে দেওয়া, যাতে ক্ষতিপূরণ না দিতে হয় অবশিষ্ট পরিবারকে। সর্দারপুর গ্রামে ব্যবহার করা হয় গ্যাস সিলিন্ডার। পুড়িয়ে মারা হয় ৩৪জনকে। আমেদাবাদ শাহপুরে টুকরো টুকরো করে কাটা হয় একজনকে, তারপর টুকরোগুলো রাস্তায় ফেলে আগুন। উল্লাস। ৮ মার্চ রাতে আমেদাবাদে দাঙ্গাবাজরা যখন হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তাদের এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে ভোটার লিস্ট। বরোদায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সমাধি চুরমার করার আগে মূত্রত্যাগ করে ধর্মগুণ্ডারা। ধ্বংস করা হয়। ধ্বংস করা হয় উর্দু কবি ডালি

www.pathagar.com

গুজরাটির ঐতিহাসিক মাজার। ইসলামপুর ও গীকন্তে ধ্বংস করা হয় ষোড়শ শতকের দুটি সংরক্ষিত সৌধ। ২৮ মার্চ আমেদাবাদে নুরানি মসজিদের কাছে সন্তানসম্ভবা কওসারকে প্রথমে ধর্ষণ। তারপর পেট চিরে 'শিশু'কে বের করে তলোয়ারের ডগায় নিয়ে নৃত্য। তারপর আগুন। জয় শ্রীরাম!

এই অবর্ণনীয় নৃশংসতার পক্ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্র উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। গোধরার ঘটনার তীব্রতম নিন্দা করেছেন সকলেই বারোদায় মহাশ্বেতা দেবীর হাত ধরে আনন্দ জেলার তরুণ শিল্পোদ্যোগী ঈশাক আনন্দওয়ালা বললেন, 'দিদি, আমরা কী দোষ করেছি ? গোধরার অপরাধীদের ফাঁসি হোক। আমরা তো গুজরাটকে ভালবাসি, ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত, একটা পিঁপড়েও মারিনি কখনো, আমাদের ঘরবাড়ি পোড়াল কেন ? আমার ভাইবোনকে পুড়িয়ে মারল কেন ?' সোজাসুজি বলা যাক, গোধরাকাণ্ড না ঘটালেও গুজরাটে এই গণহত্যার কর্মসূচী বহাল থাকত। দেড় মাস ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মিশ্র এলাকায়। কোথায়, কতজন। ১৩ মার্চ অযোধ্যায় শিলাপূজোর দিনটাই ছিল গণহত্যা শুরুর জন্য নির্ধারিত। ১২ মার্চ বজরং দলের স্থানীয় কমিটিগুলোর বিশেষ বৈঠক ডাকা ছিল। রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি হারছে, দাঙ্গা বাধিয়ে গরম হাওয়া তুলে অকাল-নির্বাচন চেয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। ভোটার লিস্ট তোলা হয়েছে বেছে বেছে হত্যার জন্য। ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসার আব্বাস আলি বাঘেলার সাথে আমাদের কথা হয় বরোদায়, মুঘলওয়াড়া ত্রাণশিবিরে। তাঁর পরিচিত এক পুলিশ অফিসার ফেব্রুয়ারী ২৭ তারিখে বলেন, আপনি ১২ মার্চের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। দিনটাকে এগিয়ে আনল গোধরা। ১ মার্চ রাতে ঘরছাড়া হতে হল দেশের হয়ে যুদ্ধ করা আব্বাস আলি বাঘেলাকে। ঘর পুড়ল, জিনিসপত্র লুট হল। গুণ্ডারা আসার আধ ঘণ্টা আগে প্রতিবেশী জনৈক মিত্র মহাশয় জানান, আপনি চলে যান, হাওয়া ভাল বুঝছি না। তারপর এক রিকশা চালক, হিন্দু, এসে বলেন, আব্বাস সাহেব, আপনি পালান, ওরা আসছে। দেড় মাস ধরে পেট্রল, কেরোসিন, গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহ করা হয়েছে। গোধরা কাণ্ডের অনেক আগে থেকেই। সংঘ পরিবারের সমর্থক পত্রিকা 'সন্দেশ' এক মাস আগেই একটি তালিকা প্রকাশ করে 'হিন্দু নাম' এর আড়ালে কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আসলে মুসলিমদের। গোধরা কাণ্ডের অনেক আগে, ১৭ ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদে বজরং দলের প্রচারপত্রে বলা হয়, ধর্মযুদ্ধ আসন্ন, এবার শেষ যুদ্ধ, 'ওদের' শেষ করার যুদ্ধ।

বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, গণহত্যার সময় পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল। হর্ষ মন্দারের মতে, কথাটি ঠিক নয়। পুলিশ ভীষণভাবে সক্রিয়

www.pathagar.com

ছিল। দাঙ্গাবাজদের পক্ষে। সামান্য প্রতিরোধ হলেই পুলিস সে প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছে। টানা বাহাত্তর ঘণ্টা লুটতরাজ ও গণহত্যার তদারকি করেছে পুলিস। জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সময় কিছু পুলিস কর্মীর মুখেও শোনা গেছে 'জয় শ্রীরাম'। ৩ মার্চ রক্তাক্ত আমেদাবাদে রাজ্যের মন্ত্রী হারীন পাণ্ডা বলছেন, কত লোকই-বা মরেছে, এই তিন দিনে এর চেয়ে অনেক বেশি মুসলিম তো জন্মাল!

দাঙ্গা দমনে পুলিশ কী চমৎকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তা বোঝাতে নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন, পুলিশের গুলিতে ক-ত লোকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ কাদের গুলি করে মেরেছে? আক্রান্তদের। এবং যাঁরা হত্যাকাণ্ড রুখতে গেছেন, তাঁদের। গুজরাট কত স্বাভাবিক ও শান্ত, বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়েছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত ভোট শান্তিতে হয়ে গেল, উদাহরণ। ভোট হয়েছে গুজরাটের ১৬,০০০ গ্রামের মধ্যে ১২০০ গ্রামে। সাড়ে সাত শতাংশ। এবং ভোট পড়েছে ৩২ শতাংশ। আমরা যেদিন আমেদাবাদে পৌঁছই, সেদিন দশম ও একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শুরু। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী টেলিভিশনে বললেন, গুজরাট শান্ত ও স্বাভাবিক প্রমাণিত হল। ঘটনা এই যে, সেদিন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র ফাঁকা ছিল। সে ছবি আপনারা আজকালে দেখেছেন। দ্বিতীয় দিন কিছু মুসলিম ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে হাজির হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওদের বাড়ীতে গিয়ে হুমকি দেয়া হয়েছে, পরীক্ষা দিতে না গেলে ঘরে আগুন লাগানো হবে। এত করেও মোট পরীক্ষার্থীর ১৮ শতাংশ অনুপস্থিত, সরকারেরই তথ্য। হ্যাঁ, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ৬৫ শতাংশ মুসলিম ছাত্রছাত্রীর একটি বছর নষ্ট হল। আব্বাস আলি বাঘেলার ভাষায়, 'আমরা এখন অন্য পরীক্ষা দিচ্ছি।

আমাদের গাড়ির চালক দলপৎ সাদাসিধে মানুষ। বললেন, এখন বুঝেছি, দাঙ্গাটাঙ্গায় লাভ নেই, ধান্দা বন্ধ, ব্যবসা বন্ধ, পেটে টান পড়ছে। বরোদায় যুবরাজ হোটেলের এক কর্মী বললেন, লোকজন আসছে না, চাকরি থাকবে কিনা কে জানে। তারপর দুটো কথা বললেন। দেখুন স্যার, নরেন্দ্র মোদিজি ফার্স্ট ক্লাস চিফ মিনিস্টার। 'ওদের ঠাণ্ডা' করে দিয়েছেন। 'আমরা' দেখিয়ে দিয়েছি, ডালরুটি খেয়েও মানুষ মারা যায়, তাক্‌ত আছে আমাদের। হোটেলের আরেক কর্মী অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী। বললেন, দাঙ্গা চাই না। 'ওরা' সবাই এখান থেকে চলে গেলেই ভাল, তাহলে আর দাঙ্গা হবে না। এঁদের ভরসাতেই অবিলম্বে ভোট চান নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, বিরোধীরা হইচই করছে কেন, আমার সরকার ফেললে ভোট হবে এবং তখন বিরোধীদের 'সওদা মে ঘাঁটা পড় জায়েগা।' সওদা। রক্ত ঝরিয়ে। মানুষের জীবন নিয়ে।

www.pathagar.com

১১ এপ্রিল বিকেলে রাজধানী গান্ধীনগরে ঢোকার মুখে দেখলাম অতি পরিচিতি—সিটি অফ ফ্লাওয়ার্স। না ফুলটুল তেমন দেখা গেল না। তবে, জানা গেল, তখনই সচিবালয়ে শলাপরামর্শে ব্যস্ত দুই পবিত্র পুষ্প—নরেন্দ্র মোদি ও জর্জ ফার্নাণ্ডেজ। বরোদা ডায়নামাইট মামলায় জর্জের সঙ্গেই অভিযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কিরীটভাই। বললেন, এ জর্জ ফার্নাণ্ডেজ লোকটাকে আমরা চিনতে পারিনি। এতবড় বিশ্বাসঘাতক গোটা দেশে নেই। নিজের সমতা পার্টির কর্মীদের সঙ্গে কথাই বলছে না, কারণ ওরা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সরব হতে চায়। গুজরাটে বামপন্থীরা চূড়ান্ত দুর্বল, গত বিধানসভা নির্বাচনে এক-শতাংশ ভোটও পায়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল বলতে কংগ্রেস। কী অবস্থা এই দলের? আমেদাবাদ পৌরসভা কংগ্রেসের দখলে। কিন্তু কোনও ত্রাণশিবিরে ওদের উপস্থিতি নেই। গোটা আমেদাবাদ শহরে কংগ্রেসের একটা পোস্টার খুঁজে পাওয়া গেল না। গেল পাওয়া গেল, অবশেষে, সাবরমতী আশ্রমের সামনে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং সোলাঙ্কি ১২ ঘণ্টার অনশনে বসেছেন সেদিন। বেশ প্রসন্ন ভাব চোখেমুখে, যদি কোনওভাবে পালাবদল ঘটে, গাছের নিচে চাদর পেতে বসে আছে ক্ষমতার ফলটা পড়তেও পারে।

কোনও ত্রাণশিবিরে একজন মন্ত্রীও যাননি। গিয়েছিলেন শুধু শাহ আলম ত্রাণশিবিরে, শুধু একদিন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী সেখানে গিয়েছিলেন। শিবিরের এক কর্মী দেখিয়ে দিলেন, এই যে, ঠিক এই যায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাজপেয়ী। কী বলেছিলেন আমরা জানি, জানতে চাইলাম, কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? খুব ভাল। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এই লোকটা হয়ত অন্য রকম, নরেন্দ্র মোদিদের মত নয়; কিন্তু তার পরই গোয়ায় গিয়ে যা বললেন, আমরা ভেঙে পড়লাম। আবার পুলিস দাঙ্গাবাজদের সাহায্য করতে থাকল। আবার আগুন জ্বলল।

বরোদা থেকে আমেদাবাদ আসার সময় ড. গনেশ দেবী বললেন, এ ধ্বংসলীলার ফলে শুধু একটা ভাল ব্যাপার হয়েছে। বিজেপি-র মুখোশ খুলে গেছে। বাজপেয়ীর মুখোশটাও। ওরা বলত, আমাদের শাসিত রাজ্যে দাঙ্গা হয় না। অভূতপূর্ব দাঙ্গা হল। অবশ্য ঠিক দাঙ্গা নয়, একতরফা হত্যালীলা। বললাম, আর একটা ভাল বার্তা উঠে এসেছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দাঙ্গার আগুন গোটা দেশে কমবেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও কোনও রাজ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেও পাল্টা গুণ্ডামি দেখা যায়নি। 'ছোটে সর্দার' নরেন্দ্র মোদির 'কৃতিত্বে' উৎসাহিত হয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষও দাঙ্গা বাধায়নি। দাঙ্গামোদির গুজরাটের ডাকে সাড়া দেয়নি অবশিষ্ট ভারত।

www.pathagar.com

কিন্তু গুজরাট তো ভারতবর্ষের একটি রাজ্য। যদি ভূকম্পে ত্রাণ নিয়ে ছুটে যেতে পারে অবশিষ্ট ভারত, এখনই বা চুপ করে থাকবে কেন ? অবিলম্বে শান্তি মিছিল হবে না কেন আমেদাবাদে,বরোদায় ? যাবেন না কেন সব বিরোধী দলের নেতারা ? আগে বা পরে, যখনই বিধানসভা ভোট হোক, বিজেপি-বিরোধী সব দলের নেতারা কেন ছুটে যাবেন না প্রচারে ? গুজরাটের ভোট হোক ভারত বর্ষেরই ভোট। ভি পি সিং, জ্যোতি বসু, মুলায়ম সিং যাদব, সোনিয়া গান্ধী করুন অসংখ্য সভা। প্রতি কেন্দ্রে একজনই বিরোধী প্রার্থী থাকুন। গোটা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সচেতন মানুষ মদত দিন। গুজরাটের পরবর্তী ভোট হোক দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ। শুধু ত্রাণ নয়, নিয়ে যেতে হবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মদত। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি একজোট হয়ে থাকতে পারেন বিরোধীরা, এখনই বা হবেন না কেন ? বীভৎস জরুরি অবস্থাই তো এখন গুজরাটে। অন্য সব কাজ পরে হবে, আগে নৃশংস সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। এই যুদ্ধে যাঁরা রাজনৈতিক প্যাঁচ কষতে চাইবেন, তাঁদের ঘৃণাভরে বর্জন করতে হবে। গুজরাটের দাঙ্গার ডাকে আমরা সাড়া দিইনি। গুজরাটকে দাঙ্গামুক্ত করার ডাকে আমাদের সাড়া দিতে হবে। দেশের জন্যই এ বিষদাঁতটি উপড়ে ফেলার যুদ্ধে আমাদের যেতে হবে।

গুজরাটে আমরা গিয়েছিলাম বাংলার নবজাগরণ সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে। শাহ আলম দরগা ত্রাণশিবিরে রয়েছেন অনেক বাঙালিও। হুগলির আমিনুল আমেদাবাদ সোনার দোকানের কারিগর। ঘোর মোহনবাগান সমর্থক। বললেন, 'বাংলায় তো আমরা ভাবতেও পারি না। কেন বাংলায় এ রকম হয় না, এখানে হয়, এদের বুঝিয়ে বলতে পারেন না আপনারা ? ত্রাণশিবিরের চিকিৎসাকেন্দ্রে দেখা ডাঃ এম জি শেখের সঙ্গে। হাত মিলিয়ে বললেন, এই প্রথম অন্য কোনও রাজ্য থেকে একটা দল এল। বললাম, বাংলা থেকে আরও অনেকে আসবেন। কলকাতায় সংহতি সংগঠন তৈরি হয়েছে। আরো সাহায্য আসছে। ডাঃ শেখ ভয়ঙ্করভাবে দগ্ধ রোশেনারার মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধার তদারকি করতে করতে বললেন, বাংলা থেকে না এলে আর কোথা থেকে আসবে। .... ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়েও একটু গর্ব ছুঁয়ে গেল আমাদের বাংলা। বাঙালি।-২৮ এপ্রিল, ২০০২, আজকাল

❐

www.pathagar.com

# অশান্তির দূত

–সঞ্জীব সিংহ

**প্রশ্ন ঃ** এখন একটাই, শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে নরক নামিয়ে এনেছে যারা, তাদের কি কোনও বিচারই হবে না ? শাস্তি হবে না ?

জেনোসাইড বা সম্প্রদায়-সংহারের অভিযোগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শুনানি শুরু হয়েছে বেলজিয়ামের একটি আদালতে। জানা যাচ্ছে, একই অভিযোগ ইউরোপের বিভিন্ন আদালতে বিচার হবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শুধু বেলজিয়াম বা ব্রিটিশ আদালত নয়, প্রবাসী সচেতন সেক্যুলার গুজরাটিরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন হেগের ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসেও মামলাটি তোলার।

শ্যারন থেকে মোদি। ইজরায়েল থেকে গুজরাট। মুসলমান বিদ্বেষের দীর্ঘ অগ্নিবলয় একসূত্রে বেঁধেছে দু'টি ভিন্ন ভূগোলকে। আর সেই আগুনের কেন্দ্রে দুই খলনায়ক। মুসলমান সম্প্রদায় বিনাশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জারি করার অভিযোগ দু'জনেরই বিরুদ্ধে। আর কী আশ্চর্য, অভিযোগ অনুযায়ী দু'জনের কর্মপদ্ধতিও মোটামুটি একই রকম। পৃথিবী থেকে মুসলমান সম্প্রদায় মুছে ফেলার জন্য দুজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা অপব্যবহার করেছে বা করছে। গুজরাটে জ্যান্ত মানুষকে গুলি করে, কেটে কুচিয়ে পুড়িয়ে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর বুলডোজার চালিয়ে নতুন রাস্তা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যারা ছিল, তাদের নামধাম সরকারী নথিপত্রে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে, যাতে পরে কেউ এসে দাবী না জানাতে পারে ! কখন না বলতে পারে, ওখানে আমার বাড়ি-ঘর, প্রেম-ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজন ছিল!

বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের হায়না ও নেকড়েদের আদর্শ কি ইজরায়েল ? এ ব্যাপারে শ্যারন তো পথিকৃৎ। শ্যারনের নির্দেশে প্যালেস্টাইনে আরব ভূ-খণ্ড দখল করেছে সুসজ্জিত ইজরায়েল সেনাবাহিনী। ট্যাঙ্ক চালিয়ে, মর্টার মেরে, বোমা ফেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আরবদের বাড়িঘর। সেখানে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইহুদী বসতি। প্রতিটি আরবীয় চিহ্ন লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। হচ্ছে। যাতে পরে কোনো আরব এসে না বলতে পারে, ওখানে আমার বাড়ি-ঘর, প্রেম-ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজন ছিল।

কিন্তু এভাবে কি ইতিহাসের গলা টিপে মারা যায় ? জাগ্রত বিবেকের কণ্ঠরোধ করা যায় ?

www.pathagar.com

আপনি গুজরাটের বাতাসে কান পাতুন, পরিষ্কার শুনতে পাবেন হাজার হাজার কচিকণ্ঠ আকুল হয়ে তাদের আব্বা বা আম্মিকে ডাকছে। আপনি যদি পরে কখন গুজরাটে যান, তাহলে আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে রাস্তায়। কারণ, আপনি জানেন না কোন্ রাস্তার তলায় চাপা পড়ে আছে অজস্র মানুষের হতভাগ্য হাড়গোড়, আপনার পায়ের চাপে তা মড়মড়িয়ে ভাঙবে। ঠিক যে রকম প্যালেস্টাইনে নবনির্মিত ইহুদী বসতির দরজায় রাত নামলেই ধাক্কা দেয় অজস্র গৃহহীন আরবের দীর্ঘশ্বাস। কবর থেকে উঠে আসে আরব গেরিলাদের প্রেত ! এবং সন্দেহ নেই তারাই বিস্ফোরণ ঘটায় ইজরায়েলের জনবসতিতে, ট্রামে-বাসে, বিনোদন কেন্দ্রে।

শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে নরক নামিয়ে এনেছে দুই অশান্তির দূত। কোটি কোটি জীবনপ্রেমী মানুষের ধিক্কার, অভিশাপ আজ ওদের ঘিরে। কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসের মত এক বিমূর্ত বিচারপদ্ধতি চালু হয়ে গেছে সচেতন, সেক্যুলার মানুষের মনে। সেই বিচারে ওদের রেহাই নেই। কাফকার নায়ক জানতো না কী দোষে তার বিচার চলছে। এরা কিন্তু জানে। এরা খুব ভাল করেই জানে নিজেদের কুৎসিত অপরাধ। একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার সভ্যতাসহ বিনাশ করার অভিযোগ এদের বিরুদ্ধে। দাঙ্গার আগুন যখন জ্বলছে, সেই মার্চ মাসেই গুজরাট থেকে বীভৎস অভিজ্ঞতার শরীক হয়ে ফিরে আসেন মুসলিম উইমেন্স ফোরামের সাঈদা হামিদ, ন্যাশনাল আলিয়ন্স অফ উইমেন সংস্থার রুথ মনোরমা, নিরন্তর সংস্থার মালিনী ঘোষ প্রমুখ। প্রায় ৫ দিন তাঁরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন, আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন, শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। তাঁদের রিপোর্টের মূলকথা, সংঘ পরিবার পরিচালিত খুনে নেকড়েদের লক্ষ্য ছিল মুসলমান শিশু ও মহিলারাও। অজস্র গণধর্ষণ, নারকীয় অত্যাচারের বিবরণে তাঁরা বিমূঢ় হয়ে যান। মহিলাদের প্যানেল পরিষ্কার তাদের রিপোর্টে জানায়, গুজরাটে যা হয়েছে তা জেনোসাইড ছাড়া আর কিছু নয়।

## হিটলার, শ্যারন ও মোদি

তুরস্ক, বুরুণ্ডি, কম্বোডিয়া হলোকাস্ট, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রুয়ান্ডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুদান, ইজরায়েলের পর সম্প্রদায়-সংহারের তালিকায় যোগ হল গুজরাটের নাম। একটা সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি সমেত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিষ্ঠুর ও নারকীয় প্রক্রিয়া যুগে যুগে সভ্য মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। সেই কলঙ্ক তালিকায় এবার জ্বলজ্বল করবে গুজরাট। সম্প্রদায় সংহার বা জেনোসাইড জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে

www.pathagar.com

থেকেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে। সেই লজ্জার দায়ভার এবার থেকে আমাদেরও বহন করে চলতে হবে ? যতবার গীতাবেনের কথা মনে পড়বে, আমরা কি শুধুই লজ্জায় মুখ ঢাকব ? গীতাবেন এক সাহসিনী হিন্দু রমণীর নাম। গীতাবেনকে প্রাণ দিতে হয়েছে বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের নেকড়ে ও হায়নাদের হাতে। গীতাবেনের অপরাধ ? তিনি এক মুসলমান যুবককে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। সংঘ পরিবারের সুশিক্ষিত শিকারী কুকুরেরা খুঁজে খুঁজে বের করে গীতাবেনকে। তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। বিবস্ত্র করে গীতাবেনকে খুঁচিয়ে মারা হয়। আমরা কি লজ্জায় মুখ ঢাকব ? চোখ ফিরিয়ে থাকব ? নাকি এই ঘটনা থেকে মৌলবাদ প্রতিরোধের সাহস সঞ্চয় করব ? আমাদের ঠিক করতে হবে। এখনই।

গুজরাটের জেনোসাইড আমাদের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, আরও উঠবে, কেন নূরেমবার্গ বিচারের মত কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে না মোদি ও তার খুনে পৃষ্ঠপোষকদের ? ১৯৩৫ সালে নুরেমবাগ আইন বলবৎ করে হিটলারের ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি জার্মান ইহুদীদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থিক মন্দার ডানায় ভর করে ইহুদীদের বলির পাঠা হিসেবে খাড়া করে ক্ষমতার শিখরে উঠে এসেছিল হিটলার। প্রথমে ইহুদীদের জার্মানি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সংঘ পরিবারের আচরণের সাথে আদর্শগত অনেক মিল পাওয়া যেতে পারে হিটলার জামানার। সংঘ পরিবারও চায় মুসলমানরা ভারত ছেড়ে চলে যাক পাকিস্তান বা অন্য কোথাও। প্রয়োজনে গণবিনিময় হোক। শুধু হিন্দুরা থাকুক এ ভারতবর্ষে।

হিটলারও তাই চেয়েছিল। কিন্তু বিতাড়নে ইহুদী সমস্যা মিটবে না বলেই শুরু হয় নির্বিচারে গণহত্যা। একের পর এক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প গড়ে ওঠে। নাজিদের হাতে মৃত্যু হয় কম করে ৬০ লক্ষ ইহুদীর। আরও ৫০ লক্ষ মৃতও নিখোঁজের মধ্যে রয়েছে কমিউনিস্ট, ভবঘুরে জিপসি, পোলিশ, সমকামী, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। পৃথিবীর সেই বৃহত্তম জেনোসাইডের সাথে নারকীয় নিষ্ঠুরতায় পাল্লা দেবে গুজরাটের মুসলমান বিদ্বেষ। রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে এই বিদ্বেষকে আরো উসকে দিয়েছে মোদী সরকার। নরেন্দ্র মোদী নিজে শুনিয়েছেন নিউটনের নিয়মের কথা। ক্রিয়ার নাকি প্রতিক্রিয়া থাকেই। গোধরায় যেহেতু হিন্দুরা পুড়েছে অতএব দ্বিগুণ, চারগুণ অথবা একশোগুণ মুসলমান নিধনে সরকারী মদদ দেয়া হবে। নির্লজ্জভাবে সেই মদদকে পরোক্ষ বাহবা দেবেন দেশের প্রধানমন্ত্রীও 'যেখানে মুসলমানেরা থাকে সেখানেই নাকি গোগুগোল বাধে।' আমরা কিন্তু জেনে

www.pathagar.com

গেছি অন্য কথা। যেখানেই বিজেপি সরকার থাকে, 'সেখানে বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের নেকড়ে হায়নারা ত্রিশূল হাতে ঘোরে, সেখানেই দাঙ্গা বাধে।' ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। ইতিহাসই সাক্ষী পৃথিবীর বৃহত্তম জেনোসাইডের। ইহুদী নিধনে যে রকম পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছিল নাজিরা, তার তুলনা মেলা ভার। না, ভুল বলা হলো। নারকীয় নিষ্ঠুরতায় গুজরাট তার সাথে পাল্লা দিতে পারে। তবে জার্মানই হচ্ছে প্রথম দেশ, যারা এই সম্প্রদায়-সংহারের অপরাধ পরে স্বীকার করেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষতি পূরণের। মোদী সরকার নিজেদের অপরাধ বা অক্ষমতা স্বীকার করা তো দূরের কথা, চটজলদি নির্বাচন ডেকে ফের পাঁচ বছরের ক্ষমতাটা সুনিশ্চিত করে নিতে চেয়েছিল। যারা ভোট দেবে, তারা মানসিকভাবে কতটা সুস্থিতি অর্জন করেছে, তারা ভীত অথবা আতঙ্কিত কিনা, এসব দেখার কোনো প্রয়োজনই মনে করেনি। গণতন্ত্রের গলাটিপে ধরার পরেও এদের মুখোশ খোলার আর কোনও বাকি থাকে ?

ঠিক যে রকম পরবর্তীকালে ইজরায়েলে আরব প্রতিবেশীদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাংখার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়ার কথা ভাবেনি ইহুদীরা। পৃথিবীর বৃহত্তম জেনোসাইডের শিকার ইহুদীরা যখন একইভাবে আরেকটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার নারকীয় খেলায় মত্ত হয়, তখন কিন্তু আমাদের সন্দেহ তীব্র হয়। মনে হয় অদৃশ্যে আরো কোনো হাত এই পুতুল খেলা নিয়ন্ত্রণ করছে। ইজরায়েলের ইহুদীবাদী ও ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের ভেতর অলিখিত যোগসূত্র হিসাবে অদৃশ্যে রয়েছে কোনো বৃহত্তর স্বার্থ। যারা পৃথিবী ব্যাপি ছড়ানো মুসলমান বিদ্বেষকে নিজেদের আর্থিক স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়।

ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রগত সমস্যা আর ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রগত সমস্যার বয়স মোটামুটি এক। দুটোরই শিকড় পাঁচ দশক ব্যাপী। ভারত-পাকিস্তানের যে কোনো শহরের মত বহু প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে জেরুজালেম। মূলত উর্বর মৃত্তিকা যুগে যুগে বহু জাতি ও সম্প্রদায়কে সেখানে টেনে এনেছে। শুরু জেবুসাইতদের দিয়ে। ঐতিহাসিকরা বলেন, আদিম কানানাইতদের শাখা জেরুজালেমে সালেম মন্দির স্থাপন করেছিল। সেই পেগান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। কীভাবে যেন রটে গিয়েছিল জেরুজালেম খুব পবিত্র স্থান। ইহুদিরা সেখানে গড়েছিল সোলোমন মন্দির, খৃস্টানরা বানায় সেপুলক্রে গির্জা, আবার মুসলমানেরা তৈরি করে আল আকসা মসজিদ। উর্বর মৃত্তিকার লোভে প্যালেস্টাইনে ছুটে আসে নানা সময় হিব্রু, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক, সিরিয়রা। অভিযানে ইহুদীরাও

www.pathagar.com

ছিল। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইহুদীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না প্যালেস্টাইনে। ওই সময়েই থিয়োডার আর্জল প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ইহুদী কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯৪৮, ব্রিটেনের দখলে ছিল আরব প্যালেস্টাইন। অধিকার ছাড়ার আগে ইংরেজরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়, প্যালেস্টাইন হবে আলাদা ইহুদী রাষ্ট্র! মনে পড়ে যেতে পারে ভারতের ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি। কিন্তু ইংরেজরা এ রকমই।

প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা বাড়িয়ে আরবদের কোণঠাসা করার চক্রান্ত ইংরেজদের দীর্ঘ পরিকল্পনারই অঙ্গ। যে কারণে ইংরেজদের উপস্থিতিতেই আমরা দেখি দু-দুবার ইহুদি আরব দাঙ্গা হয়ে যায় প্যালেস্টাইনে। একবার ১৯২১ সালে, আরেকবার ১৯২৯ সালে। তিরিশের দশকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জেনোসাইডের শিকার ইহুদীরা জার্মানি থেকে কার্যত দলে দলেই আসতে থাকেন প্যালেস্টাইনে। ১৯৩০-এর শুরুতে যে সংখ্যাটা ছিল হাজার তিরিশেক, তা ১৯৩৬ সালেই বেড়ে দাঁড়ায় ৪ লক্ষে! এবং যথারীতি ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন কূটকৌশলের আবার আরব ইহুদী দাঙ্গা হয়।

ভারতেও ততদিনে দ্বিজাতি তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়েছে। মুসলিম লিগের রাজনীতির পাশপাশি অবশ্য অতটা শক্তিশালী ছিল না হিন্দু মহাসভা। কিন্তু ইংরেজদের বদান্যতায় কুৎসিত দেশ ভাগ আটকানো যায়নি। মুসলমান মৌলবাদের ধ্বজাধারী মুহাম্মদ আলী জিন্নার দিকে আমরা আঙুল তুললেও ভুলে যাই গোঁড়া হিন্দুয়ানির পতাকা উপরে তুলে ধরার ব্যাপারে তার আগেই পথিকৃৎ বিনায়ক দামোদর সাভারকার। নেহেরু যে ভারত কল্পনা করেছিলেন, তার হাজার সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা মৌলবাদীদের কল্পিত মুসলমান ও হিন্দু রাষ্ট্রের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল আদর্শগতভাবে। সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের অন্ধকার ছায়া মোদি সরকারের আচরণেও ফুটে উঠেছে দগদগে ক্ষতের মতো। সেজন্যই হয়ত আক্রান্ত মুসলমানদের বাঁচানোর ক্ষেত্রে কোনো রকম নৈতিক দায়বদ্ধতা মোদি সরকার অনুভব করেনি। এমনকী শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারেও তীব্র অনীহা দেখিয়েছে। হাড় হিম করা আতঙ্ক সে রাজ্যের মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে অনেককে বাধ্য করেছে চাকরিস্থলে বদলির দরখাস্ত পেশ করতে। মুসলমানেরা দলে দলে গুজরাট ছেড়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে, এমন দৃশ্য যে কল্পনা করা যায় না!

ইজরায়েলের আগ্রাসনেও একইভাবে স্বভূমি ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে আরব মুসলমানেরা। যদিও সেখানকার তৈরি করা মুসলমান

www.pathagar.com

বিদ্বেষের গল্পটা একটু অন্য রকম। মধ্যপ্রাচ্যের অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডারের দখল নিতে ঘাঁটি দরকার ছিল আমেরিকার। সেজন্যই ব্রিটিনের দোসর আমেরিকা ১৯৪২ সালে ইহুদি কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়। সবার আগে স্বীকৃতি আসে আমেরিকার কাছ থেকে। ভারতের স্বাধীনতা ও ন্যক্কারজনক দেশ ভাগ সম্পন্ন হয় মোটামুটি একই সময়ে। তার পরের ৫৫ বছরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যেমন একাধিকবার ঘটেছে, ঠিক সে রকমই ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধও হয়েছে নিয়ম মাফিকভাবে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত ইজরায়েলি সেনাবাহিনী আরব ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে দখল কায়েম করেছে। ১৯৬৭ সালে এই যুদ্ধ তীব্র আকার নিয়েছিল। দুদিনের ইজরায়েলি আক্রমণে অন্তত দশ লক্ষ আরব সেই সময় গৃহহীন হয়। মারা যায় হাজার হাজার। এই সংঘাতের তীব্রতা আরো বেড়েছে উন্মাদ শ্যারনের উপস্থিতিতে। রাবিন যেটুকু সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছিলেন প্যালেস্টাইনের সঙ্গে, তা নির্মম হাতে ভাঙতে একেবারেই বেশি সময় নেয়নি খুনে শ্যারন। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গুজরাটের নরেন্দ্র মোদির মতই শ্যারনও স্বঘোষিত মুসলমান তথা আরব বিদ্বেষী। শ্যারনের অভিধানে কূটনীতি, আলোচনা ইত্যাদি শব্দের স্থান নেই। কামান, বন্দুক, ট্যাংক, মর্টার শোভিত শ্যারন আগ্রাসনে বিশ্বাসী। আগে গুলি করো, তারপর কথাবার্তা বলা যাবে, এ রকমই শ্যারনের মানসিকতা। জল, বিদ্যুৎ ও ফোনের লাইন কেটে দিয়ে আরাফাতকে অবরুদ্ধ করার ভেতরেও সেজন্যই কোনো সৌজন্যের ছোঁয়া ছিল না। হয়ত সেজন্যই আরবদের রক্তপিপাসু শ্যারন শান্তিকামী বিশ্বকে স্তম্ভিত করে বলে দিতে পেরেছিল, '১৯৮২ সালেই আরাফাতকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। ওটা আমার বড় ভুল। এজন্য এখন আফসোস হয়।'

শ্যারনের কথা শুনে মনে পড়ে যায় নরেন্দ্র মোদির মন্তব্য। গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনে একটুও দুঃখিত না হয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা। আসলে যা জেনোসাইডকে সমর্থনেরই নামান্তর।

জানতে ইচ্ছে করে মোদিও কি শ্যারনের মত মানুষ মেরে বড় হয়েছে? শ্যারন ১৪ বছর বয়সেই যোগ দিয়েছিল আরব প্রতিরোধ বাহিনীতে। পরে বিশেষ ইজরায়েলী কমান্ডো বাহিনীর প্রধান হয়ে উঠে স্রেফ খুনের যোগ্যতায়। ইজরায়েলের লেবানন আগ্রাসনে শ্যারন ছিল পুরোভাগে।

www.pathagar.com

শ্যারনের রক্তপিপাসু সৈনিক জীবনের সেরা সময় আসে আর একটু পরে, যখন সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে প্রায় হাজার দুয়েক আরব প্যালেস্তিনিকে খুন করা হয়। নেতৃত্বে সেই অ্যারিয়েল শ্যারনই। ইজরায়েলের কোর্টে শ্যারনের বিচার হয় নামকা ওয়াস্তে। হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলে সেই শ্যারনই এখন ইজরায়েলের রাষ্ট্রনায়ক। একটা খুনির হাতে দেশের ভার পড়লে যা হয়, ঠিক তাই এখন ঘটছে ইজরায়েলের ক্ষেত্রে। শ্যারন খুনোখুনিকে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে, আমেরিকার ধামাধরা রাষ্ট্রসংঘের কোফি আনান পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'পরিস্থিতি গত ১০ বছরের মধ্যে সব থেকে খারাপ'।

শ্যারন বা মোদির মতো বিদ্বেষপূর্ণ মানুষ যেখানে ক্ষমতায় থাকে, সেখানে পরিস্থিতি খারাপই হয়। এদের অভিযানে যে ভালবাসা শব্দটাই নেই ! এরা ইহুদী বা হিন্দু, সেটাও বড় কথা নয়, আসল কথা হলো এরা মৌলবাদী!

## মৌলবাদের অভিশাপ

মানব সভ্যতার আদি থেকে এ পর্যন্ত যত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে ও মানুষ মরেছে তাকে একাই ছাপিয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন জেনোসাইড।

এসব জেনোসাইড অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী কিন্তু মুসলমান মৌলবাদীরা। তুরস্কে ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল ব্যাপী প্রায় পনেরো লক্ষ আরমেনীয় খ্রিস্টান নিধনে প্রত্যক্ষভাবে মদত জুগিয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্য। ন্যাশনালিস্ট কমিটি অফ ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেসের নবীন তুর্কীরা জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসার পরেই মৌলবাদ সেখানে মাথাচাড়া দিয়েছিল। প্রথমে বিতাড়ন। পরে খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরীকরণে বাধ্য করা হল। জোর করে মুসলমান করার পথেই বাধা এল খ্রিস্টানদের তরফে এবং শুরু হল নির্বিচার গণহত্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জামানীর সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধেছিল তুরস্ক। আর তখনই সামরিক বিপর্যয়ের পর বলির পাঠা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল আরমেনীয় খ্রিস্টানদের। লক্ষ লক্ষ আরমেনীয় পুরুষকে ক্যারাভানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মরুভূমি ও পর্বতে। দুর্গম পথে পানি ও খাদ্যবিহীন বহু মানুষের এমনিতেই মৃত্যু ঘটে। বাকিদের মেরে ফেলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িত দেশসমূহ জানত তুরস্কের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কতটা অগ্নিগর্ভ। সঙ্গী দেশগুলো অটোমানকে বাধ্য করে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচার চালু করত। ১৯১৯-এ অটোমান প্রশাসকেরা সামরিক বিচার করে। গণহত্যার জন্য কিছু লোক দোষীও সাব্যস্ত হয়। যথারীতি তার পরের বছর বিচারের নামে ফের প্রহসন ঘটিয়ে বেশির ভাগকেই দোষমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ আরমেনীয় খ্রিস্টান হত্যা যে জেনোসাইড ছিল, তা এখনও স্বীকার করে না তুরস্ক। বলে মৃত্যু ঘটেছিল যুদ্ধে ! কিন্তু জেনোসাইডের ইতিহাসে নাজিদের হাতে ইহুদী হত্যার পরেই ব্যাপকতার দিক থেকে স্থান পাবে এই গণহত্যা। যেখানে অন্তত ১৫ লক্ষ খ্রিস্টান প্রাণ হারিয়ে ছিলেন মৌলবাদীদের হাতে।

মৃত্যু অবশ্যই জেনোসাইডের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু পাশাপাশি থাকে বিচ্ছিন্নতাও। সংখ্যালঘু নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বেছে নিয়ে তাদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তও জেনোসাইডের ভেতরেই পড়ে। গুজরাটে আমরা এটাও দেখেছি। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক সংঘ পরিবার প্রচারে নেমেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদের অনেক দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না। মুসলমানদের দোকান থেকে জিনিস কেনা চলবে না। মুসলমানদের সাথে ব্যবসায়িক বিনিময় নিষিদ্ধ .... ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিরন্তর এসব প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে নিধনযজ্ঞ। এ জেনোসাইড ছাড়া আর কী ! আর শুধু তো মুসলমান নয়, হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে রক্ত লেগেছে খ্রিস্টানদেরও। এমনকি যারা সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, তাদেরও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করছে হিন্দু মৌলবাদীরা। ৭ এপ্রিল রবিবারের টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় সংঘ পরিবারের মুখপত্র পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক তরুণ বিজয় লিখেছেন, প্রতিটি প্রজন্মে ওরা (মুসলমানরা) উঠে দাঁড়িয়েছে আমাদের (হিন্দুদের) ধ্বংস করার জন্য। কখনও ওরা এসেছে ঘোরি এবং গজনি হয়ে। কখনও এসেছে সেক্যুলারিস্ট হয়ে।'

এ তো পরিষ্কার সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। হিন্দু মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু এখন আর শুধু সংখ্যালঘু মুসলমানেরা নয়, সেক্যুলারেরাও! কিন্তু তরুণ বিজয়দের জানা দরকার, এ দেশে সেক্যুলারেরা সংখ্যালঘু নন। মেধা পাঠকর নিগ্রহের ঘটনা বারবার ঘটবে না। পরের পর ঘটলে সেক্যুলারেরা তা প্রতিরোধ করবেন, সেই শক্তি সেক্যুলারদের আছে। সেক্যুলারেরাই এখনও এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। থাকবেনও।

সবচেয়ে বড় কথা, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনো মৌলবাদীরা জয়ী হয়নি। জয়ী হতে পারে না। কারণ, সভ্যতা এগোয় জীবনের হাত ধরে। মৃত্যুর মিছিল কখনও কখনও তাকে পেছন দিকে টান দেয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক। ইতিবাচক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সভ্যতায় বরাবরই অক্সিজেনের কাজ করে।

www.pathagar.com

**আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা**

জেনোসাইডের ইতিহাস ঘাটলে আরও একটি ধারণা খুব পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছেন সংখ্যাগুরুদের হাতে এবং সেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহার ঘটেছে। অশান্তি নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে শক্তিশালীদের ভূমিকা জ্বলজ্বল করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

শান্তি রক্ষা করবে কে ? এ প্রশ্ন বাতুলতার নামান্তর। দায়িত্ব অবশ্যই শক্তিশালীদের। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠর। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শান্তি রক্ষার ভার তো হিন্দুদের হাতেই থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পরিহাসে আজকের পরিস্থিতি তো উল্টেও যেতে পারত। তখন কি এ লেখার প্রয়োজন হতো না ? হত এবং সেটা হত মুসলমান মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে।

মুসলমান মৌলবাদীরা এদেশেও যথেষ্ট সক্রিয়। কিন্তু তার জন্য কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানকে কেন শুনাগার দিতে হবে ? অথচ সেটাই হয়েছে। হচ্ছে গুজরাটে। দুঃখজনকভাবে প্রশাসনিক মদতেই হচ্ছে। যেমন হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের সঙ্গে। ইস্ট টিমোরিজদের সঙ্গে।

ভারতেরই মত বহু ভাষাভাষী, নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার সভ্যতা। ১৩,৭০০টি দ্বীপ, ২৫০টি ভাষা, কম করে ৩০০টি আঞ্চলিক গোষ্ঠী মিলিয়ে একটি আস্ত ইন্দোনেশিয়া। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয় ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল পার্টি (পিএনআই) ও ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (পিকেআই)। কমিউনিস্টদের আদর্শে আকর্ষিত হয়ে দলে দলে কৃষকেরা যোগ দিতে থাকে পিকেআই-তে। ১৯৬৫ সালে অভ্যুত্থান ঘটে। ক্ষমতায় আসে জেনারেল সুহার্তো। আগের প্রেসিডেন্টকে অন্তরীণ করে রাখা হয় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। সুহার্তোর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী এবার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনে কমিউনিস্টদের ওপর। প্রায় ৫ লক্ষ কমিউনিস্ট সদস্য-সমর্থক খুন হন। আরও ৫ লক্ষকে গ্রেফতার করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেই যাতে দেশে নিরপেক্ষভাবে বিচার শুরু করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বসনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার বীভৎস গণহত্যার পর। কিন্তু এখানেও বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে। দেখা গেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল ফর

www.pathagar.com

যুগোস্লাভিয়া (আইসিটিওয়াই) রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। কারণ, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে শুধু প্রাক্তন যুগোস্লাভি প্রধান মিলোসেভিচকে। ছাড় পেয়ে গেছে ন্যাটোর সেই সব কমাণ্ডার, যারা ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ায় অন্যায়ভাবে যুদ্ধ শুরু করেছিল। ন্যাটোর সেই সব কুখ্যাত সেনাপ্রধানের নির্দেশে কম সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি। তবু আশার কথা, এ বছরের জুলাই মাসের ভেতর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) হয়তো কার্যকর হয়ে উঠবে। যদিও আমেরিকা খুবই আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ, বিভিন্ন দেশে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির জন্য অভিযুক্ত আমেরিকার সেনা ও প্রশাসকদের সেই আন্তর্জাতিক আদালতে ডাক পড়তে পারে। বিরোধিতা ছিল ভারতেও। গুজরাটের পর সেই আপত্তির কারণ এখন কিছুটা বোধগম্য হয়। জেনোসাইডে জড়িত থাকার জন্য বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের বিদেশে বিচার হচ্ছে এমন কাণ্ড কল্পনা করতে বাজপেয়ী সরকারের কষ্ট হতেই পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক ভারতের মাটিতেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুজরাট গণহত্যার সিবিআই তদন্ত চেয়েছে। দাবি জানিয়েছে দোষীদের দ্রুত শাস্তি বিধানের। বাজপেয়ী কি সেই দাবিতে সাড়া দেবেন ? সাড়া দেয়ার মানসিকতা থাকলে কি গোয়ায় মোদীকে ডেকে তিনি পিঠ চাপড়ে দিতেন ? প্রশ্নের ভেতরেই তো উত্তর লুকিয়ে আছে গুজরাটে দাঙ্গায় জড়িতদের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা থাকলে কি বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মোদীকে দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করার পরামর্শ দিতো ? দোষীদের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা থাকলে কি আক্রান্ত, ভীত শিশুদের ঘাড় ধরে পরীক্ষায় বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া যায় ? যেসব ফুলের মতো শিশু তাদের চোখের সামনে বাবা-মা, ভাই-বোনকে খুন হতে দেখেছে, নারকীয় অত্যাচার যাদের মনে দগদগে ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যই বা কী করেছে মোদী অথবা বাজপেয়ী সরকার ? এত কাণ্ডের পরেও সুবিচার ? আশা কি আদৌ করা যায়, যখন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গোধরার ঘটনা না ঘটলে গুজরাটের ট্র্যাজেডিও ঘটতো না।' এদেশের মাটিতে গুজরাটের গণহত্যার সুবিচারের আশা সুদূরপরাহত মনে হয় অতীতের প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইতিহাস দেখে। রাজনৈতিক কারণে গণহত্যা ঘটিয়ে দোষীরা কখনো এদেশে শাস্তি পায়নি। ১৯৮৪ সালের দিল্লির শিখ-নিধনে জড়িতরা, মুম্বাইয়ে ১৯৯৩ সালের দাঙ্গাকারীরা এখনো বুক ফুলিয়ে ঘোরে। সেসব এখনো ধূসর হয়নি স্মৃতিতে।

www.pathagar.com

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের মতোই জটিল বহুমাত্রিক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু কোথায় যেন অদৃশ্য যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় মুসলমান-বিদ্বেষে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জারি করার ভেতর। ইজরায়েলের ইহুদীরা চায় না বিতাড়িত আরব মুসলমানেরা স্বভূমিতে ফিরে আসুক।

আবার কাফকাকেই স্মরণ করতে হয়। ইজরায়েলের আরিয়েল শ্যারনের রূপান্তর ঘটেছে নরেন্দ্র মোদীতে। মুসলমান বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মিল না থাকলে এ মেটামরফসিস্ সম্ভব হতো না।

প্যালেস্টাইন আরব শরণার্থী শিবির যেন পাল্টে গেছে গুজরাটের ত্রাণ শিবিরে। সে উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, চোখের জল ও অভিসম্পাতে কাঁপছে সেখানকার দিনরাত।

এসব অশান্তির দূতদের জন্য কোনো শাস্তিই যথেষ্ট নয়।

–৫ মে, ২০০২, আজকাল

www.pathagar.com

# গুজরাট গণহত্যার বিশেষ রূপ

–সুকোমল সেন

২৭ ফেব্রুয়ারী গোধরা কাণ্ডের পরদিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে আমেদাবাদ ও প্রায় সমগ্র গুজরাট জুড়ে সংখ্যালঘু মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের যে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে এবং তার সাথে ধর্ষণ, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস সাধিত হয়েছে তা সমগ্র ভারতের সমাজ সচেতন মানুষদের নিকটই এক দারুণ মর্মবেদনা ও তীব্র ক্ষোভের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো ভারতে অনেকবারই সংঘটিত হয়েছে এবং গুজরাটে তো তা বারংবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সেসব দাঙ্গার সাথে গুজরাটের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের শুধু পরিমিতিগত পার্থক্যই নয়, এর গুণগত পার্থক্যও বিশেষ লক্ষণীয়। সেই পার্থক্যগুলো হলো মোটামুটি ঃ

১. ব্যাপকতার দিক দিয়ে পূর্বের সব রেকর্ড অতিক্রম করে প্রায় ২ হাজার মুসলমান নর-নারী-শিশুকে হত্যা, শত শত কোটি টাকার সম্পত্তি, ঘরবাড়ী, দোকান ইত্যাদি ধ্বংস এবং মুসলমান অর্থনৈতিক জীবনকে প্রায় শেষ করে দেওয়া।

২. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস, বজরঙ দল, বিজেপি অর্থাৎ সমগ্র সংঘ পরিবারের নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষিত হত্যাকারীদের পরিচালনায় ব্যাপকতম হিন্দু জনগণের এই মুসলমান হত্যাকাণ্ডে ও অগ্নিসংযোগে এবং নর-নারী নির্বিশেষে মুসলমান হত্যায় সমবেত উল্লাস।

৩. হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদেরও মুসলমানদের শুধু গহনার দোকান নয় এমনকি জুতা-চপ্পলের দোকান লুটপাটে অংশগ্রহণ ও বিদেশী গাড়ি ভর্তি করে লুণ্ঠিত মাল ঘরে নিয়ে যাওয়া।

৪. মুসলমানদের উপর আক্রমণের সময় হিন্দু উচ্চবিত্ত নারীদের ও উচ্চবিত্ত পুরুষদের অস্ত্রাদি যুগিয়ে প্রত্যক্ষ সাহায্য করা।

৫. যে দলিত ও উপজাতি সমাজের মানুষেরা উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয় সেই অত্যাচারিত সমাজের মানুষদেরও সংঘ পরিবারের খুনীরা মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা—যা সাধারণভাবে হয়ে থাকে না।

www.pathagar.com

৬. হত্যা পদ্ধতির চরমতম নিষ্ঠুরতা এবং ব্যাপক সংখ্যক নারীদের উপর ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর ধর্ষিতা নারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দেয়া, গর্ভবতী নারীদেরও পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে বাচ্চা বের করে ত্রিশূল বা তলোয়ারের মাথায় খুঁচিয়ে তুলে উদ্দাম নৃত্য করা এবং ব্যাপকভাবে পিতা-মাতার সামনে শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা।

৭. সর্বশেষ—সমগ্র সরকারি যন্ত্র, পুলিস ও প্রশাসন হত্যাকারীদের সাহায্যে নেমে আসা এবং সংঘ পরিবারের প্রশিক্ষিত খুনীদের সাথে থেকে মুসলমান নর-নারীদের হত্যায় লিপ্ত হওয়া।

গুজরাটের 'দাঙ্গা'র এই চরম অমানুষিক বিকৃতিগুলি অতীতের কোনো দাঙ্গায় আদৌ দেখা যায়নি। গুজরাটের এই নিদারুণ গণহত্যার পর সিপিআই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে তিন দিন আমেদাবাদে সরেজমিনে তদন্তের পর এই হত্যাকাণ্ডের এই বীভৎস বিকৃতিগুলির কিছু কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করি। এর সঙ্গে আরো একটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগে যে, ভারতে অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় এমনকি উত্তরপ্রদেশ যেখানে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রামমন্দির নির্মাণ করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে—সেখানেও গুজরাটের মতো বারংবার দাঙ্গা হয়নি। তবে গুজরাটে কেন হচ্ছে?

## ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে গুজরাটে সংঘ পরিবারের প্রভাবের ইতিহাসটার দিকে একবার নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসংঘ, সিন্ডিকেট কংগ্রেস ও জয়প্রকাশের সমাজতন্ত্রী দলকে নিয়ে জনতা দল গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে পরাজিত করে কেন্দ্রে সরকারও গঠিত হয়। সেই সময় জনতা দলের অভ্যন্তরে যে বিতর্কটা উঠে তাহলো পূর্বতন জনসংঘের সদস্যরা জনতা দলে থেকেও আরএসএস-র সদস্য থাকতে পারবে কিনা। পূর্বতন জনসংঘীরা এই বিষয়ে অনঢ় মনোভাব দেখায় এবং জনতা দল গঠিত হলেও আরএসএস ও সংঘ পরিবার তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যকলাপকে সম্পূর্ণভাবেই কার্যকর রাখে। বিতর্কে জনতা দল ভেঙে যায়। ভেঙে যাওয়ার ফলে জনতা দলের জনসঙঘী অংশ যেহেতু গোপনে নিজেদের জনসঙঘী সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল তাই তারা জনসঙঘকে নতুন নামে অর্থাৎ বিজেপি-তে পুনরায় সংঘবদ্ধ করে।

www.pathagar.com

গুজরাট রাজ্যে এর ফলে হলো যে, ঐ রাজ্যে সঙ্ঘ পরিবার প্রথম থেকেই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এবং এ রায় তাদের রাজনৈতিক মঞ্চ জনসঙ্ঘ নতুন বিজেপি নামে পূর্ণ শক্তিতে ফিরে এলো। কিন্তু সিন্ডিকেট কংগ্রেস ভেঙে গেল এবং গুজরাটে ইন্দিরা কংগ্রেসও ঘর গুছিয়ে উঠতে পারল না। ফলে ১৯৭৭ সালের পূর্বে তা ছিলোই, জনতা দল ভেঙে যাওয়ার পর সংঘ পরিবার ও তার রাজনৈতিক মঞ্চ বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব দ্রুতগতিতে গুজরাটের জনগণকে আচ্ছন্ন করলো। তাছাড়া গান্ধীবাদীরাও তাদের গান্ধীবাদী আদর্শ প্রায় ভুলেই গেল এবং গান্ধীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের আর কোনো চিহ্নই গুজরাটে রইল না।

### আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

এরই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হলো তাও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকেই শক্ত করে তুললো। গুজরাটে স্বাধীনোত্তর-কালে কংগ্রেস সরকার যে ভূমি সংস্কার করেছিল তাতে ভূমির মালিক হয়ে দাঁড়ায় প্যাটেলরা অর্থাৎ গ্রামের মোড়লরা। সাধারণ কৃষকেরা এই ভূমি সংস্কারের ফল থেকে বঞ্চিত হলো। এই প্যাটেলরা তাদের কৃষি কার্যলব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগ করেছে ব্যবসায় ও শিল্পে। ফলে এই প্যাটেলরা হলো একদিকে জমির মালিক এবং অপরদিকে হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক। এদের অনেকেই বিদেশে ব্যবসাসূত্রে স্থায়ী আস্তানা করলো এবং এনআরআই হিসেবে প্রভূত অর্থের মালিক হলো।

ভাবাদর্শের দিক থেকে এরা হলো চরম রক্ষণশীল হিন্দুত্ববাদী এবং মুসলমান বিরোধী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংঘ পরিবারের এরাই হলো অর্থের যোগানদার। ফলে সংঘ পরিবার প্রভূত ধনাঢ্যতা অর্জন করলো যার প্রমাণ পাওয়া গেল এবারের মুসলমানদের গণহত্যায়, যার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হলো অস্ত্রের যোগান দিতে এবং ট্রাক ট্রাক ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, মেটাল টিনের ব্যবস্থা করতে। তাছাড়া দলিতদের যাদের এতকাল এরা ঘৃণা করে এসেছে তাদের মধ্যে কোটি কোটি টাকা নগদ অর্থ বিলিয়ে ও মদের যোগান দিয়ে তাদের মুসলমান হত্যায় সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হলো।

এছাড়া কতকগুলি ধর্মীয় উপগোষ্ঠী যেমন স্বামী নারায়ণ সেক্ট ইত্যাদি গুজরাটের উচ্চবিত্তদের নিকট হাওয়ালা ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক দুর্নীতির আখড়া হিসাবে ব্যবহৃত হলো। ধর্মের নামগান ও হাওয়ালা একই সঙ্গে চলতে লাগলো। ফলে গুজরাটের উচ্চবিত্ত সমাজ হয়ে উঠলো চরম রক্ষণশীল, হিন্দুত্ববাদী ও দুর্নীতির আখড়া—এক কথায় অর্থলোলপ ও আদর্শহীন। জৈন

www.pathagar.com

ধর্মকে ব্যবহার করে একদিকে এরা নিরামিষাশী হলো এবং অপরদিকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রমিক ও গরিবদের চরম শোষকে পরিণত হলো। এক কথায় সম্পূর্ণ আদর্শহীন ও যে কোন প্রগতিবাদী চিন্তাধারার বিরোধী।

এর ফলস্বরূপ গুজরাটে সমাজতন্ত্রী দল ছিল অতি দুর্বল এবং কিছুটা গান্ধীপন্থী। কমিউনিস্ট ইশতেহারের গুজরাটী সংস্করণ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সংস্করণের সমসাময়িক হলেও এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী বহুলভাবে গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হলেও এবং গুজরাটী শিল্প-সাহিত্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা সৃষ্টি হলেও এই নব-উদীয়মান প্যাটেল সমাজ তাদের অর্থলোলুপতা ও দুর্নীতিতে ঐ সমস্ত আদর্শকেই ক্রমান্বয়ে ম্লান করে দিল।

## কমিউনিস্ট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

তাই গুজরাটে কমিউনিস্ট আন্দোলন সীমাবদ্ধ রইলো মূলত গরিব দলিত, উপজাতি সমাজের মধ্যে এবং কিছুটা মুসলমান সমাজের মধ্যে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে তার অনুপ্রবেশ আজও পর্যন্ত প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজীরাও অবক্ষয়ের চরম সীমায় এসে হিন্দুত্ববাদী সংস্থাতে পরিণত হলো এবং একদিকে গান্ধীবাদের কমিউনিস্ট বিরোধী অবশিষ্টাংশ ও অপরদিকে হিন্দুত্ববাদী কুপ্রভাব মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়েই রাখলো।

কিন্তু দলিতদের ও উপজাতিদের যাদের মধ্যে সিপিআই (এম)-এর বা সিপিআই-র কিছুটা প্রভাব রয়েছে তাদের, এবার দাঙ্গায় কী করে ব্যবহার করা হলো ?

এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক দুর্বলতার উপরই। সংঘ পরিবার যখন নগদ অর্থ ও মদ দিয়ে দলিতদের এক বিশাল অংশকে মুসলিম হত্যায় প্ররোচিত করলো তখন পার্টির দলিত সদস্যরা যথেষ্ট বাধাদানের চেষ্টা করে। কিন্তু সংঘ পরিবারের অর্থের দাপটে সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। আবার উপজাতিদের গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের একাংশ সুদী কারবার করে এবং উপজাতিদের মহাজন হিসাবে তারা পরিচিত। মহাজন হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক—তারা অত্যাচারী ও শোষকই হয়। তাই সংঘ পরিবার সুযোগ বুঝে মুসলমান মহাজনের ঋণগ্রস্ত উপজাতি কৃষকদের মুসলমান হত্যায় প্ররোচিত করে এবং বেশ কিছুটা সফল হয়। এখানেও

www.pathagar.com

উপজাতিদের মধ্যে পার্টির কাজ থাকলেও সংঘ পরিবারের ষড়যন্ত্রকে রুখতে পার্টি সব জায়গায় সমর্থ হয় না।

কতকগুলি জায়গায় অবশ্য পার্টি সফল হয়। যেমন সবরকণ্ঠ জেলাতে। পার্টির প্রচেষ্টায় দলিত ও উপজাতিরা বহু মুসলমান পরিবারকে রক্ষা করে এবং দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করে। অন্যান্য স্থানেও এই রকম কিছু উদাহরণ আছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

গুজরাটের সাম্প্রতিক জেনোসাইডকে বুঝতে গেলে গুজরাটের এ সামাজিক-ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই তা করতে হবে। নচেৎ বারংবার কেন দাঙ্গা হচ্ছে বা এইবার তা এই রকম সাংঘাতিক আকার কেন ধারণ করলো তা বুঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধু মোদী সরকারের ভূমিকাই নয়, কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকারও এই মুসলমান হত্যার সবরকম ইন্ধন যুগিয়েছে। মোদীকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে এবং বাজপেয়ী স্বয়ং গোয়া অধিবেশনে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন বর্ষণ করেছেন। এই সবকিছু মিলিয়েই গুজরাটের ঘটনাকে বিবেচনা করতে হবে।

## কতিপয় গুজরাটী বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য

সমগ্র পরিস্থিতিটা অনুধাবনের জন্য গুজরাটের সিপিআই (এম)-এর সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে আমি কয়েকজন গুজরাটের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী ও দুইজন মহিলা সমাজসেবীর সঙ্গে গুজরাটের জেনোসাইড নিয়ে আলোচনা করি। তাঁদের সকলকেই যে প্রশ্নগুলি আমি করি, তাহলো—(১) গুজরাটে বারংবার এই দাঙ্গা কেন হচ্ছে, (২) এবার মুসলিম হত্যায় এত নারী ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে চরম নিষ্ঠুরতা সংগঠিত হলো কেন, এবং (৩) এতে শিক্ষিত গুজরাটী হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া কী ? তাঁদের জবাবগুলি মূল বক্তব্য প্রায় একই প্রকার। তাহলো—

১. গোধরায় করসেবকদের ট্রেন জ্বালানো হোক বা না হোক এই মুসলিম বিরোধী জেনোসাইড সংগঠিত হতই। গোধরা কেবলমাত্র সময়ের দিক থেকে একে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

২. গোধরা কোনো পূর্বপরিকল্পিত কাণ্ড নয়। করসেবকদের স্টেশনে স্টেশনে চরম অত্যাচার ও গোধরায় এক মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানিই এই ঘটনার প্রধান কারণ, যদিও ঘটনাটি চরম নিন্দনীয়।

www.pathagar.com

৩. দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংঘ পরিবার এই গণহত্যায় প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল এবং শুধু মুসলমানদের হত্যা নয়, কিভাবে অতি চরম নিষ্ঠুরতায় সেই হত্যা করা যায়, তার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ চলছিল

৪. দীর্ঘদিন ধরেই মুসলিম বিরোধী ঘৃণার বিষ হিন্দুদের ধমনীতে ধমনীতে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল—এবার যার সফল পরিণতি ঘটেছে।

৫. এই বিষ এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, গুজরাটের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের নারীরাও এই হত্যায় নানাবিধ সাহায্য করেছে ও সরাসরি লুটপাটে অংশগ্রহণ করেছে।

যখন আমি একজন মহিলা সমাজ সেবিকাকে প্রশ্ন করলাম—কী করে নারীদের উপর এই ধর্ষণ ও এমনকি গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে হত্যা করা, গুজরাটী শিক্ষিত হিন্দু সমাজ সহ্য করছে ? তখন তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি জানেন যে গুজরাটে প্রতিদিন গড়ে ১৫টি বধূ হত্যা সংগঠিত হয় এবং সবই হিন্দু সমাজে ?' তিনি বললেন, এই তথ্যই এই ধরনের নিষ্ঠুরতার কারণ উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থাৎ এখানে এটাই স্বাভাবিক।

দু'জন প্রবীণ অধ্যাপক আমাকে বললেন যে, বর্তমানে গুজরাটী সমাজের অর্থলোলুপতা, নিরামিষ ভোজনের ভণ্ডামি, শ্রমিক ও গরিবদের শোষণ ও আদর্শহীনতা—এই গণহত্যার বাস্তব অনুকূলতা সৃষ্টি করেছে। একজন অধ্যাপক বললেন যে, এর জন্য দায়ী গ্লোবালাইজেশন ও তার বিকৃত সংস্কৃতি ও অর্থলোলুপতা এবং সমাজের সামগ্রিক অমানবিকতা। তাই হয়েছে—মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দিয়ে সেইগুলি দখল করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র।

হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতি (গুজরাটী) আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি চরম নিষ্ঠুরতার কথা বলছেন। কিন্তু যে সমাজের অর্থলোলুপতা প্রতিদিন গড়ে ১৫টি ব্রাইড বার্নিং ঘটায় সেখানে মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা বা তার পেট চিরে বাচ্চা বের করে হত্যা করাটা কী এদের কাছে বেশি নিষ্ঠুরতা ?' তাঁর বক্তব্য—পুঁজিবাদী সমাজের অর্থপৈশাচিকতা ও গ্লোবালাইজেশনের বিকৃত রুচি ও মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয় গণহত্যা ও পৈশাচিকতার এই পরিস্থিতির বাস্তবতাকে সৃষ্টি করেছে। তাঁরা যেটা আরো বললেন, সেটা হলো গুজরাটে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনও আছে। কিন্তু তাঁরা এতই সংখ্যালঘু যে, তাঁরা মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। মুখ খোলার

www.pathagar.com

চেষ্টা করলেই তাঁদের হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং প্রশাসন নির্বিকার থাকছে, কোনো সুরক্ষা দিচ্ছে না।

জজ সাহেব আমাকে আরও বললেন যে, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যেই অপরাধী বেশি কিন্তু তিনি প্রশ্ন করলেন—হর্ষদ মেহেতা, কেতন পারেখ, ভরত শাহ—এরা কারা ? হিন্দু না মুসলমান ?

## গুজরাটের সাম্প্রদায়িক গণহত্যা—একটি হুঁশিয়ারি

সর্বাপেক্ষা বিপদ হলো—কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যে নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করে চলেছে, তা হিংস্র হিন্দুত্ববাদের বাস্তবায়নের নীতি। তা একদিকে সংখ্যালঘু গণহত্যা, অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকীকরণ এই দু' ধারায় অগ্রসর হচ্ছে। গুজরাটের ঘটনা হলো ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

তাই শুধু গুজরাটে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও গুজরাটে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো তা বিস্তৃত হতে পারে। কারণ দীর্ঘদিন যাবত বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক প্রচার অনেক দাঙ্গা বিরোধী হিন্দুকেও কিছুটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে।

যেমন দিল্লিতে এক অরাজনৈতিক মহিলা আশ্চর্য হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—হিন্দুদের দ্বারা কী এই ধরনের বর্বরতা সম্ভব ? হয়তো এইগুলো প্রচারের বাড়াবাড়ি। ঠিক একই প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গেও অনেক শিক্ষিত হিন্দু নরনারী কিন্তু করছেন। হিন্দুরা এই বর্বরতম কাজ করতে পারে তা বিশ্বাসই করতে চান না। এর অর্থ হিন্দুত্ববাদের ভয়াবহতা এরা এখনও বুঝতে পারছেন না এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িক চিন্তায়ও এরা প্রভাবিত।

বিপদ এখানেই। এই ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে এবং কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে—বিজেপি ও সংঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদী উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে হবে এবং তা পশ্চিমবঙ্গেও। নচেত সন্ত্রাসবাদী মুসলিম মৌলবাদও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।-২৯ মে, ২০০২, গণশক্তি

❐

www.pathagar.com

# ঘৃণার ধারণাই সঙ্ঘের চিন্তার কেন্দ্রে

—এ জি নুরানি

"হিন্দুস্তানে বিদেশী জাতিগুলিকে অবশ্যই হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করতে হবে, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতিকে অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা তাদের পোষণ করা চলবে না এবং হিন্দু জাতিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পৃথক অস্তিত্ব হারাতে হবে ; অথবা তাদের এদেশে থাকতে হবে পুরোপুরি হিন্দু জাতির কাছে পদানত হয়ে, কোনো কিছু দাবি না করে, কোনো সুবিধা পাওয়ার আশা না করে, বাড়তি কোনো সুবিধার থেকেও কম—এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবে না। অন্ততপক্ষে এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে তাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। আমরা একটি প্রাচীন জাতি ; আমাদের প্রভাবেই, যেভাবে একটি প্রাচীন জাতির বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে, যারা আমাদের দেশকে তাদের বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আচরণ করা উচিত।"

মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তাঁর "আমরা অথবা আমাদের জাতিত্ব নিরুপিত হলো" (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড) বইতে একথা লিখেছেন। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ জাঁ একুরান 'ভারতীয় রাজনীতিতে জঙ্গী হিন্দুত্ববাদ ঃ আরএসএস সম্পর্কে একটি সমীক্ষা' (মিলিট্যান্ট হিন্দুইজম ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস্ ঃ এ স্টাডি অব দি আরএসএস) নামে ১৯৫১ সালে লেখা একটি সহানুভূতিশীল পুস্তকে গোলওয়ালকরের এই বইটিকেই আরএসএস-র 'বাইবেল' বলে চিহ্নিত করেছেন। গোলওয়ালকর এই ৭৭ পৃষ্ঠার বইটি লেখেন ১৯৩৮ সালে, যখন হেডগেওয়ার তাঁকে আরএসএস-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে ১৯৪০ সালে তিনি 'সরসঙ্ঘচালক' হিসাবে হেডগেওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হন।

এতটাই রূঢ় ও খোলাখুলিভাবে গোলওয়ালকর বইটিতে লিখেছেন আরএসএস পর্যন্ত এর থেকে নিজেকে আলাদা করার একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নিয়েছিল। আরএসএস দাবি করেছিল যে, এই বইটি ভি ডি সাভারকরের ভাই বাবারাও জি ডি সাভারকরের লেখা মারাঠী পুস্তক 'রাষ্ট্রমীমাংসা'-র নিছক ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যদিও ১৯৩৯ সালের ২২ মার্চ লেখা 'উই আর আওয়ার নেশনহুড' পুস্তকটির ভূমিকায়

www.pathagar.com

গোলওয়ালকর বলেছেন যে, 'রাষ্ট্রমীমাংসা' বইটি 'আমার লেখার প্রেরণার এবং রচনার একটি প্রধান উৎস। এই বইটির একটি ইংরাজি অনুবাদ শীঘ্রই বের হতে চলেছে।' রাজেন্দ্র সিং এবং ভাউরাও দেওরস-ও ১৯৭৮ সালের এক দায়িত্বশীল বিবৃতিতে গোলওয়ালকরের এই বইটিকে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে আরএসএস-র দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'চিন্তাগুচ্ছ' বা 'বাঞ্চ অব থটস্ ' বইটিকে আরএসএস-র কাজের ধরন, প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। ফলে গোলওয়ালকরের লেখা, বিশেষত এই দুটি বই-এর প্রাসঙ্গিতা ও অকাট্যতা আরএসএস-র কাছে এখনো যথেষ্টই।

'উই অর আওয়ার নেশনহুড'-এ গোলওয়ালকর হিন্দু জাতিত্বের উদ্ভব সম্পর্কে লিখছেন ঃ 'মুসলিমরা হিন্দুস্থানের মাটিতে প্রথম যেদিন পা দিলো সেই অশুভ দিনটি থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত হিন্দু জাতি বীরত্বের সঙ্গে লুণ্ঠনকারীদের হঠাতে লড়াই করে চলেছে .... এইভাবেই জাতির আত্মার উন্মেষ ঘটছে।' গান্ধী এবং অন্যান্যদের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে তীব্র সমালোচনা করে গোলওয়ালকর এতে লিখেছেন যে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করে 'হিন্দু জাতিকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' গোলওয়ালকরের মতে স্বাধীনতা আন্দোলন কোনও 'প্রকৃত জাতীয়তাবাদী' সংগ্রামই নয়। তিনি বলছেন ঃ '... একমাত্র সেই আন্দোলনগুলিই 'প্রকৃত জাতীয়তাবাদী', যেগুলি হিন্দু রাষ্ট্রকে বর্তমান অসাড় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে, পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। তাঁরাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করার আকাঙখাকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে। এছাড়া অন্য যারা রয়েছে, তারা হয় জাতীয় স্বার্থের শত্রু এবং বিশ্বাসঘাতক, অথবা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া নির্বোধ।'

এই তথাকথিত 'বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু'-দের কীভাবে সংশোধন করা যাবে, তার পথ গোলওয়ালকর আবছা রাখেননি। 'হিন্দুস্থানে বিদেশী জাতিগুলিকে' থাকতে গেলে কী আচরণ করতে হবে সেটা বলার সাথে সাথে এ আচরণে বাধ্য করার জন্য কী দাওয়াই তিনি পছন্দ করেন সে সম্পর্কেও কাউকে সন্দেহে রাখেননি গোলওয়ালকর। খোলাখুলি হিটলারের মতাদর্শই তিনি ভারতেও অবলম্বন করার কথা বলেছেন এই বইতে। 'জাতি ও তার বিশুদ্ধতা রক্ষায় জার্মানি সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেশকে সেমিটিক জাতি—ইহুদী মুক্ত করেছে। জাতিগর্বের সর্বোচ্চ রূপ দেখা গেছে এখানে। জার্মানি আরও দেখিয়েছে যেসব জাতি ও সংস্কৃতির পার্থক্যের শিকড় অত্যন্ত গভীরে তাদের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্রে মিলে যাওয়া কতটা অসম্ভব। এই শিক্ষা

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানে আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো শিক্ষা, এ থেকে আমাদের লাভ হতে পারে।'

এটা কী 'সাম্প্রদায়িকতা'? আরএসএস-র কাছে অবশ্যই নয়। গোলওয়ালকরের তারস্বর চিৎকার। 'কী করে আমরা 'সাম্প্রদায়িক' হচ্ছি, যখন আমাদের দেশ, আমাদের জাতির স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও স্বার্থের জন্য আমরা কাজ করছি না।'

যখন তাঁর লেখা 'বাঞ্চ অব থটস্'-এর পাতা কেউ ওলটাবেন, যা আগের বইটি লেখার ২৫ বছর বাদে প্রকাশিত হয়েছিল, একই ধুয়োর পুনরাবৃত্তি দেখে বিস্মিত হবেন। এতে যদি কিছু থেকে থাকে, তা আরো উচ্চনিনাদী। এতে বলা হয়েছে, হিন্দুরাই একমাত্র মানব ভ্রাতৃত্বের ধারণার ভিত্তি গোটা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তা ছড়িয়েছে। হিন্দুদের ইতিহাস ঃ 'ইসলাম, ক্রীশ্চান এবং এমন কমিউনিজমের প্রসারের ইতিহাসের রক্তখচিত পৃষ্ঠার মধ্যে উজ্জ্বল বৈপরীত্য নিয়ে অবস্থান করছে .....।

গোলওয়ালকর একই রকম তীব্র ভাষায় গণতন্ত্র এবং কমিউনিজমকে নিন্দা করেছেন। গণতন্ত্র ? "এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধারণার একমাত্র অর্থ হলো কিছু মেধাসম্পন্ন লোকের বাকিদের শোষণ করার স্বাধীনতা .....।" গণতন্ত্র হলো ঃ "খুব বড়োভাবে বিস্তৃত চালু একটি অলীক অভ্যাস মাত্র।"

গোলওয়ালকর এই বইতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জন্ম থেকেই একজন হিন্দুর সাথে অন্যদের ফারাক গড়ে ওঠে। কারণ, হিন্দুরা নাকি মাতৃজঠরে থাকা অবস্থা থেকেই হিন্দু হন, কিন্তু অন্যদের মুসলিম বা খৃষ্টান হতে গেলে সুন্নৎ করতে হয় অথবা দীক্ষিত হতে হয়। জন্মগতভাবেই যারা নিম্নস্তরের, সেসব মানুষকে তাই আরএসএস সংশোধন করে ফিরিয়ে আনতে চায়। গোলওয়ালকর 'হিন্দু জীবনধারা' অবলম্বন করার মাধ্যমে ভারতে বসবাসকারী মুসলিম বা খৃষ্টানদের হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে এই বইতে।

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে 'খলনায়ক' হিসাব চিহ্নিত করে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে গান্ধীকে আলাদা করে আক্রমণ করার জন্য বেছে নেন গোলওয়ালকর।

এই ভাবাদর্শগত ঐতিহ্যকেই বালাসাহেব দেওরস গ্রহণ করেন, ১৯৭৩ সাল তিনি যখন আরএসএস-র সরসঙ্ঘচালক হলেন। দেওরসএই পথকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থেকেছিলেন। তিনি ১৯৭৭-৭৯ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও

www.pathagar.com

জনতা পার্টির আরো কয়েকজনের পক্ষ থেকে এই পথকে পরিহার করার চাপকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১৪ জানুয়ারী এক সাক্ষাৎকারে দেওরস 'হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ধর্মের মতো ভারতীয় ভূখণ্ডে উদ্ভূত ধর্মগুলোকে একদিকে এবং ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মতো বাইরে থেকে আসা ধর্মগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট ফারাক থাকার কথা বলেন। ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর তিনি 'হিন্দু' শব্দটির অভিন্ন অর্থ নিরূপণ করেন এবং বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুই জাতীয়।' মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দু শব্দের অর্থকে বিস্তৃত করার জন্য দেওরস অনেক কিছু করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি জোর দিয়ে বলেন, হিন্দু শব্দের অর্থ অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে আরএসএস-র স্বয়ংসেবক করা হয়েছে। তবে আরএসএস-র সংবিধান সংশোধন না করেই কীভাবে এ কাজ করা হলো, তা দেওরস ব্যাখ্যা করেননি, কারণ আরএসএস-র সদস্যপদ শুধুমাত্র হিন্দু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরএসএস তার সদস্য পদ সংক্রান্ত তথ্য সবসময়েই গোপন করে রাখে, যদিও গান্ধী হত্যার পরবর্তী সময়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য সেই সংগঠন তার সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্য রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও হিন্দু কারা তা নিয়ে দেওরসের দুমুখো কথার নজির রয়েছে। ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল সঙেঘর মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ দেওরস লেখেন ঃ "আমরা মনে করি এই ভূখণ্ডের দেশীয় সবাই হিন্দু, সমস্ত ধর্মনির্বিশেষেই। কিন্তু আরএসএস-র প্রধান লক্ষ্য হলো সনাতন হিন্দুদেরই সংগঠিত করা।'

এই ধরনের একটি স্বতন্ত্র ধারণা কেবলমাত্র ঘৃণার মাধ্যমে উৎসাহিত হতে পারার এবং আরও বেশি ঘৃণার যা জন্ম দেয়। হিন্দুত্ব মুসলমান এবং ইউরোপীয় অবক্ষয়ী সভ্যতার সঙ্গে দশ শতাব্দী ধরে সংযুক্ত থাকার পরেও এখনো পৃথিবীর 'মহানতম' বলার অর্থ একটি গোষ্ঠীকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করা।

আশ্চর্যজনকভাবে বৃটিশরা আরএসএস সম্পর্কে যত্নশীল আলোচনার পর নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে বিহার সরকারকে পাঠানো এক সার্কুলারে (নং এফ ২০১/৪৪, প্রস্টাস, ১৬ মার্চ ১৯৪৪) বলা হয় ঃ "…. এই সংগঠন যে অঞ্চলে শক্তিশালী, সেই সি ই বেরার এবং বোম্বে সরকারসহ অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, আরএসএস একটি রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক সংগঠন, যারা ফ্যাসিবাদী লাইন নিয়ে চলা একটি জঙ্গী সাংগঠনিক রূপ দিয়েছে।" ফ্যাসিবাদী শব্দটিকে অত্যন্ত যথার্থভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

রোনাল্ড ই স্মিথ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত' বইটিতে বলেছেন, "নেতৃত্বের ধরন, জঙ্গিপনার গুরুত্ব, জাতিগত-সংস্কৃতিগত উচ্চমণ্যতার তত্ত্ব, ধর্মীয় আদর্শবাদপুষ্ট অতি জাতীয়তাবাদ, অতীত গৌরবের প্রতীকের ব্যবহার, জাতীয় সংহতিতে জোর দেয়া, ধর্মীয় অথবা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের জাতি ধারণা থেকে বর্জন করা—আরএসএস-এর এসব বৈশিষ্ট্যগুলোই ইউরোপের ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের সাথে সাদৃশ্যমূলক।"

আজও ঠিক এই দর্শনই চালনা করছে আরএসএস ও তথাকথিত পরিবারকে।-১৯ মে, ২০০২, গণশক্তি

www.pathagar.com

# নাথুরামের বীজ থেকেই তৈরি হয়েছে এই রাজনীতি

–আবুল বাশার

আমি বরাবরই বলে আসছি, নাথুরামের ঈশ্বর আর মহাত্মা গান্ধীর ঈশ্বর এক নয়। দারা শিকোর খোদা আর ঔরঙ্গজেবের খোদা এক নয়। অর্থাৎ এঁদের প্রত্যেকের ঈশ্বরচিন্তা আলাদা আলাদা। নাথুরাম নিজেকে খাঁটি হিন্দু মনে করতেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও মনে করতেন তিনিই প্রকৃত হিন্দু। এবং সেই সাথে মহাত্মা এই হিন্দুর প্রকৃত গৌরব মনে করতেন মুসলমানকে ভালবাসার মধ্যে নিহিত ; সেই ভালবাসা খাঁটি না হলে একজন হিন্দু সত্যি করে হিন্দু হয়ে উঠে না। শুধু মুসলমান নয়, জৈন-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ এবং অন্য সকল ধর্মের মানুষকে ভালোবাসার অপরিসীম শক্তি ছাড়া একজন মানুষ হিন্দু হতেই পারে না, একথা বিশ্বাস করতেন মোহনদাস। অপরপক্ষে দারা শিকো কুরআনের আয়াতের মধ্যে উপনিষদের প্রতিধ্বনি শুনতে পেতেন। 'ঈশ্বর-আল্লা তেরো নাম, সবকো সুমতি দে ভগবান'—মহাত্মার কণ্ঠনিঃসৃত এই রামধুন, এই বোধ প্রমাণ করে, দারা এবং মোহনদাসের ঈশ্বর একই ঈশ্বর, একই খোদা। মহাত্মা গান্ধী সেই কথাই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন এবং গাইতেন যা তিনি বিশ্বাস করেন।

অন্য তরফে ঔরঙ্গজেবের খোদা আর নাথুরামের ঈশ্বর একই ধরনের ধর্মসত্তা, একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, একই ধাতুর অস্তিত্ব। এঁদের ঈশ্বর তাঁদেরকে হিংসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন, খাঁটি হিন্দু হওয়ার জন্য মুসলমানকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। খৃস্টান বা বৌদ্ধকে ধ্বংস করতে প্রাণিত করেছেন। এমনকি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য দরকার হলে মহাত্মার মতো একজন সরল অথচ বুদ্ধিমান, খাঁটি সাধু প্রকৃতির হিন্দুকে গুলি করে নিধন করতে উন্মত্ত করে তুলেছেন নাথুরামের রাম। মহাত্মার রাম আর নাথুরামের রাম নিশ্চয় তাহলে এক নয়।

মহাত্মার রাম গুলিবিদ্ধ মহাত্মাকে মৃত্যু মুহূর্তে নিশ্চয় বলে উঠেছিলেন, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি খাঁটি হিন্দুর ধর্ম পালন করলে। নাথুরামকেও তাঁর রাম বলেছিলেন, মহাত্মাকে গুলি করে তুমি হিন্দুর সত্যধর্ম পালন করলে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ধর্ম জিনিসটা কার কাছে কীভাবে প্রতিভাত হবে তা নির্ভর করছে মানুষটার ধর্মবোধের উপর, ধর্ম সম্পর্কে ধারণার উপর, তার

www.pathagar.com

পালিত ধর্মের সংজ্ঞার উপর। হিন্দুত্বের সংজ্ঞা মহাত্মার এক, নাথুরামের অন্য—দু'জনই হিন্দু, কিন্তু দুজনের হিন্দুত্ব এক নয়। একজনের হিন্দুত্ব অন্যকে গুলি করতে বলে, তার হিন্দুত্ব সহিংস হিন্দুত্ব। অন্যজনের হিন্দুত্ব অহিংস হিন্দুত্ব। অন্য ধর্মের মানুষকে সেই অহিংসাধর্ম ভালবাসতে শেখায়। 'অহিংসা পরমধর্ম'—এই হচ্ছে মহাত্মার কাছে হিন্দু ধর্মের সারাৎসার। তিনি মুসলমানকে ভালবেসে নাথুরামের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে করতে একটি শব্দই উচ্চারণ করেন, 'হে রাম'।

দারা শিকোর মৃত্যুও অনুরূপ, ইসলাম শান্তির ধর্ম, তা প্রাচীন উপনিষদের মতোই উদার, কী উৎকৃষ্ট ধর্মবোধ তাঁর, কুরআনের আয়াতে তিনি উপনিষদের গুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলেন। তাই-ই কি তাঁকে তথাকথিত খাঁটি মুসলমান ঔরঙ্গজেবের হাতে মরতে হলো। তাহলে খাঁটি কে, প্রকৃত কে, ধার্মিক কে ?

নাথুরামের ধর্মানুভূতির বীজ থেকে তৈরি হয়েছে বিজেপি-র রাষ্ট্র করায়ত্ত করার রাজনীতি। এদের কাছে এবং করসেবকদের কাছে ধর্মের আদর্শ পুরুষ নাথুরাম গড্‌সে। অপরপক্ষে স্মরণ করিয়ে দেয়া ভাল জিহাদি ওসামার ধর্মও এক বিকৃত সহিংস ইসলাম। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মহামান্য বুশের ক্রুসেডও সহিংস খৃষ্টবাদ, যা আসলে যিশুর ধর্ম ছিল না। যিশু এবং গান্ধী মৃত্যুর মধ্যে একই বেদনা, একই সত্য ফুটে ওঠে।

আমি মনে করি গুজরাটের দাঙ্গা নাথুরামের চণ্ডমূর্তিকে, জাগিয়ে তুলেছে। মনে করি, প্রকৃত ইসলামকে গোধরার হত্যাকাণ্ড হেনস্থা করেছে। আন্তর্জাতিক জিহাদ ও ক্রুসেড আসলে এক বিশেষ আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। এই ফ্যাসিবাদ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করতে চাইছে। এই অবস্থায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করসেবকদের লেলিয়ে দিয়ে নাথুরামের সহিংস হিন্দুত্বকে দাঙ্গার কাজে ব্যবহার করছে। ধর্মের এ হিংস্র ব্যবহারে বিজেপি-র রাজনৈতিক নাফা আছে। আর কারও নেই।

ভারতীয় সংবিধান ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ধর্মনিরপেক্ষতার সামাজিক অনুশীলন ছাড়া একটি রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারে না। বিজেপি বা তার প্রশ্রয়পুষ্ট ধর্মসংগঠনগুলি ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝে না, কারণ তারা সহিংস হিন্দুত্বের সামাজিক অনুশীলন চায়। ক্রমাগত দাঙ্গার অশান্তিই বিজেপি-র মসনদ দখল রাখার গ্যারান্টি —একথা বিশ্বাস করে ওই দলের নেতারা। দরকার হলে দাঙ্গার কাজে প্রশাসনকে ব্যবহার করতেও ওই নেতাদের আপত্তি নেই।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুত পার্থিব মানবতাবাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেহারা। রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন না করলে ধর্মনিরপেক্ষতা হয় না। বিজেপি হিন্দু রাষ্ট্রের খোয়াব দেখিয়ে মানুষকে হিংস্র করে তুলেছে। ইট পূজো বস্তু নাথুরামের পূজো। সাধারণ মানুষ অনেকে না বুঝেই করসেবকদের দলে ভিড়েছে এবং দাঙ্গায় লিপ্ত হতে চাইছে, তাদের দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকৃত হিন্দু মুসলমানকে না ভালবেসে পারে না এবং খাঁটি মুসলমান শান্তি চায়—একথা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বাজপেয়ীর দল। মানুষকে ধর্মচ্যুত করতে চাইছে লালকৃষ্ণের রথ। রাষ্ট্র যখন ধর্মকে উৎসাহ দেয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতি হয় কিন্তু প্রকৃত ধর্মও বাঁচে না। ওসামা ধার্মিক নয়, বিজেপি নেতারাও নয়।-৬ মার্চ, ২০০২, গণশক্তি

❐

www.pathagar.com

# হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বায়ন ও গুজরাতের শ্রমিক শ্রেণী

—রতন খাসনবিশ

গোধরায় করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে ২৭ ফেব্রুয়ারী আর তার পর থেকে অন্তত আড়াই মাস ধরে গুজরাতে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ দাঙ্গা অনেকটা একতরফা ধরনের। হিন্দুত্বের পরীক্ষাগার হিসেবে যারা গুজরাতকে বেছে নিয়েছে, মূলত সেই আরএসএস-এর উদ্যোগে আমেদাবাদ, বরোদা এমনকি তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও হিন্দু নামধারী কিছু গুণ্ডার হাতে প্রায় একতরফা মার খাচ্ছে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী। গুজরাতের এই দাঙ্গার পিছনে রাষ্ট্রীয় মদত আছে। রাষ্ট্র কীভাবে হিন্দু নামধারী লুম্পেনদের দাঙ্গা বাঁধাতে উস্কানি দিচ্ছে, মহল্লার পর মহল্লা জুড়ে খুন, লুটতরাজ এবং নারী ধর্ষণে সাহায্য করছে, তা বহু আলোচিত। এ নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে তার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

এই দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ অবশ্য গোধরায় করসেবকদের উপরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একদল অপরিণামদর্শী উস্কানিদাতার নির্দেশে ঘটে-যাওয়া নির্মম আক্রমণ, কোনো অজুহাতেই যা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু গোধরার এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াতেই আড়াই মাস জুড়ে গোটা রাজ্যটি দাঙ্গাকবলিত থেকে যাবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। আসলে গুজরাতে দীর্ঘকাল ধরেই প্রচ্ছন্নভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশ বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হঠাৎ ২০০২ সালে শুরু হয়নি। গুজরাত যদিও মহাত্মা গান্ধীর জন্মভূমি, প্রাক স্বাধীনতা যুগে, মহাত্মা গান্ধী যখন জীবিত তখন গুজরাতে মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ১৯৪১ সালে এবং ১৯৪৬ সালে আমেদাবাদে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বীভৎসতায় যা ২০০২ সালের দাঙ্গার সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীনতা উত্তর যুগেও গুজরাতে আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লজ্জাজনক ইতিহাস। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে গুজরাতে ঘটেছে মোট ২৩টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার মধ্যে গোধরায় ১৯৬৫ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষে আমেদাবাদ ও বরোদায় ঘটেছে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। ১৯৮০ এবং '৮১ সালের গোধরার দাঙ্গা, ১৯৮১-র বরোদার দাঙ্গা, ১৯৮৫, ১৯৯০, ১৯৯২-৯৩—

www.pathagar.com

কিছু সময়ের সাময়িক বিরতির পরপরই গুজরাতের নাম শোনা গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চারণভূমি হিসেবে। কেন গুজরাতে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটছে ? বর্তমান নিবন্ধে আমরা সে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মনে রাখা দরকার, বর্তমান ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে যে কটি রাজ্য সবচেয়ে এগিয়ে আছে, গুজরাত তার মধ্যে অন্যতম। বলা হয়ে থাকে আধুনিক শিল্পায়নে ভারতবর্ষ যে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, গুজরাত নাকি তার মডেল। এসব দাবি কতটা সত্য সেসব নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু গুজরাত যে বিহারের মতো পশ্চাদপদ রাজ্য নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মানদণ্ডে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যটি বারবার কেন মধ্যযুগীয় দাঙ্গার বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এ নিয়ে আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই নিবন্ধটি তারই এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

## গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায়

১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে (২০০১ সালে গুজরাতের জনগণনার ধর্মভিত্তিক জনবিভাজন সংক্রান্ত তথ্য আমাদের হস্তগত হয়নি) গুজরাতে জনসংখ্যা ছিল ৪,১৩,০৯,৫৮২ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৯,৬৪,২২২ জন। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই সে রাজ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমান ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা ৩৬,০৯,২০০ ; অর্থাৎ সে রাজ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠী হিন্দুদের তুলনায় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, এমনকি বিহারের তুলনায় গুজরাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গুরুত্ব জনসংখ্যার ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে কম। অন্য একটা বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুসলিম জনগোষ্ঠী সে রাজ্যে একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়। গুজরাতে ১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী প্রায় দুই শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে রয়েছে জৈন (৪,৯১,৩৩১), খৃস্টান (১,৮১,৭৫৩), শিখ (৩৩,০৪৪) এবং বৌদ্ধ (১১,৬১৫)। সুতরাং একথা যেমন বলা যায় না যে, গুজরাতে মুসলমানরা জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দুদের সাথে পাল্লা দেয়ার অবস্থায় আছে, তেমনি বলা যায় না যে, মুসলমানরাই সে রাজ্যে একমাত্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষ।

মুসলিম ধর্মাবলম্বী গুজরাতি মানুষেরাও কিন্তু সমসত্ত্ব সম্পন্ন নয়। গুজরাতি মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে যাঁদের অল্প ধারণা তাঁরা মনে করেন সে রাজ্যে মুসলমান বলতে বুঝায় খোজা, মেমন, দাউদি বোহরা বা সুন্নী বোহরা গোষ্ঠীকে, যারা আর্থিকভাবে সম্পন্ন এবং সে কারণে পশ্চাদপদ হিন্দু গোষ্ঠীদের

www.pathagar.com

আক্রমণের লক্ষ্য। ১৯৬১ সালে বরোদার এমএস ইউনিভার্সিটি থেকে এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষক অধ্যাপক সতীশ মিশ্র ১৯৬৩ সালে মুসলিম কমিউনিটিস ইন গুজরাত নামে প্রকাশিত একটি পুস্তকে এ সমীক্ষার তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে গুজরাতে অন্তত ১৩০টি কৌম আছে, যাদের সদস্যরা মুসলিম ধর্মাবলম্বী। অধ্যাপক মিশ্রর তথ্য অনুযায়ী এই ১৩০টি কৌমের মধ্যে সংখ্যার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ হল ৩৭টি কৌম। এগুলির মধ্যে আবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম পরিবার। গুজরাতের প্রায় সর্বত্র এরা ছড়িয়ে আছে। এছাড়া আছে পাঠান, মমিন, সুন্নী বোহরা, দাউদি বোহরা, ঘাঞ্চি, মোমিন, মেমন, প্যাটেল বোহরা, সৈয়দ, কাসবাতি, ধোবী ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম পরিবার। যদিও এরা সকলেই একেশ্বরবাদী ও ইসলামে অনুরক্ত, এদের মধ্যে সামাজিক আচার-আচরণ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আছে বিপুল বৈষম্য। এ কৌমগুলোর মধ্যে এক কৌমের সাথে অন্য কৌমের বিবাহ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ। সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণেও আছে ভিন্নতা। জীবিকার ভিন্নতা একেশ্বরবাদী এই গুজরাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরে তৈরি করেছে বিপুল আর্থিক ব্যবধান। এদের মধ্যে আছে দাউদি বোহরা, যারা শিক্ষিত, মূলত শহরবাসী, বড় বড় ব্যবসার মালিক এবং আর্থিকভাবে ধনী। অন্যদিকে আছে মোমিন কিংবা গারাসিয়া কৌমভুক্ত গুজরাতি মুসলিম, যারা দরিদ্র, অশিক্ষিত, যারা গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে অথবা শহরে বিশেষত বড় শহরে শ্রমিকের কাজ খুঁজতে আসে। আমেদাবাদ যখন বস্ত্র শিল্পে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করে, আমেদাবাদকে যখন ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হতো, সে সময়ের আমেদাবাদেও শ্রমিক মহল্লায় বিপুল সংখ্যক পরিবার দেখা যেত যারা গারাসিয়া কৌম গোষ্ঠীভুক্ত, যাদের সাথে খোজা বা মেমন কৌম গোষ্ঠীভুক্ত ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী শিক্ষিত মুসলমানদের কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই। ইসলামের পৃথিবীতে সবাই যদিও সমান, খোজা বা মেমন মুসলমানদের ঈশ্বর একটু বেশি সমান করে তৈরি করেছেন; গারাসিয়াদের সাথে যাদের সমান আসন কখনোই নির্দিষ্ট করা যায় না। নিম্নবর্গের মুসলমান পরিবারগুলোও সমসত্বসম্পন্ন নয়। শেষ অথবা ঘাঞ্চিরা হস্তশিল্পী কিংবা ছোট দোকানদার। এদের পরিবারগুলো হয় অল্প শিক্ষিত, খালেক, মোমিন বা পাঠানদের থেকে যাদের সামাজিক অবস্থান অনেকটাই আলাদা। দাঙ্গার সময়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে এই কৌম গোষ্ঠীগুলো অবশ্য কিছুটা নৈকট্য গড়ে তোলে। কিন্তু গুজরাতে উচ্চবর্ণের আরএসএস নেতারা যেমন হিন্দু নিম্নবর্গের

www.pathagar.com

ভোই, ভাইবান্ধ অথবা কারো কৌম গোষ্ঠীর মানুষদের হাতে ত্রিশূল তুলে দিয়ে হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। সেখানে খোজা, মোমিন বা দাউদি বোহরারা আত্মরক্ষার জন্য গারাসিয়া, খালেক অথবা মোমিন কৌম গোষ্ঠীর দরিদ্র মানুষদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। গুজরাতের দাঙ্গা চিরদিনই নিম্নবর্গের দাঙ্গা। সব সমাজেই যেমন ঘটে গুজরাতেও সেটাই ঘটে থাকে। দাঙ্গা সেখানেও নিম্নবর্গের দাঙ্গা। সেখানে এলিট বর্গের মানুষেরা দাঙ্গা করায় অথবা দাঙ্গার মোকাবিলা করায়। ইসলামের উপাসক এবং রাম সেবকদের মধ্যে এ বিষয়ে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। অবশ্য বলা উচিত এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যে রক্তক্ষয় শ্রেণী রাজত্বের অবসান ঘটাতে চায় না সে রক্তক্ষয়ের ইতিহাস পৃথিবীর সর্বত্র এই ধরনেরই হয়ে থাকে।

### দাঙ্গার উৎস ঃ মতাদর্শ

দেশ ভাগের সময়ে ঐতিহাসিক কারণে গুজরাত হয়ে পড়লো পাকিস্তানের একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য, যেখানে ৮ শতাংশেরও বেশি অধিবাসী মুসলমান। এই রাজ্যে দেশ ভাগের পর সিন্ধু প্রদেশ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠী এসে বসবাস শুরু করলো। এদের এবং স্থানীয় হিন্দুদের উচ্চবর্গের মধ্যে দেশ ভাগ মুসলিম বিদ্বেষের প্রয়োজনীয় মতাদর্শ গড়ে তুললো। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম-সমন্বয়ের রাজনীতি গোটা ভারতবর্ষেই ব্যর্থ হয়েছিল। গুজরাতে তা সফল হবে, সেখানে দেশ ভাগ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে পুষ্ট করবে না—এমন সম্ভাবনা ছিল না। যে নাস্তিকের রাজনীতি এই মতাদর্শ প্রতিহত করতে পারতো সেই কমিউনিস্ট রাজনীতি যে গুজরাতে দুর্বল ছিল সে কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং সীমান্ত রাজ্য, যেখানে ৮ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী, যার সীমান্তে আছে এমন একটি রাষ্ট্র যার ধর্ম ছাড়া সাধারণ মানুষকে দেবার মতো কিছু নেই, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা যে জনজীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গুজরাত শুধু মহাত্মা গান্ধীর দেশ নয়, গুজরাত দয়ানন্দ সরস্বতীর দেশও বটে। গান্ধী যে দেশে ব্যর্থ হয়েছেন, দেশভাগ—ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বিভাজন সে দেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর রাজনীতিকে পুষ্ট করে তুলেছে।

দাঙ্গা গুজরাতের নিত্যসঙ্গী। সেখানকার জনসাধারণ এই দাঙ্গার আবহাওয়াতেই জীবন যাপন করে। শান্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার মধ্যেও থাকে পরের দাঙ্গার বীজ, কেননা দাঙ্গার মতোই শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতিকে অবলম্বন করে। সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এই মেরুকরণের রাজনীতিকে স্বীকার করেই রাজনীতি

www.pathagar.com

করে—এ বিষয়ে কংগ্রেস-বিজেপির ভেদরেখা ক্ষীণ। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি যেহেতু গুজরাতের সমাজ জীবনের অঙ্গ ; ফলে সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত সবকিছুর মধ্যে সে রাজ্যে থাকে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ; সে কারণেই এ সংঘাতগুলো প্রায়শ সাম্প্রদায়িক চেহারা নিয়ে হাজির হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮১ সালে পঞ্চমহল জেলার সদর গোধরাতে ঘটে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কিন্তু একটি অতি সাধারণ ঘটনা থেকে, পশ্চিম বঙ্গে যে ধরনের ঘটনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যাবার কথা এখনো কল্পনাও করা যায় না। গোধরার ম্যুনিসিপালিটি রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জবর দখল করা জমিতে বে-আইনী যেসব বাড়ী-ঘর গজিয়ে উঠেছে সেগুলির ভাঙ্গবার একটা উদ্যোগ নেয় সে সময়। নূরউদ্দীন বোহরা নামে জনৈক ব্যবসায়ীর এই রকম একটা বে-আইনী কাঠামো ছিল জবরদখল করা জমিতে। দেখা গেল রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য দরকার ঐ জমির পনের ফুট এলাকা। নূরউদ্দীন সে অংশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্থানীয় সিন্ধিরা এই সুযোগে দাবি তুললো, নূরউদ্দীনের দখল করা বাকী জমিটাও নিয়ে নিতে হবে, কারণ লরি চালক শিখদের জন্য সম্প্রসারিত রাস্তার ধারে একটা গুরুদ্বোয়ারা বানাতে হবে এবং তার জন্য নূরউদ্দীনের জমিটাই স্থান হিসেবে আদর্শ। এ থেকে শেষ পর্যন্ত সে বছর গোধরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে। বুঝা যায়, দাঙ্গার বিষ সে সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। নতুবা রাস্তা সম্প্রসারণের মতো একটি আপাতনিরীহ প্রস্তাব নূরউদ্দীনকে বাস্তুচ্যুত করার প্রস্তাবে রূপান্তরিত হয় না।

## শ্রমিক শ্রেণী, বিশ্বায়ন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শ্রেণী রাজনীতি। মানুষের চেতনায় যখন অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পরিচয় প্রবল হয়ে উঠে, তখন ধর্ম এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়, ফলত দুর্বল হয় সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি। গুজরাতের ঘানচি সম্প্রদায়ভুক্ত ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই চিন্তা যদি জোরদার হয় যে, দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ধনী ব্যবসায়ীদের চেয়ে তাদের বেশি কাছের মানুষ হলো ভাইবন্ধ কিংবা সিন্ধি ছোট ব্যবসায়ীরা, গারসিয়া শ্রমিক যদি জানে যে, হিন্দু হলেও কাহার কিংবা ভোই সম্প্রদায়ভুক্ত মিল শ্রমিক তার কাছে মেমন মুসলমানদের চেয়ে কাছের লোক, তবে তার দিক দিয়ে এই ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর বিদ্বেষ থাকার কথা নয়। এই বক্তব্যের যথার্থ নিয়ে যাঁদের সন্দেহ আছে, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, গুজরাতের দাঙ্গা রোধে দীর্ঘদিন ধরেই ইতিবাচক

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করে এসেছে আমেদাবাদের মজদুর মহাজন সংঘ। মজদুর মহাজন সংঘ আমেদাবাদের মিল মজদুরদের ট্রেড ইউনিয়ন। এই ট্রেড ইউনিয়নের জনক মহাত্মা গান্ধী। এই সংঘটির নেতৃত্ব এখনো গান্ধীবাদীদের হাতেই। এক সময় এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ্য ; সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন আমেদাবাদের সূতাকলে কাজ করতে আসা নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলমান। মজদুর মহাজন সংঘ যখন আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতো, সূতাকলগুলোর তখন সমৃদ্ধির যুগ। মজদুর মহাজন সংঘের প্রভাবও তখন ছিল লক্ষ্যণীয়।

মজদুর মহাজন সংঘ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিতো। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত গারসিয়া, খালেক কিংবা মমিন মুসলিমরা ভোই, ঘানচি কিংবা ভাইবান্ধ বর্গীয় হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে এক সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মিছিল করতো। শ্রমিক বস্তিতে তারা এক সঙ্গে দাঙ্গার সময় বহিরাগত দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করতো। এছাড়া মজদুর মহাজন সংঘের পরিচালনায় গড়ে ওঠা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিনোদন কেন্দ্র, কো-অপারেটিভ স্টোর—এগুলোও দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে কাছাকাছি রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। একথা ঠিক যে, মজদুর মহাজন সংঘ নিজের ক্ষমতায় আমেদাবাদ বা বরোদায় দাঙ্গার সম্ভাবনা রোধ করতে পারতো না। যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মজদুর মহাজন সংঘ নিজের ক্ষমতায় তা তুলে নিতে পারবে, এ আশা করাও ভুল। কিন্তু দাঙ্গা যাতে শ্রমিক মহল্লাকে গ্রাস না করে, দাঙ্গার ব্যাপ্তি যাতে কমানো যায়—এসব বিষয়ে মজদুর মহাজন সংঘের ভূমিকা ছিল নজরে পড়ার মতো।

বিশ্বায়ন গুজরাতের সূতাকলগুলিকে ধ্বংস করেছে। বর্তমানে সেখানে পঞ্চাশটির বেশি সূতাকল বন্ধ। মজদুর মহাজন সংঘের অফিসে এখন শ্রমিকদের ভিড় নেই। বন্ধ সূতাকলের শ্রমিকরা জীবন ধারণের উপায় খোঁজে অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রে—বিশ্বায়নের দৌলতে যেখানে দৈনিক মুজরির হার নেমে এসেছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকায়। গুজরাত এখন ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ রাজ্য। গড় আয়ের বৃদ্ধির নিরিখে তার অবস্থান ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলোর মধ্যে তৃতীয়। যে কথা কম বলা হয় তাহলো, এই আয় বৃদ্ধি একই সাথে ঘটিয়েছে বিপুল ধনবৈষম্য। গুজরাতের কৃষি, যার উপর এখনো সে রাজ্যের ষাট শতাংশের বেশি মানুষ নির্ভরশীল, রাজ্যের মোট আয়ে এখন তার অংশ হলো ১৭ শতাংশ। কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। কৃষির উৎপাদনও মার খাচ্ছে। পশ্চাদপদ এলাকায় প্রায়শই তাই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষেরা কাজের সন্ধানে ভিড় জমায় আমেদাবাদ,

www.pathagar.com

বরোদা কিংবা সুরাটে। হিরা পালিশের কাজ, জরির কাজ কিংবা ছোট পাওয়ার লুমে কাজ—গারাসিয়া, শেম, খালেক এবং কাহার, ভাইবান্ধ, ঘান্‌চি—মুসলমান এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী দরিদ্র মানুষেরা এসব কাজে জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করে। এসব কাজে না আছে ট্রেড ইউনিয়ন, না আছে কোনো সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ রেখে, সামাজিক নিরাপত্তার সামান্য ব্যবস্থাও না রেখে এই যে বিশ্বায়নের যুগের শিল্পায়ন, তা মজুরির হারকে ইচ্ছেমতো কমিয়ে রাখতে পারে। আবার কাজের সময়কে তা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে দিতেও পারে। এ পথেই আজকের গুজরাত সমৃদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, এই সমৃদ্ধি সে রাজ্যে বাড়ায় ধনবৈষম্য। হিন্দু উচ্চবর্ণের পাতিদার, বানিয়া, ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম উচ্চবর্ণের খোজা, মমিন, দাউদি বোহরা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যবসা, শিল্প এবং উঁচু মাইনের চাকরিগুলো আত্মসাৎ করে সমৃদ্ধির শিখরে ওঠে। উল্টোদিকে সামান্য মজুরিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও জীবন ধারণে ব্যর্থ হয় গুজরাতের গরীব মানুষ। মজুরি যৎকিঞ্চিত, সেই যৎকিঞ্চিৎ মজুরির কাজ জোটানোও কঠিন হয় বহু মানুষের। গ্রামে কাজের অভাব, গ্রামের মানুষ তাই সামান্য মজুরীতেই শহরে কাজ খোঁজে। শহরে পুরোনো মিল বন্ধ। বন্ধ মিলের শ্রমিকেরা গ্রামে ফিরে যেতে চায় না, কারণ সেখানে কাজ নেই। তারাও সামান্য মুজরীতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ খোঁজে। এদের কাজে টানতে মজুরি বাড়ানোর কোনো দরকার হয় না, কারণ চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান সেখানে বেশি। মোটামুটি এই হলো বিশ্বায়নের যুগের ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের মডেল রাজ্য গুজরাতের শ্রমিক শ্রেণীর চেহারা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও টিকে থাকা দুষ্কর এই কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে।

যারা এতসব সত্ত্বেও অসংগঠিত শিল্পে কাজ পায় না, তারা লুম্পেন শ্রমিকে পরিণত হয়। বরোদার দেশি মদের ব্যবসা চালায় ভোই ভাইবন্ধ কিংবা গারাসিয়া সম্প্রদায়ের লুম্পেন শ্রমিক, যারা এক সময় সংগঠিত শিল্পে কাজ করতো এবং এখন যারা চোলাই মদের আসর সামলায় এবং প্রয়োজনে খুনোখুনি করে। ১৯৮২-র বরোদায় দাঙ্গার শুরু হয় এ চোলাই মদের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯০-র দাঙ্গার পিছনে ছিল লুম্পেনদের ক্ষমতা দখলের লড়াই। মজদুর মহাজন সংঘের অফিসে ভিড় করে, কীভাবে দাঙ্গা রোখা যায় সে নিয়ে আলোচনায় গুজরাতের শ্রমিকদের আর উৎসাহ নেই। ইয়ান ব্রেম্যান নামক একজন ডাচ গবেষক, গুজরাত নিয়ে যিনি বহু গবেষণা করেছেন, তাঁর বর্ণনায় এক মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে ২০০২-এর মার্চ মাসের দাঙ্গা কবলিত আমেদাবাদের। মজদুর মহাজন সংঘের অফিসে গিয়ে তিনি সে সময়ে

www.pathagar.com

দেখেছেন বিশাল অফিসে ম্লানমুখে বসে আছেন কিছু বৃদ্ধ গান্ধীবাদী, যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক সময় এই ট্রেড ইউনিয়নে কর্মী হিসেবে যোগ দেন। ব্রেম্যানের জিজ্ঞাসায় তাঁরা ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন, মজদুর মহাজন সংঘ এই ২০০২-এর দাঙ্গা রোধে কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারছে না। সামান্য সংখ্যক সদস্য নিয়েই তাঁরা মিছিল করতে চেয়েছিলেন। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। দাঙ্গারোধে তাঁদের আহ্বানে সামান্য সংখ্যক শ্রমিক তাঁদের দপ্তরে জমায়েত হয়। বেশীর ভাগ সদস্যই তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করে। এই দাঙ্গা রোধের জন্য তাঁরা যখন পুলিশকে ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বলেন, পুলিশ তাঁদের অনুরোধে কর্ণপাত করে না।

মজদুর মহাজন সংঘের নেতারা যে কথা বলেননি, অনুসন্ধানকারীদের চোখে যা ধরা পড়েছে, তাহল শ্রমিকরা যে শুধু দাঙ্গা রোধে এগিয়ে আসছেন না তাই নয়। লুম্পেনদের নেতৃত্বে হিন্দু এবং মুসলমান নিম্নবর্ণের মানুষেরা দাঙ্গা করতে সংগঠিত হচ্ছেন গুজরাতে। যে শ্রমিকরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে দিনে পঁচিশ-তিরিশ টাকা উপার্জন করে, দাঙ্গায় ইন্ধনদাতারা তাদের দৈনিক তিনশো টাকা মজুরী এবং এক বোতল দেশি মদ ধরিয়ে দিয়ে দাঙ্গায় নামাচ্ছে।

বিশ্বায়নের গুজরাতে শ্রমিক মহল্লাও ভাগ হয়ে গেছে হিন্দু ও মুসলমান মহল্লায়। জুহাপুরা হলো সবরমতির ডানদিকে গড়ে উঠা এ রকম এক বিশাল মুসলিম মহল্লা, যেখানে থাকে গরীব মুসলমানরা। ভোই, ভাইবান্ধ বা কাহার কৌম গোষ্ঠীর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হাতে ত্রিশূল নিয়ে পুলিশকে সামনে রেখে জুহাপুরা আক্রমণ করে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই দাঙ্গাবাজদের অনেকেই প্রাক্তন মিল মজুর, বিশ্বায়ন যাঁদের পঁচিশ-তিরিশ টাকা মজুরীর দিনমজুরে পরিণত করেছে। হিন্দু মৌলবাদ তাদের বুঝিয়েছে জুহাপুরের মানুষদের রক্তে সবরমতি জল লাল করে ফেলতে পারলেই আবার তারা সমৃদ্ধির পথ দেখতে পারবে। শ্রমিক এটা বিশ্বাস করে, কারণ নাস্তিকতার কমিউনিস্ট মতাদর্শ কিংবা গান্ধীবাদী সেক্যুলার মতাদর্শ—বিশ্বায়নের গুজরাতে এই দুই মতবাদই পরাজিত ; সম্ভবত বিশ্বায়নের মতাদর্শই এই দুই মতবাদকে পরাস্ত করেছে। তাঁরা যে ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন বিশ্বায়নের গুজরাতে, তার জন্য তাঁদের অবশ্যই আছে রাগ, ক্ষোভ, আক্রোশ। এক মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার মধ্য দিয়ে যাতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে—এই ক্ষোভ, এই ক্রোধ যাতে বিশ্বায়নের ছকটিকেই উলটে না দেয়, তার জন্য খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে প্রাক্ রেনেসাঁস ভাবাদর্শ। এতে অবশ্যই অবাক হবার কিছু নেই। বিশ্বায়নের যুগের পুঁজিবাদ দেশে দেশে খুঁচিয়ে তুলছে ধর্ম ও কুসংস্কারের মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শ। গুজরাতের বিশ্বায়নে কেন তার ব্যতিক্রম ঘটবে ?

www.pathagar.com

# আমরা কোথায় চলেছি ?

–দীপংকর চক্রবর্তী

'৬২-তে ভারত-চীন এবং '৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান একদিকে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও অন্যদিকে বামপন্থী আন্দোলনের ব্যাপকতাকে সীমিত করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিবৃদ্ধি ঘটে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকদেরও। এরপর বামপন্থীদের সমর্থনে, জমানার প্রথম প্রহরে পায়ের তলার মাটি শক্ত করে নেবার পর '৭১-এর যুদ্ধের পরিণতিতে পাকিস্তানের দ্বিধা-বিভক্তি এবং বাংলাদেশের জন্মের পটভূমিকায় ইন্দিরা গান্ধী 'মা দুর্গা'য় রূপান্তরিত হন, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকরা সাময়িকভাবে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরম স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যে, ব্যাপক বিক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়, তারই সুযোগ নিয়ে নতুন করে শক্তি বৃদ্ধি ঘটে হিন্দুত্ববাদীদের। তাদের রাজনৈতিক সংগঠন জনসংঘ কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ জনতা পার্টিতে মিশে গেলেও, শেষ পর্যন্ত ঐ শক্তিগুলোরই অনৈক্যের প্রেক্ষিতে তারা গড়ে তোলে তাদের নতুন রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি। আর 'সাম্প্রদায়িক তাস' খেলার ব্যাপারে দারুণ পারদর্শিতা দেখিয়ে ইন্দিরার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন আর তারপর ইন্দিরা-হত্যাজনিত 'সহানুভূতি ভোটে' বিজেপির বিরাট বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়েই তারা গ্রহণ করে তাদের উপরোক্ত চরম কট্টর সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি।

আসলে এই কর্মসূচিটির মূল উদ্‌গাতা ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। সাভারকার, হেডগেওয়ার আর গোলওয়ালকরের চরম ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে লালিত পালিত এবং 'জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠন'-এর নামাবলী গায়ে দেয়া সংঘ পরিবারেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য ভারতের বহুত্ববাদী ঐক্যের ঐতিহ্যের অবসান ঘটিয়ে তাকে একটি কট্টর হিন্দুরাষ্ট্রের রূপান্তরিত করা। মুসলমানরা, তাদের মতে, হিন্দুর 'এক নম্বর শত্রু'। '৪৭-এ দেশ বিভাগ-পরবর্তী দাঙ্গায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা আর গান্ধী হত্যার পেছনে তাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণার কথা সবারই জানা। অক্টোপাশের মতোই অসংখ্য থাবা তাদের। বিজেপি যেমন তাদেরই রাজনৈতিক সংগঠন, ঠিক তেমনি রয়েছে তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক (ঝটিকা) বাহিনী বজরং দল, ছাত্র-যুব সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, শ্রমিক

www.pathagar.com

সংগঠন এইচএমএস প্রভৃতি। এই সমস্ত সংগঠনের মূল কর্তৃত্বটা কিন্তু থাকে তাদেরই হাতে।

১৯৮৫ থেকে এই সংঘ পরিবার কোমর বেঁধে শুরু করে তাদের বহু-আকাংখিত ও বহু পরিকল্পিত 'হিন্দু তাস'-এর খেলা। এজন্য তারা একদিকে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যগতভাবে খানিকটা ঢিলেঢালা ও বহুত্ববাদী প্রবণতার অবসান ঘটিয়ে চার্চ পরিচালিত খৃস্টান ধর্ম ও ইমাম বা মৌলভী পরিচালিত মুসলিম ধর্মের মতো একে একটি এককেন্দ্রিক প্রবণতা বিশিষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারা ও সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচি নিল। অন্যদিকে তারা গ্রহণ করলো এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু জনসমাজের মানসিকতায় গত দুশ বছর ধরে বপন করা সাম্প্রদায়িকতার বীজটিকে খুঁচিয়ে বিরাট এক মহীরূহে পরিণত করার কর্মসূচী। অতীতে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শাসন কর্তৃত্ব অন্য ধর্মের মন্দির বা মসজিদ ভাঙার অনেক তথ্য যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে এসব ব্যাপারে অনেক উপকথা। ইতিহাস বা কল্পকথা থেকে মন্দির ভাঙার এ ধরনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে তারা প্রথমে উপস্থাপিত করলো কল্পকথায় রামায়ণের রামচন্দ্রের জন্মভূমি হিসেবে কথিত অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার কর্মসূচি। তা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে তৈরি করা হলো এক গণ-হিস্টিরিয়া, রাম-নামাঙ্কিত ইটপূজোর প্রতিযোগিতা। ফল যা প্রত্যাশিত ছিল ঠিক সেটাই ঘটল, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তা নতুন করে জাগিয়ে তুললো '৪৬-এর দাঙ্গার স্মৃতি। আর বিষাক্ত সেই পরিবেশ থেকে ফসল কুড়িয়েই পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপি দখল করলো লোকসভায় এবং বিভিন্ন বিধান সভায় বিপুল সংখ্যক আসন। এবং আরো বেশি ফসল কুড়োবার লালসায় তারপর বিজেপি নেতা আদভানী সাম্প্রদায়িকতার রথ ছোটালেন সারা দেশে মন্দির নির্মাণের দাবিতে। আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো। পরিণতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক করসেবক রূপী গুণ্ডারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলো। বিপরীতে সক্রিয় হয়ে উঠলো ইসলামী মৌলবাদের শক্তি-গুলোও। প্রকাশ ঘটলো 'বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত জনতারও ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার।' আর সেই রক্তস্নানে ক্রমশ বলীয়ান হয়ে উঠে বিজেপি, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও নীতিহীন ক্ষমতালোভীদের সাথে জোট বেঁধে প্রথমে ১৩ দিন, তারপর ১৩ মাস এবং অবশেষে আপাতত গত ৩ বছর তারা দিল্লীর মসনদ দখল করে আছে। ফলত জন্ম নিয়েছে নতুন ও জটিলতার এক সমস্যা।

দিল্লীর মসনদে বসতে গিয়ে বিজেপি যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট' (জা. গ. জো বা N. D. A.) গড়ে তুলছে, তার জন্য তাকে তৈরি করতে হয়েছে

www.pathagar.com

একটি ন্যূনতম কর্মসূচি। তাদের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার কর্মসূচিতে যেহেতু জোটের অন্যান্যদের সমর্থন নেই, তাই তা বাদ দিয়েই জোটের কর্মসূচি তৈরি করতে হয়েছে। ফলত জোটের প্রকাশ্য কর্মসূচি ছাড়াও বিজেপি-র রয়ে গেছে অযোধ্যায় মন্দির-নির্মাণ তথা ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের একটি গোপন কর্মসূচি। তাদের প্রত্যাশা ছিল এটাই যে, আপাতত জোট-সরকার গড়ে ধীরে ধীরে বিজেপি একাই সরকার দখল করার পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলতে পারবে এবং তখন জোটের অন্যান্যদের তোয়াক্কা না করেই তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচি রূপান্তরিত করতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এবং সেটাই ক্রমে ক্রমে প্রায়-অনতিক্রম্য এক কানা গলিতে তাদের ঠেলে দিয়েছে। কারণ, একদিকে সরকার গড়তে গিয়ে এতো আঞ্চলিক দলের সাথে তাদের জোট বাঁধতে হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সামনে হাত কচ্‌লে চলতে হচ্ছে যে, প্রায় কোনো রাজ্যেই বিজেপির নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি তেমন বাড়েনি। তার উপর বছরের পর বছর কংগ্রেসি শাসনের অপদার্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে ভোট দাবি করার পর দেখা যাচ্ছে, বিজেপি ও তার জোট সঙ্গী মন্ত্রীরাও এতো বেশি দুর্নীতি ও অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে যে, তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচকরা একদা প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেসকে ভোট দিতেও দ্বিধা করছে না। বস্তুত এ মুহূর্তে প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র গুজরাতেই শুধু রয়েছে বিজেপির শাসন। আবার অন্যদিকে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ফলে তাকে কেন্দ্র করে তাদের 'হিন্দু তাস'-এর খেলাও আগের মতো জমছে না। আসলে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঈশপের গল্পের সেই লোভী লোকটার মতো, দিনে মাত্র একটা করে ডিমের বদলে এক সাথে সমস্ত ডিম পাবার উগ্র লোভে যে ডিম প্রসবিনী হাঁসটাকেই খুন করে শেষে চরম ব্যর্থতায় মাথা চাপড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বিলুপ্ত বাবরি মসজিদ দেখিয়ে লোককে তেমন আকৃষ্ট করা তো যাচ্ছেই না। উপরন্তু রাম মন্দির নির্মাণের সাম্প্রদায়িক মদে যাদের মাতাল করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে না। বরং লাগামছাড়া সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এখন উল্টে বিজেপিকেই ফাঁপরে পড়তে বাধ্য করছে। কেননা জোট সরকারের সীমাবদ্ধতার কারণে বিজেপি সরকার গত তিন বছর ধরে যে মুখ ও মুখোশের খেলা চালিয়ে যেতে, অর্থাৎ জোটের প্রকাশ্য কর্মসূচির আড়ালে তার আসল, যদিও গোপন, কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করার মহড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল, এখন সেটা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে, এবং গোটা ব্যাপারটাই উলঙ্গ হয়ে গেছে।

সংঘ পরিবারের দৌলতে গুজরাট পরিণত হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার এক নম্বর পরীক্ষাগারে। চার বছর আগে সেখানে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ নেমে এসেছে হিন্দুত্ববাদীদের এক নম্বর শত্রু মুসলমানদের, সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টানদের উপরেও।

www.pathagar.com

এমনকি গুজরাত সরকার সমস্ত সরকারী কর্মচারীর আরএসএসের শাখা সংগঠনে যোগ দেওয়াটাকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে নির্দেশ জারি করেছিল। কিন্তু তা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে হৈ চৈ শুরু হওয়ায়, বিশেষত তাদের শরিক দলগুলোও তার বিরোধিতা করায়, শেষ পর্যন্ত সেই নির্দেশনামাকে প্রকাশ্যে বাতিল করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব পদক্ষেপ সংখ্যালঘুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে বিক্ষোভ ও ঘৃণা, প্রতিশোধের স্পৃহা। তার উপর দেশের সংবিধান ও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে প্রকাশ্যে অমান্য করে অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ নির্মাণ কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং অযোধ্যায় সাম্প্রতিক ঘোষিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাতায়াতের পথে গুজরাতের হিন্দুত্ববাদী করসেবকদের সবচেয়ে জঙ্গি ও উদ্ধত ভূমিকা, স্টেশনে স্টেশনে চরম অসভ্যতা, মস্তানি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার জন্ম দিয়েছে সেই 'বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত জনতার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার'—ঠিক যেমন বলেছেন বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় জঙ্গি বিমান হানায় অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে। ফলত ঘটে গেছে গোধরার বীভৎস ঘটনা—ট্রেনের মধ্যে ৫৮ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অবশ্যই অতীব নিন্দনীয় এই ঘটনা, তবে কেন্দ্রের বা গুজরাতের কোনো কোনো মন্ত্রী বা হিন্দুত্ববাদী নেতা অন্য সবকিছুর মতো এ ঘটনার পেছনেও পাকিস্তানের গোয়েন্দা চক্রের 'কালো হাত'-এর ইংগিত পেয়েছেন, এখনো পর্যন্ত সেই তত্ত্বের পক্ষে কোনো রকম তথ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। কাজেই একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকছে না যে, গোধরার ঘটনাটি আসলে ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের সামগ্রিক আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপেরই প্রতিক্রিয়া।

অথচ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক চরিত্রবিশিষ্ট আরএসএসের সংঘ চালক ব্যক্তিটি কার্যকারণ সম্পর্কের এ গোটা ব্যাপারটাকেই গুলিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় নিউটনের তত্ত্ব আউড়ে গোধরার ঘটনাটিকেই প্রাথমিক ক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছে এবং সেই অজুহাতে গুজরাতের অন্তত ৭০০ মুসলমানকে জঘন্যভাবে হত্যার ঘটনাকে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরে পরোক্ষে তার পক্ষে সাফাই গাইবার চক্রান্ত চালিয়েছে। বস্তুত গুজরাত সরকারের প্রত্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ মদতে যে বীভৎস খুনের প্রতিযোগিতা চলেছে, নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে সেই খুনীদের সংযমকে এবং বাজপেয়ী-আদভানীরা সেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার ব্যাপারে মোদীর 'যোগ্যতা'কে যেভাবে ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এক কথায় তা বিবমিষা ও ঘৃণারই উদ্রেক করে। আর কোনোক্রমেই তাকে 'দাঙ্গা' বলা যায় না, এক কথায় তা ছিল গণহত্যাই—আরএসএসের ঘোষিত মডেল জার্মানিদের নাৎসিদের ইহুদী হত্যার (pogrom) সঙ্গে তুলনীয় এবং

www.pathagar.com

সেটা ঘটানো হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবেই। গোধরার ঘটনা না ঘটলেও আগে বা পরে যে তা ঘটতই তার অসংখ্য প্রমাণ মিলে গেছে। আমেদাবাদের অপদার্থ পুলিশ কমিশনারটি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মতামত না নিয়ে গণহত্যার কয়েক সপ্তাহ আগেই আমেদাবাদের সমস্ত থানার প্রধান অফিসারদের রাতারাতি বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে, গত কিছুদিন ধরে সেখানে ভোটার তালিকা, বিভিন্ন পৌরসভা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রভৃতি থেকে মুসলমানদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পর্যন্ত ধ্বংস করার এক সর্বাত্মক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির প্রতীক দরগাগুলো পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়েছে। আরএসএস-বিজেপি-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বজরং দলের লোকেরা তো বটেই, এমনকি পুলিশের লোকেরা পর্যন্ত হয় সরাসরি মুসলমানদের উপর আক্রমণে অংশ নিয়েছে নয়তো নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষ মদদ দিয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য যে, শুধু লুম্পেনরা নয়, এমনকি ডাক্তার, শিক্ষক, এ্যাডভোকেট প্রভৃতি উচ্চতর স্তরের ও অভিজাত বর্গের লোকেরা পর্যন্ত এ গণআক্রমণে অংশ নিয়েছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে বিরোধী সাংসদ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি প্রভৃতি সবাই সরকারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন। তবু রাজ্য তো নয়ই, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের লজ্জা হয়নি।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী গুজরাতের ঘটনাকে 'জাতীয় লজ্জা' বলে অভিহিত করার 'সৌজন্য' দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই 'লজ্জা' যাতে উৎপাটিত হয় সে জন্য তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? গোধরার ঘটনার পরে পরেই মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশে সরকার সময়োচিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সতর্কতা অবলম্বন করার ফলে সেসব রাজ্যে গণহত্যা কাণ্ড প্রসারিত হয়নি। কিন্তু গুজরাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও প্রস্তুতির লক্ষণ তো মেলেইনি, কেন্দ্রীয় সরকারও সে ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি। এমনকি সামরিক বাহিনীকে নিয়োজিত করতেও অযথা দেরি করিয়ে দেয়া হয়েছে। গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় অটলবিহারী বলেছিলেন, 'স্বয়ংসেবক হিসেবে আমি গর্ব অনুভব করি।' গুজরাতের ঘটনা সম্ভবত তাঁর সেই গর্বের তালিকায় নতুন পালক যুক্ত করলো! আর এতদিন বিজেপি তাদের শাসন দাঙ্গা হয় না বলে একটি উপকথা গড়ে তুলেছিল, গুজরাত এক ধাক্কায় সেই উপকথার অসারতা প্রমাণ করে দিল।

অবশ্য সাম্প্রতিক অযোধ্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এ রকম আরও একটা উপকথা প্রচার করার চেষ্টা চলেছে যে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন অটল বিহারীর সরকারের

www.pathagar.com

সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ও ঝটিকাবাহিনী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের একটা মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব চলছে। মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে, কিন্তু তা যে কোনোক্রমেই মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়—একথা স্পষ্টভাবে বুঝার দরকার আছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সাম্প্রতিক অযোধ্যাকাণ্ডের সূচনাতেই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, আন্দোলন বন্ধ করে সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে এবং আদালতের নির্দেশ মেনে চলতে। একই দিনে আদভানী বলেছিলেন, অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘোষিত কার্যক্রম খুবই বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে ; আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে সরকার কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

খুবই মহান ঘোষণা সন্দেহ নেই! কিন্তু ঠিক দশ বছর আগে ১৯৯২-এ ঠিক একই ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন আর একজন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। তাঁর সেই আবেদন ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাথে বিজেপি নেতাদেরও কাছে। কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন বাজপেয়ী তখন ? এমনকি গত বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থেকেও অসীম বাগ্মিতার সাথে বারংবার ঘোষণা করেছেন তিনি যে, রামমন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়টি 'জাতীয় আবেগ'-এর ব্যাপার, আদালত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আর ১৯৯০-এর অক্টোবরে আরএসএস নির্দেশিত সোমনাথ মন্দির থেকে সূচিত দেশজোড়া রথযাত্রা সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও দাঙ্গা ছড়িয়েছিল, তার নায়ক ছিলেন তিনি নিজেই। এমনকি '৯২-এর ৬ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এবং বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশ সরকারের আদালতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বাবরি মসজিদ যখন ভাঙা হয়, তখন সেই মসজিদে আরো এক ধাক্কা দেবার সোচ্চার শ্লোগান তুলেছিলেন বাজপেয়ী-আদভানীদের সরকারের মন্ত্রী, সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন আদভানী। লিবারহান কমিশনের সামনে তাঁর প্রাক্তন পুত্রবধূর প্রদত্ত, কিন্তু পরবর্তীকালে রহস্যজনকভাবে প্রত্যাহৃত বিবৃতিতে জানা গেছে, আদভানী নিজেই বিনয় কাটিয়ারকে তার কয়েকদিন আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাবরি মসজিদ ভাঙার। তাহলে ?

আসল কথাটা হচ্ছে এটাই যে, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের বা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার প্রশ্নে বাজপেয়ী-আদভানীদের সঙ্গে সিংঘল-কাটিয়ারদের মৌলিক কোনো পার্থক্যই নেই। বিজেপি যেহেতু সংসদে এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়, তাই সরকার বাঁচানোর জন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট-এর শরিকদের একটু সমঝে চলতেই হবে, সরাসরি তাদের গোপন কর্মসূচিকে সামনে আনা চলবে না। তাদের সঙ্গে সিংঘল-কাটিয়ারদের একটু মতপার্থক্য থাকতেই পারে এ নিয়ে যে, তারা এই গোপন ও প্রকাশ্য কর্মসূচির

www.pathagar.com

পার্থক্যের তাৎপর্য বুঝে না, তাই তারা এক্ষুণি আদালত ও আইনকে অমান্য করে তাদের আসল কর্মসূচির বাস্তবায়ন চায়। অর্থাৎ পার্থক্য থাকলেও সেটা নিতান্তই সাময়িক, কৌশলগত—কোনোক্রমেই নীতিগত নয়। বিজেপি এককভাবে সরকার গড়বার অবস্থায় থাকলেও সে পার্থক্যটাও সুনিশ্চিতভাবে বিলীন হয়ে যেত।

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা আইন মানে না, আদালত মানে না, নির্বিচারে মানুষ খুন করে, তাই বাজপেয়ীরা তাদের দমন করতে চান। খুব ভালো কথা! কিন্তু সেই কাজগুলোই যখন করছে তাদের সংঘ পরিবারের ভাইবেরাদররা, তখন তাদেরও কেন 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করে একই রকম আচরণ করা হবে না ? শঙ্করাচার্য-পরমহংস কিংবা অমুক বা তমুক স্বামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের, আর মোল্লা-মৌলভীদের সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে মেনে নিয়ে সরকার তাদেরই হাতে কার্যত তুলে দিচ্ছে দেশের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবার ভার। কে তাদের দিয়েছে সমগ্র হিন্দু বা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ? দেশের সংবিধান যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভারতের অপরিবর্তনীয় এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছে, সেখানে আরএসএস প্রধানরা তাদের আদিগুরুদের প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করছে, এদেশে থাকতে গেলে মুসলমানদের নির্ভর করতে হবে হিন্দুদের সন্তুষ্টি বা মর্জির উপর। ভারতের সংবিধান তথা হাজার হাজার বছরের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের উপরে এতবড় প্রকাশ্য আক্রমণ সত্ত্বেও তাদের গায়ে যে সরকার হাত না দেয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে, কোনো নৈতিক অধিকার আছে কি তাদের দেশের শাসনের দায়িত্ব থাকার ?

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম গুজরাতের প্রেক্ষিতে 'আমরা কোথায় চলেছি ?' এ প্রশ্ন তুলে। গুজরাতই আসলে এই মুহূর্তে এই দেশে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত আধুনিকতার সঙ্গে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার সার্থকতম দৃষ্টান্ত। অন্য কথায়, কমপিউটারের গায়ে পূজোর ফোঁটা ! কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান ঘটিয়ে একটা 'সুরাজ' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির সাথে কট্টর ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার মিশেল দিয়ে ক্ষমতায় এলেও 'হিন্দু তাস'-এর খেলা যে জমছে না, সেটা আগেই বলেছি। উপরন্তু দুর্নীতি ও অপদার্থতা এবং হাজার বছরের ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাতের চক্রান্ত দিন দিন বিজেপির পায়ের তলায় মাটি সরিয়ে নিচ্ছে। জনসমর্থন ঠেকেছে গিয়ে একবার তলানিতে। তাই নতুন করে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে চরমতম উগ্র সাম্প্রদায়িকতার রথে চড়ে মসনদে থাকার নিশ্চিতি অর্জন করার লক্ষ্যে। তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ চলছে গুজরাটে। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের চোখে

www.pathagar.com

যতই ঘৃণ্য বলে প্রতিভাত হোন না কেন, সংঘ পরিবারের তিনি আজ নয়নের মণি। গুজরাটে আগামী বছরের নির্বাচনে আবার বিজয়ী হবার বাস্তব ভিত্তি তিনি রচনা করেছেন শত শত মানুষের রক্ত এবং হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে। এই পরীক্ষা এখন চলবে অন্যান্য রাজ্যে, সারা দেশে। সেই পরীক্ষায় ভারতের ব্যাপক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ কী ভূমিকা নেবে—তারই উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যত। তার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র উত্তর মিলবে—আমরা কোথায় চলেছি !

www.pathagar.com

# গুজরাত ঃ ভবিষ্যত হিন্দু ভারতের সূতিকাগার

–সৌমিত্র বসু

আর্য সভ্যতা তথা হিন্দুত্বের সংস্কৃতিই হচ্ছে মানুষকে জ্যান্ত মারার সংস্কৃতি, জীবন্ত গণদাহের সংস্কৃতি। শুরু হয়েছে সেই নৈমিষারণ্যের থেকে, আজও সেই ধারা প্রবাহিত দারা সিং, মুরলী মনোহর যোশী, নরেন্দ্র মোদী আর আদভানীদের রক্তে। তখনো রামকে অবতার বলা হয়েছিল, আজো দারাকে ভগবান বলা হয়, আদভানীকে বলা হয় অবতার। মিথ যে আসলে ইতিহাস এটা আমরা আজ বুঝে গেছি ; ইতিহাস হলো মৃত ইতিহাস আর মিথ জীবন্ত ইতিহাস। (কার্ল জঙ্ ও হাউস্টন স্মিথ, যোশেফ ক্যাম্পবেল ও লাকাঁর কল্যাণে) কি অদ্ভুতভাবে নৈমিষারণ্যের রামের মিথ, নিজের লাঙ্গুলে আগুন ধরিয়ে সোনার লঙ্কা ছারখার করার মিথ আজ এই তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রারম্ভে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ; জ্যান্ত মানুষী জ্বালিয়ে ক্ষমতা কায়েম রাখার সংস্কৃতি আমরা পেয়েছি সতী প্রথার মধ্যে, নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে আত্মহুতির মধ্যে (তখন কিন্তু পুরুষের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্ন উঠেনি, বীরভাবে কিন্তু অসম্মানের চাইতে নিজের প্রাণ নেওয়ার রীতি চালু ছিল পাশ্চাত্যে), আর গণদাহ-র আদর্শ আমরা পেয়েছি নেলির মুসলমান শিশুদের হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়া, শিখদের জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারা, ধর্মীয় যাজকদের (ক্রিশ্চান) জ্বালিয়ে মারা আর '৯৩-এর জানুয়ারীতে অনূঢ়া মুসলমান কুমারী মেয়েদের গণধর্ষণ করে গণদগ্ধ করার অভিজ্ঞতায়। আর আজকে প্রতিবেশীকে জীবন্ত জ্বালানোর অভিপ্রায়ে গুজরাতি মা-বাপেরা যখন তাদের কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের হাতে পেট্রলের ক্যানেস্তারা এগিয়ে দেয়, তখন সেই অভিজ্ঞতারই পুনর্জাগরণ আমরা দেখতে পাই।

প্রাক্‌স্বাধীন ভারতবর্ষে, কেরালার কিছু কিছু অঞ্চলে দলিত নারীদের শরীরের ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত করে রাখতে হত। কোনো লোকাচার নয়, এটা ছিল সবর্ণদের তৈরি একটি বিধি। স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়টি জানতে পেরে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, এই বর্বর প্রথা চালু রাখার জন্য তিনি সমগ্র কেরালাবাসীকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁর রূঢ় এবং ঘৃণামিশ্রিত মন্তব্যে জাতীয় নেতারা রীতিমত ঘাবড়ে যান এবং তাঁকে বক্তব্যটি প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেন। তাতে তিনি আরো কুপিত হন এবং কেরাল্যাবাসীকে মনুষ্যপদবাচ্য বলে স্বীকার করতে আপত্তি করেন।

www.pathagar.com

গান্ধীজি প্রাক্‌স্বাধীন, মধ্যচল্লিশের দাঙ্গাকালে বেলেঘাটায় এসে কোনো বাঙালির সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন। দাঙ্গার প্রতিবাদে অনশনে বসেছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন হত্যাকারীরা পিতামাতাহীন অন্য সম্প্রদায়ের শিশুদের দায়িত্ব নিতে না পারবেন ততদিন তিনি অনশন করবেন।

দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই নেতাদের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল সুশীল সমাজ, সিভিল সোসাইটি। তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের কোনো ভূমিকা দাঙ্গারোধে দেখেননি। কিন্তু অবশ্যই দাঙ্গা জাতীয় বর্বরতা রোধে সুশীল সমাজের, তার শিক্ষাদীক্ষা, চেতনার আঙ্গিক ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেদিক থেকে তাঁদের সমালোচনার যথার্থ ছিল এবং কী আশ্চর্য, পশ্চিম বাংলার তৎপরবর্তী ইতিহাসে দাঙ্গার প্রকোপ তুলনামূলক অনেক কম থেকেছে। তেভাগা থেকে নকশাল বাড়ীর দীর্ঘ যাত্রায় গণআন্দোলন, বামপন্থী মতাদর্শ যে একই সঙ্গে একদিকে যেমন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলেছে, তেমনি তা এ রাজ্যের শ্রী চৈতন্যলালিত সমন্বয়ী সংস্কৃতিতে জারিত সুশীল সমাজের চেতনার উপর নির্ধারক প্রভাব ফেলেছে। সেই অর্থে পশ্চিম বাংলায় একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। তারপর আর একবারই সেখানে দাঙ্গা হয় ১৯৬৪ সালে; অনেক ছোট পরিসরে। তারপর থেকে এতদঞ্চলের মানুষকে তেমনভাবে দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। দাঙ্গার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নিয়েছিল সচেতনতার আলো। দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিম বাংলার বুকে লালঝাণ্ডা। কয়েকটি সরকারী দল তাকে যতই কলুষিত করার চেষ্টা করুক না কেন, একথা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে লাল ঝাণ্ডাই মানুষকে দিয়েছিল সংহতি ও সম্প্রীতির প্রত্যয়, আর ত্রস্ত করেছিল জাত প্রতিক্রিয়াশীল কালসাপের বাচ্চাদের। এমনকি চরম প্রতিক্রিয়াশীল বাম বিরোধী শক্তিগুলো পর্যন্ত দাঙ্গার কথা ভাবতে পারে না।

বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজি আমাদের শেখালেন ঘৃণ্য নারকীয় সংস্কৃতি যে সমাজে প্রকট হবে সে সমাজের সুশীল সমাজ তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও ভালো লোক আছেন, বেশির ভাগ গুজরাতি নিশ্চয় ভালো, তাঁরা গণ্ডগোল চান না, কতিপয় দুষ্কৃতির জন্য সমস্ত গুজরাতিদের দোষারোপ করা যায় না—এসবই তাই আজ নেহাত ছেঁদো কথা।

আমরা দূরদর্শনে দেখেছি, গুজরাতি মহিলারা নিজেদের ছেলেদের হাতে পেট্রলের ক্যানেস্তারা এগিয়ে দিচ্ছেন, যাতে সেই কিশোর পাশের বাড়ীর মুসলমানদের ঘরে জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারতে পারে। এই মহিলা কি মায়ের সম্মান পেতে পারেন ? এ রকম কোনো পিতাকে বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দেয়া যায় ? যে মা, যে বাবা তার সন্তানদের খুন করতে শেখায়, মানুষকে জ্যান্ত

www.pathagar.com

পুড়িয়ে মারতে শেখায়, লুট-ধর্ষণ করতে শেখায়, তাদের না হয় আমাদের বর্তমান আইনে কোনোভাবে ধরা যায় না, কিন্তু তার সুশীল সমাজও কি তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে না ? আর তা যদি না করে তবে, তাকে সুশীল সমাজ না বলে কুশীল সমাজ বলতে আমাদের বাধবে কেন ? নবজাতককে এ পৃথিবীর বুকে এক সুন্দর স্বর্গ এনে দেওয়া যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি ঠিক সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই এসব সামাজিক কীটগুলোকে স্বদেশ, স্বকাল, সমাজ থেকে নির্মূল করা ও দেশকে পরিশুদ্ধ করাটাও কি আমাদের সামাজিক তথা জাতীয় কর্তব্য নয় ?

গুজরাত টেক্সটাইল ও অন্যান্য ধরনের যয়নশিল্পকে লাটে তুলে দিয়ে তার শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই করেন ঘননুইমর শ্রমিকদের নির্মাণ শিল্পে অনিয়মিত শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের রুজি কমে গেছে, সামাজিক নিরাপত্তা বলে কিছু নেই, কোনো রকম আইনী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। অমানুষিক শোষণের শিকার এসব মানুষদের অবস্থান দারিদ্রসীমার বহু নীচে এবং এরা অসংগঠিত। এসব প্রাক্তন সর্বহারাকে বর্তমানে লুম্পেনে পরিণত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলো এ প্রবণতাটির বিরুদ্ধে কোনো অগ্রিম পদক্ষেপ নেয়নি। তারা নানাভাবে উদার নৈতিকতার শিকার হয়েছে। এটাই দেখিয়ে দেয় যে, কিভাবে উন্নত দর্শন ও বিজ্ঞানের অভাবে সমাজে কালরাত্রি নেমে আসে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যখন সর্বহারা দিশায় পরিচালিত না হয়, তখন কী পরিণতি হয় তা আমরা পশ্চিম ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি। সর্বহারার সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নে বিপ্লবী চিন্তার ঘাটতি দেখা দিতেই পারে, তাতে বিপ্লবী সচেতনতার অভাব ঘটতেই পারে, কিন্তু সেটা বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু যখন সংগঠিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন দক্ষিণপন্থীদের হাতে চলে যায় বা আদর্শগতভাবে জাতীয়তাবাদী অথবা সাম্প্রদায়িকদের হাতে চলে যায় তখন তা ধীরে ধীরে শ্রেণী হিসেবে সর্বহারার অবস্থানকেই ভেঙে দেয়। ভারতের উগ্র মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আজকে তাই সামগ্রিক শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রকে সংগঠিত অবস্থার বদলে অ-সংগঠিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে একদিকে তারা শ্রমিক শোষণকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিতে পারছে, অন্য দিকে এই অ-সংগঠিত সর্বহারাকে দিয়ে তারা ঘৃণিত কাজগুলোও করিয়ে নিতে পারছে। সামন্তবাদী সময়ে জমিদারদের লেঠেল বাহিনী এ রকমই তৈরি হত। প্রতিস্পর্ধী কৃষকের উপর অত্যাচারটাও করানো হত এদের দ্বারা। এভাবেই তাদের নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতে পরিচালিত করা হত।

www.pathagar.com

কাজ ফুরিয়ে গেলে জমিদাররা এদেরকেই নীরবে নিকেশ করে দিত। নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে একটি বিতর্কের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাম আন্দোলনে অনেকেই এদের মধ্যে রুদ্ধ জীবনবোধ খুঁজে পান, কয়েকজন পণ্ডিত, প্রাক্তন নকশাল ঐতিহাসিক তো এদের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষের বিরোধীদের সুর খুঁজে পেয়েছিলেন, কারণ এরাই শ্রমিক-কৃষকের সন্তান। ইস্পাত উপন্যাসের বিতর্কে বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকরা সমাজ পরিবর্তনের জন্যে লড়াই করছে, এ লুম্পেন বাহিনী তাদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং বিপ্লবীর কাজ এই লুম্পেন বাহিনীকে নিকেশ করা, সেটাই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে ইতিবাচক কাজ। ইংগিতটি গুজরাতের ক্ষেত্রে পরিষ্কার। দেবেশ রায় ১৯৯৩-র দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'একটি দাঙ্গার প্রতিবেদন' বইতে দেখিয়েছিলেন কী করে দলিত বস্তিবাসীদের দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত কুমারীদের ধর্ষণ করানো হচ্ছে, তাদের খুন করানো হচ্ছে, কোন্ লোভে তারা এই কাজ করছে, কিভাবে একটি অদম্য ক্ষমতার লিপ্সা এদেরকে বিপথে চালিত করেছে। গুজরাতেও তাই হয়েছে। বেকার ও ছাঁটাই শ্রমিকদের সম্পত্তির লোভ ও মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে দাঙ্গাবাজে পরিণত করা হয়েছে। আমরা দূরদর্শনে দেখলাম মধ্যবিত্ত কিশোরদের শক্তিমত্তার রোমান্টিকতা দেখিয়ে দাঙ্গাবাজে পরিণত করা হয়েছে। তাদের মানসিক গঠন রূপ পেয়েছে বলিউডের ফিল্মি ঢঙে, তারই অনুপ্রেরণায়। সংস্কৃতি যেখানে শুধুমাত্রই বলিউড নির্ভর, সেখানে শক্তিমত্তার একমাত্র প্রকাশ যে এভাবেই ঘটবে তাতে তো অবাক হবার কিছু নেই।

আজকের গুজরাতে এই অবস্থা এসেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে রাজনীতি, দর্শন ও মতাদর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে সেটাকে শুধু 'সুযোগ-সুবিধের জায়গায়' পরিণত করার মধ্য দিয়ে, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায় অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নগুলোরই। আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কারণ সেখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো রকম সৃজনশীল দর্শন, সৃজন ও প্রগতির দর্শনের অভাব। যেখানে গল্প উপন্যাস লেখা হয় ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে তার গ্রহণযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে, সেখানে এই পরিণতিই অবশ্যম্ভাবী। জাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা বা অন্য ধরনের দক্ষিণপন্থী দর্শন কোনো রকম সমাজকেই টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কতটা অপারগ আজকের গুজরাট তার জ্বলন্ত প্রমাণ। লাল ঝাণ্ডা ফিকে হতে পারে কারো হাতে বা অসচেতন ব্যবহারে, কিন্তু লাল ঝাণ্ডা নিজের থেকেই একটা মতাদর্শ, যা সর্বহারাকে আরো সংগঠিত করার দিকে এগোয়। শ্রেণী চিন্তা হিসেবে সংগঠিত না হলেও অন্তত শত ফিকে

www.pathagar.com

লালঝান্ডাও শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না। নিজের প্রয়োজনেই সেটা সে হতে দিতে পারে না। তাই পশ্চিম বাংলায় বাম সংস্কৃতি কতটা লাল তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আজো পশ্চিম বাংলায় এই কদর্য অসভ্যতা-বর্বরতা ফেটে পড়তে পারে না, এমনকি পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ পন্থীরাও এটা বরদাশত করে না। এটাই লালঝান্ডার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা, তার হাত ধরে গড়ে উঠা লাল সংস্কৃতির ঐতিহ্য। আর গুজরাতের বিপদটা এখানেই। তাই আজকে ফ্যাসিবাদের উত্থানে আমাদের যেমন গভীরভাবে ভাবতে হবে গুজরাতের সুশীল সমাজের নাগরিকদের দায়িত্বের কথা, তেমনি ভাবতে হবে তার শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শহীনতার প্রসঙ্গও।

## ভবিষ্যত হিন্দু রাষ্ট্রের স্তম্ভ

হিন্দু রাষ্ট্রে মানুষের সংগঠন থাকবে না। থাকবে 'সাধু'দের সংগঠন। তারাই তোমার আমার হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, তারাই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। যুক্তি, কানুন, রীতি, নিধিদ্যাস, নৈতিকতা বলে কিছু থাকবে না। সবকিছু নির্ধারিত হবে সাধুদের বচন দ্বারাই। কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি করতে গেলে জনগণের এবং বিশেষ করে উৎপাদকের যে কোনো সাবলীল সংগঠনকেই ভেঙে দিতে হবে। মানুষের মধ্যেকার সামাজিকতাকে ভেঙে দিয়ে এককে অপরের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এদের সবার উপরে ছড়ি ঘোরাবে ঈশ্বরপ্রেরিত কিছু অতি মানব। তাই সমাজের স্বাভাবিক উৎপাদন ও সংগঠনের জায়গায় চালু করতে হবে বিচ্ছিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি ও তদনুসারী উৎপাদন সম্পর্ক। এই উৎপাদন সম্পর্কই হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা অনুৎপাদক দ্রব্য আদান-প্রদানের কারবার।

এটাই উত্তর ভারতের বৈশ্য সংস্কৃতি। বাংলা বা মিথিলাঞ্চলের মিথ-এ যখন অজানার অভিযাত্রীকে নায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তখন আর্য ভারতে শ্রেষ্ঠী ও সুদখোরকে নায়ক বানানো হয়েছে। বৃহৎ উদ্যোগের পথে যাবে না, ক্ষুদ্র 'অ্যাসেমব্লিং'-এর পথ ধরবে। দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের যে কৌলিন্য ছিল তা আর থাকবে না, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের স্তরে নেমে যাওয়াই আজ তার শাসকদের কাম্য। বিশ্বপুঁজির এই প্রয়োজনেই আজ এদেশে বানিয়াদের রমরমা। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল বৃহৎ পুঁজির সাহায্যে। অর্থনৈতিক পরিসেবাকে সম্পূর্ণ বৃহৎ শিল্প পুঁজির সেবাইত হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আজ কিন্তু এটা

www.pathagar.com

নিয়ে আর চলছে না। মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বৃহৎ পুঁজি আজ তাই বানিয়া পুঁজির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। কংগ্রেসের অপসারণ আর বিজেপির উত্থানকে আমাদের অবশ্যই এই প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। ফ্যাসিবাদের রূপ তাই বৃহৎ শিল্প পুঁজির সেবাদাসত্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বানিয়া পুঁজির সেবায় নিয়োজিত। বিজেপির ফ্যাসিবাদ তাই আসছে বানিয়াবৃত্তির পথে। বানিয়া পুঁজির কিন্তু সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা কম থাকে, আর বিশ্বায়নের পক্ষে আজ এটাই প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ কম করে, মন্দা ও কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতি (structural stagflation) অর্থাৎ কোনো কোনো খণ্ড ক্ষেত্রে প্রচুর দাম, যোগান অনেক কম ; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দামও কম যোগানও কম; সর্বোপরি নতুন দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ কম থাকে এক সামগ্রিক মন্দাকে বজায় রাখতে পারলে, বাধ্য হয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিশ্বের কাছে খুলে দিতে হবে। কংগ্রেস জমানাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের জন্যে এক বিরাট মধ্যবিত্ত শক্তির জন্ম হয়েছিল, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজের বিকাশের প্রয়োজনে এক ধরনের 'উন্নয়নের' মডেল খাড়া করেছিল, আর তার দিকেই লোভ এসে পড়লো বিদেশী কর্পোরেটদের। বিজেপি জমানাতে উৎপাদনহীনতার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মতো প্রচুর অর্থসমৃদ্ধ (যার পুরোটাই বিদেশী দানের টাকা নয়-ছয় করে এবং ব্যাংকের ঋণখেলাপ করে সংগ্রহ করা) একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং বিশাল একটি নিরন্ন দরিদ্র অংশ—এ নিয়ে তৈরি হবে ভবিষ্যত হিন্দুবাদী ফ্যাসিস্ত ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো। সামাজিকভাবে হিন্দুত্ববাদ শিক্ষা নিয়েছে পূর্বতন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরাঈল থেকে। জাতের ভিত্তিতে এক-একটি মহল্লা ভাগ হয়ে যাবে। এবারের দাঙ্গার পরে আহমদাবাদে কোনো মিশ্র এলাকা আর রইলো না। হিন্দু আহমদাবাদ (অচিরেই যার নাম বদলানো হবে ও একটি নতুন শহর হিসাবে ঘোষিত হবে যে শহরে বিপুল টাকা ঢালা হবে ও গরীব মানুষদের বাসস্থানগুলোকে ভেঙে দিয়ে সুন্দর হর্ম্যশ্রেণী গড়ে উঠবে অনেকটা নতুন দিল্লির কায়দায়) আর মুসলমান আহমদাবাদ, যে শহরটিকে ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য করে তোলা হবে পুরোনো দিল্লির মতো। এভাবে প্রথমে ঘেটোকরণ এবং তারপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের বাসের অযোগ্য একটা অবস্থানে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে বিতাড়ণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বর্তমান দাঙ্গায় তারই একটি মহড়া হয়ে গেল। সম্প্রতি গুজরাটে গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা ছড়িয়ে দেয়ার কারণ হলো, গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের তাড়িয়ে তাদের জমিজমার উপর নির্মাণ উদ্যোগের দালালদের জায়গা করে দেয়া। আগে গ্রামের সামন্তবাদীরা যে রকম গরীবের জমি আত্মসাৎ করতে অভ্যস্ত ছিল, আজ ল্যান্ড

www.pathagar.com

ডেভেলপার বা ল্যান্ড প্রোমোটাররা সেই অভ্যাস রপ্ত করছে বিজেপির নেতৃত্বে। তফাৎ একটাই, পুরোটাই ঘটছে মুসলমানদের জমিকে কেন্দ্র করে। ঘেটোকরণ মার্কিন মুলুকেও চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ নেতৃত্বের ধী ও পরিকল্পনার কাছে এ প্রকল্প বেশ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। ইসরাঈল প্যালেস্টাইনে একই কায়দা শুরু করেছে। ফ্যাসিবাদের একটা জাতিগত দিক আছে। ভারতীয় ফ্যাসিবাদ এ ধর্মীয় জায়গাটি সামনে হাজির করেছে।

সামরিক স্তম্ভ হিসেবে সংঘ পরিবারের পরিকল্পনা হচ্ছে আইএসআই নামক জুজুর ভয় দেখিয়ে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর থেকে মুসলমানদের হঠিয়ে দেওয়া। গুজরাতে আইপিএস অফিসার সাঈদকে ভিএইচপি আক্রমণ করেছে। এই সাঈদ সেই ব্যক্তি যিনি হিন্দু মন্দির নির্মাণে নিজে থেকে উদ্যোগী হয়েছিলেন নিজের গ্রামে। গুজরাতে পুলিশ অফিসারের সামনে তার মুসলমান ড্রাইভারকে কতল করা হয়েছে, সেই অফিসারের নির্দেশেই। এভাবে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে কজন মুসলমান আছেন তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে শেষমেষ তাড়িয়ে দেয়ার প্রকল্প রচিত হচ্ছে। যদি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারক্ষীরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে তবে, ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় রাষ্ট্রের দিকে মোড় দেওয়াটা সহজতর হবে। বৃটিশ শাসনে যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে চলে যায় তখন পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপক মুসলমান নিয়োগ করা হয়েছিল। এটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের একটা জঘন্যতম উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদীরা বিপ্লবীদের উপর নারকীয় অত্যাচার করতো এই মুসলমান পুলিশ অফিসাররা। এই অফিসাররাই পরে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের উপর, তেভাগা বিদ্রোহের নেতা-নেত্রীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল। ঠিক একই পদ্ধতি প্রকরণ আজ শুরু করেছে ভিএইচপি।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে হিন্দু রাষ্ট্র টিকে থাকবে পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে। হলাহল বিস্তার ছাড়া মানুষকে দৈনন্দিন দাবি-দাওয়ার থেকে বিপথে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। ভেতরের সব সমস্যাকে যেমন পাকিস্তান এতদিন হিন্দু ভারতের জুজুর ভয় দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছে, ভিএইচপি আজ তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এতে সরকারের বিশেষ প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব থাকে না, শুধু বাইরে যুদ্ধ জিগির চালিয়ে গেলে একটি ক্ষুদ্র আমলাতান্ত্রিক শ্রেণী জন্ম নিতে পারে, যারা সামরিক বাণিজ্যের ঘুষের টাকায় আর সরকারী কোষাগারের টাকায় পরিপুষ্ট হতে পারে। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের এই রূপ আমরা পাকিস্তানে দেখেছি, এই

www.pathagar.com

শ্রেণীটিই পরে দেশের বিকাশে এক উচ্চবিত্ত চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির মডেলে দেশকে চালাবে।

ফ্যাসিবাদের একটা বিশ্বব্যাপী বীক্ষা ছিল। হিন্দুত্ববাদীরা একে মুৎসুদ্দি, তার উপর সে বুঝে যে ভারতের বাইরে তাদের হিন্দুত্ববাদ এগোতে পারবে না। তারা এটাও বুঝে গেছে যে পূর্বভারত এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যতে তারা হালে পানি পাবে না। তারা বুঝেছে যে পুরো হিন্দু শক্তি তাদের পাশে নেই, আছে খুবই ক্ষুদ্র অংশ। এই অংশকে জঙ্গী করে তোলা হচ্ছে হাতে অস্ত্র দিয়ে, সরকারের সহযোগিতা দিয়ে তাদের নিজেদের রাজ্যগুলোতে—যতই দিনকে দিন কমে আসুক। তাই গুজরাত, রাজস্তান, উত্তর প্রদেশে তারা নিজেদের পা কেটে অন্যদের যাত্রাভঙ্গ করতে চাইছে। তারা এটা বিলক্ষণ জানে যে তারা যতক্ষণ না হিন্দুদের জঙ্গী করতে পারছে, ততদিন আর তারা নতুন করে জনসমর্থন পাবে না।

❐

www.pathagar.com

# নিসন্দেহে ধারাবাহিক, কিন্তু একটি নতুন অধ্যায়ও

–শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

গুজরাতে এখনো পর্যন্ত যা ঘটে চলেছে তার পরম্পরা গত শতকের উত্তাল চল্লিশ দশককে অতিক্রম করে আরও সুদূর অতীতে প্রোথিত। নলিনী মিত্রর স্মৃতি অনুসারে বঙ্গভূমিতে, বিশেষ করে ঢাকায়, ১৯২৫-২৬ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, যদিও সে পর্বে তার প্রকৃতি এতটা হিংসাশ্রয়ী ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতে এবং গো-বলয়ে রীতিমত ব্যাপক ও রক্তাক্ত সংঘাত শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে এই সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতাকেই উন্মোচন করেছেন 'দ্য কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজম ইন নর্থ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে।

দুটি দৃষ্টান্ত। আমেদাবাদের অদূরে মুম্বইতে ১৯২৯ সালের সংঘর্ষে ১৮৪ জন নিহত হন এবং ৯৪৮ আহত। ঠিক দু বছর পর, ১৯৩১-এ কানপুরের দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা আরও বেশি এবং ভয়াবহ অশান্তির প্রথম দিনেই হাজার হাজার শহরবাসী অন্যত্র পালিয়ে যান। বলা বাহুল্য, আমেদাবাদ এবং গুজরাতের অন্যান্য স্থানে এখন যে তাণ্ডব অব্যাহত, তা এই ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু শুধুমাত্র এই সংযোগের উপর জোর দিলে এবং অনিবার্য সাদৃশ্য সন্ধানের প্রচেষ্টায় সীমিত থাকলে, সর্বশেষ এ মারণযজ্ঞে তুলনাহীন নতুনত্ব, এমনকি অদ্বিতীয় আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবে। সত্যি বলতে, দেশের রাজধানী খাস নয়াদিল্লিতে শিখ গণহত্যার (১৯৮৪) সঙ্গেও আমেদাবাদের গণনিধনের মৌলিক, চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। আমেদাবাদ এক ও অনন্য কেন, খতিয়ে দেখা যাক।

নিধনপূর্ব পার্থক্য ঃ কম করে গত দুই দশক ধরে অবিশ্রান্ত এবং বহুস্তরী ঘৃণার প্রচার চালিয়ে এই সাম্প্রতিক আক্রমণের মানসিক ভিত্তিভূমি রচনা করা হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী গুজরাত থেকে ফিরে বলেছেন, গৈরিক বাহিনী দুই প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ গুজরাতবাসীর বৃহৎ অংশের মন একেবারে বিষিয়ে দিয়েছে।' প্রচলিত সংখ্যালঘু-অপ্রেমকে, একটি নির্ধারিত অঞ্চলে, এভাবে সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের সাহায্যে অন্ধ মত্ত বৈরিতায় এর আগে নামিয়ে আনা হয়নি। এমনকি দেশ ভাগের পর্বেও কোনো সুনির্দিষ্ট দাঙ্গার পিছনে এতটা জমাট, দীর্ঘস্থায়ী 'psychic' প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। গুজরাতে হিন্দুত্বের গবেষণাগারে এই অভূতপূর্ব সক্রিয়তা সর্বশেষ সংহারটিকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। কারণ গবেষণাগার এবং সংহারের ভিতর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী।

www.pathagar.com

স্বভাবতই, এই আমূল চিত্তবিকৃতির সঙ্গে চলেছে Practice বা প্রয়োগের পুংখানুপুংখ প্রস্তুতি। মুসলিম মহল্লার নির্ভুল চিহ্নিতকরণ, মুসলিমদের দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা, গ্যাস্ সিলিন্ডার ও ম্যাটাডোর ভ্যানের অক্লান্ত সরবরাহ, অভিনব কৌশলে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটিয়ে খাণ্ডবদাহর প্রশিক্ষণ, ঘরে ঘরে অগণিত ত্রিশূল-তরবারি বিতরণ, সর্বোপরি দরগা আর মসজিদ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে সারি সারি বুলডোজার মজুত রাখা—এতটা অকল্পনীয় প্রস্তুতি নাৎসিরাও ইহুদীদের উপর আক্রমণের প্রথম অধ্যায়ে নেয়নি। তারা সিনাগগ পুড়িয়েছিল ঠিকই, ওই পর্যন্ত। বুলডোজার ব্যবহার করেনি। বুলডোজারই আমেদাবাদের অকাট্য নবত্বের প্রতীক। এই অতুলনীয় মানসিক-তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক প্রস্তুতিকে মূল্য দিয়ে গুজরাতকে বলতে ইচ্ছে করে, 'তোমার তুলনা শুধু তুমি'। আরও বলতে সাধ হয়, সর্বার্থে দণ্ডনীয় এবং নির্দয়তম গোধরাকাণ্ড না ঘটলেও আমেদাবাদে এ হত্যালীলা কাল কিংবা পরশু ঘটতো। গত তিন দশক ধরে গুজরাটে উপর্যুপরি সংঘাত ও গরলপান সর্বশেষ দাবানলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে; নারকীয় গোধরা চূড়ান্ত পর্বটিকে ত্বরান্বিত করেছে।

নিধনপর্বের পার্থক্য ঃ ঠিক এই পর্বকে মাথায় রেখেই সাদৃশ্য সন্ধানের প্রবণতা তীব্র হতে পারে, বিশেষ করে যখন ধুরন্ধর জর্জ ফার্নান্ডেজ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, 'শিখ নিধন কি ভুলে গেছেন? এর আগে কি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ঘটেনি?' নিসন্দেহে বহু সাদৃশ্য জ্বলজ্বল করছে, তবে ভিন্নতাগুলোও সমান জ্বলন্ত। ভিন্নতার একটি তালিকা দিই।

ক. দিল্লিতে শিখ নিধন চলেছিল কয়েক দিনের জন্য। গুজরাতে গত দু মাস ধরে লাগাতার তাণ্ডব চলেছে। এর আগে কোনো দাঙ্গা বা একতরফা সংহার এতটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

খ. এই স্থায়িত্বের কারণ রাজ্যের প্রশাসনের প্রায় সর্বাত্মক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত যা এখনও অটুট। এখনো পুলিশ স্টেশনে ধর্ষিতাদের এফআইআর নেয়া হচ্ছে না। অতীতের বহু দাঙ্গায় স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশের একটি অংশ, করণিক-আমলা প্রধানত সংখ্যা গরিষ্ঠের আক্রমণে মদত জুগিয়েছে। উদাহরণ ঃ জামশেদপুর, ভাগলপুর, কানপুর। কিন্তু ঠিক এ অঙ্গীকারবদ্ধ পরিমাণে, তীব্রতা ও নিষ্ঠায় এর আগে কোনো প্রশাসন আক্রান্তদের সর্বনাশ করেনি। এই সর্বগ্রাসী প্রত্যক্ষ সরকারী সহযোগিতা অবশ্যই তুলনাহীন। দুটি দৃষ্টান্ত ঃ (এক) বেছে বেছে বিবেকবান পুলিশ অফিসারদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। (দুই) পুলিশ কর্মীরাই ভয়ার্ত, আক্রান্ত নারীদের সটান

www.pathagar.com

চালিত করেছে হত্যাকারীদের দিকে। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর অধ্যায়ে সুরাবর্দি প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং শিখ নিধনের পর্বে দিল্লি পুলিশের ঔদাসীন্য মোদীযন্ত্রের এই দীর্ঘ, গাণিতিক সক্রিয়তার কাছে হার মানে। ১৯৯২-এ কলকাতায় বটিয়াবুরুজে শ্রমিক বস্তি জ্বলেছিল ঠিকই, তবে তড়িঘড়ি সেই আগুন নেভানো হয়েছিল গুজরাটে চিতা অনিবার্ণ, এই মূল পার্থক্যটি মনে রাখতেই হবে।

গ. নিধনপর্ব চলাকালীন শুধু রাজ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহতা এবং অকর্মণ্যতা এই প্রথম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ইতিহাসে এক অসামান্য কেন্দ্র-রাজ্য যুগলবন্দি রচনা করে। এদিক থেকেও গুজরাত একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কেন্দ্র নিছক নিস্পৃহতার বৃত্তে নিজেকে সীমিত না রেখে সংহারের আত্মিক সমর্থন পেশ করেছে বারংবার। দুটি দৃষ্টান্ত ঃ (এক) গোয়ায় বাজপেয়ীর বহুচর্চিত আশ্চর্য ভাষণ, (দুই) মাত্র গত সপ্তাহে ফার্নাণ্ডেজ-কর্তৃক মোদীকে 'রোশনি' সম্মান প্রদান।

ঘ. শিখ নিধনের সঙ্গে গুজরাতে নিধনের পার্থক্য এখানেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব বার বার তার অপকর্মের জন্য শিখ সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে। সংঘ পরিবারের কোনো নেতা আজ পর্যন্ত মার্জনা ভিক্ষার ধারকাছ দিয়ে যাননি। তাঁদের আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশকে ছাপিয়ে গিয়েছে মোদীকে রক্ষার ব্যগ্রতা আর ব্যাঙ্গালোরে মুসলিমদের প্রতি উচ্চারিত সতর্কবাণী। এই আকাট অনুশোচনাহীন নির্লজ্জতা গুজরাতলীলার আরও এক অনবদ্য ভূষণ।

ঙ. এই প্রথম সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে স্থানীয় প্রশাসনের অপদার্থতা ও অসহযোগিতার ফলে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।

বৈরিতাসর্বস্ব মানসিক প্রস্তুতি, নিশ্ছিদ্র প্রয়োগ পদ্ধতির নেটওয়ার্কিং, প্রায় পূর্ণ শতাংশ প্রশাসনিক সহযোগিতা, নিধন পর্বের স্থায়িত্ব এবং কেন্দ্রের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সমর্থনকে অবিভাজ্য সূত্রে বেঁধে রেখেছে সংঘ পরিবারের মতাদর্শ আর জীবন দর্শন। গুজরাতের পরেও যাঁরা এই মতাদর্শকে ফ্যাসিবাদ বলতে কুণ্ঠিত বোধ করেন, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে আর একবার সাভারকর, গোলওয়ারকর, হেডগেওয়ার-এর অমৃতবাণী পাঠ করেন। নাৎসিদের প্রশংসায় মুখর এই মতাদর্শের প্রথম, বিস্তীর্ণ আঞ্চলিক ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে গুজরাতে। তিন বছর আগে একই রাজ্যে খৃস্টান নিগ্রহ দিয়ে যার মহড়া হয়েছিল তারই পূর্ণ মঞ্চায়ন ঘটেছে সম্প্রতি। অর্থাৎ এই প্রথম প্রত্যক্ষ সরকারী কৃপায় ভারত ভূমির পশ্চিমাংশে গৈরিক ফ্যাসিবাদ তার তত্ত্বকে ভয়াবহতম

www.pathagar.com

প্রয়োগে পরিণত করেছে। এই সমূহ, অপরিহার্য রাজনৈতিক বিচারেও গুজরাত অদ্বিতীয়। মতাদর্শহীন শিখ-সংহার ছিল পুরোপুরি তাৎক্ষণিক সীমিত গোষ্ঠীমত্ততার একবারের প্রকাশ, মতাদর্শপুষ্ট গুজরাত নিধনের প্রণেতারা সমগ্র ভারতকে গুজরাতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট অনেক আমেদাবাদের সৃষ্টি করে।

এবং তার স্রষ্টারা সুপ্রিম কোর্ট, বিচারক, মানবাধিকার কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, সংবিধান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিদেশি রাষ্ট্র, বিশ্বজনমত— সবকিছুকে পদদলিত করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে, তারাই সময়-সুযোগ বুঝে রাজ্যের নির্বাচনও সেরে ফেলতে চায়। ফ্যাসিবাদের এহেন উৎকৃষ্টতম দ্বিচারী দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাব ? গুজরাত ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের স্বরূপ ফালা ফালা করে উন্মোচন করেছে। তাই মেরঠ, দিল্লি, কানপুরের ঘোর সাম্প্রদায়িক আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমেদাবাদ অনন্য, অপূর্ব।



www.pathagar.com

# গুজরাতে নরমেধ যজ্ঞের আগুন নেভেনি

–আবদুর রউফ

গুজরাতে নরমেধ যজ্ঞের আগুন নেভেনি। এখনো সেই যজ্ঞাগ্নিতে নররক্তের আহুতি দানের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এরই মধ্যে আরএসএস-এর সরসংঘ চালক অর্থাৎ সুপ্রিমো কে সুদর্শন স্বয়ং সেবকদের নির্দেশ দিয়েছেন আক্রমণাত্মক হওয়ার। বলেছেন, 'আমাদের উপর কোনো আক্রমণ হলে অবিলম্বে প্রতিআক্রমণ করতে হবে।' হঠাৎ এই প্রতিআক্রমণের কথা কেন? তাহলে কি একতরফা গণহত্যার শিকার হতে হতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া গুজরাতের মুসলমানরা কোথাও কোথাও কোণঠাসা বিড়ালের মত মীরয়া আচরণ করছে? শ্রী সুদর্শন পলায়নের পথ না পাওয়া নিরুপায় বিড়ালের (পড়ুন গুজরাতি মুসলমানের) সেই আঁচড়ে কামড়ে দেওয়া আচরণটাইকেই হয়ত আক্রমণ বলে গণ্য করছেন। সম্ভবত সেই কারণেই স্বয়ং সেবকদের প্রতি নির্দেশে আরও তীব্র প্রতিআক্রমণ হলো। অর্থাৎ আক্রান্ত হতভাগ্যদের আত্মরক্ষার ন্যূনতম প্রয়াস যতক্ষণ বজায় আছে কালান্তক আক্রমণে ছেদ যেন না পড়ে। আত্মরক্ষার ন্যূনতম প্রয়াসটাকেই আক্রমণ আখ্যা দিয়ে নিজেদের নরমেধ যজ্ঞকে প্রতিআক্রমণ বলে চালাতে চান আরএসএস সুপ্রিমো।

প্রতিআক্রমণের নামে এ বিপজ্জনক প্ররোচনার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে পারে গুজরাত ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যে। বাস্তবিক গুজরাতের গোটা নরমেধ যজ্ঞটাকেই সাজানো হয়েছে প্রতিআক্রমণের ছকে। এ ক্ষেত্রে আক্রমণ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে গোধরার ঘটনাটিকে। কিন্তু গোধরার ঘটনা সত্যি সত্যি আক্রমণ, নাকি মুহূর্তের উত্তেজনায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা তার কোনো তদন্ত রিপোর্ট আজোও প্রকাশ পায়নি। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ থাকতে পারে, এই কলামেই লিখেছিলাম, গোধরার ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগের মুহূর্তের কাহিনী। করসেবকরা কীভাবে স্টেশনে স্টেশনে মুসলিম ভেণ্ডারদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল এবং সর্বশেষে গোধরা স্টেশনে একটি চায়ের দোকানের বৃদ্ধ মুসলিম কর্মচারীকে মারধোর করে তার ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাকে টেনে নিয়ে সবরমতি এক্সপ্রেসের অভিশপ্ত কামরাটিতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ঘটনা সত্য নাকি অতিরঞ্জিত সে সম্পর্কে কোনো তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। উল্লিখিত রেল কামরাটি পোড়ানোর জন্য যেসব মুসলিম দুর্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা আদৌ দোষী কিনা সে

www.pathagar.com

সম্পর্কে সংশয় আছেই। কারণ অভিযুক্ত করা আর দোষী সাব্যস্ত করতে পারার মধ্যে কতখানি ফারাক থাকে সেকথা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেরই জানা আছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতায়, এমনকি বিচার পদ্ধতিতেও সাম্প্রদায়িক সাইকি-র কারণে। এসব ব্যক্তিও দোষী সাব্যস্ত হয়ে যায় যে আসলে নির্দোষ। এই গুজরাতেই এভাবে দেশদ্রোহিতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ছজন মুসলিম ফাঁসির আসামির সুপ্রিম কোর্টে বেকসুর খালাস পাওয়ার ঘটনা গত সপ্তাহের লেখায় সুপ্রিম কোর্টের নথি থেকে উল্লেখ করেছিলাম।

যে বিচারপতি উল্লিখিত ছজনকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন তিনিই বর্তমানে গুজরাত সরকারের তরফে নরহত্যা যজ্ঞের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন। ফলে তদন্তের রায় কতখানি নিরপেক্ষ হবে সে সম্পর্কে সংশয় থাকছেই। কিন্তু যে তদন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তার রায় বেরোনোর আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বয়ং বলে দিলেন, 'যে আগুনে গুজরাত আজ জ্বলছে তা প্রথমে লাগিয়েছিল কে ? গোধরাকাণ্ড যদি না ঘটতো তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে গুজরাতে যা ঘটেছে তা ঘটতো না।' বিজেপি-র জাতীয় কমিটির গোয়া অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় শুধু এটুকু বলেই তিনি থেমে যাননি। গোধরায় কারা আগুন লাগিয়েছিল সেটা এখনও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে—একথা স্বীকার করে নিয়ে এক নিঃশ্বাসেই তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করতে কসুর করেননি। গোধরা কাণ্ডে যদি কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি জড়িত থাকেও শুধু তাদের বিরুদ্ধে না বলে আমাদের দেশের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন শুধু ভারতের নয়, দুনিয়ার গোটা মুসলিম সমাজটাকেই। বলেছিলেন, মুসলমানরা নাকি কোথাও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায় না। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ফিরিস্তি আরও লম্বা ছিল।

বলাই বাহুল্য, সেদিন প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সম্পর্কে যে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন সেটা তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ভাবনার ব্যাপার নয়। ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি বৃহদাংশ মুসলমানদের সম্পর্কে যে রকম ধ্যান-ধারণা পোষণ করে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সেটাকেই ভাষা দিয়েছিলেন। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তরফে জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বাস্তবভিত্তি অনুসন্ধান করার দায় এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি থাকলে সেটা চিহ্নিত করা জরুরি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সারা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে যত

www.pathagar.com

বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটছে, সে সবের একটা বড় অংশের নেতৃত্বে রয়েছে তেমন মানুষেরাই, ধর্মীয় পরিচয়ে যারা মুসলমান। তাদের কথা আলোচনার আগে দেশে দেশে যেসব অমুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

শুরু করা যায় আমাদের নিজেদের দেশ ভারত থেকে। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আলফা সদস্যদের সবাই হিন্দু। তারা ভারতের মূলধারার সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায় না কেন ? অসমের প্রসঙ্গ এলেই চলে আসে বোড়ো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা। তারা আর যাই হোক মুসলমান নয় নিশ্চয়ই। নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ত্রিপুরার উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সবাই প্রায় খৃস্টান। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ রকম দুর্মতিতে পেয়ে বসেছে কেন ? মুসলিম প্রধান ইন্দোনেশিয়ার টিমোরি দ্বীপের খৃস্টানরা তো নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন করে ফেলেছে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম শাসকরা শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতায় সায় দিলেও ফিলিপাইনসের খৃস্টান শাসকরা সেখানকার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার দাবি মেনে নিতে সম্মত নয় মোটেই। চীনের মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন রাজ্যটির মুসলমানরাই শুধু নয়, তিব্বতের বৌদ্ধ রাও চীনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে নারাজ। এই বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। প্রসঙ্গক্রমে আবার উল্লেখ করা যায় শ্রীলঙ্কার হিন্দুদের কথা। এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি বৌদ্ধ মূল ধারার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে সম্মত নয়। অথচ এখানকার মুসলিম অধিবাসীদের আচরণ একেবারে বিপরীত। বৌদ্ধদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে তাদের কোনো অসুবিধাই কখনো হয়নি।

সুতরাং সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মূল ধারার সঙ্গে মুসলমানরাই শুধু মিলেমিশে থাকতে চায় না, অমুসলিমদের সহনশীলতা তাদের তুলনায় বেশি, এই ধারণা বাস্তবের নিরিখে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল। তবে একথা ঠিক, সংখ্যা দিয়ে হিসাব করলে দেশে দেশে অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা বেশি হতেই পারে। তার একটা যুক্তিসংগত কারণও অবশ্য আছে। সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যার হিসাবে খৃস্টানদের পরেই মুসলমানদের অবস্থান। উপরন্তু যেসব রাষ্ট্রকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং নিপীড়নের জন্য সচরাচর দায়ী করা হয়ে থাকে সেগুলোর বেশির ভাগই খৃস্টান প্রধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম প্রধান দেশগুলোই তাদের দ্বারা শোষিত এবং উৎপীড়িত হওয়ায় এসব দেশেই অশান্তির কারণ বেশি করে ঘটে। আরব দেশগুলোতে সেটাই

www.pathagar.com

ঘটছে। প্যালেস্টাইনিদের মাতৃভূমির বুকের ওপর জোর করে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে বসিয়ে দিয়েছে ইউরোপ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোই। ইসরাঈলকে দিয়ে ক্রমাগত জুলুম চালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হুমকির মধ্যে রেখে আরব মুলুকের তৈল সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখাটাই যে তাদের অভীষ্ট একথা এখন সবার জানা। প্যালেস্তাইনি এবং অন্যান্য আরব বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা যদি মুসলমান না হয়ে অন্য কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষ হতো তাহলেও তারা এই কাজটাই করতো। ধর্মীয় পরিচয়টা এ ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনা মাত্র। একই কথা বলা যায় প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার চেচেন এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের সম্পর্কে। আসলে রুশদের জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহে বাধ্য হয়েছে। মুসলমান না হলেও তাদের সেই বাধ্যবাধকতা থাকতোই। ইউরোপে বসনিয়া হার্জিগোভেনিয়ায় তো ক্যাথলিক খৃস্টান সার্ব জাতি গোষ্ঠীই মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়নি। সেখানে গণহত্যা চালিয়ে মুসলমানদের শেষ করে দিতে চেয়েছিল সার্বরা। মুসলমানরা আগ বাড়িয়ে অশান্তির কোনো কারণ ঘটায়নি। তবুও আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোন তথ্যের ভিত্তিতে যে গোটা দুনিয়ার তামাম মুসলিম সম্প্রদায়টাকেই বাকিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় না বলে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন—সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জোড়া টাওয়ারে এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে বলেই কি তিনি একথা বললেন ? খেয়াল রাখা দরকার ত্রাসের কারণ ঘটছে মূলত আরব সন্ত্রাসবাদীদের কারণে। তারা যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে তার সঙ্গে মূলত আরবদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত।

❐

www.pathagar.com

# সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা
# বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে গুজরাত

–তরুণ সান্যাল

সম্প্রদায় না হলে সমাজ থাকে না। ছেলে বেলায় 'লাল ডীন' হিউলেট জনসনের সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ে একটি রচনায় পড়েছিলাম 'দ্য কমিউনিটি ইজ দ্য এসেনসিয়াল ট্রুথ অফ্ হিউম্যানিটি।' ধরা যাক, শিক্ষক সম্প্রদায়, অধ্যাপক সম্প্রদায়, মাহিষ্য সম্প্রদায়, সাহা সম্প্রদায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্ত-সৌর-গাণপত্য-শৈব-বৈষ্ণব ইত্যাদি সম্প্রদায়। রয়েছে শিয়া-সুন্নী-আহমদিয়া, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, খোজা-ভোরা-মেমেল-বাহাই প্রভৃতি গুজরাটি নানা মুসলমান সম্প্রদায় ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলি থেকেই কি বিশেষণ সাম্প্রদায়িক ? অবশ্যই আমরা তেমনি ভাবছি না। সাম্প্রদায়িক বিশেষণটি এবং সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ্যটির ভিন্নতর ব্যঞ্জনা রয়েছে। সমস্ত বৈষ্ণব শাক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় অনুসম্প্রদায় ইত্যাদি নিয়ে যাদের বৃটিশরা চিহ্নিত করেছিল হিন্দু বলে শিয়া-সুন্নী ইত্যাদি নিয়ে যাদের মুসলমান বলে, তেমনি নামধারী অমৃতধারী নিরাঙ্কারী ইত্যাদি নিয়ে যারা শিখ, শ্বেতাম্বর দিগম্বর জৈন, মহাযানী, হীনযানী নিয়ে যারা বৌদ্ধ, প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথোলিক-সিরিয়ান-অর্থোডক্স ও নানা উপসম্প্রদায় নিয়ে যারা খৃস্টান ধর্মমতের—এসব আলাদা আলাদা ধর্ম অনুসারকদেরই আমরা আমাদের আলোচনায় সম্প্রদায় বলছি। ভারতে জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ নিয়ে যারা সেই হিন্দুধর্ম সম্প্রদায় ও ১২ শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে যারা মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায় তাদের আন্তঃবিরোধের নানা ব্যাখ্যান নিয়েই সাম্প্রদায়িকতার কূটকচালি চলেছে। এই যে ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে গুজরাতে মুখ্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীরা যে নরহত্যা-অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ-লুণ্ঠন-সম্পদ বিনাশ ইত্যাদি ঘটাচ্ছে, এসব আমাদের মনকে এমনটাই নাড়া দিয়েছে যে মিটিং মিছিল অনশন সভা-সমিতি করে গ্রন্থ পোস্টার ও পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি নানা কিছু দিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। প্রতিকার কিছু না করতে পারলেও দাবি করছি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে নরেন মোদীকে হঠাতে। বলছি গুজরাতে এবার যা হয়েছে এমনটা আগে কখনো ঘটেনি। শুনছি ধনী বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও মারুতি মাটাডোর জেন স্যানট্রো কাজে লাগিয়ে কানে মোবাইল ফোন দিয়ে একেবারে বৈজ্ঞানিক

www.pathagar.com

প্রথায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ কার্যকর করেছে। চিহ্নিত করা মুসলমান বাড়ীতে বাড়ীতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। লাইন করে দাঁড় করানো বুলডোজার দিয়ে বাড়ীঘর, হোটেল, দোকানপাট, মাজার, কবরখানা সব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। আর ওই যে বেশ কয়েক কোটি টাকা রামমন্দির ন্যাস থেকে হিসাবহীন তছরূপ হয়েছে, কেউ কেউ তো সন্দেহ করছে, হাজার হাজার বোতল মদ, শত শত ক্যান পেট্রোল এবং হাজার কয়েক মোটর সাইকেল সে টাকা দিয়ে বোধহয় আগে থেকেই কেনা হয়েছিল। আমেদাবাদবাসীদেরও বলিহারি দিই, যখন এক অঞ্চলে এমন ভয়ঙ্কর এক তরফা খুন ও ধ্বংস চলেছে এবং অন্য বংশে তখন ফিটফাট বাবুবিবিরা সিনেমা দেখছে, রেস্তরাঁয় খানাপিনা করছে ও নানা আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে। অর্থাৎ 'ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে' অবস্থা।

রাজনীতি বলতে কী বুঝবো ? কোনো আর্থ-সামাজিক শ্রেণী রাষ্ট্রে তার স্বার্থ কার্যকর করার জন্য যে ভূমিকা নেয় তাকেই বলছি রাজনীতি। এমনি শিল্প পুঁজিপতিদেরও যেমন স্বার্থ, তেমনি তাদের তা হাসিল করার জন্য মিটিং মিছিল পথসভা জনসংযোগ নির্বাচনে প্রতিনিধি দাঁড় করানো ইত্যাদি হয়ে উঠে এদের প্রচারধর্মী নানা ভূমিকায়, তাদের রাজনীতির অন্যতম কাজ কর্ম। আবার বাণিজ্য পুঁজিপতির লোকজন, যারা গ্রামের তেজারতি ও কৃষিপণ্য মজুতদার এবং খনিজ সম্পদসহ নানা অর্ধসমাপ্ত সামগ্রী বিদেশীদের জন্যে তৈরি করার আড়কাঠি, এদেরও শ্রেণীস্বার্থ কার্যকর করার জন্যে রাজনীতি করতে হয়। প্রয়োজন পড়ে ধর্মমত কাজে লাগানো, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো। শ্রমিক শ্রেণীর বা বামপন্থীদেরও নিজস্ব রাজনীতি আছে। এমনি অঞ্চলে অঞ্চলে কেন্দ্রের হয় শিল্প পুঁজিপতি নয় বাণিজ্য বা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা পাবার জন্যেও তাদের সহযোগী শ্রেণীগুলি ভারতে রাজনীতি করে।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে শিল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর ভূমিকাই ছিল প্রধান। তারা একটি অভিন্ন ভারতীয় বাজার চাইতো বটে এবং সে জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা ভূমিকা নিয়েছে তারা। কিন্তু নানা প্রদেশের ভাষাগত স্বাতন্ত্রের মৌলিকতা তারা কিছুটা অস্বীকার করে। ওই যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে, মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর বসিয়েছিলেন, তাঁর মনে ছিল ভারতে অজস্র জাতির সমন্বয়ে এক মহাজাতির স্বপ্ন। বাঙালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাব, সিন্ধি ইত্যাদি সবারই স্বাতন্ত্র মেনে নিয়ে এক মহাজাতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন। আমাদের জাতীয় সংগীত জন-গণ-মনের মধ্যেও রয়েছে পাঞ্জাব সিন্ধু.... প্রতিটি জাতীয় ভাষা সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে ভারত

www.pathagar.com

ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা। এখন যারা হঠাৎ ঘুম ভেঙে 'হিন্দুস্তাঁ হামারা' গানটি গাইতে চাইছেন তাঁরা ওই জাতীয় সত্তাগুলি ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। কেন ? বর্তমানে যাঁরা ভারতের বৃহত্তম রাজশক্তি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি, এই দল বাণিজ্য ও মুৎসুদ্দি পুঁজির ভারতীয় প্রতিনিধির দল এবং বিশ্বায়নের পর্বে আন্তর্জাতিক বিদেশী ঋণ পুঁজির কার্যকর করার হাতিয়ার। ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে শিল্প পুঁজিপতিদের বিকাশমুখী দৃষ্টিভঙ্গি যে সরকারী প্রকল্পগুলি সৃষ্টি করেছিল এরা তা বেচে দিচ্ছে, নয়ছয় করছে এবং বিদেশী পণ্যে দেশ ছেয়ে দিচ্ছে জনগণকে সঞ্চয় বিমুখ করে বিদেশী মালিকানার ভোগ্যপণ্য কেনবার জন্য নানা বাজেট নীতি-নিয়ম অনুযায়ী প্ররোচনা দিচ্ছে, কিন্তু ভারতের কী শিল্প পুঁজিপতি শক্তি, কী বামপন্থী আন্দোলন কাউকে এখনো উৎসাদন করে নিঃশেষ করা যায়নি। নিঃশেষ করার পথ কি ? ভারতের রাজ্যে রাজ্যে তো বটেই, কেন্দ্রেও বিজেপি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই। এই জয়ের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্যে বেশ ক-বছর আগে থেকেই দূরপ্রসারী পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

কোনো আর্থ-সামাজিক শ্রেণী রাষ্ট্রে তার স্বার্থ কার্যকর করার জন্য যখন বিশেষ ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে বাহন করে এবং তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে অন্য ধর্মমত বিশ্বাসী এক কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংঘ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে তখন বলা হবে ওই দলটি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ দলটি সাম্প্রদায়িক। আর পুরনো দিনে সংস্কার ও কল্পিত ঘটনাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মানতে বাধ্য করাই ধর্মীয় মৌলবাদ বলা হয়। গত শতকের গোড়ায় প্রোটেস্টান্ট খৃস্টান কিছু মাতব্বর মনে করেছিলেন, মা মেরীর পুরুষ স্পর্শহীন গর্ভাধান, খৃস্টকে অনুসরণ করলেই পরিত্রাণ ও অনন্তজীবন এবং খৃস্টের পুনরুত্থান ইত্যাদিই খৃস্টানির মূল সত্য। এগুলি জানলেই শুদ্ধ খৃস্টান হওয়া যাবে। এভাবেই মৌলবাদী রাজনীতিরও সৃষ্টি। সাম্প্রদায়িকরাই হয় মৌলবাদী।

অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগ দল বিশেষভাবে পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান বড় বড় ভূস্বামী, পুঁজিপতি, তেজারতি কারবারি, বাঁধাইকার ও পণ্য মজুতদারদের প্রতিনিধিত্ব করতো। মুসলমান ধর্ম অনুসারী একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বা শ্রেণী-কোয়ালিশন ভারতে একাধিক অঞ্চলে রাষ্ট্র গঠন ও ক্ষমতা পাবার জন্য ধনী-গরীব শোষক-শোষিত নির্বিশেষে ব্যাপক মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে। একেই সাম্প্রদায়িকতা বলছি। এমনি ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, দুর্গা বাহিনী, রাম মন্দির ভূমিন্যাস, করসেবক বাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বহু ছোট

www.pathagar.com

ছোট নানা নামের সংস্থা। এদের সবাইকে এক সাথে বলা হচ্ছে 'হিন্দুত্বর পরিবার'। এদের বাহন করে হিন্দুত্ব এক অনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ তুলে ধরে ভারতের বহুত্বকে ভেঙে এক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সৃজন ঘটিয়েছে। একদা মুসোলিনী এমনি নানা সংস্থা গড়েছিলেন (ফ্যাসিস) শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ও মুক্ত মতের রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে। এক সময় ঐ ফ্যাসিস মিলিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ফ্যাসিস্ত দল। আদতে ফ্যাসিবাদ ছিল একচেটিয়া পুঁজির পরজাতি ও পরমত বিদ্বেষী আক্রমণাত্মক সন্ত্রাসমূলক শক্তি। হিটলার জার্মানিতে ইহুদী, বামপন্থী, এমনকি খৃষ্টীয় মানবতাবাদী, জিপসি প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং দেশের বাইরে স্লাভ জনগণের বিরুদ্ধে ওই সন্ত্রাসবাদীর একনায়কত্ব কার্যকরী করেছিল। আমাদের দেশে তো সব মতপথের 'হিন্দু'কে কোনো বিশেষ আইকন তুলে ধরে এক করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে বহু মানুষের কাছে এখনও ধর্মচর্চা বলতে বুঝায় 'অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয়সংযম' অনুসরণ। উত্তর ভারতের গোবলয়ের জনপ্রিয় ধর্মীয় আইকন রামচন্দ্রকে ফলক শীর্ষ করে তুলতে চেয়েছে হিন্দুত্বের পরিবার। অবধি ভাষায় লেখা ভক্তকবি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' হিন্দী ও তার উপভাষাগুলির বলয়ে সাধারণ মানুষের নিত্য ধর্মীয় পাঠ্য। খুব পরিকল্পিতভাবে রামচন্দ্রের প্রতীককে ব্যবহার করেছে ঐ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী জাপানি গাড়ি টয়োটাতে রামচন্দ্রের নানা ছবি সাজিয়ে রামরথ বানিয়ে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণকে পুষ্ট করেছেন। তারও আগে গোটা ভারতে দূরদর্শনকে বাহন করে রামায়ণ দেখিয়ে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। দূরদর্শনে মহাকাব্যের ছবি তো দেখবারই কথা। কিন্তু গ্রামে গ্রামাঞ্চলে ধূপধূনো নিয়ে ঢোলডগর বাজিয়ে বজরং দলের যেভাবে পূজা ও ভক্তির বাতাবরণ তৈরি করেছিল, তার ফল ভোট বাক্সে দেখা গেছে। ঐ টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনেকেই বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়েছেন। প্রচার করেছেন। বিভ্রান্ত লোকের প্রণাম কুড়িয়েছেন। এসব ভারতীয় জনগণের এক বিশেষ অংশের মনের অচেতন অংশকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাবার পন্থা। সুইস মনস্তাত্ত্বিক কার্ল ইয়ং মানুষের মনের গভীরে যে অচেতনা রয়েছে তার সৃষ্টিশীল ও ধ্বংসকারী দুই ভূমিকার কথাই বলেছিলেন। হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী শিল্পশাস্ত্রী গিয়র্সি লুকাচ বলেছিলেন জার্মান নাৎসিবাদ ঘুলিয়ে তুলেছিল গেরমান জনজাতির আদি উপজাতীয় বর্বরতার স্মৃতি, তাদের জাতীয় অচেতনা থেকে। তা হয়েছিল আধুনিক সমরাস্ত্র ও দানবীয় পুঁজির বাহন। হত্যা, ধ্বংস, প্রোগ্রাম ইত্যাদি বীভৎসার প্রয়োগকারী। ১৯৯২ সালে স্যামুয়েল পি

www.pathagar.com

হানটিনটন সাহেব মার্কিন 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকাতে একটি ভয়ানক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির মোদ্দাকথা খৃস্টানির সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার সংঘাত। খৃস্টান সভ্যতা হয়ে উঠেছে নাকি বর্তমানে উদার নৈতিক, গণতন্ত্রী, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদাসূচক ও প্রগতিপন্থী। ভিন্ন দিকে ইসলামী সভ্যতা নাকি হয়ে পড়েছে স্বৈরতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তি মানুষের বিকাশের পরিপন্থী ও মৌলবাদী। ফলে এই ভিন্ন চরিত্রের দুই সভ্যতার সংঘাতের সূচীমুখে নিরূপিত হবে পৃথিবীর ভাগ্য। সত্য কথাটি হলো পশ্চিমী সভ্যতা যা শিল্প সমৃদ্ধ ও ধনী—তার গোড়ায় কিন্তু আছে ব্যাপকভাবে খনিজ তেল ও গ্যাসের ব্যবহার। যানবাহন, বিমান, যন্ত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদনী ডায়নামো ইত্যাদি ইত্যাদি কোনোটাই চলবে না যদি তেল না পাওয়া যায়। মার্কিন দেশের সমৃদ্ধির পিছনে রয়েছে আরব দেশের তেল। আরব উপদ্বীপ, পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, ক্যাসপিয়ান সমুদ্রের অববাহিকা এমনকি ইন্দোনেশিয়া-ব্রুনেই-মালয়েশিয়া-নাইজেরিয়া এসব দেশই অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার। আর এমনই অদ্ভুত ঘটনা যে, এসব দেশ মুসলমান প্রধান। হানটিংটন ভাবছেন মাটির উপর যে সভ্যতার ডালপালা ছড়ানো পুষ্পপ্রসব করেছে গণতন্ত্র, তার গোড়ায় রয়েছে মাটির গভীরে শিকড় ছড়ানো ইসলামী 'স্বৈরতন্ত্র'। এই ইসলামধর্মীদের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাশূন্য না করতে পারলে পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যাবে। যেখানে মুসলমানরা আছে তাদের কোমর ভেঙে দাও। তাদের অন্য সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী করে দাও। তাই দেখছি প্যালেস্টাইনে আরাফাতের সদর দপ্তর শত শত ট্যাঙ্ক দিয়ে ঘিরে ফেলে, আশ্রয়প্রার্থীর শিবিরে গোলাগুলির হামলা চালিয়ে, জল ও রসদ বন্ধ করে যা কিছু ঘটনা হয়েছে তার সাথে গুজরাতের ছবিটির খুব মিল আছে। ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক ইজরাঈলেরই পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর কে না জানে ইসরাঈলের বাবুর নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর আমাদের দেশের আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ী, মুৎসুদ্দী পুঁজি ও সামন্তবাদী স্বার্থের বাহন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বাবুও ওই একই রাষ্ট্রশক্তি।

গুজরাত রাজ্যটিকে বেশ ক-বছর ধরেই বিজেপির শাসনে ক্রমশ বিস্তৃত দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সরকারী নির্দেশানুযায়ী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের মুখপত্র রাখা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে সুরাটে খৃস্টান ধর্মীয়দের উপাসনাগৃহ আক্রমণ করে বজরং দল বুঝতে চেয়েছিল 'পরীক্ষামূলক'ভাবে, দেশবাসী কী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি করসেবক গিয়েছিল গুজরাত ও মহারাষ্ট্র থেকে। গুজরাত বেশ ধনী রাজ্য।

www.pathagar.com

তার শিক্ষার হারও যথেষ্ট উঁচু। সহশিক্ষা সবস্তরের বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক। অর্থাৎ বালিকা বা বালক বিদ্যালয় আলাদা করে কিছু নেই। উপরন্তু সাতটি বড় বিমান বন্দন আছে আন্তর্জাতিক মানের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি নানা দেশে নিত্য যাতায়াত চলে গুজরাতি ব্যবসায়ী চাকুরে জনগণের। গুজরাতি উন্নত শিল্পপতি ব্যবসায়ী সমাজের অন্যতম ভোরা খোজা বাহাই মেমেন প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর মুসলিমরাও। যানবাহন, ছোট শিল্প, রেস্তোরাঁ ও হোটেল, হীরা ও জরির কাজ এবং নানা ধরনের হাতের কাজ এই মুসলিমরা করে থাকেন। তাছাড়া সূতাকলের শ্রমিক, স্কুটার-বাস-ট্রাক-ট্যাক্সি প্রভৃতি চালক অংশের ভিতরেও তাদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব আছে। বাহাই সমাজ খুবই উচ্চশিক্ষিত এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট আধুনিক। মুসলিম সম্প্রদায় কিন্তু গুজরাতের জনসংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ। অর্থাৎ কোনোভাবেই সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কী মন্ত্রী সভায়, কী পুলিশ বাহিনী, ৩ শতাংশের বেশি সেখানে এদের প্রতিনিধিত্ব নেই। অর্থাৎ শান্তি রক্ষায়, প্রশাসনে ও মন্ত্রীসভায় এদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যই নয়। আক্রান্ত হলে দলীয় প্রশাসন কোনোভাবে আশ্রয় দেবে না। গুজরাতে কিন্তু মদপান নিষেধ অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রোহিবিশন। কিন্তু বিদেশ থেকে যে পরিমাণ নামে বেনামে ডলার পাউন্ড আসে এবং স্মাগলিং হয়ে জিনিসপত্র আসে ও যায় তার ফলে পশ্চিমী ভোগ লালসা গুজরাতের সদ্য-ধনীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। তরুণ প্রজন্মের মদপানও প্রায় ঘরে ঘরে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ থেকে ট্রাকে ট্রাকে দেশী ও বিলাতি মদ গুজরাতে ঢোকে এবং যে পরিমাণ উৎকোচ গোটা দেশে ছড়িয়ে যায়, তার অংশভাগ পুলিশ কনস্টেবল থেকে মন্ত্রীসভার সদস্য পর্যন্ত। এক অদ্ভুত বিকলাঙ্গ মৈত্রীতে বাঁধা পড়েছে গুজরাতের প্রশাসনের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ স্মাগলাররা। হিন্দু গুজরাতবাসীরা সাধারণত নিরামিষাশী। তবে বড় রাস্তার দুপাশে অজস্র হোটেল ও রেস্তোরাঁয় মদ ও মাংসের ছড়াছড়ির সঙ্গে কাঁচা মাংসও কম পাওয়া যায় না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাস্তান বাহিনী সময় কাটান। এদের যারা তোলা দেবে, তোলা সংগ্রহ করার যারা সুযোগ দেবে তাদের সেবক ও ভৃত্য হিসাবেই কাজ করে। যারা সম্প্রতি হিন্দি ছবি দেখেন তাঁরা মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে ধনী স্মাগলারদের বাহন মাস্তানদের চরিত্রের কিছু কিছু নিরিখ পেয়ে যান। আমি বিশেষভাবে 'প্রহার' ছবিটির কথা বলছি। এই মাস্তানবাহিনীর পরিপোষক বিজেপি রাজনৈতিক দল। এদের থেকেই তৈরি হয় করসেবক বজরং দলের বাহিনী। মধ্যবিত্ত মুসলিম শিক্ষিত পরিবারগুলির প্রতিবেশী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি, খোজা বাহাই ভোরা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সামর্থে অনেক সময়ই

www.pathagar.com

চোখ টাটায়। সাম্প্রদায়িকতার বিষের সঙ্গে অনুৎপাদিতভাবে কিছু ধান্দায় পেয়ে যাওয়াটাও অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত মহিলা এবং পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছে।

স্কুলে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও আরএসএস পত্রিকা পাঠ, স্যাগলিং-এর সঙ্গে, 'ধান্দায়' অনুৎপাদক কাজে যুক্ত এক সদ্যতন মধ্যশ্রেণী ও তাদের সঙ্গী মাস্তানবাহিনী, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালিত মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং মূল্যবোধহীন বুর্জোয়া সংস্কৃতি—এক হিংস্র হিন্দুত্ব অনুসারী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে বেশ ক-বছর ধরে পরিকল্পনা মাফিক। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং তাদের বাহন 'পরিবার', এই ঘৃণ্য বাতাবরণের পরিপোষক।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিনটি স্তর থাকে। প্রথম স্তরে রাজনৈতিক প্ররোচকরা ধর্মমতে অন্ধ এবং তাৎক্ষণিক লাভ প্রয়াসী মাস্তান ও গুণ্ডাদের কাজে লাগায়। কিন্তু যদি বিস্তৃত জনবাতাবরণ, জনমত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দাঙ্গার বিরোধী না হয় এমনকি সে ক্ষেত্রে জন সমর্থন নিষ্ক্রিয়ভাবেও থাকে তবে মাস্তান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলিশ প্রশাসন যদি ইতিমধ্যে নানাভাবে উদ্বৃত্ত পাবার সুযোগ পেয়ে যায়, তাদের সঙ্গে লুটের সম্পত্তিও ভাগাভাগি করা হয়। আর প্রশাসন যদি দাঙ্গার স্বপক্ষে থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। দাঙ্গাকারী দুর্বৃত্ত-সহায়ক জনমতের অবকাঠামো, প্রশাসন, পুলিশ বা শান্তি রক্ষাকারী এবং মন্ত্রীসভা যদি এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আক্রান্তদের রক্ষা করবে কে ? আর রোটি, বেটি, চটি তিনটির উপরে যদি কব্জা করা যায় তবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের ক্ষমতাও ভেঙে দেয়া সম্ভব। অর্থাৎ রোটি বা অর্থনৈতিক সামর্থ, চটি বা বাসস্থান দুই-ই যদি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া যায় এবং পুরুষ প্রধান সমাজে পরিবারে নারীর শ্লীলতাহানি করা যায় তাহলে জনগোষ্ঠীর শিরদাঁড়া একেবারেই নরম হয়ে যায়, গুজরাতে তো এটাই ঘটেছে। এই দুর্গতি আরো বিষময় করার জন্য গোয়ার একটি প্রকাশ্য জনসভায় তথাকথিত 'নরম' ও 'লিবারেল' দুমুখো প্রধানমন্ত্রী মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়েছেন, মুসলিমরা নাকি সব জায়গাতেই বিরুদ্ধতা পাকিয়ে তোলে। আরএসএস কর্তারা বলেছেন। সংখ্যালঘু মুসলিমদের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের তাঁবে থাকতে হবে, বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে। প্রসঙ্গত, আরও কিছু কথা আছে। সোমনাথ মন্দির সুলতান মামুদ কর্তৃক ভাঙা এবং স্বাধীন ভারতে বল্লভভাই প্যাটেলের নায়কতায় তা পুনর্নির্মাণ, আলাউদ্দিন খলজীর গুজরাটের রাজবধূ কমলাদেবীকে বিবাহ এবং কমলার মেয়ে দেবলাদেবীর সঙ্গে সুলতানের পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ ; প্রসঙ্গচ্যুত করে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ভটভাবে ব্যাখ্যা মারফত জনমনে

www.pathagar.com

মুসলিমদের উপরে ঘৃণার সৃষ্টি, কচ্ছ বা রান সীমান্তের ওপারের পাকিস্তান-কর্তৃক সম্ভাব্য হামলার নিত্য শঙ্কা সৃজন, সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর ও জায়গাগুলি পাক নৌবাহিনীর গোলার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে বলে ভীতি সঞ্চার এবং গুজরাতের অবকাঠামো ও পণ্য যোগান মুসলিমদের হাতে বন্দী রয়েছে বলে—ইত্যাদির দাক্ষিণ্যে বিস্তৃত সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করা গেছে গুজরাতে। অর্থাৎ গুজরাতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা, আশংকা, ভীতি সবকিছু মিলে যে প্যারানইয়া বা সন্দেহ প্রবণতা সৃষ্টি করা হয়েছিল বছরের পর বছর ধরে এবং সাম্প্রদায়িক খুন জখম হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল নিপুণভাবে, তা সবকিছু এক সঙ্গে কার্যকর হয়েছিল ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে। বিজেপি দল ইতিমধ্যেই বিধান সভার হার স্বীকার করেছে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, পাঞ্জাব ও মণিপুরে। গোয়ায় তাদের সরকার ভেঙে গেছে। দিল্লির পুরনিগমে ঘটেছে সর্বাত্মক পরাজয়। সামনে গুজরাটে নির্বাচন। আর এ সময়ে গোধরার ঘটনাকে তুরুপের তাস করেছে বিজেপি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ ফ্যাসিস্ত গোষ্ঠীগুলি।

১৯৩৩ সালে হিটলার যখন জার্মানিতে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল নাৎসি পার্টি নিয়ে বামপন্থী ও নানা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জেতবার উপায় ভেবেছিল সে সংসদ ভবন রাইখস্ট্যাগ পুড়িয়ে দিয়ে। দোষ চাপিয়েছিল কমিউনিস্টদের ঘাড়ে। আক্রমণ নেমে এসেছিল কমিউনিস্টদের উপর কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল রাইখস্ট্যাগ পুড়িয়ে দিয়েছিল হিটলারের দল, নির্বাচনে জিতবার জন্য। আমরা এখনো জানি না গোধরায় রেলের ৬নং বগিদুটিতে আগুন দিয়েছিল কারা। তবে আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি ওই বগি দুটিতে অযোধ্যা থেকে ভ্রমণকারী করসেবকরা ওই গোধরা স্টেশনে এক চা বিক্রেতার উপরে হামলা করে ও তার তরুণী মেয়েটিকে জোর করে গাড়িতে তুলি নিয়ে যায়। তারপর ট্রেনের শিকল টানায় স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে যেখানে আটকে যায় সে অঞ্চলটি ছিল মুসলমান প্রধান এলাকা আর সেখানে ছিল অনেক মোটর গাড়ির গ্যারেজও। সবই কি কাকতালীয় ? গোধরায় কামরায় আগুন লাগলো, বিধান সভায় সেদিন বাজেট পেশ হচ্ছে ; পুলিশ, দমকল, প্রশাসন বেশ ক-ঘন্টা দেখাই গেল না কাছে ভিতে, তারপর সেল ফোন মারফত গুজরাত জুড়ে প্রচার হয়ে গেল ২৮ ফেব্রুয়ারী বন্ধের ডাক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে। ব্যস লেগে গেল। একতরফা আক্রমণকে কেউ দাঙ্গা বলে না। বলে গণহত্যা।

পশ্চিম বঙ্গবাসীদেরও কাছে বিশেষভাবে কিছু বলার আছে। কজন মাস্তান বাসে মেয়েদের নিয়ে ইতরামি করে। যদি কেউ প্রতিবাদ করে তাহলে সে খুন

www.pathagar.com

হয়ে যায়। বাকী যাত্রীরা নির্বাক থাকে। তাহলে তো বলবো যারা নির্বাক ছিল তারাও ইভটিজিং-এর প্রচ্ছন্ন সমর্থক ; এবং আত্মপরায়ণ দুর্জন ও দুষ্কৃতিকারীরা সংখ্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর হলেও, নিশ্চেতন ও নির্বাক পরোক্ষ সংখ্যাগুরু সমর্থকদের বৃহন্নলা-ভূমিকা তখন জনবিরোধী বিষফল ফলাতে থাকে। দাঙ্গা এভাবেই হয়। দাঙ্গাকারীরা যখন হামলা করে, জনগণের মানসিক অবকাঠামোর সহায়তা যদি না পায় তারা দাঙ্গা করতে পারে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও অনেকের মধ্যে মুসলিমদের বিষয়ে প্রচ্ছন্ন সংশয় আছে প্যারানইয়া। আমরা মিটিং মিছিল করি, সে মিটিং মিছিলে মাস্তান বা দুর্বিত্তরা অংশগ্রহণ করে না। আমাদের দাঙ্গা বিরোধী লেখাও তারা পড়ে না। যারা দুর্বৃত্ত নয় কিন্তু মানসিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যারা সেই জনগণ যদি দাঙ্গা বিমুখ না হয় যে কোনো সময়ে আমাদের রাজ্যেও অগ্নুৎপাত হতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন, শাসক দলগুলি এবং বিস্তৃত বুদ্ধিজীবী সমাজ ও শ্রমিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। এটাই কালো মেঘের রূপালি পাড়। পাশের রাষ্ট্রে যখন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া ও রাজ্যের নানান আলাপ-আলোচনায় শুনতে পাওয়া যায়। আমরা তেমনভাবে প্রচার করি না। ঐ বাংলার বুদ্ধিজীবী সংবাদ মাধ্যম ও নারী-শিক্ষক-শ্রমিক সংস্থাগুলির সমর্থক দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ভারতের অখণ্ডতা বিষয়েও। ভারতের পাঞ্জাব-পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু-উত্তর শ্রীলঙ্কা, কাশ্মীর-কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ বিদেশী চক্রান্তে ভাষা ও জাতিসত্তার প্রশ্নে ভারতীয় সংহতি বিরোধী হয়ে পড়তে পারে। বিশেষভাবে যখন বিজেপি নেতারা দেশ বলতে হিন্দুস্তান, জাতি বলতে হিন্দু এবং ভাষা বলতে হিন্দি বুঝাচ্ছে। এবং জাতিসত্তা বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। হিন্দুধর্ম কখনোই জাতিসত্তার অন্যতম উপকরণ নয়, এমনকি নয় ভারতীয়দের কাছে হিন্দী ভাষা।

এই হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থানের সূত্রপাত কিন্তু ১৯২৩-২৪ সাল থেকে। কংগ্রেস যতদিন আবেদন-নিবেদন নিয়ে রাজনীতি করেছে, বিপ্লববাদীরা ছোট ছোট গোষ্ঠী হয়ে গণ-আন্দোলন না করে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছেন, এমনভাবে 'হিন্দু' তত্ত্ব নিয়ে কারো আবির্ভাব হয়নি। ১৯২১ সালের ব্যাপক অসহযোগ এবং হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত খিলাফত আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের বিহ্বল করেছিল। গান্ধীজী কংগ্রেস নেতৃত্বে গরীবগুর্বো সাধারণ চাষাভুষো জনসাধারণকে টেনে এনেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রভৃতি কংগ্রেস ত্যাগ করে লিবারেল দল গড়েছিলেন। আর ১৯২৩ সালে একদা মার্সাই শহরে বৃটিশ জাহাজ থেকে

www.pathagar.com

পলাতক বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে আন্দামান প্রত্যাগত বিনায়ক দামোদর সাভারকর বৃটিশ রাজত্বকেই সমর্থন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর কাছে মুসলমান খৃস্টান ইত্যাদিরা ছিল বিদেশী। দেশবাসী ছিল নিছক হিন্দুরাই। ভারতীয়ত্ব তাঁর মতে ছিল. 'হিন্দু' জাতিসত্তা বিধৃত। অর্থাৎ ভৌগোলিক অঞ্চল হলো হিন্দুস্তান। স্মৃতি-শ্রুতি-ঐতিহ্য ও সমমানস গঠন করেছে শুধু হিন্দুদেরই। তাদের ভাষাও হবার কথা হিন্দি। সাভারকরের কাছে ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব ছিল সমার্থক। বাঙালি, ওড়িয়া, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল ইত্যাদি ভাষা বা জাতিগোষ্ঠী বা 'পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাত-মারাঠা-দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ' সাভারকারের কাছে সত্য ছিল না। বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা অনুসারে ধর্মই ছিল তাঁর কাছে জাতিসত্তার অঙ্গ মধ্যপ্রাচ্যের ঐ দুই সেমেটিক ধর্মমতই তো বিদেশী! ঐ ধর্মমত অনুসারীরাও বিদেশী। সুতরাং সাভারকর তাদের 'হিন্দু' জাতির নির্দেশমাফিক চলবার সুপারিশ করেন। ১৯৪০ সালে সাভারকর আন্দোলন শুরু করে ভারতের রাজনীতি 'হিন্দুবাদী' করতে, এবং হিন্দুত্বকে সমবাদী করে তুলতে। ১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগ লাহোর মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব মাফিক পাকিস্তান দাবী করে। কী সাভারকর কী জিন্নাহ— দুজনেই কিন্তু একমত ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্যের ব্যাপারে। এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।

একদিকে ইংরেজের অনুগ্রহ প্রার্থনা, অন্যদিকে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের ভাবাদর্শ—এই দুই মিলে কেশব হেডগেয়র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তৈরি করেন। এক 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ব্রতে এই গোষ্ঠীর তাত্ত্বিকরা শক্তি বাড়িয়েছেন হিন্দু মহাসভার। গড়েছেন ১৯৫১ সালে জনসংঘ। খুব কৌশল মাফিক কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্র বিদ্বেষ কাজে লাগিয়ে মহাজোটের রাজনীতির অংশীদার হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে, শেষে ওই দলের নানা সহযোগীদের একজালে ধরে এনে ভারতীয় জনতা পার্টি বানিয়েছেন। পার্টি ও তার সহযোগী হিসাবে 'ফ্যাসিস' গোষ্ঠীগুলিকে নানা মতামত প্রকাশ করার বাহন করেছেন। শেষে এক কোয়ালিশন বানিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে দু-এক টুকরো ক্ষমতার ভাগ দিয়ে গোটা দেশ শাসন করেছেন। এবং আইকন বা মৌলবাদী স্মরণ চিহ্ন বা নায়ক তাদের রামচন্দ্র। রামচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজটাই তাঁদের কাছে হিন্দুদের এক একবার পথ। ঐ রামমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে নিযুক্ত করসেবকদের গোধরায় পোড়ানোর নাম করেই গুজরাতে মুসলমানদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া যায়। যেমনটি করতে চান বুশ সাহেব। চায় জায়োনিষ্ট ইহুদী চক্র—। বিশ্বের তেলের ভাণ্ডার দখল করতে ও দখল রাখতে। মার্কিন প্রশাসনের মিত্র শক্তি আজ ভারতের

www.pathagar.com

বিজেপি দল। গুজরাতের দাঙ্গা বা গণহত্যা ঠিক এই নিরিখেই দেখতে হবে। এবং ভারত-পাক যুদ্ধোন্মাদনা এ বিষবৃক্ষের ফল হিসাবেই জানা দরকার। এমন কি সন্ত্রাসকেও দেখতে হবে বহু ক্ষেত্রে রাইখস্ট্যাগ পোড়াবার স্মৃতি মনে করে। কেনইবা মানহাট্টানে একশো এগারোতলা বাণিজ্য কেন্দ্রটি ভেঙে পড়ে, তারপর যেন হাতের পাঁচের মতো মার্কিন দেশের তাঁবে চলে আসে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চল। পশ্চিম বৃটেন সহ ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে যায় মুসলিম সহ এশিয়া-আফ্রিকাবাসীদের পরে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হামলা। শেষে অতি দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্তদের হঠাৎ রমরমা হয় ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে। কেনই বা নানা নামের সন্ত্রাসীরা হামলা করে কাশ্মীরে পণ্ডিতদের উপর ভারতীয় সংসদ ভবনে, কাশ্মীর বিধানসভা গৃহে, সেনা পরিবার অঙ্গনে জম্মুতে। তারপর এক সময় দু সরকার পক্ষেই খুব হুঙ্কার চালাচালি হয়, গোলাগুলি ছোঁড়া হতে থাকে। এক সময় বড়বাবু হোয়াইট হাউসে ইংগিত দেন। দু পক্ষই গোঁসা ঘরে খিল দেয়। ওসামা বিন লাদেন দাড়ি কামিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেশের পর দেশ পশ্চিমী শক্তিদের, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজির কব্জা হতে থাকে। কেন, কেন?

গুজরাটের দাঙ্গা, মনে হয়, ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের দখলদারি হাসিল করার ড্রেস রিহার্সাল। মিথ্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয় তার বিজেপি মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা। যেন এক একজন গোয়েবলস। সম্প্রতি কলকাতায় বরোদার বিজেপি সাংসদ লজ্জার মাথা খেয়ে বলে গেলেন, আমেদাবাদে হিন্দুরাই মরেছে বেশি বেশি।

যেমনটি ছিল ১৯৩৬-৩৮ স্পেনে হিটলার মুসোলিনির গৃহযুদ্ধ বাধালে। ঐ গৃহযুদ্ধে ক্ষমতা দখল করেছিল ফ্যাসিস্তরা। তারপর ১৯৩৯ থেকে মহাযুদ্ধ শুরু করেছিল বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে। ঐ ফ্যাসিস্ত প্রধানরাই। ভারতীয় ফ্যাসিস্তদের ভারত জুড়ে দাঙ্গার বা গণহত্যার ব্লু-প্রিন্ট আগেই ছিঁড়ে ফেলতে হবে আমাদের। মনে রাখতে হবে মার্কিন পরিকল্পনা রয়েছে ঐ হানটিংটনের চিন্তা মাফিক ইসলামী-সভ্যতাকে উৎসাদন করা—। এজন্য মুসলমান নিধনের সম্ভাবনা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তুলতে পারে। জন্ম দিতে পারে অবশ্যই সন্ত্রাসমূলক মৌলবাদ। সংখ্যালঘু ও আক্রান্তর আত্মরক্ষার উপায় হয়ে সন্ত্রাসবাদ বিশ্বযুদ্ধের মহড়াও দেওয়া যায়। আর আধুনিক মারণাস্ত্রের পুরুষ নারী শিশুকে সন্ত্রাসী নাম দিয়ে দুরমুষ করে দিয়ে বিশাল অঞ্চলে সম্পদের মালিকও হওয়া যায়। কী ভয়ানক সম্ভাবনা। নর মাংসাশী পিশাচ পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের রাক্ষসেরা পৃথিবীর উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। গুজরাত তার ইংগিত দিচ্ছে। সাবধান, এখুনি একজোট হতে হবে সব বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, মানবিকতার নানা শক্তিকে, এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

# গুজরাটের আয়নায়

–অশোক দাশগুপ্ত

হাসি নয়, কান্না ও ক্রোধের সময়। তাই রসিকতায় ভরপুর মোদিদের আমরা তারিফ করতে পারছি না। বুধবার রক্তমাখা হাতে মাইক নিয়ে দাঙ্গা দুর্গতদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, মাথায় লাল পাগড়ি, মুখে দু'গাল হাসি। আহমদাবাদে শান্তি মিছিল করে এলেন জর্জ ফার্নান্ডেজ, সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। শান্তি মিছিলের সহ-নেতৃত্বে ঘাতক দলের সরদার। এবং জর্জ ফার্নান্ডেজ, যিনি এরপরই লোকসভায় গিয়ে বলবেন, কী এমন হয়েছে যে এত চিৎকার করছে বিরোধীরা, দেশে কি দাঙ্গা এই প্রথম হলো, সন্তানসম্ভবা মহিলার পেট চিরে তলোয়ারের ডগায় শিশু নাচানো কি এই প্রথম হলো ? বলা যায় না, প্রতিরক্ষায় বিপুল ঘুষের অভিযোগের জবাবে জর্জবাবু এবার হয়ত বলবেন, এত চিৎকারের কী আছে, দেশে কি কেলেঙ্কারি এই প্রথম হল ? অস্ত্র কেনাকাটায় ঘুষ কি এই প্রথম নেয়া হল ? রসিকতার সাথে চমৎকার পাল্লা দিয়েছে এদের ঘাতক বাহিনী। 'শান্তি মিছিল' যেখান থেকে শুরু, ঠিক সেখানেই সেই রাতেই আবার হিংস্র হামলা। রসিকতা আরও ঃ গুজরাটে শান্তি ফেরাতে গুরত্বপূর্ণ বৈঠক হবে গান্ধীনগরে, পথ বাতলাবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের নেতারা !

আরও অনেক কিছু দেখিয়ে দিল গুজরাট। টেলিভিশনে দেখছি, গুজরাটের বড় শিল্পপতিরা, দেশের বড় শিল্পপতিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বলছেন, এ রকম চললে ব্যবসায় মন্দা আসতে বাধ্য। সত্য। কিন্তু আরও সত্য এই যে, এঁরা স্রেফ ব্যবসায় ক্ষতির কথাই ভাবছেন, বলছেন। একবারও বলছেন না (ব্যতিক্রম অনু আগা) যে এত মানুষের এমন মৃত্যু দুঃখজনক। ব্যবসা, ব্যবসা, ব্যবসা, টাকা, টাকা, টাকা, এক ফোঁটা চোখের জল নেই। এবং বাজপেয়ীর মুখোশ। গোবিন্দাচার্য বলেছিলেন, আসল নেতা আদভানি, বাজপেয়ী তো বিজেপি-র মুখোশ। নরম মুখ। বিরোধীরা বলছেন, গোয়ার বক্তৃতায় মুখোশটা খসে পড়েছে। অসুবিধে নেই, আবার পরে নিলেই হল। সম্ভবত, বাজপেয়ীর দুটো মুখোশ। একটি কাজে লাগান নরমপন্থী ভাবমূর্তি ধরে রাখতে, জোট সরকার ধরে রাখতে। দ্বিতীয়টি গরমপন্থী, সাম্প্রদায়িক দলে নিজের নেতৃত্ব ও অস্তিত্ব ধরে রাখতে। এই দুই মুখোশের আড়ালে থেকে যায় আসল মুখ, যা আসলে নরম বা গরম কোনও পন্থারই অনুসারী নয়। সে মুখ এক ভণ্ডের, এক প্রতারকের, এক সুযোগ সন্ধানীর। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী

www.pathagar.com

প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি এক নীতিহীন রাজনীতিক, যিনি কোনওভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নন। কে জানে, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব দেখেই মমতা ব্যানার্জি মুগ্ধ কি না। কে জানে, বাজপেয়ীর গুণমুগ্ধ হওয়ার জন্যও একটা মুখোশ দরকার হচ্ছে কি না।

শরিক দলগুলোকে রীতিমত চাবকে দিয়ে দলের উগ্র অংশকে সন্তুষ্ট রেখেছে বিজেপি। লোকসভায় গুজরাট বিতর্কে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে উমা ভারতীকে, যাঁর বক্তৃতা শুনে চন্দ্রশেখর বলেছেন, মনে হচ্ছিল কোন নাৎসি কর্মীর কথা শুনছি। এগিয়ে দেওয়া হয়েছে জর্জ ফার্নান্ডেজকে, যাঁর হৃদয়হীন কুৎসিত ভাষণের জন্য মৃদু দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে আদভানিকে ! রাজ্যসভায় কংগ্রেসের একটি দাবিকে তা-ও মেনে নিয়েছে বিজেপি, শরিকদের কোনও দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বক্তব্য স্পষ্ট ঃ আমরা যা আমরা তা-ই, তোমরা নিজেদের স্বার্থে যতদিন থাকার থাকবে। মায়াবতী আছেন, জয়ললিতা আছেন, স্বার্থের কারবারিদের আমরা দরকারমতো পেয়ে যাব। ভোটের স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে দু-চার কথা বলতে চাও বলো, আমাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রথ চলতেই থাকবে। শরিকদের অতি চালাকির গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়েছে বিজেপি।

রক্তাক্ত গুজরাট শিক্ষা দিচ্ছে, এবার আমাদের সব প্রশ্নেরই মুখোমুখি হতে হবে এবং স্পষ্ট সমাধান খুঁজতে হবে। যাঁরা সংঘ পরিবারের খুনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের সামনে একটা প্রশ্ন ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা গোধরা-দুষ্কাণ্ড সম্পর্কে কী বলছেন ? স্পষ্ট জবাব, তীব্রতম ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং তারপর বক্তব্য স্পষ্টতর করে দিতে হবে। গোটা ফেব্রুয়ারী মাস জুড়েই অসভ্য করসেবকরা যাতায়াত করছিল সাবরমতী এক্সপ্রেস-এ। ট্রেনে মুসলিম যাত্রীদের পেলেই ওরা উত্যক্ত করছিল। জঘন্য ভাষা ব্যবহার করছিল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জুলুম করা হচ্ছিল—বল, জয় শ্রীরাম! গোধরা স্টেশনে গরিব মুসলমান চা-ওয়ালাকে দাম না মিটিয়ে গালিগালাজ করা হচ্ছিল। এদিক-ওদিক মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণও চলছিল। অন্যায়। ট্রেনে আগুন লাগিয়ে গণহত্যা আরও বড় অন্যায়। করসেবকরা ট্রেনেই রান্নাবান্না চালাচ্ছিল, প্রচুর গ্যাসস্টোভ ছিল কামরায়, আগুন বেশি বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। যারা আগুন লাগিয়েছে, তারা প্ররোচক করসেবকদের চেয়েও বড় অন্যায় করেছে। এদের মধ্যে কতজন সংগঠিত, মৌলবাদী, কতজন প্ররোচনার ফাঁদে পা-দেয়া সাধারণ মানুষ, আমরা জানি না। ওরা সবাই জঘন্য অপরাধ করেছে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় সূত্রের উল্লেখ করে আমরা গোধরা-দুষ্কাণ্ডের অপরাধীদের রেহাই দেব না। ওদের কঠোরতম

www.pathagar.com

শাস্তি হোক। প্রথমেই আইএসআই-য়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়া চলবে না। প্রত্যক্ষ অপরাধীদের শাস্তির পাশাপাশি দেখতে হবে, পরোক্ষ মদতদাতা আছে কিনা, থাকলে কারা। বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত চাই। করসেবকদের প্ররোচনামূলক আচরণ নিন্দনীয়। গোধরা-দুষ্কাণ্ড তার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দনীয়। এবং তার পরের ঘটনা শতগুণ নিন্দনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে নিউটনীয় সূত্রের সম্পর্ক আমরা মানব না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনার মধ্যেও নয়। অনেক বেশি নিন্দনীয় শুধু এ কারণে নয় যে, সংঘ পরিবারের খুনিদের হাতে বহুগুণ বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এজন্যও যে গণহত্যা ঘটেছে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট প্রশ্রয়ে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রও অবান্তর, কারণ এ গণহত্যার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে অনেক দিন ধরে, গোধরা-দুষ্কাণ্ডের অনেক আগে থেকেই। এবং এখানে আমরা বলে নিতে চাইব যে, গোধরা-দুষ্কাণ্ডের পরই ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর ধিক্কার তীব্রতর হওয়া উচিত ছিল। নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু নিন্দার ভাষা আরও তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত ছিল। উচিত কাজটা দ্রুততার সাথে করতে না পারলে অনুচিত কাজকেই মদত দেয়া হয়।

অযোধ্যাতেই বুঝা গেছে, গুজরাটে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। সংঘ পরিবারের সেনাপতিরা ও সৈনিকরা স্রেফ ধর্মীয় মৌলবাদী নয়, রীতিমত ভোগবাদী। ধর্মের নামে ওরা শুধু সংখ্যালঘুদের হত্যা করেনি, অবাধ লুটতরাজ করেছে, ধর্ষণ করেছে। কোনও ঝুঁকি নেই, সরকার মদতদাতা। রামচন্দ্র পরমহংসের এক ট্যাকে টাকা, আরেক ট্যাকে সেলফোন। বাতানুকুল গাড়িতে ঘোরাফেরা। ফল ও দুধে ভরা জীবন। গুজরাটের গণহত্যাকারীদেরও দেদার মজা। আগুন লাগাও, মানুষ মারো, 'জয় শ্রীরাম' হাঁকো, সঙ্গে ইচ্ছেমত লুট করো, ধর্ষণ করো। দাঙ্গাবাজির সাথে ভাল চাকরির আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধে, 'পার্কস'। ভোগবাদী সমাজ একদল আশ্চর্য ধর্মীয় গুণ্ডাকে সামনে এনে দিয়েছে, অপরাধ করতে গিয়ে যাদের কোনও ঝুঁকি নেই, লোটার জন্য রয়েছে অফুরন্ত মজা।

গুজরাটের ঘটনার পর সংখ্যালঘু মানুষের মন বিধ্বস্ত। তাঁদের সামনে এখন তিনটি পথ। এক. সংঘ পরিবারের কাছে আত্মসমর্পণ। কেউ যখন বাঁচাতেই পারছে না, ঘাতকদেরই পা ধরতে হবে। বলতে হবে, আমরা মাথা নিচু করেই থাকব, তোমাদের অসভ্যতা সহ্য করেই থাকব, তোমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেব না, শুধু আমাদের বাঁচতে দাও। দুই. রক্ষণাত্মক হয়ে আর লাভ নেই, মরতেই যখন হবে, মেরে মরব। লাদেনরা যদি আমেরিকাকে

www.pathagar.com

চমকে দিতে পারে, আমরা কেন ভারত রাষ্ট্রকে বিব্রত করতে পারব না ? এসো, আমরা এবার দলে দলে নাম লেখাই মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে। তিন. ভারতবর্ষ আমার দেশ, এখানে আমি সসম্মানে থাকব। ধর্ম বড় কথা নয়, সম্প্রদায় বড় কথা নয়, ভাল মানুষদের সাথে জোট বেঁধে থাকবো। গুণ্ডা সংঘ পরিবারের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করবো না, মুসলিম মৌলবাদি শক্তির খেলার পুতুলও আমরা হব না, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পতাকা প্রাণপণে বহন করবো। গুজরাটের দাঙ্গার ডাকে তো অবশিষ্ট ভারত সাড়া দেয়নি। আমরা সেই ভারতকে দেখব এবং গুজরাটকেও সেই পথে আনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মিছিলে পথ হাঁটব। প্রথম সম্ভাবনাটি ক্ষীণ, কিন্তু অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি মারাত্মক, কিন্তু অসম্ভব নয়। তৃতীয় পথ বাঁচার পথ। এ ই বাঁচার পথে বিধৃস্ত সংখ্যালঘু মানুষকে আনা যায়, যদি আমরা বিবেচক হই, যদি আমরা সহৃদয় হই, যদি আমরা মানুষ হই।

অপ্রিয় কথাও বলতে হবে, যদি তা সত্য হয়। গোধরা-দুষ্কাণ্ডের অপরাধীদের তীব্রতম ধিক্কার জানাতে হবে। সংঘ পরিবারের খুনিদের বিরুদ্ধে পাল্টা মৌলবাদী শক্তি যেখানে মাথাচাড়া দিতে চাইবে, সরাসরি বিরোধিতা করতে হবে। আরো বলতে হবে, সব ধর্মের মানুষকেই বলতে হবে, ধর্মকে বর্জন যদি না-ও করতে পারেন, ঘরের মধ্যে রাখুন। সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত জায়গায় রাখুন। বৃহত্তর জনজীবনে আনা চলবে না। রাজনীতিতে আনা চলবে না। জনগণই সর্বোচ্চ শক্তি, কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিত্ব তো রাজনৈতিক দলগুলোই প্রধানত করে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করতে হবে আমাদের, যাতে দলগত স্বার্থে কোন ধরনের ধর্মীয় সুড়সুড়ি না দেয়া হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মকে অপ্রধান করে দিতে হবে। কোন রামচন্দ্র পরমহংসের নয়, কোন শাহী ইমামের নয়, আমরা চলব আমাদের বিবেকের নির্দেশে। সব ধর্মের ব্যবসায়ীদেরই আমরা বর্জন করব। এবং আমরা বাংলার কথায় আসব। গুজরাটকে পাল্টাতে পারব কি না জানি না, বাংলাকে পাল্টাতে দেব না। আমরা দেওয়াল তুলব। সেই সম্প্রীতির ও বিশ্বাসের দেওয়াল চূর্ণ তো হতে দেবই না, ক্ষুদ্র ছিদ্র করার চেষ্টা দেখলেই বাধা দেব। প্রথমত আমরা বাংলাকে বাংলা রাখব। দ্বিতীয়ত আমরা গোটা ভারতবর্ষকে বলবো, এ রকম থাকতে হয়।

❐

www.pathagar.com

# গুজরাত হিংসা ঃ মেয়েদের দৃষ্টিকোণ

পিইউসিএল ভদোদরা এবং শান্তি-অভিযান এর পক্ষে সংকলিত

(২৭ ফেব্রুয়ারী-২৬ মার্চ, ২০০২, ভদোদরা)

## ভূমিকা

গোধরা-ঘটনার পরবর্তীকালীন সাম্প্রদায়িক হিংসার ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এই লেখা। প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে আক্রান্ত বস্তি ও জামাত পরিচালিত ক্যাম্পগুলিতে বারংবার সরেজমিন পরিদর্শন এবং সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা মহিলাদের একটি বৃহৎ অংশের সাথে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে।

যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, গোধরা-পরবর্তী গণহত্যায় ভদোদরার অধিবাসী অধিকাংশ মহিলার জীবনই কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের জীবন বদলে গেছে আমূল। তাছাড়া সব সম্প্রদায়ের মহিলারাই পুলিশ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব সন্ত্রাস ও তদ্বজনিত ভীতির শিকার। 'ওরা' হামলা করবে—হিন্দু মহিলাদের এই আশংকা একটা মনস্তাত্ত্বিক সংকটের রূপ নিয়েছে। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পুস্তিকা আর প্রচারপত্রের মধ্য দিয়ে যেভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছে, এ বিষয়ে তারও একটা বড়ো ভূমিকা আছে। দরিদ্র, শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সংখ্যালঘু পরিবারগুলিতে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ; অন্নাভাব পৌঁছেছে চরমে কেননা পুরুষরাও কাজে বেরতে পারছেন না। পাশাপাশি বাস করা প্রতিবেশী আর 'চোখের সামনে বড়ো হওয়া' (অথবা আমার 'অংগন মে ...') ছেলেদের প্রতি একটা তীব্র বিশ্বাসভঙ্গের অনুভব ছড়িয়ে আছে সব শ্রেণীর মধ্যেই।

এ অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃতিক পরিস্থিতি অবশ্য বহু বহু মহিলার ভেতরে এনে দিয়েছে নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা। নোরবানু, জাহানারা, সামিদা, নাজমা, রাঈসা, লক্ষ্মীবেন এবং আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাঁরা প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে, প্রবল ব্যক্তিগত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, শহরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিপজ্জনক অঞ্চলগুলোতে নিজেদের প্রতিবেশীদের, নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষদের বা অন্যদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং শরণার্থী পরিবারগুলির মধ্যে ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন মেয়েরা। আক্রান্ত

www.pathagar.com

মহিলারা অন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের ওপর এবং তাঁদের গ্রেফতার হওয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের ওপর, পুলিশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গঠনে।

সাম্প্রতিক এই ঘটনা বহু নারীর মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক সত্তার জন্ম দিয়েছে। মহিলাদের একটি গোষ্ঠী প্রায় সিদ্ধান্তই নিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের প্রযোজনায় যে নরহত্যা তাঁরা ঘটতে দেখেছেন, সে বিষয়ে তাঁরা মুখ খুলবেন। অন্যদিকে আরেকটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আরো মৌলবাদী ও দক্ষিণপন্থী লক্ষণও আমরা দেখেছি—শিলাদান অনুষ্ঠানের পর শহরের ৪২টি মন্দিরের উৎসব পালনের যে ছবি স্থানীয় সংবাদ চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে তাতে হিন্দু মহিলাদের উন্মত্ত নৃত্যের ছবি ধরা আছে!

বর্তমান প্রতিবেদনটি 'পিইউসিএল-ভদোদরা শান্তি'র পক্ষে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানী দলগুলো কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মহিলাদের কাছ থেকে সংগৃহীত। তাঁদের নিজস্ব সাক্ষের আধারে রচিত। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের পর আমরা যে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম, নিম্নলিখিত অংশগুলি তার থেকেই তুলে আনা হয়েছে। এই মহিলারা নিজেরাই যেসব দাবীর কথা তুলেছেন, তা একেবারে শেষে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাক্ষ্যের বেশ কিছু অংশ মোটা হরফে দেওয়া আছে, সেগুলো আমাদের চোখে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

❐

www.pathagar.com

# ঘটনা ও অভিজ্ঞতা

## ক. হাজিমিঞা কি সারা, বারানপুরা

## (ফেব্রুয়ারী ২৭ মার্চ, ২২, ২০০২)

### পটভূমি

বারানপুরা অঞ্চলটি বরোদা শহরের দক্ষিণপূর্ব অংশে, ন্যায় মন্দিরের থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে, সন্ত কবীর রোড আর বারানপুরা মেন রোডের মাঝামাঝি। সাক্ষাৎকারদাতা কোন কোন অধিবাসীর মতে হাজি মিঞা কি সারা, প্রায় ১৫০-২০০ বছরের পুরনো। এখানে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ যেমন আছে, তেমনি কাজীর আদালতের বহু দুর্লভ নথিও রয়েছে। এ অঞ্চলের ইতিহাস আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পাশে চম্পাগলির কোণে এখানে একটি পুরনো রামমন্দির দেখা যায়।

গুজরাতী হিন্দু ও মারাঠী অধ্যুষিত অঞ্চলটিতে মুসলিম পরিবারের অনুপাত শতকরা ১৫ ভাগ। হিন্দুদের মধ্যে আছে পাটনি, পাখালি, ছোবদার ও মাছি। মারাঠী ব্রাহ্মণরা মূলত একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী। যারা সব রকম ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চায়। অন্যান্য মারাঠীদের মধ্যে আছে রিকশাওয়ালা, গৃহভৃত্য এবং নার্স। গুজরাতী পাটনিরা ট্রাক ও টেম্পোর চালকের কাজ করেন, মহিলারা গৃহকর্মী। মাছি রাজপুত মহিলারা অবশ্য সংসার চালানোর স্বার্থে দিনমজুরির কাজে বের হন।

মুসলিম বাড়ীগুলো দুটি অংশে অবস্থিত, একটি ছোবদার ফলিয়া সন্ত কবীর রোডের উপর, কামবালা হলের পিছনে। অন্যটি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন গোটা বারো দোকানকে ঘিরে। ১৫ মার্চ বারানপুরায় পুলিশ চৌকি ছিল দুটি, একটি ছোবদার ফলিয়ার কাছে, অন্যটি মসজিদের কাছে।

### ঘটনা

২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ২২ মার্চের মধ্যে ৩৯টি মুসলিম গৃহ ও ১৯টি দোকান লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি দরগা। পাঁচ-ছটি বাড়ী হিন্দুদের ইমারতের কাছাকাছি থাকার সুবাদে বেঁচে যায়। গৃহহীন হন প্রায় ৭০০ মানুষ।

হামলাকারী জনতার পাথর ছোঁড়ার পর্ব ২২ মার্চও চলেছিল যখন লুণ্ঠিত গৃহগুলোর ১০জন বাসিন্দাদের একটি গোষ্ঠী তাঁদের পাঁচনামা রেকর্ড

www.pathagar.com

করানোর জন্য পুলিশ প্রহরাসমেত নিজেদের বাড়ীতে পা দেন। দুটি পুলিশ চৌকি থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে সনাক্ত করে, ৮ মার্চ পুলিশ কমিশানরের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এখনো পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নীমা আহমেদ গুলাম কুওয়াওয়ালার পরিবারই ছিল সর্বশেষ যারা ওই অঞ্চল ত্যাগ করে। ১ মার্চ রাত ২টা নাগাদ কয়লার গুদামের মালিক এ পরিবারটি মাদার মার্কেটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। ২ মার্চ, আরেকজন অধিবাসী, সাজিদা বানু, শুনতে পান যে তাঁর বাবার বাড়িটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ওইদিন বিকেলে যখন তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে ওই অঞ্চলে ফিরে আসেন, তিনি দেখেন যে ঈশ্বর মাছি, সোনি ভূরিয়া, ডাঃ ঠাকুর প্যাটেল এবং বিমল ঠাকুর মিলে তাঁর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।

৪ মার্চ, কার্ফু উঠে যায়। সাজিদা, আরিফ (নীমার ভাই) এবং আরো কয়েকজন ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে বারানপুরায় ফিরে আসেন। আরিফ দেখেন, তাঁর বাড়ী থেকে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দমকল এসে আগুন নিবিয়ে ফেলে। কয়লার গুদামের পাশে মসজিদের নিচের ১৭টি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে, লুট করে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দোকানগুলি ছিল পুলিশ চৌকির ঠিক পিছনেই। ২২ মার্চ আট-দশটি পরিবারের প্রতিনিধি জনাদশেক মানুষ, ৩জন পুলিশ এবং একজন লেখক পাঁচনামার জন্য যেতে গেলে ৫০০ জনের একটি শক্তিশালী দল তাঁদের আক্রমণ করে। তাঁরা বিভিন্ন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পালিয়ে যান। তাঁদের একটি স্কুটার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন বাধা দেয়নি। হামলা হবার সম্ভাবনা আছে খবর পেয়ে সাজিদা তাঁর পরিবারের লোকজনদের সাবধান করে দিতে এসেছিলেন। তিনি নিজেই তলোয়ারধারী মজিরা ছোবদারের হাতে আক্রান্ত হন। অনেক কষ্টে, পুলিশের সঙ্গে বহু অনুনয়ের পর ওই স্থান ত্যাগ করে ফিরে আসতে সক্ষম হন। তিনটি বাড়ীর পাঁচনামা এখনো অসম্পূর্ণ ; কেননা হামলাকারীরা এসে পড়ায় তাঁরা পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

## সাক্ষ্য

### নীমা আহমেদ গুলাম কুওয়াওয়ালা ঃ
### (বারানপুরের অধিবাসী)

২৮ ফেব্রুয়ারী, যখন সব হামলা চলছিল, হামলাবাজরা "হায়রে মিঞা, হায় হায়" বলে চেঁচাচ্ছিল আর পাথর ছুঁড়ছিল। পুলিশ এলে থামছিল, তারপর শুরু হচ্ছিল আবার। এরা আমাদের এলাকারই লোক। আমরা

www.pathagar.com

কয়েকটা ছেলেকে ডেকে তাদের থামতে বললাম, নয়তো পুলিশে খবর দেব বললাম। ওরা এসে বলল, "আমাদের সবার নাম বল না। আমরা বলে দেব, কাদের নাম দিতে হবে। তোমরা আমাদের পরিবারের মতো, তোমাদের কিছু করব না। যদি চাও আমাদের বাড়ীতে এসে থাকতে পার।" আমরা আশ্বস্ত হলাম এবং বাড়ীর ভেতরই থাকলাম। এমনকি সেদিন রাতেও আমরা তেমন উদ্বিগ্ন হইনি।

পরদিন সকালে, আমরা একটা সবজিওয়ালাকে ডাকি, কারণ ঘরে কিছু ছিল না। কিন্তু ওই লোকগুলো তাকে আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না, শাসায়। আমাদের বাড়ীর ঠিক ডান পাশেই পুলিশ চৌকি। সেদিন ছিল শুক্রবার, বিকেলে আমাদের নামায। যখন নামায চলছে, তখন ওই দলটা আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা বেকারিতে আগুন লাগায়। পুলিশ আমাদের একথা জানায়। পুলিশের কথায়, যখন তারা ওদের আটকাতে চেষ্টা করে, ওরা পুলিশকেও আক্রমণ করে এবং কয়েকজন পুলিশ আহতও হয়। তারপর, ওই এলাকা থেকে পুলিশকে বের করে দেওয়া হয়। ওই দলটা তখন অ্যাসিড, পেট্রল, ট্রাকের টায়ার আর মশাল হাতে বেকারির মধ্যে ঢুকে গোটা চত্বরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এরপর এই এলাকা এবং এলাকার বাইরের লোক মিলে একটি দল আরেকটি বেকারির মধ্যে ঢোকে, যার মালিক ছিল আমাদের বন্ধু। আমাদের কয়লার গুদামটাও ওখানে। ওরা ওটা জ্বালাতে চেয়েছিল। আমাদের গুদামটার পিছন দিকটা পুরনো। সামনের দিকটা নতুন। এ অংশটা টিনের পাত দিয়ে তৈরি, খুব শক্ত। সামনে থেকে ভাঙা যায় না। ওখানে ঢোকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাশের গুদামটা দিয়ে ঢোকা, চন্দ্রকান্ত পাটনি যার মালিক। পেছন দিকে ওদের একটা বাগান আছে। লোকগুলো ওইখানে ঢুকে আমাদের গুদামে পেট্রল আর এ্যাসিডের বোতল ছুঁড়তে থাকে। গুদামের পেছনেই আমাদের বাড়ীর পুরনো অঞ্চলটা। ওটা কাঠের, আর খুবই পুরনো। আমরা বাড়ীর সামনের দিকটাই নতুন করে বানিয়েছিলাম। পিছনটা যেমন তেমনই ছিল।

যখন ওরা গুদামে আগুন জ্বালল, অ্যাসিড, পেট্রল আর কাঠ থাকায় আগুন ধরে গেল সহজেই। আমরা আগুন নেভাতে গেলে ওরা আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল, যেতে দিল না আমাদের। ওরা সর্বক্ষণ গালাগালি করছিল, কিছু করা খুব কঠিন ছিল আমাদের পক্ষে। সুতরাং কয়লা গুদাম আর বাড়ী, দুটোতেই আগুন ধরে গেল, পুড়ে গেল সবটা। এখন আমাদের আর কিছু নেই। সব ছিল আমাদের। টিভি, ফ্রীজ, কমপিউটার। এখন আর কিছু নেই।

www.pathagar.com

ওই দলটা থেকে আমাদের বাবাকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছিল। ওরা বলছিল, "যখন পুলিশ নিতে এসেছিল, তখন তুমি যাওনি। এখন বসে বসে তোমার ঘরবাড়ী জ্বলতে দেখ। তারপর তোমাকে মারবো।" বাবা বলেছিলেন, "আমি এমনিতেই শেষ হয়ে গেছি। বেঁচে থাকার জন্য আর কিই বা পড়ে আছে ? তোমরা আমায় মারতে পার।"

আমরা পুলিশ আর দমকলকে অনুরোধ করছিলাম আমাদের বাঁচাতে। কিন্তু তারা কোন সাহায্য করেনি। নামাযের পর, আমি দমকল স্টেশনে অনবরত ফোন করে গেছি। কেউ আসেনি। ওরা প্রত্যেকবার ফোনটা অফ করে দিচ্ছিল। দমকল স্টেশনে যে লোকটির সাথে আমরা কথা বলছিলাম, তার নাম প্রফুল ভাই। দমকল আসছিল না, পরে ওখান থেকে একজন আমাদের বলে যে, ওয়াড়ি থানার ইন্সপেক্টর ওদের ঢুকতে দেয়নি। রাত সাড়ে ৯টার পর আমরা যখন বেরিয়ে পড়েছি তখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি। পরের শুক্রবার (৪ মার্চ, যখন কার্ফু উঠে যায়) আমরা আবার যখন ওখানে যাই, আগুন জ্বলছিল তখনো। আমরা দমকল ডাকি, তখন দুটো গাড়ি এসে আগুন নেবায়। তারও পরের শুক্রবার আবার যখন যাই, তখন দেখি যে, যেখানে আমাদের তোষক-গদিগুলো থাকতো, সেখানটা তখনো জ্বলছে। সুতরাং আমরা আবার দমকলে খবর দিই। ১৯৬৯-এর দাঙ্গার পর থেকে আমাদের বাড়ীর কাছেই পুলিশ চৌকি। সেদিন ওখানে এসআরপি-র লোক যারা ছিল, এসকে পাণ্ডে তাদের একজন। ওয়াড়ি থানা থেকে যে ইন্সপেক্টররা আসে, তারা শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আর কাঁদানে গ্যাস দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে রাত সাড়ে নটার সময় তারা আমাদের পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং মাদার গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

আমাদের বাড়ী আর দোকানগুলো অবশ্য সবই সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত আর ভস্মীভূত। হামলা হয়েছে তিনটি পর্যায়ে। আমাদের একটা সাইকেলের আর দুটো ছিট কাপড়ের দোকান ছিল। সবগুলোর দরজা ভেঙে মালপত্র লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিরাট যৌথ পরিবার। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কেউ আহত হয়নি। আমার মা আর বাবার চুল পুড়ে গিয়েছে, অন্য কোনো আঘাত লাগেনি।

আমার ভাইকে অবশ্য মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছিল। সেদিন গুজরাত বন্ধ ছিল। আমার ভাই যখন নামাযের জন্য যাচ্ছিল, তখন ওর তিন বন্ধু—বিজয়, আখতার আর দীপক সোনিকে ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে দেখে যে, ও যখন ফিরবে তখন ওরা ওকে খতম করে দেবে। বিজয় অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দীপকও ছিল। আমরা শুনতে পেয়ে, চারজনে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

অপেক্ষা করছিলাম। ভাইকে হাঁক দেব বলে—দুজন জানালায়, দুজন সিঁড়িতে। তবে ভাই পুলিশ নিয়েই এসেছিল, ওরা কিছু করতে পারেনি। ওরা তিনজনই আমার ভাই-এর বন্ধু ছিল আর তিনজনেই ২৬ জানুয়ারীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল!

## সাজিদা বানো ঃ
## (বারানপুরের অধিবাসী)

আমার নাম সাজিদা বানো জাকির হুসেন শেখ, বয়স বত্রিশ্ বছর। আমি একটা সেলাই ক্লাস চালাই। আমার ঠিকানা, হাজিমিঞা কামুওয়াড়া হলের পেছনে, বারানপুরা। এখন আমি কুরেশি মহল্লায় আছি।

ঘটনাটা ঘটে ২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা দেড়টার সময়। আমি গত দশ বছর ধরে বারানপুরায় আছি। ২৭শে যখন গোধরার ব্যাপারটা ঘটল, মহল্লার রিকশাওয়ালারা আমাদের বলছিল কি হয়েছে। ওরা বলেছিল "গর্মাগর্মী" আছে (বাতাসে/বারানপুরায়/বরোদায়), বারানপুরাতে যে কোন সময় হতে পারে।

২৭শে রাত্রে গণ্ডগোল হয়েছিল। পুলিশ কোন সাহায্য করেনি। এখানে ৩০টা মুসলমান পরিবার আছে, আশেপাশের বাড়ীগুলো হিন্দুদের। আঠাশে, সকাল সাড়ে এগারোটায় মঞ্জুলা খুচাচাঁদ হাইস্কুল থেকে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। গুলিও একবার। সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ সব হিন্দুরা (প্রায় ২০০০ লোক) এলাকাটা ঘিরে ফেলে। পুলিশও তাদের সঙ্গে ছিল। আশেপাশের মহল্লার লোক মিলেই দলটা তৈরি হয়েছিল। ওরা আমাদের ভাষায় (?) স্লোগান দিচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান পুরুষেরা বুঝতে পেরেছিল। এরা আমাদের লোক নয়। দু-চারবার হাওয়ায় গুলি চলে। বাইরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। জিইবি-এর লোকেরা নিজেরাই রাস্তার আলো নিভিয়ে দেয়। যে এটা করেছে, আমি জানি তাকে, আমরা একটা অভিযোগও দায়ের করেছি। সন্ধেবেলা আত্মীয়স্বজন আর বাচ্চাদের অন্যান্য আত্মীয়দের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হতে থাকে আর ভোর পাঁচটার সময় লোকজন নিজেরাও এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

আঠাশে, দুপুর দেড়টার পর, লুটতরাজ শুরু হয়েই গিয়েছিল। গোটা মহল্লাটা লুট হয়। তিনটে বাড়ীতে বিয়ের ব্যাপার ছিল। ফলে সেখানে খাবারদাবার, সোনা আর জামাকাপড় ছিল। সেগুলোও লুট হয়। এই

www.pathagar.com

বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটায় ১৫-২০জন করে মানুষ থাকে। এ রকম ব্যাপার আগেও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা, মহল্লা ছেড়ে চলে যেতে পারি। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকার কথা ভাবতে হবে কেননা এতবড় আকারে লুটতরাজ হয়েছে! এসব যখন হল, শুধু একজন মহিলাই আরো তিন দিন বারানপুরায় রয়ে গেছিলেন, এখন মাছিপীঠ-এ আছেন।

২ মার্চ, আমরা যখন আত্মীয়দের বাড়ীতে ছিলাম, ঈশ্বর ভাই-এর ছেলে আমাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়, আমি দেখেছি। ২৮শেও ওরা আগুন ধরাবার চেষ্টা করেছিল। না পেরে ফিরে যায়। এখন যখন আমরা ফিরে যাই, এক দঙ্গল লোক আমাদের মারবে বলে তাড়া করে। ২২শে আমরা যখন DCP লোকদের সঙ্গে করে পাঁচনামার জন্য গিয়েছিলাম, দু-তিনটে বাড়ী ছাড়া অন্য সকলে পাঁচনামা করায়। তারপর ৫০০ জনের একটা দল ওদের মারতে আসে। আমি যখন সেটা জানতে পারি, আমি গিয়ে ওদের সাবধান করে বলি যে চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। ওদের সঙ্গে পুলিশ ছিল। ওখানে একটা পুলিশ চৌকিও ছিল, তৎসত্ত্বেও পুলিশ কিছু করেনি। থামায়নি পর্যন্ত। যে লোকগুলো আমাদের মারতে এসেছিল, ওরা এসেছিল পাশে ফলিয়া থেকে। আমি চিনি ওদের। ওরা মাছি ফলিয়া থেকে এসেছিল, সন্ত কবীর কামুওয়াড়া হলের পেছনে। (১) ভায়া (মাছি), (২) ভুরিও (সোনি), (৩) মোছি, (৪) রমেশ, (৫) ডাঃ ঠাকুরের ছেলে, (৬) হার্দিক আর বিমল এবং (৭) মানিও। ও ছোবদার ফলিয়ায় থাকে। বাবার নাম রঞ্জিৎ। এ ঘটনাটা ঘটে ২ মার্চ।

বারানপুরা মন্দিরের পেছনে, একজন মারাঠীর এক ছোট ভাই আমাকে আক্রমণ করেছিল, আমি বেঁচে যাই। আমি গেন্টিগেট থানায় গিয়েছিলাম পুলিশের সাহায্য চাইতে। ওরা আমায় বলে, সামনে লোক (পুলিশ) আছে, ওখানে যাও। যখন গেলাম, সেখানে কোনো পুলিশ ছিল না। সুন্দর পানওয়ালার সামনে একটা চৌকি আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা নজর রাখছিল। প্রত্যেকে (?) নলবুন্দালার দুই ছেলেকে আক্রমণ করে। চৌকির পুলিশরা উর্দিতে ছিল না। ওরা ভেবেছিল, এখানে কেউ আসবে না।

এ রকম কতবার হয়েছে। ১৯৬৯ আর ৯২তে যখন ওরা শুধু দরজায় আগুন লাগায়। তখন আমরা দু মাসের জন্য চলে গিয়েছিলাম। আবার ফিরে আসি। আমরা যখনই আক্রান্ত হই, আমাদের ছেলেরা যদি রুখে দাঁড়ায়, পুলিশ তখন ওদেরই টার্গেট করে। পুলিশ চৌকিটা দশ বছর ধরে আছে। কিন্তু ওরা কিছু করে না। আমাদের পুলিশ চৌকি দরকার নেই। থাকলেও

www.pathagar.com

কোন লাভ হয় না। ওরা চায় সব মুসলমানরা চলে যাক, কিন্তু সেটা হবে না। আমরা ফিরে আসব, দুমাস বা ছমাস পরে। আমরা পারতাম, কিন্তু আমরা ওদের আক্রমণ করার আগে দশবার ভাবি। আমরা প্রত্যাঘাত করতে পারি। কিন্তু করব না। কারণ ওরা "খাউফওয়াড়" হয়ে গেছে। মুসলমানদের জান নেবার পিপাসায় মুখিয়ে আছে। এতসব হওয়ার পরও আমি ফিরে যাব। যদি আমরা সাহায্য পাই, আমরা সবাই ফিরে যাব। আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের মসজিদের জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়েছিল—সেটা সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে গেল। আমরা ভাগ্যবান। নইলে আমরা মরে যেতাম। আমরা ওখানে গেলে ওরা বলে "আমরা" নাকি ওদের মারব। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ওদেরই আছে, ওরাই আমাদের মারবে বলে তাড়া করে। পড়শীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত ভালো ছিল। আমরা একে অন্যের উৎসবে, অন্যান্য অনুষ্ঠানে যেতাম। আমরা ওদের নেমন্তন্ন করতাম। আমরা থী মুন ফেরভি লিডু ছে (এখন ওরা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে)।

## খ. বেস্ট বেকারি, দাভোই রোড

(পয়লা মার্চ, ২০০২)

**পটভূমি**

হনুমান টেকরির অবস্থান দাভোই রোডের উপর, বরোদার প্রান্তে। নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র মানুষের বসতি এখানে। বাসিন্দাদের অধিকাংশই হিন্দু, কয়েকঘর মাত্র মুসলমান। বস্তির বাড়ীগুলো ছোট আর অত্যন্ত সরু গলিঘুঁজি বেষ্টিত প্রধানত টিনের চালা, খুব কমসংখ্যক বাড়ীতেই একের বেশি তলা। বেস্ট বেকারি সেই মুষ্টিমেয় বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা।

হাবিবুল্লা আবদুল রউফ, বেকারির মালিক। ঘটনার দশদিন আগে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। বেকারিটা তিনি শুরু করেছিলেন কয়েক বছর আগে। তাঁর পরিবার অবশ্য এই এলাকায় থাকত না। ঘটনার ছয় মাস আগে তাঁরা এখানে উঠে এসেছিলেন। যখন এলাকার অন্যসব মুসলমানরা আগেই তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যায়, এই পরিবারটি কিন্তু থেকে গিয়েছিল। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি জয়ন্তীভাই চাইওয়ালা তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন। মার্চ ১ ও ২ তারিখে বেকারিটি লুট করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। বৃহৎ পরিবারটির ২৪জনের মধ্যে ১৪ জনকে কুপিয়ে/পুড়িয়ে মারা হয়। বাকিরা গুরুতর আহত অবস্থায় পালিয়ে যান।

www.pathagar.com

**জাহিরা শেখের সাক্ষ্য ঃ (হাবিবুল্লা আবদুল রউফের কন্যা)**

১ মার্চ সকালে যখন অশান্তি শুরু হয়, জয়ন্তীভাই চাইওয়ালা, উনি একটি চায়ের দোকানের মালিক আর স্যানিটেশনের ঠিকাদারও, এখানে আসেন এবং আশ্বস্ত করে বলেন যে, আমাদের কিছু হবে না। উনি বলেছিলেন, "ফিকর মত করনা, হামলোগ হ্যায়" (বেকারিটা যে জমির ওপর, সেটা জয়ন্তীভাই-এর কাছ থেকে কেনা। লেনদেনটা বেআইনি, কারণ জমিটা রেজিস্টার্ড ছিল না। এ পরিবারটি আন্দাজ বিশ বছর আগে বম্বে থেকে এখানে চলে আসে। জাহিরার বাবা প্রথমে ইকবাল ভাই-এর বেকারিতে কাজ করতেন। পরে নিজের বেকারি শুরু করেন। ওঁরা তখন নবহরায় থাকতেন। এ বেকারিটা শুরু হয়েছিল, ঘটনার ছয় মাস মাত্র আগে)।

দিনের বেলা কিছুই ঘটেনি। তবে আমার কাকা কিছু একটা আশংকা করে আমাদের সকলকে বাড়ীর বাইরে বেরুতে বারণ করেছিলেন। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হামলাকারীদের দলটা গণেশনগরের দিক থেকে আসে। ওরা জোরে চিৎকার করছিল, আদিবাসীদের মতো আওয়াজ করছিল। ওদের সঙ্গে ছিল তলোয়ার, বোতল, পাথর, পেট্রলের টিন আর কেরোসিন। ওরা থালি বাজাচ্ছিল। পুরুষ মানুষ আর ছেলেরা মিলে প্রায় ২০০-৩০০ জন। দুজন শক্ত সমর্থ লোক ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। একজনের গায়ে ছিল হলুদ ডোরাকাটা জার্সি, আর একজনের খাকি শার্ট। ওদের অত্যন্ত হিংস্র দেখাচ্ছিল। আমি ওদের নাম জানি না, কিন্তু আমার সামনে আনলে চিনতে পারব। ওরা আমাদের সাথে হিন্দী অথবা গুজরাতীতে কথা বলছিল।

এইসব দেখে কাকা ছুটে ভেতরে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। তক্ষুণি সামনে লাল মহম্মদের কাঠের দোকান জ্বালিয়ে দেয়া হল। আমরা আগে কিছু গুজব শুনেছিলাম যে ওটা জ্বালানো হতে পারে। ফলে সত্যিই যখন সেটা হল, আমাদের বাস্তবিকই ভয় করতে শুরু করল।

প্রথমে ওরা বেকারিটা লুট করল। আগে সমস্ত জিনিস টেনে বের করলো, তারপর একতলার ঘরটায় আগুন লাগাল। ঘর ভর্তি ছিল কাঠ, সবেমাত্র নতুন চালান এসেছিল। ঘরটা খুব সহজেই পুড়ে গেল। আমরা সবাই ছাতে ছিলাম। শুধু কাকা (তাঁর পায়ে লেগেছিল) দোতলায় নেমেছিলেন। আমার বোন তাঁকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। কিন্তু দলটা ওপরে উঠে এসে, পেট্রল ছিটিয়ে ঘরটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওরা দুজনেই পুড়ে মারা যান। ফিরোজ পাঠান (এক চাচা) তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যাঁরা পাশের বাড়ীতে থাকতেন, ওঁরাও ছিলেন। ওঁরাও সকলে পুড়ে মারা যান।

www.pathagar.com

সারাটা রাত আমরা ছাতে ছিলাম। দলটা আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়ছিল, গালি দিচ্ছিল আর চেষ্টা করছিল যাতে আমরা নেমে আসতে বাধ্য হই। বাড়ীর পিছন দিকে মই লাগিয়ে ওরা উঠতেও চেয়েছিল। কিন্তু দেয়ালগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকায় পারেনি। সারারাত ওরা বাড়ীটা ঘিরে থাকল আর গালাগালি দিতে লাগল মা বোনদের উদ্দেশে। আমাদের বাড়ীর পিছনে যে হিন্দুরা থাকত, তারাও পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছিল। চম্পক পুলিশওয়ালা, আমাদের যে হিন্দু প্রতিবেশী বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের সাহায্য করবে বলেছিল, কিছুই করেনি।

সাড়ে আটটাতেই আমরা পানিগেট থানায় ফোন করেছিলাম, যখন লাল মহম্মদের গুদাম জ্বলছিল। ওঁরা বলেছিলেন লোক পাঠাবেন। আমরা আরো তিন চারবার ফোন করি এবং প্রত্যেকবার ওঁরা বলেন যে, কেউ আসবে। এক ঘন্টা পর পুলিশ ভ্যান আসে, ওই দলটা তখন লাল মহম্মদের গুদামের পেছনে লুকোয়। ভ্যান গলির ভেতরে না ঢুকে বড়োরাস্তা থেকেই চলে.গেল। পরে রাতের দিকে কোন এক সময় ফোনের তারটা কেটে দেয়া হয়েছিল।

সকাল বেলায়, আমরা আমাদের প্রাণ ভিক্ষা করে অনুনয় করতে থাকি (হাম নে মাফি মাঙ্গা) কিন্তু সকালে আরো অনেক লোক জড়ো হয়ে দলটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। জবাবে ওরা শুধু হাসছিল। জয়ন্তীভাই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে নেমে আসতে বলে। আমরা বলি যে আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই এবং আল্লাহর নামে কসম খাই। কয়েক মুহূর্ত পর ওরা বাড়ীর পেছনে মই লাগিয়ে আমাদের নেমে আসতে সাহায্য করে। ওরা আমার ভাই-এর কাছ থেকে দুহাজার টাকা আর ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। আমাকে মারতে মারতে, ধাক্কা দিতে দিতে, একটি হিন্দু বাড়ীতে নিয়ে আসে (পরিবারটিকে হয় কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নয় তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল—আমরা ওদের দেখিনি)। "মারো সালো কো" বলে ওরা চেঁচাচ্ছিল। ছেলেদের আরো মারল। যে হিন্দু শ্রমিকরা পালাতে চেষ্টা করছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে মেরে ফেলা হল। ওরা বলে চলেছিল মেয়েগুলোকে ধর্ষণ কর" হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল আমাদের জঙ্গলের ভেতর। ২ মার্চ এগারোটা নাগাদ পুলিশ এল, দমকলের গাড়ি এল আগুন নেভাতে। দমকলের লোকেরাই ছাত থেকে আমার নানীকে নামাল। উনি তখনো পর্যন্ত ওখানেই লুকিয়েছিলেন।

পুলিশ ওইখানেই আমার জবানি নেয়। আমাকে আর নানীকে নিয়ে যায় পানিগেট থানায়, আহতদের হাসপাতালে। যখন পুলিশ দেখে যে আমিও আহত (মাথায় আঘাত) তখন আমাকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও আমাকে জবানি দিতে হয়, আরো একবার থানাতেও। তিনবারই

www.pathagar.com

আমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করানো হয়, কিন্তু কোনোটাই আমাকে পড়ে শোনানো হয়নি। বা, আমিও পড়িনি। তিন তারিখ দুপুর অবধি আমি থানাতে ছিলাম। তারপর ইকবাল ভাই (পুলিশ তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল) এসে আমাদের নিয়ে যান।

দলের মধ্যে আমি যাদের চিনতে পেরেছিলাম তারা হলো—(১) মিঃ জয়ন্তী চাইওয়ালা এবং তাঁর দুই ছেলে লালা আর আরেকটি ছেলে (নাম জানি না), (২) মিঃ মহেনা (জয়ন্তীর আত্মীয়), (৩) মিঃ মুন্না, (৪) মিঃ সঞ্জয় ঠাক্কর, (৫) মিঃ সন্তোষ ঠাক্কর, (৬) মিঃ জগদীশ রাত্তিওয়ালা, (৭) মিঃ দীনেশ বেকারিওয়ালা, (৮) মিঃ শানাভাই, (৯) পেন্টার বলে পরিচিত এক ব্যক্তি।

## গ. বাহার কলোনি
### (মার্চ ১৫-১৭, ২০০২)

**ঘটনা ঃ**

আজওয়া রোডের বাহার কলোনি একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম কলোনি। সাম্প্রদায়িক হানাহানির কোনো পূর্বোতিহাস এখানে নেই, এমনকি ১৯৯২তেও নয়। এবারে অশান্তির শুরু হয়, ১৫ মার্চ একটি ঝোপড়পট্টি জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে। ১৭ মার্চ, সকালে বহু লোক জড়ো হয়ে সরদার এস্টেট চার রাস্তার লরিগুলোতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে। তারপর, সর্দার এস্টেটের দুটো মুসলমান কারখানায়, যার শ্রমিকরা অধিকাংশই হিন্দু, আগুন দেওয়া হয়। সকাল দশটা থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ গুজব সন্দেহে পাত্তা দেয়নি। অবশেষে পুলিশ আসে একটা নাগাদ, যখন একদল মানুষ নামায শেষে ফিরছিল। পুলিশকে দেখে মেয়েরা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসেন। পুলিশের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন। গত তিনদিন ধরে তাঁরা যে নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন, তা জানাতে যান। পুলিশ জনতার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। দুজন আহত হন, একজনের পরে মৃত্যু হয়।

**মহিলাদের ভূমিকা/অভিজ্ঞতা ঃ**

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা সবচেয়ে হতাশ এবং ক্রুদ্ধ, আক্রমণকারী জনতাকে সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের ব্যর্থতায়। কলোনিতে একটা পুলিশ চৌকি বসানোর জন্য তাঁরা অনুরোধ জানাতে চেয়েছিলেন। পুলিশ তাঁদের কথা তো শোনেইনি, বরং লাঠিচার্জ করে তাঁদের ফেরত পাঠাতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছে। অন্যান্যদের মধ্যে, বৃদ্ধা আমিনা মেমন লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুলিশ অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে, তবে আজ অবধি কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

## ঘ. ওয়াড়ি তাই ওয়াড়া
## (১৫ মার্চ, ২০০২)

**ঘটনা ঃ**

নিম্নলিখিত সাক্ষ্য অনুসারে, সাড়ে দশটার সময় ১৫-২০ জন পুলিশ সাদা পোশাকে, মাথায় হেলমেট পরিহিত অবস্থায় তাই ওয়াড়া এলাকায় আসে। নেতৃত্বে ছিলেন ডিসিপি কানানি। পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে খবর পেয়ে ওরা বস্তিতে এসেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। বরং নবপুরার দিক থেকে পাথর ছোঁড়া হচ্ছিল। পুলিশ সেখানে না গিয়ে তাই ওয়াড়ায় আসে। ইবরাহীমের বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশ কমিশনার এসেছিলেন স্বামী নারায়ণ মন্দিরে। কেননা গুজব ছিল, সেদিন রাতে মুসলমানরা ওই মন্দিরটা ভাঙবে। শামসুদ্দীন নওসানওয়ালা শুনেছিল যে, কমিশনার পুলিশদের বলছে মুসলমানদের ঘিরে ফেলতে। ১৫টা গাড়ি আনা হয়েছিল চিরুনি তল্লাশির জন্য—যেখানে সত্যি সত্যি গণ্ডগোল চলছিল সেখানকার জন্য নয়। রঙমহল অঞ্চলে একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, মুসলমানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধারা সহ ১৪জন মহিলা সে রাতে আহত হন। পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে, ২৫জনকে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করে। প্রথমে তাদের রাস্তার উপরেই বেদম প্রহার করা হয়। তারপর পুলিশ নিয়ে যায় ওদের। দুই ঘণ্টা প্রবল মারধোরের পরও কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। ৩০৭ আর ৪৩৬নং ধারায় ওদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। লকআপে এবং জেলেও তাদের মারধোর করার পর, অবশেষে সাতদিন পর তারা মুক্তি পায়।

**সাক্ষ্য-বিবরণী ঃ**

**১. হামিদা বানো ইবরাহীম (৪০ বছর) ঃ** স্বামী বেকার, সম্প্রতি তাঁর ছানি অপারেশন হয়েছে, ছেলে এসএসএলসি অকৃতকার্য, বয়স ১৮ বছর।

সে রাতে হামিদা শৌচালয়ে গিয়েছিলেন (বাড়ীর বাইরে), ফেরার সময় একজন পুলিশ তাঁকে বাড়ীর ভেতরে যাওয়ার জন্য বলে। হামিদা উত্তর দেন যে, তিনি বাড়ীতেই যাচ্ছেন। পুলিশ তখনই তাকে গালিগালাজ করতে থাকে, আঘাত করতে থাকে। একজন ডাণ্ডা দিয়ে এত জোরে মারে যে, তাঁর

www.pathagar.com

ডান হাতে তিনটি জায়গায় হাড় ভেঙে যায়। সারারাত ধরে তিনি ফোলা কমাবার জন্য বরফ ঘষতে থাকেন। পরদিন তাঁকে প্রথমে যমনাবাই হাসপাতালে ও পরে এসএসজি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় কর্পোরেটর জাভেদ ভাই। তাঁর মোট চারটি অপারেশন হয়, একটা লোহার পাতও লাগাতে হয়। অপারেশন করতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। তাঁর তিনটি আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। হামিদা অবশ্য প্রাপ্ত চিকিৎসায় খুশি। এসএসজি হাসপাতালেই পুলিশ কেস নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কোনো ব্যবস্থা অবশ্য গত দুসপ্তাহে নেওয়া হয়নি। পুলিশ তাঁর কোন জবানি নিতে আসেনি।

মহিলা কমিশনের কাছে হামিদা বলতে চান যে, কোন মহিলার গায়ে হাত তোলার অধিকার পুলিশের নেই। এই ঘটনায় তাদের পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর সাথে যা হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন মেয়ে যেন কোনদিন এভাবে নির্যাতিত না হয়। যদি কেউ অপরাধ করে, তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু বিনা কারণে পুলিশ কাউকে লাঞ্ছনা করতে পারবে না।

**২. জারিনা (১৮-১৯ বছর)** ঃ তিনি মাত্র এক মাস আগে মা হয়েছেন। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার সময় পুলিশ বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাঁর পা থেঁতলে দিয়েছে। তিনটি ছোট ছোট সন্তানের জননী। তিনি পুলিশকে মিনতি করে বলেছিলেন, "আমার স্বামীকে নিয়ে যেও না।" পুলিশ তাঁর পিঠে আঘাত করেছে। "যে দরজা ভেঙে ওরা ঢুকল, সেটা আমার পিঠে এসে পড়েছিল। ওরা মেরে ধরে আমার স্বামীকে নিয়ে গেল।"

**৩. হালিমা বিবি (মন্দিরের উল্টো দিকে থাকেন)** ঃ ওরা আমার জামাইকে প্রচণ্ড মারধোর করে। আটা আর চাল রাখার পাত্রগুলো ঘরময় উল্টে দিয়েছে। প্রচুর নুকসান করেছে, ছমাসের বাচ্চাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে—বাচ্চাটা খুব কাঁদছিল—ওকে থামাবার জন্য ওর ওপর পা তুলে দিল আর বলছিল "এরা সবগুলো মরুক।"

**৪. রফাই মহল্লার অধিবাসী নাসীম বানোর সাক্ষ্য** ঃ নাসীম একজন সমাজসেবী। বিধবাদের প্রাপ্য 'সহায়' আর গরিবদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা তাঁর কাজ।

"সেদিন আমি পুলিশকে থামাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলার চেষ্টা করছিলাম, এই এলাকায় কোনো তুফান নেই, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করো না। এটা না বললে আরো অনেক কিছুই ঘটতে পারত। পরে ওরা আমাকেও মারল আর খুব খারাপ গালাগালি দিল। আমি ওদের বলি যে, আমি মামলা করব। যমনাবাই হাসপাতালে আমরা একটা রিপোর্ট

www.pathagar.com

জমাও দিই। কিন্তু কোনো তদন্ত হয়নি। কালকে আমি বাওয়ামনপুরায় ছিলাম। একটা ঘুড়ি উড়ে এসে আমার পায়ের কাছে পড়ল। ওতে এ রকম লেখা ছিল যে, 'আমরা তোমাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেব। তোমাদের ঘরবাড়ী, ছেলেমেয়েদের জ্বালিয়ে দেব। তোমাদের রক্তে হোলিধুলোতি খেলব আমরা।' আমি এটা কমিশনার সাহেবকে দেখাতে উনি বললেন, 'এসব চলতেই থাকবে, আমরা ওদের দিকে মন দেব, না তোমাদের দিকে মন দেব ?' আমি বললাম, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ওনার তদন্ত করা উচিত। 'আপনাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা কানুন নিজেদের হাতে নিই তাহলে আমরা গুনাহগার হব, যদি না নিই, তাহলে মারা পড়ব। এখানে কোন নিরাপত্তাই নেই।' আমি ওকে বললাম, 'আপনি একতরফা হতে পারেন না। আপনি ওদেরও ধরুন, আমাদেরও ধরুন। (ধরপাকড় বা গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপনি বাছাবাছি করবেন না)।' আমাদের নিজেদেরই নিজেদের রক্ষা করতে হবে। ওরা যদি তলোয়ার নিয়ে আসে, আমরা আমাদের বাঁচাতে পাথর ছুঁড়ব। তোমরা তো আমাদের বাঁচাচ্ছ না। কমিশনার তো নিজেই বললেন, 'আপ আমনে সামনে কর লো'।"

**৫. শাবির খান (ব্যবসায়ী)-এর সাক্ষ্য ঃ** "পনেরই মার্চ, আমাদের বাড়ী থেকে গুলি চালানো হচ্ছে সন্দেহে, পুলিশ এখানে আসে। আমরা ঘুমোচ্ছিলাম। পুলিশ দরজা ভেঙে ঢুকে আমাদের বাইরে নিয়ে আসে, অকথ্য গালাগালি দেয়, মেয়েদের দিকে বুরী নজরে তাকায়। আমি ওদের বলি যে, 'আমরা ব্যবসাদার। আমরা এসব কাজ করি না।' ১২জন পুলিশ তখন ঘরে ঢুকে আসে—ছজন একদিকে, ছজন অন্যদিকে। বলল যদি আমরা হাত তুলি বা চেঁচাই, তাহলে আবারো মারবে। স্বাভাবিকভাবেই, পিঠে ডাণ্ডার বাড়ি পড়াতে আমি চেঁচিয়ে উঠি। ওরা আবার মারতে থাকে। আমাদের তিন ভাইকেই ওরা মারধোর করে, ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। লকআপে পুলিশ আমাদের বলে, 'তোমাদের, মুসলমানদের, আমরা জ্বালিয়ে দেব।' ওখানে আমাদের কোন খাবার বা জল দেওয়া হয়নি। আমি শুনতে পেয়েছিলাম ওরা আমাদের নামে খুনের মামলা সাজাচ্ছে। যদিও কোন খুনের ব্যাপার ঘটেনি। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। আমার ঘরের একটা কুড়ুল নিয়ে এসে সেটাকে অস্ত্র বলে চালান হয়। একটা পুলিশ অফিসার আমার স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল, ওপর থেকে নিচে। ভগবানের দোহাই ; ও যদি ওকে কিছু করতও, আমার অবস্থা ছিল না যে ওকে বাঁচাই। আমি আমার অন্তত একটা ভাইকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। অফিসার বলে, 'না,

www.pathagar.com

আমরা তোমাদের সবাইকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেব।' সেন্ট্রাল জেলে, যেখানে আমি সাতদিন ছিলাম, সেখানে পাঁচজন করে হিন্দু থাকলে ২৫জন করে মুসলিম। যে হিন্দুরা জেলে আমার সাথে ছিল, ওরা ভোই। একজন অস্ত্রসহ (ব্লেড) ধরা পড়েছে, একজনের সাথে গুপ্তি, আরেকজন খঞ্জর। সে আমার কাছে স্বীকার করেছিল—'আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা থানা থেকে আমাদের সাধানও নিয়ে নেব। হামারা ইয়ে সব চলতা হ্যায়।' এ ছিল ওর কথা। আমার সন্দেহ হয়, আমার বাড়ীতে যারা চড়াও হয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনই সাধারণ পোষাক পরা পুলিশ, বাকিরা নয়। ওরা বাইরের লোক। পুলিশগুলোকে আমি চিনি। কারণ, আমি ডিসিপি অফিসের পেছনেই থাকি। ওখানে একজন মুসলমান অফিসার ছিলেন, আমি নাম বলতে পারব না। উনি বলেছিলেন, ওনার কোন ক্ষমতা নেই এবং মুসলমানদের সাহায্য করতে উনি কিছু করতে পারবেন না। আমি বলেছিলাম যাতে আমাদের এক ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উনি বলেন, 'আমার হাতে কিছু নেই।'

সবচেয়ে বড়ো কথা, এলাকার মহিলারা ইনসাফ চান, পুলিশের একতরফা কার্যাবাহী নয়। কানাজির লোককে তাঁরা ওই অঞ্চলে চান না, কানাজিকেও না। ওঁরা অবাক, নরেন্দ্র মোদী কিভাবে এখনো মুখ্যমন্ত্রী রয়ে যাচ্ছেন। 'ওকে সরানোই এখন আমাদের বাঁচার একমাত্র রাস্তা।'

## ৬. রায়েন বসেরা

(১৫ মার্চ, ২০০২)

**ঘটনা**

কারেলিবাগ পুলিশ থানার অন্তর্গত মাছিপীঠের রায়েন বসেরায় চিরুনি তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ বহু মহিলার ওপর নির্যাতন চালায়। পনেরই মার্চ, আন্দাজ তিনটের সময় চারজন পুলিশ বস্তির মধ্যে ঢোকে। তারা নির্বিচারে মহিলা ও শিশুদের মারধোর করে, পুরুষদের মারধোর করে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, বহু সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করে। অন্তত চারজন অত্যন্ত গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। গ্রেফতার হন এগারো জন।

**মহিলাদের ভূমিকা ও আভজ্ঞতা ঃ**

গোটা সময়টা পুলিশ কুৎসিততম গালাগালি দিচ্ছিল, যার মধ্যে যৌন ও ধর্মীয় ইংগিত খুব স্পষ্ট, বিশেষ করে সাবিরাবেন আহমেদ ভাই শেখ, বয়স পঁয়তাল্লিশ, এমনভাবে প্রহৃত হন যে, তাঁর বাঁ হাত ফুলে ও থেঁতলে যায়।

www.pathagar.com

ফরিদাবানু বাচ্চু ভাই শেখ, বয়স ৩০, হাজিরা বিবি গুলামহুসেন ধোবি; বয়স ৩২ এবং হামিদাবিবি আহমেদ খান পাঠানের পায়ে লাথি মারা হয়। এর মধ্যে হাজিরাবিবির বুকে এবং ফরিদাবিবির গোপন অঙ্গে লাথি মারে পুলিশ।

মেহেরুন্নিসার বয়স ১৮, তলপেটে তলোয়ারের (আপাতদৃষ্টিতে বাজেয়াপ্ত) ফলা ঠেকিয়ে শাসানো হয়েছে। সুলতানা রাজ্জাক ভাই-এর (১৮) ক্ষেত্রে রাইফেলের মুখ ঠেকিয়ে রাখা হয় তার বুকে।

## চ. আলিশান অ্যাপার্টমেন্টস
## (১৭ মার্চ, ২০০২)

আলিশান অ্যাপার্টমেন্টস আজওয়া রোডের ওপর, সরদার এস্টেটের মোড়ে, একটি মধ্যবিত্ত এলাকা।

**ঘটনা ঃ**

দখলদারদের পয়সা দিয়ে হঠিয়ে, চাররাস্তার ধারের ঝোপড়িটা খালি করে ফেলা হয়েছিল। একটা মুসলমান মালিকানাধীন গুদোম ছিল, দাহ্য রাসায়নিকের সাহায্যে সেটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অন্তত ১০০ জনের একটি দল ঝোপড় পট্টিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ আপাততভাবে তদন্তে আসে। কি ঘটছে দেখার জন্য মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলেন। পুলিশ দুটো কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে, পাশাপাশি লাঠিও চালায় তাদের ওপর। মাহ্মুদার ছেলে ইমতিয়াজ শেখ তার টাটা সুমোর মধ্যে বসে গান শুনছিল। তাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বার করে, প্রচণ্ড মারধোর করা হয় এবং জোর করে তার হাতে একটি তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে তার ছবি তুলে নেয়া হয়।

**মহিলাদের ভূমিকা/অভিজ্ঞতা ঃ**

মহিলারা পুলিশকে ঠেকাতে যাওয়ায় পুলিশ তাদের মারে। অন্তঃসত্ত্বা জাহ্রাও তাদের মধ্যে একজন। মাহমুদা একজন অফিসারকে (নামটা বলতে পারেননি) শুধু অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁর ছেলেকে জেলের মধ্যে আরো মারধোর করা না হয়। সে রাতে তাকে আরো বেশি মাত্রায় মারা হয়েছিল। মহিলারা পুলিশের এ নৃশংসতার কথা জানিয়ে কমিশনারের কাছে তাঁদের অভিযোগ ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছিলেন এবং ১৭ মার্চ যাতে তাঁদের ডাক্তারি

www.pathagar.com

পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সে বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। আজ পর্যন্ত (১ এপ্রিল) অবশ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

মাহ্‌মুদা এবং অন্যরা জানিয়েছেন, কিভাবে তাঁদের স্বামীপুত্রেরা ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে গৃহবন্দী হয়ে আছেন। ওয়াঘড়িয়া রোডের উপর দোকানগুলো যদিও খোলা ছিল, হিন্দু পুরুষরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ওঁরা জানিয়েছেন, কোনো মুসলমান পুরুষ বাইরে পা দিতে নিরাপদ বোধ করেননি। কেউই তাঁরা কাজে বের হতে পারেননি। তাঁদের (চাইনিজ ফুড বিক্রি করার) লরিগুলো বেকার পড়ে আছে সামনের চত্বরটিতে।

## ছ. রোশন নগর (তুলসীওয়াড়ি/হাতিখানা)
## (১৮ মার্চ, ২০০২)

**ঘটনা ঃ**

১৮ মার্চ, তুলসিওয়াড়ি মন্দিরের জাল্লি ভাঙা পাবার পর সাড়ে আটটার সময়, পুলিশ এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায়। মোট ৫৮জনকে এই সম্প্রদায় থেকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে হুশা বানো মানসুরির মানসিক ভারসাম্যহীন পুত্রও একজন (ছোকরে কো কুত্তে কি তরহ মারা এবং সে এখন বেহান)।

**মহিলাদের ভূমিকা/অভিজ্ঞতা ঃ**

মহিলারা মৌখিক ও শারীরিক, দুভাবেই লাঞ্ছিত।

যেভাবে তাঁদের ১৬ থেকে ১৮ বছরের ছেলেদের ঘিরে ফেলে জেলে নিয়ে গেছে পুলিশ, তাতে তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত। তথাকথিত চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছিল তারা। বাচ্চাদের ঝুলা থেকে শিক বের করে নিয়ে বলা হয়, ওগুলো অস্ত্র। ওরা আরো বলে যে, "তুমহারে ইয়ার আয়েঙ্গে, উহ তুমহে জিন্দা মারেঙ্গে।" "মুসলমান মেয়েদের, তোমাদের মারতে ভাল লাগে। আমরা গন্ধা কামও করতে পারি।" "পাকিস্তানে চলে যাও।"

মেয়েরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেছেন, পুলিশের দায়িত্ব তাঁদের হিফাজত করা। বদলে, পুলিশ তাঁদের নিদারুণ লাঞ্ছনা করেছে, তাঁদের মর্যাদাবোধ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। সব মেয়েরাই বলেছেন যে, পুরুষ মানুষ আর ছেলেরাই ছিল তাঁদের সংসারে রোজগারের উৎস। তারা না থাকায় চারদিন ধরে পরিবারগুলির অন্ন জোটেনি। মেয়েরা বারংবার অনুনয় করেছেন,

www.pathagar.com

"আমাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দাও। আর কিছু চাই না। পুরুষ মানুষ আর ছেলেরা ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত আমরা খাব না।" পুলিশের হাতে আহত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন গর্ভবতী। তাঁর গায়ে দুটি বুলেট লেগেছে। তাঁকে এসএসজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছয় বছরের মেয়ে রবিনার হাতে চোট লেগেছে, ফুলে রয়েছে ভয়ানকভাবে। মুমতাজ বানোর চোখের চারপাশটা কালো। সে তিনদিন ধরে চোখ খুলতেই পারেনি। নমাসের একটি শিশুরও চোখের ক্ষতি হয়েছে। তার মায়ের কোলে থাকা অবস্থায়, তাঁর পায়ের কাছে একটা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটেছিল।

**রাইসা শেখের সাক্ষ্য ঃ**

আমরা সব কাজকর্ম সেরে নামায পড়ছিলাম। একটা বড়ো তোলা হল। মুখোশ আর হেলমেট পরেছিল ওরা। আমরা চিনতে পারিনি। পুলিশও ওই একই সময়ে আসে। ইতিমধ্যে তুলসিওয়াড়ি মন্দিরটা ভাঙা হয়েছিল —মন্দিরের জাল্লি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য পুলিশ আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে। আমাকে টেনে বের করে আনে বাড়ীর মধ্য থেকে। বাইরের কাদায় গড়িয়ে পড়ি আমি। গোটা সময়টা ওরা আমায় মারধোর করে চলেছিল।

অনেক যত্নে আমাদের ছেলেদের মানুষ করেছিলাম, শিখিয়েছিলাম, কারো ক্ষতি না করতে, শান্তিপ্রিয় হতে। এখন ওরা ওই ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে গেল। এখন যদি ওরা আতঙ্কবাদী হয়ে যায় (জেলের এ অভিজ্ঞতার পরিণামে), আমাদের আর কিছুই থাকবে না।

রাইসাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পুলিশের এই অত্যাচারের ব্যাপারে তাঁরা কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেছেন কিনা। রাইসার রাগত জবাব ছিল, "কি হবে ওনার কাছে অভিযোগ করে। যখন ওঁর লোকেরাই আমাদের এসব করেছে? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানো দরকার।" বস্তি থেকে রাইসারই নেতৃত্বে পাঁচজন মেয়ের একটি দল এনএইচআরসি-র কাছে সাক্ষ্য দিয়েছে।

## জ. বাওয়ামনপুরা

(২৫ মার্চ, মহরমের দিন, সন্ধে সাড়ে সাতটা)

**ঘটনা ঃ**

অত্যন্ত দরিদ্র একটি অঞ্চল। অধিবাসীরা মূলত সবজি বিক্রেতা অথবা দিনমজুর। গত এক মাস যাবৎ তাঁরা কাজে বেরতে পারেননি।

www.pathagar.com

পাথর ছোঁড়া শুরু হয়েছিল ভোইওয়াড়া আর বাহুচাওয়াড় থেকে। মানুষজন আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। সামনের পুলিশ চৌকি থেকে পুলিশ আসে। পুলিশ ভোইওয়াড়ায় গেল না, এল মুসলমান এলাকাটিতে। ওদের ধারণা ছিল, এখানে মেয়েরা দোষী পুরুষদের আড়াল করে রেখেছে। ওরা বাড়ির মধ্যে হানা দেয়, বিছানার তলা পর্যন্ত খোঁজে, মেয়েদের টেনে বার করে আনে। লাঠি আর ডাণ্ডা দিয়ে মারছিল ওরা, কুৎসিত গালি দিচ্ছিল। ছয়জন পুলিশের মধ্যে চারজনই ছিল মাতাল।

প্রায় ২০-২৫ জন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন গর্ভবতী, দুজন বিধবা এবং আরো বয়স্কা অনেকে। অধিকাংশ আঘাতই শরীরের নিচের অংশে—কোমর এবং তার নিচে। কয়েক জন মহিলা তলপেটে ও থাই-এর সংযোগস্থলে আঘাতের চিহ্ন আমাদের দেখিয়েছেন।

**বিবরণী ঃ**

রেহেনা পাঠান (৩০ বছর) ঃ বারদিন আগে তাঁর ৩৫ বছর বয়স্ক স্বামী মারা গেছেন (রেহানা মনে করেন, দাঙ্গাহাঙ্গামাজনিত আতঙ্ক-উদ্বেগের বশেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর)। রেহানার দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। স্বামীর মৃত্যুর কারণে রেহানা ইদ্দত (পর্দা) পালন করছিলেন। পুলিশ তাঁকে তাঁর পর্দা অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে, বাইরে বের করে আনে এবং প্রহার করে। তাঁর তিন বছরের মেয়ে আরবাসও আহত হয়।

**সাক্ষ্য ঃ**

**১. জাহিদা (১৭ বছর) ঃ** ২৮ মার্চ, আমি ঘরেই ছিলাম। বাসনপত্র ধুয়ে বাইরে জল ফেলতে গেছি, একটা লোক তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এলো। আরো দুজন আক্রমণ করতে উদ্যত। আমি ওদের নাম জানি না, তবে দেখলে চিনতে পারব। ঘটনাক্রমে দাদা আমার পেছনে বেরিয়ে এসেছিল। ও চেঁচিয়ে আমাকে বললো, সরে যেতে। ভাগ্যক্রমে আমার একটা খোঁচা শুধু লেগেছে, নাহলে আমার গলাই কাটা যেত।

**২. সালমা ঃ** দুদিন আগে আমি আরো দুজন মেয়ের সঙ্গে ভোর সাড়ে পাঁচটায় জল আনতে বেরিয়েছিলাম। আজানের সময় ওরা আমাদের দিকে পাথর ছোঁড়ে, অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখায় আর নিজেদের প্যান্ট নামিয়ে দেয়। পুলিশ চৌকি ঠিক সামনে, পঞ্চাশ পা মাত্র দূরে। পুলিশ ওদের নিজেদের এলাকায় ফিরে যেতে বলেনি, বরং আমাদের এখানে চলে এল, আমাদের পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে গেল। আমরা পুলিশের কোন সাথ পাই না। আমাদের

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়ীর সামনেও খেলতে পারে না। পুলিশ এসে বলে, "ভেতরে যাও, কার্ফু আছে।"

**৩. কৌশল্যা বানো মানসুরি (নয় মাসের গর্ভবতী) ঃ** ২৩ মার্চ, রাত নটার সময় আমার ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বাড়িতে অনেক পুলিশ। পুরুষদের দেখতে না পেয়ে ওরা আমাদের গালি দিতে থাকে। ডাণ্ডার দুটো বাড়ি মারে আমাকে—একটা আমার হাতে, আরেকটা পেটে। তারপর ওরা লক্ষ্য করে যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা, তখন আমার থাই-এ আঘাত করে। ওরা সবাই, "কানানি, কানানি" বলছিল। ওরা ওর লোক। সবে আজ আমি একটু চলাফেরা করতে পারছি। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, তারপর দরগায় লুকিয়েছিলাম। আমি ওদের বলেছিলাম, আমি "পেট সে" আছি। তবু ওরা বলে যে, আমরা ওকে মারবো। আমার সাসও বলেছিল যে, আমি গর্ভবতী। ওরা বলে "বাচ্চাটা হওয়ার আগেই ওটাকে মেরে ফেলতে হবে।"

**৪. নূরজাহান বিবি (৫০ বছর) ঃ** আমি আমার মেয়ে আর বৌদের নিয়ে ছিলাম। ওরা জিজ্ঞেস করল "মর্দরা কোথায় ?" আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক গর্ভবতী মেয়েকেও মেরেছে ওরা। ওর সাত মাস চলছে। আমি ওকে সরে যেতে বলেছিলাম। তাতে ওরা বলল, "না, আমরা ওকেও মারব।" তারপর ওরা আমার আরেক মেয়ে আর বৌমাকে মারে। ওদের মধ্যে একটা লোক ভালো ছিল। সে অন্যদের বলল, "ওকে ছেড়ে দাও। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে দাও ওকে—গাড়িতে চলো আর ওদের বল, কোথায় তোমাদের পুরুষ-মানুষরা আছে। আমরা তোমায় ছেড়ে দেব।"

**৫. সত্য বানো সৈদ (৬০ বছর) ঃ** আমি দরজা খুলেই রেখেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে, যদি ওরা দরজা বন্ধ দেখে, তাহলে ভাববে, তুমি ছেলেদের লুকিয়ে রেখেছ আর আমার দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ওরা ভেতরে ঢুকেছে। অনেক বছর আগে আমার সিজারিয়ান হয়েছিল। ওরা আমার পেটে এত জোরে মেরেছে যে, আমার সেলাইগুলো প্রায় খুলে এসে ছিল (প্রচণ্ড কাঁদতে কাঁদতে)।

## ঝ. কুরেশি জামাত খানা ক্যাম্প

**কিছু বিবরণী ঃ**

**১. ইন্দিরা নগর থেকে রশিদা, রেলওয়ে কলোনি, দাভোই রোড ঃ** রশিদা তিরিশের গোড়ার দিকে পা রাখা এক যুবতী। সে বলেছে, কিভাবে তাদের ছয়টি পরিবারের (প্রায় কুড়িজন) লোক ঘর ছেড়ে পালিয়ে দুদিন

www.pathagar.com

বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। অন্নজল ছাড়া দুদিন কাটার পর তবে তারা বন থেকে বেরিয়ে আশ্রয় খোঁজবার মতো সাহস সঞ্চয় করে।

**২. ৭০ নম্বর ঝাণ্ডা চৌক, কিসানওয়াড়ির বানো বিবি আমীর ভাই ঃ** ৭৫ নম্বর থেকে মুমতাজ বিবি, রফিকা বিবি, নিজাম ভাই, ৭৬ নম্বর থেকে বানু বিবি, ৬৪ নম্বরের মুমতাজ, ৬২৫ নম্বরের গুভান বিবি, ৭৩ নম্বরের তাহিরা বিবি এবং ৯৯ নম্বর হুসেইনি চৌক থেকে নূরবানু ইকবাল, সকলে জানিয়েছেন, কিভাবে তাঁরা কিসানওয়াড়ি থেকে এলেন। ওঁরা বলেছেন, রামদাস পিল্লাই ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীবেন কিসানওয়াড়িতে মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেছেন। তাদের বাঁচিয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা করেছেন, কিভাবে প্রায় ৫০০ লোক লক্ষ্মীবেনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুড়ি ঘণ্টা ধরে, যখন হামলাকারীদের একটা দল গোটা অঞ্চলটা ঘিরে রেখেছিল। মহিলারা/মেয়েরা যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসের সঙ্গে বলছিলেন কিভাবে তাঁদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ধ্বংসকার্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হামলাকারীরা বারবার হানা দিয়েছে।

ক্যাম্পে দুটি কমবয়সী মেয়ে—একজন সদ্যবিবাহিত, আরেকজন বিয়ে হতে চলেছে। তাদের সমস্ত পণ-যৌতুকের সামগ্রী (বাসন, কাপড়, গয়না) ধ্বংস ও লুণ্ঠিত। একজনের এই ক্যাম্প থেকেই এই সপ্তাহে বিয়ে হবে। বরের বাড়ি পানিগেটে।

কিসানওয়াড়ির মেয়েরা কোন রকম অনিশ্চয়তা না রেখেই জানিয়েছেন, তাঁরা তাদের বাড়িতে ফিরে যাবার কথা কখনোই ভাবতে পারেন না। তার পরিণতির কথা ভাবলেই আতঙ্ক হয় তাঁদের। তাঁরা মনে করেন, যদি ফিরে যান, তাহলে তাঁদের যৌন হিংসার শিকার হতে হবে। একজন কমবয়সী মহিলা বলেছেন কিভাবে তাঁরা পালিয়েছিলেন সেই দুঃস্বপ্নে তাঁর রাতে ঘুম ভেঙে যায়।

**৩. মুহম্মদ তালাও, শাস্ত্রী নগর থেকে নাগমাবিবি ঃ** চারটি শিশুর বিধবা জননী। সকলেরই বয়স দেখে মনে হয় ছয়ের নিচে। সবচেয়ে ছোটটি ছেলে, তার যক্ষ্মা হয়েছে (আমরা ওর ডাক্তারি কাগজপত্র দেখেছি)। ওই এলাকা থেকে নাগমা একাই এ ক্যাম্পে এসেছেন। তিনি তাঁর ছেলেকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন এসএসজি হাসপাতালে। গুলাম ভাই, সেখানে ওষুধ দেওয়ার কাজ করেন। তিনি ব্যবস্থা করে দেওয়াতে নাগমা তাঁর শিশুদের নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চেপেই পানিগেট যমনাবাই হাসপাতালে আসেন। সেখান থেকে তাঁর এই ক্যাম্পে আসা।

www.pathagar.com

**উদ্বেগ আর দুর্ভাবনার যে দিকগুলি ব্যক্ত ঃ**

বাড়িতে যারা হামলা করেছিল, মেয়েরা তাঁদের অধিকাংশকেই চিনতে এবং শনাক্ত করতে পেরেছেন। বিষ্ণু প্রজাপতি, কিশোর মারাঠী, সন্তোষ হাজম, যোগী, চন্দ্রকান্ত, উমা, ধম্ম, রাহুল, কারিয়া, জয়ন্তী, পাপ্পু, সুভাষ আর নাটু তাদের মধ্যে কয়েকজন। কিসানওয়াড়ির বানোবিবি বলছিলেন, "চাঁদু প্লাম্বার কয়েক মাস আগে মুসলমান বাড়িগুলোর একটা ফর্দ তৈরি করেছিল। রমেশ স্টিকারওয়ালাও আমাদের বাড়ি লুট করার সঙ্গে ছিল।" বিষ্ণু প্রজাপতি সব জায়গা থেকে ওর বন্ধুদের ডেকে এনেছিল আর বলেছিল, "গোধরায় তিরিশজন হিন্দু মরেছে। আমাদের ষাট জনকে মারতে হবে।" "এই ছেলেরা আমাদের চোখের সামনে বড়ো হয়েছে।"

মেয়েরা তাঁদের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত। ক্যাম্পের বাইরে তাঁরা আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। "কতদিন আমরা এখানে থাকবো ?" "কতদিন এরা আমাদের খেতে দেবে ?" ওঁরা চান, আমরা আলাদা কোন একটি মুসলমান এলাকায় ওদের একত্রে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সাহায্য করি। "এক জাঠেমে মার যাওয়ে"—এটা অনেক বেশি গ্রহণীয়, কিসানওয়াড়িতে ফিরে যাবার চেয়ে।

মেয়েদের কথা ফুরোয় না। প্রথমে, একজন বাইরের লোক হয়ে তাঁদের স্মৃতি-অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলাতে চাইব, এ নিয়ে আমি ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু ওঁরা বললেন, ওঁদের কথা বলতে ভালো লাগছে। ওঁরা খুব চাইছিলেন, যেন আমরা যাই। দেখে আসি ওঁদের ঘরবাড়ী—অনেকে জোর করে লেখালেন ওঁদের ঠিকানা। "ভেতরে গিয়ে সব দেখে এস"—এই ছিল ওঁদের বক্তব্য। আমরা অনেকটা যেন তাঁদের অতীত মাতৃগৃহ আর ঘরবাড়ীর সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। আরেকটি লক্ষ্য করার মতো বিষয়, বহু বহু মহিলা, আমরা যখন চলে আসছি, আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। ভারি ব্যগ্রতা ছিল এই শারীরিক সংস্পর্শটুকুর জন্য ওঁদের।

## ঞ. তাণ্ডালজা ক্যাম্প

চিন্তিয়া মসজিদ কমিটি পরিচালিত এই ক্যাম্পে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা এসেছেন বরোদা শহরের ষাটটিরও বেশি অঞ্চল তথা আশপাশের গ্রামগুলি থেকে ; যেমন—বাজওয়া, গোত্রি, ভয়ালিগাঁও, জওয়াহরনগর, পায়েল সোসাইটি, মকরপুরা মানেজা, জিআইডিসি রোড, ইন্দিরা নগর, মকরপুরা ডিপোর পেছন, দণ্ডেশ্বর (অনুপম নগর) ঘাঘরোটিয়া, কাপুরাই

www.pathagar.com

চৌকড়ি, তারসালি, পানওয়াড়, সঞ্জয় নগর ইত্যাদি। আশ্রিতের সংখ্যা প্রায় দুহাজার। এখানে দিনে দুবার খাবারের ব্যবস্থা আছে। থাকার আয়োজন বিশাল একটি নির্মীয়মান অ্যাপার্টমেন্টে। খানিকটা শান্তি ফিরে আসার পর অনেকে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি চলে গেছেন।

**বিবরণী ঃ**

**১. পনওয়াড় থেকে মেহেরুন্নিসা ফকির মহম্মদ ঃ** সাতটি পরিবারের চল্লিশ জন লোক পনওয়াড় এবং কাওয়ান্ত থেকে এসেছেন। আমরা মেহেরুন্নিসার সাথে কথা বলেছিলাম। উনি বলেন, "যেটা পরেছিলাম, সেটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই না নিয়ে পালিয়েছিলাম আমরা। ১১ মার্চ, ওরা পনওয়াড় জ্বালিয়ে দেয়। একই দিনে ওরা কাওয়ান্তে ফোন করে ভয় দেখায় যে, পরের দিন ওরা ওখানে আসবে। আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিসার বলেন যে, ওঁদের ওখানে লোক কম আছে। পনওয়াড় আর কাওয়ান্ত, দু জায়গাতেই প্রায় ২০০ ঘর। অঞ্চলের কিছু হিন্দু আদিবাসীদের ১০০০-২০০০ টাকা দিয়েছে আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবার জন্য। প্রায় ৪০০০ আদিবাসীদের একটা দল এসেছিল। প্রথমে পাথর ছুঁড়ছিল ওরা। পরে তীর ছুঁড়তে শুরু করে ; ফলাগুলোয় কেরোসিনে ভেজানো কাপড় লাগানো থাকায়, ওগুলো জ্বলে উঠছিল। আমরা পুলিশের কাছে নিরাপত্তার দাবী জানাই, আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য বলি। ওঁরা পাঁচ ছয়জন পুলিশসহ একটি জীপ আমাদের দেন। আমরা নিজেরা পাঁচ-ছটা জীপের বন্দোবস্ত করি এবং পুলিশ ভ্যানটিকে অনুসরণ করি। যখন বোদেলিতে পৌঁছলাম, তখন কার্ফু চলছে। বেশ কিছু হিন্দু কার্ফুর অজুহাতে আমাদের বোদেলিতে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। তাদের অনীহার সবচেয়ে বড়ো কারণ এটাই ছিল যে, তারা আসলে কোন বহিরাগত মুসলমানদের আশ্রয় দিতেই রাজি ছিল না। ডিডিও বললেন, আমরা যেন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিই। দু ঘণ্টার মধ্যে ওই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। শেষে আমরা এ তাণ্ডালজা ক্যাম্পে এসে দাঁড়াই। এখানে ওঁরা সকাল-সন্ধে খাবার দেন। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে। আমরা আর ওই জায়গায় ফিরতে চাই না।

**২. বাদসার রোড থেকে সালমা বেগম মেহবুব আলি ঃ** আমরা সালমা বেগমের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। উনি বাদসার রোডে, রেলরাস্তার মোড়ে থাকেন। মোড়ের কাছে মুসলমান বাড়ি ছিল সাতটি, যার মধ্যে ছটি লুট হয়েছে। একটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের দিন কিছু লোক এসেছিল, তারা হিন্দু বাড়িগুলির দেওয়ালে দেওয়ালে হনুমানের ছবি সাঁটছিল। সালমা

www.pathagar.com

যখন জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা ছবি আটকাচ্ছে, ওরা বলে যে, উনি তা বুঝবেন না। ঘটনার দিন, আক্রান্ত সকলে কবরখানায় লুকিয়ে ছিল। একটা দল এসে রাত্তিরে সবকটা দোকান আর লরিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরদিন লুট করে সব বাড়িগুলি। পুলিশ কিছু তো করেইনি, বরং ওই দলটাকেই সাহায্য করছিল। পুলিশ ওদের জিজ্ঞেস করছিল, মুসলমানগুলোকে ধরে না জ্বালিয়ে ওরা মুসলমানদের সম্পত্তিগুলো জ্বালাচ্ছে কেন ? যারা এইসব লুটপাট করেছে আর আগুন লাগিয়েছে, স্থানীয় লোকে তাদের জানে, এই লোকগুলোকে তারা পুরস্কার দেয়। মনোজ, যোগেশ আর মারাডিকে চেনে ওরা। জনতার এই উন্মত্ততার পেছনে বজরং দল আছে। আমরা আর ওখানে ফিরতে চাই না।

**৩. গোত্রি গ্রাম থেকে মেহমুদাবেন সিকন্দর ভাই এবং ফরিদাবেন ইয়াকুব ভাই ঃ** মেহমুদা আর ফরিদার সাথে দেখা করেছি আমরা। ওঁরা অম্বিকা নগরের পিছনে খোদিয়ার নগরে ছিলেন। কথাবার্তার সময় ওঁরা বলেন যে, হামলাকারীরা ঘরে আগুন দেবার আগে লুটপাট সব সেরে রেখেছিল। পাথর ছুঁড়ছিল ওরা। এক হিন্দু মহিলা মেহমুদাকে বাঁচান। মেহমুদা এসেছেন পরনের শাড়িটা শুধু সম্বল করে। আক্রমণকারীদের মধ্যে সেবাসি আর আস্তোদিয়া থেকে লোক ছিল। "ওরা আমাদের বলছিল সবকিছু ফেলে রেখে ওখান থেকে চলে যেতে। আমরা আর ফিরতে চাই না ওখানে। এখানে ক্যাম্পে নিরাপদে আছি। তাও আমরা বেশির ভাগ রাতই না ঘুমিয়ে জেগে কাটাচ্ছি।

**৪. অনুপম নগর, দন্তেশ্বর থেকে সায়রাবানু ঃ** সায়রাবানুর সঙ্গে কথা বলায়, উনি জানান যে, ওই রাস্তাটির ওপর সার দিয়ে ১৬টি মুসলমান বাড়ি ছিল। সবই বস্তি বাড়ি। সায়রাবানুর পরিবারে এক সঙ্গে তিনটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সায়রা তার সমস্ত আয়োজনও করে রেখেছিলেন। তিনটির পণ্যসামগ্রীই বাড়ির মধ্যে ছিল। হামলাকারীদের দল ওই অঞ্চলের সবকটি বাড়ি লুট করে। প্রতিটি পরিবারের প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মতো ক্ষতি হয়। সায়রা আর ফিরে যেতে চান না। তাঁর কাছে আরো জানা যায়, কিভাবে মকরপুরার অবধূতনগরে কিছু হিন্দু লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ফেরত দেবার নাম করে ডেকে পাঠিয়ে আবারো আক্রমণ চালায়। তিন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হন, আহত হন উনিশ জন। কয়েকজন জয়াবেন ঠাক্করের সাথে পরিচিত ছিল। তারা মকরপুরা থানায় গিয়ে, জয়াবেনের নামের সাহায্য নিয়ে এফআইআর করে। পুলিশ কিছু বিষয় লিখে নেয়, কিন্তু আমাদের এখানে আসেনি। দলটার ওই লোকগুলোর মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। চেনা যায়নি। ওরা 'হর হর

www.pathagar.com

মহাদেব' বলে চেঁচাচ্ছিল। যে কয়েকজন হিন্দু আমাদের সাহায্য করতে আসে, ওরা তাদের ধমকায় আর শাসানি দেয়। নিরাপত্তার জন্য পুলিশের কাছে যেতে গেলে, কমবয়সী ছেলেদের একটা দল, ওঁদের একধারে আটকে দেয়। দলটা আমাদের সবদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল। পুলিশ এলে পুলিশকে গুলি চালাতে বারণ করা হয়। কারণ ওদের মধ্যে পুলিশ বসতির ছেলেরাও ছিল। শেষকালে, পুলিশ বসতির অধিবাসী আবদুল চাচার অনুরোধে, আমরা ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ পাই।

**সন্তানদের বিষয়ে উদ্বেগ ঃ**

ক্যাম্পের সব মহিলারাই মনে করেন, যতদিন ক্যাম্প চলবে তাঁরা নিরাপদ। কিন্তু ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত সকলেই। যদিও অধিকাংশই তাঁদের ঘরবসত— পুনর্বাসন নিয়ে ভাবছেন, কিন্তু যে একটা বিষয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথা জুড়ে বসছে, তা হল ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া। ক্যাম্পে ২৫০-৩০০ বাচ্চা রয়েছে। যেহেতু তারা স্কুলে যেতে পারছে না, সেই জন্য কেউ যদি এখানে এসে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতেন, তাহলে ভালো হতো বলে মনে করেন মহিলারা।

**নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরে ফিরে আসা বিষয় ঃ**

ভবিষ্যত নিয়ে আশংকা, মৃত্যু, বিপর্যয় এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির ধ্বংস বিষয়ে ছেলেদের সুস্থিতি ও লেখাপড়া নিয়ে ভাবনা। আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে ভাবনা, বিশেষত উপার্জনকারীরা যারা গ্রেফতার অথবা নিরুদ্দেশ। জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা—বিশেষত ত্রাণশিবিরের পরবর্তীকালে। স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রতিবেশীদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ।

কোরআনের অপমানে এবং মসজিদ/দরগার ধ্বংস/ক্ষতিতে ক্ষোভ। ক্রোধ এবং বিহ্বলতা, রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায়, বিশেষত পুলিশের। গুজরাত তথা ভারতের প্রতি মমত্ববোধের পুনরাবৃত্তি, এক্ষেত্রে নিজ পরিবার তথা সম্প্রদায়ের অবদানের উল্লেখ। হামলাবাজ এবং পুলিশের তরফে স্পষ্ট ধর্মীয়-যৌনতামূলক ইংগিতে ব্যক্তিগত ব্যথা, সমষ্টিগত অমান্যতা ও অবমাননার বোধ।

**দাবীসমূহ ঃ**

"দাঙ্গা"র দিনগুলির মধ্য দিয়ে বহু মহিলা নেতৃত্বের আসনে উঠে এসেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৭ মার্চ, মেয়েরা একত্রে পুলিশকে ঘেরাও করেন, যখন পুলিশ যথেচ্ছভাবে ছেলেদের নির্যাতন করছিল আর গ্রেফতার করছিল। রাওয়ামনপুরার সাজিদার মতো মহিলারা প্রতিকূল পরিস্থিতির

www.pathagar.com

মধ্যেও প্রচণ্ড সাহস ও স্থিরতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া, প্রায়শই যখন শুধু মেয়েদের জন্য কার্ফু লাঘব করা হয়েছে, মেয়েরা সাংসারিক কাজ কর্মের পাশাপাশি, ঘরের বাইরের বহু কাজও সামাল দিয়েছেন। দুটি সম্প্রদায়ের অশান্তি সত্ত্বেও, দুই সম্প্রদায় থেকেই বেশ কিছু মহিলা প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন। বহু মহিলা দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন।

**সবার ওপরে, মেয়েরা চান ঃ**

রাজ্যে দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক।
জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক।
হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসীদের মধ্যে আপোস মীমাংসা হোক।
ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হোক।
পক্ষপাতী পুলিশ ও প্রশাসকদের সরানো হোক, মুখ্যমন্ত্রীকেও।

গুজরাত সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের বিষয়ে যা ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে মেয়েদের সমস্যা বা চাহিদার কোন প্রতিফলন নেই। বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ তথা পুনর্বাসনের ঘোষণা যদিও গুরুত্বপূর্ণ (তবে, কোনভাবেই প্রয়োজনোপযোগী নয়) কিন্তু দৈনন্দিন জীবিকার্জনের বিষয়ে মহিলাদের দুর্ভাবনা তা মেটায় না। বিশ্বাসভঙ্গের বোধ বা নিরাপত্তাবোধের অভাবকেও ঘুচিয়ে দেয় না। এখনো পর্যন্ত সামাজিক পুনর্বাসনের বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই এড়িয়ে গেছেন। আর সামাজিক পুনর্বাসনের এই প্রশ্নটাই এখন মেয়েদের মনে সর্বাগ্র স্থানে রয়েছে।

লেখক ঃ প্রীতি প্যাটেল, প্রতিমা প্রজাপতি, সুনীতা পারমার, গীতা রাধোয়া, রক্ষা প্রজাপতি, শোভা শাহ (সকলেই 'শিশু মিলাপ' থেকে), শেরবানো, রীতা চৌকশি, মুবিন কাদারি, তৃপ্তি শাহ (সকলে 'সাহিয়ার' থেকে), বেলা ওয়াখেলা, মমতা, ভাবনা, শান্তি, নিমিশা দেশাই, (সকলে 'ওলাখ' থেকে), রঞ্জনা, লক্ষ্মী ('সহেলী' থেকে), চয়নিকা, অপূর্বা (ফোরাম এগেইনস্ট অপ্রেসন অফ উইমেন), হাসিনা ('আওয়াজ-এ-নিশওয়ান'), মায়া ভালেচা (আইসিএস), রীতিকা খেরা, জাহানারা রহরেজ, বীণা শ্রীনিবাসন, নন্দিনী মঞ্জুরেকর, দীপ্তা আচার, রেণু খান্না।

www.pathagar.com

# গুজরাত গণহত্যা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ
# জনস্বাস্থ্যের এক চূড়ান্ত বিপর্যয়

## মেডিকো ফ্রেণ্ড সার্কেলের একটি তদন্তের প্রতিবেদন

## মে ২০০২

অনুমান করা হচ্ছে যে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ থেকে গুজরাতে যে গণহত্যা চলেছে তাতে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু মিলিয়ে ২০০০-এর বেশি মানুষকে খুন করা হয়েছে। এক লাখের বেশি মানুষকে ত্রাণ শিবিরগুলিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এর ফলে চিকিৎসক সমাজ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর প্রবল চাপ পড়েছে। রাজ্য সরকার তার জনগণকে রক্ষা করার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। অসংখ্য প্রতিবেদন রক্তপাতে রাষ্ট্রের সহযোগী ভূমিকা এবং আক্রান্তদের যথেষ্ট ত্রাণ দিতে তার অনীহা নথিভুক্ত করেছে।

এই পটভূমিতে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাদার ও কর্মীদের এক সর্বভারতীয় স্বেচ্ছামূলক জোট, মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল, গুজরাতের হত্যা ও মারদাঙ্গায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পেশায় যুক্ত মানুষদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি তদন্ত করে।

### দলের সদস্যরা ঃ

ডঃ রীতু প্রিয়া, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি; শ্রীমতী সরোজিনী এনবি সামা, দিল্লি এবং আহ্বায়ক, মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল, দিল্লি ; ও শ্রী এস শ্রীনিবাসন, লোকোস্ট, বরোদা, গুজরাত সফর করেন ১৫-১৮ এপ্রিল। ডঃ অভয় শুক্লা এবং ডঃ সুনীতা বন্দেওয়ার, সেহাট, পুণে ; ডঃ ধ্রুব মানকড়, মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল, নাসিক ; শ্রীমতী জয়শ্রী ভেলাঙ্কর, ফোরাম ফর উইমেন্স হেল্‌থ, মুম্বাই এবং শ্রীমতী নেহা মাধিওয়ালা, সম্পাদিকা, মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল বুলেটিন, ২৫-২৯ এপ্রিল সফর করেন।

### সফর করা এলাকা ঃ

দলের সদস্যরা আমেদাবাদ, বরোদা, পাঁচমহল ও দাহোদ জেলার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ৯টি শিবির এবং দুটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁরা কথা বলেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে, আমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে, ত্রাণ শিবিরগুলোর চিকিৎসা অধিকর্তাদের সঙ্গে, সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক এবং বেসরকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে

www.pathagar.com

মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং ত্রাণকার্যে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। তাঁরা শিবিরগুলির বাসিন্দা এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথেও আদানপ্রদান চালান।

### ত্রাণ শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্যের অবস্থা ঃ এক সার্বিক সংকট

**হিংসার প্রত্যক্ষ প্রভাব ঃ** অন্যান্য প্রতিবেদনে যে ব্যাপক পাশবিকতা ও ধর্ষণের ধারাবাহিক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, আমরা কথাবার্তা বলে তার সমর্থন পেয়েছি। যাঁরা উদ্বর্তিত, তাঁরা এখনো বন্দুকের গুলি, ব্যাপক পুড়ে যাওয়া, ছুরিকাঘাত ও অন্যান্য গুরুতর আঘাত থেকে সেরে উঠেনি। অনেকে স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক আঘাত এক গভীর সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যার ফল হবে দীর্ঘমেয়াদি।

**বৃহত্তর মহামারীর বিপদ ঃ** হাম, চিকেন, পক্স, টাইফয়েড এবং ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যে দেখা গেছে। হাজার হাজার শিশু শ্বাসযন্ত্রে কড়া সংক্রামক রোগ এবং ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে। জল এবং শৌচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সক্রিয় উদ্যোগের অভাবে, খুব বড় রকম মহামারী হতে পারে।

### স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জবাব ঃ

শিবিরগুলিতে ও বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য যুগ্মভাবে কাজ করছে রাজ্য এবং পৌর পরিষেবাগুলি। যেখানে এমনকি সাধারণ পরিস্থিতিতেও জনস্বাস্থ্য পরিষেবা অপ্রতুল, সেখানে এদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তার ওপর এখন তো রয়েছে সংকট এবং সাম্প্রদায়িক পরিবেশের বাড়তি বোঝা। কিন্তু এইসব উদ্যোগ সাধারণ অবস্থায় যা দেওয়া হয়, তার বেশি যায় না। সুতরাং খুবই অপ্রতুল। দায়সারাভাবে এটুকু পরিষেবা দেওয়া স্বাস্থ্য কৃত্যকদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

যেইসব মানুষ চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির কাছে যেতে পারেননি, পরিষেবারাও কোনো চেষ্টা করেনি, তাঁদের কাছে পৌঁছতে। একই সঙ্গে, চলমান হিংসার অর্থ হল, শিবিরগুলিতে সেবারত স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদাররা মনে করছেন, তাঁরা বিপন্ন। ফলে চিকিৎসাধীনদের চাহিদার প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

২০০১ সালে গুজরাতে ভূমিকম্পের পর যে ব্যাপক মাত্রায় ধর্মীয় নয় এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনরা সমাবেশ করেছিল, পরিদর্শনকারী দল এবার

www.pathagar.com

তা দেখতে পায়নি। কিন্তু যাঁরা ত্রাণের কাজে লিপ্ত, তাঁরা রাষ্ট্র এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিদের হুমকি ও শারীরিক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ভাল কাজ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রয়োজনীয় সার্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয়নি। তারা টীকা দেয়, মা ও শিশুদের যত্ন নেয়ার কিছু ব্যবস্থা করে এবং সীমিত আকারে আউট পেসেন্ট পরিষেবা দেয়। যথাযোগ্য জল সরবরাহ ও শৌচ ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তারা সক্রিয়ভাবে কোনো চেষ্টা করেনি। একটি সার্বিক উদ্যোগের মধ্যে থাকতে হবে বড় ধরনের আঘাতের চিকিৎসা, দীর্ঘ মেয়াদি রোগের চিকিৎসা এবং নৃশংস হিংসার শিকার হওয়া বা তা প্রত্যক্ষ করার ফলে যে মানসিক পীড়া, তার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা।

মানসিক পীড়া জনিত চাপের ফলে বিশৃঙ্খলা, যা হল এ রকম সব ক্ষেত্রে এক সুপরিচিত পরিণতি, তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ও তাকে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা এক বিশেষ সমস্যা হিসেবে স্বীকার করার কোনো চিহ্ন নেই। অনুভূতি সংক্রান্ত সমর্থন দিচ্ছেন একমাত্র শিবিরের স্বেচ্ছাসেবীরা, যাঁদের এ কাজের জন্য না আছে তালিম, না আছে সরকারী সমর্থন।

বিদ্যমান পরিষেবা মেয়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদার কোনো স্বীকৃতি দেয় না এবং এ পরিষেবা যেন মেয়েরা আরো সহজে পেতে পারে, সে জন্য কোনো উদ্যোগও নেই। শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে শিবিরগুলিতে সন্তানের জন্ম দিয়েছে, প্রধানত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে এবং কোন রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াই। এই মেয়েদের এবং কার্ফু কবলিত এলাকার মেয়েরা, নিজেরা স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইবার মতো অবস্থাতেই নেই।

প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদন অন্যান্য তদন্তের ফলাফলকে সমর্থন করে জানাচ্ছে, ব্যাপক ও ধারাবাহিক যৌন আক্রমণ ঘটেছিল। এমন বহু রিপোর্ট আছে যে, মেয়েরা এমন অবস্থায় হাসপাতালে এসেছে, যাতে ডাক্তারদের অবশ্যই যৌন আক্রমণ সন্দেহ করার কথা। তবু, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যেসব হাসপাতালে যান, সেখানকার ডাক্তাররা বলেন যে, যৌন আক্রমণের কোনো মামলা করা হয়নি—অর্থাৎ, যৌন আক্রমণের স্পষ্ট চিহ্নগুলোকে অবহেলা করা হয়েছে। ফলে, যৌন আক্রমণের কোনো চিকিৎসাশাস্ত্র ভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে মেয়েরা ন্যায়বিচার চাইতে পারে।

সরকারী হাসপাতালগুলি কাজ করে চলেছে তাদের মুসলিম রোগীদের বিরুদ্ধে হিংসার হুমকির মধ্যেই। দাঙ্গাবাজ জনতা একাধিক হাসপাতাল আক্রমণ করেছে, আহতদের ঢুকতে দেয়নি, ওয়ার্ডগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, রোগীদের ও তাদের আত্মীয়দের ভয় দেখিয়েছে ও আক্রমণ করেছে। মনে

www.pathagar.com

হয় না যে সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সুরক্ষা করার এবং জনগণ যাতে তা পেতে পারেন সেই পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার কোনো চেষ্টা করেছে। তবু, হাসপাতালগুলিত কর্মরত স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদাররা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করেছেন ; সম্প্রদায়গত তারতম্য করে বৈষম্যমূলক চিকিৎসা করেননি। এটা প্রশংসনীয়।

সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রোগীদের পৃথকীকরণ বা মুসলিম কর্মীদের সহানুভূতি-ছুটি দেওয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বিপন্ন করে এবং পেশার মধ্যে আরও মেরুকরণ ঘটাবে। প্রশাসন হয়তো এইভাবে কাজ করেছে, কারণ রাষ্ট্র রোগী ও কর্মীর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করেছে।

### স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিযুক্ত পেশাদারদের ওপর প্রভাব

ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য হিসেবে, চিকিৎসা ক্ষেত্রের কিছু পেশাদার ব্যক্তি গুজরাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার ও আঘাত করার দোষে দুষ্ট। তাঁরা এমন এক ভূমিকা পালন করেছেন, যা সেবা প্রদানকারী হিসেবে তাঁদের যে পেশা, তার বিপরীতে যায়।

চিকিৎসক সমিতি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার করেছে এবং ত্রাণ সমাবেশের কোনো চেষ্টা করেনি। ডাক্তারদের ওপর আক্রমণকে নিন্দা করা হয়েছে কেবল ডঃ অমিত মেহতা আক্রান্ত হওয়ার পর—যা ঘটেছে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা, যদিও এর আগেই অন্য বহু (মুসলিম) চিকিৎসকের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে এবং তাঁরা শারীরিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এই প্রথমবার, হিংসার সময়ে ডাক্তারদের রেহাই দেওয়া হয়নি। ডঃ মেহতার ওপর আক্রমণের ঘটনাকে বিকৃত করে বলতে চাওয়া হয়েছে যে হিন্দু ডাক্তাররা আক্রান্ত হচ্ছে তাঁরা যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সেবা করছেন তাদেরই হাতে। এটা তথ্যের বিকৃতি এবং এটা ডঃ মেহতার আবেগের প্রতিও অন্যায় করছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিযুক্ত পেশাদারদের ধর্মীয় পরিচিতির ওপর যে জোর আরোপ করতে চাওয়া হচ্ছে তা বিপজ্জনক। এই পেশাকে নিরপেক্ষ ও মানবিকতা সম্পন্ন হতে হবে—এবং জনসমক্ষে দৃশ্যমান হবে সেইভাবে।

সার্বিকভাবে ডাক্তাররা পেশাদারি ব্যবহার করেছেন কথাটার এক সংকীর্ণ অর্থে। তাঁরা সক্রিয়ভাবে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেননি, কিন্তু তাঁরা তাঁদের রোগীদের ও তাঁদের সহকর্মীদের অধিকার রক্ষা করতেও কোনো চেষ্টা করেননি। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক সাক্ষ্য নথিভুক্ত

www.pathagar.com

না করে, তাঁরা তাণ্ডব থেকে যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন—তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করেছেন।

**চিকিৎসা বিষয়ক আইনি প্রসঙ্গ ঃ**

'চিকিৎসা বিষয়ক আইনি নথিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু খামতি, কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ছাড়া চোখে পড়ে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পোস্ট মর্টেম করা হয়নি এবং চিকিৎসা বিষয়ক আইন সংক্রান্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মৃত্যুপূর্ব ঘোষণা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। আমরা জানি না এটা ইচ্ছাকৃত কিনা, কারণ সাধারণ অবস্থাতেও এ রকম ত্রুটি খুবই দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ত্রুটির ফল জীবিতদের ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রচেষ্টার ওপর খুবই নির্ভরশীল।

**সুপারিশ**

গুজরাতে আজ কোনো রকম সর্বাত্মক জনস্বাস্থ্য বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা বা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ওই রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরানো হচ্ছে এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি আলোচিত হচ্ছে।

১. কোনো অবস্থাতেই জীবিতদের পুনর্বাসনের আগে ত্রাণ শিবিরগুলি ভেঙে দেয়া চলবে না। পুনর্বাসনের মধ্যে পড়ে চিকিৎসার পরিষেবা, ক্ষতিপূরণ ও আবাসনের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জীবিকা ফিরিয়ে দেওয়া।

২. একটি স্বাধীন স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করতে হবে। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দরকার, যাতে শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্যের পরিস্থিতির তদন্ত করা হবে, পুনর্বাসনে কী প্রয়োজন তা যাচাই করা হবে, যৌন আক্রমণের শিকার যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ করা হবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত পেশাদারদের ওপর প্রভাবের মূল্যায়ন করা হবে এবং হত্যা ও তাণ্ডব থেকে যে চিকিৎসার আইনী দিক সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলো বেরচ্ছে তাদের বিচার করা হবে।

৩. স্বাস্থ্য পরিষেবাসমূহের ওপর আক্রমণগুলিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে হবে এবং এই কাজ করেছে যারা, তাদের শাস্তি দিতে হবে, যাতে এই পরিষেবা যে অলঙ্ঘনীয় মানবিকতাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাদের এই পবিত্রতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৪. রোগী, হাসপাতালের কর্মী এবং শিবিরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া ও সেখান থেকে ফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

৫. শিবিরগুলিতে জল সরবরাহ ও শৌচ ব্যবস্থাসহ বাসের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের ও শিশু সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছেন এমন মায়েদের এবং সদ্যজাত ও ছোট বাচ্চাদের জন্য, বিশেষ পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্ত করতে হবে এবং এজন্য রাখতে হবে ওইখানে বসানো স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, যথাযোগ্য সুপারিশ ব্যবস্থা এবং স্ত্রীরোগ, মানসিক স্বাস্থ্য ও ফিজিওথেরাপি সহ বিশেষীকৃত পরিষেবার ব্যবস্থা।

৭. স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে এবং স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক যত্নসহ মেয়েদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে অনুভূতিশীল করে তুলতে হবে।

৮. যৌন আক্রমণের ঘটনা নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে মেয়েরা যৌন আক্রমণের পরবর্তী অবস্থায় হাসপাতালে আসে, তাদের চিকিৎসা সম্পর্কিত পরীক্ষা করায় কেন ত্রুটি হয়েছিল তার তদন্ত করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং যারা বেঁচে ফিরেছে তাদের বয়ানকে অপরাধের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গ্রহণ করতে হবে। যৌন আক্রমণের জীবিত শিকারদের জন্য যথেষ্ট চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে।

৯. মানুষের তৈরি এই 'বিপর্যয়ের' ফলে যে বড় রকমের মনস্তাত্ত্বিক বিপাক ঘটেছে, রাজ্য প্রশাসনকে তার প্রমাণ মেনে নিতে হবে। মানসিক মদত তখনই সফল হতে পারে, যখন মানুষের বিরুদ্ধে যে অপরাধগুলো করা হয়েছে, তার জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া যায়।

১০. হিংসায় অংশগ্রহণকারী ডাক্তাররা নৈতিকতা ও মানবাধিকার যে প্রকটভাবে লঙ্ঘন করেছেন (দ্রষ্টব্য, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, কোড অফ মেডিক্যাল এথিকস, ৩নং ধারা), তাতে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে তাদের কাজের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। যেসব ডাক্তারের হিংসায় উস্কানি দেওয়া বা অংশগ্রহণ করা প্রমাণিত হয়েছে, তাদের ওপর থেকে স্বীকৃতি তুলে নিতে হবে।

১১. সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নৈতিক ব্যবহারের দিকনির্দেশক নিয়মাবলী সৃষ্টি করতে হবে। এই পেশার ও তার পেশাগত সমিতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক আচরণ চিকিৎসা বিষয়ক নৈতিকতার পরিপন্থী (দ্রষ্টব্য, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, কোড অফ মেডিক্যাল এথিকস, ৪নং ধারা),

www.pathagar.com

ডাক্তারদের সামাজিক উৎস নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) এবং অন্যান্য পেশাদার সংস্থাদের সব ডাক্তারের ওপর আক্রমণের নিন্দা করতে হবে।

১২. চিকিৎসা সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ধারাবাহিকভাবে নথিভুক্ত করা হলো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশার একটা নৈতিক দায়িত্ব (দ্রষ্টব্য, মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, কোর্ড অফ মেডিক্যাল এথিকস, ৩১নং ধারা)। মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য শবচ্ছেদের সময়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিধি মেনে চলা দরকার। গভীরভাবে আহত রোগীদের সবক্ষেত্রে মৃত্যুপূর্ব উক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অডিট করতে হবে এবং নমুনামূলক কিছু পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এক দল স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

১৩. যেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণ ধ্বংস করা হয়েছে বা অন্য কারণে তা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যেসব দেহ কেউ দাবী করেনি, পুলিশকে সেগুলি ৭২ ঘণ্টা যথাযথভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীগুলিতে আমাদের সহকর্মীদের কাছে আমরা এই মানবিক সংকটে সাড়া দিতে ও সেবা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও অন্যায়ের প্রতিকারে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আবেদন করছি।

## নারী সংগঠনের স্মারকলিপি

### ১ মে, ২০০২

গুজরাত, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও মুম্বাইয়ের ২৫টি নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা, যাঁরা ১ মে ২০০২ বরোদায় এক সভায় মিলিত হয়েছি, তারা কঠোরভাবে এই রাজ্যের মানুষের ওপর, বিশেষত নারী ও শিশুদের ওপর যে পরিকল্পিত ও ভয়াবহ হিংসা নামিয়ে আনা হয়েছে তার নিন্দা করছি। জাতির সামনে মেয়েদের বিরুদ্ধে যে হিংসা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, আমরা তার চরিত্র ও ব্যপ্তি খুলে ধরতে চাই। দু-মাস হয়ে গেছে এবং মানুষ যে ভয় ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে তা প্রচণ্ড। এটা তাদের বেড়ে গেছে এই কারণে যে, এমনকি বড় বড় ত্রাণ শিবিরগুলি, যেগুলি হল খুনে জনতার আক্রমণ থেকে পলাতক মানুষের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং যেখানে দশ হাজারের বেশি লোক থাকে, সেখানেও আমেদাবাদ ও অন্যত্র আক্রমণ ঘটেছে। স্বাধীন দলসমূহের একাধিক তথ্যানুসন্ধানকারী

www.pathagar.com

প্রতিবেদন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন বিশ্বাস করতে বাধ্য করার মতো প্রমাণ দেয় যে, মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন হিংসা প্রয়োগ করা হয়েছিল। মেয়েদের নৃশংস ধরনের যৌন আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে এবং তাদের অনেককে তারপর পুড়িয়ে মারাও হয়েছে। বহু নারী ও শিশু তাদের আত্মীয়দের গণ যৌন আক্রমণ ও তৎপরবর্তী হত্যার সাক্ষী হয়েছে। গণহত্যাকাণ্ড থেকে যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন, তাঁদের মানসিক সংকট প্রবল হতে বাধ্য। হিংসা ঘটে চলেছে, রাষ্ট্র তাতে সহযোগিতা করছে এবং অপরাধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা করছে, এই রকম পরিস্থিতিতে এইসব অপরাধমূলক কাজের রিপোর্টও হয়নি, শাস্তিও হয়নি। তাঁদের যন্ত্রণা বেড়ে গেছে, কারণ মেয়েরা গণহত্যার পর পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত তথাকথিত 'চিরুনী তল্লাশি'র নামে শারীরিক, মৌখিক ও যৌন লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। উপরন্তু, বহু জায়গায় শিবিরগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং মানুষ যেখান থেকে পালিয়ে গেছে, সেখানে তাদের বাড়ি পুড়িয়ে, মাটিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা দেখেছে তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের উলঙ্গ করা হয়েছে, পেটানো হয়েছে, পোড়ানো হয়েছে, ধর্ষণ করা হয়েছে ও অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। গুজরাত সরকারের এক নির্দেশনামা বেরিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, সব শিবির যেন ৩১ মে, ২০০২-এর মধ্যে ভেঙে দেয়া হয়, অথচ দাহোদ জেলার শিবিরগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, লোকজনকে দাহোদ জেলায় পুনর্বাসন না করেই। যথাযথ পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তার অনুপস্থিতিতে আক্রান্ত নাগরিকরা কোথায় যাবেন-? রাজ্যে প্রশাসনযন্ত্র ভেঙে পড়েছে, মানুষ এক অসহায়, বিপন্নভাবে জীবনযাপন করছেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা নিম্নলিখিত দাবীগুলো পেশ করছি ঃ

- ❐ যাঁরা শিবির থেকে বেরিয়ে নিজেদের মনোমত নিরাপদ এলাকায় যেতে চান, রাষ্ট্রকে তাঁদের জন্য জমি দিতে হবে এবং একক মেয়ে ও নারী-শীর্ষক গৃহদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরি করতে হবে।
- ❐ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পরিমাণ অন্তত ভূমিকম্প আক্রান্তদের সাথে তুলনীয় হতে হবে।
- ❐ শিবিরগুলো মানবিকভাবে চালানো ও তদারকির পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া উচিত। শিবিরগুলো আতঙ্কজনক শৌচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া আবশ্যক। শিবিরের সমস্ত অধিবাসীর, বিশেষত মেয়েদের মানসিক সংকটের জন্য এবং গর্ভবতী মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

- শিবিরগুলির সংগঠকদের সঙ্গে এবং শিবিরে বসবাসকারীদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া শিবিরগুলি ভেঙে দেওয়া চলবে না।

- সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অবিলম্বে এফআইআর করতে হবে। বিশেষ করে, মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজের ক্ষেত্রে, আমরা দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করছি যেন বিশেষ আদালত গঠিত হয়। যেহেতু চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা সম্ভব হয়নি ও বহু ক্ষেত্রে মেয়েদের পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, তাই ওই আদালতকে সাক্ষ্যের নিয়ম নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই গঠন করতে হবে। যে অন্যান্য সাধারণ পরিস্থিতিতে অপরাধগুলি করা হয়েছিল এবং অপরাধের শিকারদের রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাওয়ার সুযোগ ছিল না বলে যে প্রমাণ রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আইনি প্রক্রিয়ার 'স্বাভাবিক' চাহিদাগুলিকে এই উপাদান নির্ভর করার দরকার আছে।

- পরিস্থিতির পক্ষপাতহীন পর্যালোচনার জন্য এবং বুঝাপড়া ও ন্যায়ের দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে, আমরা দাবী করছি যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও বিশেষ করে সংখ্যালঘু মেয়েদের, যে ভয়ংকরভাবে অধিকার হরণ করা হয়েছে তার মোকাবিলা করতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাদের ব্যবহার করা হোক। এ প্রসঙ্গে আমরা দাবী করছি যে তদন্ত ও পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসা বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক সহ অন্যান্য বিশেষ প্রতিবেদকদের ডাকা হোক।

স্বাঃ উত্থান—আমেদাবাদ।
টিআরইউ—বরোদা
সাহিয়ার—বরোদা
গুজরাত ফোরাম ফর উইমেন্স স্টাডিজ—আমেদাবাদ
ডিকেটি ইন্ডিয়া—বরোদা
জনকল্যাণ সেবা সমিতি, বিকাশ অধ্যয়ন কেন্দ্র—আমেদাবাদ
পিইউসিএল—বরোদা
শান্তি অভিযান—বরোদা
সিএসজে—আমেদাবাদ
আনন্দী—ভাবনগর
স্বাতী—ধাগন্দ্রা
মহিলা সমাখ্যা—বরোদা

www.pathagar.com

সাহর ওয়ারু—আমেদাবাদ
সিটিজেন্স ইনিশিয়েটিভ—আমেদাবাদ
বনাঙ্গনা—উত্তর প্রদেশ
ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেশন অফ উইমেন—মুম্বাই
আওয়াজ-এ-নিশওয়ান—মুম্বাই
মজলিস—মুম্বাই
জাগরী—দিল্লী
সহেলী—দিল্লী
এআইডি ডব্লু এ—দিল্লী
নিরন্তর—দিল্লী
সামা—দিল্লী
অঙ্কুর—দিল্লী
সিএইচআরআই—দিল্লী

www.pathagar.com

ড. পূর্ণিমা আদবানি
সভানেত্রী, জাতীয় নারী কমিশন
৮, দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ,
নয়া দিল্লী-১১০ ০০২
৬ই মে, ২০০২

**বিষয় ঃ গুজরাত বিষয়ক রিপোর্ট**

প্রিয় ড. আদবানি

এই চিঠি লেখা হচ্ছে, "জাতীয় নারী কমিশন কর্তৃক গুজরাতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে নারী ও কন্যা শিশুদের আস্থা ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য সৃষ্ট কমিটির প্রতিবেদন"-এর উল্লেখ করে। আমরা এই প্রতিবেদন সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ করতে চাই।

সবচেয়ে প্রথমে, আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, গুজরাতের হত্যাকাণ্ড ২৭ ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়ার ৫ সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে, কেবল ৯ এপ্রিল, অসম্ভব দেরী করে এই কমিটি নিয়োগ করা দেখায় যে এই ভয়ংকর ঘটনাগুলির প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভাব ঘটেছে।

উপরন্তু, গোটা প্রতিবেদন জুড়ে একটা ব্যর্থতা প্রকট, যা হলো, গুজরাতের মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণটা যে সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল ও পূর্ব পরিকল্পিত, সেই বিষয়ে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার না করা। এই রকম একপেশে হিংসাকে "সাম্প্রদায়িক গোলযোগ" বা "দাঙ্গা" বলা যায় না, যেমন বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। আমরা ২২-২৭ মার্চ ফোরাম এগেইনস্ট অপ্রেসন অফ উইমেন, মুম্বাই, আওয়াজ-এ-নিশওয়ান, মুম্বাই এবং সাহিয়ার, বরোদার সঙ্গে যৌথভাবে একটি নারী দলের অংশ হিসেবে গুজরাতে সফর করেছি। পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (বরোদা)-এর প্রতিবেদন "মেয়েদের দিশা" শীর্ষক অধ্যায়ের একাংশ হল আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল। এ তদন্তের ফলে আমরা অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হল, গোধরার অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণসমূহ ও প্রশাসনের মদত এবং তাকে সবচেয়ে যথাযথভাবে বলা যায় গণহত্যা (genocide)।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে, প্রতিবেদনের কোথাও হিংসার স্রষ্টাদের চিহ্নিত করা হয়নি। আমাদের নিজেদের পাওয়া তথ্য, অন্যান্য স্বাধীন তথ্যানুসন্ধানকারী দলের প্রতিবেদন এবং গণপ্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, স্পষ্টতই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সশস্ত্র বেসরকারী ফৌজকে দায়ী করে। যারা অপরাধী, তাদের নামকরণ এড়িয়ে যাওয়া গভীরতম ধরনের হিংসার শিকার যাঁরা, তাঁদের মনে নিরাপত্তাবোধ সঞ্চার করতে পারে না। যে পরিস্থিতিতে হিংসার স্রষ্টারা এখনো বহাল তবিয়ত রয়েছে এবং নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আক্রান্ত সম্প্রদায় লুকিয়ে আছে শিবিরে, এবং নিরাপত্তার এতই অভাব যে, সেখান থেকে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না, সেখানে আপনাদের অজুহাত, যে প্রতিবেদনের মন্তব্যগুলি "খুব সংযত ভাষায়" করা, যাতে "অনুভূতি আরো উত্তপ্ত না হয়," আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যদি দোষীদের শনাক্ত করা ও গ্রেফতার করা না হয়, তবে আক্রান্ত মানুষদের কেউ ন্যায়ের আশা করতে পারেন না।

প্রতিবেদনে এই গণহত্যায় রাজ্য সরকারকে সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, রাজ্য সরকার শুধু এখন পর্যন্ত আক্রমণ "হাত দেওয়ার" দোষে দুষ্ট, তাই নয়, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধর্ষণে অংশ নিয়েছিল। বিজেপি সরকারের সদস্যদের এফআইআর-এ নাম করা হয়েছে। অন্যান্য প্রমাণ, যথা যেসব পুলিশ অফিসাররা হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন তাঁদের বদলি করে দেওয়া, দেখায় যে অসামরিক প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে এক সংখ্যালঘু বিরোধী সরকার।

সুতরাং প্রতিবেদন যখন সুপারিশ করে যে, "মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সবক'টি সংস্থাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে," তখন আমরা বুঝতে পারি না, তা কীভাবে করা যাবে, যদি না যেসব অফিসাররা নিজেরা দায়িত্ব পালন করেনি এবং যেসব রাজনীতিবিদরা গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

জাতীয় নারী কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী নাফিসা হুসেন যেভাবে একটি নারী অনুসন্ধানকারী দলের স্বাধীন প্রতিবেদনকে "বাড়াবাড়ি" বলে খারিজ করেছেন এবং সে প্রসঙ্গে আপনার যে নীরবতা, তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের কাছে ভীতির সঞ্চারকারী ইংগিত পাঠায়, কারণ তাঁদের গণধর্ষণ, অত্যাচার, চরম যৌন হিংসা, অঙ্গচ্ছেদ ও খুনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতীয় নারী কমিশনের বিবৃতি শুধু এই তথ্যানুগ বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে না। উপরন্তু তা বিপজ্জনক, কারণ তা এসেছে মেয়েদের ভালোমন্দ দেখার ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ এক সংস্থার কাছ থেকে।

www.pathagar.com

যে মেয়েরা গত দু মাসের বেশি সময় ধরে অভূতপূর্ব ধরনের অত্যাচার সহ্য করেছেন তাঁদের কষ্টের প্রতি আপনাদের উদাসীনতা, সংখ্যালঘু মেয়েরা যে ভয়ানক হিংসার লক্ষ ছিলেন তা স্বীকার করতে আপনাদের আপত্তি এবং গুজরাত সরকার এ কাজে জড়িত থাকার জন্য তাকে নিন্দা করতে আপনাদের আপত্তি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ও হাত-পা গুটিয়ে থাকার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। আজ যখন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করেই ত্রাণ শিবিরগুলি গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, যখন আক্রমণাত্মক জনতা ত্রাণ শিবিরের বাসিন্দাদের হুমকি দিয়ে দাবী করছে যে, এফআইআর থেকে তাদের নাম প্রত্যাহার করতে হবে, এবং তাদের বাড়িতে ফেরার কোনো নিরাপত্তা নেই, তখন কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জাতীয় নারী কমিশনের সুপারিশগুলি যে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা নিয়ে ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের ফিরে যেতে হয় ২০০০ সালে, যখন আপনি একটি দলিল প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল ঃ "Rape-A Legal Study" (ধর্ষণ—একটি আইনগত বিশ্লেষণ)। তাতে আপনি এক অত্যাশ্চর্য ধারণা ছড়িয়েছিলেন যে, মেয়েদের পদানত অবস্থা শুরু হয়েছিল বিদেশি আক্রমণের ফলে। ওই গবেষণা শুধু যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উৎস সম্পর্কে বিদ্যমান সুবিশাল ঐতিহাসিক ও নারীবাদী সাহিত্যের বিষয়ে অজ্ঞ তাই নয়, বরং তা এক সাম্প্রদায়িক আখ্যানের আদলে রচিত। যদিও আমাদের এবং অন্যান্য নারী সংগঠনের প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত ওই গবেষণা প্রত্যাহার করতে হয়, কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান গুজরাত সম্পর্কিত প্রতিবেদনে একই সাম্প্রদায়িক ছক এবং মুসলিম-বিদ্বেষী কুসংস্কার কাজ করছে।

প্রতিবেদনে গুজরাতের গণহত্যা সম্পর্কে আপনাদের যে অবস্থান, তা জাতীয় নারী কমিশনের প্রতি কোনো আস্থার জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই শীর্ষ সংস্থাটি নির্মিত হওয়ার সময় থেকেই জাতীয় নারী কমিশনের স্বায়ত্ব সম্পর্কে নারী সংগঠনেরা চিন্তিত ছিল। যখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন মানবাধিকার, নারী ও সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রসঙ্গসমূহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে যোগসাজশের এবং নিষ্ক্রিয়তার দায়ে অভিযুক্ত করেছে, সেখানে আমরা জানতে চাই, জাতীয় নারী কমিশনকে কোন্ রোগে ধরেছে ? জাতীয় নারী কমিশনের শাসক দলের শাখা হিসেবে নয়, সারা দেশের সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা উচিত। বর্তমান জাতীয় নারী কমিশন স্পষ্টতই এই ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

ইতি

ড. সাধনা আর্য

লক্ষ্মী মূর্তি

(সহেলীর পক্ষে)

অনুলিপি ঃ কমিটির সমস্ত সদস্যদের প্রতি ঃ

শ্রীমতী নাফিসা হুসেন, সদস্যা, জাতীয় নারী কমিশন

শ্রীমতী রেবা নায়ার, সদস্যা, জাতীয় নারী কমিশন

শ্রী ই এন রামমোহন, প্রাক্তন পরিচালক, বিএসএফ

শ্রী অনীস আহমেদ, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট

শ্রীমতী পিঙ্কি আনন্দ, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট

অধ্যাপিকা প্যাম রাজপুত, মহিলা দক্ষতা সমিতি, ও ডিরেক্টর, মানবীচর্চা কেন্দ্র, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়

ড. বসুধা ধাগামওয়ার, কার্যনির্বাহক ডিরেক্টর, মাল্টিপল অ্যাকশন রিসার্চ গ্রুপ (MARG) সহেলী উইমেন্স রিসোর্স সেন্টার

দোকান নং ১০৫-১০৮-এর উপর

ডিফেন্স কলোনী ফ্লাইওভার মার্কেট (দক্ষিণ দিক)

নয়া দিল্লি ১১০ ০২৪

দূরভাষ ঃ ৪৬১৬৪৮৫

❐

www.pathagar.com

# রাম রহিমের নামে বুদ্ধু বানাবে কে কাকে ?

–মৈত্রী ('গর্ভঘাতী গুজরাত' গ্রন্থ থেকে)

আমরা দেশের বেশির ভাগ মানুষই খুব সাধারণ। কোন রকমে খেটেখুটে দু' পয়সা কামাই। মেলা লেখাপড়া শিখে বিদ্বানতো হইনি, তাই ওরা ভাবে, আমাদের বোকা বানানো বড় সোজা। ওরা তাই ধর্ম নিয়ে দলবাজি করে, লোক ক্ষ্যাপায়। আমরা এত উজবুক নই যে কেউ আমাদের লেলিয়ে দেবে পাড়া প্রতিবেশীকে খুন করতে, আর আমরা তাই করব। যদিও গুজরাতে ওরা এমনটাই করতে পেরেছে।

### গুজরাতে কি হলো ? কি হচ্ছে ?

আজ দুমাস ধরে গুজরাতে মুসলমানেরা খুন হচ্ছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসের দুটো কামরায় আগুন লাগানো হয়েছিল। ৫৮ জন মারা যায় তাতে, তারা ছিল সাধারণ মানুষ আর অযোধ্যা থেকে ফেরা করসেবক। আমরা সবাই এই ঘটনাকে নিন্দা করি, প্রতিবাদ করি। কিন্তু গোধরাকে ছুতো করে সারা গুজরাতে যা হল, যা হচ্ছে তা কি আরো বীভৎস ভয়ঙ্কর নয় ? বেছে বেছে মুসলমানদের খুন করা হল, বাড়ীঘর পোড়ানো হল, অবাধে দোকানপাট লুটপাট করা হল। মেয়ে, বৌ, বাচ্চা, বুড়ো কাউকে রেয়াৎ করেনি ওরা।

> এই দু' মাসে ২০০০-এর বেশি মানুষ মারা গেছে গুজরাতে, এখনও যাচ্ছে। ১,৫০,০০০-এর বেশি মানুষ বাড়িঘর হারিয়েছে। এমনকি এখন ক্যাম্প ছাড়ার মত অবস্থা নেই কোথাও। বিশেষ করে মেয়েরা আর বাচ্চারা হয়েছে এই একতরফা দাঙ্গার সবচেয়ে বড় শিকার।

### মেয়েদের শরীর—দাঙ্গা, হত্যার সবচেয়ে বড় শিকার

হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান, সবসময়ই দেখা যায় দাঙ্গায় মেয়েদের আর তাদের শরীরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। গুজরাতেও তার অন্যথা হয়নি। সব সমাজ বা গোষ্ঠীই মেয়েদের শরীরকে মনে করে তাদের মানমর্যাদা রক্ষার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই যখনই দরকার হয় কোন গোষ্ঠীর মানমর্যাদা ধূলোয় লুটিয়ে দেবার তখন অন্য গোষ্ঠীরা প্রথমেই আছড়ে পড়ে মেয়েদের

www.pathagar.com

শরীরের ওপর। এইভাবেই ধর্ষণে, অত্যাচারে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েকুটে গুজরাতের মুসলমান মেয়েদের শেষ করেছে ওরা।

### ওরা বলে দাঙ্গা, আমরা বলি গণহত্যা

যতই ওরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাক যে গুজরাতের মুসলমান হত্যা গোধরার হত্যার বদলা হিসেবে ওখানকার হিন্দুদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আমরা জানি আসল ঘটনা তা নয়।

এদেশে দাঙ্গা আমরা কম দেখিনি, কিন্তু কখনও কি আমরা দেখেছি যে—

- ❐ হামলাবাজদের হাতে ঘোরে ভোটারলিস্ট বা জনগণনালিস্ট।
- ❐ তাদের হাতে থাকে ইন্‌কাম ট্যাক্স বা সেল্‌স ট্যাক্সের গোপন রিপোর্ট।
- ❐ দু মাস আগে থেকে বড় বড় শহরে উধাও হয়ে যায় গ্যাস সিলিন্ডার।

না, ওটা দাঙ্গা ছিল না। সরকারী মদতে ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংস্থা, বজরং দলের ছক কষে গণহত্যা ছিল ওটা ; আজও আছে। গোধরা ছিল কেবলই অজুহাত। গোধরা না ঘটলেও ওখানকার মুসলমানেরা মরতই। যেভাবে ঝাড়াই বাছাই চলছিল বহুদিন ধরে, খোঁজ চলছিল কোন্ অঞ্চলে বেশি মুসলমানরা থাকে, কোন্ পাড়ায় কোন্ মহল্লায় মুসলমানদের দোকানপাট বেশি, যেভাবে একটাই বাঁধা বুলি ওরা আউড়েছে—'মুসলমান হঠাও দেশ বাঁচাও' তাতে এটা বুঝতে কি কারো অসুবিধা হয় যে মুসলমান হলে বাঁচার অধিকার গুজরাতের মানুষ হারিয়েছিল, এমনকী মুসলমান হওয়ার অপরাধে মায়ের পেটের বাচ্চাকেও রেহাই দেয়নি ওরা।

### যেই রক্ষক সেই ভক্ষক

হ্যাঁ, আর এ কাজটা ওরা এত নিখুঁতভাবে, এত সহজে করতে পারল তার সব থেকে বড় কারণ সরকার আর পুলিশের পুরোপুরি মদত। তাই—

- ❐ হিন্দুরা ক্ষেপে উঠবে জেনেও মোদী সরকার গোধরায় মৃতদের দেহগুলিকে পোস্টমর্টেমের বদলে সাত তাড়াতাড়ি আমেদাবাদে নিয়ে এসে সবার চোখের সামনে সৎকার করেছে।
- ❐ প্রায় কয়েক মাস আগে থেকে সরকারে থাকা দল লাগাতার প্রচার করেছে সবরকম ভাবে মুসলমানদের ভাতে মারতে।
- ❐ হামলাবাজরা হামলার আগে পরে বলে বেড়িয়েছে 'ইয়ে অন্দর কা বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়।'

www.pathagar.com

- ❐ গত কয়েক মাস ধরে হোমগার্ডে কেবল বেছে বেছে করসেবকদের নেওয়া হয়েছে।
- ❐ অবাধে গণহত্যা চলার ৭২ ঘণ্টা পরও সেনা তলব করা হয়নি, এমনকি সেনা এসে পৌঁছানোর ১৬ ঘণ্টা পরও সরকার সেনা নামানোর আদেশ দেয়নি।
- ❐ দাঙ্গা বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল যে ২৭ জন পুলিস অফিসার রাতারাতি তাদের বদ্‌লি করে দেয়া হয়েছে।
- ❐ অভিযুক্ত হিন্দুদের বেলায় হালকা শাস্তি হবে এই রকম আইনের ধারায় মামলা করা হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের বেলায় অনেক কঠিন শাস্তি হবে এই রকম আইনের ধারায় মামলা করা হয়েছে।
- ❐ ক্ষতিপূরণ দেবার সময়ে হিন্দুদের দেয়া হয়েছে ২ লাখ টাকা আর মুসলমানদের দেয়া হয়েছে ১ লাখ টাকা।

এই রকম অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করে গুজরাতের এই গণহত্যায় পুলিস আর সরকার কতটা জড়িত ছিল। কিন্তু প্রশ্ন একটাই কেন ঘটলো এমনটা ? কোন মতলবে এই দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ রাজ্যকে ছারখার করে দেওয়া হল ?

### ওদের আসল মতলব—চাচা নিজের আখের গোছা

মতলব ওদের একটাই। ভোটে জিততে হবে। গত এক বছরে কোন রাজ্যের ভোটে জেতেনি ওরা। যেভাবে একটার পর একটা মানুষ মারা, শ্রমিক মারা নীতি নিয়েই চলেছে ওরা তাতে যে ভোটে জেতা যায় না সেটা ওরা ভাল করেই জানে, মানুষ ওদের জেতাবে না। তাই ভোট সাগর পার হতে ওদের শেষ পারানির কড়ি এখন 'হিন্দুত্ব'। সেজন্য সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ওরা বুঝিয়েছেন মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে, তাদের দোকানপাট অবাধে লুট করে, তাদের জায়গা-জমির দখল নিতে পারলেই তবে এদেশে হিন্দুরা ভাল থাকবে। তবেই প্রতিষ্ঠা হবে সোনার রামরাজ্য। আচ্ছা এই সোনার রামরাজ্যে সোনাটা ফলবে কার ঘরে ? কোনো গরীবের ঘরে কিন্তু নয়, এমনকি রামভক্ত গরিব হিন্দুর ঘরেও নয়।

### জাতের লড়াই বনাম ভাতের লড়াই

যতদিন যাচ্ছে ততই আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইটা কঠিন থেকে আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা সবাই ব্যস্ত কোন রকমে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবার অধিকারের জন্য যে লড়াই করা যায় তাই আজ আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। আর তাই এই

www.pathagar.com

ফাঁকফোকর দিয়ে মাথা তুলছে সেইসব সংগঠন যারা বলেই চলেছে আমরা চাষী নই, মজুর নই, ব্যাপারী নই, কারিগর নই, চাকুরে নই, কিচ্ছু নই—আমাদের একটাই পরিচয় আমরা হয় হিন্দু নয় মুসলমান। একেই যা দিনকাল পড়েছে তাতে আমাদের হাত আছে কিন্তু কাজ নেই, ক্ষিধে আছে কিন্তু ভাত নেই। এসব নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই, উল্টে ওরা চায় কোনো না কোনো ভাবে আমাদের মধ্যে এমন আগুন জ্বালাতে যাতে ক্ষিধের কথা ভুলে, কাজের কথা ভুলে আমরা সবাই তাতে পুড়ে মরি। এ মানুষ মারা আগুনই গুজরাতকে জ্বালিয়েছে, আমরা এই পশ্চিম বাংলায় কি পার পাবো তার থেকে ?

## কোন্ ভরসায় পশ্চিম বাংলায় আমরা আজ এত উদাসীন ?

ঐ পাড়াতে জ্বলছে আগুন
পুড়ছে ভিটে, উড়ছে ধোঁয়া
নিজের ঘরে দোরটি এঁটে মনের সুখে খাচ্ছি মোয়া
ভুলেই গেছি আমার ঘরেও মজুত আছে আগুন লাগার কাঠ কয়লা
ঐ আগুনের থেকে যদি উড়ে আসে একটি কণা
অমনি করে পুড়বে তবে আমার সাধের ভালবাসা

মনে করে দেখুন তো নয়-দশ বছর আগেও তো আমরা এত উদাসীন ছিলাম না। '৯২-এর দাঙ্গাকে আটকে ছিলাম আমরাই। সবাই মিলে মিছিলে পা মিলিয়েছিলাম, গান গেয়েছিলাম, সব শক্তি দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম দাঙ্গা ছড়াবার সব সম্ভাবনা। কিন্তু আজকে কোথায় সেই চেষ্টা ? তবে কি ভেতরে ভেতরে ভাগাভাগির বিষে আমরাও ধুঁকছি ? আসলে আমরা বোধহয় প্রতিবাদ করতেই ভুলেই গেছি। এখানেও রোজই বন্ধ হয়েছে কোন না কোন কলকারখানা, কয়েকশো লোক কাজ হারাচ্ছে, হাজারে হাজারে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজারে হাজারে মানুষকে—কিন্তু কোথায় সেই প্রতিবাদী গলা ? গুজরাতের গণহত্যাকে ঠেকাতে, অন্য কোথাও তার পুনরাবৃত্তিকে আটকাতে যাতে কেউ ফাটল ধরাতে না পারে সে নজরদারী রাখতে হবে আমাদেরই, এমনকি পুলিশ প্রশাসনের ওপর চোখ বুঝে ভরসা করাও চলবে না। পূজো-আচ্চা, নমাজ-আজান যার যার তার তার—তা নিয়ে আর নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি নয়, খুনোখুনি নয় কিছুতেই নয়।

www.pathagar.com

## আমাদের সবার দাবী হোক

- ✔ এই মুহূর্তে গুজরাতে নিরীহ নাগরিক হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট বন্ধ করতে হবে।
- ✔ অবিলম্বে মোদী সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।
- ✔ ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, বজরং দল সহ সবাই যারা এই দাঙ্গা করেছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
- ✔ এক তরফা দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ মদতদাতা সমস্ত পুলিশ কর্মচারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
- ✔ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেবার সময়ে হিন্দু-মুসলমান তফাৎ করা চলবে না।
- ✔ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত ঘরছাড়া মানুষকে তার ঘরে ফেরাতে হবে।
- ✔ হামলায় কাজ হারানো সমস্ত মানুষকে কাজ দিতে হবে।

## আজ তাই আমরা শপথ নিই

গুজরাতের গণহত্যার মতো ঘটনা আমরা আর কোথাও হতে দেব না। পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতের কোথাও নয়।

❐

www.pathagar.com

# গুজরাতে সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার নগ্ন নাচ

–মাওলানা আসরারুল হক কাসেমী

২৭ ফেব্রুয়ারী যা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, নিন্দনীয়, ঘৃণ্য এবং অমানবিক কাজ ছিল। বাহ্যিকভাবে বলা যায় যে, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সঙ্গীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য গুজরাত সরকার ও পুলিশ এবং প্রশাসন প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বিগত (প্রথম) এক সপ্তাহ যাবত জীবন্ত মানুষ দগ্ধ করার যে ঘটনা চলতে থাকে, গুজরাত সরকার, পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত সেনাবাহিনী সেটাকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ কেন ? অন্যান্য অনেক প্রশ্নের মধ্যে এ প্রশ্নটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়টা নিয়ে সমগ্র দেশকে, সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে, সকল বিরোধী পার্টিগুলিকে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে, মুসলমানদের প্রতিনিধিবর্গকে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার, যারা সামান্য বিষয় নিয়ে নিজেদের মর্যাদার ইস্যু করে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেন। এখন বাক-বিতণ্ডা ও বক্তৃতা দেওয়ার সময় নয়, এখন লেখনীতে ব্যস্ত থাকার সময়ও নয়, এখন বাস্তবে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ ও কাজ করার সময়। আজ গুজরাত জ্বলছে এবং সেই আগুনের শিখা ইউপি ও হরিয়ানায় পৌছেছে, আগামীকাল সমগ্র দেশ ঝলসে যেতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে এখনও ক্ষমতাসীন কর্তা ব্যক্তিদের চক্ষু খোলেনি।

অধিকাংশ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণ, কিছু রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি এবং খোদ মিডিয়ার রিপোর্ট এই বিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনা করসেবক যাত্রীদের অবিরাম অশালীন আচরণের পরিণতি ছিল, যা তারা অযোধ্যা থেকে করতে করতে আসছিল এবং এই ট্রেনের হতভাগ্য অন্যান্য হিন্দু যাত্রীদেরও সেটা পসন্দ ছিল না। বিখ্যাত অভিনেতা ও সাংসদ রাজ বব্বর যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, করসেবকরা অযোধ্যা থেকে গোধরা পর্যন্ত শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বিরক্ত করেনি, বরং সাধারণ হিন্দুযাত্রীদের সাথেও অশালীন আচরণ করেছে। যেসব যাত্রীর আসন সংরক্ষিত ছিল, তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাদের সংরক্ষিত আসন দখল করে নিয়েছে, এমনকি সেইসব ব্যক্তিরা টিকিট পর্যন্ত কিনে নি। তারা সাধারণ দোকানদার ও হকারদেরকে সরকারের মতই নিজের জায়গীর ও গোলাম ভেবেছিল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার পর তাদেরকে পয়সা দেয়নি—এই ধরনের অভিযোগ শুধু মুসলমানরা নয়, বরং হিন্দুরাও করেছে। গোধরা থেকে প্রায়

www.pathagar.com

২৬ কিলোমিটার দূরের বাসিন্দা এক আইনজীবির সাথে আমার টেলিফোনে বিস্তারিত কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ১৯৯২ সালে যখন গুজরাতের বিভিন্ন এলাকা থেকে করসেবকরা অযোধ্যা গিয়েছিল, তখনও তারা সাধারণ যাত্রী বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে অভদ্র আচরণ করেছিল এবং প্রত্যাবর্তনের পথে এক রকম কেয়ামত আরম্ভ করে দিয়েছিল। গোধরার ঘটনা বাহ্যত আকস্মিক ঘটে গিয়েছে। কিন্তু একটা সংগঠিত চক্রান্তের পরিণতি ছিল। সেই চক্রান্তের ফলেই সমগ্র আমেদাবাদের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হাজার হাজার উত্তেজিত দুর্বৃত্তদের দল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তীর, তরবারী, লাঠি, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমবেত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ এহসান জাফরী এবং তার পরিবারের সকলকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। বিদ্যাপুর, বায়ুনগর, ক্ষীরা থাসরা, ডাস্কুর এবং অন্যান্য অঞ্চলে ডজন ডজন মসজিদ ও বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পরেও হাজার হাজার বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মীরা ট্রাকভরে অস্ত্র, গোলা বারুদ, কেরোসিন তেল নিয়ে মুসলিম এলাকার দিকে নির্দ্বিধায় ও নির্ভিকভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। যদি গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনা কিছু অপরিণামদর্শী মুসলিমদের চক্রান্তের পরিণতি হত, তাহলে এহসান জাফরীকে পুড়ে মরতে হত না বা শত শত মুসলিম পরিবারকে শুকনো কাঠের মত পুড়ে ভস্মে পরিণত হতে হত না। বিশ্বহিন্দু পরিষদ এই চক্রান্ত অতি ব্যাপক আকারে করেছিল। চক্রান্তে রাজ্যের মোদী সরকার সমানভাবে দায়ী, কেননা দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার ২৪ ঘণ্টা পরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেনা নামানোর আবেদন করতেও ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় দেরী করা হয়।

যদি নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রদায়িক ও নিষ্ক্রিয় সরকার ২৭ ফেব্রুয়ারীর দুর্ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হত এবং আগাম সতর্কতাস্বরূপ পুলিশ প্রহরা বাড়িয়ে দিত তাহলে শত শত নিরপরাধ মানুষকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা যেত। এমতাবস্থায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কার্ফু জারি করা যেত। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। লাগামহীন দুর্বৃত্তরা কেমন ব্যাপক আকারে পরিকল্পনা করেছিল এবং তাদের ভয়ঙ্কর ক্রোধের উত্তেজনা কি পরিমাণে ছিল, আহমদাবাদের পুলিস কমিশনারের অসহায় অবস্থা থেকে তা অনুমান করা যায়। তিনি পরিস্থিতি সরেযমীনে দেখতে যাওয়ার পূর্বে নিজের দাড়ি কেটে

www.pathagar.com

ফেলা জরুরী মনে করেন। কেননা তার ভয় ছিল যে, তিনি হিন্দু হলেও তার দাড়ির জন্য দুর্বৃত্তরা তাকে মুসলিম ভেবে না বসে এবং তার সাথে সেইরূপ আবেদন না করে বসে যেমন অন্যান্য মুসলমানদের সাথে করা হচ্ছিল। একটু ভেবে দেখুন, পুলিস কমিশনার যদি এ রকম ভীত হয়ে পড়েন, তাহলে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র মুসলমানদের অবস্থা কি হতে পারে ! যাদের বাসগৃহগুলো হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা ঘিরে রাখে এবং কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেইসব মুসলমানদের পরিণতি কি হতে পারে। যাদের ঘরে 'দাড়ি কাটার ক্ষুর তো দূরের কথা, সব্জি কাটার ছুরি পর্যন্ত নেই।' পুলিস কমিশনারের এই অসহায়তা একথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, সমগ্র দেশে ভিএইচপি ও বিজেপির কর্মীরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, যদি প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে ধর্মীয় পরিচয় পরিত্যাগ করতে হবে। একজন পুলিশ অফিসার তো এমনও বলেছেন যে, তারা দাড়ি কাটার উপর ভরসা করছে না, বরং পরনের কাপড় খুলে পরিচয় দেখছে যে, তারা সত্যই হিন্দু না কি, জীবন বাঁচানোর জন্য 'ক্লিন শেভ' দাড়ি কেটে বেড়াচ্ছে। পুলিস অফিসারের এই কথায় প্রমাণ হয়ে যায় যে, তাদের প্রস্তুতি কেমন ব্যাপক আকারে ছিল, বড় বড় পুলিস অফিসারও নিজেরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। নরেন্দ্র মোদী ঠিক বলেছেন যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। একথা বলে তিনি সব ঘটনার অবসান করেছেন যে, মুসলিমরা করসেবকদের অগ্নিদগ্ধ করেছেন সেজন্য করসেবকদের সমর্থকরা মুসলিমদের অগ্নিদগ্ধ করছে, এতে আশ্চর্য বা অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদি অল্প সময়ের জন্য এইকথাটা মেনে নেওয়া হয় যে, উত্তেজনায় প্ররোচনাদানকারী ৫৭জন করসেবককে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা পূর্বেই করা হয়েছিল, তাহলে এখানে দুটো প্রশ্ন দেখা দেয়— প্রথমত এই পরিকল্পনার কথা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ আগে থেকে জানতে পারেনি কেন ? পুলিস প্রশাসন কোথায় ছিল ? দ্বিতীয়ত, এক সপ্তাহ ধরে (প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা এই নিবন্ধ) যে পাশবিক অগ্নি সংযোগের ঘটনা চলতে থাকে, তার সবগুলি কি কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই চলে। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, দুই ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী এই অযোগ্য সরকার এবং যার নেতৃত্ব দিচ্ছে এক অপরিণামদর্শী ব্যক্তি। যারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে, রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রজা, তাদের রক্ষার দায়িত্ব তার উপরেই অর্পিত। যারা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে, যার এই বোধ নেই যে, তার অশোভনীয় বিবৃতি আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করছে।

এ সময়ে গুজরাতে জীবন ধারণ করা শুধু সাধারণ মুসলমানদের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে তাই নয়, বরং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমানরাও এর থেকে

www.pathagar.com

নিরাপদ নয়। পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছে যে, আহমাদাবাদের অত্যন্ত সম্মানীয়, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রহরীদেরকেও দুর্বৃত্তদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আহমাদাবাদের স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস এআই সৈয়দের সজ্জিত গাড়ীকে একদল উত্তেজিত জনতা বাধা দেয় এবং ভিএইচপি আহূত বন্‌ধে সামিল হতে বলে। এআই সৈয়দের কথা হল যে, আমি খুবই নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে একজন আমার পোশাকে লাগানো নামের প্লেট দেখে চেঁচাতে লাগল, 'আরে এতো সৈয়দ।' একথার সাথে সাথে আমার উপর জনতা চড়াও হয়। কিন্তু ড্রাইভারের উপস্থিত বুদ্ধির কারণে সৈয়দ সাহেব এ যাত্রা বেঁচে যান, কিন্তু ভিতরে তিনি খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তার কথা হল যে, আমার বিশ্বাস ছিল যে, লোকেরা আমাকে পুলিস ইন্সপেকটর হিসাবে দেখবে, কিন্তু আজ আমি উপলব্ধি করছি যে, আমি ভুল বুঝেছিলাম। এ. আই. সৈয়দ আহমদাবাদের হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একজন নামকরা সমাজসেবী রূপে বিখ্যাত। তিনি ১৯৯৮ সালে আহমাদবাদের মুসলমানদের থেকে চাঁদা আদায় করে পটনাসদাপুর থানায় একটা শিশু মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস এইচএম কাদরীর সাথেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। যাকে দূর্বৃত্তদের ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য ৮৫ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা ও অসুস্থ মাতা সহ সমগ্র পরিবারকে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তিনি এমনই ভীতসন্ত্রস্ত যে, এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলতে চাইছেন না। আরও একজন প্রাক্তন জজের সাথে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। তার বাসস্থানকে দুর্বৃত্তরা একেবারেই ছারখার করে দিয়েছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অনেক জজেরা এই ঘটনার প্রতি অত্যন্ত বেদনা ও শোক প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে, এহসান জাফরীর ঘর থেকে জনতার উপর গুলি চালানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি এটা বলতে পারেন না যে, তীর, তলোয়ার, লাঠি দ্বারা সজ্জিত জনতা তার বাসস্থানে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিল ? এর উত্তর আইজি পুলিসের বিবৃতির সাথে মিলে যায় যে, উত্তেজিত জনতার সমবেত হওয়ার পূর্বেই এহসান জাফরীর বাসস্থানে কয়েক ডজন মুসলিম পরিবার আশ্রয় গ্রহণের জন্য একত্রিত হয়েছিল। আইজি পুলিস এহসান জাফরীকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে নিষেধ করেছিলেন। এটা কি পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল না যে, একদিকে আইডি পুলিশ এহসান জাফরীর সাথে কথা বলে বের হলেন, অপরদিকে হাজার হাজার পাশবিক জনতা তার বাসস্থানকে ঘিরে

www.pathagar.com

ফেলল। এবার মোদী বলুন, এমতাবস্থায় এহসান জাফরী কি করতে পারেন ? প্রকৃতপক্ষে এটা শুধু একজন এহসান জাফরীর ঘটনা নয়, গুজরাতে শত শত নিরপরাধ মুসলিম ব্যক্তিকে এহসান জাফরী করা হয়েছে। গুজরাত সরকার নিজের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা গোপন করার জন্য ৫৭জন করসেবকের প্রাণের বিনিময়ে ৫৭ হাজার নিরপরাধ মুসলিমের রক্তে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। শান্তিকামী মুসলমানরা এছাড়া আর কি করতে পারে যে, তারা হিংস্রতার আগুনে জ্বলেপুড়ে ভস্মে পরিণত হবে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, পূর্বেও আমরা ৫৭ হাজার ওলামা হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছি, আজও আমরা দেশের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে প্রস্তুত রয়েছি। সকল প্রমাণ, সাক্ষ্য, ঘটনা ও দৃষ্টান্ত দৃপ্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা করছে যে, নিরস্ত্র ও নিরপরাধ ব্যক্তিদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, কিন্তু দেশের অন্যান্য মুসলমানরা শান্ত রয়েছে, একমাত্র এইজন্য যে, দেশের শান্তি তাদের কাছে অতি প্রিয়। যদি মুসলমানরা নরেন্দ্র মোদীর মত বোকামী নীতিতে কাজ করত, তাহলে দেশের অন্যান্য এলাকা বা তার বাসিন্দারা নিরাপদে থাকতে পারত না, কিন্তু মুসলমানরা তেমন করবে না, তাদের তেমন করা উচিতও হবে না।

এই বেদনা ও অশ্রুধারার মধ্যেও আশার ক্ষীণ আলো প্রতিভাত হচ্ছে। মুসলিম চিন্তাবিদ, নেতৃবৃন্দ ও ওলামারা একই প্লাটফর্মে এসেছেন, সকল গোষ্ঠী ঐক্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন, তা থেকে উত্তম পরিণতি পাওয়া যাবে। সম্ভবত স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম সুযোগ যখন বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বিক্ষিপ্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে এই ঐক্য টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম নেতা ও ধর্মীয় পথপ্রদর্শকের অন্তরে দরদী আবেগ ফুটে উঠেছে, তবে এ আবেগকে ব্যক্তিস্বত্ত্বা, ব্যক্তি মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধে তুলে আনতে হবে। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, প্রতিটি মন্দের মধ্যে একটা ভাল দিক নিহিত থাকে। হয়ত এই বিক্ষিপ্ত জাতির কাছে সঙ্গীন পরিস্থিতি কোন পয়গাম বহন করে এনেছে, সেই আহ্বানকে কোনো ব্যাখ্যা না করেই উপলব্ধি করা দরকার,— একটা সংগঠিত, সদর্থক, আবেগহীন, উত্তেজনাহীন, গঠনমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজন, তার জন্য ব্যক্তি স্বার্থের ছোঁয়া দূরে থাকতে হবে। যদিও এটা এই বস্তুজগতে খুবই মূল্যবান হবে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে জাতির সামগ্রিক স্বার্থে এবং দেশের নিরাপত্তার জন্য সর্বাবস্থায় সাহায্য করে যেতে হবে।

দেশের প্রধামন্ত্রীর কাছেও একটা আবেদন রয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি একটু নড়েচড়ে বসুন, এই পীড়াদায়ক পরিস্থিতির সংযোগ শেষ পর্যন্ত বাবরী মসজিদ সমস্যার সাথে যুক্ত। এই দেশের মুসলমানরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে,

www.pathagar.com

তারা বিচারালয়ের ফায়সালা মেনে চলবে, কিন্তু আপনারই প্রতিপালিত বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃবৃন্দ সরাসরি আদালত অবমাননা করছে, আইন-কানুনকে পদতলে দমিত করছে। পবিত্র সন্তদের নামে সমগ্র জাতিকে বন্ধক রাখছে। সমগ্র ভারতে আগুন লাগার আগে আপনি তাদের হাতে-পায়ে, আইন-কানুনের শিকল পরান এবং তাদের নাকে ন্যায়বিচারের নাকাল (লাগাম) পরান, জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে নির্বাপিত করুন, যদি আপনি তা করতে না পারেন তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তার কোন রাস্তা থাকবে না।

❐

www.pathagar.com

# ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক পেগামদের হাতে এটাই ভবিতব্য

—সুমন চট্টোপাধ্যায়

নির্বাচনে ভরাডুবির পরে এমনিতেই দিল্লীর ক্ষমতায় থাকার বৈধতা অনেকটাই খুইয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এরপরে গুজরাতও হাতছাড়া হয়ে গেলে তা হবে আক্ষরিক অর্থেই বিজেপি-র কফিনে শেষ পেরেক। অতএব গড় রক্ষায় মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষ প্রশাসন দিয়ে না হলে, সংখ্যালঘুদের সবক শেখানোর রাস্তা দিয়েই।

কিন্তু বিজেপি-র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এত কথা বলার পরে একই রকম প্রাসঙ্গিক আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তা হল, দাঙ্গার সময় প্রশাসনের এমন নিষ্ক্রিয়তার ঘটনা কি এই দেশে এই প্রথম ঘটল ? কিংবা এর জন্য কি কেবল বিজেপি-ই দায়ী ? '৮৪ সালে ইন্দিরা গাঁধীর হত্যার পরে খাস রাজধানী দিল্লীতে নিরীহ শিখদের নিধনযজ্ঞ কংগ্রেস নেতারা কি প্রকাশ্যে ইন্ধন জোগাননি ? সেই দাঙ্গার সময়েও কি ইচ্ছে করেই সেনাবাহিনীকে দেরিতে নামানো হয়নি ? তার চেয়েও বড় কথা, আজ নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা যাচ্ছে যে রকম প্ররোচনামূলক উক্তি, তখন ইন্দিরাতনয়ের মুখে কি তা শোনা যায়নি ? শিখ বিরোধী দাঙ্গা প্রসঙ্গে তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কি বলেননি, মহীরুহর পতন হলে ধরণী কেঁপে উঠবেই ? শেষ পর্যন্ত '৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে 'হিন্দু ব্যাকল্যাশ' এর পিঠে চড়েই কি তিন-চতুর্থাংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফেরেনি কংগ্রেস ?

রাম খারাপ হলে শ্যাম ভাল, হতভাগ্য ভারতবর্ষে সে কথা বলার কোন উপায় নেই। কেননা বিজেপি নেতাদের মতো কংগ্রেসি নেতাদের হাতও একই রকম রক্তে মাখা। কংগ্রেসি জমানায় বিভিন্ন রাজ্যে অতীতে কত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অযোধ্যা আন্দোলন নামক যে বিষবৃক্ষ থেকে দেশে এমন ধারাবাহিক অস্থিরতা তা রোপণও করেছিল কংগ্রেস। অযোধ্যার বন্ধ দরজার তালাটি খুলে দিয়ে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে কংগ্রেসি পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে গোটা দেশকে।

গুজরাতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সতর্ক ভূমিকার পিছনের উদ্দেশ্যটিও কি পানির মতো পরিষ্কার নয় ? এত বড় দাঙ্গার পরেও রাজ্য কিংবা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করেননি। তার একমাত্র কারণ নির্বাচনের মুখে কোনও রকম বাড়তি ঝুঁকি কংগ্রেস

www.pathagar.com

নিতে চায় না। একইভাবে গোধরার জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নিন্দাও কেবলই কেতাবি। ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে যেসব স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ধরা পড়েছেন রাজ্য কিংবা কেন্দ্রের দলের নেতৃত্ব তাঁদের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত রা কাড়েননি। পাছে সংখ্যালঘু ভোট নষ্ট হয়ে যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এর অর্থ হল, দাঙ্গার মধ্যেই বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েই যে যার মতো করে ভোটের অংক কষে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকে এবং সনিয়া গাঁধীর কংগ্রেস সেই নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কেবলই সাবধানী ক্ষোভ ব্যক্ত করে।

সুড়ঙ্গের শেষে অতএব এই দেশে আলোর দেখা মিলবে না কিছুতেই। গোধরার বদলা হবে আহমদাবাদে। আহমদাবাদের বদলা হবে অন্য কোথাও। যত অপ্রিয়ই শোনাক না কেন, ধান্দাবাজ, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক পিগমিদের হাতে ন্যস্ত ভারতবর্ষে আজ আমাদের এটাই নির্মম ভবিতব্য।

–আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ ০৬-০৩-২০০২

❐

www.pathagar.com

# প্রসঙ্গ ঃ গুজরাট গণহত্যা

## বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ-সম্পাদকীয়-প্রবন্ধ-এর শিরোনাম সংকলন

(২৮-২-২০০২—৩০-৪-২০০২)

সংকলক ঃ রাখী চক্রবর্ত্তী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আনন্দবাজার পত্রিকা

২৮-০২-২০০২ প্রথম পাতা ✪ ট্রেনে পুড়লো, অটল বললেন, মন্দির নয়।
✪ অযোধ্যা থেকে আসা সবরমতী এক্সপ্রেসে হানা গুজরাটে, নিহত ৫৭।
✪ কড়া হাতে দমনের সরকারী শাসানিতেও অনড় পরিষদ।
✪ অযোধ্যা নিয়ে এক সুরে উদ্বেগ অনিল—মমতার।

০১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ আগুন—গুলি—ছুরিতে ২৩-৮০, উন্মত্ত গুজরাতে সেনা নামছে। আরএসএস মধ্যস্থ হবে। আজ বন্‌ধ পরিষদের।

দ্বিতীয় সম্পাদকীয় ✪ বিষবৃক্ষের ভয়াবহ ফল।

নয়ের পাতায় ✪ পুলিশকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

০২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সেনার সামনেই জ্বলছে গুজরাত।
✪ আপাততঃ সন্ধি, কেন্দ্র-পরিষদ মুখরক্ষার সূত্র দিল সঙ্ঘ।
✪ খুনোখুনি, লুটপাটে খামতি নেই, রাজ্যে নিহত প্রায় ৩০০।
✪ অযোধ্যা ছেয়ে পুলিশ, তবে উদাসীন প্রশাসন নিয়েই শঙ্কা। (স্বাতী ভট্টাচার্য/অযোধ্যা)
✪ সেনা দেখলেই তটস্থ জনতা, আড়াল হতেই যে কে সেই। (প্রশান্ত কুণ্ডু/আমেদাবাদ)
✪ আইএসআই-চর ধৃত কলকাতায়।
✪ বন্‌ধ নিয়ে হাসনাবাদে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ। (নির্মল বসু/হাসনাবাদ।)
✪ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকা ভারত বন্‌ধ।

প্রথম সম্পাদকীয় ✪ অপদার্থ রাজ্য। অপদার্থ কেন্দ্র।

সম্পাদকীয় পাতা ✪ কেন্দ্রকে অবস্থা থিতু হওয়ার সময় দিচ্ছে বিরোধীরা।
✪ উদ্বিগ্ন আমেরিকা, বাংলাদেশ।
✪ সতর্কতা পাকিস্তানে।
✪ সেনা নামাতে এত দেরী কেন, কেন্দ্র চুপ।

চারের পাতা ✪ বন্‌ধ ব্যর্থ, হাঙ্গামা অন্যান্য রাজ্যেও।

পাঁচের পাতা ✪ হিংসায় উদ্বিগ্ন বুদ্ধের দিল্লী-যাত্রা বাতিল।

০৩-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গুজরাটের গ্রামেও ছড়াচ্ছে হিংসা।
✪ আগুন লাগিয়ে গণহত্যা মহল্লায় মহল্লায়।

www.pathagar.com

- ✪ গুজরাটের ঘটনা দেশের কলঙ্ক, বললেন প্রধানমন্ত্রী।
- ✪ হাওয়ায় এখনও ত্রাস, চলছে ছন্দে ফেরার চেষ্টা। (প্রশান্ত কুণ্ডু/আমেদাবাদ)
- ✪ অযোষিত কার্ফুই, ভিটে ছাড়ছেন সংখ্যালঘুরা (স্বাতী ভট্টাচার্য/অযোধ্যা)।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- ✪ 'তফাৎ থাকুন' (অশোক মিত্র)।
- ✪ জাতীয় লজ্জার এ মুহূর্তে আপনিই ভারসা (ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে মহাশ্বেতা দেবীর খোলা চিঠি)।

সম্পাদকীয় পাতা
- ✪ করসেবকদের রুখতে জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠাল রাজ্য সরকার।
- ✪ রাস্তায় নেমে সম্প্রীতি রক্ষার আর্জি কংগ্রেসের।

০৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ গোধরার খলনায়ক ধৃত— হিংসা থামেনি ত্রস্ত গুজরাটে।
- ✪ বাঙালি স্বর্ণকারেরা নিরাপদে (প্রশান্ত কুণ্ডু/আমেদাবাদ)।
- ✪ সবুজ-হলুদ-লালে আজ অযোধ্যা তিন টুকরো (স্বাতী ভট্টাচার্য/অযোধ্যা)।
- ✪ বাজপেয়ী সম্মান রাখলে সমঝোতায় রাজি পরিষদ।

প্রথম সম্পাদকীয়
- ✪ সুরাজ-এর পরিণতি।

ছয়ের পাতা
- ✪ সম্প্রীতি রক্ষার ডাকে আজ মিছিল যুব কংগ্রেসের, বাম ছাত্র-যুবদেরও।

০৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ মন্দিরের কাজ থামাতে নারাজ সাধুরা।
- ✪ খুন কমছে, লুট বাড়ছে, সন্দেহে জড়িত আই এস আই।
- ✪ অযোধ্যায় সাজো সাজো রব, করসেবা রুখতেই হবে।
- ✪ আগুন নেভেনি, ফায়দা লোটার খেলা শুরু।
- ✪ সরকার শর্ত না মানলে ১৫ই গ্রেফতার হব, হুমকি সন্তদের।
- ✪ কেন্দ্র ও রাজ্যকেই দুষলেন বিরোধীরা।

প্রথম সম্পাদকীয়
- ✪ মোদীকে বিদায় করা দরকার।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- ✪ জাতীয় আবেগের মহিমা—
- ✪ ভোট মেলেনি, আগুন জ্বলছে (অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়)।
- ✪ আমাদের জোট বাঁধা জরুরি এ শহরেও, দাঙ্গার আগেই (অনিতা অগ্নিহোত্রী)।

সম্পাদকীয় পাতা
- ✪ মমতার মানা, তবু পরেশের মিছিল আজ।
- ✪ ফ্রন্টের মিছিলে যাবে এসইউসি।
- ✪ করসেবকদের যেতেই দেবে না বাম সরকার।

www.pathagar.com

পাঁচের পাতা
- কেন্দ্রে সংঘের প্রভাব কতটা, ধন্দে আমেরিকা।

০৬-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- শঙ্করাচার্যের সূত্রেও সমাধান অধরা।
- আপত্তি কংগ্রেসের, নারাজ শরিকেরাও।
- মন্দির-মসজিদ পাহারা দেয়ার চিন্তা সিপিএম-এ ফের হাঙ্গামা হবে হোলিতে, শংকায় প্রহর গুনছে গোধরা (প্রশান্ত কুণ্ডু/গোধরা)।

প্রথম সম্পাদকীয়
- অক্ষমতার আর এক নজির। (এনসিইআরটি কর্তৃক রচিত নতুন ইতিহাস পাঠক্রমের উপর সুপ্রীম কোর্টের স্থগিতাদেশ বিষয়)।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- ধান্দাবাজ রাজনৈতিক পিগমিদের হাতে এটাই ভবিতব্য (সুমন চট্টোপাধ্যায়)।

সম্পাদকীয় পাতা
- গুজরাটকে দেয়া হোক ফৌজের হাতে, দাবি ইয়েচুরির।

পাঁচের পাতা
- সুরাটে যুবার শেষ যাত্রায় কাঁধ মেলাল হিন্দু-মুসলিম।
- আবার মিছিল করসেবকদের।

০৭-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- অনড় পরিষদকে হুঁশিয়ারী শঙ্করাচার্যের।
- দৌত্যে সাড়া ইমামদের আপত্তি হবে না কংগ্রেস বিজেপি'র। (গৌতম হোড়/নয়াদিল্লী)।
- উস্কানির ফলে আদিবাসীরাও হিংস্র, চলছে 'শত্রু' নিধন। (প্রশান্ত কুণ্ডু/বারোদা)।
- আডবানী-মোদীর ইস্তফা চান বিরোধীরা।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- অযোধ্যা ? কার সমস্যা ? দেশের মানুষ সুশাসন চায়।–বিবেক দেবরায়

সম্পাদকীয় পাতা
- করসেবকদের রুখতে কেন্দ্রকে আর্জি ফ্রন্টের।

০৮-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- কোর্ট বললে মসজিদও মানবে পরিষদ।
- শঙ্করাচার্যের সূত্রে রাজি মুসলমান নেতারাও।
- সিংঘলের কথা কৌশল মাত্র, বলছেন কর্মীরাই। (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

পাঁচের পাতা
- কখন ঝাঁপাবে দাঙ্গাবাজেরা, সুরাতের চোখে ঘুম নেই (প্রশান্ত কুণ্ডু/সুরাত)।
- সংসদে দাঙ্গা বিতর্ক চললো সেই চেনা ছকেই।

০৯-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- এখন শংকর-সূত্র রূপায়ণে উদ্যোগ।
- মুসলমান নেতাদের স্বীকৃতি আদায়েই এবার ব্যগ্র সরকার।
- দিল্লীর প্রতিশ্রুতিতে পরমহংস ফের চাঙ্গা, ১৫ই পুজোর তোড়জোড় (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

www.pathagar.com

✪ পোড়া কামরা দেখে শিউরে উঠলেন সনিয়া।

প্রথম সম্পাদকীয় ✪ অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয়।

পাঁচের পাতা ✪ পির দরগা, বাঙালিবাবা সুরাতে নানা ধর্মের সেতু। (প্রশান্ত কুণ্ডু/মুম্বাই)।

১০-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সুপ্রীম কোর্টেই বল ঠেলে দিলেন অটল।

✪ আজ বৈঠকে বসছেন মুসলিম নেতারা।

✪ স্তম্ভিত পরমংহস বয়কট করবেন পুজো (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

১১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ শঙ্কর-সূত্রে নারাজ মুসলমানেরা।

✪ পরিষদ ১৫ই পুজো করবেই।

✪ ক্যানিং-এ পরিষদ-পুলিশ সংঘর্ষ, গুলি, হত-১। (শ্যামল মুখোপাধ্যায়/ক্যানিং)।

✪ সাধু নয়, অযোধ্যায় প্রদক্ষিণ পুলিশের। (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

১২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ কোর্ট বললে তবেই পুজো অযোধ্যায়।

✪ আলোচনার আশায় ফের দিল্লীতে তলব শঙ্করাচার্যকে।

✪ সংঘর্ষ এড়াতে তিন দফা পরিকল্পনা সরকারের।

✪ পরিষদের নয়া কৌশল, ১৫ই হবে শিলাদান (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

✪ দাঙ্গায় দলের মর্যাদা নষ্ট, মানলেন আডবানি।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ হর হর মহাদেব, জয় শ্রীরাম ঃ ত্রেতা যুগ না কি দ্বাপর ? (গৌতম রায়)

✪ পুলিশি টহলের মধ্যেই তালদিতে হরিনাম সংকীর্তন।

প্রথম সম্পাদকীয় ✪ সুযোগ হাতছাড়া হইল।

১৩-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সিঙ্ঘলের শান্তিবাণী, স্বস্তি অটলের।

✪ আজ রায় বিরুদ্ধে গেলে শুধুই শিলাদান। (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।

✪ সরকার রক্ষার তাগিদেই রাতারাতি ভোল বদল।

✪ তৃণমূল দাঙ্গার কথা তুলে বিজেপির চক্ষুশূল।

✪ ক্যানিংয়ে গুলি চালানো হয় পুলিশ কর্তাদের অনুমতি ছাড়াই।

প্রথম সম্পাদকীয় ✪ শান্তি রক্ষা শুধু প্রাণের মূল্যে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ সংখ্যালঘুর লাশের উপর সওয়ার হয়ে ক্ষমতার সাধনা। (সুমন চট্টোপাধ্যায়)।

সম্পাদকীয় পাতা ✪ ক্যানিং নিয়ে আডবানীকে নালিশ রাজ্য বিজেপি'র।

পাঁচের পাতা ✪ ফকির মহম্মদের শিবলিঙ্গে জল দিল গোটা পাড়া।

www.pathagar.com

সাতের পাতা
✪ জেলাকে সতর্ক করলেন বুদ্ধ।
(অযোধ্যা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে)।

১৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
✪ কিছুতেই পুজো নয় অযোধ্যায়।
✪ সোরাবজির আর্জি খারিজ, দিল্লী উত্তাল
(দীপেন্দ্র রায় চৌধুরী/নয়া দিল্লী)।
✪ রায়ের ফাঁক খুঁজে পুজোর চেষ্টা করছেন সিংঘলেরা।
✪ অঘোষিত কার্ফু, শুধু রক্ষীর রক্তচক্ষু।
(দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।
✪ রায় মানব অক্ষরে অক্ষরে, শরীকদের সামলাতে
আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী, গৌতম হোর/নয়া দিল্লী।
✪ অটল ধোঁকা দিয়েছেন, সমালোচনা বিরোধীদের।
✪ পুজোর অনুমতি চেয়ে বিতর্কে সোরাবজি।
(স্বাতী ভট্টাচার্য/ নয়া দিল্লী)।

প্রথম সম্পাদকীয়
✪ প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায় কেন্দ্রের।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের গুরুদায়িত্ব—মৌলবাদই হিন্দুত্বের
শত্রু (শর্মিলা বসু)।

পাঁচের পাতা
✪ হজরতবাল নিয়ে কাটিয়ারের মন্তব্যে উত্তপ্ত কাশ্মীর।

১৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
✪ আত্মাহুতির হুমকি পরমহংসের।
✪ অধিগৃহীত জমির কোথাও কোনো অনুষ্ঠান নয়,
ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টের। (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।
✪ শিলা গ্রহণ করে সংকট কাটাতে চাইছে সরকার।
✪ অ্যাটর্নি জেনারেলকে ধরেই ভবিষ্যতে নরম হিন্দুত্বের
পথে চলতে চায় কেন্দ্র।
✪ আজ শিবির, বন্দী রাখা হবে রামভক্তদের।
✪ শিলা কোথায়, নিরুত্তর পরমহংস।

সম্পাদকীয় পাতা
✪ ক্যানিংয়ে রবার বুলেট ছিলই না, মানলেন বুদ্ধ।
✪ আজ ক্যাডারদের সতর্ক থাকতে অটলের নির্দেশ।

চারের পাতা
✪ 'অযোধ্যা'য় জাদু নেই, এক সুর সম্প্রীতির স্রষ্টাদের।

পাঁচের পাতা
✪ দেশ জুড়ে সতর্কতা।

১৬-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
✪ শান্তিতে শিলাদান দিল্লীর দূতকে।
✪ মুখরক্ষা হয়েছে, নেতাদের দাবি মানছে না
রামসেবকরা। (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।
✪ রাত দেড়টায় চন্দ্রের ফোন রামচন্দ্রকে, বরফ গলা শুরু।
✪ বাড়তি জমি পরিষদকে দিতে চায় কেন্দ্র
(গৌতম হোড়/নয়া দিল্লী)।
✪ সূর্য ঢলতেই পাল্টাল ছবি, নিরাপত্তা ঢিলেঢোলা।

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| প্রথম সম্পাদকীয় | ✪ স্বস্তি, সাময়িক। |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ শ্রীরাম কৃষ্ণকেই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ)। |
| পাঁচের পাতা | ✪ কাটোয়ায় রামপুজো নিয়ে গ্রেফতার, থানায় বিক্ষোভ।<br>✪ এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন অটল (দীপেন্দ্র রায় চৌধুরী/নয়া দিল্লী)।<br>✪ নির্লিপ্ত শঙ্করাচার্য বললেন, আমার কাজ শেষ (বিক্রমন নায়ার/কাঞ্চিপুরম)।<br>গুজরাতে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, খুন, কার্ফু। |
| ১৭-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ শান্ত অযোধ্যায় অটল-চন্দ্রের প্রশংসায় পরমহংস (দেবব্রত ঠাকুর/অযোধ্যা)।<br>✪ কোর্ট বললে তবেই মন্দির, সাফ জানালেন প্রধানমন্ত্রী।<br>✪ দাঙ্গা নিয়ে দলের সাফাই উড়িয়ে দিলেন বাজপেয়ী।<br>✪ ফের সন্ত্রাস গুজরাতে—হত ৫, আহত ১৫। |
| পাঁচের পাতা | ✪ বজরং, পরিষদের হামলা ওড়িশা বিধান সভায়। |
| ১৮-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ পাকিস্তানে গির্জায় গ্রেনেড, নিহত-৫।<br>✪ জঙ্গিদের কাজ, বললেন, বুশ ও মুশারফ।<br>✪ গোধরা-কাণ্ডের পাণ্ডা হাজি বিলাল গ্রেফতার, গুজরাটে নিহত চার।<br>✪ চাপ বজায় রাখতে সিংঘল অনশনে। |
| চারের পাতা | ✪ নিরাপদ নয় এ রাজ্যও, উদ্বেগ বুদ্ধের। |
| পাঁচের পাতা | ✪ ওড়িশা-কাণ্ডের সাসপেণ্ড ১৮, পুলিশ কর্তাও। |
| ১৯-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সংঘের মন্তব্যে ফের বিড়ম্বনায় অটল।<br>✪ স্পিকার পদে প্রার্থী না দেয়ার চিন্তা চন্দ্রবাবুর। |
| দ্বিতীয় পাতা | ✪ তালদি ঃ এসপি-র ঘরে ফাটাফাটি। |
| সম্পাদকীয় | ✪ নাতসি ঝটিকা বাহিনী যেন। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ আর কোনো আড়াল নেই, হিন্দুত্বের আলো আসছে (অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়)। |
| পাঁচের পাতা | ✪ অটল লজ্জিত, আডবানীও। |
| ২০-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ শরীকেরা সন্তুষ্ট, বিজেপি-র ভিতর ভিন্ন মত দাক্রমশইনা বাঁধছে। |
| সম্পাদকীয় | ✪ এদের প্রতিহত করা চাই। |
| পাঁচের পাতা | ✪ অযোধ্যা মামলার দিন শুনানি নিয়ে রায় আজ।<br>✪ গুজরাতের পুলিশের গুলিতে হত-৪। |

www.pathagar.com

২১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সাক্ষ্য নিতে কমিশন—অযোধ্যা মামলা দ্রুত মেটাতে রোজই শুনানি।
পাঁচের পাতা ✪ গুজরাতে গুলিতে মহিলা সহ হত-দুই।
২২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ আমেদাবাদ ফের অশান্ত, গুলি-ছুরিতে নিহত ৬জন।
সম্পাদকীয় ✪ শুনানি চলুক, আলোচনাও।
২৩-৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ শিলাদানে রায় লঙ্ঘিত হয়নি, বললো সুপ্রিম কোর্ট।
✪ সংখ্যালঘু নিয়ে পুরানো বক্তব্যে অনড় আরএসএস।
✪ শরীকি চাপে গুজরাতে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে পোটো প্রয়োগ বন্ধ করাল কেন্দ্র।
২৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ দুর্দিনে অটলের পাশে সেই আডবানী (দীপেন্দ্র রায় চৌধুরী/নয়া দিল্লী)।
২৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গুজরাতে মহরম ও হোলি নির্বিঘ্ন করতে নির্দেশ—দাঙ্গার জন্য ভৎর্সিত মোদী।
✪ শক্তি বাড়ার দাবি ভিএইচপি-র (গৌতম হোড়/নয়া দিল্লী)।
২৬-০৩-২০০২ ছয়ের পাতা ✪ মহরমের তাজিয়া বের হয়নি, হাঙ্গামা গুজরাতে।
২৭-০৩-২০০২ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ পুরুত আর মৌলবাদীদের হাত ধরে গণতন্ত্র যেখানে পৌঁছোচ্ছে। (সুগত মারজিৎ)।
পাঁচের পাতা ✪ মোদীকে আজ তলব অটলের।
২৮-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ হিন্দুত্বের অপব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী—সংখ্যালঘুদের শঙ্কা দূর করুন, মোদীকে অটল।
✪ মুসলিমদের ফের ফতোয়া দিল সংঘ।
সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ গুজরাতে যা দেখে এলাম—'হিন্দুত্বে'র নামে সংগঠিত হত্যা (শর্মিলা বসু)।
৩০-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ হোলি খেলেননি, সহনশীলতার কথা রাষ্ট্রপতির বার্তায়, লক্ষ্য বিজেপি-ই।
সম্পাদকীয় ✪ মোদীকে বিদায় করা হোক।
৩১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ জম্বুতে হানা রঘুনাথ মন্দিরে।
✪ নির্বিচার গুলি চালিয়ে জঙ্গিরা মারল ৮জনকে।
ছয়ের পাতা ✪ এখনই পোটা নয় রাজ্যে, জানালেন মোদী।
০১-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ অশান্ত গুজরাট, হিংসা মহারাষ্ট্রে, ছুরি, গুলি, হত-১৪।
০২-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গুজরাতে হাঙ্গামা চলছে, হত বেড়ে ৯। সিবিআই তদন্তের সুপারিশ কমিশনের।
✪ হিন্দুত্ব নিয়ে বলার অটল কে ঃ পরিষদ।
✪ ধর্মস্থানের আগুন রুখে দিলেন অমূল্য শংকর-রহমতেরা (সঞ্জয় চক্রবর্তী/দিনহাটা)।

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| তিনের পাতা | ✪ গুজরাতের জন্য ফ্রন্টের অর্থ সংগ্রহ। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্মের' ভয়— |
| | ✪ বামপন্থীদের দায় ও দায়িত্ব (সুকান্ত সরকার)। |
| পাঁচের পাতা | ✪ অযোধ্যা মামলায় সাক্ষীদের বয়ান নথিভুক্ত করা শুরু হলো কমিশনে। |
| ০৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ কাল গুজরাতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। |
| | ✪ কমিশনের এক্রিয়ার নিয়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। |
| | ✪ হাঙ্গামা থামার লক্ষ্য নেই, ছড়াল কচ্ছেও। |
| | ✪ মোদীর এক সুর। |
| সম্পাদকীয় | ✪ আসার অবান্তর প্রস্তাব। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ গুজরাতে সংখ্যালঘুদের প্রাণের সাথে ভাতেও মারা হচ্ছে (শর্মিলা বসু)। |
| ০৪-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ আজ গুজরাটে অটল। পুড়িয়ে মারা হলো ৭ জনকে। গুলিতে হত-১। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ চেনা মানুষ সহসা অচেনা— |
| | ✪ আত্মপ্রবঞ্চনাই নিয়তি ? (বোলান গঙ্গোপাধ্যায়) |
| ০৫-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ রাগ, বিস্ময়, বিপন্নতা ঃ গুজরাটে অটল। |
| | ✪ দগ্ধ কামরা দেখে অটল বললেন, এ কী করে সম্ভব। |
| | ✪ রাজধর্ম পালন করুন, মোদীকে তীব্র তিরস্কার। |
| ০৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ গুজরাটে গুলি ছোরাছুরি চলছেই—অটল হিন্দুদের অপমান করেছেন, বললো বজরং। |
| সম্পাদকীয় | ✪ বাজপেয়ীর রাজধর্ম। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ বাংলার সীমান্ত পেরিয়ে ১৫ জঙ্গি গুজরাতের পথে (হীরক বন্দোপাধ্যায়)। |
| | ✪ দাঙ্গার আগুনে সব খুইয়ে মেমারিতে ফিরে অন্ন চিন্তায় বিপন্ন খোন্দাকারেরা (রানা সেনগুপ্ত/মেমারি)। |
| পাঁচের পাতা | ✪ ৮-ই সব মন্দিরে শাঁখ বাজাতে ডাক পরিষদের। |
| ০৭-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সরকারের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে সনিয়ার অস্ত্র গুজরাট কাণ্ড। |
| | ✪ গুজরাত নিয়ে অটল সংঘাতের মুখে—মোদীকে রেখেই ভোট চায় সংঘ পরিবার। |
| পাঁচের পাতা | ✪ অটল আগে মুখ দেখাতেন কী করে ঃ বসু। |
| | ✪ মোদীকে তীব্র ভৎর্সনা সংখ্যালঘু কমিশনেরও |
| ০৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ মেধা পটকর ও সাংবাদিকেরা আক্রান্ত—সবরমতী আশ্রমের শান্তি বৈঠকে হামলা। |

www.pathagar.com

✪ অটলই রুখতে পারেন দাঙ্গা, বললেন মমতা।

০৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ দক্ষ পুলিশ অফিসার বদলি নিয়ে জলঘোলা গুজরাতে—
✪ সাংবাদিক নিগ্রহে উদ্বিগ্ন অটল।
✪ মোদীকে গদি ছাড়তে হবে এখনই, সরব এবার মমতা
✪ নেতৃত্বের ডাকে গোয়ায় গেলে বিপদ না গেলেও মোদী উভয় সংকটে (গৌতম হোড়/নয়া দিল্লী)।

সম্পাদকীয়
✪ সবরমতীতে গৈরিক তাণ্ডব।

ছয়ের পাতা
✪ গুজরাত কাণ্ডে অটলকেই বিঁধবে কংগ্রেস।

১০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ অফিসারদের বদলির জন্য মোদীকে ভৎর্সনা করলো সংখ্যালঘু কমিশনও
✪ মোদীর ডানা ছাঁটতে অস্ত্র কেশুভাই।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
✪ মুখোশ খুলে গেছে, মুখ বাঁচাতে পারছে না বিজেপি। (সুমন চট্টোপাধ্যায়)।

পাঁচের পাতা
✪ মোদীকে সরানোর প্রশ্ন নেই, সাফ কথা জনার।

১১-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ গুজরাত নিয়ে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা এনডিএ-তে (দীপ্তেন্দ্র রায় চৌধুরী/নয়া দিল্লী)।
✪ মোদীকে সরালে মানবে না জনগণ, হুমকি পরিষদের।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
✪ আইন রক্ষক কেবল নামে—আসলে ক্ষমতার দাস (শর্মিলা বসু)।

চারের পাতা
✪ সাংবাদিকদের প্রতিবাদ মিছিল

ছয়ের পাতা
✪ ভারতীয় গণতন্ত্র স্রেফ 'ধাপ্পা', দাবি মুশারফের।
✪ সন্ত্রাস রোধে ভারত-মার্কিন বৈঠক ৩০-শে।

সম্পাদকীয়
✪ নিজের চরকায় তেল দিন।

১২-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ মমতার আশা, গোয়াতেই হেস্তনেস্ত—
✪ 'মোদী হটাও' দাবিতে সরব তেলেগু দেশমও

১৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ ইস্তফা খারিজ মোদীর, গুজরাতে ভোটে যাচ্ছে বিজেপি।
✪ গুয়াহাটিতে দাবি অপসারণের।
✪ গোধরা কাণ্ডকেই দায়ী করে হিন্দু তাস খেললেন বাজপেয়ী। (গৌতম হোড়/পাঞ্জিম)।
✪ সনিয়া জানালেন, তাঁর হাতিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুষ্ঠ প্রশাসন (সুমন চট্টোপাধ্যায়/গুয়াহাটি)।

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ✪ হিন্দুত্বের ইজারা। |
| দশের পাতা | ✪ মোদীকে সরানো না হলে কেন্দ্রের গভীর সংকট। |
| ১৪-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ বিজেপি সাম্প্রদায়িক, বললো দেশম— |
| | ✪ অবস্থা সামলে দিতে ফোনে অটলের কথা নাইডুর সঙ্গে। (গৌতম হোড়/পাঞ্জিম)। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা—(শঙ্খ ঘোষ)। |
| ছয়ের পাতা | ✪ অটলের মন্তব্যে উস্কানি আছে, অভিযোগ বুদ্ধের। |
| ১৫-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সুর নামিয়ে জোট রাখল বিজেপি। |
| | ✪ লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আজ কংগ্রেসের। |
| | ✪ সমর্থন—প্রশ্ন উহ্য রেখেই মোদীকে নিয়ে সরব দেশম। |
| | ✪ গুজরাটে এখনই ভোটের পরিকল্পনা নেই, বললেন জর্জ। |
| সম্পাদকীয় | ✪ স্বতীর্থে প্রত্যাবর্তন। |
| পাঁচের পাতা | ✪ বাজপেয়ীর নিন্দায় পাকিস্তান। |
| দশের পাতা | ✪ গুজরাটের অশান্তি থেকে সতর্ক থাকুন, আর্জি বুদ্ধের। |
| ১৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সমর্থন রেখেও বিরোধী ভূমিকায় দেশম। |
| | ✪ গুজরাত কাছে আনল সনিয়া ও মুলায়মকে। |
| | ✪ সংখ্যায় নিশ্চিত নয় সরকার, লোকসভায় ভোটে যেতে নারাজ। |
| | ✪ 'গুজরাতে যা ঘটছে, তা জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের স্বার্থ, দেশের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ সবই এখানে জড়িত।' |
| | ✪ কেন্দ্র ও মোদীকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের। |
| সম্পাদকীয় | ✪ প্রকৃত সংকট কাটিল না। |
| ১৭-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ কংগ্রেস জানাল, সরকার ফেলার খেলায় তাদের আদৌ সায় নেই। |
| | ✪ কুর্সির বিনিময়ে সমর্থন মায়ার। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ গুজরাতের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার খেলা। (সুমন চট্টোপাধ্যায়)। |
| পাঁচের পাতা | ✪ আমেদাবাদে সংঘর্ষে হত-৪। |
| ১৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ মোদী হটাও কোরাসে এবার জয়াও। |
| | ✪ নীতির প্রশ্নে আপস নয়, সাফ বললেন চন্দ্রবাবু। |
| | ✪ গুজরাত নিয়ে সর্বদল বৈঠক আজ ডেপুটি স্পিকারের। |
| ১৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ শরীক-সম্মেলনের উদ্যোগ, গুজরাট আলোচ্য—বেসুরে গাইলেন ফারুকও। |

www.pathagar.com

✪ গুজরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী মমতার।

পাঁচের পাতা
✪ মুসলিমদের পরীক্ষা বয়কট গুজরাতে।

২০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ বিরোধীরা অনাস্থা আনুক, চ্যালেঞ্জ অটলের।
✪ সংঘ বাহিনী বন্ধ হলো।

পাঁচের পাতা
✪ সেনা সরবে কবে, কথা মোদী-জর্জের।

২১-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ 'গুজরাটের ঘটনা লজ্জাজনক—শরীকদের তুষ্ট করতে অটল পুরানো অবস্থানে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
✪ আমাদের দায় (সুকান্ত চৌধুরী)।

সাতের পাতা
✪ নিরাপত্তার আশ্বাস, তবু গুজরাটে পরীক্ষায় বসতে ভয় পাচ্ছে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা।

২২-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ গুজরাত আবার দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে—হত-১৭।
জর্জের মতে, শান্তির জন্য আরো কিছু করা উচিত।
✪ প্রধানমন্ত্রীর আবেদনেও সংসদ চালু হতে দিতে নারাজ বিরোধীরা।
✪ দোষীরা শাস্তি পাবেই, বললেন অটল। (সৌভদ্র চট্টোপাধ্যায়/ডিব্রুগড়)।
✪ মালদহে ২৫ আদিবাসীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা পরিষদের। (পীযুষ সাহা)।

২৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
✪ শুধু আমেদাবাদেই ৬৩৩ রাউণ্ড গুলি—গুজরাত ] বিপর্যস্ত দাঙ্গায়, হত-বেড়ে ২৭।
✪ প্রত্যাঘাত করুন সঙ্গে সঙ্গে, সংঘকে নির্দেশ সুদর্শনের।
✪ গুজরাত নিয়ে বিজেপি সমালোচনা অবাঞ্ছিত, সাফ জানাল ভারত।

সম্পাদকীয়
✪ আর কত দিন।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
✪ বাতাসে পোড়া মাংসের গন্ধ—ইতিহাসের খুটিনাটি মাত্র (অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়)

পাঁচের পাতা
✪ আবার ধর্মান্তর এক মাসের মধ্যে, ঘোষণা পরিষদের।

সাতের পাতা
✪ মসজিদে রাম নবমীর কীর্তন, কোরানে সম্প্রীতির সুর।

২৪-০৪-২০০২ সম্পাদকীয়
✪ তবে কেন এই কালহরণ।

পাঁচের পাতা
✪ প্রশ্নপত্র হিংসার ইন্ধন, লোকসভা উত্তাল।
✪ হিংসার নিন্দায় আডবানী
✪ দাঙ্গার ছাইচাপা আগুন আবার ছড়ানোর আশঙ্কা।

www.pathagar.com

২৫-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ভোটসহ বিতর্ক প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও, বিজেপি টোপ দিল মমতাকে।
- প্রধানমন্ত্রী 'দুর্ভাগ্যজনক' বলায় অধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- বিদেশিরা নিন্দা করছেন—কী অন্যায়! কী অন্যায়! (শর্মিলা বসু)।

পাঁচের পাতা
- আমেদাবাদে নতুন করে হিংসায় নিহত সাত।
- ক্ষোভ সংখ্যালঘু কমিশন।

২৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- 'গুজরাত-পশ্চিমবঙ্গকে এক করে দেখাতে চায় বিজেপি। অপমান রাজ্যেরই ক্ষুব্ধ বুদ্ধ।
- গুজরাতে সংঘ ও মুসলিম নেতাদের কথা হবে মুখোমুখি। (স্বাতী ভট্টচার্য/নয়া দিল্লী)।
- বসপাকে পাশে পেতে উত্তর প্রদেশ তড়িঘড়ি সরকার গড়ছে বিজেপি।

পাঁচের পাতা
- গুজরাতে দিশাহারা পুলিশ, বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ছয়ের পাতা
- গুজরাত-কাণ্ডে কাশ্মীরে বিপাকে ভারতপন্থীরা।

২৭-০৪-২০০২ ছয়ের পাতা
- গুজরাতে যাবেন কবি শিল্পীরা।

দশের পাতা
- আমেদাবাদে শান্তি মিছিলে হামলা হতে পারে।
- গুজরাতে ফের পরীক্ষার ব্যবস্থা।

বারোর পাতা
- গুজরাতের হিংসা এড়িয়ে গ্রামে ফিরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। (রানা সেনগুপ্ত)

২৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- গুজরাত শান্ত না হলে বিপদ, সংঘ নেতৃত্বকে প্রধানমন্ত্রী।

২৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- গুজরাতে করসেবক বোঝাই ট্রেনে আগুন। মৃত ৫৯।
- ভোরে গোধরায় আক্রান্ত সবরমতী এক্সপ্রেস।
- পেট্রল ও অ্যাসিড বোমা, নির্বিচারে পাথর বৃষ্টি কামরায়।
- গোটা গুজরাট উত্তপ্ত, কার্ফু।
- প্রধানমন্ত্রী কার্যত মানলেন, দায়ী মন্দির নিয়ে হিন্দু পরিষদের প্ররোচনাই। আন্দোলন স্থগিত রাখতে তাঁর আবেদনে কান দিল না পরিষদ।
- সরকার সংকটে, ক্ষুব্ধ দেশম, ক্ষিপ্ত বিরোধীরা।
- অটলের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল।
- অযোধ্যায় করসেবকদের প্রবেশ বন্ধ করতে কেন্দ্রের নির্দেশ, প্রশ্ন উঠছে।
- ষড়যন্ত্র কি পূর্বপরিকল্পিত ?

www.pathagar.com

- ✪ রাজ্য জুড়ে সতর্কতা।

০১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ অটলকে 'রাবণ' বলে হিন্দু পরিষদ ভারত বন্‌ধ ডেকেছে আজ।
- ✪ ক্ষুব্ধ শরীকরা।
- ✪ মধ্যস্থতায় সংঘ? প্ররোচনা ছড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মোদী।
- ✪ কার্ফু, সেনা, হাঙ্গামা। জীবন্ত দগ্ধ ৩০, মৃত্যু-৮০।
- ✪ গুজরাট জ্বলছে, বাজপেয়ী সংকটে।
- ✪ বাম বিধায়করা এলাকায় যান—বুদ্ধঃ সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

পাঁচের পাতা
- ✪ পূর্ব পরিকল্পিত ঃ বসু।

পাঁচের পাতা
- ✪ আজ শান্তি মিছিল। দাঙ্গার আগুন নেভেনি এখনও।
- ✪ অভিযোগ অস্বীকার করল পাকিস্তান।

২৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ আমেদাবাদে নিহত-৫, শান্তি মিছিলে শরীকদের মধ্যে হাজির শুধু সমতা।
- ✪ সরকার, দল নিয়ে অটল-সংঘ কথা।
- ✪ অযোধ্যায় অচলাবস্থার সমাধানে ফিরিয়ে আনা হলো শঙ্করাচার্যকে।

সম্পাদকীয়
- ✪ গুজরাত আর পশ্চিমবঙ্গ?
- ✪ গুজরাট নিয়ে আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গকে টেনে আনা তো শয়তানী, বললেন বসু।

চারের পাতা
- ✪ ভয়ঙ্করের ছবি নিয়ে দেশভ্রমণ।

৩০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ, শান্তি মিছিলে হাটবেন অটলও।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- ✪ গুজরাতের ধ্বংস লীলা—বিদেশী লগ্নির ভবিষ্যত (তপন ভৌমিক)
- ✪ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! কাটিয়ারদের সামনে অসহায় অটলও।

০২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ আসুন, এক হয়ে দাঁড়াই।
- ✪ হায় ভারতবর্ষ। হত অন্তত ২৫০, পুলিশ নিষ্ক্রিয়।
- ✪ গুজরাটে সেনা।
- ✪ আবার জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা।
- ✪ মুখোমুখি সংঘর্ষ
- ✪ অবাধ লুট-পাট
- ✪ কার্ফু ৩৮ শহরে।
- ✪ দেখামাত্র গুলির নির্দেশ
- ✪ মোদীর প্ররোচনা অব্যাহত
- ✪ হাঙ্গামা ছড়ালো অন্য রাজ্যগুলোতে, সেখানেও মৃত্যু-৪। (দেবারুণ রায়/অসীম নাথ)।

www.pathagar.com

- আইএসআই। (গুজরাটে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আজ একেবারে উচ্চপদস্থ মহল থেকে জানিয়ে দিল গোধরায় দাঙ্গা লাগিয়েছে আইএসআই)।
- সম্প্রীতি রক্ষায় রাস্তায় নামুন ঃ সিপিএম। সতর্ক বুদ্ধ দিল্লী গেলেন না।
- ৩ মাসে জমি চাই ঃ হিন্দু পরিষদ, অটলের রক্ষায় সংঘ শরীকরা দায় এড়াচ্ছে। (অতুন ভট্টাচার্য)।
- উদ্বেগ আমেরিকার।

০৩-০৩-২০০২ প্রথম পাতা

- নেপথ্য ভাষণ—(অশোক দাশগুপ্ত)। কেমন দেশ রেখে যাচ্ছে বিজেপি ?
- গুজরাট এখনো অশান্ত, মৃত্যু ৪০০ পার।
- শহরে-গ্রামে পুড়িয়ে খুন।
- আজ মহাকরণে বুদ্ধ, ছুটি নেই পুলিশ কর্তাদের— রাজ্য থেকে যাবে না কোনো করসেবক, গ্রেফতার চলছে।
- আসুন, এক হয়ে দাঁড়াই।
- শর্ত বেড়ে-৩, হিন্দু পরিষদের আবদার মানবেন অটল ? ত্রাণে আরএসএস।

সম্পাদকীয় পাতা

- গুজরাটের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর পাশে মমতা।
- 'চাওয়ালা ছেলেটিকে ট্রেন থেকে ফেলে দিল উগ্র রামসেবকরা!' (দেবারুণ রায়)।
- গুজরাট ঃ রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখলেন মহাশ্বেতা দেবী।
- সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতিতে রুখতে এগিয়ে আসুন মেয়েরা ঃ সুহাসিনী আলি।
- নিন্দায় মুশারফ।

০৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা

- গুজরাটে মৃত্যু ৮০০ ছাড়িয়ে ?
- 'প্রচারক' মোদীকে বাঁচাতে জর্জের নাটক! (দেবারুণ রায়/দিল্লী)।
- আসুন, এক হয়ে দাঁড়াই।

দ্বিতীয় পাতা

- দেশের সর্বনাশ করছে ওরা ঃ বসু।
- গুজরাট ঃ ফোনের অপেক্ষায় গোটা হাওড়া জেলা।

পাঁচের পাতা

- আজ অটলের সঙ্গে বৈঠক।
- ক্ষুব্ধ করুণানিধি বিশ্ব হিন্দুর কর্মসূচী বহাল, এবার 'প্রতীকী'।

www.pathagar.com

- ওড়িশায় ধৃত জৈশের তিন—বহু খুন ও দাঙ্গার ছক ছিল ওদের।
- রামপুজোর চেষ্টা রাজ্যে। (চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/কাটোয়া)
- ছুটির দিনে দপ্তরে বুদ্ধ।
- গুজরাটে নিষিদ্ধ পাকিস্তান টিভি।
- ৬ মার্চ 'জাতীয় ঐক্য দিবস'—বুধবার শহরে সম্প্রীতির মিছিল।
- সম্প্রীতি রক্ষায় সতর্ক বাংলাদেশ।

০৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- গুজরাট ঃ লুটপাট চলছেই রিপোর্ট চায় মানবাধিকার।
- 'না' বলুন। (মহাশ্বেতা দেবী)।
- ৩ নারীর কথায় চলেন অটল। মহন্ত রামচন্দ্র—কৌশলে সময় দিল হিন্দু পরিষদ।
- আসুন, এক হয়ে দাঁড়াই।

চারের পাতা
- বুড়ো প্যাট্রিয়ার্ক নই—পাল বাবুকে খোলা চিঠি। (মল্লিকা সেনগুপ্ত)
- গুজরাটে সংসদীয় দল পাঠাবার দাবি সোনিয়ার।
- সুরাটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত দেখালেন বাঙালিরা।
- গুজরাট যেন 'বম্বে'। পুড়ছে ধর্মের বেড়া, ভাঙা দাম্পত্য।

পাঁচের পাতা
- একজন করসেবককে যেতে দেব না ঃ বুদ্ধদেব।

ছয়ের পাতা
- বসিরহাট ঃ রামভক্তদের আক্রমণে জখম এসডিপিও কলকাতায়।

০৬-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- হিন্দু পরিষদে ভাঙ্গন ধরালেন অটল।
- শঙ্করাচার্য বললেন, আদালতের রায় মানবে পরিষদ। স্থিতাবস্থা থাকবে। আপত্তি গিরিরাজের (দেবারুণ রায় ও অতনু ভট্টাচার্য)।
- মমতা ঃ সংসদকে জানাতেই হবে।
- ক্ষতিপূরণেও মোদীদের বৈষম্য!

সম্পাদকীয়
- রাম আবদার।

সম্পাদকীয় পাতা
- গুজরাটের দায়িত্ব সেনাকে দেয়া হোক ঃ ইয়েচুরি।
- সংঘের হাতে বিজেপি-র লাগাম ঃ উদ্বিগ্ন আমেরিকা।
- আজ বামফ্রন্টের সংহতি দিবসে দুই সম্প্রীতির মিছিল।

পাঁচের পাতা
- হঠাৎ কাটিয়ার ঃ ১৫ মার্চ অশুভ।

www.pathagar.com

- ✪ জর্জকে ছাড়িয়ে জয়ার সওয়াল মোদীর পক্ষে।
- ✪ গোধরার প্রতিক্রিয়াতেই দাঙ্গা ঃ বললো আরএসএস।

৭-০৩-২০০২ প্রথম পাতা

- ✪ হিন্দু পরিষদের এক গোঁ-বিশ্বাস করছে না মুসলিম বোর্ড।
- ✪ অযোধ্যা ঃ দ্রুত শুনানি চেয়ে কেন্দ্রে আদালতে। (অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।

সম্পাদকীয়

- ✪ মোদীর মুখে মানায় না।

সম্পাদকীয় পাতা

- ✪ গুজরাট ঃ বিধান সভার নিন্দা তবু সর্বদল প্রস্তাব হলো না।

পাঁচের পাতা

- ✪ চলছে গণকবর, ভিড় মর্গের সামনে—গোধরা ঃ পুলিশ হাতড়াচ্ছে পাক যোগ।
- ✪ কাল গুজরাটে সর্বদল প্রতিনিধি—আদবানি, মোদীকে সরানোর দাবিতে সংসদে আজ ধর্না।

সাতের পাতা

- ✪ লক্ষ মানুষের সম্প্রীতির মিছিল ধিক্কার দিল দাঙ্গাবাজদের।

০৮-০৩-২০০২ প্রথম পাতা

- ✪ বলতেই হলো তোমরা জানো ব্রাহ্মণ হত্যায় হাজার বছর নরক বাস।–(দীপাঞ্জন চক্রবর্তী)
- ✪ দাঙ্গাবাজরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, জেলে পুরছে লেখকদের ! অরুন্ধতী রায়।–(অনুমিতা সেনগুপ্ত/দিল্লী।)
- ✪ অটলের হুমকি, শংকরাচার্যের ধমক। হিন্দু পরিষদের আপাতত আত্মসমর্পণ। –(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।)
- ✪ আসুন ! এক হয়ে দাঁড়াই।
- ✪ দাঙ্গা নিয়ে জয়পুরে জুয়া! গাড়ি চেপে লুটপাটে ধনীরা! ভোটার তালিকা ধরে ধরে হামলা গুজরাটে।

সম্পাদকীয় পাতা

- ✪ এবার বক্তা শুধু নামীরা।

পাঁচের পাতা

- ✪ ওয়াশিংটন পোষ্ট—গোধরার ঘটনা পরিকল্পিত নয়।
- ✪ দাঙ্গার রিপোর্ট দিতে সময়ের আবদার—গুজরাট সরকারকে তিরস্কার করলো মানবাধিকার কমিশন।

সাতের পাতা

- ✪ সম্প্রীতির শপথও নেয়া হচ্ছে আগরতলা বইমেলায়।
- ✪ আদবানি, মোদীর ইস্তফা দাবি।
- ✪ উত্তর প্রদেশ নিয়ে প্রতিবাদ। বিরোধিরা এককাট্টা, সোনিয়ার নেতৃত্বে ধর্না।
- ✪ সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে—আজ ধর্মতলায় মহিলা সমাবেশ।

www.pathagar.com

০৯-০৩-২০০২ পাঁচের পাতা
- ✪ শঙ্করাচার্য ঃ প্রতীকী পূজা।
- ✪ অযোধ্যায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল। হিন্দু পরিষদের ফাটল আরও চওড়া।–(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।)

সাতের পাতা
- ✪ অযোধ্যা, বাজেট, গুজরাট, প্রধানমন্ত্রীকে মমতার ক্ষোভ।
- ✪ মোদী, আদবানির ইস্তফা চায় লিবারেশন।
- ✪ গুজরাটের দাঙ্গা পরিষদের ফ্যাসিস্ট কর্মসূচী ঃ রুশদি
- ✪ রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিলেন বুদ্ধিজীবীরা।
- ✪ সন্ত্রাস, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার মহিলারা।

১০-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ সেনা চাইল উত্তর প্রদেশ, প্রতীকী পূজো নিয়ে চাওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ।
- ✪ দুঃস্বপ্নের বিবরণ শোনালেন গুজরাট ফেরত সাংবাদিকরা।
- ✪ গুরুদক্ষিণা
- ✪ গুজরাটে বৈষম্য, সমালোচনার মুখে পিছু হটল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

সম্পাদকীয় পাতা
- ✪ দাঙ্গার নিন্দায় সর্বদলীয় প্রস্তাব—অযোধ্যা নিয়ে চাই কেন্দ্রের স্পষ্ট অবস্থান ঃ বুদ্ধদেব।

রবিবাসর
- ✪ দাঙ্গার আগুনে টিন টিন তেল এসেছে পুলিশের জিপে।–(সীতারাম ইয়েচুরি)
- ✪ আজও এত বিষ!–(ভীষ্ম সাহানি।)
- ✪ রাজা তোর কাপড় কোথায়?–(সোনিয়া জব্বার)

১১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ তালদিতে হিন্দু পরিষদের পূজো নিয়ে সংঘর্ষ, গুলি, মৃত্যু।
- ✪ শঙ্করাচার্যের সূত্র খারিজি মুসলিম বোর্ডের, হিন্দু পরিষদ ক্ষুব্ধ।
- ✪ ভূমি পূজোয় আপত্তি বিজু জনতারও।

পাঁচের পাতা
- ✪ গুজরাট ট্রেনে চড়তে যাত্রীদের ভয়! সেবা শিবির চালাচ্ছে র‍্যাফ।
- ✪ মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী।
- ✪ সতর্ক থাকুন কর্মীরা ঃ অনিল।
- ✪ ক্ষুব্ধ রামচন্দ্র।

১২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ কাল কী রায় সুপ্রিম কোর্টের? অটল বললেন, আশা, খুলে যাবে জট। বিরোধীদের অভিযোগ, প্রভাবিত করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী।

'নরম' পরমহংস পূজো সেরে ফেললেন, কিন্তু—

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| | ✪ সিংঘল অযোধ্যায় ঢুকতেই উত্তেজনা, তৈরি ১৮ 'জেল'। |
| | ✪ আজ থেকে সতর্ক থাকুন ঃ অনিল। শিবরাত্রি—যজ্ঞের নামে অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে? |
| | ✪ এমন ঘটনার সঙ্গে আপস নয় ঃ বুদ্ধদেব। |
| | ✪ বিরোধীতায় প্রায় ৮৫ শরীক সাংসদ। |
| | ✪ হামলাবাজদের নেতা ত্রিদিব গ্রেফতার |
| | ✪ গা-ঢাকা দিয়েছে বিশ্ব হিন্দুর অনেকে—তালদিতে নিহত—তাপস, নিরীহ যুবক। |
| দুয়ের পাতা | ✪ সম্প্রীতি মিছিল। |
| তিনের পাতা | ✪ বিরোধীদের ওয়াক আউট—মোদীর ব্যর্থতার অভিযোগ তুললো দেশম, তৃণমূল, বিজু জনতাও। |
| সম্পাদকীয় | ✪ বিরোধীতা যদি করতেই হয়— |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ কেন এ গরীব মারা রাষ্ট্রীয় বাজেট? কেন ধর্মের নামে এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস?—(মহাশ্বেতা দেবী) |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ বাজেট ঢাকা পড়ে গেল লাশে।—(আজিজুল হক) |
| | ✪ গুজরাটের দাঙ্গায় উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার-কর্ত্রী, হতাশ শিল্পপতিরা। |
| | ✪ মন্দির গড়েন জাভেদ, সালিমি। |
| পাঁচের পাতা | ✪ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ে ঃ বুশ। |
| ১৩-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ আজ সুপ্রিম কোর্টের রায়, থমথমে অযোধ্যা। |
| | ✪ ধোঁয়াটে বক্তব্য হিন্দু পরিষদের, দিল্লীতে রাজ্যপাল।—(দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা ও অতনু ভট্টাচার্য্য/দিল্লী।) |
| | ✪ সাবধান! সতর্কতা চন্দ্রবাবুর। |
| | ✪ জেলা শাসকদের সতর্ক করলেন বুদ্ধদেব। প্রকাশ্যে যজ্ঞ, ধর্মীয় মিছিলে নিষেধাজ্ঞা, ট্রেনে কেউ নেই তো? তৎপর পুলিশ। |
| সম্পাদকীয় | ✪ টিকি-জিন্দাবাদ। |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ পাপীদের ক্ষমা নেই।—(অশোকেন্দু সেনগুপ্ত) |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ পুর নথিপত্র নিয়ে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই গুজরাটে দাঙ্গা। |
| পাঁচের পাতা | ✪ ফ ব সাংসদের অভিযোগ ঃ নীরব কেন সুপ্রিম কোর্ট? |
| সাতের পাতা | ✪ চালু সবরমতী। |
| ১৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সুপ্রিম কোর্টের ধাক্কা ঃ কিছুই করা যাবে না। |

www.pathagar.com

- হিন্দু পরিষদ নেতারা বিভ্রান্ত, তাকিয়ে আজ ধর্ম সংসদের দিকে।–(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী ও দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।)
- অযোধ্যা ঃ ১৫২৮-২০০২। গুজরাটের দাঙ্গার মূলে এরাই, ক্ষুব্ধ সাধু, মহন্ত।–(দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।)
- এটা সংসদ নয়। ধমক বেঞ্চের।

প্রথম পাতা
- ভুরের জয়।
- তবু আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।–অমিত মুখার্জি

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- দাঙ্গার রাজনীতি ঃ গুজরাট।–দেবেশ রায়

পাঁচের পাতা
- সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি সিপিএম চায় বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর অপসারণ।
- শান্তি মিছিলে সোনিয়া গান্ধী।
- বিজেপি-র ভূমিকায় উদ্বিগ্ন-মার্কিন কমিশন। গুজরাট ঃ লোপাট বহু ঐতিহাসিক সৌধ।

সাতের পাতা
- ধর্মীয় জিগির রুখতে কঠোর মুম্বাই পুলিশ, সতর্ক অস্ত্র।
- সম্প্রীতি ঃ আজ ফ্রন্টের রক্তদান।

১৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- অযোধ্যা ঃ কী হয়, কী হয়, সারা দেশ উৎকণ্ঠায়।
- আইন না ভেঙেই 'শিলা' নিয়ে মান বাঁচাবেন রিসিভার ?–অসীম নাথ/দিল্লী ও দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।
- রামচন্দ্র ঃ বাধা দিলে আত্মহত্যা করবো! ব্যর্থ অটলের দূত।–দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।
- বিবৃতির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়তে ভুলে গেলেন থতমত অটল।–(অসীম নাথ/দিল্লী।) জয়পালের মন্তব্য।
- মহাজনের প্ররোচনা। সোরাবজির ইস্তফা চান শরীকরা।–(দেবারুণ রায়/দিল্লী।)
- সতর্ক রাজ্যে আজ মিছিল সম্প্রীতির।

সম্পাদকীয়
- আজকের দিনটি।

সম্পাদকীয় পাতা
- হিন্দুত্ব ঃ আর রাখ-ঢাক নেই বিজেপির।
- গোধরা অশান্ত ঃ আদিবাসীরা ক্ষিপ্ত।
- বুদ্ধিজীবীরা সামিল প্রতিবাদে, প্রতিরোধে।
- লেখক, শিল্পী সমাবেশ রবিবার।

পাঁচের পাতা
- বুদ্ধদেব বললেন, ঢিল, বোমা, গুলিতে অতিষ্ট হয়েই পুলিশ গুলি চালিয়েছে—তালদি।

www.pathagar.com

১৬-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- রণে ভঙ্গ রামচন্দ্রের, স্বস্তি ভারতবাসীর।
- রীতিমত গালগাল শুনতে হলো রামচন্দ্র, সিংঘলদের।–দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।
- হিন্দু পরিষদ-সরকারের গোপন আঁতাত ঃ সোনিয়া। সরকারী আমলা শিলা নিলেন কেন?
- গুজরাটে অশান্তি ঃ খুন কংগ্রেসী সাংসদের ভাগ্নে।

সম্পাদকীয় পাতা
- অযোধ্যা ঃ রাজি হননি হালিম।

পাঁচের পাতা
- মন্দির ঃ সংঘের ঠেস অটলকে। নিন্দা কোর্টের।
- অটল, আদবানি, যোশি, জর্জ ব্যস্ত সারারাত— শিলা নিয়েছে কেন্দ্র, এবার তাদের দায় ঃ হিন্দু পরিষদ।–(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।)
- রাজ্য শান্ত, কলকাতায় সম্প্রীতি মিছিল।
- শত্রুঘ্ন কেন শিলা নিলেন? সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন ভুরে।
- শঙ্করাচার্যদের মতে আদালতে নিষ্পত্তি অসম্ভব।
- গোধরা ঃ ফায়দা তুলতে বিজেপি রাজ্যে চাইছে অন্তর্বর্তী নির্বাচন।
- ৩জনের কেরামতি।–(দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।)

১৭-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- ওড়িশা বিধান সভায় বিশ্ব হিন্দু, বজরং দলের তাণ্ডব।
- হাতে ত্রিশূল, মুখে জয় শ্রীরাম ২ মন্ত্রী, ২ বিধায়ককে প্রহার।
- এদেশ আমার জন্মভূমি—(অশোক দাশগুপ্ত)।
- শিলা নিতে আমলা ঃ বাবরি কমিটির মামলা। রামের মুখে অটল স্তুতি।–(দেবজ্যোতি ঘোষ/ অযোধ্যা।) পরিষদের দাবি নাকচ অটলের।

সম্পাদকীয় পাতা
- অযোধ্যা ঃ কেন্দ্রের নিন্দায় মুখর বিধানসভা।
- রাজকোট ঃ বিমান বন্দরে বিস্ফোরণ, ফের অশান্ত গুজরাট। নিহত-৩।

১৮-০৩-২০০২ প্রথম পাতা
- গোধরা ঃ মূল অভিযুক্ত বিলাল ধৃত—গুজরাট এখনও অশান্ত, ছাই ৬৩ ওপেল অ্যাস্ট্রা।
- হামলাবাজদের সমর্থন হিন্দু পরিষদের।

দুয়ের পাতা
- হাওড়া-কলকাতায় সম্প্রীতির মিছিল।

পাঁচের পাতা
- অনশনে সিংঘল, ফের জিগির রামচন্দ্রের— শিলাদান ঃ কোর্টে যাবেন ন্যাসের সদস্য। –(দেবজ্যোতি ঘোষ/অযোধ্যা।)
- শিলা নিয়ে বাজপেয়ী বিপদের সূচনা করলেন— শিল্পী—বুদ্ধিজীবী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী।

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| ১৯-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ সংখ্যালঘুদের সংঘের হুমকিতে ক্ষোভ। |
| | ✪ বজরং, বিশ্ব হিন্দু নিষিদ্ধ হোক ঃ চায় তৃণমূল সহ ৩ |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ প্রফেসর মোদী এবং বেচারা নিউটন। রণজিৎ গুপ্ত |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ সেই শিলা দশরথ মহলে! মহন্ত খাপ্পা। সরাতে দাবি। |
| | ✪ দাঙ্গার অভিযোগ বিশ্ব হিন্দু, বিজেপি-র দুই নেতার নাম। |
| | ✪ গির্জা ঃ সন্দেহে আলকায়দাকে। |
| | ✪ সংখ্যালঘুদের হুমকি সংঘের, তীব্র ক্ষোভ। |
| ২০-০৩-২০০২ সম্পাদকীয় পাতা | ✪ অন্যভাবে ভাবা যায় না ?–আজিজুল হক |
| | ✪ সংঘের প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের হুমকি— |
| | ✪ কড়া ব্যবস্থা চাইল কং, উদ্বেগ জানাল সমতাও। |
| | ✪ 'সতর্ক করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার'—কলকাতা, দুবাইয়ে চক্রান্ত গুজরাতকে ধ্বংসের ঃ মোদী। |
| পাঁচের পাতা | ✪ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কীর্তি আজাদের—বজরং, বিশ্ব হিন্দুকে ছাড়তে চায় বিজেপির একাংশ। |
| | ✪ অযোধ্যা মামলা ঃ দ্রুত সাক্ষ্য নিতে কমিশন ? আজ রায়। |
| ২১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ রামমন্দির নির্মাণার্থে নির্বাচিত বলি গুজরাট ?–(মহাশ্বেতা দেবী) |
| | ✪ সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসের ডাক—বিজেপি জোট ছাড়ুক ধর্মনিরপেক্ষ শরীকরা। –(দেবারুণ রায়/হায়দ্রাবাদ) |
| | ✪ অযোধ্যা ঃ দৈনিক শুনানি। |
| সম্পাদকীয় | ✪ শাবাশ শাবানা |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ পুলিশের গুলিতে হত-২, গুজরাটে মানবাধিকার দল। |
| ২২-০৩-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ প্রায় হাতাহাতির যাদব-কাটিয়ারের—হিন্দুত্ব ঃ প্রবল সংঘাত বিজেপি শরীকদের। |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ ঘেরাও বিচারপতি বর্মা—আমেদাবাদে হত-৬। মোদীর রিপোর্ট খারিজ মানবাধিকার কমিশনে। |
| | ✪ শিলাদান নিয়ে রাজনীতিতে কেন্দ্র ঃ দ্বারকার শঙ্করাচার্য। শরীকী চাপে অটল ঠুঁটো ঃ গিরিরাজ। |
| পাঁচের পাতা | ✪ অটলকে বিব্রত না করতে সংঘের নির্দেশ। –(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।) |
| সাতের পাতা | ✪ ওড়িশা বিধানসভা–বজরং তাণ্ডব তদন্তে অধ্যক্ষ। |

www.pathagar.com

২৩-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গণরোষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ?
–(মহাশ্বেতা দেবী।)
✪ পিছু হটে পোটা তুললেন মোদী–গুজরাট রীতিমত অশান্ত।
✪ হিন্দু পরিষদ নরম, সংঘ অনড় মন্তব্যে।
সম্পাদকীয় ✪ ওঁদের বলে তো লাভ নেই।
সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভগৎ সিং-এর আদর্শ চাই।–(একে রায়)
সম্পাদকীয় পাতা ✪ সুপ্রিম কোর্ট ঃ শিলাদানে লঙ্ঘন হয়নি। স্থিতাবস্থা।
২৪-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ নেপথ্য ভাষণ–অশোক দাশগুপ্ত। ভারসাম্যের খেলা আর দাঁড়াচ্ছে না।
✪ বুদ্ধ ঃ আদবানির প্রশংসায় আমার কিছুই যায় আসে না।
সম্পাদকীয় পাতা ✪ আদবানি ঃ সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে পাকিস্তান।
✪ মানবাধিকার চেয়ারম্যান ঃ গুজরাট ভয়াবহ।
২৫-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ তবু জাগে মানবতা।–(মহাশ্বেতা দেবী)
✪ মাদ্রাসা শিক্ষা ও মুসলিম সমাজ।–ডাঃ ওমর আলী
পাঁচের পাতা ✪ মোদীকে ধিক্কার মানবাধিকারের এবার উদ্বিগ্ন অটল, আদবানি।
২৬-০৩-২০০২ সম্পাদকীয় পাতা ✪ অটল ঃ অযোধ্যা নিয়ে সংবিধান সংশোধন নয়।
পাঁচের পাতা ✪ 'গুজরাটে কাউকে নাক গলাতে দেব না'–মরিয়া মোদী ভোট চাইছেন।
সাতের পাতা ✪ রাজস্থান—মন্দিরের সামনে খণ্ড যুদ্ধ, মৃত-৩।
২৭-০৩-২০০২ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ সব শেয়ালই নিউটনের সূত্র আওড়াচ্ছে।–(নির্মল সেন)
সম্পাদকীয় পাতা ✪ খোলাখুলি সংঘের ওকালতি জর্জের।
পাঁচের পাতা ✪ দাঙ্গা চলছেই—মোদীকে তলব—কড়া পুলিশ অফিসারদের অন্যত্র বদলি।
সাতের পাতা ✪ কমিশনে সাক্ষ্য ঃ অযোধ্যায় ৯২ সালে হামলার চক্রান্ত করেছিল আইএসআই।
২৮-০৩-২০০২ সম্পাদকীয় পাতা ✪ শান্তি ফেরান ঃ মোদীকে ধমক বাজপেয়ীর।
✪ অটল মানলেন, কিছু হিন্দুত্ববাদী বিপদজ্জনক। ফের মুসলিমদের আক্রমণ সংঘের।
৩০-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গুজরাট ঃ নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে মোদীকে আমেনেস্টির চাপ।

www.pathagar.com

✪ ইস্তফা দিতে চাপ জনাকেও।
–(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।)

সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ গুজরাটে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবে না বাংলা ?
–(জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়)

সম্পাদকীয় পাতা ✪ বাজপেয়ী গুজরাট যাচ্ছেন ৪ এপ্রিল—দাঙ্গার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করলো অ্যামনেস্টি।
✪ হিন্দুত্ব ঃ অটলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সংঘ, হিন্দু পরিষদ।
✪ হোলি খেলেননি ঃ সহিষ্ণুতার ডাক রাষ্ট্রপতির।

৩১-০৩-২০০২ প্রথম পাতা ✪ ব্যর্থ ব্যক্তির ভীত ভাষণ ঃ–(অশোক দাশগুপ্ত)
✪ প্রসঙ্গ ঃ গুজরাট—শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি।

তিনের পাতা ✪ গুজরাটে লুটপাট, হাঙ্গামা চলছেই—অটলজিই আমার তারিফ করেছেন।–মোদী

সম্পাদকীয় ঃ ✪ দাঙ্গা মোদী।

০১-০৪-২০০২ সম্পাদকীয় পাতা ✪ 'তমস'-এর সেই দুঃস্বপ্নের বিরুদ্ধে (কিন্নর রায়)।

পাঁচের পাতা ✪ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
✪ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী ভাবতে লজ্জা করে ঃ বুদ্ধদেব।
✪ অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ—গুজরাটে গণ্ডোগোল, গুলি, কার্ফু, হত-৭।

ছয়ের পাতা ✪ বিশাল সভায় এসইউসি। সন্ত্রাসবাদের কথা বলে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হচ্ছে।

০২-০৪-২০০২ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ রামজন্ম ভূমির পুরাতত্ত্ব।
–সুজিৎ চৌধুরী

পাঁচের পাতা ✪ গুজরাট ঃ মোদীকেই দুষল মানবাধিকার কমিশন।
–সিবিআই তদন্ত দাবী
✪ অর্থ সংগ্রহে নামছে ফ্রন্ট।

সাতের পাতা ✪ ধৃত জাভেদ মির, অনশনরত মালিক মৃত্যুশয্যায়
—পুলিশের সামনেই শিবসেনার নিগ্রহ। লোনকে।
✪ বিশ্ব হিন্দু ঃ বাজপেয়ী ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ অটলকে রক্ষায় বিক্ষুব্ধদের মুখে 'লাগাম'।

০৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ দাঙ্গা ছড়াল কচ্ছে, পুলিশ কর্তাকে অ্যাসিড বাল্ব—
✪ মানবাধিকারের সঙ্গে সংঘাতে যাচ্ছে কেন্দ্র।
–কাল বাজপেয়ী যাচ্ছেন গুজরাটে
✪ লজ্জা ও কলঙ্কের ইস্তাহার।–মহাশ্বেতা দেবী

www.pathagar.com

০৪-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ দুঃস্বপ্নের গুজরাট—জীবন্ত পুড়িয়ে ২০।
সাসপেন্ড প্রতিবাদী সব কংগ্রেস বিধায়ক।
সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ গুজরাটে 'মহরম' বাতিল—
✪ হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে পঞ্চম পদক্ষেপ—
(জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।)
সম্পাদকীয় পাতা ✪ গুজরাটের তাণ্ডবের প্রতিবাদ—আজ বুদ্ধিজীবীদের সভা দ্বার ভাঙ্গায়।
০৫-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ 'কোন মুখে বিদেশে যাব ? মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে! লাশ গুণতে আসিনি।'
✪ গুজরাটে অটল বললেন—জাতীয় লজ্জা।
✪ আরো মৃত্যু, আমেদাবাদে যেন মৃত্যুপুরী—
অটলের সামনেই ধিক্কার মোদীকে।
সম্পাকীয় ✪ হতাশা বনাম আশা।
পাঁচের পাতা ✪ অটল দেখলেন পোড়া কামরা, এবার সরছে।
✪ রাজ্যে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বুধবার ধর্নায় মমতা।
✪ গুজরাট ঃ এবার ত্রাণ সংগ্রহ।
০৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ গুজরাটে হিংসা থামার লক্ষণ নেই—
✪ সংঘ বললো, সংখ্যালঘু তোষণ করছেন অটল।
নিছক নাটুকেপনা, কাজ কোথায় ? কংগ্রেস।
–(অসীম নাথ, অতনু ভট্টাচার্য, দেবারুণ রায়।)
সম্পাদকীয় ✪ বলার জন্য বলা।
সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ গলা খুলে বলুক।–(দেবেশ রায়)
০৭-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সংখ্যালঘু কমিশনের ধমক,
মোদীর ইস্তফা ফারুক দলও।
✪ ঘৃণায় ইস্তফা আইএএস হর্ষ মন্দারের।
✪ গুজরাটে হিংসা চলছেই, হত-৬।
সম্পাদকীয় পাতা ✪ পুলিশকে দিয়েই দাঙ্গা করিয়েছেন মোদী ঃ বসু।
০৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সাংবাদিকদের পুলিশের লাঠিপেটা,
স্টেনগান দেখিয়ে হুমকি।
✪ গান্ধীর আশ্রমে আক্রান্ত মেধা, বিজেপি হামলা।
✪ আমরা তো এখন একঘরে! গুজরাট নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা।
✪ আহমদি ঃ রাষ্ট্রপতি চাপ দিতে পারেন বাজপেয়ীকে।
✪ ওদের মাথা ভেঙে দেব ঃ মুখ্যমন্ত্রী।
পাঁচের পাতা ✪ আজ ফ্রন্টের সংহতি সমাবেশ, ত্রাণ সংগ্রহ।
০৮-০৪-২০০২ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে।–(দেবাংশু দাশগুপ্ত)

www.pathagar.com

০৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- মেধার চুলের মুঠিধরে লাঞ্ছনা দুঃশাসনদের, মোদী কোণঠাসা
- সাংবাদিকদের রক্ষাকর্তা, দাঙ্গা রুখে দেয়া শিবানন্দই বদলি।
- মোদীর পদত্যাগ চাইলেন মমতা।

সম্পাদকীয় পাতা
- মেধা, কলকাতা।

পাঁচের পাতা
- গুজরাটের দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ—
- শত্রুকে ছোট করে দেখতে চাই না, সতর্ক আছি ঃ বুদ্ধদেব।

১০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এবার বিদেয় করুন। –(সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)
- সাবরমতী বন্ধ, শান্তি ও বদলি নিয়ে বিক্ষোভ পুলিশ প্রশাসনে
- সংখ্যালঘু কমিশনে প্রেস কাউন্সিলের চাপ গুজরাটে।
- মওকা বুঝে নেমেছেন কেশুভাই—সমতার মুখপাত্রকে সরতে হলো মোদীর ইস্তফা চেয়ে।

সম্পাদকীয়
- আর আঁটছে না।

সম্পাদকীয় পাতা
- গুজরাট, মেধা প্রতিবাদ নন্দনে।

পাঁচের পাতা
- বিক্ষোভ দমনে ধোলাই ঃ মনোহর যোশী-ঠাকরে ভক্ত কল্কি মহারাজ ঃ আমি 'আত্মঘাতী সৈনিক'।

১১-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- কল্যাণে বেধে গেল হাঙ্গামা, মৃত-৪। গুজরাটে অবাধে উস্কানি সংঘের।–(অগ্নি পাণ্ডে/মুম্বাই)
- সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানকে হুমকি চিঠি।
- সাবরমতী–সাংবাদিকদের ধিক্কার মিছিল।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- অন্যভাবে কী ভাবা যায়!–(আজিজুল হক)

সাতের পাতা
- গুজরাটের দাঙ্গা ঃ কলকাতায় বামফ্রন্টের অর্থ সংগ্রহ শেষ হলো।

১২-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- মোদীকে সরিয়ে গুজরাটে রানাকে বসাবেন অটল ? সরাবার দাবি তুললো দেশমও।
- উগ্র হিন্দুত্বের সাথেই অটলের টানাপোড়েন। –(অতনু ভট্টাচার্য/পানাজি।)

সম্পাদকীয় পাতা
- গুজরাটের দাঙ্গা–পীড়িতদের সাহায্যে সিনেমা, থিয়েটার, ছবির নিলাম, গান, ফুটবল ...
- কল্যাণ ঃ দ্রুত ব্যবস্থা নিল জোট সরকার। –অগ্নি পাণ্ডে/মুম্বাই।

www.pathagar.com

- 'হে রাম' দেখে কেঁদে ফেললেন আজিজুল। –দাঙ্গার তথ্য চিত্র

পাঁচের পাতা
- সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফ্রন্টের সমাবেশে অন্যান্য বামপন্থীরাও।

১৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- শরীকদের উপেক্ষা, দেশমকে দরকার নেই ?
- মোদীর ইস্তফা খারিজ, ভোটে যেতে বললো দল। –অতনু ভট্টাচার্য/গোয়া।
- ১৪ মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্প্রদায়িকতা রুখতে কঠোর হতে নির্দেশ দিলেন সোনিয়া।–অসীম নাথ/দিল্লী।

দুয়ের পাতা
- দাঙ্গার বিরুদ্ধে।

সম্পাদকীয় পাতা
- অযোধ্যা ঃ রায় মানবে পরিষদ ?

পাঁচের পাতা
- গুজরাটে দাঙ্গার দায় গোধরা কাণ্ডের ঃ অটল।

১৪-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- মোদী বহাল, গুজরাটে ফের চাঙ্গা দাঙ্গাবাজরা ভোট জুন-জুলাইয়ে ?–অতনু ভট্টাচার্য/পানাজি।

সম্পাদকীয় পাতা
- নির্বাচনে যোগ না দিতে মুলায়মের ডাক (গুজরাট)।
- গুজরাট ঃ চন্দ্রবাবু সংঘাতে, ফোন অটলের।
- হিন্দুত্ব নিয়ে লজ্জা কী! আদবানি।

১৫-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- রণেভঙ্গ দেশমের! অতনু ভট্টাচার্য/গোয়া ও দেবারুণ রায়/দিল্লী।
- জর্জকেও এড়িয়ে গেলেন মমতা।
- আহমদাবাদ ফের অশান্ত।

চারের পাতা
- গৃহস্তের খোকা হোক!–সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পাঁচের পাতা
- যুক্তফ্রন্টের শরীকরা ছেড়ে আসুন এনডিএ ঃ অনিল।
- গুজরাট ঃ রাষ্ট্রপতির কাছে মহাশ্বেতর দাবিপত্র গণস্বাক্ষর অভিযানে 'নবজাগরণ'।

১৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- চরম ধাক্কা দিতে কাল চন্দ্রবাবু দিল্লীতে ?
- মোদী—অপসারণের দাবি ছাড়ছে না দেশম।
- গুজরাট নিয়ে আলোচনা ও ভোট চায় বিরোধীরা, নারাজ সরকার।
- ক্ষুব্ধ জোট শরীকরা বৈঠকে।
- সরকার বাঁচাতে ভোট দেবে না শারদের দল।
- সোনিয়া-মুলায়েম বৈঠক। -দেবারুণ রায় ও অসীম নাথ/দিল্লী।
- দাঙ্গা ঃ মোদীকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের। –ভোট ? সিদ্ধান্ত কাল।

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ একুশ শতকের প্রত্যয়, সংহতি সৌভ্রাতৃত্ব ও ডঃ আম্বেদকর।–কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর |
| পাঁচের পাতা | ✪ সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা ও বাংলা ভাষাকে ভালবাসার শপথ নিলেন হাজার হাজার গ্রামবাসী। |
| ১৭-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ স্পিকার পদ নেবে না দেশম, গুজরাট আলোচনায় ভোটাভুটি চায়। |
| | ✪ সংসদ ফের পণ্ড। |
| | ✪ মুলায়ম-লালুপ্রসাদ হাত মেলালেন। |
| | ✪ দেবগৌড়া বসাবেন বসু-চন্দ্রবাবুকে ? –(অসীম নাথ ও দেবারুণ রায়।) |
| | ✪ অশান্ত গুজরাট, হত-৪, দাঙ্গা ঃ উদ্বিগ্ন আমেরিকা। |
| পাঁচের পাতা | ✪ রফা হয়েই গেছে উত্তর প্রদেশে—কাঁসিরামও কথা বললেন আদবানির সাথে। |
| | ✪ গুজরাট ঃ কাল পদযাত্রা অর্থ সংগ্রহের। |
| ১৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ মোদী হটাও ঃ নাইডুর পাশে জয়ললিতাও। –(দেবারুণ রায় ও অতনু ভট্টাচার্য) |
| | ✪ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ভোট গুজরাটে। –(অসীম নাথ/দিল্লী।) |
| | ✪ কিছু প্রস্তাব মাত্র।–(মহাশ্বেতা দেবী।) |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ প্রকৃত অর্থে সামাজিক সমর্থনই সমাজবিরোধীদের নেতা বানায়।–সুজিৎ চৌধুরী |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ বামফ্রন্ট ও অন্য বামপন্থীদের সভা—দাঙ্গা নয়, গুজরাটে হয়েছে রাষ্ট্রীয় মদতে হত্যাকাণ্ড। |
| পাঁতের পাতা | ✪ গুজরাট ঃ উদ্বেগ বৃটিশ পার্লামেন্ট। |
| ১৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ ফের ইস্তফার জুজু অটলের—বিকল্প মোর্চার পথে চন্দ্রবাবু?–দেবারুণ রায়, অসীম নাথ, অতনু ভট্টাচার্য। |
| | ✪ মোদীকে সরিয়ে মমতা চান রাষ্ট্রপতি শাসন। |
| | ✪ দুই মুখোশের গল্প–(রাজদীপ সারদেশাই)।) |
| দুয়ের পাতা | ✪ গুজরাটের জন্য অর্থ সংগ্রহ মিছিলে উজ্জ্বল কলকাতা। |
| সম্পাদকীয় | ✪ তুখোড় বাবু। |
| সম্পাদকীয় পাতা | ✪ বহু সংখ্যালঘু ছাত্রের পরীক্ষা বয়কট।–জর্জ গুজরাটে |
| সম্পাদকীয় নিবন্ধ | ✪ অরুন্ধতী থেকে মেধা।–আজিজুল হক |
| ২০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ মন্ত্রিত্বে মরিয়া মমতা ছাড়বেন চন্দ্রবাবুকে ? –দীপঙ্কর নন্দী |
| | ✪ গুজরাট ঃ ঘটনা, তথ্য ও ভাবনা।–তপন মিত্র |
| ২১-০৪-২০০২ প্রথম পাতা | ✪ দাঙ্গার বলি ৩ বৃটিশ মুসলিম ঃ রিপোর্ট গেল লন্ডনে— |

www.pathagar.com

- মোদীর বিচার হতে পারে বৃটেনে।
  -(দেবারুণ রায়/দিল্লী।)
- অশান্তি, মৃত্যু, তাও জর্জ বললেন গুজরাট স্বাভাবিক।
- গুজরাট নিয়ে প্রশ্ন, বাংলা নিয়ে ভাবনা।-তপন মিত্র

চারের পাতা
- গুজরাটের জন্য দেশটা বসনিয়া হয়ে যাবে! ভিপি।
- গুজরাট নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নামছে অনশনে।
- অটলের দাবি, জোটে কোনো বিভেদ নেই।
- মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বুদ্ধিজীবীরা।
  -(গুজরাট সংহতি)

২২-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- আসামে অটলের আশ্বাস, জর্জের শান্তি বৈঠক, তবু গুজরাট জ্বলছে—সংখ্যালঘুরা ফের আক্রান্ত, হত অন্তত ১৭। গুজরাট-পিডিএস, কং, বামদের ডাকায় চটে লাল মমতা।
- উঠেছে ৪০ লক্ষেরও বেশি।
  গুজরাট যাবে ফ্রন্টের দল।
- শিল্পপতিরা দাঙ্গা পীড়িতদের সাহায্য দিয়ে সরকারকে বিরক্ত করতে নারাজ। নাযিক্তা আলী।

চারের পাতা
- ফৈয়াজ খাঁর সমাধির পর পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত তাজমহল।-(পাঁচু রায়)

পাঁচের পাতা
- সংখ্যালঘুদের হাতে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের টাকা দিলেন বুদ্ধ।
- গুজরাটে অশান্তি বাড়তে কঠিন হলো চন্দ্রবাবুর পিছু হটার পথ

২৩-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- আরও হিংসা গুজরাটে। গুলি, বোমা, ছুরি, মৃত্যু বেড়ে-২৭।
- দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাটে নবজাগরণের প্রতিনিধিরা।
  -দেবজ্যোতি ঘোষ
- আজই সঈদের সিদ্ধান্ত আস্থা ভোটের ভাবনাও।
- গুজরাট যেন হিটলারের জার্মানী ঃ
  বিদেশী রিপোর্ট।-(দেবারুণ রায়/দিল্লী।)
- ভারতীয়রা চাকরি হারাবেন ?-(অসীম নাথ/দিল্লী।)

সম্পাদকীয়
- যা হচ্ছে না, তা রুখবেন!

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- গুজরাট—গণতন্ত্রের বিষাদ ও বিশ্বাস।-দেবেশ রায়

২৪-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- সঈদের রায় ঃ গুজরাট নিয়ে আলোচনার পর ভোটাভুটি ৩০ এপ্রিল—দেশম দ্বিধায়, তবে অটল নিরাপদ।-(অসীম নাথ, দেবারুণ রায় ও অতনু ভট্টাচার্য।)

www.pathagar.com

✪ মৃত্যু বেড়ে ৩৬—গুজরাটে আক্রান্ত, মৃতও।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ এ ভারত কি শুধুই গোবলদের ভূস্বামীদের ?
—(আজিজুল হক)

পাঁচের পাতা ✪ গুজরাট—রাষ্ট্রপতিকে চিঠি হীরেন মুখার্জীর।
✪ গুজরাট ঃ উচ্চমাধ্যমিক প্রশ্নপত্রের নাৎসিতত্ত্ব!

২৫-০৪-২০০২ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ✪ বিষণ্ন সময় (মৃনালনী দাশগুপ্ত)

পাঁচের পাতা ✪ রাজ্যসভায় নির্বিষ প্রস্তাবে ভোটাভুটি—সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে গুজরাটে তদন্ত হবে না ঃ আদবানি
✪ ইন্ধন দিয়েই চলছে বিশ্ব হিন্দু—এবার মোদীকে তিরস্কার নারী কমিশনের।
✪ বিজেপি-র সঙ্গে আবার মাখামাখি পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ।
✪ গুজরাট ঃ নিন্দায় মুখর পশ্চিম, যশবন্তকে বুঝিয়ে বলার ভার দিলেন অটল বিহারী।

২৬-০৪-২০০২ প্রথম পাতা ✪ সংসদে ১৮৪ ধারায় রাজ্য ? বুদ্ধ ঃ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই অপমান।

সম্পাদকীয় ✪ কঠিন ভোটাভুটি।

সম্পাদকীয় পাতা ✪ গুজরাট পুলিশ সাহায্য করছে না, বললো সেনারা।—(হাঙ্গামা ছড়ালো সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে)

পাঁচের পাতা ✪ বাজপেয়ী ঃ অন্য দেশের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা শিখব না!
✪ গুজরাট বিতর্ক—বিরুদ্ধে ভোট দেবে এনসিপি।
✪ মোদী ঃ নালিশ বিজেপি-কেই।
✪ গুজরাট ঃ ফের অর্থ সংগ্রহে বুদ্ধিজীবীরা।

ছয়ের পাতা ✪ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে—শুধু ধর্মঘট নয়, আরও সংগ্রাম চাই ঃ জ্যোতি বসু।

২৭-০৪-২০০২ সম্পাদকীয় ✪ দাদা পরিণত, দিদি নন।

সম্পাদকীয় পাতা ✪ কাল কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভায় শাবানা-জাভেদ।
✪ কার্ফু, সেনা—পুলিশের তোয়াক্কা না করে ঘুরছে দাঙ্গাবাজরা।—(গুজরাটে নিহত আরো-৩।)

পাঁচের পাতা ✪ শান্তি মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন পোরবন্দরে—গুজরাটের দাঙ্গায় বিরাট ক্ষতি অর্থনীতির ঃ সোনিয়া।
✪ যুদ্ধ, দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হুসেনের ছবির উদ্বোধক বুদ্ধ।

www.pathagar.com

- ✪ তালদির সেই রামযজ্ঞের পাণ্ডারা প্রায় একঘরে।

২৮-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ গুজরাট দিচ্ছে ডাক।–(অশোক দাশগুপ্ত)
- ✪ মোদীকে সরানোর সংকেত অটলের।

সম্পাদকীয়
- ✪ ফাঁসিরাম।

সম্পাদকীয় পাতা
- ✪ বৃটিশ রিপোর্ট ঃ সরকারী মদতে পরিকল্পিত দাঙ্গা। –(মোদীকে রেখে শান্তি অসম্ভব)
- ✪ মে দিবসে গুজরাটে সোনিয়ার শান্তি মিছিল, প্রার্থনা।
- ✪ এসআইসিসি বৈঠক দিল্লীতে ১০ মে।

২৯-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ গুজরাট আলোচনা—দল তিন ভাগ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ চন্দ্রবাবু।
- ✪ সংঘের পথেই চলবেন রফায় গেলেন অটল। –(অসীম নাথ/দিল্লী।)
- ✪ শান্তির মিছিলে মোদী তবু নিহত আরও-১১
- ✪ সিবিআই তদন্ত চাই গুজরাটে ঃ শাবানা।
- ✪ পশ্চিমবঙ্গ ঃ আজ ১৮৪ তুলছেন বিক্রম।

দুয়ের পাতা
- ✪ গুজরাট ঃ পথে নামছে ৪৬টি শিক্ষক সংগঠন।

সম্পাদকীয়
- ✪ কাদের সাথে বৈঠক ?

সম্পাদকীয় নিবন্ধ
- ✪ গুজরাট যেন চিরকালের শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ হয়। –(সুনীত সেনগুপ্ত)

পাঁচের পাতা
- ✪ কত তেল!

৩০-০৪-২০০২ প্রথম পাতা
- ✪ আজ গুজরাট নিয়ে ভোটাভুটি সরকার থাকলেও ধাক্কা অটলকে।–(অসীম নাথ ও দেবারুণ রায়)
- ✪ মোদীকে বিদায়ে সংঘও সায় দিল। –(অতনু ভট্টাচার্য/দিল্লী।)
- ✪ মোদীকে সরাবার দাবিতে অটল মমতার ভোট আজ অটলকেই!
- ✪ চারবার অটলকে চিঠি ঃ উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপতি –(বাজপেয়ী যাবেন শান্তি মিছিলে।)

সম্পাদকীয় পাতা
- ✪ মোদীকে সরাতে রাষ্ট্রপতিকে ১০ হাজার চিঠি পাঠাচ্ছে পিডিএস।

www.pathagar.com

# ঠাকরের হুংকার
# হিন্দুত্ববাদীদের নোংরা ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন
## –অধ্যাপক গৌতম রায়

সদ্যসমাপ্ত শারদ উৎসবের শেষ দিনে শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে মুম্বাই শহরে যে শীবাকীর্তন সম্পন্ন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ, যার হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের জিয়নকাঠির সামনের অংশটি রয়েছে, ধুকপুক করতে থাকা সরকারের প্রাণভ্রমরার নিয়ন্ত্রক যারা, তারা কী দেশের প্রচলিত সব রকমের আইন-কানুনের উর্ধে ?অবসর-গ্রহণের কুহেলিকা ছড়িয়ে যযাতির তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে থাকা বাল ঠাকরে নামক এই বর্বরটির বর্বরতা আর একই সঙ্গে কাপুরুষতার বহু নিদর্শন উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা দেশবাসীর আছে। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে মুম্বাই দাঙ্গার বিভৎস নায়ক হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের প্রতিবেদনে অভিযুক্ত এই নরপশুটি বর্বরতার, নর-রক্তপানের পেয়ালাবাজিতে বড্ড দর, তাই দশেরা উৎসবের ভড়ং করে বন্ধু আর এসএসের পদলেহন করতে তাদের জন্মদিনটিকে বেছে নিয়ে হিন্দুদের আত্মঘাতী বাহিনী গড়বার আহ্বানের নামে আবার রক্তের হোলির নেশায় এ কপট ষড়যন্ত্রের আভাস প্রদান। বর্বর আরএসএস এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন কেন্দ্রের জোট সরকারের প্রধান শরীক বিজেপি ও সংঘ পরিবারের অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলো গুজরাটের বিভৎসতাকে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেয়ায় জোরদার পাঁয়তারা কষতে শুরু করে দিয়েছে। বাল ঠাকরের এ হুংকার তাদের সেই হিশহিশে ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কৌশলী সংঘ পরিবার চুপিসারে যে কাজটি সেরে ফেলতে চাইছিলো আত্মম্ভরী ঠাকরে তাঁর আত্মঅহংকারের গরিমায় সেই নোংরা ষড়যন্ত্রের ফানুসটি ফাটিয়ে দিয়েছেন।

গুজরাটের গণহত্যার মূল অভিযুক্তদের কোনো শাস্তি পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের মূল চালিকা শক্তির নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার সেইসব শয়তানদের একের পর এক পুরস্কৃতই করে যাচ্ছেন। যে নরেন্দ্র মোদীর কীর্তিকলাপে বিদেশে মুখ দেখাবার চিন্তায় ঘুম চলে যাওয়ার ভড়ং করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, আজ সেই তিনিই মোদীর সাম্প্রদায়িক বর্বরতার প্রসারের লক্ষ্যে প্রবাহিত তথাকথিত 'গৌরব যাত্রা'র নীরব দর্শক। দাঙ্গামোদী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন দাঙ্গাবাজ বর্বরদের কোনো শাস্তি এ পোড়া দেশে হবে না। অতএব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দোহাই পেড়ে ঠাকরের হিন্দুদের আত্মঘাতী বাহিনী গড়বার নির্দেশ, সন্ত্রাসবাদ

www.pathagar.com

মোকাবিলার নামে যে বাহিনীর একমাত্র কাজ হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত মানুষদের উপরে অত্যাচারের নিত্য নতুন কলা-কৌশলের প্রয়োগ। বেশ কয়েক বছর কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার দরুন হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বর্বর আরএসএস তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-কে দিয়ে গোয়েবলসীয় প্রচারের ঢক্কানিনাদে সন্ত্রাসবাদ আর মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষকে একীভূত করে ফেলতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সব থেকে বড়ো প্রেরণা তথা সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেছে তাদের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

শিষ্টাচারের শেষ সীমাটি লংঘন করে দলীয় মুখপত্র 'সামনা'তে এবং মুম্বাইয়ের শিবাজী পার্কের সমাবেশে ঠাকরে মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষদের সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা ছাপার অযোগ্য। ঠাকরে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, ভারতবর্ষে নাকি এই মুহূর্তে ৪ কোটি বাংলাদেশের মুসলমান রয়েছেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ভণ্ডামির আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তটির হুংকার, ওদের লাথি মেরে তাড়ানো উচিত! এটা প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য হতে পারে ? বিজেপি এবং তার রাজনৈতিক সহযোগী শক্তিগুলো রাজনৈতিক শিষ্টতাকে কোন্ স্তরে নামিয়ে এনেছেন এ ঘটনা তারই সাক্ষ বহন করছে। না আমাদের কবি প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এ ধরনের অশালীন শব্দ ব্যবহারের জন্যে ঠাকরের প্রতি একটিও কঠিন শব্দ ব্যবহার করেননি বরঞ্চ আমাদের অকর্মণ্য প্রধানমন্ত্রী মূল চালিকা শক্তি বর্বর আরএসএস ঠাকরের প্রতি তাদের সহমর্মিতাই প্রকাশ করেছে। আর এসএসের প্রতিষ্ঠা দিবসে ঠাকরে অবশ্য আরএসএসের অনুগত ভৃত্যের আচরণই পালন করেছেন। সংঘ পরিবারের অ্যাজেন্ডার পুনরাবৃত্তি করে দেশের মূল বাণিজ্য কেন্দ্রে বসে বর্বর ঠাকরের হুমকি ঃ 'আপনারা এখন থেকে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলুন। ভারত এখন শুধু হিন্দুর দেশ। অন্য ধর্মকে আমরা কি চোখে দেখবো, তা পরে ঠিক করা যাবে।' এতো আরএসএসের মূল বক্তব্য তথা সাভারকর, গোলওয়ালকারেরই পুনরাবৃত্তি। আরএসএসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি দেশে বেশ কিছুকাল যাবত জোট সরকারের নেতৃত্ব দিলেও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই সরকারের পবর্তপ্রমাণ ব্যর্থতা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতি আজ গভীর সংকটের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, সরকার সমস্ত লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তথাকথিত বিশ্বায়নের নাম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পা রাখবার সুযোগ করে দিতে জলের দরে বিলগ্নীকরণ করার নেশায় উন্মাদ। এ মার্কিনী বিতত বিতংসে আত্মনিবেদন হিন্দুত্ববাদীদের শ্রেণী স্বার্থকেও এখন আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছে, যে বণিক সমাজ কংগ্রেস অপেক্ষা বিজে

www.pathagar.com

পি-র মাধ্যমে তাদের নগ্ন শ্রেণীস্বার্থ আরো অধিক পরিমাণে সুরক্ষিত থাকবে মনে করে কৃপাহস্ত উপুড় করেছিল বিজেপি-র প্রতি, পেন্টাগনের নির্দেশের ফলে তাদের স্বার্থও আর মার্কিনী বহুজাতিকদের জন্যে সুরক্ষিত থাকছে না। শ্রেণীস্বার্থের উপরে এই আঘাতই মাঝে মাঝে অসভ্য বর্বর আরএসএস-কে শিয়ালের কুমির ছানা দেখাবার মতো তথাকথিত স্বদেশীয়ানার বুলি কপচাতে হচ্ছে। বাইরে তারা এমনও ভান দেখাচ্ছে যে, এ ইস্যুতে বুঝিবা তাদের সাথে তাদেরই রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-র একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বের কোনো বাস্তবভিত্তি রয়েছে এমনটা মনে করার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ, বণিক সম্প্রদায়কে নিজেদের শিবিরে টেনে রাখতেই এ দ্বন্দ্বের নাটকের অবতারণা কৌশলী আরএসএস-এর। অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থই আরএসএস এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-র মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধের বাস্তবভিত্তি নির্মাণ করতে পারে না।

গোটা দেশে বিজেপি জোট সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতাকে আড়াল করে নিজেদের গোপন অ্যাজেন্ডার প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই গোটা দেশে সাম্প্রদায়িকতার কার্ড খেলতে শুরু করেছে আরএসএস। নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবার ফলে প্রশাসনের প্রায় সমস্ত কলকব্জাই এ মুহূর্তে আরএসএস-এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণের একটি মহড়া তারা দিয়েছে গুজরাটে। ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা গুজরাট শিক্ষা (!)-কে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার শিবারব শুরু করে দিয়েছেন। আরএসএস-ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু করার জন্য গোপনে যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে। গুজরাটে সেনা বাহিনীর আপাত নিরপেক্ষ ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আর পরবর্তী টার্গেট রাজ স্থানে সেনাবাহিনীতে আরএসএস-এর বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করা লোকদের নিয়ে যাচ্ছে বলে জোরদার অভিযোগ উঠেছে। মধ্যপ্রদেশে দলিত, আদিবাসী এবং মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষদের জমির অধিকার কেড়ে নেয়ার নোংরা ষড়যন্ত্র চলছে, একই অবস্থা ঝাড়খন্ডেও। আরএসএস-এর এই তালিকা থেকে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গও বাদ যাচ্ছে না। উগ্র আরএসএস-পন্থী একজনকে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি-র রাজ্যপ্রধান করে আরএসএস বুঝিয়ে দিয়েছে এই রাজ্যও তাদের শকুনের দৃষ্টির বাইরে নেই। আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস বিজয়া দশমীর দিন তাদের মতোই তাদের মহিলা সংগঠন 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি' (যদিও নারীর ক্ষেত্রে মনুর অনুশাসনের বাইরে এক পাও ফেলতে রাজি নয় আরএসএস) গোটা

www.pathagar.com

রাজ্য জুড়ে 'অস্ত্র পূজা' পালন করলো। এটি আরএসএস-এর উৎসব বিধির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এ উৎসবে শ্লোগান উঠেছিল ঃ 'অত্যাচারের প্রতিরোধে যবে/ভীম প্রতিজ্ঞা লও যদি সবে/সেইদিন তব প্রার্থনাধ্বনি পশিবে আমার কানে/শুধু ফুলে পূজা নেবো না এবার কাতর কাকুতি গানে।' এসবেরই মূল লক্ষ্য হলো মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষ। সমিতির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ঃ সমিতির আরাধ্যা দেবী অষ্টভুজার হাতে যেমন ত্রিশূলের মধ্যে গৈরিক ধ্বজা লাগানো রয়েছে, দেবীর অভয় হস্তের পিছনে রয়েছে খড়গধারী হাত, তেমনি সমিতির সংকল্প হবে তেজস্বী রাষ্ট্র নির্মাণ এবং আত্মরক্ষার্থেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হবে এ অস্ত্র। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি এবং দুর্গা বাহিনী আরএসএস-এর মতোই গোটা দেশজুড়েই এ অস্ত্র পুজো উৎসব পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তেও এ কাজ তারা করেছে।

মুম্বাইতে ঠাকরের হুংকার, গুজরাটে মোদীর গৌরব যাত্রা কিংবা বিলগ্নীকরণের প্রশ্নে আরএসএস-এর প্রতিবাদ আর এ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, দুর্গা বাহিনীর অস্ত্র পুজোর নামে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ—এসবই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাক্রম নয়। প্রত্যেকটি কাজই অসভ্য বর্বর আরএসএস-এর দীর্ঘ পরিকল্পনার একটি নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। আরএসএস এ মুহূর্তে তাদের এ বর্বরতার সহযোগী শক্তি হিসেবে অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের জন্যে অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গের মতো ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের ঐকান্তিক সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিম বঙ্গে এই ধর্ম ব্যবসায়ী সংগঠনটি অত্যন্ত সক্রিয়। এই সংগঠনটির মধ্যে বহু আরএসএস-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক রয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের গিধনিতে এ সংগঠনের দলছুট কিছু ব্যক্তির একটি কেন্দ্র রয়েছে, যাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, আরএসএস এবং জনযুদ্ধওয়ালাদের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। আরএসএস-এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলতায় এদের রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়। কোন্ সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে পুত্র সন্তান হবে আর কোন্ সময়ে কন্যা সন্তান হবে তার বিধানও এ সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। পশ্চিম বঙ্গে আরএসএস যে জায়গাগুলোতে নিজেরা প্রবেশ করতে পারছে না সেই জায়গাগুলোতে এ ধরনের বর্বরদের সাহায্য নিয়ে প্রবেশ করছে। এ মুহূর্তেই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এ নোংরা ষড়যন্ত্রকে রুখবার জন্যে সব রকমের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। আরএসএস. বিজেপি-র মতো ধর্ম ব্যবসায়ী বর্বরদের সমাজের প্রত্যেকটি স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করাই এখন যে কোনো দেশপ্রেমিক মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

❐

www.pathagar.com

# শ্যামাপ্রসাদ ও বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসা

এ মুহূর্তে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন ভারতীয় জনতা পার্টি যে সংগঠনটির রাজনৈতিক মুখ, সেই বর্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের চরম মানবতাবিরোধী ধ্যান-ধারণার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত না হওয়ায় হিন্দু মৌলবাদীরা ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষুব্ধ হয়েছে। 'আর বাবু যতো বলে পারিষদ দল বলে তার শতগুণ' মৌলবাদীদের লেজুড় তৃণমূল কংগ্রেস স্বভাবসুলভ শিবারব জুড়ে দিয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতিটা একই সাথে আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির ন্যক্কারজনক ভূমিকা বিশ্লেষণের সুযোগ এনে দিলেও আত্মসমীক্ষারও একটি দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল মানুষটির গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সংশোধনবাদী কমিউনিস্টরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন আজ ঢোক গিলে দু-চারটি প্রলাপ বকে সেই পাপস্খলন কী আদৌ সম্ভব ? হ্যাঁ, আমি আরএসএস-এর মুখপত্রে সত্তরের দশকের প্রথমার্দ্ধে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের কথাই বলছি। 'পাঞ্চজন্য'-এ হীরেনবাবুর এ লেখাটি যেভাবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের কাছে শ্যামাপ্রসাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে তার মূল্য আজ আমাদের দিতে হচ্ছে। আরএসএস দশটিরও বেশি ভারতীয় ভাষায় হীরেনবাবুর এ প্রবন্ধটির অনুবাদ করে প্রচার চালিয়েছে। আজ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে যে ক্রেজ তৈরি হয়েছে তা সৃষ্টির দায় থেকে কোনো অবস্থাতেই সিপিআই-এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অব্যাহতি দেয়া যায় না।

স্যার আশুতোষের মতো নজরকাড়া ব্যক্তিত্বের সন্তান হয়েও সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা শ্যামাপ্রসাদের মানসিক গঠনকে কতখানি বিকৃতভাবে তৈরি করেছিল তা তার সমগ্র জীবনের পর্যালোচনা করলেই খুব সহজে বুঝতে পারা যায়। শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকার কথা আশ্চর্যজনকভাবে চেপে যাওয়া হচ্ছে। এর থেকে সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণার জন্ম হতে পারে যে, রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে বহু সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সব সমালোচনার ঊর্ধে। ব্যাপারটি কিন্তু আদৌ সে রকম নয়। রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদের সাম্প্রদায়িক অভিব্যক্তির সবসময়ই শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর সংকীর্ণ ধর্মীয় স্বার্থের বাইরে এক পা ফেলতেও সক্ষম হননি।

www.pathagar.com

# ফ্যাসিবাদের মানস সন্তান বর্বর বিজেপির শিক্ষা ক্ষেত্রকে গৈরীকিকরণ প্রসঙ্গে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক চরম প্রতিক্রিয়াশীল, মানবতাবিরোধী বর্বর সংগঠনটির জন্মের পর তার পালক পিতার ভূমিকা পালন করেছিল ইতালির ফ্যাসিবাদী শক্তি। ফ্যাসিবাদী মডেলেই এদেশে হিন্দু মৌলবাদকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে সমাজ জীবনের গভীরে নানা প্রকারের অন্ধত্ব, কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়েছে আরএসএস সহ তাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলি এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও সহযোগী শক্তিগুলি। শিক্ষার অঙ্গনকে কুক্ষিগত করে তাদের বর্বর চিন্তাধারার হলাহলকে দেশ ও জাতির মধ্যে সংক্রামিত করা আরএসএস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তারা চিরকালই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষাক্রমগুলির উপর। মহাবিদ্যালয় স্তরে যখন একজন ছাত্র প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে চিন্তাচেতনার বিকাশ একটা মাত্র পেয়ে যায়। সেখানে কোনো অবৈজ্ঞানিক, প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার প্রবেশ ঘটানো একটু মুশকিলের ব্যাপার। তাই-ই বর্বর সঙঘ পরিবার তাদের আসুরিক ক্রিয়াকর্মের বীজ স্থাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে এই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরটিকেই। আগে হিন্দি বলয়ে এই স্তরে আগ্রাসনটা হতো সব থেকে বেশি। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে এ আগ্রাসনের ক্ষেত্রটা আর কেবলমাত্র হিন্দি বলয়ে সীমাবদ্ধ নেই, দেশের সর্বত্র-ই বর্বর সঙঘ পরিবার তাদের শক্তি, সামর্থ অনুসারে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। বর্বর সঙঘ পরিবার তাদের এই নোংরা কৌশলের ভয়ার্ত সংক্রমণ আমাদের সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে ঘটিয়ে চলেছে বিরামহীন ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় প্রত্যেকটি স্তরকে তারা অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, প্রতিক্রিয়াশীলতার নোংরা প্রলেপে ঢেকে দিতে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাচ্ছে সরকারী ক্ষমতাকে। এই বদমাইশির পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে মানবিকী বিদ্যা থেকে আধুনিক বৈদ্যুতিন শিক্ষা পদ্ধতিতে, সবক্ষেত্রে-ই চলেছে তাদের নগ্ন আগ্রাসন।

জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ফ্যাসিবাদের মতাদর্শ এবং ব্যবহারিক দিকগুলির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণ কেবলমাত্র লোক-দেখানো আকর্ষণ ছিল না। অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের তাগিদ-ই এ

www.pathagar.com

আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এই আকর্ষণ আবার কোনো সাময়িক আবেগসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া ছিল না। বিগত শতকের বিশের দশকের সূচনাপর্ব থেকেই তথাকথিত হিন্দুত্বের মতাদর্শ এবং সংগঠন সৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দেয়। মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের বড় কারণ অবশ্য ছিল বিশের দশকের প্রথমে সেখানে বড় কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। আর মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষেরা সেখানে ছিলেন সংখ্যালঘু। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন সেখানকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি ইতিবাচক প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭০ সালে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং তার প্রভাব ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক জুড়ে মহারাষ্ট্রে বেশ ভালো রকমের-ই ছিল। জ্যোতিবা ফুলের 'সংশোধক সমাজ' সেখানকার সামাজিক জীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল তা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির শ্রেণীস্বার্থকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেছিল। এই ঘৃণ্য শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদ হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার বিকাশে মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের একটি বড় কারণ ছিল। '২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক জন্মলগ্ন থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথেই ফ্যাসিবাদের প্রতি আকর্ষণ এই সংগঠনটির নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল ছিল। এ আকর্ষণ জনিত চিন্তাভাবনার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার পরিকল্পনা এই বর্বর সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকেই করে ফেলে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্মের বেশ কিছু সময় আগে থেকেই তথাকথিত হিন্দু সংহতিতে বিশ্বাসী জাতীয় আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁদের আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বিশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই মারাঠী সাংবাদিকদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। চরমপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক এক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পাদিত 'কেশরী' পত্রিকা ইতালির ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে, মুসোলিনী সম্পর্কে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন সংবাদ ছাপতে শুরু করে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়া ইতালিকে মুসোলিনী কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার অতি কথন ছিল সেই সময় উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক 'কেশরী' পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পত্রিকা ফ্যাসিবাদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক উৎস সন্ধানেও আত্মনিয়োগ করেছিল। ফ্যাসিবাদের বাইরের আবরণের আড়ালে তার প্রকৃত স্বরূপটি যে কী ভয়ঙ্কর ছিল সেটা উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অজানা ছিল না। কারণ, ১৯৩১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিএস মুঞ্জের ইতালি সফর ফ্যাসিবাদের সঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অতীতের সংযোগ এবং ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ের দিকচিহ্ন বহন করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

নেতৃত্ব উগ্রতাকে আশ্রয় করে এ দেশে হিন্দু মৌলবাদ কায়েম করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্লজ্জ পদসেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাবার উদগ্র বাসনাজনিত অভিব্যক্তি-ই তাদের তাড়িত করেছিল। স্বৈরতন্ত্রের প্রতি হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের প্রথম থেকেই প্রবল আকর্ষণ ছিল। মুসোলিনী তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের খোলাখুলি প্রশংসা বর্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থিঙ্কট্যাঙ্কেরা গোড়া থেকেই করতেন। মুসোলিনী যখন প্রথমের দিকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরিবর্তে মনোনীত সাংসদ ব্যবস্থার প্রথা প্রচলন করেছিলেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের কাছে তা বিশেষ রকমেরই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে যখন এ মাদকতা সমাজ জীবনকে কলুষিত করতে শুরু করে দিয়েছে তার বেশ কিছু সময় আগে থেকেই কিন্তু গোটা উত্তর ভারত জুড়ে তথাকথিত সংস্কারের নামে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বেশ প্রবল আকার ধারণ করে ফেলেছে। বিশেষ করে আর্যসমাজীদের নানা কীর্তিকলাপ, লালা লাজপত রায়ের দেশভাগের পক্ষে স্পষ্ট সওয়াল, ভাই পরমানন্দ, লালা লালচাঁদ প্রমুখ উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের। সেখানকার সামাজিক পরিবেশকে ভয়ঙ্কর রকমভাবে কলুষিত করে দিয়েছে। উত্তর ভারতের এই সামাজিক পরিবেশ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। দক্ষিণ ভারতে এ বর্বর সংগঠনটির উৎসভূমি হলেও এই বর্বরতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উত্তরের অবদান খুব একটা কম নয়। মুসোলিনী যেভাবে নির্বাচিত সংসদকে বাতিল করে সেই জায়গায় 'গ্রান্ড কাউন্সিল ফর ফ্যাসিজিম' তৈরি করছিলেন সেটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করেছিল। 'কেশরী' পত্রিকার সেই সময়ের বিভিন্ন সংখ্যাগুলো এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। এই গণতন্ত্র বিরোধী ধ্যান-ধারণা হলো আমাদের দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির মূলমন্ত্র। এই ধ্যান-ধারণার প্রকাশ-ই তারা তাদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা, কাজকর্মের মধ্যে করে থাকে। এবং জন্মলগ্ন থেকেই এই গণতন্ত্র বিরোধী ধ্যান-ধারণা তারা তাদের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে প্রোথিত করে আসছে। তাদের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাভাবনা সব কিছুর-ই মূলে এই গণতন্ত্র বিরোধী ধ্যান-ধারণা একটা বড় জায়গা নিয়েছে। একনায়কতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে 'কেশরী'-তে লেখা হয়েছিল, যদি আমরা সবকিছু ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, একনায়কতত্ত্ব যে কোনো জাতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর থেকে অনেক-ই বেশি ইতিবাচক।

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয় ১৯২৯ সাল নাগাদ তার উত্তাপ ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। বেকারী লাগামহীন হয়ে পড়ে। এ অর্থনৈতিক সঙ্কট ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদকে প্রসারণের সুযোগ এনে দেয়। একই সঙ্গে এই অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

সঙ্কট শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে কমিউনিস্টদেরও শক্তি বৃদ্ধি ঘটায়। হিন্দু সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তি যখন ফ্যাসিবাদের মোহিনী মায়ায় অভিষ্ট হয়ে পড়েছে তখন-ই কিন্তু ইতালী সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে ফ্যাসিবাদের নগ্ন প্রকাশ ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের সঙ্কট ফ্রান্সে যেমন কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি-ই ফ্রেঞ্চ সলিডারিটি (French Solidarity) নামক ফ্যাসিস্ট পার্টির জন্ম দেয়। পর্তুগালে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়। অস্ট্রিয়াতে ১৯২৫ সাল নাগাদ-ই ফ্যাসিস্ট বিস্তারের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছিল। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিস্ট শক্তির এই তথাকথিত বাড়বাড়ন্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এতটাই মোহবিষ্ট করে তোলে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে—তারা লেখে, ইতালি এবং নতুন প্রজন্ম। এই প্রবন্ধে তথাকথিত নতুন প্রজন্মের হাত ধরে ইতালির কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার একটি মনগড়া বিবরণ ছিল। ইতালির শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এখানে নানা স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। এবং আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতালির মডেল প্রয়োগের স্বপক্ষে ওকালতি করা হয়েছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব ফ্যাসিস্ট আদলে ভারতীয় সমাজের তথাকথিত পুনর্গঠন কামনা করেছিলেন। ইতালির শিক্ষাব্যবস্থার গুণগান করে তাদের তথাকথিত সামাজিক অগ্রগতির মূল নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে তারা নিরুপিত করেছিলেন তথাকথিত ধর্মীয় আবেগকে। এই ধর্মীয় আবেগ-ই নাকি ফ্যাসিবাদী শক্তির নিয়মানুবর্তিতার চাবিকাঠি। তাদের শিক্ষার মেরুদণ্ড-ও হচ্ছে এই ধর্মীয় আবেগসঞ্জাত তথাকথিত নিয়মানুবর্তিতা—এটাই ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির অভিমত। সেই সাথে যাবতীয় প্রগতিবিরোধী বিষয় যেমন, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর অনূঢ়া না থাকা, নারীর ভোটাধিকার থাকবে না ইত্যাদির পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। হিন্দু মৌলবাদী শক্তি তাদের তথাকথিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে সামরিক শিক্ষার উপরে একটা বিশেষ ধরনের দুর্বলতা দেখায় এবং তাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যেও যে সামরিক শিক্ষায় ট্রেনিং দেয়া হয় সেই সামরিক শিক্ষার প্রতি এই বর্বর শক্তির দুর্বলতার প্রথম লিখিত সাক্ষ্য বহন করে 'কেশরী'র আলোচ্য নিবন্ধটি।

বর্বর আরএসএস-এর সমস্ত উৎসব পালনের যে প্রচলন রয়েছে তার ধ্যান-ধারণার ভিত্তিভূমি হলো এই তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন। আর. এস. এস যে কয়টি উৎসব পালন করে থাকে যেমন, নবরাত্রি, বিজয়া দশমী—সেটা নাকি রাবণের বিরুদ্ধে রামের বিজয়ের দিন। এই দিনে অস্ত্র পূজো করা হয়। জানুয়ারী মাসে মহা সংক্রান্তি—এই দিনটি তারা পালন করে 'অখণ্ড জাতীয়তাবাদ' বিকাশের জন্যে এপ্রিলে পালন করে 'বর্ষ প্রতিপদ'—এই

www.pathagar.com

দিনে নাকি যুধিষ্ঠির আর বিক্রমাদিত্য 'হিন্দু ক্যালেন্ডার-এর' প্রচলন করেছিলেন, আর এই দিনে নাকি অভিষেক হয়েছিল রামচন্দ্রের! শিবাজীর অভিষেকে স্মরণ করে মে মাসে তারা পালন করে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস', আগস্ট মাসে পালন করে 'রাখী বন্ধন', এ দিনটিতে স্বয়ং সেবকদের নাকি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, হিন্দু সমাজের মানসম্মান বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তাদের পরমতম কর্তব্য। সেপ্টেম্বরে আরএসএস পালন করে ব্যাস পূজো—এ দিন গৈরিক পতাকার পূজো করা হয় এবং এ সংগঠনে নাম না জানিয়ে সদস্য, সমর্থকেরা অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ-ই আরএসএস-কে পুষ্ট করে, এই দানের কোনো রকমই হিসেব-নিকেশ থাকে না। এই সমস্ত উৎসব পালনের মধ্যেই প্রথাবহির্ভূতভাবে সমাজের সর্বস্তরে হিন্দুত্ববাদী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্বয়ংসেবকদের মগজ ধোলাই করা হয়। এই তথাকথিত হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী উৎসব পালনের রীতি বর্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অতীতের সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রচলিত ধারা থেকেই আয়ত্ত করেছে। আজ বিজেপি জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এবং অতীতে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে সামাজিক উৎসবের থেকে ধর্মীয় উৎসবগুলো স্কুল, কলেজের ছুটির ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ সমস্ত চিন্তাভাবনার ও দ্যোতনা অতীতের এই তথাকথিত সংস্কারবাদী আন্দোলনের মধ্যেই ছিল। দীনদয়ালুর পরিবর্ধিত সংগঠন 'ভারত ধর্মমহাওল'-এর প্রথম প্রকাশ্য সভা হয়েছিল গঙ্গা দশমীর দিন। এই সংগঠনটি 'বর্ণাশ্রম'-এর উপরও জোর দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, জন সংঘ কিংবা তাদের পরিবর্তিত রূপ ভারতীয় জনতা পার্টির এই বর্ণাশ্রমের প্রতি, মনুবাদী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিভূমি নিহিত রয়েছে এইসব তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নানা গতিপ্রকৃতি, কার্যবিধির অন্তরেই।

এই সংগঠনটি এই সময়ে উত্তর ভারতে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ১৮৮৯ সালের ২৪ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত তারা বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ দেব মন্দিরে তাদের সংগঠনের দ্বিতীয় সভা করে। এই সভার প্রতিবেদনে তারা দাবি করেছিলেন যে, ওই সময়ে সমগ্র দেশে প্রায় ১০০টি হিন্দুদের ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে। কিন্তু ১৮৮৭ থেকে পরবর্তী দুই বছরে এই ধরনের সংগঠন প্রায় ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে তাদের দাবি ছিল। এই ধরনের তথাকথিত ধর্মীয় সংগঠনগুলো মূলত সমাজে পশ্চাৎপদমুখীতাকেই দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য আত্মনিবেদন করে গেছে। এই সময়ে একটি বড় ধরনের ধর্মীয় মেলায় এই মহামণ্ডল আবার সমবেত হয়েছিল। এই সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধির-ই সংখ্যা ছিল ৫০০জন, স্বেচ্ছাসেবক ছিল ৫০০০ জন। এরপর

www.pathagar.com

থেকে এ সংগঠন জোর দেয় তথাকথিত 'গায়ত্রী মহামন্ত্র'-এর উপরে। ১২৫ জন ব্রাহ্মণ এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় এ 'গায়ত্রী মহামন্ত্র' নামক একটি বড় মঞ্চ তৈরি করে। এই গায়ত্রী মহামন্ত্র-এর ধারণাটি পরবর্তীকালে আত্মস্থ করেছে আরএসএস। উচ্চবর্ণের হিন্দু অভিজাতদের মৌলবাদী সংগঠন দলিত সমাজে অনুপ্রবেশের উদ্দেশে এই 'গায়ত্রী মহামন্ত্র'-এর আশ্রয় নেয়। বিজেপি-র পূর্বসুরী হিন্দু মহাসভা কিংবা জনসংঘ-এর আমলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সেভাবে দলিত হিন্দু সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়নি। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত সেবক হিসেবে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি তাদের যাবতীয় কুকীর্তিগুলো মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিল। তবে তাদের হিন্দুত্ববাদী প্রচার, তাদের তথাকথিত শিক্ষাপদ্ধতি এগুলির সবই প্রয়োগ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে সাথে দলিত হিন্দুদের উপরেও চলেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এরা যেমন দলিত সমাজের মধ্যে অনুবিষ্ট হয়ে নিজেদের উচ্চবর্ণের মনুবাদী হিন্দু পার্টির ইমেজকে ভাঙতে চাইছিল তেমনিই তাদের তথাকথিত শিক্ষা চিন্তার মাধ্যমে মানুষের মগজ ধোলাইয়ের নোংরা ষড়যন্ত্রটি শুরু করে দিয়েছিল জোরদারভাবে। আরএসএস-এর পরিবারভুক্ত সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদ আদিবাসী সমাজের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী চিন্তাচেতনার প্রসারের উদ্দেশে ১৯৭৭ সালে তৈরি করে ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। মূলত আদিবাসী সমাজের মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সর্বভারতীয় সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল। এই ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কর্মসূচির একটা প্রাথমিক রূপরেখা অবশ্য '৭৭ সালের অনেক আগেই ('৫২ সাল নাগাদ) মধ্যপ্রদেশকে কেন্দ্র করে প্রথম গড়ে উঠেছিল। '৬৬ সাল থেকে আরএসএস সেই ভাবধারাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। '৭৭ সালে বিভিকেএ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরানো স্বয়ংসেবক তথা প্রচারক এবং জনসংঘ নেতা রামভাউ গোভিলকে (Rambhau Godbole) আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এ সংগঠনের দায়িত্ব আরএসএস দিয়েছিল। গোভিল একদা জনসংঘের সম্পাদকের দায়িত্ব-ও পালন করেছিল। ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই সংগঠন একান্ত নিজস্বভাবেই মূলত উত্তর ভারতে ৮৯টি ছাত্রাবাস তৈরি করে।

ঊনবিংশ শতকে ইতালিতে যে ঐক্য আন্দোলন হয়েছিল, মাৎমিনী যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই Risorgiments বা পুনর্জাগরণের সঙ্গে ফ্যাসিবাদকে তুলনা করে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ইতালির পুনর্জাগরণ কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম

www.pathagar.com

পর্যায়কে খুবই প্রভাবিত করেছিল। নরমপন্থী এবং চরমপন্থী উভয় পক্ষই ইতালির পুনর্জাগরণের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তিরিশের দশকে গোড়ার ফ্যাসিস্ট শক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের যোগাযোগ গড়ে উঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির সাথে ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বিএস মুর মাধ্যমে। আরএসএস-এর জন্মলগ্নের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা ছিলেন মুঞ্জে। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের একজন সংস্কারপন্থী কংগ্রেস নেতা ছিলেন ড. বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে। হেডগেওয়ারের জীবনে জাতীয়তার নামে উগ্রতাকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে মুঞ্জের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। মুঞ্জে-ই হেডগেওয়ারকে ডাক্তারি পড়বার উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কলকাতায় ছয় বছর অবস্থান কালে হেডগেওয়ারের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। হেডগেওয়ার এই সময়ে অনুশীলন সমিতির সর্বোচ্চ স্তরের সদস্য পদ লাভ করেছিলেন।[১৬] আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া ছিল মুঞ্জের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে আরএসএস-এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে মুঞ্জে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাস জুড়ে গোটা ইউরোপ সফর করেন। এ সময়ে তিনি বেশ কিছুদিন ইতালি থাকেন এবং মুসোলিনীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে আরএসএস-এর সাথে ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। ফ্যাসিবাদী শক্তির শিক্ষা পরিকল্পনাগুলোকে তিনি নিজে দেখেন এবং পরবর্তীকালে দেশে ফিরে এসে বর্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শিক্ষাক্রমগুলিকে ফ্যাসিবাদী শিক্ষার অভিজ্ঞতার নিরিখে গড়ে তোলেন। সেই ভাবাদর্শকেই বর্তমানে বিজেপি-জোট সরকার অনুসরণ করে চলেছে। রোমে অবস্থানকালে যে সমস্ত ফ্যাসিবাদী সংগঠনের সাথে যেমন, ফ্যাসিস্ট আকাদেমি অফ ফিজিকাল এডুকেশন, মিলিটারি কলেজ, সেন্ট্রাল মিলিটারী স্কুল অফ ফিজিকাল এডুকেশন, বালিল্লা, আভাঙগুওয়ারদিস্‌তি ইত্যাদির সঙ্গে মুঞ্জের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, দেশে ফিরে ওইসব সংগঠনগুলির ভাবাদর্শ, কার্যপদ্ধতি তিনি আরএসএস-এর ভাবাদর্শ, গঠন পদ্ধতি সঙ্গে সংযোজিত করেন। আভাঙগুয়ারদিস্‌তি এবং বালিল্লা ছিল ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সব থেকে প্রভাবশালী দুটি সংগঠন। আরএসএস-এর পরিকাঠামো এই দুটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের আদলেই তৈরি করা হয়েছে। এই ফ্যাসিবাদী সংগঠন দুটিতে ছয় থেকে আঠারোর মধ্যেকার ছেলেদের যুক্ত

www.pathagar.com

করা হত, সংগঠনের প্রত্যেক সভ্যের সাপ্তাহিক সভায় যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। এখানে নানা ধরনের শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হত, কুচকাওয়াজ এবং ড্রিল ছিল বাধ্যতামূলক। এগুলি প্রায় সবই আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের অবশ্য পালনীয় কার্যবিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত মুঞ্জের সঙ্গে ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে-ই ফ্যাসিস্ট ভাবাদর্শের আদলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ গড়ে উঠেছে।

আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জন্ম ১৯৪৮ সালে। নীতি হিসেবে এই সংগঠনটি জন্মলগ্নে ঘোষণা করেছিল ; পারিবারিক আদর্শে শিক্ষক, ছাত্র, মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসকদের সম্পর্কের কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা। প্রশাসক এবং শিক্ষকরা এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে রয়েছে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আরএসএস-এর উৎসব ব্যাস পূজোরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্ররা শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আরএসএস স্বীয় শিক্ষাপদ্ধতির (যা কিনা ব্যাপকভাবে ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রথাভুক্তভাবে কাজ করার লক্ষ্যে আরএসএস শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ১৯৫০ সালে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে। 'বিদ্যাভারতী' নামক এই শিক্ষা পরিকল্পনা ১৯৫২ সালে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছিল। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে এই বিদ্যাভারতী প্রকল্পে তারা প্রায় ৫০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লাখেরও বেশি। উত্তর পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং মিজোরাম বাদে দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যেই এই বিদ্যাভারতীর শাখা স্থাপন করতে এই সঙ্ঘ পরিবার সমর্থ হয়েছে। এই বিদ্যাভারতীর পরিকাঠামো নির্মাণেও ইতালির ফ্যাসিবাদী সংগঠন বালিল্লার বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। এই সংগঠনটি যে আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতাদের কতোখানি প্রভাবিত করেছিল তা বুঝা যায় ড. মুঞ্জের দিনলিপির মধ্যে দিয়ে। তিনি লিখেছেন ঃ "বালিল্লা প্রতিষ্ঠানগুলো আমায় মুগ্ধ করেছে। এই সংগঠনগুলোর সামগ্রিক সাংগঠনিক ধ্যান-ধারণা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। ইতালির সামরিক পুনর্জাগরণের কথা চিন্তাভাবনা করেই শ্রদ্ধেয় মুসোলিনী সমস্ত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। ভারতীয়দের যেমন স্বভাব তেমনিই ইতালির মানুষদেরও স্বভাব, তারা বড্ড বেশি যুদ্ধবিমুখ আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের বড্ড বেশি অনুরাগ। ভারতীয়রা যেমন কেবলমাত্র শরীরচর্চা করেই সময় কাটিয়েছে এর ফলে যুদ্ধ বিদ্যাটা আদৌ রপ্ত করে উঠতে পারেনি, ইতালির মানুষ সম্পর্কেও ঠিক একই রকমের কথা খাটে।

www.pathagar.com

ইতালির এই দুর্বলতাকেই বুঝতে পেরে মুসোলিনী অত্যন্ত বাস্তবসম্মত চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বালিল্লার মতো সংগঠনের কথা চিন্তা করেছেন। আমার মনে হয় ইতালির সামরিকীকরণের জন্যে বোধহয় এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। জনগণের বিচারে ঐক্য, সংহতির ধারাকে স্পষ্ট করে তুলেছে ফ্যাসিবাদের দ্যোতনা। হিন্দুদের সামরিক পুনর্জাগরণের জন্যে, হিন্দু ভারতের জন্যে এই রকমের সংগঠনেরই সব থেকে বেশি প্রয়োজন। এই ধরনের সংগঠন যদি গড়ে উঠে তাহলে বৃটিশরা ইচ্ছে করে হিন্দুদের ভিতরে যোদ্ধা এবং অযোদ্ধা—এই যে বিভাজনটা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে রেখেছে—তা আর থাকবে না। আমাদের নিজস্ব সংগঠন নাগপুরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এই রকমই একটা সংগঠন। আমি আর যেকটা দিন বেঁচে থাকবো এইকটা দিন ডা. হেডগেওয়ারের এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আরো ব্যাপক আকারে সারা দেশের মধ্যে বিস্তৃত করার জন্যে আত্মনিয়োগ করবো।" তিরিশের দশক থেকেই এই ফ্যাসিবাদী আদলে আরএসএস-কে গড়ে তুলতে হিন্দু মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তির চেষ্টার বিরাম নেই। সেই উদ্যোগেরই একটি নোংরা অংশ হলো শিক্ষা ক্ষেত্রকে সাম্প্রদায়িক কৌণিক বিন্দুতে উপস্থাপন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাভারতীর শাখা আরো দশ হাজার বৃদ্ধি করা হবে ২০০০ সালে মধ্যে—এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরএসএস। তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যমাত্রা তারা পূরণ করে ফেলেছে। আরএসএস সহ সংঘ পরিবারের সকল শাখা সংগঠন এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির শিক্ষা বিষয়ক মূল চিন্তা হলো ঃ 'হিন্দুত্ব'-এর চিন্তায় মানুষকে তাড়িত করেই দেশে 'জাতীয়তাবাদের' সঠিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশে এবং হিমাচল প্রদেশে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেখানকার শিক্ষাক্ষেত্রকে কীভাবে সাম্প্রদায়িকরণ করা হয়েছিল তার সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করছি। সেই ধারাকেই কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরও বিভৎস রূপ দেওয়া হয়। কেন্দ্রে দেশাই সরকারের আমলে বিদ্যাভারতীর প্রয়োগকে সফল করার জন্যে যেসব প্রয়াসের গায়ে সরকারী তক্‌মা দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল, সেই ধারাকেই এই চারটি রাজ্যে প্রথম অনুসরণ করা হয়। আটের দশক পর্যন্ত দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ; বিশেষ করে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড মেঘালয়ে খৃস্টান মিশনারীদের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় এ অঞ্চলগুলিতে আরএসএস তাদের বিদ্যাভারতীর কার্যক্রম সেভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে ভিপিসিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ট্রেজারি বেঞ্চে অবস্থান কিংবা তারও পরবর্তীকালে সরাসরি কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের সুযোগে আরএসএস ওই অঞ্চলগুলোর শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ব্যাপকভাবে চালাতে শুরু করে দিয়েছে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ব্লকেই বিদ্যাভারতীর শাখা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আরএসএস। ক্ষমতায় আসবার পর উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকার সেখানকার সরকার পরিচালিত স্কুলগুলোর পাঠ্য ইতিহাসে পুস্তক নতুন করে লেখবার দায়িত্ব আরএসএস-এর হাতে তুলে দেয়। রাজ্য সরকারগুলোর পক্ষ থেকে আরএসএস-কে অনুরোধ করা হয় ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে যে বিকৃতি (বিজেপি-র মতাদর্শ অনুযায়ী) ঘটানো হয়েছে সেগুলো দূর করে সত্যিকারের ইতিহাস যেন আরএসএস রচনা করে। আরএসএস-এর পক্ষ থেকে বিদ্যাভারতী এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। '৯২ এর শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন করে লেখা বিদ্যাভারতী দ্বারা প্রস্তুত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক এই চারটি রাজ্যের সরকার পরিচালিত স্কুলগুলিতে পড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৯] ইতিহাস বিকৃতি হিসেবে যেসব বিষয়গুলি আরএসএস গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল ঃ আর্যরা বহিরাগত বলে ঐতিহাসিকদের যে সিদ্ধান্ত তা সঠিক নয়, আরএসএস-এর বিশ্বাস, আর্যরা হলো ভারতের-ই ভূমিপুত্র।[২০] আরএসএস যে সমস্ত স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে গ্রন্থ প্রস্তুত করেছে সেগুলিতে এই ধ্যান-ধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বিজেপি জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবার পর স্কুল পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকগুলোতে পুনর্লিখনের নামে ইতিহাস অনাশ্রিত এই ধারণাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসে সম্রাট আকবরের যে স্থান রয়েছে আরএসএস তা স্বীকার করে না। আরএসএস-এর মতে সম্রাট আকবার আদৌ মহান ছিলেন না। মহারাণা প্রতাপ সিংকেও অবশ্য আরএসএস প্রথম অবস্থায় 'মহান' বলে না ! কারণ তিনি সম্রাট আকবরের সঙ্গে রাজনৈতিক শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন। মজার কথা হলো, আরএসএসীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্রাট আকবর 'বিদেশি'— বহিরাগত আর মাহারানা প্রতাপ হলেন 'ভূমিপুত্র'। এই দিক থেকে বিচার করে মহারাণা প্রতাপকে আরএসএস 'মহান' আখ্যা দিয়েছে! সম্রাট আওরঙ্গজে মেঘের তথাকথিত নিষ্ঠুরতাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার পক্ষপাতী আরএসএস। বিদ্যাভারতী প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে এইসব ধ্যান-ধারণার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলাবাহুল্য বিজেপি-জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে এই ধারাকেই অন্ধভাবে অনুকরণ করে চলেছে। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মূল বৈশিষ্ট্য আরএসএস তাকেই স্বীকার করে না। এ দেশের 'মিশ্র সংস্কৃতি'র ধারাকেই তারা অস্বীকার করে। তাদের মতে, ভারতের একটাই সংস্কৃতি, আর সেটা হলো হিন্দু সংস্কৃতি। আরএসএস-এর মতে, ভারতবর্ষ হলো 'এক জাতীয়তাবাদে'র দেশ। বিদ্যাভারতী প্রকাশিত যাবতীয় ইতিহাস গ্রন্থে এই ধরনের অসত্য, অনৈতিহাসিক বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একই ধারা অব্যাহত রেখেছে বিজেপি জোট সরকার-ও। আরএসএস দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজীর ভূমিকাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত করবার স্বপক্ষে সাওয়াল করে আসছে। তাদের মতে, দেশ ভাগে গান্ধীজীর একটি নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকাকে তারা ইতিহাস পুস্তকে আলোচিত হোক এটাই বর্বর সঙ্ঘ পরিবারের কাম্য। কাশ্মীর প্রশ্নে সর্দার প্যাটেল, নেহরুর ভূমিকাকে নেতিবাচক ভাবে দেখে সঙ্ঘ পরিবার। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ তারা ক্ষমতায় আসার পর স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বইগুলিতে নগ্নভাবে রেখেছে। বলাবাহুল্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেশ ভাগের স্বপক্ষে ভয়ঙ্কর ভূমিকাকে তারা ইতিবাচক ভাবেই এইসব ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে দেখিয়েছে, যেমন দেখিয়েছে কাশ্মীর প্রশ্নে শ্যামাপ্রসাদের আগুন নিয়ে খেলাকে। ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গান্ধীজীর প্রবেশ ১৯১৫ সালে। এরপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর উপস্থিতিকে সংশ্লিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

আরএসএসের বক্তব্য হলো ; বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল স্তরের ইতিহাস হিসেবে যা শেখানো হয় তার পিছনে নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যের প্রধান উপকরণ হল সংখ্যালঘু তোষণ। এই তথাকথিত উদ্দেশ্যকে বানচাল করবার উদ্দেশে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সঙ্ঘ পরিবার স্কুল পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছে। আরএসএস-এর বক্তব্য হলো, রাজ্য স্তরের বিদ্যালয়গুলি ইতিহাস পাঠক্রমের সিংহ ভাগ জুড়েই রয়েছে মুঘল এবং ব্রিটিশ আমল। এখানে নাকি রামায়ণের কালের ঘটনাবলীর উল্লেখ প্রায় নেই-ই। আরএসএস যে ইতিহাস পাঠক্রম বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকেই শুরু করেছিল সেখানে রামায়ণ এবং রামকাহিনীর নায়ক রামচন্দ্র-ই ছিলেন সিংহভাগ জুড়ে। বিজেপি-জোট সরকার মনে করে মানুষের মনে 'হিন্দুত্ব' জাগ্রত করার উদ্দেশে হিন্দু ধর্মের আদর্শ প্রচার করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, আরএসএস সহ সঙ্ঘ পরিবারের সকল সদস্যদেরই এটা বক্তব্য। যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল কেন্দ্রে এই 'হিন্দুত্ব'-এর বোধকেই স্থাপিত করেছে বিজেপি-জোট সরকার। আরএসএস রামকাহিনীর নায়ক 'রামচন্দ্র'কে আদর্শ ব্যক্তি বলে মনে

www.pathagar.com

করে। তাদের এই আদর্শ ব্যক্তিই বিজেপি-জোট সরকারের ইতিহাস চিন্তার মূল জায়গা জুড়ে রয়েছে। 'হিন্দুজাতি' এবং 'ভারতবর্ষ' এক এবং অভিন্ন—এই ধারাটিকেই বিশ্লেষণ করা বিজেপি-র শিক্ষানীতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীতে চারটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে এবং পরে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রামকাহিনীর নায়ক 'রামচন্দ্র'-এর কী ভূমিকা এবং রাম জন্মভূমির কী গুরুত্ব সেটাও স্কুল পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষক এবং ছাত্রদের সচেতন করবার বিষয়টি আরএসএস সহ সঙ্ঘ পরিবারের সকল সদস্য এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি চিরদিনই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে এসেছে, ক্ষমতা দখলের পর এই বিষয়গুলি শিক্ষাক্রমের মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত পর্যন্ত করেছে। মুখে তারা এই বিষয়গুলির পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে থাকে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে শিক্ষাদান-ই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলিকে আরএসএস অস্বীকার করে না। কিন্তু এ সবই ভারতের দেশগুলির প্রেক্ষাপটে তারা আলোচনা করে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সমস্ত কিছুকেই তারা উপস্থাপিত করে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাদের মতে, এইসব ধর্মগুলির নামে যেসব 'অপরাধ' সংগঠিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা খুবই জরুরি। এতকাল পর্যন্ত নাকি এইসব 'অপরাধ'-এর তালিকা স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরএসএস নাকি তথ্য গোপনের বিরোধী। এ অনুযায়ী ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মের নামে অসত্য, অনৈতিহাসিক প্রচার তারা চালাচ্ছে। সেই অনুযায়ী ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলির বিকৃতি ঘটাচ্ছে। কারণ, তাদের মতে, গালিচার নিচে লুকিয়ে রেখে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর নয় জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করা। আরএসএস-এর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনার রূপরেখায় বলা হয়েছে, তারা শিশুদের 'জাতীয়তাবাদী' এবং 'প্রকৃত নাগরিক' হিসেবে বিকশিত করতে প্রতিশ্রুতিবাদ। কারণ দেশের ঐক্য সংহতি বিপন্ন—এটা নাকি ভীষণভাবে আরএসএস-কে উদ্বিগ্ন করছে। কোনো সামাজিক গোষ্ঠী যদি ভারতকে ভাঙতে সচেষ্ট হয় তাহলে তা আরএসএস সহ্য করবে না।—এই সমস্ত বক্তব্য তারা স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আরএসএস-এর বক্তব্য হলো পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষা নাকি সম্পূর্ণ বিকৃত। ছাত্রদের নাকি এখন পিতৃপুরুষের ইতিহাস না পড়িয়ে বিশ্ব ইতিহাস এবং কার্ল-মার্কস পড়ানো হচ্ছে!

জন্মলগ্ন থেকেই আরএসএস-এর ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনী, হিটলার সম্পর্কে যে গভীর আগ্রহ এবং আকর্ষণ ; যোগাযোগ তা তাদের মৌলবাদী,

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। আরএসএস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুঞ্জে সরাসরি মুসোলিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ১৯৩১ সালের ১৯ মার্চ মুঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মুসোলিনীর। ফ্যাসিস্ট সরকারের সদর দফতর Palazzo venezia তে এ দিন বেলা ৩টের সময় মুঞ্জে দেখা করেন মুসোলিনীর সঙ্গে। মুঞ্জে লিখেছেন ; 'আমি মুসোলিনীর দুয়োরের সামনে দাঁড়াতেই তিনি স্বয়ং তাঁর আসন ছেড়ে উঠে এসে আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রাথমিক সম্ভাষণ এবং করমর্দন শেষ হলে তাঁকে আমরা বক্তব্য জানালাম। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, ইতিমধ্যেই তিনি আমার সম্বন্ধে বহু কিছুই জেনে নিয়েছেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে-ও তিনি যথেষ্ট-ই ওয়াকিবহাল। গান্ধীর প্রতি তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাশীল। আমরা সামনাসামনি বসে প্রায় আধঘন্টা সময় ধরে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। গান্ধী এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। দেখলাম, গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্টই সন্দিগ্ধ। এই বৈঠক থেকে যে ভারত ইংলন্ডের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকতার অনুকূল কোনো পদক্ষেপ উঠে আসবে না সে সম্পর্কে দেখলাম মুসোলিনী অনেকটাই নিশ্চিত। তিনি আমাকে ইতালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের উপদেশ দিলেন। ছেলেদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হাতেকলমে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই আমি ইতালিতে এসেছি—তাঁকে একথা বলায় খুব খুশি হলেন। আমি তাঁকে আরও বললাম যে, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইংল্যান্ডের ছেলেদের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। মুসোলিনীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কারণ ; তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ইতালির সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আমি যাতে ভালোভাবে দেখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম আজই (১৯-৩-১৯৩১) সকালে আমি 'বালিল্লা' পরিদর্শন করেছি। পরে অন্যান্য সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিও দেখেছি। মুসোলিনীকে আমি সরাসরি জানালাম যে, সংবাদ মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে, সর্বোপরি আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু নেতিবাচক কথাবার্তা দেখেছি, কিন্তু আমি এগুলির মধ্যে আদৌ আপত্তিজনক কিছু দেখিনি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আমার অভিমত মুসোলিনী জানতে চান। আমি তাঁকে বলি, ওই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আমি গুণমুগ্ধ। আপনারা ওখানে যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন প্রতিটি উন্নতিকামী জাতির পক্ষেই তা একান্ত জরুরি। আমার মতে, আপনাদের পরিকল্পনা জাতির সামরিক পুনরুত্থানের জন্যে বিশেষ জরুরি। ভারতের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। বৃটিশদের রাজত্বে ভারতীয়দের

www.pathagar.com

গায়ের জোরে সরিয়ে রাখা হয়েছে সামরিক জগত থেকে। আজ পরিস্থিতি ঘুরে গেছে। ভারতের মানুষ আজ নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুত হতে চায়। আমি সেই লক্ষ্যেই আমার সমস্ত কাজকর্মকে সংঘবদ্ধ করেছি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে নিজেদের একটা সংগঠন-ও আমরা তৈরি করেছি। আমি বিশ্বের যে প্রান্তে যখন যাব সেখানেই আপনার এবং আপনাদের সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করে যাব। আমি তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভ কামনা জানাই। এর উত্তরে অত্যন্ত সহকারে মহামান্য মুসোলিনী আমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আমার পরিকল্পনা এবং আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্যেও তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা, শুভ কামনা জানান এবং সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[২৫]

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মুঞ্জে ছিলেন আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. হেডগেওয়ারের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা। তরুণ হেডগেওয়ার বহুকাল মুঞ্জের বাড়ীতেই কাটিয়েছিলেন। হেডগেওয়ারকে কলকাতাতে মুঞ্জেই পাঠিয়েছিলেন। ইউরোপ সফর, মুসোলিনীর সাথে যোগাযোগ, ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ এইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে মুঞ্জে ভারতবর্ষে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে কাজ করতে শুরু করে দেন। মহারাষ্ট্রের হিন্দু সম্প্রদায়জাত মানুষদের মধ্যে জঙ্গী মানসিকতা জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশে ফিরেই তিনি জোরকদমে হিন্দুদের সামরিক পুনর্গঠনের পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করে দেন। দেশের সেনাবাহিনীর 'দেশীয়করণ' এর জন্যেও আওয়াজ তোলেন। বিগত শতকের তিরিশের দশকে মুঞ্জে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক হবে। মুঞ্জের এ আশার পিছনে ফ্যাসিবাদের ছায়া প্রবলভাবে ছিল। মুঞ্জের এ আশাকে বিজেপি আজও পোষণ করে। 'দি মারাঠা' পত্রিকায় মুঞ্জে বলেছিলেন, বালিল্লা এবং ইতালির অন্যান্য ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলিকে একান্তভাবে অনুকরণ করা আমাদের দেশের নেতাদের কর্তব্য। জার্মানীর যুব আন্দোলনও আমাদের অনুকরণযোগ্য বলে মুঞ্জে মন্তব্য করেছিলেন। এইসব বিষয়গুলি আমাদের দেশে প্রয়োগ করা জরুরি—এটাই ছিল মুঞ্জের অভিমত। মুঞ্জের ভাবশিষ্য ডা. হেডগেওয়ার ছিলেন তথাকথিত হিন্দু সমাজের সামরিকীকরণ তত্ত্বের অন্যতম প্রধান উদ্‌গাতা। ১৯৩৪ সনের ৩১ জানুয়ারী আরএসএস-এর পক্ষ থেকে আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনী সংক্রান্ত একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট আরএসএস নেতা কভেদ শাস্ত্রী এই আলোচনাচক্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভায় হেডগেওয়ার সভাপতিত্ব করেন, মুঞ্জে দিয়েছিলেন সমাপ্তি ভাষণ। লালু গোখলে, মুঞ্জে, হেডগেওয়ার-এর অল্প কিছুদিন পরেই (৩১ মার্চ) হিন্দুদের জন্যে ইতালি ও জার্মানির আদলে সামরিক সংগঠন গড়ে তোলবার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে লালু গোখলে হিন্দুদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সংগঠিত হওয়া সম্ভব কী না তা জানতে চান মুঞ্জের কাছে। মুঞ্জে তার উত্তরে হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিতে যে কার্যক্রমের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেন। ধর্মশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মের একটা সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড এদেশে তৈরি করা অসম্ভব নয়—এটাই ছিল মুঞ্জের প্রধান বক্তব্য। কিন্তু এ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধক হচ্ছে পরাধীনতা—এই বক্তব্যের সাথে সাথেই মুঞ্জে বলেন, আমরা স্বাধীনতা পেলে সর্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন অতীতের শিবাজী কিংবা বর্তমানের হিটলার বা মুসোলিনীর মতো একজন কিংবদন্তী তুল্য হিন্দু মহানায়ক। এ মহানায়কের যতদিন না আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত চুপ করে বসে না থেকে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রচার কার্য চালানো প্রয়োজন—এই ছিল মুঞ্জের অভিমত। ইতালির ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলি এবং স্বয়ং মুসোলিনীর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি ব্রিটিশদের অজানা ছিল না। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বক্তব্য হলো ; মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে আরএসএস-কে ১৯২৭ সাল পুনর্গঠনের দায়িত্ব মুঞ্জে গ্রহণ করেন। আরএসএস যে ভারতবর্ষে একদিন না একদিন ইতালির ফ্যাসিস্ট বা জার্মানির নাৎসীদের ভূমিকা নিতে যাচ্ছে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইংগিত ১৯৩৩ সালেই গোয়েন্দা বাহিনী করেছিল। হিন্দু সমাজকে এই তথাকথিত সামরিকীকরণের লক্ষ্যে কারা কারা মুঞ্জেকে সাহায্য, সহযোগিতা করতে পারবে সে সম্পর্কে ইতালি থেকেই তাকে (মুঞ্জে) একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছিল। দেশে ফিরে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিবর্গের সাথে মুঞ্জে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে '৩৪ সালে মুঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন 'বনশালা সামরিক স্কুল। '৩৪ সালেই মুঞ্জে কেন্দ্রীয় হিন্দু সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার লক্ষে জোরদার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট আদলে পরিকল্পিত এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল ; হিন্দুদের সামরিক নবজাগরণ! আর তার সাথে সঙ্গে তরুণ, যুবক হিন্দুদের নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে উপযুক্ত করে তোলা। তাদের 'সনাতন ধর্ম'-এ দীক্ষিত করবার পরিকল্পনাও ছিল। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মুঞ্জে লিখেছিলেন ঃ আমার লক্ষ্য হল আমাদের ছেলেদের গণহত্যার খেলার জন্যে তৈরি করে দেয়া। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ যখন হবে তখন বিপক্ষের লোক যত বেশি নিহত হয় ততই মঙ্গল। এইসব জঘন্য পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছিল হিন্দু সমাজকে। 'শত্রু'কে এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব মুঞ্জে না দিলেও 'শত্রু' যে ব্রিটিশরা নয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। মুঞ্জের শত্রুরা হলেন, মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষ। মুসোলিনী, হিটলারের জাতিবিদ্বেষের সঙ্গে মুঞ্জের জাতিবিদ্বেষী চিন্তাভাবনার কোনো ফারাক নেই। মুঞ্জে তার সামরিক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন এই জাতিবিদ্বেষী ধ্যান-ধারণাকে। 'ডকট্রিন অফ ফ্যাসিজিম'

www.pathagar.com

থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মুঞ্জে বলেন ঃ চিরস্থায়ী শান্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। এ তথাকথিত চিরস্থায়ী শান্তি হলো মানুষের মৌলিক গুণগুলির ভীষণ রকম পরিপন্থী। সংঘাতের মধ্য দিয়েই সম্ভব মানুষের গুণের বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধই পারে মানুষের যাবতীয় শক্তি, সামর্থকে একটা চরম স্তরে উপনীত করতে। ফ্যাসিবাদে তথাকথিত শান্তিবাদের কোনো জায়গা নেই। 'শান্তির' অর্থ হল গৃহযুদ্ধের আবাহন—এটা ছিল মুঞ্জের অভিমত এবং সামরিক শিক্ষার এই ধারা বজায় রাখবারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে গৃহযুদ্ধকেই কাম্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। মুঞ্জে লিখেছেন ঃ তাকে ইতালির রাজা (মুসোলিনী) বলেছেন, শান্তির সব থেকে মাধ্যম হল সেনাবাহিনীর সহযোগ। এই সক্ষমতা আবার ক্যাডার, অস্ত্রাদি এবং সেনাপতিদের একতার উপর একান্ত নির্ভরশীল। মুঞ্জে ব্রুনসহিবক কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইওয়ার্ল্ড বানসে (Ewarld Banse)-এর 'সামরিক বিজ্ঞান' পুস্তক থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সামরিক প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার পক্ষে সাওয়াল করেন। ইতালির অভিজ্ঞতার নিরিখে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্যে মুঞ্জে 'She world's children, Baltila Avanguardistry' গঠনের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেন। এই সংগঠনে ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেদের আধাসামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এভাবেই তারা ফ্যাসিস্ট হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে। এই পদ্ধতিতেই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত বলে মনে করতেন মুঞ্জে। আরএসএস-এরও অভিমত। বিজেপি জোট সরকারও তাদের গোপন কর্মসূচিতে এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারেই স্থান দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রকে গৈরীকিকরণের সাথে সাথে সামরিকীকরণও তাদের লক্ষ্য। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ ইতিমধ্যে-ই এ ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। মুঞ্জের যে লেখাগুলোর উল্লেখ করা হলো সেগুলি জাতীয় আন্দোলন চালাকালীনই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল।[৩৫] এখনও সংঘ পরিবার এগুলির ব্যাপক প্রচার করে থাকে।

বিজেপি-জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রকে একই সঙ্গে গৈরীকিকরণ এবং সামরিকীকরণ করার পরিকল্পনা নিয়ে নানা প্রকারের মানবতা-বিরোধী আগ্রাসন চালাচ্ছে। বিজেপি জোট সরকার প্রথম দফায় ক্ষমতা দখল করে '৯৮ সালের ২২-২৩ অক্টোবর বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডাকেন। সেখানে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের ১৪ পাতার একটি প্রতিবেদন সহ মোট ২০ পাতার এক ভয়ঙ্কর প্রস্তাব পেশ করেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মুরলী মনোহর যোশী। ওই প্রস্তাবে বলা হয় ;

www.pathagar.com

ক. শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থাকে অনেক বেশি পরিমাণ ভারতীয়করণ করা হবে। এ যাবৎ যে শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে তাতে আদৌ ভারতীয়করণের উপর জোর দেওয়া হয়নি। দেশের শিক্ষাক্রমে আধ্যাত্মিকতার কোনো জায়গা নেই। এর ফলে-ই দেশের নাগরিকদের নৈতিক মান আজ এতো নিম্নমুখী। নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষাক্রমে আধ্যাত্মিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাতে ভারতীয় তথা হিন্দু দর্শনের কোনো জায়গা রাখা হয়নি। নতুন শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমূলক ধারাতে ১০% থেকে ১৫% ভারতীয় দর্শন তথা হিন্দু দর্শন পড়ানো হবে না। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের (১৯৪৮) প্রতিবেদনে ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী ধারা সম্পর্কে ছাত্র সমাজের মধ্যে ধারণা গড়ে তোলবার প্রয়াসের কথা বলা হলে-ও বর্তমান সময়ের উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে হিন্দু দর্শন পড়ানো হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনে (১৯৬৪) স্পষ্ট কিছু বক্তব্য ছিল। এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের ওই বক্তব্যগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারছে না।

খ. তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতকে আবশ্যিক করা হবে। ভারতবর্ষের চারটি প্রান্তে চারটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

গ. ভারতীয় সংগঠনের ৩০ নম্বর ধারার (মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত) অবলুপ্তি ঘটানো হবে।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যেসব স্কুল পরিচালনা করে, তারা যদি একটানা ১০ বছর ওই ধরনের স্কুল পরিচালনা করে তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো সরকারী অনুমোদন পাবে। [এটির অর্থ হলো আরএসএস যেসব স্কুলগুলো বিদ্যাভারতীর ব্যানারে পরিচালনা করে সেইসব স্কুলগুলোর সরকারী অনুমোদন জোগাড় করা।]

ঙ. শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব সমাজের, শিক্ষার কোনো দায়িত্ব সরকারের নয়।

চ. প্রাথমিক স্তরে সিলেবাস ছাত্র ও ছাত্রীর পাঠ্য পদ্ধতিতে কোনো প্রভেদ না থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ের সিলেবাস ছাত্রীদের জন্যে শিশু প্রতিপালন বিষয়ক শিক্ষা আবশ্যিক হবে।

বিজেপি-জোট সরকার যে ফ্যাসিবাদী মডেলে মেয়েদের গৃহকোণে আবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর তা তাদের এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে পরিষ্কার। বিজেপি জোট সরকার যে শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত রকমের দায়িত্বকেই অস্বীকার করতে চায়—এই প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে তাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এ উদ্ভট, চরম প্রতিক্রিয়াশীল, শিক্ষা বিজ্ঞান-বিরোধী প্রস্তাবগুলো তৈরি করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষা বিষয়ক শাখা সংগঠন

www.pathagar.com

বিদ্যাভারতীর দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। '৯৮ সালের আগস্ট মাসে বিদ্যাভারতীর শিক্ষা বিষয়ক একটি সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আরএসএস নেতা দীননাথ বাটরার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটিকে। ওই বছরের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে ওই কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় ড. মুরলী মনোহর যোশীকে। এই প্রতিবেদনকেই শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন বলে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে পেশ করে বর্বর বিজেপি জোট সরকার। এই প্রস্তাব পেশ করাকে কেন্দ্র করে বিজেপি জোট সরকারের বর্বরতা নগ্নভাবে প্রকাশ্যে এসে পড়ে। এই সম্মেলনে বিজেপি জোট সরকার সরস্বতী বন্দনা দিয়ে শুরু করার পরিকল্পনা করেছিল। স্বাধীনতার পর থেকে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সম্মেলনের সূচনায় বাজানো হয়ে থাকে দেশের জাতীয় সঙ্গীত। মূলত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের বিরোধিতাতেই কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় তাদের ওই পাগলামো সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে। এ সম্মেলনের উদ্বোধন করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বৃহত্তম প্লাইউড প্রস্তুতকারক সংস্থা 'সারদা প্লাইউডের' মালিক কলকাতা নিবাসী পুরুষোত্তর দাস চিৎলাঙ্গিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রমোদ মহাজন, যশোবন্ত সিনহা, তৎকালীন মন্ত্রী মদনলাল খুরানার সঙ্গে এই ব্যক্তিটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের সূত্রেই চিৎলাঙ্গিয়াকে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বর্বর বিজেপি জোট সরকার। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে ১১টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সম্মিলিত বাধায় অবশ্য বর্বর বিজেপি-র আশা অপূর্ণই থেকে গেছে।

ফ্যাসিবাদী মডেলে শিক্ষাক্রমে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জাতি বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি বিজেপি জোট সরকারের মাধ্যমে আরএসএস কীভাবে সংক্রামিত করেছে তার কয়েকটি নগ্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হলো ;

এই মুহূর্তে আরএসএস-এর শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যাভারতী সারা দেশে প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি শাখা স্থাপন করেছে। সংস্কৃত জ্ঞানের বেশ কিছু বই বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলিতে পড়ানো হয়। এই ধরনের বই দেশের সমস্ত স্কুলগুলিতে অবশ্য পাঠ করার দাবি আরএসএস কেন্দ্রীয় সরকারকে দীর্ঘদিন ধরে জানিয়েছে। এই বইগুলিতে সুকুমার মতি ছাত্রদের শেখানো হয় ঃ

১. রামের জন্মস্থান হলো রামজন্ম ভূমি।

২. ভারতীয়রা অর্থাৎ আর্যরাই প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল ইরানে।

৩. বাল্মিকীর রামায়ণকে নকল করেই হোমার রচনা করেছিলেন 'ইলিয়াড'।

www.pathagar.com

৪. খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শ হিন্দুধর্ম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যীশু খ্রিস্ট হিমালয় পরিভ্রমণকালে হিন্দু আদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়ে খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. গরু আমাদের সকলেরই পরম পূজনীয় জননী। এই জননীর দেহেই ঈশ্বরের বাস।

৬. অ্যারিস্টোফেলিস, হেরোদোদাস প্রমুখ দার্শনিকরা মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন বেদের দ্বারা।

৭. আমেরিকার অধিবাসীদের ভাষার উৎপত্তি ভারতীয় তথা হিন্দু ভাষা থেকে।

৮. পিথাগোরাস, প্লেটো প্রমুখের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হলো ভারতীয় ঐতিহ্য।

৯. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের জন্ম এই ভারত থেকেই।

১০. মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, তিব্বত নিয়েই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ।

বিজেপি জোট সরকারের শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য ছাত্রদের মধ্যে তথাকথিত 'হিন্দু' সচেতনতা তৈরি করা এবং তাদের 'হিন্দু' হিসেবে গর্বিত করে তোলা। সারা দেশে আরএসএস প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি বিদ্যাভারতীর শাখা স্থাপন করে (বিজেপি যে যে রাজ্য ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে এই বিদ্যাভারতীর শাখা খোলার প্রবণতা সব থেকে বেশি) ভারতীয় সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতির সম্মিলিত চরিত্রকে বর্বর সংখ্যাগুরু মৌলবাদীরা চিরদিনই অস্বীকার করে। এই ধারা তারা তাদের শিক্ষাক্রমে নগ্নভাবে বজায় রেখেছে। ভারতীয়ত্ব পরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণে আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত মানুষদের অবদানকে বিজেপি-জোট সরকারের শিক্ষানীতিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের এ মানবতা-বিরোধী শিক্ষাক্রমে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছুকেই দেখানো হয় 'হিন্দু' উৎসমুখ থেকে উৎসাহিত হিসেবে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের একদা রাষ্ট্রমন্ত্রী উমাভারতী সদম্ভ উক্তি করেছিলেন যে, মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে-ই নিহিত রয়েছে কাশ্মীর সমস্যার মূল। মাদ্রাসাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী তথা আরএসএস-এর নিয়ন্ত্রণে আনবার দাবি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেই উমাভারতী রেখেছিলেন।

যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে ইতিহাসের নাম করে কী ধরনের বিকৃত তথ্য ছাত্রদের শেখানো হচ্ছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি।

www.pathagar.com

১. রামচন্দ্রের এবং কৃষ্ণের জন্মের উদ্দেশ্য হলো দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। ন্যায়, ধর্ম আর সরস্বতীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য-ই নাকি তারা জন্মেছিল। 'ভগবান' এ দেশের মানুষকে নিষ্পাপ করতে বহুবারই জন্ম নিয়েছেন। 'সোনে কি চিড়িয়া' বলে 'গৌরব গাথা' নামক আরএসএস লিখিত স্কুল পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যাভারতীর সরস্বতী শিশু মন্দিরের চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য হল এই পুস্তক।

২. লোভী, লুঠেরা, হানাদার, বর্বর, অত্যাচারী শাসকদের চিরদিন-ই লক্ষ্য আমাদের দেশ। প্রথম মানব আমাদের দেশেই জন্ম নেয়।

৩. আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এইসব হানাদারদের নরকের কীটের মত ধ্বংস করেছিলেন।

৪. প্রথম আমাদের দেশে হানা দিয়েছিল বাক্কাস এবং ডায়ানোসিস (গ্রীক পুরাতত্ত্বে একে গ্রীকের যুদ্ধের দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এদের এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যা এরা গ্রীক দেশে ফিরে গিয়েও ভুলতে পারেননি। ইংরেজ কোনোদিন আমাদের দেশের দিকে নজর দিতে পারেনি তার কারণ হলো দারাউসকে প্রায় মৃত্যুর মুখে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ঠেলে দিয়েছিলেন।

৫. ২২০০ বছর আগে আমাদের দেশের বাণিজ্য বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশের সমস্ত বাজার ভরা থাকতো আমাদেরই দেশের দ্রব্যাদি দিয়ে। মহাপদ্মনন্দের এতো ধন-সম্পত্তি ছিল যে, তা যদি প্রজাদের মধ্যে তিনি ভাগ করে দিতেন তাহলে প্রত্যেকে ৫০ লক্ষ করে টাকা পেতেন।

৬. পুরুর কাছেই আলেকজান্ডারকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল এবং আলেকজান্ডারকেই ক্ষমা চাইতে হয়েছিল পুরুর কাছে (!)

৭. ক্ষত্রিয়রা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। বৌদ্ধ হওয়ার জন্যই মগধের শাসক এগিয়ে যাননি। দেশ তখন স্বাধীন ছিল। আমাদের শত্রুরা কোনো অবস্থাতেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি থেকে জিতে ফিরে যেতে পারেনি।

৮. গ্রীকদের ধ্বংস করেছিলেন পুষ্যমিত্র। তারপর থেকে গ্রীকেরা আর আমাদের দিকে নজর দেয়নি। আমরা আজ সম্রাট পুষ্যমিত্রের জন্যে গর্ববোধ করি।

৯. অশোকই হলেন অহিংসা নীতির স্থপতি।

উত্তর প্রদেশের নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে কল্যাণ সিং-এর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিহাসে সিলেবাসের ব্যাপক

www.pathagar.com

পরিবর্তন তথা সাম্প্রদায়িকরণ করে একথা লেখে—বৈদিক সভ্যতা আর হরপ্পা সভ্যতা এক এবং অভিন্ন।

এছাড়াও নানা আজব তথ্য এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আর্যদের আদি বাসস্থান এই ভারতবর্ষ-ই তারা বাইরের থেকে আমাদের দেশে নিয়ে আসেনি —আরএসএস-এর এ মূর্খামিকে ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত করছে বর্বর বিজেপি জোট সরকার। সেখানে বলা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র সংগঠন হলো আর্যরা। বিজেপি-র মতে, চাণক্য নাকি সমগ্র ভারতকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন (!) সংঘ পরিবার কর্তৃক লিখিত স্কুল পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকে লেখা হচ্ছে (এগুলি বিজেপি শাসিত বহু রাজ্যের সাধারণ স্কুলগুলি অর্থাৎ বিদ্যাভারতীর নিজস্ব শাখা ব্যতীত অন্যান্য স্কুল) তে পড়ানো হয় ; 'রাজ্যটি অতো বড় হওয়া সত্ত্বেও অশোক তাঁর অনুশাসনগুলি একটি মাত্র লিপিতে (ব্রাহ্মী) এবং একটি মাত্র ভাষায় (সংস্কৃত) খোদাই করা হয়েছিল। মজার কথা হল সংস্কৃতে লেখা সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অশোকের শিলালিপিগুলি ছিল প্রাকৃত ভাষায়। গ্রীক, খোটানীজ, আরামর্যকে ভাষাতেও অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। মূলত তাঁর শিলালিপিগুলি ব্রাহ্মী, খবোষ্ঠী, আরামিক আর গ্রীক—এই চারটি লিপিতে লিখিত।

বিজেপি স্কুল পড়ায়ুদের শেখাচ্ছে রাজপুতেরা হল প্রাচীন ক্ষত্রিয় পরিবারেরই বংশধর। উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী '৯৮ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে এক শিক্ষক সম্মেলনে বলেন ঃ 'সিন্ধু সভ্যতা ভারতবর্ষে কোনো প্রাগার্য সভ্যতা নয়, আর্য এবং বৈদিক সভ্যতাই হল বিশ্বের সব থেকে প্রাচীনতম সভ্যতা। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা রয়েছে তাঁরাই জানেন হিন্দু সভ্যতার উৎকর্ষতাকে', বিজেপি পড়ুয়াদের শেখাচ্ছে, কুতুবমিনার নির্মাণ করেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত, বাবরি মসজিদ হলো রামের জন্মভূমি, মসজিদ ভেঙে সেখানে মন্দির নির্মাণ করতেই হবে—এইসব সাম্প্রদায়িক বিষয়। ছাত্রদের শেখানো হচ্ছে; অযোধ্যায় রামের জন্মভূমি নাকি মুসলমানেরা ৭৭ বার আক্রমণ করেছিল। নবচেতনার উন্মেষের যুগের ইতিহাসে ('মধ্যযুগ' এই শব্দটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। ইসলামের প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার একটা নব পর্যায়ের বিবর্তনের যুগকে কোনো অবস্থাতেই মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করে তার ভূমিকাকে খাটো করা যায় না যে বর্বর সঙঘ পরিবার কীভাবে বিকৃত করেছে এবং সেই বিকৃত ইতিহাস ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে বর্বর বিজেপি জোট সরকার। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি ;

www.pathagar.com

১. এই পর্যায়ের ইতিহাস গ্রন্থের নাম সঙ্ঘ পরিবার দিয়েছে ; 'কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ্ দি মুঘল পিরিয়ড' (Culture and Civilization of the Mughal Period) পুস্তকে। এখানে সম্রাট বাবরের উদার নীতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে বর্বর বিজেপি জোট সরকার।

২. আমাদের দেশের মুসলমান শাসনকাল হলো সম্পূর্ণরূপে বিদেশি শাসন।

৩. লক্ষ লক্ষ বিদেশিরা এই হাজার বছরের ভিতরে এসেছে আমাদের দেশে। এই বহিরাগতরা চিরকালই ভোগ করে এসেছে অপমানজনক পরাজয়। আবার এদের অনেককেই আমরা খেয়ে ফেলেছি। এ সময়ে আমরা অনেকাংশে ঐক্যবোধের দ্বারা তাড়িত ছিলাম না। আমরা বুঝতাম না যে, কে আমাদের দেশের আর কে-ই বা বাইরের। যারা বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাদের কিন্তু আমরা খেয়ে ফেলতে পারিনি। এরাই হলো আজকের মুঘল, পাঠান, খ্রিস্টান ইত্যাদিরা।

৪. ইসলাম এদেশে এসেছে কুরআন আর কৃপাণ হাতে। তার জোরেই তারা ধর্মের নামে মানুষ খুন করে গেছে।

৫. রামমন্দিরকে ধ্বংস করে বাবর বাবরি মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

আরএসএস-এর শাখা সংগঠন 'বিদ্যাভারতী'রই ১৪ হাজার স্কুলে শুধুমাত্র এই বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হয় না, যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেইসব রাজ্যেও এই বিকৃত ইতিহাস সরলমতি শিশু, কিশোরদের শেখানো হচ্ছে। বিজেপি জোট সরকার নানা পর্যায়ে বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকবার সুবাদে বিদ্যাভারতীর ৫ হাজারের বেশি ইস্কুলে সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। প্রায় ১৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাভারতীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই রয়েছে। মিজোরামকে বাদ দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলিতে ৮০ হাজরেরও বেশি মাস্টারমশাই রয়েছেন। এই বিদ্যাভারতী তখন সারা দেশে ৬০টিরও বেশি মহাবিদালয় স্থাপন করেছে। এইসব মহাবিদ্যালয়গুলি স্নাতক এবং স্নাকোত্তর স্তরের। এছাড়াও প্রায় ২৫টি অন্য প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তারা পরিচালনা করে। জয়পুর এবং আহমেদনগরে এরা দুটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে। 'গীতা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল' গোয়ালকর স্থাপন করেছিলেন '৪৬ সালে কুরুক্ষেত্র। এই ধরনের স্কুল তখন সারা দেশে ছেয়ে গেছে। গান্ধীজী আরএসএস কর্তৃক নিহত

www.pathagar.com

হওয়ার পর সাময়িকভাবে এই গীতা স্কুলের কাজ ব্যাহত হলেও এখন সারা দেশে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকাতেও এর শাখা রয়েছে। আজ যে খৃস্টান সম্প্রদায়জাত মানুষ সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বর্বর সঙঘ পরিবারের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন তার পিছনে সঙঘ পরিবারের পাঠ্য বই 'ভিশন অফ্ অ্যাকশন' (Vision of Action)-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই বইতে খোলাখুলিভাবে বলা হচ্ছে খ্রিস্টানদের প্রতিহত করা অবশ্য কর্তব্য।

আধুনিক ভারতের ইতিহাস হিসেবে সঙঘ পরিবার শেখাচ্ছে ;

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে আরএসএস-এর অবস্থান। জাতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা হলেন হেডগেওয়ার! তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরাট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আরএসএস লিখিত ইতিহাসে আইন অমান্য আন্দোলন, পূর্ণ স্বরাজের প্রভাব (লাহোর কংগ্রেস) ইত্যাদির আদৌ কোনো উল্লেখ-ই নেই। নবম শ্রেণীর হিন্দি পাঠ্য বইতে স্থান পেয়েছে আরএসএস-এর প্রাক্তন প্রধান রজ্জু ভাইয়া, বর্তমান প্রধান কে. এস সুদর্শন, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের আলম সিং, তরুণ বিজয়ের লেখা।

## -ঃ সূত্র ঃ-

১. 'কেশরী' পত্রিকার ১৩ মে, ১৯২৪, ২৪শে জুন, ১০ই নভেম্বর ১৯২৫ ইত্যাদি আরও বহু সংখ্যায় খোলাখুলিভাবে স্বৈরতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নাকি নৈরাজ্য থেকে আমাদের মুক্তি দেবে—এটাই ছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অভিব্যক্তি। স্বৈরতন্ত্রের তথাকথিত শৃঙ্খলার প্রতি 'কেশরী' গোষ্ঠীর প্রবল আকর্ষণের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এই পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার দ্যোতনা দেশের অজ্ঞতা, অন্ধত্ব দূর করবার সহায়ক হবে বলে এঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার উপর স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া বিশৃঙ্খলতা দূর করে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সাথে দেশের সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের সূচক হবে বলে এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত পর্যন্ত করা হয়েছিল।

২. নির্বাচিত সংসদদের পরিবর্তে মনোনীত সাংসদদের যে ব্যবস্থা মুসোলিনী করেছিলেন 'কেশরী' পত্রিকার ১৭ জানুয়ারী, ১৯২৮, সংখ্যায় তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার এর তিন বছর আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম হয়ে গেছে।

৩. সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ১৭ জুলাই ১৯২৮। এই ধরনের স্বীকারোক্তি থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বর্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যাবতীয়

www.pathagar.com

চিন্তাচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ফ্যাসিবাদের একনায়কতন্ত্র একটা বড় স্থান জুড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার উন্মেষে এ একনায়কতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা গোপন থাকেনি। বিজেপি-জোট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষা ক্ষেত্রের গৈরীকিকরণের যে নোংরা খেলা শুরু করেছেন তার পিছনেও এই একনায়কতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে।

৪. এই প্রবন্ধটি 'কেশরী' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৯ সালের ১৩ আগস্ট। যে সময় এই প্রবন্ধটি ছাপা হয় সেই সময়ে ইতালি সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্র বাস্তববোধ লেখকের থাকতো তাহলে এই ধরনের লেখা সম্ভব হতো না। '২৮ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত নতুন আইন করে সেখানে ফ্যাসিস্ট শক্তির একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়েছিল।

## গুজরাট-এই বর্বরতার অবসান চাই

মোদি যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন, সেই পরিবেশই গোধরা কাণ্ডের পরে তথাকথিত ক্ষুব্ধ হিন্দু জনগোষ্ঠীর নামে বর্বর হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে উন্মত্ততার ভূগোলে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে। সব থেকে আশ্চর্যের কথা হলো, মোদি একবারের জন্যও তার করসেবক সত্তাকে অতিক্রম করতে পারেননি। লজ্জার কথা তিনি তার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার প্রতিও বিন্দুমাত্র নজর দেননি। এরপরে আর অবাক হওয়ার ব্যাপার থাকে না যখন আমরা দেখতে পাই যে, মোদী মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং শাসক দলের বিধায়কেরা বর্বর দাঙ্গাবাজদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, সরাসরি নরহত্যার সাথে নিজেকে যুক্ত করে।

গুজরাটের দাঙ্গাটির বীভৎসতা বোধহয় সাম্প্রতিককালের যে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মাত্রাকে অতিক্রম করে গেছে। আগে দেখা যেত মূলত নিম্নবিত্তের মানুষরাই দাঙ্গায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কিন্তু এই দাঙ্গায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষদের উপরে হত্যার, লুটতরাজের তাণ্ডব চলেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর শারীরিক, মানসিক আঘাত হানবার সাথে সাথে তাদের উপর চরম অর্থনৈতিক আঘাত হানার লক্ষ্যে অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক এই কাজ করেছে বর্বর সংখ্যাগুরু মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি। গুজরাটে অপেক্ষাকৃত ধনী বোরো সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপরেই এবার সব থেকে বেশি অত্যাচার চলেছে। অত্যাচারের মাত্রা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বুঝতে পারা যায় গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি মোস্তাক আমেদ দাঙ্গায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে কোনো প্রকারের প্রশাসনিক নিরাপত্তা দিতে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়ে গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক আমেদ সাহেবকে সপরিবারে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শের মধ্যে দিয়ে। কতোখানি বর্বর হলে একটি রাজ্যের সরকারের এ ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। সাংসদদের যে প্রতিনিধি দল দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে সেখানকার দাঙ্গার সব হারানো মানুষরা কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন—আপনারা আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিন, শুধু একটু বাঁচতে দিন। বর্বর কেন্দ্রীয় সরকার, গুজরাট সরকারের কর্ণকুহরে কী এই কাতরতা বিন্দুমাত্র অনুরণন তুলতে পারবে ? গোটা দাঙ্গার সময় গুজরাট রাজ্য প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্ব বিন্দুমাত্র পালন করেনি। সিনিয়র আইএএস আইপিএস অফিসারেরা নিজেদের হাত লাল করেছেন দাঙ্গার আগুনে। গুজরাট রাজ্য পুলিসের ডিজি এবং আমেদাবাদের কমিশনারকে দাঙ্গাবাজদের সাথে একই সঙ্গে অভিযুক্ত করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী মোদীর বহু বেআইনী আদেশ সম্পর্কে সবকিছু জেনে-বুঝেও এই দুজন নীরবতা পালন করেছেন। রাজ্য সরকারের পরিচালনাতেই কার্যত যে দাঙ্গা হয়েছে, তাকে বন্ধ করতে যে রাজ্যের পুলিশ আদৌ কোনো পদক্ষেপ নেবে না এটা তো বুঝতেই পারা যায়।

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে তাদের কোনো রকমই রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেননি। দিল্লীর এই অবিমৃষ্যকারিতা দাঙ্গাবাজদেরই উৎসাহিত করেছে। দাঙ্গা নিয়ে মোদি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়েছেন। মোদি প্রধানমন্ত্রীকে অসত্য তথ্য দিয়েছেন আর প্রধানমন্ত্রী সেগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছেন—ব্যাপারটা বুঝতে কী কোনো অসুবিধা হয় ? গোটা দেশ দাঙ্গার প্রায় ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জানাতে পারলো না যে, কীভাবে প্রধানমন্ত্রী এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথা জানছেন আর তাঁর প্রতিক্রিয়াই বা কী, প্রধানমন্ত্রী কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা জানা তো দূরের কথা। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে গুজরাট সরকার মদত জোগাচ্ছেন আর দেশের প্রধানমন্ত্রী মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন—সত্যিই কী উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।

কেন নীরবতা কেন্দ্রীয় সরকারের ? গুজরাটে বিজেপি সরকার যখন প্রকাশ্যেই দিনের পর দিন বর্বর হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত জুগিয়ে এসেছে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হরেন পাণ্ডা যখন ১৫১ দিন ধরে গোটা রাজ্য জুড়ে গো-রক্ষা প্রকল্পের নাম করে গ্রামে-গ্রামান্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সব জেনে-শুনেও চুপ করে থেকেছে।

www.pathagar.com

লজ্জার কথা হলো হরেন পাণ্ডার বদমাইশির তালে তাল মিলিয়ে গোটা গুজরাট মন্ত্রিসভার ৪০ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন প্রকাশ্যে গো-রক্ষা প্রকল্পের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছেন। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করা ; বর্বর আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আজ গুজরাট জুড়ে যে দাঙ্গা করেছে তার পরিবেশ সরকারী মদতেই সেখানে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ২০০০ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের নোংরামি করেছে বর্বর বিজেপি সঙ্ঘ পরিবার। গোটা গুজরাটে ১৩,১৩৩টি গ্রাম জলের অভাবে ধুঁকছে, প্রায় প্রতিটি জেলায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, কৃষকরা নিজেরাই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় গরু, উটগুলোকে খাবার দিতে না পেরে দড়ি খুলে ছেড়ে দিচ্ছে, একটা রুটির অভাবে নিজের সন্তানের মৃত্যু চোখের সামনে দেখছে আর বর্বর বিজেপি সেখানে এ রক্তের হোলি খেলে যাচ্ছে। রুটি আর জলের অভাবে শিশু মৃত্যু গুজরাটের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ভূমিকম্পের ত্রাণের সময়ে ও আজকের দাঙ্গার মতোই একটা চিত্র গোটা গুজরাট জুড়েই দেখা গেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মুখোশ পরে গোটা ত্রাণ ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে বর্বর আরএসএস, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত মানুষদের এবং দলিত মানুষদের বাড়ির দেওয়ালে চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাদের কোনো রকম ত্রাণ বা উদ্ধার না করা হয়।

গোটা দেশের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে আজ এ জল্লাদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এই বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে শুভবুদ্ধির নৈবেদ্য মানব হৃদয়ে ফোটাতে হবেই, তা না হলে আমরা কেউ-ই বাঁচতে পারবো না।

❐

www.pathagar.com

# 'পজিটিভ সেকুলারিজিম'

–শেখ নাসীর আহমদ
(সম্পাদক ; সাপ্তাহিক মিযান-কলিকাতা)

আর্য ফ্যাসীবাদী সংস্থা আরএসএস-এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট বিজেপি পজিটিভ সেকুলারিজিম বা ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার আওয়াজ তুলেছে। এটা কোন অভিনব বা নতুন আওয়াজ নয়। নাৎসীরাও খৃস্টান মূল্যবোধকে তাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ভেবে এই বাধাকে অপসারিত করার জন্য 'পজিটিভ খ্রীশ্চানিটি'র আওয়াজ তুলেছিল।

'Under the sign of the swastiks' প্রবন্ধে এম, এন, রায় লিখেছেন He rejects traditional christian virtues and opposes them with what he calls 'positive christianity'. This new failh is so very antagonistic to the teachings of christ that it drove the orthodox dignitaries of the Evangelical church to issue a Manifesto protesting against this vulgarisation of christianity. The historical documents concludes :—Even a great cause, if it places itself in opposition to the revealed will of God, must finally bring people to ruin. Hitler is invested with the dignity of the National priest, and even of the mediator between God and the people.

"তিনি ঐতিহ্যবাহী খৃস্টান ধর্মীয় গুণাবলীকে নেতিবাচক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি সে সবের বিরোধিতা করেন "পজিটিভ খৃশ্চানিটি'র দোহাই দিয়ে। এই নবধর্ম খৃষ্টের শিক্ষার এত বিরোধী ছিল এটা ইনভেনজেলিক্যাল খৃষ্টান চার্চের কর্তাব্যক্তিদের খৃস্টান ধর্মের এ বিকৃতির প্রতিবাদ করে ফতোয়া জারী করতে হয়েছিল .....। এ ঐতিহাসিক দলীলের উপসংহারে বলা হয়, 'এমনকি মহান ব্যাপারও যদি ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলেও তা শেষ পর্যন্ত জাতিকে ধ্বংস করবে। হিটলারকে জাতীয় পুরোহিতের মর্যাদা দেওয়া হয়, এমনকি তাকে ঈশ্বর ও জনগণের মধ্যেকার সংযোগকারীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।"

'German christanity-র প্রবক্তা Alfred Roseberg-র The Myth of the Twentith Century.'

www.pathagar.com

ইতিবাচক খ্রীষ্টানধর্ম যেমন প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের মৃত্যু ঘন্টার শামিল ছিল ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতাও তেমনি ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু ঘন্টার শামিল। বিজেপির জনক জনসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি বলরাজ মাধোক Indianisation-এর কথা বলেছিলেন। এর অর্থ ছিল ভারতে থাকতে হলে মুসলমানদের ভারতীয় সংস্কৃতির নামে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। এই ভারতীয়করণ বা আর্যকরণতত্ত্বকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে "ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার" নামে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান স্পষ্টতই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হিন্দু ফ্যাসীবাদীদের ক্ষমতালাভের আন্দোলন ছিল, সকল ভারতবাসীর সমসুযোগ ও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল না। এরা ক্ষমতা পেলে কি হবে তাও মিঃ রায় বলে গেছেন ঃ

"But since western spiritualism is no different from the Indian brand, this also would show equally ugly teeth, if its protagonists ever come to power."

অর্থাৎ "যেহেতু পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতাবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ একই চিজ তাই এটাও সমানভাবে দন্ত ব্যাদন করবে যদি এর প্রবক্তারা কখনও ক্ষমতায় আসে" রায়ের এই ভবিষ্যৎ বাণীও ফলে গেছে। হিন্দু রাষ্ট্রের নামে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের ধ্বজাধারীরা এসেই গেছে। তারা এক কঠিন জিঘাংসা নিয়ে সকলকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সেবাদাস বানাবার জন্য পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি স্বামী চিন্ময়ান্দ গীতার উক্তি উদ্ধৃতি করে ভাগলপুরে মুসলিম নিধন যজ্ঞকে সমর্থন করে মিঃ রায়ের ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রমাণিত করেছেন।-(দ্রষ্টব্য ১৪-১১-৮৯ টেলিগ্রাফ)

বেদান্ত দর্শন ও তার প্রচারক বিবেকানন্দকেও তিনি উনমার্গ গামী নীৎসের শিষ্য মনে করতেন ;

"The spiritual guide of the modern Indian intellectual, Vivekananda echoed Nietzschle when he vaingloriously declared, if I drink wine, I do not let the wine drink me. He may not have learned from cynical philosopher of European reaction."

অর্থাৎ "আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক গুরু বিবেকানন্দ নীৎসেরই প্রতিধ্বনি করেন যখন তিনি বৃথা গর্ব সহকারে ঘোষণা করেন ঃ যদি আমি মদ পানও করি তাহলেও মদকে আমি আমাকে

www.pathagar.com

গ্রাস করতে দেব না ইউরোপীয় প্রতিক্রয়াজাত নিন্দুক দার্শনিকদের থেকে তিনি হয়তো কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেননি।"

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এঁদের সর্বগ্রাসী ফ্যাসীবাদী চিন্তার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। নেহেরু-প্যাটেলের সময় যা তরল ছিল এখন আরএসএস ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে তা সাইক্লোনের ঘনীভূত রূপ ধারণ করেছে।

বৈশিষ্ট্য হলো ভারতের সকল বৈচিত্র খতম করে কেবলমাত্র ফ্যাসীবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তাহারে বহু ধর্মের দেশ ভারতে একই সিভিল কোর্ডের কথা বলা হয়েছে। কাশ্মীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হরণ করার জন্য সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করতে চাওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে সারা ভারতে গো-হত্যা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হরণ করার পর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলাটাই এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতবাসীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বানানো হয়েছিল (যদিও কার্যত তা দেওয়া হয়নি) শাসকগোষ্ঠীর রদ-বদলের ফলে যাতে আর্যপুত্রদের কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন না হয়ে পড়ে সে জন্যই এই ফ্যাসীবাদী প্রয়াস।

ইনভেনজেলিক্যালচার্চ ইতিবাচক খ্রীষ্টান ধর্মের নামে খ্রীষ্টান ধর্মের বারোটা বাজানোর এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তখন যখন ফ্যাসীবাদী হিটলার ক্ষমতাসীন কিন্তু ভারতীয় হিটলার এখনও ক্ষমতাসীন হয়নি, ক্ষমতাসীন হতে চলেছে মাত্র কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর সরলকণ্ঠ প্রতিবাদ কোথাও ধ্বনিত হচ্ছে না বরং একে বাধা দেবার নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যাদের সবচেয়ে বেশী ছিল তারাই এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

রোসেনবার্গ মনে করতেন যে, ইউরোপীয় নবজাগরণ ইউরোপের অধোগতির কারণ। এই নবজাগরণের ফলে ইউরোপে উদার নৈতিক মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকবাদ প্রভৃতির জন্ম হয়েছে। তার মতে এটা ইউরোপের অধোগতি। ভারতীয় নাৎসীরা মনে করে ভারতীয় সংবিধানের উদার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থান, সহনশীলতার আদর্শ তার অধঃপতনের কারণ। এটাকে তারা মুসলিম-তোষণ, সংখ্যা, তোষণ আখ্যা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের ন্যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভারতীয়, জাতীয়তাবাদের সমার্থক বলে মনে করে। তারা খোদাকে, খোদায়ী বিধি-বিধান, ন্যায়, সত্য, মানবতা সবকিছুকে জলাঞ্জলী দিয়ে হিন্দু স্বার্থকেই একমাত্র দেবতা বানিয়েছে।

www.pathagar.com

নাৎসী জার্মানরা এমনটাই করেছিল। মিঃ রায় নাৎসী পুরোহিতদের বাণী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'Every living religion must be inspired by the national spirit, nations are the thoughts of God.

অর্থাৎ "প্রত্যেক চলমান ধর্মকে অবশ্যই জাতীয় জোশে অনুপ্রাণিত হতে হবে, জাতি তো খোদার ইচ্ছার প্রকাশ।"

জার্মানরা নিজেদের ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি বলে মনে করতো, এদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও নিজেদের তাই মনে করে। নাৎসী জার্মানদের ন্যায় তারাও কোনো ন্যায় সত্য মানতে রাজী নয় কিন্তু পৌরাণিক কল্পকাহিনী ও দেবদেবীর তারা একনিষ্ঠ সেবক। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হচ্ছে তা সকলেরই জানা। টিভিতে রামায়ন, রামমন্দির নির্মাণ এর কোনোটারই পিছনে ন্যায়, সত্য অথবা যুক্তি নেই, আছে কুসংস্কার পাশবিক শক্তির আস্ফালন। একদিকে এ মাইথোলজী বা মিথ্যাতত্বের কাল্পনিক নায়ক আর অন্যদিকে নাথুরাম গডসের ন্যায় দুষ্ট প্রতিভারা তাদের আদর্শ। নাৎসী জার্মানদের অনুরূপ চিন্তাই ছিল। মিঃ রায় লিখেছেন ঃ

"The resurrected should worship mythological heroes like Odin and Siegfied, barbarian congress like Attila and Theodoric, fewdal monarchs like Frederic the great, Russian militarist like Bismark, the new Avatar Hitler being the Zeus of this picturesque pantheon."

একবারে জার্মান নাৎসীদের কার্বন কপিরূপে হিন্দু নাৎসীরা আত্মপ্রকাশ করছে। উভয়ের প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে স্বস্তিকা। এটা সূর্য দেবতার প্রতীক। বুঝতে অসুবিধা নেই শের্কই হচ্ছে উভয় নাৎসীবাদের মূল। অহীর পরিবর্তে পৌরাণিক গল্প, নবীর পরিবর্তে কাল্পনিক পৌরাণিক চরিত্র, ন্যায়ের পরিবর্তে জেদ, যুক্তির পরিবর্তে সেন্টিমেন্ট, সত্যের পরিবর্তে পাশবিক শক্তি তাদের মূলধন। নাৎসী জার্মানীদের মতই রয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা। তারা মেকং থেকে মিশর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ দখল করতে চায়।

এই জঙ্গী হিন্দুত্বের উৎস রয়েছে ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। মিঃ রায় লিখেছেন ঃ 'Just so was the spiritualism of Indian culture the product of unsurmownted social crises in the past. It is a chronic disease which for ages has eaten into the vitals of India's social organism having been cause of the prolonged slavery of our people. Fascism is the monstrous manifestation

www.pathagar.com

of a philoosophy which is cherished by the Indian intellectuals even today ... It is utterly antagonistic to the forces of progress.'

অর্থাৎ "ভারতের সংস্কৃতি ও তা থেকে জাত আধ্যাত্মিকতাও ছিল ঐ একই রকমের। অতীতের জমে থাকা নানান সামাজিক সমস্যা থেকে এর জন্ম। এটা ছিল পুরানো জটিল রোগ যা ভারতীয় সমাজ-সত্তার প্রাণসত্তাকে যুগ যুগ ধরে কুরে কুরে খেয়েছে। পরিণতিতে তা আমাদের জাতির দীর্ঘ গোলামীর কারণ হয়েছে। ..... ফ্যাসীবাদ হচ্ছে এক প্রকার জীবন দর্শনের দানবীয় প্রকাশ যা আজও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা লালন করে চলেছেন। ... এটা সম্পূর্ণরূপে প্রগতিমূলক শক্তির বিরোধী।"

ভারতের অতীত ইতিহাসের অনতিক্রমনীয় এই সামাজিক যন্ত্রণাটা তাহলে কি ? এ পুরানো ও জটিল রোগটাই বা আসলে কি ? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ভারতের আর্যদর্শনের প্রবক্তাদের কাছে কোনো অবিকৃত ঐশীগ্রন্থ কিংবা তার বাস্তবায়নকারী বা ব্যাখ্যাতা কোনো নবী ছিল না বরং তারা দার্শনিকের আন্দাজ-অনুমান কল্পনার সীমিত অস্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মূলত ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরের বাণীর নামে তারা মানুষের সংকীর্ণ বাণীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। না স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিল, না সৃষ্টি সম্পর্কে তারা সঠিক জ্ঞান রাখতেন। ফলে তারা ধোঁয়াটে চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ও এটা করার জন্য তাদের অসাম্যের দর্শন খাড়া করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন জাতিকে শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করেছিল। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। এটা ছিল এক স্থবির সমাজ। এজন্য পরাধীনতা ও গোলামী তার বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বর্ণভেদ, জাতিভেদ ভারতের চিরকালের সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান না করে চিরদিন একে চেপে দিয়ে গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা চলে এসেছে। পুণা চুক্তিতেও এই গোঁজামিল ছিল। দেশ স্বাধীন হলেও এই সমস্যার তাই সমাধান হলো না। যারা জাতিভেদের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসলমান হয়ে গেল তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রোষানলে পড়লো। ইংরেজের ছত্রছায়ায় মুসলমানদের একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিরিশের দশকে তারা যখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা করলো তখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার যথার্থ সমাধান করা হল না। আর্যপুত্রদের একাধিপত্য কায়েম করার জন্য এবং এই সমস্যার সমাধান না করে মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়া হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল

www.pathagar.com

করার জন্য। ফলে ভারত বিভক্ত হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলেও ছত্রভঙ্গ মুসলমান সমাজ স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না। চ্যালেঞ্জ এল অচ্ছুতদের থেকে, ড. আম্বেদকরের কাছ থেকে। তিনি মারা গেলেন কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন মারা গেল না বরং শক্তি সঞ্চয় করলো। ওদিকে শিখেরাও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে নাজেহাল হয়ে তাদের আত্মস্বাতন্ত্রের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলো। এদিকে অচ্ছুতরা মার্কসবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকলো। এসব সমস্যার সমাধান করতে হলে যে উদারতা ও মানবিকতা থাকা দরকার, যে সমতার নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা স্বৈরতন্ত্রী শাসক গোষ্ঠীর জীবনদর্শন ও মন-মেজাজে ছিল না। তারা তাদের কায়েমী স্বার্থ পরিহার করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয় অধিকন্তু স্বাধীনতার যাকিছু সুফল তারা একাই ভোগ করতে চায়, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুযায়ী এটা সবার প্রাপ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন লেখাপড়া শিখছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। ভোটের প্রয়োজনে এইসব গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা রাজনৈতিক দলগুলোকে বলতে হচ্ছে। যদিও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তৃক বর্ণহিন্দুদের হাতেই রয়েছে কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাদের কার্যত না হোক তত্ত্বগতভাবে এদের অধিকার স্বীকার করতে হয় এবং কখনো কখনো ছিটেফোঁটা দিতে হয়। না দিলে এসব বঞ্চিতের দল গণতন্ত্রে নিজস্ব দল গড়ে তুলে আপন পাওনা আদায়ের জন্য দর কষাকষিতে নেমে পড়তে পারে। দীর্ঘকাল কোনো সমাজ ও সম্প্রদায় নাবালক কিংবা পংগু থাকতে পারে না। তাই বাকস্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র রক্ষার স্বাধীনতা থাকলে একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থের বিপদ। তাই সকলের সম অধিকারের দাবী, আর্যদর্শন অনুযায়ী ছোটলোকদের সমান হওয়ার দাবী নস্যাৎ করার জন্যই তথাকথিত ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার ধাপ্পাবাজী খাড়া করা হয়েছে যাতে ভারতের আর্যপুত্ররা ছাড়া সকল গোষ্ঠীর বৈচিত্র, স্বাতন্ত্র স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও বিকাশ রোধ করা যায়, যাতে উন্নয়নের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে অপরাপর ভারতীয় জনতাকে বঞ্চিত করা যায়। এটা করার জন্যই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধীকার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতার আখ্যা দিয়ে চরম দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে ও অন্যের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী ও বিদেশী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং আরো নির্মম জুলুম-অত্যাচার চালাবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে কুক্ষিগত করার জন্য তারা নির্বাচনে নেমেছে। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন-পীড়নের সাহায্যে দমিয়ে দেবার জন্যই হিটলারের

www.pathagar.com

ঝটিকা বাহিনীর ন্যায় বজরঙ্গবলী দল তৈরি করা হয়েছে। এসবই করা হচ্ছে হিন্দুত্বের নামে, দেশপ্রেমের নামে, ধর্মের নামে, জাতির নামে। যারাই এর বিরোধিতা করবে তাদেরই গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ফ্যাসীবাদের স্বভাব প্রকৃতিই এই। কি সুন্দরভাবেই না মি. রায় ফ্যাসীবাদের এই চিত্র তুলে ধরেছেন ঃ

"any dissatisfication with it is irreligious, any desire to change is blasphemous and any attempt to remake it is downright heresay, revolt aginst divine providence—and therefore must be suppressed by all means, in the name of religion and spiritual values, often religious fanatics behave immorally and commit violence in sincere pursuance of their superstious notions and faith. What is the use of having a faith or a philosophy, unless one is preoared to stand by it all cost."

অর্থাৎ এর প্রতি অসন্তোষ ধর্মহীনতা, এর পরিবর্তন আকাংখা নিন্দনীয়, একে নতুন রূপ দেবার প্রচেষ্টা সরাসরি ধর্মদোহিতা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুতরাং যে কোনো উপায়ে এসব দমন করতে হবে—ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের নামে। প্রায়ই ধর্মান্ধরা তাদের কাজ-কারবারে নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না এবং তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বিশ্বাসের আন্তরিক অনুসরণে লিপ্ত হয়। (তাদের মনোভাবটা হল) কোন দর্শন থেকে কি লাভ যদি আমরা যে কোন মূল্যে তার বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত না হই ?

যারা আরএসএস বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি, শিবসেনার বক্তব্যের সাথে পরিচিত তারা উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার না ক'রে পারবে না।

কিন্তু এসব ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলাম ও মুসলমান হলেও এর আসল লক্ষ্য গোটা মানবতা। ঘুঁটে হয়তো পুড়ছে কিন্তু গোবরের হাসার কোন কারণ নেই। এই ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে পারলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০শে নভেম্বরের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে এদিকে ইংগিত করেই নিম্ন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, "ভারতের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আজ যে কথাটি স্পষ্ট করে বুঝিতে হইবে তাহা ইহাই, ভারত হইতে ধর্মনিরপেক্ষতা যেদিন লুপ্ত হইবে সেদিন ভারতে গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটিবে। যেমন প্রতিবেশি পাকিস্তানে ঘটিয়াছে, যেমন বাংলাদেশে ঘটিয়াছে। ধর্মীয় একনায়কত্ব যেমন সংখ্যালঘুদের বিপন্ন করিয়া ফেলে, তেমনই সংখ্যাগুরু

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের লোককেও বিপন্ন করে তোলে। যেমন পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে ধর্মীয় সামরিক একনায়কত্ব চলিয়াছিল তাহাতে সব চাইতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই দেশের মুসলমান সম্প্রদায়। বাংলাদেশে ধর্মীয় সামরিক একনায়কত্ব শুধু সংখ্যালঘুদের অভিশাপের কারণ হইয়াছে তাহা নহে, সেই দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিশাপের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারত নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার নানা ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের সর্ব ধর্মের নাগরিকদের পক্ষে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ। ইহা বিনষ্ট হইলে সংখ্যালঘুরা যেমন বিপন্ন হইবেন, তেমনই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের জীবনেও একনায়কত্বের দমন পীড়নের অভিশাপ নামিয়া আসিবে। কাজেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে টিকাইয়া রাখাই নাগরিক ধর্ম।"

❐

www.pathagar.com

# ভারতের রাজনীতিতে গরু

–শেখ নাসীর আহমদ

বিজেপি-র তথাকথিত ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার তিনটি অঙ্গ। এই তিনটির একটি হচ্ছে সারা দেশে গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা। এ কাজ করার জন্য তারা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে চায়। প্রশ্ন হলো তারা এ কাজ কেন করতে চায় ? এর একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ জাগ্রত করা। ইসলামে গরু কুরবানীর বিধান রয়েছে। মুসলমানরা গরু খায়। ব্রাহ্মণরা গরু খায় না। গরুর পূজা করে। এককালে তারা গরু খেতো কিন্তু অবৈধ স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণে তারা তা খাওয়া পরিহার করে। সমাজ বিজ্ঞানী ডক্টর আম্বেদকর তাদের এই কলাকৌশলের উপর আলোকপাত করছেন এভাবে ঃ

"মনুর কথাই ধরুন। তিনি পর্যন্ত গো-হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। পক্ষান্তরে কিছু কিছু অনুষ্ঠানে তিনি বরং গোমাংস ভক্ষণকে বাধ্যতামূলক করে দেন। তাহলে অব্রাহ্মণরা গোমাংস ভক্ষণ পরিহার করলো কেন ? বাহ্যত এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ আছে। যে কারণটা আমি পেশ করতে চাই তা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের অনুসরণ করার জন্য অব্রাহ্মণদের গো-মাংস পরিহার করার আকাংখা। স্পষ্টত-ই অব্রাহ্মণরা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। গোমাংস ভক্ষক থেকে গোমাংস পরিহারক বনে যাওয়া এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছিল। কিন্তু অব্রাহ্মণরা যদি একটা বিপ্লবী যুগ অতিক্রম করে থাকে তাহলে ব্রাহ্মণরা দুটি বিপ্লবী যুগ অতিক্রম করেছিল। তারা গোমাংস ভক্ষণ পরিহার করেছিল এটা একটা বিপ্লব কিন্তু আমিষ পরিহার করে একদম নিরামিষাশী হয়ে যাওটা ছিল আর এক বিপ্লব।

**যজ্ঞের ছলনা**

ব্রাহ্মণদের জন্য প্রতিদিনই গোমাংস ছিল অপরিহার্য। সুতরাং ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বাধিক গো-খাদক। ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ ধর্মের নামে জাঁকজমক সহকারে নিরীহ পশু বধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গোমাংস ভক্ষণকে এক রহস্যের আবরণে ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এসব করা হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম আম-জনতার মনমানসিকতার উপর এত গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে বৌদ্ধধর্মের মত-পথ, আচার-আচরণকে চরমতম রূপে রপ্ত করা ছাড়া ব্রাহ্মণদের পক্ষে বৌদ্ধধর্মের মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে তাদের পজিশনকে মজবুত করার জন্য উপাসনা আরাধনা হিসাবে যাগযজ্ঞ ও গোবধ পরিহার করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।

ব্রাহ্মণদের গোমাংস পরিহারের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের অর্জিত প্রাধান্য ছিনিয়ে নেয়া। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ব্রাহ্মণদের নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া। কেন ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী বনে গিয়েছিল। এর জবাব হচ্ছে বৌদ্ধ পুনর্জাগরণের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

**রণকৌশল**

এইসবই প্রমাণ করে ব্রাহ্মণরা বংশ পরম্পরায় গো-মাংস ভক্ষণ করে এসেছে। কেন তারা তাহলে গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দিল ? কেনই বা তারা চরমপন্থা অবলম্বন করে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে একাবারে নিরামিষাশী হয়ে গেল ? এটা একই ভাঁজে দুটো বিপ্লব।

আমার মতে গো-মাংস ভক্ষণ পরিহার করে গো-পূজক হয়ে যাওয়াটা ছিল ব্রাহ্মণদের এক রণকৌশল। গো-পূজার সূত্র খুঁজতে হবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত এবং বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গৃহীত পন্থার মধ্যে। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত ভারতীয় ইতিহাসের সংকটময় ঘটনা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্ররা এই সংঘাতের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে।

তারা জানতো ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল। এই সমস্ত ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের ৪০০ বছরের বিস্তৃতি ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির উপর যেসব অনপনেয় প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই মনে হয়।

**আপোষ**

লক্ষ্য অর্জনে ব্রাহ্মণদের বেপরোয়া দুঃসাহসিকের মত রণকৌশল অবলম্বন করিতে হয়েছিল। উগ্রতাকে তারা উগ্রতা দিয়েই বেদখল করতে চেয়েছিল। বামপন্থীদের প্রতিহত করতে সব দক্ষিণপন্থীদেরই এটা রণকৌশল। বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে তাদের আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে নিরামিষাশী হতে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন একজন হিন্দু রাজা কিভাবে মনুর আইনের বিরুদ্ধে গোহত্যা বন্ধের আইন প্রণয়ন করলো ? এই জবাব হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের উপর

www.pathagar.com

নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্মের বিধানকে মুলতবী অথবা রদ করতে হয়েছিল।

যদি এই বিশ্লেষণ সঠিক হয় তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, গোপূজা ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাতের ফল। হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য এটা ছিল ব্রাহ্মণদের অবলম্বিত কলাকৌশল।"

উপরোক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণরা জাতিগত স্বার্থে মনুর বিধানকে উল্টে দিয়েছে। এটা এক বিরাট ডিগবাজী। দেশ স্বাধীন হবার পর তারা হিন্দু কোডবিল পাশ করে মনুর বিধানকে স্ব-স্বার্থে আবার বিকৃত করেছে। এটাকেই কমন সিভিলকোডের নামে মুসলমান তথা সারা দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা খোদার বিধানকেও নস্যাৎ করার তালে আছে। ইসলামী শরীয়তকে টেক্কা দেবার জন্য তারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দিয়েছে, মনুর বিধানে কিছুই দেয়া হয়নি কিন্তু নয়া আইনে হিন্দু নারীকে পুরুষের সমান সম্পত্তি দেয়া হয়েছে। এ একাধারে গোখাদক থেকে গোপূজক নিরামিষাশী হয়ে যাবার ব্যাপার আর কি ! এটা মধ্যম পন্থার বিপরীত চরমপন্থা। এটা ভ্রষ্ট মানসিকতার বৈশিষ্ট্য।

অহিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, অচ্ছুতদের হিন্দুদের মধ্যে ধরে রাখার জন্য মনুর বিধান পাল্টে সামাজিক ব্রাহ্মণ আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের হিন্দু কোড পাশ করতে হয়েছিল। জাগতিক স্বার্থেই এসব করতে হয়েছিল।

ভারতের বনী ইসরাঈল মুসলিম রাজা বাদশারাও এমনতর কাজ করেছিল। মোগলদের পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্যই আকবরকে 'দ্বীন ইলাহীর' গ্যাঁড়াকল তৈরি করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের নিকট মোগল বাদশাহীকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যই গরু কুরবানী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

পাকিস্তানের উপর নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ভারতকে সেকুলার রাষ্ট্র বানানো হয়েছিল। আর একটা কারণ ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে নেহেরু বংশের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তাছাড়া বিরাট অব্রাহ্মণ দলিত, উপজাতিদের কাছেও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান শাসনকে জনপ্রিয় করার প্রয়োজন ছিল। এজন্য ধর্মীয় বিধানকে অগ্রাহ্য করে অচ্ছুতদের সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হয়েছিল। বৈদিক ধর্মের বিধানকে এভাবে মুলতবী অথবা রদ করতে হয়েছিল। এ ছিল দু' হাজার বছর পরে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করার জন্য অবলম্বিত কলাকৌশল।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব কলাকৌশল কোনো কাজে আসেনি। কংগ্রেসী ব্রাহ্মণরা তাদের এই ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। ৭ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রাফে বলা হয়েছে ঃ

The old congress ideology of secularism and socialism has been exhausted, said a senior leader and former cabinet minister.

'কংগ্রেসের পুরোনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে, বলেছেন একজন প্রবীণ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।'

সকল গোষ্ঠীর সমানাধিকার দিয়ে সকলের আশা-আকাংখা পূরণ না করার কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে চামচে সৃষ্টি করে যে শাসন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে জনগণ তাতে আস্থা হারিয়েছে। দেশের নতুন শাসন কাঠামোকে আরও উদার না করে উপায় নেই।

দলিত ভারতের রুদ্র জাগরণে ভীত ব্রাহ্মণ্যবাদ তার নগ্ন রূপে বিজেপি-র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাকে রুখে দেওয়ার জন্য মুসলিম বিদ্বেষকে মূলধন করে বিজেপি রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে চায় কারণ দলিতরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও ঐতিহাসিক কারণে দলিতদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন। বিজেপি জানে মুসলমানদের হজম করা যাবে না তাদের উচ্চতর ইসলামী জীবনবোধ ও ইসলামী শরীয়তের জন্যই। তাই তারা মুসলমানদের ইসলামী জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকেই খতম করতে চায়। মুসলমানদের খতম করতে পারলে দলিতদের দুদিনেই দমন করা যাবে ব'লে তারা মনে করে। এজন্যে তারা নিরামিষাশী থেকে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠেছে। এটা দলিত ব্রাহ্মণ বিরোধের ফল। দলিতদের দলে টানার জন্য দুঃসাহসিক কৌশল। কংগ্রেসী ব্রাহ্মণদের ব্যর্থতার পর আসল ব্রাহ্মণরা, গো-ব্রাহ্মণের পূজকরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। গরুর রাজনীতির আসল রহস্য এখানে। এটাকে তারা তাদের ঐক্যের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করে কারণ এই নেতিবাচক পন্থা ছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্য-সংহতির কোনো ইতিবাচক পন্থা নেই। এখন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আবার তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

এদিকে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোমাংস রপ্তানিকারক দেশ। গোবলয়ে গরু জবাই বন্ধের জন্য দেশের ৫০০০ কোটি টাকা বার্ষিক লোকসান হয় বলে ভারতের বৈজ্ঞানিকরা কয়েক বছর আগে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এটাও বেশ কয়েক বছরের আগের হিসাব। এখন দেখা যাক বিজ্ঞান ও কুসংস্কার, সত্য ও শঠতা কোন্‌টার জয় হয়।

www.pathagar.com

এদিকে ১৯৯২ সালের ৫ই এপ্রিলের Organiser-এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি বিষ্ণুহরি ডালমিয়ার এক বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে। বিবৃতিতে মাওলানা মওদূদীর 'রাসায়েল মাসায়েল' নামক বিশ্ববিখ্যাত বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়েছে। এ পুস্তকের প্রকাশক মারকাজী মাকতাবার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাবলম্বনের দাবীও জানানো হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, এই পুস্তকের কোন একটি খণ্ডে মাওলানা গরু কুরবানীকে সেই সমস্ত দেশে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে সমস্ত দেশে গরুকে খোদা হিসাবে পূজো করা হয়। গোপূজক জাতির লোক মুসলমান হলে সেই নও-মুসলিমের গোমাংসা খাওয়াকেও তিনি অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেছেন এই কারণে যে যেন গরুর দেবতা হওয়ার ভাবধারা তার মধ্যে বর্তমান না থাকে। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর উপর দেবত্ব আরোপ ইসলাম স্বীকার করে না। যে মুসলমান হবে তাকে গরুকে দেবতা ভাবার কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে হবে এটা কুরআনের দাবী। মিশরে সূর্যপূজকদের বা ফেরাউনের আমলে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রপূজকদের গোলামীর ফলে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে গো-পূজার মানসিকতা বিস্তার লাভ করে। ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত হবার পর হযরত মূসার অনুপস্থিতে সামেরী নামক এক মুনাফিকের ফেরেবে বনী ইসরাঈলরা গোপূজা ক'রে বসে। এই মানসিকতা দূর করার জন্য আল্লাহ হযরত মূসা আ.-কে হুকুম দেন তিনি যেন বনী-ইসরাঈলদের গোপূজার পরিবর্তে গরু জবাইয়ের আদেশ দেন। বনী ইসরাঈলরা অনেক টালবাহানা করার পর গরু জবাই করে। হযরত মোহাম্মদ হযরত মূসার এ সুন্নাতকে জীবিত রাখেন। কুরআনে সূরা বাকারা বা গাভী জবাইয়ের সূরা পর্যন্ত বিদ্যমান। মওলানা মওদূদী কুরআন-হাদীসের এই বিধানকে অনুসরণ করেছেন মাত্র এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের এর তাৎপর্য ভারতীয় পরিবেশে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। হিন্দুদের উত্যক্ত করা মওলানা মওদূদীর লক্ষ্য ছিল না অথচ মিঃ ডালমিয়া সেই অভিযোগ এনেছেন। মওলানা মওদূদী তাঁর ধর্মের বিধানকে তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের নিকট স্পষ্ট করেছেন মাত্র। এটা যদি হিন্দুদের উত্যক্ত করা হয় তাহলে শাক্তদের পাঁঠা কাটাও বৈষ্ণবদের উত্যক্ত করার কারণ হবে এবং বৈষ্ণবরাও পাঁঠা কাটা বন্ধের দাবী করতে পারে কিন্তু সেটা কি সংগত হবে ? তাছাড়া মহিষ বলিও যা আজও প্রচলিত তার বিরুদ্ধেও দলিতরা আপত্তি করতে পারে। মহিষবলিকে সংগত আখ্যা দিয়ে যেসব বইপুস্তক লিখিত হয়েছে তাও নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী উঠতে পারে। বৌদ্ধরা দাবী করতে পারে যে, সমস্ত প্রকার পশুবধ বন্ধ করতে হবে কারণ তাদের ধর্মে পশুবধ নিষিদ্ধ। যারা পশুবধ করে বা যে সমস্ত পুস্তকে পশুবধের স্বপক্ষে ওকালতি করা হয়েছে সেগুলি তাদেরকে উত্যক্ত করার জন্য, তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য লিখিত হয়েছে এমন দাবীও তারা করতে

www.pathagar.com

পারে। ফলে মাছ-মাংস ভক্ষণও রহিত করে দিতে হয়। এই ধরনের দাবী তখন সম্ভব হতে পারে যখন দেশ কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীরই দেশ হবে। মুসলমানরা যদি কোন মিশ্র মুসলিম দেশে দাবী করে যে, মূর্তিপূজা, গান-বাজনা কেবল তাদের উত্যক্ত করার জন্যই করা হয়, তাই তা বন্ধ করতে হবে এবং মূর্তিপূজার স্বপক্ষে যে সমস্ত বইপত্র আছে তা বন্ধ করতে হবে তাহলে তা হিটলারের কাজ হবে। মিঃ ডালমিয়া কি তা মেনে নেবেন ? বাস্তবতা ও বুদ্ধিমত্তার দাবী কি এটাই নয় যে, সকলকে সকলের বিশ্বাসানুযায়ী চলতে দিতে হবে। মূর্তিপূজা, গোপূজা, গরু জবাই হতে দিতে হবে। এর নাম ধর্মীয় সহনশীলতা। ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সকল ধর্মের সমানাধিকার মেনে নিয়েছে। এখন এর বিরোধিতা করা, কোনো বিশেষ ধর্মের স্বপক্ষে ও কোনো বিশেষ ধর্মের বিপক্ষে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। আজকের পরিবেশে মিঃ ডালমিয়া বা তার সমতাবলম্বীরা যা করতে পারেন তা শুধু এতটুকু যে গোপূজার স্বপক্ষে প্রচার। গো-পূজার স্বপক্ষে দাওয়াত ও তাবলীগ করা ছাড়া তাদের করার কিছুই নেই। গোখাদকদের সমালোচনাও করা যেতে পারে। গরু খেলে দেবতাদের রোষবহ্নি তাদের গ্রাস করবে একথাও বলা যেতে পারে কিন্তু গো-খাদকের বই নিষিদ্ধ করা যেতে পারে না। ভারত সরকার ব্যাপারটিকে কিভাবে নেয় তা দেখার বিষয়। এ ব্যাপারে জামায়াতের প্রতিক্রিয়া কি তাও আমাদের জানা নেই। তবে মিঃ ডালমিয়ার দাবী যে স্ববিরোধী তাতেও কোন সন্দেহ নেই। মার্চের (১-১৫) 'দলিত ভয়েস' পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'That the Vedic Brahmins have been voracious beef-eaters is an established fact and admitted by Brahmin historions themselves. Today Hindu nazi parties led by Brahmins, however, strangely oppose beef-eating and use violence to stop cew slaughter. They use state force to ban cow-slaughter while at the same time advocating that if India has to pregress, 'We must go back to vedic days.' Going back to vedic days means Brahmins must take to beef-eating. They demand cow-slaughter ban and in the same breath they also advocate 'back to vedas.' (DV Nov. 1. 1989 'when Brahmins were gluttonus Beef-Eaters' Mukundi Lal Pal. 16 to 21 and DV Dec 1. 1989 p. 22 secret of cow worship.)

The Najis do this not because they love the cow which they call their mother. If they are really born to the cow and not their mothers, why they are permitting widespread beef-eating in kerala ? Are not the kerala cows their mother ? In kerala,

www.pathagar.com

every hotel serves delicious beef-fry and the customers are the very members of the Brahminical social order who are tody in the fore front of anti-cow compaing all over India of course execpt kerala.

Here is a verdict on the vedic Brahmins, ancestors of today's Brahmins, who were such gluttonous beef eaters. The author is a noted Brahmin historian from Maharashtra, D. R. Bhandarker, whose book, Ancient Indian Culture, (1939) is now avalible in Asian Educational Services-reprint (1989) ; C 2/15, SDA, New Delhi-16 The following is the Chapter, 'India-isation' (from his book, pages-70 to 81.)

অর্থাৎ 'বৈদিক ব্রাহ্মণরা যে খুব ভাল গোমাংস খাদক ছিলেন তা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিকগণই তা স্বীকার করেছেন। আজকের ব্রাহ্মণ পরিচালিত হিন্দু নাৎসী দলসমূহ অদ্ভুতভাবে গোমাংস খাওয়ার বিরোধিতা করেন এবং গোহত্যা বন্ধের জন্য তারা হিংসার আশ্রয়ও গ্রহণ করেন। তারা একদিকে গোহত্যা বন্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন আবার অন্যদিকে ভারতের প্রগতির জন্য "আমাদের বৈদিক যুগে ফিরে যেতে হবে" এ ওকালতিও করেন। বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়ার অর্থ ব্রাহ্মণদের অবশ্যই গোমাংস খেতে হবে। তারা একই সঙ্গে গোহত্যা বন্ধের দাবী করেন আবার 'বৈদিক যুগে ফিরে যাবার' বায়নাও ধরেন (দ্রঃ DV Nov. 1. 1989 "ব্রাহ্মণরা যখন পেটুক গোমাংসাশী ছিলেন"Mukundi Lal P. 16 to 21 & DV Dec. 1. 1989 p. 22 : গো-পূজার গুপ্ত কথা")।

যে গাভীকে তারা মা বলে সে গাভীকে ভালবাসার কারণে যে নাৎসীরা এটা করে তা নয়। যদি তারা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ না করে গাভীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে তারা কেরালায় বহুল প্রচলিত গোমাংস ভক্ষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন ? তাহলে কি কেরালার গাইগুলো তাদের মা নয় ? কেরালায় প্রত্যেক হোটেলেই উপাদেয় ভাজা গোমাংস পরিবেশন করা হয় এবং এসবের খদ্দের সেই ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার সদস্যগণই যারা কেরালা বাদে সারা ভারতে গোহত্যা বন্ধ অভিযানের অগ্রভাগে রয়েছে।

আজকের ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ পেটুক গোমাংস খাদক বৈদিক ব্রাহ্মণদের উপর এখানে অভিমত প্রদত্ত হয়েছে। লেখক ডি. আর ভাণ্ডারকর মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক, যার বই Ancient Indian culture (1939) এখন এশিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে এবং পাওয়া

www.pathagar.com

যাচ্ছে (1989) C2/15, SDA, New Delhi 16. নীচে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের অংশ "ভারতীয়করণ" (তাঁর বই-এর ৭-৮১ পৃষ্ঠা থেকে) প্রদত্ত হয়েছে।"

আমরা বাহুল্যভয়ে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা তা দেখে নিতে পারেন।

ভারতে যে আজ পর্যন্ত গরু জবাই চালু আছে তার মূলে আছেন দাক্ষিণাত্যের অমুসলমান এম.পি.রা। বিনোবাভাবের আন্দোলনের সময় ও অন্যান্য সময়ও তারা লোকসভার ভিতরে ও বাইরে এর প্রতিবাদ করেছেন। গরু শুধু মুসলমানরা খায় না, খ্রীষ্টান ও আদিবাসীরাও খায়। বিহারে আইনত গরু জবাই বন্ধ হলেও রাচীতে মেন্টাল হাসপাতালের পাশে গরুর গোশতের বেচাকেনা দেখে আমি বিস্মিত হই। দেখি মুসলমানদের সাথে এমন লোকেরা মাংস কিনছে যারা মুসলমান নয়। অনুসন্ধানে জানতে পারি এরা আদিবাসী। তৎসত্ত্বেও ইউপির কল্যাণ সিং সরকার গরু জবাই বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রস্তাবিত আইনে জেল ও জরিমানার মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গো হত্যাকে সংবিধান-এর মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় গণপরিষদে মুসলমানদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। দেশ বিভাগের পর হতমান মুসলমানরা শান্তি ও সৌহার্দের কারণে অথবা অসহায়তার কারণে এটা মেনে নেয় কিন্তু এতাবৎকাল গোবলয়ে গোহত্যা বন্ধ থাকলেও মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার উন্নতি হয়নি। আসলে এসব বাহানা মাত্র। গোবলয়ে গোহত্যা বন্ধের দরুণ অকেজো গরুগুলোকে বনে ও জংগলে ছেড়ে দেওয়ার ফলে ফসল ও বনাঞ্চলে গাছপালা নষ্ট হচ্ছে অধিকন্তু যত্রতত্র মরে থাকার কারণে হাড়, চামড়ার মত সম্পদের মূল্য থেকে দেশ ও সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। রাজস্থানে খরার সময় সরকারী গো-শালায় গো-খাদ্য সরবরাহ করে গরু বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় অথচ খাদ্যাভাবে মানুষ মরছিল। মানুষ বাঁচার তাগিদে গরুগুলো পানির দামে পাকিস্তান সীমানা দিয়ে পাচার করছিল। আবার সরকারী খামারে যত গরুর তত্ত্বাবধানের হিসাব দেখিয়ে সরকারী টাকা ওসুল করা হচ্ছিল কার্যত খামারে তত গরুই ছিল না। এসব কেলেংকারীর বিশদ বিবরণ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। আজ কলের লাঙ্গলের ফলে গরুর কৃষি মূল্যও নেই। এখন গরুর খাদ্য মূল্যই আসল মূল্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এসব বাস্তব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। তাদের অস্বাভাবিক কর্মপন্থার ফল শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। ১৯৯২ সালের আম্বেদকর জয়ন্তীতে Beef বিরিয়ানী তার প্রমাণ। Dalit voice (May 16-31-1992) ইস্যুতে বলা হয়েছে, "The newly-formed Samata Sainik Dal, Karnataka's most disciplined cadre-based Ambedkarite organisation, celebrated the Dr. Ambedkar Jayanti here of April 14 in a novel way by having beef biriyani for lunch ... .

www.pathagar.com

# ধ্বংসাত্মক ভাষানীতি

## –শেখ নাসীর আহমদ

আর্যরা এসেছিল এক যাযাবর জাতি হিসাবে। তারা এদেশের অনার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে। তাদের সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাদের মানবেতর দাসের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। দেশীয় জনসাধারণ আত্মোন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মি. শেঠী লিখেছেন, 'Btahminism had ccmpletly destroyed everything in the North অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ্যবাদ উত্তর ভারতের সবকিছুকেই ধ্বংস করেছে।'

আর্যরা অনার্যদের তাদের দেবভাষা সংস্কৃত লিখতে পড়তেও দেয়নি। 'এভাবেই Brahmins had destroyed all creative talent অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ্যবাদ সব সৃজনী প্রতিভাকেই ধ্বংস করেছে।'

বৌদ্ধরা সংস্কৃতের পরিবর্তে পালিভাষা গ্রহণ করে কিন্তু গুপ্তযুগে ভারত থেকে বৌদ্ধবিতাড়ন শুরু হলে পালির পতন হয়। বাংলায় বৌদ্ধ পালরাজাদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্যবাদী বল্লাল সেনরা ক্ষমতায় আসে। বৌদ্ধরা সারা ভারত থেকে কোণঠাসা হয়ে চট্টগ্রাম দিয়ে পালায়। তাই চট্টগ্রাম ছাড়া উপমহাদেশে কোথাও বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

মুসলমান আমলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্রাহ্মণদের ছোবল থেকে ভারতের আপামর জনসাধারণ মুক্তি পায়। দেশীয় আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ শুরু হয়। ফারসী রাজ দরবারের ভাষায় পরিণত হয়। দেশীয় জনসাধারণ আরবী-ফারসী হরফ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় বর্ণনা দিতে গিয়ে দলিত ভয়েস পত্রিকার সম্পাদক ভি. টি. রাজশেখর লিখেছেন, "এই পরিস্থিতিতে মুসলমানরাই ভারতীয় জনতাকে হরফ উপহার ও শিক্ষা দিয়েছিল যেহেতু জ্ঞানের প্রসার ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাদের অপবিত্রতার মানসিক জটিলতা যেমন ছিল না তেমনি তারা তাদের অক্ষরগুলোকেও দৈব ব্যাপার বলে মনে করতো না। মুসলমানরা বিশ্বাস করতো নদীর প্রবাহিত পানির মতোই ভাষা সকলের জন্যই যোগাযোগের মাধ্যম। যোগাযোগের মাধ্যম বঞ্চিত ভারতীয় জনতা মনপ্রাণ দিয়ে এই অক্ষর ও ভাষাকে গ্রহণ করেছিল, উপভোগ করেছিল এবং একে নদীর পানির মতই ৮০০ বছর ধরে ব্যবহার করেছিল ...।"

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য বেনিয়ালবীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই ইংরেজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয়। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে আর্যদর্শন

www.pathagar.com

ও ভাষার পৃষ্ঠপোষক বনে যায়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্সকে এ কারণেই কোলকাতা হাইকোর্টের জজ করে পাঠান হয়। তিনি ও ম্যাক্সমুলার এই দুই পাশ্চাত্য আর্যপণ্ডিত ক্রমবিলীয়মান সংস্কৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করেন। ফরাসী পণ্ডিত পলিকভ লিখেছেন ম্যাক্সমূলারের প্রভাবে ইংরেজরা তাদের আর্যভাই হিসাবে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাদের প্রশাসনের উচ্চপদগুলোতে বসিয়ে দেয়। এ যোগসাজসের ফলেই ফারসীকে রাজভাষার স্থান থেকে বেদখল করা হয়। এতে রাজা রামমোহন রায়েরও সমর্থন ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পাদরী ব্রাহ্মণরা সম্মিলিতভাবে বাংলা ভাষাকে আরবী ফারসী মুক্ত করার চেষ্টা করে ও এক সংস্কৃতানুগ বাংলা ভাষার জন্ম দেয়। হেম মধু বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে এই বাংলা ভাষা চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

ইংরেজ রাজত্ব বাংলাবিহার উড়িষ্যার সীমান্ত পেরিয়ে যতই দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই ভাষার উপর মুসলিম প্রভাব ক্ষুণ্ন করার আন্দোলনও এগিয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে রাজশেখর শেঠি লিখেছেন, "১৮৩২ সাল পর্যন্ত ফারসী ছিল ভারতের অফিস আদালতের ভাষা। ১৮৩২ সালে ফারসীর পরিবর্তে উর্দু সমস্ত উত্তর ভারতের ভাষা হিসাবে চালু হয়। যখন শিক্ষা সরকারী তৎপরতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো তখন সমস্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদেরই উর্দু শেখানো হতে লাগলো। আলীগড় আন্দোলনের জনক স্যার সৈয়দ আহমদ উপলব্ধি করেন যে, ভাবী গণতান্ত্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উর্দু গদ্যের সমৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন এবং তিনি তাঁর জ্ঞানীগুণী বন্ধুদের সহায়তায় উর্দু গদ্যের নতুন স্টাইলের পত্তন করেন। এই কারণে উর্দু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও এর লেখা ও বক্তৃতার স্টাইল ভারত, পাকিস্তান, ইংলন্ড, কানাডা ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এক। এভাবে স্টান্ডার্ড ইংরেজীর মত সব স্থানের জন্য এক স্টান্ডার্ড ভাষার উন্নয়ন করা হয়েছিল।

ভাষাটিকে শুধু উর্দু নামেই অভিহিত করা হত না, একে হিন্দী, হিন্দুবী এবং হিন্দুস্থানীও বলা হত। অনেক প্রাচীন উর্দু বই, অনুবাদ এমনকি কুরআনের ভূমিকাও হিন্দী, হিন্দবী ও হিন্দুস্থানীতে লেখা হতো।

মীর্জা গালিবের একটা বইয়ের নাম ছিল কুদই হিন্দী অর্থাৎ হিন্দীর দিকে প্রত্যাবর্তন কারণ এটা উর্দুতে লিখিত হয়েছিল, যখন তার লেখা ছিল ফারসীতে। এখানে হিন্দী ব্যবহার হয়েছে উর্দুকে বুঝাবার জন্য যেহেতু উর্দু ছিল ফারসীর নিকটস্থ ভাষা। ঐ একই ভাষাকে সৈন্যরা বলতো উর্দু। উর্দু হচ্ছে তুর্কী ভাষা যার মানে হচ্ছে শিবির। লেখকেরা একে ফারসীর নিকটবর্তী ভাষা হিসাবে হিন্দী বলতো আর জনসাধারণ একে বলতো হিন্দুস্থানী এবং বিদেশী

www.pathagar.com

তুর্কী পার্শী, আরবী ও ইউরোপীয়নরা একে বলতো হিন্দবী যার অর্থ হিন্দ বা ভারতীয়।

### ব্রাহ্মণদের খেলা

ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি যে অনৈক্য ও বিভেদে বিশ্বাসী তার প্রমাণ হলো তারা ভারতীয়দের জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত করেছে। এই শক্তিই হিন্দী শব্দ ব্যবহার করে যার অর্থ এটা হিন্দুদের এবং এই ভাষা দেবনাগরী হরফে লেখার জন্য তারা দেবনাগরী প্রচার সভার পত্তন করে মুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্থ ও উর্দুকে অর্থাৎ আরবী হরফকে বদনামী করার জন্য। অবশিষ্ট ভারতীয়দের থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতে এই প্রয়াস চালান হয়, তারা ভারতীয়দের হিন্দু বলতে শুরু করে। সমস্ত অমুসলমান, অখৃষ্টান, অ-ইহুদীদের প্রতারিত করার মানসে জনতাকে হিন্দু মুসলমানে বিভক্ত করা হয়।

তারা জানতো মুসলমানদের বোকা বানানো অসম্ভব কারণ ব্রাহ্মণরা যদি গীতার চর্চা করে তাহলে মুসলমানরা কুরআনের চর্চা করবে। বেদের বিপরীতে মুসলমানদের হাদীস আসবে, আয়ুর্বেদের বদলে আসবে হেকিমী, বাল্মিকীর পরিবর্তে ফেরদৌসী, মহা-ভারতের পরিবর্তে আরব্য রজনী, চাণক্যশ্লোকের বদলে শেখ সাদী। ব্রাহ্মণদের সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিজস্ব তন্ত্রমন্ত্র আছে এবং মুসলিম তন্ত্রমন্ত্র তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং এই কা'রণে মুসলমানদের কখনই বোকা বানানো যাবে না।

### তপশিলী জাতি/উপজাতি/অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর হিন্দুকরণ

বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীর হিন্দী আন্দোলন মুসলমানদের সন্ত্রস্থ করে তুলবার জন্য ততটা নয় যতটা অহিন্দু তপশিলী জাতি/উপজাতি/অনুন্নত গোষ্ঠীদের হিন্দুকরণ করবার জন্য। এভাবে তারা আদিবাসী দেশীয় জন-সাধারণকে গোলাম বানাতে চায়। মুসলমানদের গোলাম করা যাবে না তাদের প্রচণ্ড ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণে। তারা যা করতে পারে তা হচ্ছে অহিন্দু তপশিলী জাতি/উপজাতি অনুন্নত প্রভৃতি গোষ্ঠীর উপর সংস্কৃতায়িত হিন্দী চাপিয়ে দিতে এভাবে একবার তাদের হিন্দীকে গ্রহণ করাতে পারলে তাদের হিন্দু বলা সহজ হবে ঃ হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্থান। দেবনাগরী হরফে শিক্ষিত সংস্কৃতায়িত হিন্দী চালান দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এক ঢিলে দুটো পাখী মেরেছে। তারা অহিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করেছে এবং এভাবে বিচ্ছিন্ন করে তারা তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়।

www.pathagar.com

এভাবে সংস্কৃতায়নের পরিবর্তে, সংস্কৃত শব্দের উর্দুয়ায়ন করা হয়েছে। এ নমনীয় (সুরেলা উর্দুয়ায়িত শব্দ সর্বত্রই বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এজন্যই তারা উর্দুকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। ...

স্বাধীনতার পর ৪২ বছর ধরে দেবনাগরী অক্ষরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু সংস্কৃত ভাষার খদ্দের জুটেনি। সহজলেখ্য সংক্ষিপ্ত, সুন্দর শিল্প সৌন্দর্যমণ্ডিত উর্দুর পরিবর্তে সরকারী স্কুলে ছেলেদের এই অক্ষর রপ্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু নাৎসীদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের ৮০% নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তথাকথিত হিন্দী ফিল্ম, টিভি প্রোগ্রাম (সরকারী পণ্ডিতের প্রস্তুত সংবাদ ছাড়া), রেডিও ঘোষণা টিভির বিজ্ঞাপন সবই উর্দুতে। এমনকি মন্ত্রী, পণ্ডিত ও নেতাদের বক্তৃতাও উর্দু শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উচ্চারণ ছাড়া।

### মুলক্‌রাজ আনন্দের মন্তব্য

হিন্দী ফিল্মের উর্দু হিন্দীর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মুলক্‌রাজ আনন্দ লিখেছেন, "আমি হিন্দী বাণিজ্যিক সিনেমা সম্পর্কে দারুণভাবে লজ্জিত ও অসুখী। আমি হিন্দী সিনেমাকে ক্ষমা করবো হিন্দী নয়, উর্দুতে-হিন্দুস্তানিকে জনপ্রিয় করার জন্য তার অবদানের কারণে (Decan Herald, March, 6, 1981) ...

### সংগ্রামের ইতিহাস

হিন্দী হিন্দু জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ হিন্দু নাৎসী বা উচ্চবর্ণওয়ালাদের প্রত্যক্ষ মসলা। প্রখ্যাত ভাষাবিদ, 'The Hindi Devnagari' গ্রন্থে লিখেছেন, কেবল হিন্দী নাম নয়, এমনকি এই ভাষাটাই সম্পূর্ণভাবে তৈরী ... দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির এই চিন্তা সিপাহী বিদ্রোহের পরে জন্মলাভ করে। তার পূর্বে শাসক পরিবারসমূহের মধ্যে বিবাদ বাধানোই এর লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণকে রাজনীতির দাবার ঘুটিও মনে করা হতো না। বরং সাধারণভাবে জনগণকেও গরু ছাগলের মত মনে করা হতো। জনগণের মধ্যে বিভেদনীতির পত্তন হয় সিপাহী বিদ্রোহের পর হিন্দুদের তুলে ধরে ও মুসলমানদের উৎখাত করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে কংগ্রেস আন্দোলনের জন্ম দেওয়া হয়। কোনোক্রমে এটা তার তীরকে ছাপিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা পক্ষ সঞ্চালন করতে শুরু করে। যেহেতু হিন্দুরা এ আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল তাই মুসলমানদের এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। চিরন্তন

www.pathagar.com

অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র মিলেছে হিন্দী-উর্দু বিতর্কের মধ্যে। একই ভাষা মুসলমানরা বললে উর্দু, হিন্দুরা বললে হিন্দী। সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যম, প্রশাসন, আদম সুমারী, রাজনৈতিক মঞ্চ এ ভেদনীতির তত্ত্ব প্রচার করতে ব্যবহার করা হয়। এর ফল উর্দু মুসলিম, হিন্দী হিন্দু হয়েছে। দেবনাগরী হরফে হিন্দী হিন্দু অথবা ভারতয়ীদের ভাষা হিসাবে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জালিয়াতী।

## দেবনাগরী প্রীতি

কলম দিয়ে আড়াআড়িভাবে লেখার জন্য মৃত দেবনাগরী হরফকে নির্বাচিত করা হয়নি বরং বাটালি দিয়ে নীচের দিকে খোদাই করার জন্যই এটা করা হয়েছিল।

এখানেও রয়েছে ব্রাহ্মণ্যসুলভ শয়তানী। এই দেবনাগরী হরফ নির্বাচিত করা হয়েছিল লেখাকে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক করার জন্য যাতে তফশিলী জাতি/উপজাতি/অনুন্নত জাতিসমূহকে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞানার্জনে অনুৎসাহিত করা যায়। এটা মনুর ধর্মশাস্ত্রের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল যার নির্দেশ হলো শূদ্রের লেখাপড়া শেখা নয় এবং যদি তারা বেদ পড়ে তাহলে তাদের জিভ কেটে দিতে হবে এবং এমনকি যদি তাঁরা ঘটনাচক্রে বেদ শুনে ফেলে তাহলে তাদের কানে সীসে গরম করে ঢেলে দিতে হবে।

## বাঁদরমুখো

বিংশ শতাব্দী জনগণকে নিরক্ষর, অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ থাকার অনুমতি দেয় না। ইলেকট্রনিক যুগ সমাজের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে তাদের সংবাদ সরবরাহ করছে। এ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার জন্য তারা ভাষাটাকেই কঠিন করেছে যাতে সংবাদ পরিবেশনই কঠিন হয়ে পড়ে। দেবনাগরী অক্ষর ও সংস্কৃত শব্দ যা উচ্চারণ করতেই মুখ বাঁদরের মত হয়ে যায় তা আর্য হিন্দু নাৎসীদের ত্রাণকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ...

যে সংস্কৃত ভাষাকে বাঁদরের মত মুখ করে অর্দ্ধস্বরযুক্ত শব্দোচ্চারণ করতে জনসাধারণ অপারগ সেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে আর্য/ব্রাহ্মণ্যলবী সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে বিকৃত করেছে। এটাই আর্যরা চাচ্ছিল। কিন্তু তারা উর্দুকে বিকৃত করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে তারা দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দকে নমনীয় করে উর্দুতে ঘরঅকে ঘর, শ্মশানকে শ্মশান, চন্দ্রকে চাঁদ, রাত্রিকে রাত, বলিবর্দকে বয়াল, লশতিকাকে লাঠি, দুগ্ধকে দুধ এবং আরো অন্যান্য শত শত শব্দকে এভাবে নমনীয় করেছে।

www.pathagar.com

বিভেদের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি হিন্দী নামের এ জীবটিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তে হিন্দু জাতীয় আন্দোলনের এক টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকি এখন (১৯৩৫) কংগ্রেসের কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনের আনন্দে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে শুরু করেছে ইন্ডিয়ান সংস্কৃতি থেকে এর পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করতে।

... ১৮৯৩ সালের নাগরী প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (উর্দু হরফের পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরকে জনপ্রিয় করার জন্য)। সরকারী স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতাও পরে পরেই এসে যায়। ১৯০০ সালে সরকার দেবনাগরী হরফে আদালতে দরখাস্তের অনুমতি দেন। ১৯০৫ সালে সভা হিন্দী ভাষার প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১০ সাল থেকে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়, রুচিবোধকে বিসর্জন দিয়ে সর্বপ্রধান পাপীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই সমস্ত সম্মেলনে প্রতাপ নারায়ন মিশ্রের মত লোকদের গান গাওয়া হয়। সমস্ত সৎ হিন্দুদের হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্তান এই শ্লোগান নিয়ে এক পতাকার তলে সমবেত হবার আহ্বান জানানো হয়। (This Hindi and Devnagary, pages 102, 103, Metropolitan Book Company Ltd, Faiz Bazar, Delhi, 1957).

### মারওয়াড়ীদের প্রতি গান্ধী

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দীর মাধ্যমে যে হিন্দু জাতীয় আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল মারওয়াড়ীরা তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে যারা বিহারের হিন্দু জমিদারদের ক্রীতদাস দলিতদের রক্তশোষণ করছিল হিন্দী পাঠশালার মাধ্যমে যার মধ্যে গোরক্ষা প্রোগ্রামও সামিল ছিল এবং এ উদ্দেশ্যে এম. কে, গান্ধীর খেদমত এত ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল যে এমনকি গান্ধীকেও এক সময়ে স্বীকার করতে হয়, "আমি আমার সফরকালে দেখেছি যে, গোরক্ষা ও হিন্দীপ্রচার মারওয়াড়ীদের একমাত্র ভাবনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। (My Experiments with Truth—Mr. M. K. Gandhi, p. 314. Navajeevan publishing House, 1957). Why Godse killed Gandhi থেকে যোগ করতে হবে।

হিন্দী প্রচারের ভিত তৈরী করে ১৯২৭ সালে হিন্দুরা উত্তর প্রদেশে উর্দুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে। তারা সরকারী অফিসের নিকট নিজস্ব খরচায় হিন্দী লেখক নিয়োগ করে নিখরচায় উর্দু বদলে দেবনাগরী হরফে দরখাস্ত লেখার জন্য যা সাধারণতঃ বৃত্তিধারী উর্দু লেখকরা করতেন (মৌলানা মোহাম্মদ আলী কী ইয়াদ মে–সৈয়দ সাবাউদ্দিন আবদুর রহমান–মাকতাবা মুয়ারিফ আযমগড়, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২০১)।

www.pathagar.com

অবশেষে নাৎসীরা ভারত ভাগ করে সারা গোবলয়ে মুসলিম গণহত্যা শুরু করে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে উর্দুকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থান অর্থাৎ পুরো গোবলয় থেকে উৎখাত করে যেখানে উর্দু সেদিন পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল। প্রেসিডেন্টের একমাত্র কাষ্টিং ভোটে তারা ভারতের সরকারী ভাষা হিসাবে দেবনাগরী হরফে হিন্দীও পেয়ে যায়।

সমস্ত দ্রাবিড় ভাষাপন্থী গোষ্ঠী এবং বাঙ্গালীরাও এর বিরোধিতা করে এবং এ বিরোধিতা এখনও অব্যাহত। এ অবৈধ আর্য সন্তানকে গ্রহণ করার থেকে তামিলনাড়ু ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু কেউ নাৎসীদের পরাস্ত করতে পারেনি।"

এই ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের সংস্কারান্ধতা এত প্রবল যে ১৯৮৯ সালে বিজেপির জাতীয় সম্মেলনে মঞ্চ থেকে নেতৃবৃন্দের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে উক্ত সভায় হট্টগোলের সৃষ্টি হয় ও জিন্দাবাদের পরিবর্তে 'অমর রহে' ধ্বনি দেওয়া হয়। বিহারের পর ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের মুখে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদান করা হলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বাদাউনে দাঙ্গা বাধায় যদিও উর্দুকে স্বীকৃতি ঘোষণার বাস্তব মূল্য খুব বেশী নেই কেননা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত আমলারা এ ঘোষণাকে কার্যকরী করতে সর্বপ্রকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও উর্দুর গতিরোধ করা যাবে না। যেমন রোধ করা যাবে না বাংলা, তামিল প্রভৃতি অহিন্দী ভাষাসমূহের গতি। সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে All India Radio-র বদলে হিন্দী শব্দ প্রচলনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ তামিলনাড়ুতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। হিন্দীওয়ালারা ইংরেজী হঠালেও দক্ষিণ ভারত হিন্দী ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখার পক্ষপাতী। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' কথাটা সত্য হলে ইংরেজীতেও হঠানোর প্রশ্ন উঠতো না। ইংরেজী এখন ভারতীয় ভাষাই। ইংরেজী ভাষাতে সংবাপত্রগুলোই সারা দেশে পঠিত হয় কিন্তু হিন্দী তো কেবল গোবলয়েই চলে। এ গোবলয়েও ইংরেজী ও উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলো প্রবল প্রতাপে চালু রয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাও ময়দানে বিদ্যমান। এখন সাঁওতালী, নেপালী, ঝাড়খণ্ডী, গোর্খালী প্রভৃতি ভাষাও স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার। এরা কেউ হিন্দীর গোলামী করতে রাজী নয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পর সমস্ত রাজ্যগুলোর অফিস আদালতের ভাষা ক্রমশঃ আঞ্চলিক ভাষাই হবে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা জেলার নিম্ন-আদালতে বাংলা ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বাংলা ভাষা চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী

www.pathagar.com

আবদুল কাইয়ুম মোল্লার নেতৃত্বে এক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল এই অভিজ্ঞতাকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য সম্প্রতি ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে আইনের গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীও বসে নেই তারা আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সংস্কৃতিকরণ শুরু করেছে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে বসে তারা এ গোলামীকরণের তালিম দিচ্ছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। 'আবহাওয়া' শব্দটা খুবই সুপ্রচলিত, সবাই এটা বুঝে। সংবাদপত্র ও লেখাতেও চালু আছে। তবুও কোলকাতার রেডিও সেন্টার থেকে বলা হয় 'জলহাওয়া'র খবর। রিপোর্ট ও রিপোর্টার শব্দটি খুবই প্রচলিত কিন্তু এক নজরে হিন্দীওয়ালাদের অনুগ্রহ ধন্য চামচে বুদ্ধিজীবীরাও সংস্কৃতি ঘেঁষা প্রতিবেদন, প্রতিবেদক শব্দ চালু করবার কসরৎ করছে। সহজ, নমনীয় সুপ্রচলিত জনপ্রিয় শব্দকে বাদ দিয়ে অপ্রচলিত, কষ্টকল্পিত সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দসমূহকে আমদানী করা হচ্ছে। সারা ভারতে যে ভাষায় কেউ কথা বলে না যা কারো মাতৃভাষা নয় সেই মরা ভাষা সংস্কৃতকে জিন্দা করার জন্য রেডিওতে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায় সরকারী খরচে সংবিধান পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়েছে। এবার নবম লোকসভায় ব্রাহ্মণ্য লবী সংস্কৃত ভাষাকে পাদপ্রদীপে আনার জন্য সেই ভাষাতে শপথ গ্রহণ পর্যন্ত করেছে। ১৮ই ডিসেম্বরের হিন্দুস্থান টাইমে বলা হয়েছে, It was, however, not a spontaneous decision, At the BJP parliamentary party meeting this morning, leader Atal Behari Vajpayee is understood to have requsted those members who could take oaths in Sanskrit with facllity to do so. What was the reason why such a large number of members from the BJP took their oaths in Sanskrit.

This decision, again was the result of an appeal by a group of intellectuals in Bombay including Mrs. Roza Despande, Ex-M. P. and daughter of veteran Communist leader S. A. Dange, that newly elected members should take their oaths in Sanskrit according to Mr. Ramdas Naik, BJP member elected from North Bombay.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতে শপথ গ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার ছিল না এটাকে চক্রান্তমূলকভাবে করা হয়েছে বিজেপি পার্লামেন্টারী দলের সভায়। এর সাথে যোগ দিয়েছেন বোম্বের ব্রাহ্মণ কমিউনিষ্টরা যাতে ডাঙ্গের মেয়ে রোজা দেশপাণ্ডেও রয়েছেন। মিসেস পাণ্ডে সম্প্রতি এ তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে

www.pathagar.com

মার্কসবাদ বেদ থেকে জাত। তাহলে দেখা যাচ্ছে বেদকে এ যুগে চালু করা যাবে না বিধায় ব্রাহ্মণরা মার্কসবাদের মধ্যে অব্রাহ্মণদের ফাঁদে ফেলবার জন্য মার্কসবাদের মুখোস পরেছে। তাই বিজেপি ও সিপিআই ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠায় এক হয়ে গেলেন। বুঝতে অসুবিধা নেই ব্রাহ্মণ্যলবী শেষ পর্যন্ত কোথায় যেতে চায়। তারা এখন হিন্দী ভুলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাকে জিন্দা করতে চাইছে যাতে একে আগামী দিনের গো-ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করা যায়। এই সংস্কৃতওয়ালারা কোন এলাকার লোক ? পত্রিকা বলছে, "Most of them were the BJP members elected from Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharastra, Uttar Pradesh and apart from Delhi and Rajasthan." অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও রাজস্থানের নির্বাচিত বিজেপি সদস্য।

একদিন এই অঞ্চলের লোকেরাই তো হিন্দুস্তানী বা উর্দুর বিরুদ্ধে হিন্দীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর তারা হিন্দী থেকে সংস্কৃতে যাবার পথ প্রস্তুত করছে। এটাকে সফল করার জন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সংস্কৃতকরণ শুরু হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে এই কারণেই ব্রাহ্মণ্যলবী আঞ্চলিক ভাষাগুলোর স্বাভাবিক বিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। এজন্য তারা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনেরও বিরোধী।

উর্দু ও মুসলমানকে খতম করার পর তারা শিখ ও পাঞ্জাবীর প্রতি নজর দিয়েছিল। মাষ্টার তারা সিং গুরুমুখী হরফে লেখা পাঞ্জাবী ভাষাকে দেবনাগরীতে লিখতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন এই শর্তে যে পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ্যবাদী পাঞ্জাবীকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে আদম সুমারীতে নথিভুক্ত করবে। ফলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। আর্য সমাজীরা ওআরএসএস এতে রাজী হয়নি। তারা হিন্দীকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে নথিভুক্ত করে। ফলে ব্রাহ্মণ্যলবীর সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয় বলে কেবল ভার্মা আপসোস করেছেন। উর্দুর ন্যায় পাঞ্জাবীকেও হিন্দীর উপ-ভাষায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি। এখানে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যলবীর ভাষানীতিকে প্রতিহত করার জন্য রাজশেখর এক মূল্যবান প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "দলিত ও শূদ্রদের মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে হবে।" তিনি মুসলমানদের কাছে আবেদন করেছেন যে, তারা যেন একজন আর একজনকে উর্দু শেখায় এবং এদের মধ্যে গ্রাম-শহরের মুসলমান ও দলিত যেন থাকে যাতে দলিত এবং

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম গড়ে উঠে কারণ একবিংশ শতাব্দী তাদের শতাব্দী—আম্বেদকর যুগ হবে।

## এর পরেই কি পাঞ্জাব ?

"নাৎসীরা ইউপির শহুরে লোকদের সাধারণ ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করতে সক্ষম হলেও গ্রামগুলো এখনো সুরক্ষিত রয়েছে। দিল্লী যেখানে উর্দু ভাষার জন্ম হয়েছিল সেখানে এই ভাষাটির বিশুদ্ধতা সংস্কৃতকরণের দ্বারা নষ্ট করা হয়েছে। এখন ভাল উর্দু পাঞ্জাবেই চালু আছে কারণ পাঞ্জাবী উর্দুর বোনের মত। এই ভাষা উর্দুয়ায়িত ও পাঞ্জাবীকৃত আরবী ফারসীর কারণে সহজ ও সরল। পাঞ্জাবীকে ধ্বংসের জন্যই পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বিভক্ত করা হয়। শিখেরা নিজেদের এবং পাঞ্জাবী ভাষাকে রক্ষার জন্যই ভালভাবেই সংগ্রাম করছে। তাদের উচিত যথাশীঘ্র পাঞ্জাবে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া এবং নাৎসীদের ভাষাকে প্রথমে পরাজিত করা। হরিয়ানার জাঠ, ঠাকুর ও রাজপুতরাও তা করতে পারে এবং নাৎসী বাচ্চাটাকে হরিয়ানা ছাড়া করার পিছনে লাগতে পারে।

## উর্দু শুধু মুসলমানদের ভাষা নয়

আমরা আবার জোর দিয়ে বলতে চাই, উর্দু শুধু মুসলমানের ভাষা নয়। এটা তথাকথিত সব হিন্দীওয়ালাদের ভাষা। এটা গোবলয়ের দলিত মুসলমান, শূদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর কথাবার্তার ভাষা যেখানে এই সমস্ত লোকেরা হাটে-বাজারে, খেতে-খামারে ও কলে-কারখানায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে।"

ব্রাহ্মণ্যলবীর ভাষানীতির সমালোচনা করে ভি. টি. লিখেছেন, "হিন্দুরা কোথা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে ? এমনকি তাদের তিনটি প্রিয় 'হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্তানও' ফারসী শব্দ ? হতভাগ্য অজ্ঞ জাতি! তাদের জন্য আমাদের করুণা হয়। ব্রাহ্মণদের অনেক গোত্রই আরবী-ফারসী শব্দের বাহক। আরবী শব্দ নহর থেকে নেহেরু গোত্র এসেছে। কানুনগো মির্ধা (গ্রামের মোড়ল), স্বর্ণবাট (ফৌজী প্রধান), কুলকার্নি (প্রধান পরিচালক), মজুমদার (আমীন) বক্সী, (উৎসর্গীকৃত প্রাণ) মালিক (প্রভু)। এ ধরনের শত শত প্রখ্যাত গোত্রের নামের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সর্বাধিক প্রখ্যাত হচ্ছে জহরলাল নেহেরুর মত নামজাদা মানুষের গোত্র নেহেরু গোত্র।

ব্রাহ্মণদের জীবনে আরবী ফারসী এতদুর অনুপ্রবেশ করেছে যে, হিন্দু নাৎসী ফুহর বালাসাহেব দেওরসেরও নামেও দুটো আরবী শব্দ রয়েছে।

www.pathagar.com

বালা মানে উচ্চ, সাহেব মানে ব্যক্তি। মতিলাল নেহেরু ও জহরলাল নেহেরুর নামের সমস্ত শব্দই আরবী ফারসী—(মোতি, জহর-এর অর্থ মণিমুক্তা) হিন্দুদের দ্বারা জাতির জনক এম. কে. গান্ধীকে প্রদত্ত আদুরে নামে 'বাপু' আরবী, 'বাবা' শব্দ থেকে জাত। এ শব্দ হিন্দু সাধু-সন্তদের ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

### ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সমস্ত জনপ্রিয় এবং সরকারী উদ্যোগে ঘোষিত শ্লোগান ও প্রোগ্রামও আরবী ফারসী শব্দযুক্ত—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আরাম হারাম হ্যায়, রোটি, কাপড়া, আউর, মাকান, নাসববন্দী। সাম্প্রতিককালের জওহর রোজগার যোজনা এর অন্তর্ভুক্ত। ইন্দিরা হত্যার পরে এখনো কিছু নাৎসীদের শ্লোগানও খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্গেও আরবী ফারসী শব্দ।

আরবী-ফারসী উচ্চারণ পদ্ধতিও গোবলয়ের হিন্দু শাস্ত্র ও অবতারদের নাম পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। এ সমস্ত নামের শেষ থেকে অকারন্ত স্বর প্রত্যাহৃত হয়েছে। রামায়ণঅ হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, লক্ষ্মণ, শিব প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষায় এই স্বর এখনো রয়ে গেছে। সেখানে রামকে রামা, শিবকে শিবা প্রভৃতি বলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্যরা ভারতীয় ভাষা থেকে আরবী-ফারসী শব্দ তুলে দিতে চায় এবং একে শুদ্ধ হিন্দী করার চেষ্টা করছে।

তদুপরি আমরা দেখতে পাই ভারত সরকারের মনোহারী সাইনবোর্ড ও মুদ্রায়, নোটে লিখিত ভারত সরকারের 'সরকার' শব্দটাও ফারসী।

আরবী-ফারসীকে উৎখাত করার অত্যুৎসাহে হিন্দুদের প্রথমে যা করা উচিত তা হচ্ছে তাদের নাম থেকে হিন্দু শব্দটাই বাদ দিয়ে দেওয়ার কারণ এটা খোদ ফারসী শব্দ।

যাহোক এই ভাষাগত ফ্যাসীবাদ রুখবার জন্য অব্রাহ্মণ জনসাধারণকে সাহিত্যে বেশী বেশী দেশী কথাভাষা, বোলচালের ভাষা চালু করতে হবে। সংস্কৃত প্রধান তৎসম শব্দ যতদুর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত বিদেশী শব্দকে পরিহার না করে ব্যবহার জারী রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রিপোর্টকে প্রতিবেদন ও রিপোর্টটার প্রতিবেদক বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। রিপোর্ট ও রিপোর্টার বহুল প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য। যারা জীবনে ও ভাষায় ছুৎমার্গকে প্রশ্রয় দেয় তাদের অনুসরণ করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। দলিত ও মুসলমানদের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও ভাষা বাদ দিয়ে নিজস্ব সাহিত্য ও ভাষা তৈরী করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

# ইতিহাস যখন অনৈতিহাসিক

–অধ্যাপক গৌতম রায়
(আনন্দ বাজার)

তর্ক কি শুধু দুরদর্শনের 'রামায়ণ' আর 'বাহাদুর শাহ্ জাফর' নিয়েই ? ভারত-ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে কিন্তু ইতিহাস চর্চার তথাকথিত আধুনিককালের সূচনা থেকেই। বিকৃতি এমনকি তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাসেও। ফলে একদিকে অনিবার্যভাবেই যেমন ঘটেছে বিচার বিভ্রাট, অন্যদিকে তেমনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস।

সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশনের মঞ্চ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, দুরদর্শনে প্রচারিত সিরিয়াল 'বাহাদুর শাহ্ জাফর'-এ ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। শুধু দুরদর্শন বা আকাশবাণীর মতো গণ-মাধ্যম নয়, স্কুল-কলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বইগুলিও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সমান দুষ্ট। আজ দেশের সর্বত্র ধর্মীয় মৌলবাদের যে পুনরুজ্জীবন অনাস্থা, বিদ্বেষ ও হানাহানিতে নিয়ত বিস্ফোরিত, তার মূলে কিন্তু রয়ে গেছে ওইসব পাঠ্যবই থেকে আহরিত বর্তমান প্রজন্মের অমার্জিত ইতিহাস চেতনা। এইসব কেতাবে ছাত্রছাত্রীরা এতকাল যা পড়ে এসেছে, এবং এখনও পড়ে চলেছে, তাতে প্রকারান্তরে ভারতের যাবতীয় গৌরবের অংশীদারি দেওয়া হয়েছে হিন্দুদের, আর সবরকম দুর্ভাগ্য, তমসা ও ধ্বংসের দায়ভাগ চালানো হয়েছে মুসলিমদের ঘাড়ে। দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এই রকম একপেশে ধারণা নিয়ে যারা কর্মজগতে প্রবেশ করছে, প্রশাসনের কর্ণধার বা আইনসভার জনপ্রতিনিধি হয়ে তারা যে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুষে রেখেই আগাগোড়া কাজ করে যাবে, ক্ষেত্র বিশেষে পক্ষপাতপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ?

অন্য অনেক কিছুর মতো, এদেশে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনাও ঘটেছিল ইউরোপীয়দের হাতে। ম্যাক্সমূলর প্রমুখ প্রাচ্যবেত্তাগণ বৈদিক যুগের গুণগান করতে গিয়ে সবরকম পরিমিতিবোধ খুইয়ে বসেছিলেন। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আর্যরক্তের সন্ধানে জার্মান প্রাচ্যবিদদের ভারত-অভিসার সেইসব মনগড়া জাতীয় অহমিকারই রকমফের, পরবর্তীকালে সমগ্র মানব সভ্যতাকে ভাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মূল্যে যার পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। এদের অস্বস্তিকর ভারতপ্রেম এ উপমহাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে যেসব উদ্ভট

www.pathagar.com

তত্ত্ব ও অভিসন্ধিমূলক তথ্যবিন্যাস সৃষ্টি করে, দেশীয় ঐতিহাসিকরা সেগুলোই শেখানো বুলির মতো আউড়ে গেছেন। সে সময়কার ভারতবিদ্যা ছিল একান্তভাবেই 'হিন্দু ভারতের' জীবনচর্চা। যেন তুর্কি আগমনের পরবর্তী ছ'শ বছরের কোনও অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস নেই। অথচ তথাকথিত ওই হিন্দু ভারতে, অর্থাৎ বৈদিক, মৌর্য বা গুপ্ত যুগে, ভারতবাসির কাছে 'হিন্দু' কথাটার কোনও অর্থ ছিল না। প্রাক-ইসলামী উপাদানগুলোয় শব্দটির অস্তিত্বই নেই। আরবরাই প্রথম সিন্ধু-অববাহিকার বাসিন্দাদের 'হিন্দু' নামে ডাকতে শুরু করে। সংজ্ঞাটি অতএব মোটেই জাতিবাচক ছিল না। তখন যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী এদেশে ছিল, কেউই নিজেদের হিন্দু বলে জানত না। এমনকি একটি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশও ভাবতো না। আধা সভ্য কৌম নৃগোষ্ঠীর কৌলিক আচারের বেশী কিছু তারা অনুশীলন করত না (আজও তা-ই করে)। তবু পশ্চিমের হিতবাদী দার্শনিক ও প্রাচ্যবিদরা এ যুগকে 'হিন্দু যুগ' আখ্যা দিলেন। অথচ সামাজিক ইতিহাসের কথা বাদই দিলাম, রাজবংশের ইতিহাস বিচারেও এ যুগকে কোনক্রমেই হিন্দু যুগ বলা যায় না। কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রিক, শক, কুষাণ রাজবংশ হিন্দু ছিল না। অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ এবং সচেতনভাবে নিজেদের বৌদ্ধ বলে প্রচার করতেন, কিন্তু কোনো রাজাই নিজেকে হিন্দু দাবি করেননি। মাত্র গত শতকে আসলে অসংখ্য ভারতীয় স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করে নিয়েছে, এটা হজম করতে বর্ণহিন্দু সংস্কারে লালিত ঐতিহাসিকদের বাধে। অথচ সে সময় তথাকথিত হিন্দু ধর্ম ও সমাজের জদ্দার অচলায়তনটি যে রকম জরাজীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু ও অধঃপতিত হয়েছিল, বর্ণাশ্রমের অবমাননাকর বিকৃতি, তন্ত্রের উৎকট বীভৎসতা এবং কৌলিন্য প্রথার কদর্য অনাচার মিলে জনসমাজে এমন একটা হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছিল যে, ইসলামের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের উদার আহ্বানে আপামর জনগণ সাড়া না দিয়ে পারেনি। সূফি সন্ত দরবেশ ফকিরদের সমন্বয়ের বাণী, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আন্তরিক আবেদন উপেক্ষা করা সেদিন সম্ভব ছিল না। বহু ক্ষেত্রে গোঁড়া উলামাদের পরামর্শে মুসলিম রাজশক্তি দ্বারা নিগৃহীত ও বিতাড়িত হয়েও এ ই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের যে প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন, তারই তরঙ্গ অভিঘাতে এদেশে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ নিজেকে ফিরে পায়, জন্ম নেয় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, আর জোয়ার আসে আচারসর্বস্ব দেবতাবহুল, পুরোহিত নির্ভর, যাগযজ্ঞভারাক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ধর্মের মরা গাঙেও। হিন্দু যুগনয়, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মডেল এই উপমহাদেশে তুর্কি-মুঘলদের শাসন-ইতিহাস। ইসলামের অপ্রতিহত রথের পথ আগলে দাঁড়াতে নয়; একেশ্বরবাদী ইসলামের ভাবপ্রভাবেই ব্রহ্মবাদী শংকরের উদয়।

www.pathagar.com

মুসলিম রাজশক্তির উচ্ছেদ করে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও হিতবাদী দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে যে ভাবাদর্শগত জমি তৈরি করেছিলেন, স্বভাবতই সেখানে সংস্কৃতি সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সংহতির মুসলিম ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উহ্য রাখা হল। আর সেই জমিতেই ঊনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আবাদ করলেন বিষবৃক্ষ। ততদিনে ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের বুঝিয়ে ফেলেছে, ভারতের শক্তি তার আধ্যাত্মিকতায়—হিন্দু আধ্যাত্মিকতায়। ক্রমে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের উপকথা জন্ম নিল। শুরু হলো হিন্দু ভারতের সবকিছুই বৃহৎ ও মহৎ বলে ধরে নিয়ে, মুসলিম ভারতের অপযশ গাওয়া। চালু হলো তুর্কি ও মুঘল বাদশাহদের ইতিহাসের খলনায়করূপে চিত্রিত করার রেওয়াজ, আর আঁতিপাতি করে খোঁজা শুরু হল, ৬০০ বছরের মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে অমুসলিম বিদ্রোহী রাজা রাণা ভূস্বামী বা কুলপতিদের নাম। শুধু মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের কৃতিত্বই অতঃপর ওইসব ভুঁইফোড় খুদে জায়গীরদারদের জাতীয় বীর মহান দেশপ্রেমিক ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হল। পাদপ্রদীপের আলো এসে পড়ল শিবাজী, রাণা প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহের ওপর।

কিন্তু কেন ? হাতের কাছে মজুত যখন 'নীলদর্পণ' তাঁতিয়া টোপি আর নানা সাহেবের রক্তে ভিজে রয়েছে মাটি, কানপুর-অযোধ্যায় পথের ধারে ঝোলানো রয়েছে বিদ্রোহী সিপাহীর লাশ তখনই ঐতিহাসিকরা আশ্চর্যজনকভাবে শিবাজী-রাণাপ্রতাপকে নিয়ে পড়লেন, কিন্তু এঁরা কি বিদেশী প্রভুত্ব উচ্ছেদের জন্য লড়েছিলেন ? ষোড়শ শতকে মুঘলদের কে বিদেশী ভাবত ? পেশোয়াশাহীর কট্টর সমর্থক মুষ্টিমেয় মারাঠা সৈন্য ছাড়া তামাম হিন্দুস্তানের জনমানস শিবাজীর হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল এমন কোনও প্রমাণ নেই। গোটা ভারত বা উত্তর ভারত দূরস্থান, রাণাপ্রতাপ এমনকি সমগ্র রাজপুতানার হয়ে লড়ার কথাও কখনও ভাবেননি। রাজপুতরা ১৯০১ সনেও খোদ রাজপুতানার মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশের বেশি ছিল না। তারও কয়েকশ বছর আগে কত রাজপুত ছিল ? প্রতাপের পক্ষে কি একশ রাজপুতও লড়েছিল ? নিজের হৃত রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো মহত্তর আবেগ তাঁকে তাড়িত করেনি। অথচ ইতিহাসের কেতাবে এদের নিয়ে কত আদিখ্যেতা।

বস্তুত শিবাজী রাণাপ্রতাপ বা গোবিন্দ সিংহের বিদ্রোহগুলোর সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র মিল-বেন্থাম পড়া নেটিভ ঐতিহাসিকরা বুঝতে পারেননি, বুঝেছিলেন এক মণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ'

www.pathagar.com

প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থভাবেই বলেছেন, "মহারাষ্ট্র বা শিখ সম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। ওই দুই ক্ষণপ্রভা সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল ; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।" ইতিহাসের পাঠ্য-কেতাবে কিন্তু ঠিক উল্টো ধারণাই প্রচার করা হয়। জাতীয় বীর খুঁজতে গিয়ে লেখকরা লক্ষ্মীবাঈ, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপিদের খুঁজে পান না, কারণ ওরা কেউ যে মৌলবাদী হিন্দু নয়, ওদের কারো তরবারি যে ম্লেচ্ছের রক্তে সিক্ত নয়। এভাবেই ইতিহাসের বইগুলি খিড়কির দরজা দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে পাচার করে, ছাত্রছাত্রীদের সুকুমার মনে যা দ্বিজাতিতত্ত্বরূপে চোলাই হয়।

এ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ইতিহাস শিক্ষাই পাড়ায় পাড়ায় একটি দুটি এমন উন্মাদকে ছড়িয়ে রাখে, যারা বিশ্বাস করে শাস্ত্রকার মনুবর্ণিত মহাপ্রলয়ের রেডিও কার্বণ তারিক পাঁচ লক্ষ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং বেদ উপনিষদ তার আগেই লেখা হয়ে গেছে, যারা প্রচার করে ভারতই আর্যদের আদিনিবাস, গ্রিক-ল্যাটিনের আদিজননী সংস্কৃত, মিশর-ব্যাবিলনের সভ্যতার উৎস গাঙ্গেয় উপত্যকা, পরমাণু বোমা কিংবা সুপারিসনিক জেট 'ব্যাদেই ছিল' যারা প্রচার করে তাজমহল রূপান্তরিত হিন্দু মন্দির, যারা মহাকাব্যের নায়কের 'জন্মস্থান' নিয়ে রক্তাক্ত কাজিয়া করে এবং পিএন ওকের মতো যাদের কেউ কেউ ফোকটে ঐতিহাসিক বনে যায়।

এই সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চা বন্ধ করতে হবে। দেখাতে হবে, অভিন্ন ধর্মাবলম্বী সব মানুষদের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি ভ্রান্ত। বুঝতে হবে, যারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে এবং অন্য যারা সেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে, এই দু' পক্ষেই নানা ধর্মের লোক রয়েছে। এবং ব্রিটিশ শাসন খৃষ্টান শাসন নয়, তুর্কি-মুঘলের শাসনও তেমন মুসলিম শাসন ছিল না বা তার আগেকার যুগ ছিল না অবিমিশ্র হিন্দু যুগ। মধ্যযুগে মুসলমান মাত্রেই শাসক ছিল না, আপামর মুসলিমরা হিন্দু প্রজাদের মতোই নিঃস্ব ছিল। আজও আছে। ধর্ম নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থই নির্ধারণ করে রাজনীতি এবং শাসক-বিদ্রোহী উভয়েই জাগতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতেই ধর্মের জিগির তোলে। শেখাতে হবে ভারত কোনও কালেই শুধু হিন্দুর দেশ ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অহিন্দুর অবদান, অংশীদারি ও উত্তরাধিকার হিন্দুর চেয়ে একচুলও কম নয়।

❐

www.pathagar.com

# অভিমত

**আবদুল হামিদ কাসেমী**
সম্পাদক, মাসিক তালীম
মগরাহাট দঃ ২৪ পরগণা

বিশ্ব সভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভের পিছনে যাদের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ তুলনা রহিত, আজ তাদেরকে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। তাদেরকে দেশ থেকে সমূলে উৎখাত করতে দেশব্যাপী এক ষড়যন্ত্রের নিশ্ছিদ্র জাল বিছানো হয়েছে উহা ভারতীয় কৃষ্টি, কালচার এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে যেমন চরম লজ্জাকর তেমন ভয়াবহও বটে।

এ হেন চক্রান্তের পিছনে যাদের কালো হাত কাজ করছে, যাদের মন-মগজ ও অর্থ সহায়তা করছে, তাদের স্বরূপ চিহ্নিত এবং মুখোশ উন্মোচন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা অজ্ঞতা ও মূর্খতা মানব সমাজের পক্ষে এক অভিশাপ। অপপ্রচারে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিভ্রান্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই প্রয়োজন আছে মূল সত্যের বহুল প্রচার। এই মহান দায়িত্বভার গ্রহণে অনেককেই অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়েছি। আনন্দ এবং ধন্যবাদের কথা অনুজ-প্রতিম দুআবরেষু ভাই আহমদ আলী মোল্লা এই গুরু দায়িত্ব পালনে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির ছক ও নক্‌শা তৈরীতে আমার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। মুদ্রিত কপিও সময়মত দেখেছি। নতুন লেখক, নতুন প্রেস ও কর্মচারী, তাই গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়তো হয়নি। কিন্তু মূল বিষয়বস্তু পাঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘ দিনের ভুল ধারণা অপনোদিত হবে। সত্যের আলোক রশ্মিতে মন-মগজ উদ্‌ভাসিত হবে। এহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আজকের ভারতবর্ষে যে অনৈক্যের ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সুর শোনা যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ হলো সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যর্থতা। সাহিত্য আকাদেমি, ললিতকলা আকাদেমি, জাতীয় সংহতি পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র অক্ষুণ্ন রেখে ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী সমূহের ঐক্যবোধ সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে। জাতীয় সাহিত্য এবং ইতিহাস রচনায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দুষ্ট মনোভাবকে বিদূরীত করতে হবে। এই সুর ও স্বর ধ্বনিত হয়েছে "ভারত তুমি কার ?" নামীয় বক্ষমান গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

www.pathagar.com

ভারতকে নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর্যরা বলছে ভারত কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব, আর সবাই বিদেশী। অতএব ভারতের কোন অংশে অনার্যদের কারো অধিকার নেই। এই দাবীর সপক্ষে তারা যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করছেন তা যে নেহাতই বালখিলা, অসার, তার প্রমাণ বক্ষমান গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছে। তাই নামকরণ অনেকের কাছে আজগুবি বলে প্রতীয়মান হলেও বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও জনতা আমাদের আওয়াজকে সমর্থন জানাবেন এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়।

এ গ্রন্থ আরো কয়েক খণ্ডে সমাপ্তি লাভ করবে। ইহা একটি সূচী মাত্র। অতএব আগ্রহী পাঠক একটু প্রতীক্ষা করুন।

সর্বশেষে অনুরোধ, "নিরপেক্ষ জনতার আদালতে ভারত তুমি কার ?" আসামীর কাঠগড়ায় সমুপস্থিত। জানি না জনতার রায়ে তার যাবৎ জীবন কারাদণ্ড হবে, না বেকসুর খালাসের ছাড়পত্র পেয়ে বছর না ঘুরতেই পুনঃমুদ্রিত হয়ে বাংলা-আসামের ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে।

উপযুক্ত "ভুল-ত্রুটি" প্রমাণসহ প্রকাশকের ঠিকানায় প্রেরণ করতঃ ভারতকে ভালবাসার পরাকাষ্ট প্রমাণিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলীম। আমীন।

www.pathagar.com

# মুখবন্ধ

ডঃ ওসমান গনী

ভারত সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত অমরশিল্পী আল-বেরুণী (আবু রায়হান্ মুহম্মদ বিন্ আহম্মদ আল্ বেরুণী)। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর অমর তুলিকাতে ভারতের অচিন্তীয় অপরূপ চিত্রটি তুলে ধরেছেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও ভারতের জ্ঞান-জগতে, গ্রন্থ-জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ, মহাকালের স্পর্শ আজও যাকে মলিন করতে পারেনি, তার নাম 'কেতাবুল হিন্দ'–অর্থাৎ ভারত-গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার স্বর্গত মাষ্টার মশাই ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—'এই ভারতে আজিও এই গ্রন্থের কোন তুলনা নেই।' আমার জীবনের অদ্বিতীয় মাষ্টার মশাই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যাচার্য সুকুমার সেন মশাইও এই সেদিন মাত্র (৬-৮-৮৮) কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন—'ভারত সম্পর্কে আজও এই গ্রন্থের কোন বিকল্প গ্রন্থ রচিত হয়নি।

এখানে এই গ্রন্থটির আনন্দ ও গর্বভরে নামোল্লেখ করার মূল কারণ হচ্ছে, আমি এখানে আজ ভারত সম্পর্কে অন্য একটি গ্রন্থের কথা বলছি, এটিও চমৎকার বই; এবং এই গ্রন্থটির আলোচনার পূর্বে বা প্রসঙ্গে 'কেতাবুল হিন্দের' কথা উল্লেখ করাটা একান্ত দরকার। আজকে আমার আলোচ্য গ্রন্থ—'ভারত তুমি কার ?'

ভারতের বর্তমান ও অতীতের অধিবাসী, ভারতের ভাবী জনগণ বা উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে 'ভারত তুমি কার' বইটির নামকরণ হতেই একটি জিনিস স্পষ্টাক্ষরে পাঠক-চিত্তে ভেসে আসে। তা বিশাল দেশ ভারত সম্পর্কে। তবু ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাসে, ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে, মালিক বা উত্তরাধিকারের ইতিহাসে কোথায় যেন সত্য-নির্ণয়ের গরমিল ঘটেছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক সত্যের অবমাননা ঘটেছে বা ঘটছে। সত্য অনুধাবনের ও তার যথাযথ অনুশীলনের অভাব ঘটেছে, অর্থাৎ সত্য যেন বিকৃত রূপ লাভ করেছে। এখানে ভারতের ইতিহাসের সত্য-সূর্য আজ যেন মিথ্যা ভাষ্য মেঘের জালে একেবারেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সত্য নির্ণয়ে লেখক যে পরিশ্রম করেছেন, যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নজীরবিহীন।

ইংরেজের লেখা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস মুসলমানদের সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি কষ্ট-কল্পিত বিকৃত ইতিহাসই নয়, বরং এর অন্তরালে আছে

www.pathagar.com

—একটি মহান জাতি ও একটি সুবিশাল দেশকে খণ্ড খণ্ড করার ছন্নছাড়া করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও যাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ অমুসলমান ঐতিহাসিকগণই মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাকালে ঐ মন্ত্রে মোহাভিভূত হয়ে সুচতুর ইংরাজের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার বনে গেছেন। ফলে বেধে গেছে হিন্দু-মুসলমানে ভুল বুঝাবুঝি ও দারুণ অশান্তি। পূর্ণ হয়েছে ইংরাজদের আশা, ফলিত হয়েছে তাদের কুচক্র, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মহামানবের মহান ভারত।

সুতরাং বিপুল জনগণের ভারত, ঋষি-মনিষীর ভারত, তপোবনের ভারত, শান্তির ধারক, সত্যের বাহক ভারত, শত শত সূফী-অলি-আওলিয়া, কামেল-দরবেশের ভারত, এই ভারতের সত্য ইতিহাসকে যাঁরা চিনতে ও জানতে চান সেই সমস্ত সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার একান্ত আবেদন তাঁরা যেন একটিবার 'ভারত তুমি কার' এই অপূর্ব গ্রন্থটিতে চোখ বুলিয়ে নেন। বিশ্ব-মনীষা আলবেরুণীর 'ভারত-গ্রন্থ' যেমন তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ মহাকালের কোলে একটি অক্ষয় অমূল্য গ্রন্থ। অনুরূপভাবে জনাব আহমদ আলী সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা ১২০০ সনের আগেকার রাজবংশগুলোর ওপর হিন্দুত্ব আরোপ করেন।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সিন্ধু সভ্যতার পর্যালোচনায় সর্বক্ষণ এমন একটা ভান করা হয়, যেন ওই সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার একা ভারতের—হিন্দু ভারতের, পাকিস্তানের নয়। অথচ এই সভ্যতা যেসব স্থানে সবচেয়ে বিকশিত হয়েছিল, সেগুলি সবই আজকের পাকিস্তানে। পাঠ্যপুস্তক পড়লে আরও মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কোনও সংঘাত-বিরোধ ছিল না। মুনি ঋষিরা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে জপতপ করতেন, ছাত্ররা গুরুগৃহে বেদ পাঠ করতো, চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠরা চতুরাশ্রম অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, দানে-ধ্যানে নিস্তরঙ নিরুপদ্রব দিন গড়িয়ে চলতো। তুর্কিরা এসেই সব গোলমাল করে দিল। কিন্তু প্রাচীন যুগের এমন স্বর্ণময় ছবি তুলে ধরার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হল, সেগুলি কোনটাই সমসাময়িক জীবনের বাস্তব আলেখ্য নয়, বরং জীবন যাপনের আদর্শ কী হওয়া উচিত, রক্ষণশীল সমাজপতিদের কলমে তারই প্রস্তাবনা। আচরণে তাত্ত্বিক সূত্র এবং বক্ষমান সমাজ জীবন কোন যুগেই অভিন্ন হতে পারে না, 'হিন্দু যুগেও' ছিল না।

পাঠ্য বইয়ে যে ধারণাই প্রচার করা হোক, আধ্যাত্মিকতায় ভারত বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় মোটেই অগ্রণী ছিল না। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা যথেষ্ট ভোগীও ছিলেন। বস্তুতঃ 'হিন্দু' ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুষ্ঠানসর্বস্বতা এবং

www.pathagar.com

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান, আর তার পরধাপহারী ক্ষয়িষ্ণু ঔপচারিতার বিরুদ্ধেই ছিল চার্বাকদের জেহাদ। বৌদ্ধদের কাছ থেকেই ভারতবাসী আয়ত্ত করে অহিংসা, ত্যাগ, সন্ন্যাস ও সহিষ্ণুতার ধারণা। আজ ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ নেই। থাকলে হিন্দু যুগের মতো প্রাচীন ভারতে একটি বৌদ্ধ যুগের অস্তিত্বের ধারণাও আজ জনপ্রিয় হত। সে ক্ষেত্রে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আটশো বছরের ইতিহাসকে অনায়াসে বৌদ্ধযুগ আখ্যা দেওয়া যেত। বৌদ্ধ ও জৈনদের মতো চার্বাকরাও ধারাবাহিকভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বিব্রত করে গেছেন। তাঁরাই প্রাচ্যের বাস্তববাদী সত্যজ্ঞানের প্রবক্তা। তাই ইউরোপে যাজকদের হাতে কোপার্নিকাস-জিওর্দানো ব্রুনোগালিলেওরা যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, এ দেশে চার্বাকদের সঙ্গে সমাজপতিরা ঠিক একই আচরণ করেছিল। চার্বাকপন্থীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঐতিহ্য এ দেশে সুপ্রাচীন। তাঁদের লোকায়ত দর্শনের সমস্ত পুঁথিপত্র সুপরিকল্পিত ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা কিন্তু বৌদ্ধ-জৈন আজীবিক চার্বাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উত্থান ও বিকাশকে অখণ্ড ও সর্বগ্রাসী এক কল্পিত 'হিন্দু সংস্কৃতির' সমুদ্রে কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী ঝঞ্ঝাবাতের চেয়ে বেশি মূল্য দেননি, কারণ 'হিন্দু ভারতের' ছকে এ ধর্মান্দোলনগুলোকে খাপ খাওয়ানো যায়নি।

পাঠ্যপুস্তকে মধ্যযুগের ইতিহাসের শুরুতেই কাফেরের রক্তাপ্লুত তরবারি হাতে আরবী ঘোড় সওয়ারের ঝটিকা প্রবেশ। অথচ অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করে ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়, সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও গণ-প্রতিরোধও একেবারেই দেখা যায়নি। কারণ সে সময় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয় এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজপুত প্রভুদের হয়ে লড়ার কোনও প্রেরণা জনগণের মধ্যে জাগেনি। জাগার কথাও নয়। তুর্কিদের চেহারা, লোকাচার, সংস্কৃতি বা শাসন পদ্ধতির মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর বা দানবীয় কিছু ছিল না, যা হিন্দুস্তানের জনগণ ইতিপূর্বেই রাজপুতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি। শুধু বহিরাগত বিধর্মী বলেই তুর্কিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে, এমন কোনও কুসংস্কার ত্রয়োদশ শতকে ছিল না। থাকলে রাজপুতদেরই কি এখানকার ভূমিপুত্ররা মেনে নিতেন ? কিংবা তারও আগে বর্বর আর্য উপজাতীয়দের ? তুর্কিদের চেয়ে তারা তো কম বহিরাগত ছিল না, কিংবা কম বিধর্মী ? কয়েক শতাব্দী আগে তারাও তো তুর্কিদের ভূখণ্ড থেকেই এদেশে ঢুকেছিল ? আসলে বইয়ে যাই লেখা হোক, তদানীন্তন জনসাধারণ তুর্কি আধিপত্যকে বিদেশী আগ্রাসন ভেবে নেয়নি। গণপ্রতিরোধও তাই দেখা দেয়নি।

www.pathagar.com

তাছাড়া, হিন্দু শাসকদের আনুগত্যের অঙ্গীকার ছাড়া মুসলিমদের পক্ষে খায়বার গিরিপথের এপারে থেকে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহও যে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি, তার কারণ সুলতানকে একটা নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব সময়মত দিয়ে গেলে হিন্দু রাজা রাণা জায়গীরদারদের কাউকেই উচ্ছেদ না করার নীতি সব তুর্কি-মুঘল শাসকই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। পরবর্তীকালে রাজপুত, মারাঠা বা শিখ রাজাদের কেউ কেউ যখন বাদশাহদের কাছ থেকে ঘা খেতে শুরু করলেন, ততদিনে মুসলিমরা আর বহিরাগত নয় হিন্দুদের মতোই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সমান অংশীদার। তখন হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ আর বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ নেই বরং হয়ে পড়েছে নিজের হৃত রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়ার সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত, এমনকি ব্যক্তিগত লড়াই।

হিন্দুদের গণ-ধর্মান্তরের ধারণাটি সাধারণ্যে যতই ছড়িয়ে দেওয়া হোক, মধ্যযুগের রাষ্ট্র কখনো ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেনি, বহু নিন্দিত ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রেও এ রকম প্রমাণ নেই। তুলনায় সম্রাট অশোকের কথা ভাবুন। সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে রাজধর্মে আকৃষ্ট করতে তিনি কী না করেছেন ? বস্তুত গণ-ধর্মান্তরে তাঁর সর্বাত্মক প্রয়াসের জন্যই ইতিহাসকাররা অশোককে মহামতী বলেছেন। আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছ থেকেই ধার করেছে অহিংসার প্রতীক।

পাঠ্যপুস্তকে সুলতান মাহমুদ এবং আওরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে হিন্দু বিদ্বেষের প্রমাণ বলে প্রচার করা হয়। অথচ মাহমুদের লক্ষ্য ছিল নিছক ধন লুণ্ঠন। আজকের মতো সেদিনও মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, তার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হত পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীদের রত্নভাণ্ডার। খবরটা কেউ মাহমুদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকবে আওরঙ্গজেবের কোপদৃষ্টি পড়েছিল শত্রু পক্ষের এলাকার মন্দিরের ওপর। আসলে সেগুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দেবার্চনার আধ্যাত্মিক প্রচ্ছদের আড়ালে সেখানে রচিত হত নিতান্ত জাগতিক ষড়যন্ত্রের নীল নক্‌শা। তাই বোধহয় বাদশাহের ফৌজ সেগুলো গুঁড়িয়ে দিলে নৈষ্টিক হিন্দুদের মনেও কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। পাশাপাশি, বহু হিন্দু মন্দিরে দরাজ হাতে ভূমি ও অর্থ দান করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। তাছাড়া, তাঁর মন্দির বিনাশ যদি বিধর্মীর হিন্দু বিদ্বেষ হয়, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষের মন্দির ধ্বংসকে তাহলে কী বলা যাবে ? একাদশ শতকে হর্ষ, 'দেবোৎপাটননায়ক' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারীর নিয়োগ করেছিলেন, যাদের সরকারী দায়িত্বই ছিল মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস।

www.pathagar.com

একইভাবে দ্বাদশ শতকে পারমারের হিন্দু রাজা সুভাতবর্মণ গুজরাত আক্রমণ করে দাভয় ও কাম্বে এলাকায় অসংখ্য জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। আর গোটা 'হিন্দুযুগ' ব্যাপী লিঙ্গায়েৎ ও বীরশৈব সম্প্রদায়গুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মঠ পুঁথি ধ্বংস করে গেছেন। পাঠ্যবইগুলি এদের ব্যাপারে নীরব কেন ? সনাতন ভারতের পরধর্মসহিষ্ণুতার ফানুসটি ফেঁসে যাবার ভয়ে ? একই কথা প্রযোজ্য জিজিয়া কর সম্পর্কে, যা অ-মুসলিমদের দিতে হত। কিন্তু একইভাবে মুসলিমদেরও দিতে হত 'যাকাত'। তাছাড়া জিজিয়া শুধু তুর্কি-মুঘলরাই চাপায়নি। চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্যে 'হিন্দু' জামেরিন রাজারা তাঁদের ইহুদী প্রজাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন। 'মুসলিম' যুগে জিজিয়ার আওতা থেকে রেহাই ছিল নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, প্রতিবন্ধী ও সৈন্যদের। এসব কথা কেন ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় না ? মোল্লার 'ভারত তুমি কার' গ্রন্থটিও ভারতের মানুষের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে, উত্থান-পতনের আবর্তনে ও মহাকালের বিবর্তনে একটি অসাধারণ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

মানুষ যে দেশের জলবায়ুতে গড়ে উঠে, যে দেশের আবহাওয়া ও প্রকৃত জগৎ থেকে তার মানব প্রকৃতি লালিত পালিত, যে দেশ তার পূর্বপুরুষের পুণ্যভূমি, সে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানা ও তা ভাবী বংশধরদের জানান প্রতিটি দেশবাসীর মহান দায়িত্ব। আমি আশা করব 'ভারত তুমি কার' এ গ্রন্থ পাঠে দেশের প্রতিটি আত্মসচেতন মানুষের দ্বারা দেশমাতার বুকে কৃত্রিম মিথ্যার জাল ছিন্ন করে অকৃত্রিম মিলনের মহান দায়িত্ব পালিত হোক, বিশাল ভারত সম্পর্কে সত্য ইতিহাস উদ্ধার হোক, মিথ্যার অবসান ঘটুক, সত্য জয়ী হোক, লেখকের অপরিমিত শ্রম সার্থক হোক, আগত অনাগত কালের অগণিত পাঠক-পাঠিকার চিত্ত ও মন উদ্ভাসিত হোক সত্যের আলোকে ও অনুসন্ধানে।

'একম্ সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' ... ঋক্‌বেদ

মানুষ আপন ধর্ম যথাযথভাবে পালন করলে সাম্প্রদায়িকতা বাধতে পারে না, ভুল বুঝাবুঝির ও মিথ্যার অবসান হয়।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ○

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

– কোরায়ান সূরা কা'ফেরূন ঃ ১০৯ ঃ ৬

www.pathagar.com

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

"বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১

**ড. ওসমান গনী**
এম এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট
অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
০১-১২-১৯৯৮

www.pathagar.com

# ভারত তুমি কার ? (প্রথম খণ্ড)
## গ্রন্থে "আমার কথা"
### আহমদ আলী মোল্লা ঃ এম, এ

আমার এই 'গ্রন্থখানি' লেখার প্রেরণা পেয়েছি কয়েকজন সুসাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সাংবাদিকের লেখা থেকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়, ঐতিহাসিক রমিলা থাপার, বিপন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে, এম আবিদ হোসেন এবং সাংবাদিক সাগরময় ঘোষ, কুলদীপ নায়ার প্রভৃতি মনীষীগণ। ১৯৬৮ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পঠিত প্রবন্ধের অংশে রমীলা থাপার বলেছেন, "গত একশত বছরে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার জন্যে দায়ী ভারতের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি।" অন্নদাশংকর রায় 'শুভোদয়' নামক পুস্তকে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল হল ঃ দ্রাবিড়, আর্য ও ইসলামী সংস্কৃতি। অথচ ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে বাংলার সর্ববহুল প্রচারিত পত্রিকা 'পরিবর্তন'-এআরএসএস প্রসঙ্গে দুটি প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িকরা যেভাবে ভারতকে কেবলমাত্র আর্যদের বা আর্যদর্শনে বিশ্বাসীদের দেশ বলে দাবি করেছে, তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে, উত্তর ভারতে শিখসহ অন্যান্য দুর্বল জাতি গোষ্ঠী ও মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে এবং সেই অশুভ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে প্রতিবাদ করেই চলেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু-মুসলিম, অগণিত সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদসহ আরো অনেকেই। প্রতিবাদ করছেন কংগ্রেস, সিপিএম ও সিপিআই সহ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই প্রতিবাদমূলক লেখাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। আরএসএস কেবলমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিংসা-বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছেন যার ভয়াবহ পরিণতিতে ভারতের অবস্থা উগ্র আর্যত্ববাদের পূজারী হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান জাতির ধ্বংসের ন্যায় হতে পারে বলে সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকায় তাঁর জোরালো প্রতিবাদও কয়েকবার করেছেন। তাই বিশাল ভারত রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল লক্ষ হলো সংখ্যাগুরু নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের নিকট আবেদন তাঁরা যেন সংখ্যালঘু মুসলমানসহ সকল দুর্বল জাতিবর্গের বেদনাকে উপলব্ধি করে দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন।

একদিকে সংখ্যালঘু কমিশনের রায় হল, ১৯৮৪ সালেই ভারতীয় মুসলমানরা অন্যান্য ভাইদের তুলনায় দশগুণ পিছিয়ে পড়েছে। পিছিয়ে আছে আদিবাসীসহ দুর্বল জাতি গোষ্ঠীর আরো বহু মানুষ। সংখ্যালঘুদের প্রতি 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' এর ন্যায় জান ও মালের নিরাপত্তাহীনতার ভয়ের উপর আবার ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর যে কায়দায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গভীরভাবে চিন্তিত। আর এগুলি হচ্ছে এক ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীবর্গের দ্বারাই।

দেশে জাতি বিদ্বেষ বজায় থাকলে অমঙ্গল যে সামগ্রিক জাতীয় পর্যায়ে এসে যাবে সে বিষয়ে সতর্ক করে বিশ্ব কবি আমাদের সাবধান করে বলে গেছেন—

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তাই হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইছায়ী সকলকে একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, হিংসার দ্বারা কোন মহৎ কার্যসিদ্ধ হয় না। একই ভৌগলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী সকল মানবগোষ্ঠী ঐক্য ছাড়া কোন দেশের অস্তিত্ব ও প্রগতি সম্ভব নয়।

❐

www.pathagar.com

# কয়েকটি মন্তব্য

(১)

"ভারত ইসলামের কাহিনী, এক প্রাচীন সভ্যতাকে নতুন এক সামরিক শক্তির বোকা বানানোর কাহিনী বা শেষাক্তের প্রথমাক্তকে গলাধঃকরণ করে পরিপাক করার কাহিনীও নয়। এটাকে বলা যায়, পারস্পারিক সহাবস্থান ও সমঝোতার একটা সুদীর্ঘ পদ্ধতি, যার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে শত্রুতা ও সংঘর্ষের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অধ্যায়গুলি।" 'Essays in Understanding' বই-এ পণ্ডিত, কুটনীতিক, কে. আর. নারায়ণ। (এটি ভারত সরকারের প্রকাশন) পৃ. ৭৩।

(২)

Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilisations, so vast and so strongly developed yet so radically dissimilar as the Mohammadan and Hindu, meeting and mingling togather. The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their culture and their religions make the history of their impact peculiarly instructive. "বহু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সভ্যতাদ্বয়ের মিলন এত ব্যাপক এবং উন্নতভাবে ঘটেছে, যা পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসে স্বচক্ষে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পার্থক্যগুলির মধ্যে এই সমন্বয়ের প্রভাব ইতিহাসকে অদ্ভুত শিক্ষাপ্রদ করে তুলেছে।" 'An advance History of India' (Three doctors).

(৩)

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কট্টর হিন্দুরূপে পরিচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা উদ্ধৃত করে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, "অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার ... অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে

www.pathagar.com

মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরেজ গ্রন্থকারের এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। ... মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। হর্ম শিল্পে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী সংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে, মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহাঋণগ্রস্ত।"

শুভাশীষ গুপ্ত যুব মানস শারদীয়া সংখ্যা ১৯৯৩ সালে "ভারতের মধ্যযুগের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন" নামক পুস্তকে লিখেছেন, "গজনীর সুলতান মামুদকে হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনকারী বলে চিহ্নিত করা হলেও, পারস্যের নব জাগরণের অন্যতম প্রতিনিধির মর্যাদাতেই তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের বসবাসের জন্য এক আবাসকেন্দ্র করেছিলেন।"

তাঁরই প্রবন্ধের অন্য স্থানে লিখেছেন, "একথা ঠিক যে ভারতের মত বিশাল বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশে এবং শত শত বছর ধরে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বের পটভূমিতে বিদেশাগত ইসলামী রাজত্ব তাঁদের কর্তৃত্ব রক্ষা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্তরেও নানা কূটনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম ছিল হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হস্তক্ষেপ না করা।" অন্য একস্থানে লিখেছেন, "আওরঙ্গজেব ১৬৬৪ সালে ফর্মানজারি করে তাঁর রাজত্বে সতীদাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন।" আজকের "হিন্দু কোড বিল"-এর অগ্রদূত "জাভাবিট-ই আলমগিরি" "আওরঙ্গজেবের আমলেই সূত্রপাত করা হয়। তিনি সারাদেশ থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের সমবেত করে মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলোর অপসারণ করে হিন্দুদের জন্য ধর্মীয় সামাজিক নিয়ম চালু করার উদ্যোগ নেন।"

(৫)

'মুসলিমরা এদেশে প্রারম্ভ হতে গোঁড়ামীর উর্ধে অবস্থান করে রাজত্ব করেছিলেন। যা হিন্দু ও মুসলিম উভয়ে মিলে পরিচালিত করতেন।"–শ্রী রাম স্বামীনাথন

(৬)

সাধারণের বিশ্বাস এবং স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে লিখিত হয়ে থাকে যে আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষের এবং সংকীর্ণ নীতির জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

পতন হয়েছিল, কিন্তু একথা সত্য যে, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ সম্রাট আকবরের সময়েই উপ্ত হয়েছিল। সম্রাট শাজাহানের বিরাট সাম্রাজ্য বিলাস-বিষে ও নানা অনাচারে অন্তঃশূন্য হয়ে পড়েছিল। আওরঙ্গজেব এই সমস্ত দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি কারো সন্তোষ অসন্তোষের কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেননি। তাঁর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছিল বলেই ভারতে ইসলাম এবং জাতি হিসেবে মুসলমান এখানে বেঁচে আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী আদর্শ চরিত্র কোন ব্যক্তি আর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেননি। এটাই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ। (Stanly Lane Pool's Aurangjeb)

(৭)

"পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে আমরা লাভ করেছি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ফলে অসংখ্য মুসলমান ভারত ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু বহু মুসলমান ভাই নিজেদের দেশের মাটি বলে ভারতের মাটি আঁকড়ে রয়ে গেছেন। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এসব সংকীর্ণতাগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে এদের কি আজ আবার বিভ্রান্ত করবো ? তারা কি ভারতীয় হয়ে উঠতে পারবেন না ? আর একটা প্রশ্ন এসবকে কেন্দ্র করে যেসব জাতীয়তাবাদী মুসলমান আমাদের সুখে-দুঃখে রাজনীতি ও সমাজনীতিতে সর্বত্রই আমাদের পাশে থেকেছেন ও আছেন তাদের অবদান কি আজ উপেক্ষার চোখে দেখবো ? এসব প্রশ্ন অতীতের ভুলের দায় নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের উপর চাপিয়ে দেবো কিনা এটা আজ ভেবে দেখার প্রয়োজন এসেছে।"–শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজ, পত্রিকা, ১৯৯৩।

## সমন্বয়ের কথা

(৮)

"এটাও লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানরাই প্রথমে সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেন। ইসলামের উদার মানবতাই তাঁদের সমন্বয়ের প্রথম অনুপ্রেরণা ছিল।" বিষয়টি আরো একটু গভীরভাবে বিচার্য। আবু রাইহান আলবেরুণী সমকালীন 'হিন্দু' সভ্যতার এবং সংস্কৃতির যে সুবিস্তৃত এবং তথ্যপূর্ণ বিবরণ রচনা করেন, তাতে এই সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি কোথাও, কখনওই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিংবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কোন অসঙ্গত এবং কোন খারাপ কথা লেখেননি। রমেশ মজুমদার পর্যন্ত আলবিরুণীর

www.pathagar.com

উচ্চ প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। বিদেশী হয়েও আলবিরুণী সংস্কৃত চর্চা করতেন। তাঁর কালজয়ী রচনার সঙ্গে যদি বিখ্যাত "উপযোগীবাদী" জেমস্ মিল রচিত ভারতের ইতিহাসের তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, তিনি যখন জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন, কট্টর সাম্রাজ্যবাদী জেমস্ মিল কেবলই কঠোর সমালোচনা করেছেন, নিন্দা করেছেন, ব্যাঙ্গোক্তি করেছেন অথচ প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে মিল এর জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ।"–রমাকান্ত চক্রবর্তী (মধ্যযুগের ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সমন্বয় ভাবনা, যুব মানস, ১৯৯৩ শারদীয় সংখ্যা)।

❐

www.pathagar.com

# ভারত তুমি কার ?

ভারতবর্ষের যে সকল মানুষ যুগ যুগ ধরে ভারতকে মাতৃভূমি (Homeland) মনে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে, ভারত তাদের দেশ। যারা দেশকে রক্ষা, গঠন ও উন্নতির সকল রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, ভারত সেই সকল মানব গোষ্ঠীর। তারাই ভারতের নাগরিক।

হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান, শিখ শহীদের রক্তে গড়া ভারতের স্বাধীনতা। ভারতীয় সংবিধানেও সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে ভারত কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও প্রতিরক্ষায় বহু উন্নতি সাধন করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এটা সকল ভারতবাসীর গর্ব। কিন্তু ভারতীয় সমাজ জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র বড়ই করুণ। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে তা বড়ই ক্ষতিকারক। আজ ভারতের বুকে ধর্ম ও গোষ্ঠীগত পার্থক্যের দরুন বাঁচার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে সামান্য সামান্য কারণে সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার বয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মান-ইজ্জত ও জাতীয় একতার ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছে। এমন বহু সংগঠন আছে, যাদের শ্লোগানে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আদিবাসী ও সিডিউলকাস্টের লোকদের ধর্মের স্বাধীনতাটুকু এবং উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধাগুলি সহ্য করতে রাজি নয়। এইরূপ সংগঠনসমূহ শক্তি ও পুষ্টিতে ক্রমবর্ধমান। সংবাদে প্রকাশ, স্বাধীনতার পর সাতচল্লিশ বছরে তেইশ হাজার এইরূপ সংঘর্ষ ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কেবলমাত্র ১৯৮৩ সালে আসামের হাঙ্গামায় প্রায় দু হাজার মুসলিমের মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্যদের সংখ্যাও কম নয় ১৯৮৪ সালের বোম্বাই-এর একটি দাঙ্গায় মুসলিমদের প্রায় দুই শত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। অপরদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টগুলিও মুসলিমদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলিম জনসংখ্যা ১৫% চাকুরীর ক্ষেত্রে ২.৫%। একদিকে পোলাও কোর্মার ছড়াছড়ি, অপরদিকে মুসলিমদের ক্ষেত্রে খালি দস্তরখান।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং-এর ভাষায় "ভারতের সকল মানুষের সমান অধিকার (সংবিধানে লিখিত), তবে অগ্রগামী ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগলাভের বিশেষভাবে সমান অধিকার।"

www.pathagar.com

যাঁরা আর্যদর্শন ও সংস্কৃতিকে ভারতীয়ত্বের মাপকাঠি বলে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, তাঁদের নিকট আজ সকল ভারতীয়দের একটি মাত্র প্রশ্ন "ভারত তুমি কার—?" "সংখ্যালঘু আর্যগোষ্ঠী সংখ্যা গরিষ্ঠের অন্যান্য গোষ্ঠী অর্থাৎ যারা ভারতের মূল মালিক, সেই দ্রাবিড়, অস্ট্রিক সহ ছয়টি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা আদিতে আর্যদের বহু পূর্ব থেকে ভারতে বসবাস করে আসছে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটি বড়ই বেদনাদায়ক এবং হাস্যকরও বটে। তাই আসুন ইতিহাস ও বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যাক, এ হুমকির গভীরতা কতটুকু। সত্যিকার দৃষ্টিতে "ভারত তুমি কার—?"

## আর্যদের সাথে ভারতের মূল অধিবাসীদের সংঘর্ষের চিত্রাবলী ও জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সহ আর্যগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক লোকেরা ভারতের সকল শ্রেণীর নিরপেক্ষ, বাস্তববাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু জনসাধারণকে যে আর্যদর্শনে বা আর্য স্বর্ণ যুগে উল্টো দৌড় দিতে আহ্বান করছেন, সেই আর্য যুগের সমাজচিত্র উদঘাটন করে 'জাতিভেদ' নামক পুস্তকে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ঋকবেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল পাঠ করিলেই সর্বত্র 'আর্য' এবং 'দস্যু' এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রকর্তা ঋষিরা আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তোমার শুভবর্ণ, বন্দুদিগের সহায় হও, কৃষ্ণবর্ণত্বককে নিঃশেষ কর। ... 'যখন আর্যরা সপ্তনদীর তীরবর্তী এ দেশে পদার্পণ করিলেন, তখন এ দেশের আদিম অধিবাসীগণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন। এই জয়লাভের পর তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। আদিম অধিবাসীগণের কিয়দংশ তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিল, অপরাংশ পর্বত ও অরণ্যাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপরে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা দাসত্ব স্বীকার করিল, তাঁহারা 'দাস' ও যাহারা উপদ্রুপকারী হইয়া দাঁড়াইল তাহারা 'দস্যু' নামে পরিচিত হইল। কিন্তু উভয়ে একজাতির লোক। ইহারাই ভবিষ্যতের শুদ্র!' বর্তমানে উহাদেরকে মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' নামে অভিহিত করেছেন। চলতি ইংরেজীতে যাহাদেরকে আমরা 'সিডিউল ফাস্ট' এবং 'সিডিউল ট্রাইব' বলি।

একদিকে বিদেশী আর্যরা পঞ্চনদের নিকট উপনিবেশন স্থাপন পূর্বক বাহু বলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করে আপনাদের গ্রাম জনপদ প্রভৃতি নির্মাণ

www.pathagar.com

করতে থাকে। অপরদিকে পরাজিত আদিম অধিবাসীগণ পর্বতাদিতে আশ্রয় নিয়ে তাদের উপর উপদ্রব করতে থাকে, ইহাতে আর্যগণের আত্মরক্ষার ভীষণ প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই দেশীয় জনগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের মধ্যকার সাহসী ও সমরকুশল লোক বাছাই করে জনপদকে রক্ষা করার কাজে লাগাল। এরাই ভবিষ্যতের ক্ষত্রিয়। আর যারা পূজা অর্চনা, রাজ্যচালনা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হলো তারা ব্রাহ্মণ। চাষ ও ব্যবসা নিয়ে যারা রইল, তাঁরা হলেন বৈশ্য।"

বৈদিক যুগ থেকে আর্যগোষ্ঠীর শ্রেণীভেদ প্রথার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভারতের বুকে যেখানে কেবলমাত্র প্রাচীন যুগেই তেষট্টিটি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই (হিন্দু) ধর্মীয় সংঘর্ষের ফলে শত শত বছর ধরে কত নির্যাতন ও রক্তক্ষয় হলো। তারই প্রতিবাদে ও নানা বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে যেখানে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে প্রগতির দিকে সেখানে ইংরেজ জাতির ষড়যন্ত্রে আর্য গোষ্ঠীর প্রচারকরা বৃটিশ যুগে জাতিভেদের সমর্থনে সমাজকে কলুষিত করে গেলেন। এ কাজটা আর্যরা অবশ্য সর্বযুগে একই ধারায় করে এসেছে। তারা প্রচার করতে লাগলেন, "পশ্চিমের সমাজভেদের অপেক্ষা ভারতের বর্ণভেদ কল্যাণমূলক।" বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের চিন্তাধারায় জাতিভেদের বহু সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে যেমন মনু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের বাণী থেকে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়, আধুনিক আর্য মনীষীদের চিন্তাধারায় একই কথার পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করা অর্থাৎ শূদ্র চিরকালই শূদ্র থাকুক। দেশের শাসনব্যবস্থা, সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের নেতৃত্ব চিরকাল সমাজের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক। এই হলো বর্তমান আরএসএস সহ উগ্র এবং ক্ষুদ্র এক আর্যগোষ্ঠীর প্রাচীন ও কল্পনাবিলাস স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগের আদর্শ। তাই ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়, "যখনই নিম্নবর্ণের লোকেরা সবাক ও আত্মসচেতন হয়ে উঠবেন, তখনই তাঁরা স্বর্ণযুগের এই প্রতিরূপটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। কারণ এর মূলে আছে বর্ণশ্রম ধর্ম ও উচ্চবর্ণের আধিপত্য। উপজাতিরাও এ ধারণাটি পছন্দ করতে পারে না।"-(১৯৬৮ সালের অক্টোবরে আকাশবাণীতে পঠিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ থেকে।)

www.pathagar.com

## জাতিভেদ প্রথার সমর্থনে

(আর্য মনীষীদের উক্তি)

১. স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "হিন্দুধর্ম তার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি। এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য এর সম্পর্কিত কিছু জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিটি বর্ণক্রমকে কেন্দ্র করে বোনা এবং তাই হচ্ছে এর অনন্যতা। কারণ তা ধর্মের দ্বারা বিধানকৃত।"

–(আমার প্রভু)

২. "শূদ্র যদি কোন দ্রব্য উপার্জন করে, ব্রাহ্মণ অসংকোচে সমুদয় কাড়িয়া লইবেন, কারণ শূদ্রের ধনে অধিকার নাই, সে যাকিছু উপার্জন করিবে সে সমুদয় তাহার প্রভুর।"–(মনু, ৮ম অধ্যায়)

৩. "শূদ্র যদি কৃতীও হয়, তথাপি সে ধন সঞ্চয় করিবে না ; কারণ শূদ্রের হস্তে ধন সঞ্চয় হইলে ব্রাহ্মণ দিগকে ক্লেশ পাইতে হইবে।"

–(মনু, ৮ম অধ্যায়)

৪. "শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত একাসনে বসিতে অভিলাসী হয়, তাহা হইলে তাহার কটিদেশে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে।"–(মনু)

৫. "অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোনো অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিলে তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে, ইহাই মনুর বিধি।"

৬. "হিন্দু ধর্মের মৌলিক নীতি যা নির্ধারণ করে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পদ্ধতি, হিন্দু ধর্মের থেকে আলাদা করে বর্ণাশ্রমকে বুঝা যায় না। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ একই মনোবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

–(যদুনাথ সরকার)

## ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর আর্যজাতির নিষ্ঠুর আক্রমণ পদ্ধতির ধারা

**ক. দৈহিক আক্রমণ ঃ**

১. "ভারতের আদিবাসিদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্রাদি সহ সকল কিছুতে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে চিরতরের ন্যায় উচ্ছেদ করা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বৈদেশিক আর্যরা এই পুরগুলি ধ্বংস করেছিল বলেই তাদের সংগ্রামী দেবতা ইন্দ্র পুরন্দর বা পুর ধ্বংসকারী নামে অভিষিক্ত হয়।

www.pathagar.com

২. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সাথে ঋগ্বেদের বর্ণনা ও প্রার্থনা মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার দিকে বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রবণতা ছিল। এসব কাজে তারা উল্লাস ও গৌরববোধ করত।"-(সুরজিৎ দাসগুপ্তের ভারতবর্ষ ও ইসলাম পৃ. ৯।)

খ. সাংস্কৃতিক আক্রমণ ঃ "বেদপাঠ ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ভারতীয় নাগরিকদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হলো।"

## অনার্যদের জীবন, সংস্কৃতি এবং ধর্মরক্ষার চেষ্টা

আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দ্রাবিড়, অষ্টিক সহ সকল আদিবাসী তাদের নাগরিক বাসস্থানগুলি ত্যাগ করে ভারতের বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি গভীরতর অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে নিজেদের জীবন সংস্কৃতি ধর্ম প্রভৃতি রক্ষা করতে থাকে। তারা ধ্বংসকারী বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্তের দৃষ্টিতে পড়ার ভয়ে আর পুর বা নগর গড়ে তোলেনি।

ভারতের আদিবাসী কারা তা বুঝতে অনেক সহজ হবে, যদি ভারতের ১৯৮১ সালের আদম সুমারি পর্যালোচনা করে দেখি। ঐ সালে ভারতে ৮২৬ ভাষা প্রচলিত দেখা যায়। এগুলির মধ্যে এমন বহু ভাষা আছে, যে সকল ভাষায় মাত্র আট থেকে দশ হাজার মানুষ কথা বলে থাকে। এক লক্ষের মধ্যে কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা প্রায় ৭২০টি। মালদহ জেলায় 'টোডো' বলে যে আদিবাসী আছে তাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। তারাও পৃথিবীর কোন ভাষা বুঝে না। এরা ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে আছে।

## অনার্যদের এতগুলো উপদল হলো কেন ?

আর্যদের অত্যাচারে জীবন রক্ষার তাগিদে অনার্যরা ছিন্নমূল হয়ে সভ্যতার আলো থেকে নিভৃত অন্ধকারে আত্মরক্ষা করল। যে যেদিকে পারলো চলে গেল। অপরদিকে আর্যদের চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বাল্যকালে গুরুর বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষালাভ থেকে শূদ্রদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ থেকে বঞ্চিত রাখার ধর্মীয় বিধান দেওয়া হল।

www.pathagar.com

# আর্য সভ্যতা

উপনিষদের মতানুসারে মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা ভাল অথবা মন্দ কাজের দরুন স্বর্গ অথবা নরকে পৌঁছায়। অর্থাৎ কিছুদিন আস্বাদনের পর আবার পৃথিবীতে নতুন জন্ম নেয়। হয় মানুষ অথবা পশুরূপে। আর এই পদ্ধতি বার বার চলতেই থাকে। এভাবে বারে বারে আসতে আসতে যখন সে স্রষ্টার সম্পর্কে উপলব্ধি পূর্ণ যোগ্যতার স্তরে পৌঁছায় তখন সে মুক্তিলাভ করে। তখন থেকে তাকে আর এই কর্ম সংসারে আসতে হয় না। উপনিষদের এই দার্শনিক চিন্তাকে বেদান্ত বলা হয়। এই সকল বৈদিক ধর্মচিন্তার চরম উন্নতি ষষ্ঠ খৃ. পূর্বে সংঘটিত হয়। শূদ্রদের মধ্যে এ সকল জ্ঞানচর্চাকে ধর্মীয় বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়। উপনিষদের যুগই হল শূদ্রদের ধর্মীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করার যুগ। একথার প্রমাণ দিয়েছেন ১৬ই পৌষ ১৩৯১ আরএসএস পরিচালিত স্বস্তিকা পত্রিকা, লেখক ড. নবকিশোর হাজরা "রাম কথার উৎস সন্ধানে" নামক প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, বৈদিক সাহিত্য এবং মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈদিক সাহিত্যে পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে উৎপত্তি লাভ করে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এপিক সাহিত্য পুরোহিত শ্রেণীর মধ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করলেও তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চারণ কবিদের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

অপরদিকে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে সভানেত্রী দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. রোমিলা থাপার বলেছেন, "রামায়ণ ইতিহাস নয় শুধুই কাব্য। খৃ. পূ. তিনশো অব্দের সময়কালের মানবজীবন এবং সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার ফসল হলো রামায়ণ। এটিকে সু-সাহিত্য ও দর্শন বলে মেনে নেওয়া হলেও ইতিহাস বলে মেনে নেওয়া যায় না। যুগ যুগ ধরে এই রামায়ণ কাহিনীর ব্যাপকভাবে প্রচলন হওয়ায় দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে মূল ঘটনার বিস্তর ফারাক। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় তো নয়ই। ... রামায়ণের দ্বৈত ভূমিকা। যার বাহির বিন্যাসে আছেন মেঘ দেবতা রাম ও কৃষিদেবী সীতা। ... এই রামায়ণের যুগেই কৃষিভিত্তিক সমাজ দৃঢ়তর হয়েছিল। ... রামায়ণের লঙ্কা কখনই বর্তমান শ্রীলঙ্কা হতে পারে না। ... সবদিক দেখে আমার মনে হয়েছে পৌরাণিক লঙ্কা প্রাচীন ইতিহাসের উজ্জয়িনী হতে পারে।"–(সাংবাদিক শ্যামল মুখোপাধ্যায়, যুগান্তর ২৮-১২-৮৩)

www.pathagar.com

## আর্য সভ্যতার অন্যান্য অবদান

১. ক্রমে ক্রমে আর্যগণ সুবিশাল নগর সকল নির্মাণ করতেন। ২. স্বর্ণরৌপ্যাদির অলংকার নির্মাণ করতেন। ৩. যুদ্ধক্ষেত্রে দেহরক্ষার জন্য লৌহ নির্মিত বর্ম পরিধান করতেন। ৪. শর তূনীর প্রভৃতি সংগ্রামিক প্রহরণ সকল প্রস্তুত করতেন। ৫. বাদ্যযন্ত্র সকল নির্মাণ ও ব্যবহার করতেন। ৬. যানবাহন প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। ৭. সূক্ষ্ম গণনানুসারে সময় নির্ধারণ করতেন। ৮. পথিকজনের সুবিধার নিমিত্ত পান্থশালা সকল নির্মাণ করতেন। ৯. নারীগণ অবরোধে না থেকে প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করতেন। ১০. শিবনাথ শাস্ত্রীর জাতিভেদ নামক বই-এর তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া যায় যে, সভ্য সমাজের যে সকল গুরুতর পাপ, তারও নিদর্শন সকল এই যুগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বারাঙ্গানাদিগের দুষ্ক্রিয়ার এবং জারজ সন্তানাদিগের গোপন প্রসূত হওয়ার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। এতকথা থাকা সত্ত্বেও বেদের পুরুষ—সূক্ত নামক একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া ঋগবেদের কুত্রাপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিবরণপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অ-আর্যদের পূর্ণভাবে পরাজিত করার পর যখন থেকে আর্যরা শান্তিপূর্ণসহ অবস্থানের নীতি গ্রহণ করল, তখন তারা অহংকার বশত দস্যুদের অর্থাৎ অ-আর্যদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলো ঃ "This social gradation was given a religious sanction by invoking a verse from the Regveda to the effect that the Brahmins came from the face of the creater, the Kshatriyas from arms, the Vaishyas from his thighs and the Sudra from the sole's of his feet." "সামাজিক এই জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মীয় অনুমোদন দেওয়া হল। ঋগবেদে বলা হল, ব্রাহ্মণ স্রষ্টার মুখ থেকে ক্ষত্রিয় তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্য তাঁর উরু থেকে এবং শূদ্র তাঁর পায়ের তলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।"

খৃ. পূর্ব ১০০০ পর্যন্ত উত্তর ভারতে বৈদিক সংস্কৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন দ্রাবিড় সংস্কৃতি পাশাপাশি চলছিল। তার ঠিক পর থেকে উভয় সংস্কৃতির মিলন ঘটল। তাই ১০০০ খৃ. পূর্বের পর থেকে ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির শুরু বলে চিহ্নিত হলো। এখান থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে একত্রে হিন্দু যুগ বলা হল। অবশ্য বর্তমানকালের ইতিহাস গবেষকরা এভাবে ভাগ করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতার দোষে চিহ্নিত করেছেন।

www.pathagar.com

## "বেদের সাম্যবাদ"

হিন্দু ধর্মের যুগ শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত 'বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ'-এর ১ম খণ্ডে আদি বৈদিক যুগের 'সাম্য' কেমনভাবে বিকৃত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে, তার সুন্দর ব্যাখ্যা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পরিবেশন করেছেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে লিখেছেন, "আদি বেদে 'আমার' 'তোমার' বলে কিছুই ছিল না। সবকিছুই 'আমাদের'।" অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সে যুগে সকল বস্তুর উপর ছিল সকলের সম অধিকার ? কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিছু ধান্দাবাজ মানুষ কিভাবে সু-কৌশলে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সাম্যের বদলে শোষণের রাস্তা কায়েম করেছিল, তার খোলাখুলি বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "প্রথমেই তারা স্থানে স্থানে ঘাঁটি করে তাকে 'আশ্রম' 'মন্দির' ইত্যাদি নাম দিল। তারপর সেই উপাধিধারীদের সেখানে বসিয়ে তাদের দ্বারাই বেদের অপব্যাখ্যা শুরু করল। সেই বিকৃত অর্থ করেই গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করা হল। এভাবে শুরু হল বিকৃত শাস্ত্রের প্রচার।

বেদের সাম্যনীতির উপর দাঁড়িয়ে বেদের বিশ্লেষণ করতে করতে এক একজন এক একদিকে 'অভিজ্ঞ' হয়ে উঠেছিল। সেখানে এই দুশমনরা, তাদের বেদের উপর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সবকিছু ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। জনসাধারণ বুঝতেই পারল না, কত বড় ক্ষতি তাদের হয়ে গেল।

বেদের বিভিন্ন শ্লোক, বিভিন্ন মন্ত্র, বিভিন্ন মূর্তি শিল্প, ভাস্কর্য স্থাপত্যের রূপকে যদি আমরা তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব, তাদের রচনা ও পরিকল্পনার পেছনে বেদজ্ঞ ঋষিদের দূরদর্শিতা ও তৎকালীন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাই কাজ করেছে। তাঁরা যাকিছু বলেছেন, যাকিছু লিখেছেন, যাকিছু করেছেন—সবকিছু তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই করেছেন। যেমন ধর, বেদের অনেক শ্লোকই সূর্য, বরুণ, পবন, বসুমতী প্রভৃতির রূপ গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে এরাই জাতির ও জীবনের উন্নতির মূল। সুতরাং নিজের হিত যদি চাও, তবে এদের শরণাপন্ন হও। কেন এরা একথা বললেন ? তখন দেশ কৃষিপ্রধান ছিল। আলো, বাতাস, জল, মাটি কৃষির প্রধান উপায়। সুতরাং এ বস্তুগুলোর স্মরণ নাও, ক্ষেত্রের যত্ন নাও। সেচের উন্নতি কর। আলো বাতাসকে যথাযথ কাজে লাগাও। তবে কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে, দেশ ধনধান্যে ভরে উঠবে, কোন অভাব থাকবে না। বেদে অনুগ্রহের সময় পঞ্চদেবতাকে স্মরণ করে আচমন করার যে বিধি দেওয়া হয়েছে, তার পেছনেও এই পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ,

www.pathagar.com

মরুৎ ব্যোম—যাদের বিভিন্ন রূপের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের খাদ্যদ্রব্য, বস্তু ইত্যাদি পাচ্ছি, তাদেরই স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। এভাবে প্রতিটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করে দেখবে—সেখানে ভগবান বলেও কিছু বলা হয়নি। দেবদেবী বলেও কিছু বলা হয়নি। বরং তাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ভবিষ্যৎ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

## পুরাণে হযরত মুহাম্মদ স.

ভবিষ্যৎ পুরাণ লিখছে ঃ ঠিক সেই সময় আরব দেশের মরুভূমি অঞ্চলে মুহাম্মদ স. নামক এক ব্যক্তি 'ম্লেচ্ছ' (বিধর্মী) পুরোহিত পরিবেষ্টনের মধ্যে শিষ্য ও সহচরসহ আবির্ভূত হবেন। অতপর তিনি ভুজরাজ হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে গঙ্গাজল পঞ্চগব্য ও চন্দনাদি অর্ঘবস্তু দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করে বলবেন—হে মরুভূমির প্রভু, মহাদেব, (দেবতা শ্রেষ্ঠ) হে মরুবাসী গিরিজানাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের সমস্ত পাপ মোচন করার বহু উপায় জান, তুমিই প্রেমের ধর্মপ্রবর্তক। তুমি ম্লেচ্ছগণ (অধর্মচারী) কর্তৃক গুপ্ত ধনবৎ সযত্নে রক্ষিত। আমি তোমার শরণাগত। তোমাকে নমস্কার।

–(ভবিষ্যত পুরাণ)

বিষ্ণু পুরাণে তাঁহার পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত বিষ্ণেষু বিষ্ণু দাস বা আবদুল্লাহ, সুমত্যা বা আমেনা 'নিরাপদস্থল' বলে বর্ণিত রয়েছে।

## উগ্র আর্য জাতির সংস্কৃতির আক্রমণে সবাই দিশেহারা

"ভারতবর্ষ ও ইসলাম" গ্রন্থে সুরজিত দাশগুপ্ত লিখেছেন, "রামচন্দ্রের কাছে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সমান হওয়ার জন্যে নিম্নবর্ণের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে, তেমনই বুদ্ধদেবের কাছে আর্য সমাজের বহু বিচারই ঘোর নিন্দার যোগ্য বিষয় বলে মনে হয়েছে।" তিনি আরো লিখেছেন, "প্রথম পর্বে মুখ্যতঃ আক্রমণকারী ও আগ্রাসী হিসেবে ভারতবর্ষে এসে বৈদিক আর্যরা যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিচার, ধারণা ও সংস্কার প্রচলন করেছিল, সে সবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য ও দর্শন একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ এবং একটা পর্যায়ে সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে। কিন্তু বৈদিক আর্যরা এক সময় যে কৌশলে প্রাচীনতম তথা অনার্য ধর্ম সংস্কৃতিতে গ্রাস করেছিল সেই কৌশলেই আস্তে আস্তে বিদ্রোহের থেকে উদ্ভূত মনোভঙ্গি এবং তার ধর্ম সংস্কৃতিকে গ্রাস করে।"

www.pathagar.com

(ভারতের পূর্বাঞ্চলে আর্যদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বৌদ্ধদের নালন্দা, সোমপুর, ময়নামতি প্রভৃতি মহাবিহারগুলো প্রাচীর ও পরিখা খনন করে সুরক্ষিত করতে হয়েছিল। মুসলমানরা এদেশে আসার আগে থেকে স্বদেশী আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে ধর্মস্থান, মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রাচীর বেষ্টিত করতে হয়েছিল। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা পররাজ্য জয় করার সময় বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে ধন-সম্পদ লুট করত। বৈদিক যুগ থেকে মুসলিম যুগ পর্যন্ত আর্য ধর্মের পাশাপাশি অপর যে কোন ধর্মমতকে ও তাদের ধর্ম সংস্কৃতিকে যে কৌশলে আর্যরা গ্রাস করে এসেছে আজ তারা ভারতীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অপরাপর ধর্মের উপর একই কৌশল অবলম্বন করে চলেছে তার প্রমাণ তাদের লিখিত বই-পত্র, পত্র-পত্রিকা এবং আক্রমণের সেই সু-প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়।

অন্নদাশংকরের ভাষায় ভারত দ্রাবিড়, আর্য ও ইসলামী সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। আজ হাজার হাজার মনীষীর কথায় তা সমানভাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও উগ্র ও ক্ষুদ্র এক আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন যে, একমাত্র আর্যদর্শনে বিশ্বাসী হলেই সেই ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী হবে।)

এই সর্বনাশা মনোভাবের হাত থেকে মুক্তি না পেলে দ্রাবিড় মিশ্র রাজ পুত জাতি, অনুন্নত আদিবাসীসমূহ, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শীয়ান, জৈন এবং মুসলিমসহ অপরাপর সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাবোধ করতে পারে কিনা ; পাঠক সমাজের কাছে বিচার প্রার্থনা করছি।

## বৌদ্ধ ও জৈন যুগ

(৬০০ খ্রীঃ পূ. ২০০ খ্রীঃ পূ.)

আর্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ করে বৈদিক ধর্মের Rigid Caste System এর অত্যাচারে ষষ্ঠ খ্রীঃ পূর্বে ৬৩টি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি হয় (কল্যাণ চৌধুরী "ভারতের ইতিবৃত্ত কথা" পৃঃ ২৪) তার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ছাড়া আর্যগোষ্ঠীর কৌশলগত মোকাবিলায় অন্যান্যরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এটা আর্যদের সর্বগ্রাসী মনোভাবের পরিণত ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এই যুগটি ভারতের ইতিহাসে হিন্দু বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন এই তিন ধর্মের সংঘর্ষের যুগ হয়ে দাঁড়াল। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা এই যুগকে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় ইতিহাসের আরম্ভের যুগ

www.pathagar.com

বলেছেন। "This period marks the beginning of Indian history in the proper sense of the word." এই যুগের ভারতের ইতিহাসের উপাদান বা তথ্য সংগ্রহের একটি সূত্র হলো গ্রীকদের লেখা। কারণ ৩২৬ বা ৩২৭ খ্রীঃ পূর্বে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করে। এই যুগে গ্রীকরা ভারতীয়দের কাছে যবন এবং বিদেশী বলে চিহ্নিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তারা হিন্দু সমাজে মিশে গিয়ে ক্ষত্রিয় নামে চিহ্নিত হয়। গ্রীকদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ হয়েও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।-(কল্যাণ চৌধুরী)

তারপর এল স্কাইথিয়ানরা (Scythians) তারা শক নামে পরিচিত ও তারা ৯০ খ্রীঃ পূঃ যুগে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ থেকে মথুরা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলো। শকদের নামানুসারে শকাব্দ গণনা শুরু হয় ৭৮ খ্রীঃ পূঃ থেকে। পরে তারা পল্লবদের সাথে মিশে গেল। পল্লবদের মাতৃভূমি ছিল ইরান। তারা কুষানদের কাছে রাজ্য হারাল। কুষানদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন কনিষ্ক। ৭৮ খ্রীঃ পূর্বে কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল। কনিষ্কের একশত বছর পূর্বে খরভেলা (Kharvela) (জৈন) এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করল। মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর সাতবাহানা (Satavahanas) নামে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল যা চারশত বছর চলল। এই আট শত বছর তিন ধর্মের সংঘর্ষের মধ্যে কাটল। বৈদিক হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলল। ভারতে সংস্কৃতির এলাকা আলাদা হওয়ার দিকে চাকা গড়াতে লাগল। যার ফলে বেদের থেকে ভারতের বেশীর ভাগ মানুষ দূরে সরে গেল। কারণ ঃ The caste system had become so rigit that the lower classes of Hindu society were completely cut off from the higher classes and higher culture. So much so that they were forbiden to read the Vedas. শ্রেণীভেদ প্রথা সমাজে এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল যার ফলে নিম্নশ্রেণীর মানুষের উচ্চশ্রেণীর লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তার উপর নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বেদ পড়া নিষিদ্ধ করা হলো।

## প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্রের টুকিটাকি

শূদ্ররা আজও মন্দিরে প্রবেশ বা প্রত্যেকেই পূজার কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিত। তাছাড়া সামাজিক মর্যাদায় তারা আজও পদদলিত।

**ঐতিহাসিক ইবনে খলদুনের লেখা থেকে জানা যায় ঃ**

১. দক্ষিণ ভারতের আর্য সমাজে এক একজন নারীর একই সঙ্গে চার/পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলাই ছিল সামাজিক রীতি, বরং তা করতে অনিচ্ছুক যুবতীকে সামাজিক শাস্তিও ভোগ করতে হত।

www.pathagar.com

২. যদি কোন স্ত্রীর তাঁর স্বামীর ঔরসে কোন সন্তান না জন্মাতো তাহলে অন্য পুরুষের সঙ্গ নিয়ে সন্তান ধারণ করাটাও কোনো দোষের ছিল না। বরং তা ধর্মীয় বিধানরূপে গণ্য হত। বৈদিক স্বর্ণযুগের কথা বাদ দিলেও ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত আর্য সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অংশ না থাকা প্রভৃতি চালু ছিল। এ সকল আইন বা প্রথা যদি স্বর্ণযুগের উন্নত আদর্শের বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ইসলামী যুগকে অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করা কি নিহাত সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কি বলা যাবে।

ভারতে ইসলাম ধর্ম আগমনের প্রথমদিন থেকেই এ দেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কু-প্রথা সকল পরিবর্তনের সূচনা করে। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ ভারতের নিম্নবর্ণের নারীদের উর্ধাঙ্গ আবরণের প্রথা প্রবর্তন। ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কাল পর্যন্ত কেরালা অঞ্চলে নিম্নবর্ণের নারীদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখতে হত। এককালে কেরালাতে অমুকের স্ত্রী বা মেয়ে ইসলাম নিয়েছে বলার দরকারই হতো না, তার বদলে শুধু 'কুপ্' 'পায়ামিডুক' শব্দটি ব্যবহার করা হতো, ঐ শব্দটির অর্থ হলো, "গায়ে জামা চড়িয়েছে"। সুরজিৎবাবু লিখেছেন, অপমান সূচক বা হীনতা দ্যোতক এ রকম বহু আচার প্রথা ইসলামের প্রভাবে কেরালার সমাজ থেকে দূরীভূত হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দাস প্রথাও বহুল পরিমাণে কমে যায়। মালাবার অঞ্চলে পারিয়াদের বিরাট অংশ সামাজিক নির্যাতন থেকে বাঁচার তাগিদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" (মধ্যযুগ)-এর ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বাংলাদেশে বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 'ধর্ম পূজা বিধান' নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।"

যদুনাথ সরকার তাঁর বাংলার ইতিহাসে লিখেছেন, "... পূর্ব বাংলার এইসব অঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে পর্যন্ত যত অধিবাসী সবাই জাতিতে ছিল মঙ্গোলীয়, ধর্মে ভূত, পিশাচ পূজারী এবং অনেক উপভাষায় কথা বলতো তাঁরা, যার ছিল না কোনো লিখিত সাহিত্য এবং যা ছিল গৌড়, বরেন্দ্র ও রাঢ়ের শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে বিদেশী। ... পূর্ব বাংলার জনসাধারণ দল বেঁধে অতি সহজেই ভূত পূজা ছেড়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের

www.pathagar.com

মৌলিক নীতি বর্ণ প্রথা যা নির্ধারণ করে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পদ্ধতি। হিন্দু ধর্মের থেকে আলাদা করে বর্ণাশ্রমকে বুঝা যায় না। কারণ হিন্দু ধর্মই নৈতিকতা ও করণীয়সহ বর্ণের ব্যবস্থা করেছে এবং সমগ্র প্রথায় নৈতিক অর্থদান করেছে। উপনিষদের দর্শনকে সাধারণভাবে বলা হয় বেদ, যার অন্তর্বাণী হল বেদ জ্ঞানের শেষ দিগন্ত সংস্থাপন করে। কোন বর্ণ সম্পর্কে প্রথম লিখিত উল্লেখ দেখা যায় ঋগ্বেবেদে, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

সর্বশেষ দশম শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায় চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের কথা। ভাগবত গীতার ধর্মীয় পরাকাষ্ঠাসহ মহাভারত ও রামায়ণ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে —প্রত্যেক নরনারীর প্রয়োজনে নিজ বর্ণধর্মের অনুসরণের নির্দেশ। মহাভারতের এক উপচ্ছেদে বিভিন্ন বর্ণোৎপত্তির নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাসহ চার বর্ণের রং ও ক্রমিক মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে।

ভগবত গীতায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শোনা যায়, "গুণাবলীর ও কর্মের বিভিন্ন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে চারটি বর্ণ আমার থেকেই উৎপন্ন। জেনে রাখ, আমিই তাদের স্রষ্টা।"

বাংলার বৌদ্ধদের মতো দক্ষিণ ভারতের জৈনরা রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে আট হাজার জৈনকে শূলে হত্যা করার কথা তামিল পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। রামানুজের মত অদ্বৈতবাদের পূজারীকেও শ্রীরঙ্গম ছেড়ে কুড়ি বছরকাল পালিয়ে থাকতে হয়েছিল। ঐ সকল অন্ধ আর্যত্ববাদীদের ভয়ে। বাংলায় বল্লাল সেন কুলীন প্রথা চালু করে হিন্দু সমাজের স্তর বিন্যাসকে আরো বিস্তার লাভ করান। ঐ সময়ে আর্য বন্ধুরা বৌদ্ধদেরকে নেড়ে বলে ডাকত।

নানা রকম ছুতো ধরে ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের লোকদের উপর কত রকমের কর ধার্য করত তার কোন নিয়ম পর্যন্ত ছিল না। সদ্য বিবাহিত নিম্নবর্ণের নারীগণের সতীত্ব পরীক্ষা করার অজুহাতে বা অন্য যে কোন কারণেই হউক ব্রাহ্মণদের হাতে তাদের তুলে দেবার রীতি পর্যন্ত সমাজে চালু রাখা হয়েছিল। আরো কত কি ? যেমন—প্রাচীন ভারতের বিবাহ পদ্ধতি সকল অনুসন্ধান করলে সে যুগের সমাজ চিত্রে বহুরকম নিন্দনীয় রীতির সন্ধান পাওয়া যাবে।

নমুনা স্বরূপ একটি মাত্র বই-এর নাম উল্লেখ করছি, ড. অতুল সুরের লেখা "ভারতে বিবাহের ইতিহাস" পুস্তকটিতে অতুলবাবু রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে মুনি ঋষিদের বহু নিন্দনীয় ঘটনা উল্লেখ করার সাহস

www.pathagar.com

দেখিয়েছেন। তিনি এই পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন, "হিন্দু সমাজে বহু পত্নী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বহু পতি গ্রহণ প্রথাও চালু ছিল। আর কুলীন প্রথায় ব্রাহ্মণরা তো এক একজন ২০০/৩০০ পর্যন্ত বিবাহ করতেন।" আর্যরা যখন এ দেশে আসেন তখন দেবরের সঙ্গে ভাবীর যৌনসম্পর্ক কেন ছিল সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "তাঁরা (আর্যরা) তাঁদের সঙ্গে খুব কমসংখ্যক মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মেয়েছেলের অভাব বিশেষভাবেই ছিল। এ দেশে আসার পর তাঁরা এ দেশের অধিবাসীদের খুব ঘৃণার চোখে দেখত। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য গোড়ার দিকে তাঁরা এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁরা এ দেশের মেয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালে তাদের মধ্যে বিবাহযোগ্য মেয়ের অভাবের দরুন মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিবাহ করতেন আর অন্য ভ্রাতারা ভাবীর সাথেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। ... বিধবা ভাবীর উপর দেবরের এই যৌন অধিকার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পরেও অবিকৃত থাকার দরুন ঋগ্বেবেদে বিধবা বিবাহের কোনো উল্লেখ নেই, যা পরবর্তীকালে গ্রন্থসমূহে দেখতে পাওয়া যায়".... "তুমি উঠে পড়, যে দেবৃ (দেবর) তোমার হাত ধরছে তুমি তাঁরই স্ত্রী হয়ে তার সঙ্গে বসবাস করো।" ইত্যাদি। ঋগ্বেবেদের এক স্তোত্রে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন বধূকে দেবৃ-র (দেবর) প্রিয়া ও অনুরাগের পাত্রী করে তোলেন।"

## ইসলামিক সংস্কৃতি

ইসলামের কালেমা বিশ্বে যে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করেছে বা ইসলামী সংস্কৃতি নামে অভিহিত যার শ্রেণী বিভাগ হলো ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. Spiritual | Revolution | আধ্যাত্মিক | বিপ্লব |
| ২. Moral | ,, | নৈতিক | ,, |
| ৩. Intellectual | ,, | জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত | ,, |
| ৪. Social | ,, | সামাজিক | ,, |
| ৫. Political | ,, | রাজনৈতিক | ,, |
| ৬. Economic | ,, | অর্থনৈতিক | ,, |
| ৭. Cultural | ,, | সাংস্কৃতিক | ,, |

www.pathagar.com

কুরআন শরীফে মোট আয়াত (বাক্যের) সংখ্যা ৬৬৬৬টি যা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. প্রতিশ্রুতির | আয়াত | ১০০০ |
| ২. শাসনের | ,, | ,, |
| ৩. আদেশের | ,, | ,, |
| ৪. নিষেধের | ,, | ,, |
| ৫. উদাহরণের | ,, | ,, |
| ৬. নবী কাহিনীর | ,, | ,, |
| ৭. হালাল ও হারামের | ,, | ৫০০ |
| ৮. দোয়ার | ,, | ১০০ |
| ৯. মনসুখ বা রহিতকৃত | ,, | ৬৬ |

নবী কাহিনীগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ প্রাচীন যুগের মানবজাতি সকল যারা নবীদের স্বীকার করেছিল তারা কিভাবে পৃথিবীতে কৃতকার্য হয়েছিল এবং যারা তাঁদের অমান্য করেছিল তারা ধ্বংস হয়েছে সেই শিক্ষাদান করেছেন অনাগত মানবদের জন্য।

আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি সাহায্য (অলৌকিক শক্তি) পাওয়া প্রত্যেক মানুষের একান্ত কাম্য। সে শক্তি অর্জনের মূল হাতিয়ার হলো আল্লাহর হুকুমের অধীনে চলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হালাল পথে সংগ্রহ করা। কুরআনে বর্ণিত, "ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধকে জীবনের সাথী করে নেয়া। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রার্থনা করা। বান্দা আল্লাহর নিকট সাহায্য না চাইলেও তিনি রাগান্বিত হন সে কথাও মনে রাখা।

মুসলমানরা কুরআনের বাণীসমূহ বহন করে ভারতবাসীদেরকে মুক্তির মন্ত্রে আহ্বান জানায়। সে মুক্তির মূলকথা হল পার্থিব প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পরও জাহান্নামের আগুন থেকে মানুষ বেঁচে যাক। ইসলামিক কালচার অন্যান্য কালচার থেকে উপকরণ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নয়, তবে যে সকল কালচারের মূল সুর ধর্মভাবশূন্যতা (Godless) ইসলামিক কালচার তা বর্জন করে চলতে চায়। সংস্কার, সংরক্ষণ, সমন্বয় ও সংযোজন হল এই কালচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কর্মজীবনের জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে কুণ্ঠিত নয় কিন্তু ধর্ম জীবনের সে কুরআন ও হাদীস ছাড়া কারো কাছে আপোষ করতে পারে না। ধর্মের ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো তুমিও থাকো, আমিও থাকি। সহাবস্থানের নীতি ইসলামের মূলনীতি যা মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে স্থির করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

# সুলতান মাহমুদ

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এঁর ইন্তেকালের (৬৩২ খ্রীঃ) তের বছরের মাথায় ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবিয়ানরা ইরান জয় করেন। ঐ সাম্রাজ্য কাবুল ও জাবুলের পশ্চিমসীমা পর্যন্ত এগিয়ে আনেন (হিট্টি) (The Arabs 1948 page 50) ক্রমে ক্রমে আরব খলীফাদের হাতে আফগানিস্তানের শাসন চলতে থাকে। ৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত তুর্কীদের হাতে আফগানিস্তানের হিন্দু শাসন সমাপ্ত হয়।

পরবর্তী দশম শতাব্দী ইসলামী খিলাফতের দ্বন্দ্ব ও পতনের যুগ। খিলাফত ত্রিধা বিভক্ত। স্পেনে উমায়্যা, মিশরে ফাতেমীয় খিলাফত ও সর্বাপেক্ষা দুর্বল বাগদাদের খলীফা। পারস্য অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্বিপ্লবের কারণে রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার দুই বন্ধ। এই যুগ সন্ধিক্ষণে দশম শতাব্দীর শেষে ছিন্ন ভিন্ন পারস্য সাম্রাজ্য যাঁর যাদুমন্ত্রে একত্র হয় এবং অখ্যাত গজনী নগর প্রাচ্যের শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর নাম সুলতান মাহমুদ। একতা সূত্রে গ্রথিত হয়ে মুসলমানরা আবার নতুন রাজ্য জয়ে বের হয়ে পড়ে। ইতিহাসে এই বংশের নাম হয় গজনভী বংশ। এই সময় থেকে ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক হয়ে যায়। আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংসের পরে প্রাচ্যে এতবড় সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হয়নি। ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "দিগ্বীজয়ী হিসেবে মাহমুদ আলেকজাণ্ডার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (Gibbon VI 241p) পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কিস্তান ও উঃ পঃ ভারতের খণ্ড রাজ্যগুলিকে নিয়ে তিনি বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন গজনী সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা। সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রাজা জয়পালের (রাজপুত) সঙ্গে তাঁর এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে জয়পাল তাঁর দূতদেরকে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবুক্তগীন ও তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান।

এই পরাজয়ের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা দখল করেছেন তার মধ্যে শ্রীবাস্তব মহাশয়ের উল্লেখিত কিছু যুক্তি তুলে ধরছি ঃ

১. রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা তাদের কায়স্থ ও শূদ্র প্রভুদের বিরুদ্ধাচর করেছিলেন।

২. ঐ সময় ভারত অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমিকতার কোন রকম অবস্থা বিদ্যমান ছিল না।

৩. সুলতান মাহমুদ ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রচুর নৈতিক সমর্থনও পেয়েছিলেন। অন্তর্বিদ্রোহে ভারতীয় রাজারা পরস্পরকে ধ্বংস করার তালে ছিল।

www.pathagar.com

৪. অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী থাকা সত্ত্বেও নৈতিক চরিত্র এত নিম্নস্তরে চলে গিয়েছিল শ্রীবাস্তব মহাশয় "The Sultanate of Delhi এর ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন Every important temple had a number of unmarried Girls dedicated to the service of the deity. This bred corruption and temple Prostitution became common. যৌন পাপ মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ হয়ে পড়ে।

৫. বিপক্ষে তুর্কি, আরব, আফগান সৈন্যের সঙ্গে বহু হিন্দু সেনাকেও মাহমুদ ভারত আক্রমণে সঙ্গে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬. সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ইসলামের প্রভাবে আরবিয়ানরা মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল, উজবেক ও তুর্কি জাতিকে জয় করে চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর বংশের মত আরবদের অপেক্ষা শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতিদের সঙ্গে পেয়েছিল, ফলে অল্পদিনের মধ্যে পনেরশো শতাব্দীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য জয় করে দু'শ বছর শাসনে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যে জাতি সিরিয়াকে এক বছরে (৬৩৫ খ্রীঃ) যুদ্ধ না করে ইরাককে (৬৩৭ খ্রীঃ) সমগ্র পারস্য সম্রাজ্যকে পাঁচ বছরের মধ্যে এবং ৬৩৯-৭০৯ এর মধ্যে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা, ব্যাবিলন ও আলেকজান্দ্রিয়া এক বছরে (৭১১ খ্রীঃ) জেনারেল মূসার অধীনে জাবালুল তারিখ (৭১১ খ্রীঃ) স্পেনের রাজধানী রোডারিক এবং কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্স জয় করতে সমর্থ হয়, সে জাতিকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা ভারতীয়দের ছিল না।"

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "ইতিহাসে মাহমুদের স্থান নির্ধারণ করা কঠিন নহে। সমসাময়িক মুসলমানরা তাঁহাকে গাজী ও ইসলামের নেতা বলিয়া জানিতেন। হিন্দুরা অদ্যাপি তাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, আদি হুন এবং মন্দির ও মূর্তি ভগ্নকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সে যুগের বিশেষ অবস্থার খবর রাখেন, তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে মাহমুদ একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক, ন্যায় পরায়ণ ভূপতি, সাহসী ও প্রতিভাশালী সেনাপতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার মতে তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতিদের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হওয়ার যোগ্য।"

মার্শম্যান সাহেব বলেন, "মাহমুদ কেবল সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বীজয়ী নহেন, সর্বপ্রধান নরপতিও বটে। আরব সাগর, পারস্যোপসাগর ও কুর্দিস্তানের পর্বতমালা হইতে শতদ্রুর তীর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বিশাল ভূভাগে যেরূপ শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল, তাহাই তাঁহার শাসন

www.pathagar.com

প্রতিভার পর্যাপ্ত প্রমাণ। এশিয়ায় তাঁহার দরবারই সর্বাপেক্ষা অড়ম্বরময় ছিল, বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতায় কখনও কোন রাজ্য তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এশিয়ার অপর কোন রাজার দরবারে কখন এত অধিক প্রতিভাশালী বিদ্বান ব্যক্তি সমবেত হন নাই।"

পারসী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিও তাঁহারই অভূতপূর্ব উৎসাহের ফল।

শুভাশীষ গুপ্ত যুব মানস শারদীয় সংখ্যা ১৯৯৩ সালে "ভারতের মধ্যযুগ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন নামক পুস্তকে লিখেছেন, "গজনীর সুলতান মাহমুদকে হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনকারী বলে চিহ্নিত করা হলেও, পারস্যের নবজাগরণের অন্যতম প্রতিনিধির মর্যাদাতেই তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের বসবাসের জন্য এক আবাস কেন্দ্র করেছিলেন।"

## আলবেরুনীর চোখে একাদশ শতাব্দীর ভারত চিত্র

একাদশ শতাব্দীতে ভারতের সমাজ চিত্র জানতে গেলে আরবিয়ান পণ্ডিত আলবেরুনীর লেখার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। প্রফেসর সাকাও-এর মতে আলবেরুনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। (Al Beruni was the greatest intellect that ever lived on this earth) তিনি ১০২৯ খ্রীঃ ভারতে এসেছিলেন, ভারত সম্পর্কে তার লিখিত পুস্তকের নাম হলো 'কিতাবুল হিন্দ'। ভারত সম্পর্কে তিনি যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দ্বারা একটা ছবি তুলে ধরলাম ঃ

হিন্দু জাতি ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বাক্য বিরোধ ছাড়া দৈহিক বিবাদ বিসম্বাদ না করলেও তাঁদের যত গোঁড়ামী ও আক্রোশ সমস্ত হলো বিদেশীদের উপর। তাঁরা বিদেশীগণকে ম্লেচ্ছ বা অপবিত্র বলে জ্ঞান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরের কথা, তাদের সঙ্গে খাওয়া, বসা বা পান করা পর্যন্ত ঘৃণা করেন। আমাদের সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারেও এতদূর পার্থক্য বর্তমান যে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়ে ভয় দেখান। এ সমস্ত ছাড়া আর একটি মস্তবড় কারণ তাদের জাতীয় জীবনে দাম্ভিকতা। যদিও এ রহস্যের মতই শুনাবে তবুও তাঁদের জাতীয় জীবনে দৃঢ় শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বেশ সু-পরিস্ফুট। আমরা শুধু বলতে পারি যে, এ নির্বুদ্ধিতার কোন ওষুধ নেই। হিন্দুরা মনে করেন তাঁদের দেশের মত কোন দেশ নেই, তাদের মত কোন লোক নেই, তাঁদের রাজার মত রাজা নেই,

www.pathagar.com

তাঁদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নেই। তাঁরা উদ্ধত, দাম্ভিক এবং অহংকারী। তাঁরা স্বভাবতই অন্যদের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞাত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ, এমনকি নিজেদের মধ্যেও এক সমাজ অন্য সমাজকে নিজেদের বিষয় জানতে দিতে অনিচ্ছুক। বিদেশী বিজাতির সম্বন্ধে তো কোন কথাই নেই। তাঁদের ধারণা সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁরা ছাড়া আর কেউ বিজ্ঞান জানেন না।

যদি আপনি তাঁদেরকে খোরাসান ও পারস্যের বিজ্ঞান আলোচনার বা তথাকার সুধীবর্গের কোন কথা বলেন, তাহলে তাঁরা আপনাকে জলজ্যান্ত মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। যদি তাঁদের দেশ বিদেশে ভ্রমণ এবং অন্য লোকের সঙ্গে মেশবার অভ্যাস থাকত তাহলে তাঁরা এমন সংকীর্ণমনা হতেন না বরং তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মত উদার হতেন।" ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কিঞ্চিত হলো, "ভারতীয় সমস্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিই কাব্যে লিখিত ছিল। প্রথমে আমি তাদের জ্যোতির্বিদ্যার ছাত্র হিসেবেই অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলাম। তাঁদের কায়দা-কানুনগুলো আয়ত্ত হবার পর আমি তাঁদের এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির কথা বলতে শুরু করি এবং যুক্তি-তর্কসহ অঙ্কের সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কতদূর উন্নত করা যেতে পারে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এতে তাঁরা বিশেষ অভিভূত এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সবাই আমাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, আমি কোন্ হিন্দু পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করেছি। যখন তারা জানতে পারলেন যে, আমি কোনো হিন্দু পণ্ডিতের নিকট এ সমস্ত শিক্ষা করিনি, তখন তাঁরা আমাকে যাদুকর বলে মনে করতে লাগলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে লোকটি একটি সমুদ্র বিশেষ।

এ হলো ভারতের অবস্থা। তবে আমি বিষয়টি শিক্ষার জন্যে কোনরূপ পরিশ্রম স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হইনি। যে রকমভাবে যেখানে পাওয়া যাক না কেন, এই সমস্ত বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি এবং সেগুলি বুঝিয়ে দেবার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে পণ্ডিতদের আশ্রয় নিয়েছি। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সততার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে সাধারণে প্রচলিত কু-সংস্কারগুলো জড়িয়ে নিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে তুলেছেন। আমি তাঁদের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাকে এক সঙ্গে মুক্তা এবং গোবর, বহুমূল্য প্রস্তর এবং সাধারণ পাথরের সংমিশ্রণ মনে করি। এ সবই তাঁদের চোখে সমান, কেননা বৈজ্ঞানিক সততাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে সাধারণের মধ্যেকার ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিবার মত সৎসাহস তাঁদের কারোর নেই।"

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'কানুনে মাসউদী' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে জোতির্বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়ে ত্রিকোণমিতিকে উচ্চস্তরে উন্নিত করার মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি তার প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে, এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিজ্ঞানচর্চাকারী দেশ হিসেবে পূর্ব পারস্যের দাবীই অগ্রগণ্য। ইনি ইসলামের গণতন্ত্রের সঙ্গে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা, মুসলমানদের সুষ্ঠ বৈবাহিক নিয়ম কানুনের সঙ্গে হিন্দুদের বিবাহে বর্বর প্রথা, মুসলমানদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে হিন্দুদের নোংরামী প্রভৃতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের বিশেষত আরবদের কু-প্রথা ও অন্যায় কার্যগুলিকে আক্রমণ করতে পিছপা হননি। আলবিরুনীর মতে পারস্যের কাছ থেকে চীন এবং ভারত আদিতে বিজ্ঞানচর্চা করতে শিখেছে। আর ভারতীয় আর্যরা ইরানে বহুদিন বসবাস করে এবং ঋগবেদের চর্চাও তাঁরা সেখানে শুরু করে।

## হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগ

"এটা লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানরাই প্রথমে সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেন। ইসলামের উদার মানবতাই তাঁদের সমন্বয়ের প্রথম অনুপ্রেরণা ছিল।" বিষয়টি আরও একটু গভীরভাবে বিচার্য। আবু রাইহান আলবিরুনী সমকালীন 'হিন্দু' সভ্যতার এবং সংস্কৃতির যে সুবিস্তৃত এবং তথ্যপূর্ণ বিবরণ রচনা করেন, তাতে এই সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি কোথাও, কখনওই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিংবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কোন অসঙ্গত কোন খারাপ কথা লেখেননি। রমেশ মজুমদার পর্যন্ত আলবিরুনীর উচ্চ প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। বিদেশী হয়েও আলবিরুনী সংস্কৃত চর্চা করতেন। তাঁর কালজয়ী রচনার সাথে যদি বিখ্যাত "উপযোগীবাদী" জেমস্ মিল রচিত ভারতের ইতিহাসের তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, তিনি যখন জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন, কট্টর সাম্রাজ্যবাদী জেমস্ মিল কেবলই কঠোর সমালোচনা করেছেন, নিন্দা করেছেন, ব্যাঙ্গোক্তি করেছেন অথচ প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে মিল এর জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ।"–রমাকান্ত চক্রবর্তী (মধ্যযুগের ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সমন্বয় ভাবনা, যুব মানস, ১৯৯৩ শারদীয় সংখ্যা)।

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম কথা হল দেশ রক্ষা ও দেশের জাতীয় ঐক্য গঠনের জন্যে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ জান, মাল, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও লিপির ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা। গোটা মুসলিম যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ কি ছিল তা এখন আলোচনা করব। এই বিষয়ের

www.pathagar.com

বর্ণনায় স্পষ্ট দেখতে পাবো, যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে সমাজে সর্বত্র গরমিল সৃষ্টি করে ফেলেছিল, যে কারণে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সেই গরমিলের মাঝে ইসলাম কত অল্প সময়ের মধ্যে, আর কত তলা থেকে শুনাল মিলনের সুর। অবাস্তবকে করল সম্ভব। সবাইকে নিয়ে গঠন করল সর্বভারতীয় ঐক্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিভেদের মাঝে আজি মিলন মহান।" সৃষ্টি হল ধর্মের মূল বিশ্বাস ও আচার আচারণে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পার্থিব ক্ষেত্রে গড়ে উঠলো এক সদ্ভাবের পরিবেশ। একথার প্রমাণ স্বরূপ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঐতিহাসিক বিপন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে লিখিত 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "১৮৫৭-এর বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের শক্তির অন্যতম উৎস ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। ... 'নেতৃত্বের সব স্তরেই হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ছিল সমান সমান' এক প্রবীন বৃটিশ রাজকর্মচারী পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন, "মুসলমানদের যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাব এ ক্ষেত্রে তারও উপায় ছিল না।" বস্তুতপক্ষে ১৮৫৭-র ঘটনাবলী থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগ এবং ১৮৫৭-র আগে ভারতের মানুষ এবং তাদের রাজনীতি আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিল না।" (পৃষ্ঠা ৫৬) গোটা মুসলিম যুগে এমনকি ১৮৫৭-এর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সময়কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তি রাজতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণতান্ত্রিক। কারণ গণতন্ত্রের প্রাণ বলতে সেই সাম্য ও মৈত্রী বুঝায় যার সংকেত কুরআনের মধ্যে রয়েছে, 'জনগণ তোমাদেরকে একই স্ত্রী-পুরুষ থেকে আমি সৃষ্টি করেছি।" ... "তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান, আর মাটি থেকেই আদমের সৃষ্টি।" –(হাদীস,) গণতন্ত্রের প্রাণ কথাটির মর্মমূলে রয়েছে অপরূপ ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি তাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সকল মানুষই ভাই ভাই।" ইসলামের কথা হলো সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর সংসার। "তাই সংসারে সবকিছুর প্রতি যে সমদৃষ্টি রাখে, সদ্ব্যবহার করে সেই জনই তো আল্লাহর সমধিক প্রিয়ভক্ত।"–(হাদীস,) গণতন্ত্রের প্রাণ কথাটির সর্বপ্রকার ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচার যা আপন পর শত্রু মিত্র, দেশী বিদেশীর মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান রচনাকে প্রশ্রয় দেয় না, শত্রুর জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার দাবী জানায়, যেমন তার নিজের জন্যেও সমীচীন বোধ করে। কুরআনের ভাষায়, "কারো প্রতি শত্রুতা, মনোমালিন্য তোমাদের যেন অন্যায় অবিচারে উদ্বুদ্ধ না করে।" গণতন্ত্রের প্রাণ সুপ্ত রয়েছে মত ও চিন্তার স্বাধীনতার

www.pathagar.com

মধ্যে যা ধর্মের ক্ষেও কোনরূপ পীড়ন বা বলপ্রয়োগের নীতি সমর্থন করে না, যার আদর্শ "লা-ইক্‌রাহা ফিদদ্বীন" অর্থাৎ ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।"

–(কুরআন)

অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির শুরু। ইতিমধ্যে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সংস্কৃত থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়ে আরবে পৌঁছে গেছে। অপরদিকে ইসলামী ভাবধারার প্রভাবে ভক্তিবাদের সৃষ্টি হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতে আরব মুসলিমদের প্রভাবে পোশাক, বহুপ্রথা এবং আচার আচরণেরও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। দশম শতাব্দীর শেষের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সংস্কৃতির বহির্ভাগও স্পর্শ করেছে। উভয় সংস্কৃতির মিলন গজনভীদের দ্বারা পাঞ্জাব ও মুলতান জয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই বরং তা সম্ভব হয়েছিল দিল্লী জয়ের পর। উত্তর ভারত মুসলমানদের হাতে আসার প্রথম সূত্রপাত আফগানিস্তানের রাজধানী গজনী জয় থেকে শুরু। ঐ সময় আফগানিস্তান ইরানের অধীনে ছিল। সবুক্তগীন ৯৮৬-৯৮৭ খ্রীঃ প্রথম পাঞ্জাব অধিকার করে। তাঁর পুত্র মোহাম্মদের হাতে গজনভী শাসন ভার এসে যায় পরে তারা পঃ পাঞ্জাব ও পেশোয়ার অঞ্চলে দেড়শ বছর রাজত্ব চালান। ১১৭০ খ্রীঃ মোহাম্মদ ঘোরী গজনী সাম্রাজ্য দখল করে ভারতের দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি এবং তাঁর প্রধান সেনাপতি কুতুবউদ্দিন রাজপুত প্রধানদের (পৃথ্বিরাজ প্রভৃতির) হাত থেকে উত্তর পশ্চিম ভারত দখল করেন। কুতুবউদ্দিন ১২০৬ খ্রীঃ দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীঃ বাবরের দিল্লী জয় পর্যন্ত সময়কালকে সুলতানী যুগ এবং পরবর্তী মুসলিম যুগকে মুঘল যুগ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। ৬৪৭ খ্রীঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পাঁচশত বছর পর সুলতান কুতুবউদ্দিনের হাতে সর্বপ্রথম এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ঐতিহাসিকদের ভাষায়, 'India now had a fair degree of political unity.' "অর্থাৎ এখন থেকে ভারত সুন্দর এক রাজনৈতিক একতায় উন্নিত হল।" এখন অবশিষ্ট পৃথিবীর নিঃসঙ্গতার অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করল। শ্রীবাস্তব মহাশয়ের ভাষায়, "For want of contact with the rest of the world our outlook had become narrow and culture was stereotyped and the spirit of Progress was taken out of the People.—"অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তাঁদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও মামুলী পর্যায়ে নামে, ঐ অবস্থায় তাঁদের মধ্যে প্রগতির উৎসাহ প্রায় উবে গিয়েছিল।"

www.pathagar.com

এখন নতুন শাসক সম্প্রদায় বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাতৃভূমির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে ভারতকে মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একতা ও সামগ্রিক প্রগতির জন্যে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

এর পূর্বে গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি যে সকল জাতি ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, ভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে, কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, Their Culture was primitive and no modic. অর্থাৎ তাদের সাংস্কৃতিক ছিল প্রাথমিক যুগের এবং যাযাবরীয়। কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষ্টি-কালচার মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকদের মত হলো, "They were representatives of an adanced international Culture. অর্থাৎ মুসলমানরা এক উন্নত এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি। যা হোক আরব দুনিয়ার খলীফাদের অধীনে থেকে সুলতানরা অনেকেই ভারতে রাজত্ব চালিয়েছেন।

ফলস্বরূপ অন্য যে কোন মুসলিম দেশের ন্যায় ভারতেও তাঁরা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। They made dynastic monarcy limited by the Shariah and giving its non-Muslim subjectsreligious and Cultural freedom but slightly fewer political right.

প্রথমে তারা শরীয়তের গণ্ডী মেনে রাজকীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং অমুসলিম প্রজাদেরকে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দানসহ সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক অধিকার দান করলেন। ফলে সরকারী পদগুলিতে তাঁদেরও বেশ কিছু প্রবেশাধিকার এসে গেল।

ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়, সেখানে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের অনুমতি আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে এমন রাষ্ট্র গঠন করা যায়। ভারতীয় সুলতানদেরকে ঐ দু রকমের ব্যবস্থায় শাসন করতে দেখা যায়। গোটা মুসলিম যুগে ভারতে অমুসলিমদের জন্য যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল, যেমন সম্পত্তিলাভ, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার ও মান-মর্যাদা প্রভৃতি তার ফলাফল ভারতীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের পাতায় পাতায় ছড়ান আছে, খুঁজে ঢুঁড়ে দেখলে এবং বুঝতে চেষ্টা করলে আমাদের চিন্তাধারা অনেকটা পরিষ্কার হতে বাধ্য। ধর্মীয় ব্যাপারে ভারত রাষ্ট্র Multi religious state-এর সর্বপ্রকার সুবিধালাভ মুসলিম যুগের অন্যতম অবদান ছিল।

www.pathagar.com

তাই সুরজিৎ দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, "মুসলমানরা যদি সত্যিই এক হাতে কুরআন ও অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামত তাহলে ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্ন মাত্র থাকতো না।–(পড়ুন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম' মুহম্মদ তাহের)।

## দিল্লীর সুলতানরা কি অবস্থার মধ্যে জাতীয় একতার জন্যে কাজ করেছেন ?

ত্রিয়দ্বশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে প্রাচ্য দেশীয় ইসলামী জগতের দুর্দশা ও অসংহতির মোকাবিলা করতে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সুলতানগণ সমগ্র ভারতকে সংহত করতে প্রচেষ্টা চালান। এ সময় (১০৯৫-১২৯১) ইসলাম জগতের উপর ইউরোপীয় ক্রুশেডের আক্রমণের ধাক্কা, অপরদিকে আব্বাসী খলীফাদের অধঃপতন মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ফলে No rallying point was left for the cultural forces of Islam. দিল্লী সুলতানের উত্থান এরূপ এক দুর্যোগ মুহূর্তে ঘটেছিল একথা ভুললে চলবে না। তাছাড়া মঙ্গল আক্রমণের ধাক্কা সুলতানদের তো পাগল করে ছেড়েছিল।

একদিক দিয়ে দিল্লীর সুলতানীরাজ মধ্যযুগের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মত ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল বলা যায় না। তারাও বহু ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি থেকে হটে এসে আইন তৈরী করেছেন, যেমন জমির খাজনা $\frac{১}{৫}$ থেকে বাড়িয়ে $\frac{১}{২}$ করা হয়েছিল। খাজনার ক্ষেত্রে নওমুসলিম চাষীদের ৫০% ছাড় দেবার ইসলামী নীতি সুলতানরা প্রবর্তন করেননি, সুদে টাকা ধার করা বা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাহা ইসলামী আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সমাজে তাও চালু ছিল বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে।

অপরদিকে উচ্চশ্রেণীর শাসক হিন্দুদের মধ্যে রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা এতবেশী দলে ও গোত্রে বিভক্ত ও রেষারেষীর মধ্যে ছিল যে, তাদের পরস্পরের সাথে মিলন করা সম্ভব ছিল না।

জাতীয় একতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এই যে, ভারতীয়রা যেমন পূর্বের জাতিগুলোকে ম্লেচ্ছ বলে আলাদা হয়েছিল, মুসলমানদেরকেও সেই 'ম্লেচ্ছ' জাতি বলে তারা দূরে থাকতে চেষ্টা করল। জাতীয় একতা সৃষ্টির প্রশ্নে আর্য ও বৌদ্ধরা শাসক হিসেবে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করে যেভাবে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল, মুসলিম যুগে তার অবসান অবশ্যই ঘটলো। সাত দশকের প্রথমার্ধে

www.pathagar.com

শশাঙ্ক বৌদ্ধ পীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন পর্যটক হিউয়েন সাঙ ও হর্ষচরিত প্রণেতা বানভট্টের। বৌদ্ধ পীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে 'নিঞ্জনের রুম্ব' নামের পদবন্ধে। এতে বিজিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধরা তুর্কি বিজয়কে সধর্মীর মুক্তির সহায় ও ভগবানের আশির্বাদ বলে জেনেছে।

এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারা এগিয়ে চলল চমৎকার একটা মিলনের পথ ধরে।

হিন্দু রাজারা এবং সামন্ত প্রধানগণ তাঁদের রাজত্ব হারানোর ভয় পেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারকে মেনে নিতে হয়েছিল, বিপক্ষে মুসলিম সুলতানগণ কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার তাগিদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে নিয়ে বৃহত্তর ভারত গঠন করার দিকে এগিয়ে চললেন। যদিও দিল্লীর সুলতানগণ হিন্দুদেরকে পুরোপুরি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং হিন্দু ব্যক্তিগত আইনকে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি দিলেন এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে হিন্দু ধর্মীয় বিষয়ে প্রধানরূপে কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করলেন, তথাপি সাধারণ হিন্দুদের থেকে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করল। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুদের সম্পর্ক ক্রমেই মধুর হতে আরম্ভ হল। অসন্তুষ্টির কোনো বাঁধা ধরা কারণ তাঁরা পেলেন না। On the whole, the Muslim Kings maintained peace and justly and gave religious and cultural freedom to their Hindu Subjects. মোটের উপর মুসলিম শাসক সম্প্রদায় দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে লাগলেন। No dout Muslim Kings had charged civil and criminal laws and introduced some provisions of Islamic law. They were considerate enough to appoint Pandits in the central as well as provncial courts to help in deciding cases of Hindu personal law as well as those which concerned the religious life of Hindus. এতকিছু করা সত্ত্বেও সেকেন্দার লোদী, ফিরোজশাহ তুঘলকে এবং শেষ শাহ শূরী হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের জন্যে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের উপর পূর্ণ আস্থাস্থাপন করে তাঁদের সরকারগুলিকে নিজেদের সরকার বলে মেনে নিয়েছিলেন। অপরাপর মুসলিম সুলতানদের শাসনে ভারতকে তাঁরা own state বলে পুরোপুরি মানতে পারেননি। কারণ তাঁদের সমস্ত অভিযোগ জিজিয়া করের অবমাননাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠেছিল। জিজিয়া প্রবর্তনের অন্যতম কারণ হিসাবে ইসলামিক রাষ্ট্রের "coupulsny Military serince" নীতি, সকল মুসলিম শাসকদের আমলে চালুও ছিল না।

www.pathagar.com

# জিজিয়া

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের হিন্দু নির্যাতনকে বড় করে দেখাবার জন্য ব্রিটিশ যুগ থেকে হিন্দু ঐতিহাসিকরা জিজিয়া করকে বড় করে দেখান। ইসলামী অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ইসলাম বলে—দুনিয়ার যাবতীয় উৎপাদন ও পুঁজিতে বিশ্বমানবের সম্মিলিত মালিকানা আছে। তবে দ্বন্দ্ব ও কলহ-বিরোধ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকতা ; ভোগাধিকারের সুবিধাকে বিবেচনা করে "নিয়মিত নিজ দখলকারীরই স্বাভাবিক মালিকানা" স্বীকার ও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন হিসেবে সম্পদ প্রদানই সাম্যবাদ। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফাদের সাধারণ লোকের তুলনায় অধিক পরিমাণ ধন-দৌলত ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়নি। দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিন ও আওরঙ্গজেবের জীবনে সে আদর্শের কিছুটা নমুনা আমরা পাই।

দেশ রক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি কাজে অর্থেরও প্রয়োজন। সেই অর্থ সংগ্রহের মধ্যে যাকাত, সদকা, খুমুছ, ফাই, উশর প্রভৃতি বহু রকম ট্যাক্স-এর ব্যবস্থা আছে। আর জিজিয়া হলো ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে তাঁদের ধন, প্রাণ, ইজ্জত, হিফাজত ও সংরক্ষণের জন্য গৃহীত একটিমাত্র কর। অন্যান্য সরকারী কর তাদের দিতে হতো না। যুদ্ধে জীবন দানও তাদের করতে হতো না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে চাইতেন, তাহলে তাকেও এই কর থেকে রেহাই দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো। কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের উপর এ কর ধার্য হতো। পরিমাণও যৎসামান্য ছিল। জিজিয়া আদায় করার ক্ষেত্রে কড়াকড়িও ছিল না।

মুসলিম পূর্ব আর্য শাসনে যেখানে শূদ্রদের ধন-সম্পত্তি লাভের অধিকারকে স্বীকার করা হতো না, সেখানে জিজিয়া কি সত্যই নিন্দনীয় ? মিঃ ম্যাশো তাঁর 'প্রাচ্য ভ্রমণ' গ্রন্থে লিখেছেন "বিভিন্ন ধর্মের সহিত পরস্পর সহ অবস্থানের উন্নত আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতি মুসলমানগণই খ্রীষ্টজগতকে শিক্ষা দিয়েছেন, পর ধর্মকে সম্মান দান ইসলাম ধর্মে পূণ্য এবং ধর্মগ্রহণে বলপ্রয়োগ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে।"

এমনি করে শত শত মনীষীদের মন্তব্য উল্লেখ করলে পৃথক একটা অধ্যায় হয়ে যাবে। আর 'জিজিয়া' প্রবর্তন করে ভারতীয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করল ভারতের মুসলিম শাসকবৃন্দ। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই কি ?

www.pathagar.com

আর স্বাধীন ভারতে তীর্থ কর বাধ্যতামূলক করার পরও মুসলিম বাদশাহগণের উপর সে অভিযোগ আর না তোলা ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পক্ষে মঙ্গলজনক।

## মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে মুঘল শাসকদের ভূমিকা

বর্তমান স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ধর্ম পালনের মূলনীতি শরীয়তের আইনকে (Muslim Personal Law) বারবার সংশোধন করে সকল ভারতীয়দের জন্য এ রকম আইন রচনার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যা বিনা বাধায় মানলে কুরআনের ঘোষণানুসারে আল্লাহর আযাব বা ধ্বংস নির্ধারিত রয়েছে। সংবিধান রচনায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর নীতি অনুসারে মুসলিম শাসনে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা কর্তব্য। যুদ্ধের সময়ের অবস্থাগুলিকে বাদ দিলে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অন্যকে কোথাও জোর জবরদস্তির অনুমতি ইসলাম ধর্ম দেয় না।

পণ্ডিত সুন্দরলাল তাঁর 'ভারতে ইংরেজ রাজ' নামক গ্রন্থে বলেন, "আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান অতপর আওরঙ্গজেবের স্থলাভিষিক্ত সকল সম্রাটের সময়ই হিন্দু-মুসলিম ছিলেন সমমর্যাদাসম্পন্ন। উভয় ধর্মকেই সমানভাবে সম্মান করা হইত। ধর্ম বিষয়ে কাহারও প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। প্রত্যেক বাদশাহর পক্ষ হইতেই অসংখ্য হিন্দু মন্দিরকে জায়গীর এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দান করা হইয়াছিল। এখনও পর্যন্ত হিন্দু পূজারীদের নিকট আওরঙ্গজেবের স্বহস্তে লিখিত এমন সকল ফরমান আছে যাহাতে জায়গীর এবং দেবোত্তর সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান। এলাহাবাদে অনুরূপ দুইটি ফরমান এখনও আছে যাহার একটি সোমেশ্বরনাথ মন্দিরের পূজারীর নিকট রহিয়াছে।"

অনুরূপভাবেই সম্রাট আওরঙ্গজেব বেনারস জেলার জগজীবনের পুত্র গিরিধরকে, মহেশপুর গ্রামের যদু মিশ্র এবং পণ্ডিত বিল্বধর মিশ্রকে জায়গীর দান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মনীষী আর্নল্ড তদীয় গ্রন্থ "প্রিচিং অফ্ ইসলামে" বলিয়াছেন, "আওরঙ্গজেবের ফরমান এবং পত্রাবলীর একখানি এ যাবত অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার এমন সব পরিপুষ্ট ও উন্নত নীতি বর্ণিত রহিয়াছে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজার সাথে যাহার প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রত্যেক বাদশার পক্ষে আবশ্যকীয়। যে ঘটনা প্রসংগে এই সমস্ত নীতি বর্ণিত রহিয়াছে তাহা এই যে, "একদা কোন ব্যক্তি আওরঙ্গজেবকে এই মর্মে দরখাস্ত দেয়

www.pathagar.com

যে, বেতন বিতরণের কাজে যে দুজন পার্শি কর্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন যেহেতু তাহারা অগ্নি উপাসক তাই তাহাদিগকে বরখাস্ত করতঃ তাহাদের স্থলে অভিজ্ঞ মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করা হউক। কেননা কুরআনে আল্লাহ্ বলিয়াছেন—"তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধু করিও না।" উত্তরে আওরঙ্গজেব ঐ আবেদনপত্রেই নির্দেশ দেন, "জাগতিক বিষয়ে ধর্ম বিদ্বেষের প্রশ্রয় ইসলাম ধর্ম দেয় না।" কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করে, "লাকুম দীনুকুম অলীয়াদীন।" অর্থাৎ "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।" তিনি আরো লিখেন, "আবেদনকারীর বক্তব্য যদি সত্য এবং অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে তো ইতিপূর্বে এ দেশের সকল রাজা মহারাজা এবং প্রজা সাধারণের নিপাত সাধন করাই ছিল আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে। রাজকার্য পরিচালনায় যোগ্যতা হিসাবেই লোক নিযুক্ত করা হইবে ; অন্য কোন বিষয়কেই এ ক্ষেত্রে আমল দেওয়া চলিবে না।"

পুত্র হুমায়ুনকে লিখিত বাবরের ওসিয়তনামা থেকে আর একটি নমুনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বৎস! ভারত রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মে পরিপূর্ণ। আল্লাহর প্রশংসা করি। যিনি অনুগ্রহপূর্বক তোমাকে এখানকার রাজত্ব দান করিয়াছেন। মন হইতে যাবতীয় ধর্ম বিদ্বেষ বিদূরিত করত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সংগে সমদর্শিতা ও ন্যায়বিচার পালন করিয়া চলাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত তুমি ভারতবাসীদের চিত্ত জয় করিতে পারিবে না। এখানকার প্রজা সাধারণ সহৃদয়তা, আন্তরিকতা, উদার এবং সদয় ব্যবহারেই কৃতজ্ঞতা পাশে, প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের অনুগত এবং বাধ্য কোন জাতিরই কবর এবং মন্দির বিনষ্ট করিতে দিও না। ন্যায়বিচার এবং ইনসাফ এমনভাবে করিও যাহাতে সকলেই বাদশার প্রতি প্রীত, সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত থাকে। অত্যাচার-উৎপীড়নের পরিবর্তে দয়া দাক্ষিণ্য এবং ভালবাসার তরবারীতেই ইসলামের অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়। শিয়া-সুন্নীর বাদানুবাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না, নতুবা ইসলাম দুর্বল হইয়া যাইবে। মানব শরীরে আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি এই চতুষ্পদার্থের সমাবেশে যেমন জীবনের ক্রিয়া চলিতেছে তেমনি সাম্রাজ্য দেহকে নীরোগ নিরাপদ রাখিতে হইলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাসাধারণকে একত্র সমবেত এবং তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ রাখিয়া চলিও।"–খুতবাদে শেয়খুল ইসলাম

www.pathagar.com

## আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে চাকুরী থেকে হিন্দুদের অপসারণের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন

কিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাস মত আওরঙ্গজেব সম্পর্কে এমনভাবে কলম চালিয়েছেন, যাতে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে থাকতে চায়। তাঁরা হিন্দুদের মগজে একথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে, আওরঙ্গজেব হিন্দুদেরকে সরকারী চাকুরী থেকে হটিয়ে সমস্ত পদে মুসলমানদের নিয়োগ করতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যদিও তা পারেননি।

তাঁর রাজত্বকালে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে একটা আইন এমনভাবে সংশোধন করিয়েছিলেন, যাতে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন যে, বিশেষ মহলের খাজনা ও ট্যাক্স আদায়কারী পদসমূহে যেন হিন্দুদেরকে নিয়োগ করা না হয়। তার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, ঐ সকল পদে নিযুক্ত হিন্দু (বিশেষ করে কায়স্থ) কর্মচারী অতিরিক্ত ঘুষ গ্রহণে তৎপর ছিল। তাই বলা যায় যে, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের সাথে বাদশার এই আদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া এই আদেশটির বলবৎ রইল না। ওটাকে এমনভাবে সংশোধন করা হল যে, একজন পেশকার হিন্দু আর একজন পেশকার মুসলমান যুগ্মভাবে সকল পদে নিযুক্ত থাকবে।

**খাফী খাঁ লিখছেন ঃ**

"এটাই স্থিরিকৃত হল যে, সমস্ত দীওয়ানী দফতরের পেশকার এবং সরকারের বখ্শী পদসমূহে একজন পেশকার মুসলমান ও একজন পেশকার হিন্দু নিয়োজিত হবে।"–(খাফী খাঁ, আলমগীরি পৃঃ ২৫২)

এই ব্যবস্থা গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দুদের ঘুষ গ্রহণ ও অসুদপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? অন্যথায় সামাজিক রেষারেষি যদি এর কারণ হত, তাহলে ঐ সকল পদে হিন্দুদেরকে প্রথম থেকেই যুক্তভাবে নিয়োগ করার অর্থ কি ছিল ?

ঐ সকল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আকবরের রাজত্বকালে যেমন হিন্দুরা মুসলমানদের পক্ষ হয়ে স্বধর্মাবলম্বী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, ঠিক তেমনিভাবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঐ অবস্থা বিরাজিত ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবৈতনিক অফিসারও ছিলেন। গৌরবজনক মনে করে তাঁরা এটা গ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

এই তালিকায় উদয়পুরের মহারাণার পুত্র ও ভ্রাতাও স্থান পেয়েছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবাজীর কতিপয় স্নেহভাজন ও আত্মীয়-স্বজনের নামও এতে পাওয়া যাচ্ছে। এরা শুধু নামমাত্র পদধারী ছিলেন না। বরং মরণপণ করে যুদ্ধ করতেন। এদের মধ্যে সকল রকম পদের লোক ছিলেন। সৈন্য বিভাগে ছিলেন, শাসন বিভাগেও ছিলেন। সৈন্যদলের নেতৃত্ব, কেল্লার কেল্লাদারী, জেলাসমূহের নাজেমের পদ ও ফৌজদারী ইত্যাদি অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও নির্ভরশীল পদ আর কি হতে পারে। এ সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ সজ্ঞানে ঐতিহাসিক নেলপুল সাহেব ক্ষমতার জোরে ইতিহাস বিকৃত করে লিখলেন, "রাজপুতগণ আলমগীরের সাহায্য করে একটা অঙ্গুলি প্রদর্শন করতেও ইচ্ছা করেনি।"

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এইরূপ মিথ্যা বক্তব্যগুলোর জবাবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বে প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও পদাধিকারীদের একটা তালিকা নিম্নে পেশ করা হল, যা 'মাসেরে আলমগীরি' নামক মূল কেতাব থেকে গৃহীত। (অনুবাদক হাসান আলী ঃ মূল লেখক "আওরঙ্গজেবের চরিত্র বিচার" নামক পুস্তকের লেখক শিবলী নো'মানী)।

| পদধারীর নাম | পিতৃ পরিচয় ইত্যাদি | নিয়োগের তারিখ, পদোন্নতি অথবা মনসব প্রাপ্তি (সন বলতে আলমগীরের জলুশ বুঝায়) |
|---|---|---|
| ১. রাজা ভীম সিং | উদয়পুরের মহারাণা রাজ সিংহের পুত্র ও মহারাণা জয় সিংহের ভ্রাতা। | আলমগীরের ৩১তম অভিষেক বর্ষে দাক্ষিণাত্য এসেছিলেন এবং বুরহানপুরে অভিযানে যোগদান করেছিলেন ও ৩৮তম বর্ষে ৫ হাজারী মনসবে পৌঁছে মারা যান। |
| ২. ইন্দ্র সিং | মহারাজা জয় সিংহের ভ্রাতা | ৪৩তম অভিষেক বর্ষে ২ হাজারী হন, ৪৩তম বর্ষে ৩ হাজারীতে পৌঁছেন। |
| ৩. বাহাদুর সিং | মহারাজা জয় সিংহের ভ্রাতা | ৪৩তম অভিষেক বর্ষে দেড় হাজারী মনসব প্রাপ্ত হন |
| ৪. রাজা মানসিংহ . | রাজা রূপসিংহের পুত্র | ২৬তম অভিষেক বর্ষে মান্দেলপুর ও বদনূরের ফৌজদার নিযুক্ত হন (উদয়পুরের মহারাণা এই পরগণাদ্বয়ের জিজিয়ার পরিবর্তে দিয়েছিলেন) |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ৫. আচলাজী | শিবাজীর জামাতা | ৪৩তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। |
| ৬. আরজুজী | শিবাজীর পুত্র শম্ভার চাচাতো ভাই | ৪৯তম অভিষেক বর্ষে ৫ হাজারী মনসব ও পতাকা নাকাড়া ইত্যাদি লাভ করেন। |
| ৭. আরজুজী | শম্ভার ভৃত্যদের একজন | ৩৮তম অভিষেক বর্ষে ২ হাজারী মনসাব। |
| ৮. মাঙ্গুজী | ..... | ৩১তম বর্ষে ২ হাজারী মনসব। |
| ৯. রাও অনুপ সিং | রাজা করণের পুত্র | ৩১তম বর্ষে চাকুরীর খেলাত প্রাপ্ত হন। |
| ১০. রাজা অনুপ সিং | ..... | ৩১তম বর্ষে শঙ্করের কেল্লাদার নিযুক্ত হন। |
| ১১. রাজা উদিয়াত সিং | ..... | ৩৬তম অভিষেক বর্ষে ইংরেজের ফৌজদার এবং আড়াই হাজারী হন। |
| ১২. উদয় সিং | খেলনা কেল্লার কেল্লাদার ছিলেন | ৪৭তম বর্ষে সাড়ে তিন হাজারী হন। |
| ১৩. বাসদেব সিং | জন্দন কারার জমিদার | ৪৯তম বর্ষে ৩ হাজারী হন। |
| ১৪. কাথুজী | ..... | প্রথম ৫ হাজারী ছিলেন, ৪৯তম অভিষেক বর্ষে ১ হাজার বর্ধিত হলো। |
| ১৫. ছরলাল বুন্দিয়া | | ৪৪তম বর্ষে তারা কেল্লার কেল্লাদার হন। |
| ১৬. বসন সিং | কুমার কিশান সিংহের পুত্র, তিনি রাজারাম সিংহের পুত্র। | ২৫তম বর্ষে ১ হাজারী ও ৪ শত অশ্বারোহী প্রাপ্ত হন। |
| ১৭. রাম চাঁদ | কাহতালুনের থানদার | ৪০তম অভিষেক বর্ষে আড়াই হাজারী পান। |
| ১৮. লোক চাঁদ | শাহজাদা আজমের নায়েব ও কর্মচারী ছিলেন। | ২৯তম বর্ষে বাহাদুর শাহকে পরাজিত করার পুরস্কার স্বরূপ রায় রাইয়ান খেতাব পান। |
| ১৯. ভাণ্ড বনজারা | | ৪২তম বর্ষে ৫ হাজারী। |
| ২০. জাকিয়া | | ৫০তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী। |
| ২১. দুর্গাদাস ঠাকুর | | ২৯তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী। মসনবে পুনর্বহাল হন। |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ২২. রূপ সিং | রাজা অদৌত সিং-এর পুত্র | ৪১তম অভিষেক বর্ষে ১ হাজারী হন। |
| ২৩. সুভান | সেতারার কেল্লাদার | ৪৩তম অভিষেক বর্ষে ৫ হাজারী। মনসব, খেলাত ও নাকাড়া প্রাপ্ত হন। |
| ২৪. শিব সিং | রাহেরীর কেল্লাদার | ৪৭তম অভিষেক বর্ষে দেড় হাজারী হন। |
| ২৫. আন্ধাতা | রাও কাথুর পুত্র ও নসরত জঙ্গের ফৌজে নিযুক্ত | ৫১তম অভিষেক বর্ষে মাহমানাত দুর্গ অধিকার করনার্থ নিযুক্ত হন। |
| ২৬. কিশোর দাস | মনোহর দাস গৌরের পুত্র। | ২৬তম অভিষেক সোনাপুরের কেল্লাদার হন। |
| ২৭. রাজা কুলিয়ান সিং | ভাদাওরের জমিদার | ৪০তম অভিষেক বর্ষে দরবারে হাজির হলে ৭ শতের উপর আরো ২ শত প্রাপ্ত হন। |

## মূর্তি ভঙ্গ করা

আলমগীর দীর্ঘ ২৫ বছর কাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন। ওখানকার রাজ্যগুলিতে হাজার হাজার মন্দির ছিল। কিন্তু কোন ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই যে, সে দেশের কোন একটা মন্দিরও তিনি স্পর্শ করেছেন। আলোয়ারের বিখ্যাত মন্দিরে শত শত প্রতিমূর্তি ও প্রতিমা রয়েছে। এ আলোয়ার-এর দুই মাইলের মধ্যেই আলমগীর চিরশয্যায় শায়িত রয়েছেন। বড় বড় অলি-আউলিয়াদের মাজারও এখানে অবস্থিত যাঁরা আলমগীরের বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সকল প্রতিমা ও প্রতিমূর্তি অদ্যাবধি সেখানে বিদ্যমান আছে।

ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকের দল বলেন যে, আলমগীর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সত্য কথা এই যে, বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল বলেই মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল।

তাঁর অভিষেকের ৫ম বর্ষে উত্তর ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং আলমগীর দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলেন। তখন সেই শান্তিপূর্ণ সময়ে মন্দির ভেঙে দেবার একটা প্রমাণও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির সঙ্গে অর্থাৎ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বিরোধ ছিল। সেই জন্য কোন মন্দিরের সঙ্গেই তাঁরা

www.pathagar.com

বিরোধিতা করেননি। অন্যথায় যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হত, তাহলে এখানে তাঁর সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান ছিল।

দাক্ষিণাত্যে আলী আদেল শাহ বিজনগরের রাজা রামরাজকে (৯৭৬ হিজরী) নিজাম শাহ বাহমনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য স্বীয় সাহায্যার্থে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু রামরাজ সাহায্য করতে এসে স্বয়ং আদিল শাহের রাজ্যের সমস্ত মসজিদগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। (তারিখে ফেরেশতা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬)

এই প্রসঙ্গে ঐ ইতিহাসের মূল ভাষা নিম্নরূপ ঃ

নেজামশাহ বাহরীর সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত হয়ে পড়ায় আলী আদেলশাহ প্রথমবার যখন অনন্যোপায় হয়ে রামরাজকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, তখন তাঁদের মধ্যে শর্ত ধার্য হল এই যে, বিজনগরের হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক শত্রুতাহেতু মুসলমানদের প্রাণহানিকর, লুটপাট ও গ্রেফতারমূলক কোন কাজ করবে না এবং মসজিদগুলোর কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু কার্যত তারা এর বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল। তারা আহমদ নগরের মসজিদ গুলি ধ্বংস, মুসলমানদের উপর অত্যাচার এবং তাদের মান-ইজ্জত বিনষ্ট করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। এও জানা গেছে যে, তারা মসজিদে প্রবেশ করে প্রতিমা পূজা করত ও বাদ্য বাজিয়ে গান গাইত।"–২য় খণ্ড পৃ. ২৭

এ ধরনের বহু ঘটনা আলমগীরের রাজত্বলাভের পূর্বে ঘটে গিয়েছিল। তিনি যখন তাদের অত্যাচার বন্ধ করতে উদ্যত হলেন, তখন তাদের মধ্যে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। ১০৮৯ হিজরীর জিলকদ মাসে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে আওরঙ্গজেব অবগত হতে পারলেন যে, হিন্দুরা মুসলমান শিশুদেরকে তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্যাশিক্ষা দিচ্ছে, তিনি তা বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনার মাত্র মাসখানেক পর মথুরা অঞ্চলে হিন্দুরা বিদ্রোহ শুরু করে দিল। ঐ বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদুন্নবী খাঁ মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত হলেন ও নিহত হলেন।–(মাসেরে আলমগীরী)

## রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় আওরঙ্গজেবের ভূমিকার টুকিটাকি

### [ট্যাক্স রহিতকরণ]

অন্যান্য বাদশাহদের আমলে জমির খাজনা ছাড়াও বহু প্রকারের বাজে ট্যাক্স ও মাশুল আদায় করা হত যা প্রায় খাজনার সমান সমান হত। তা যথাক্রমে টুঙ্গী, পন্দরী, (বাড়ীর ট্যাক্স) সরশুমারী, বরশুমারী, বরগাদী,

www.pathagar.com

তুফানা, জরিমানা, শনকারাণা ইত্যাদি। এরূপ প্রায় ৮০ (আশি) রকমের ট্যাক্স আদায় করা হত এবং তার আয় খাফী খাঁর মতে কোটি টাকার উর্ধ্বে ছিল। এ সমস্ত মাশুল আলমগীর একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

## বিচার-আচার

আলমগীরের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার। তাঁর বিচার ব্যবস্থায় আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব এবং শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না। একখানা পত্রে তিনি স্বয়ং লিখেছেন, "বিচার ক্ষেত্রে শাহজাদাকেও আমি সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত মনে করি।"

## পরবর্তী মুসলিম শাসকবৃন্দ

"এই প্রথম সিপাহী বাহিনী (১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে) হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের ; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে। হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।"–(কার্ল মার্ক্স)

"প্রশ্ন হলো ঃ আরওঙ্গজেবের 'নিষ্ঠুরতা' আর 'ধর্মীয় গোঁড়ামিই' কি তাঁর শাসন কাজের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হতে পারে ? সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা যেসব তথ্য উদঘাটন করেন তাতে মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি, শিল্পায়ন, সামুদ্রিক বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, শহর, মুদ্রা, জনবিন্যাস, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। মুঘল আমলে দীর্ঘকাল শান্তি বজায় থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। সেই সময়ে বাণিজ্যিক ও আর্থিক যথেষ্ট উন্নত ছিল। একটি সংহত জাতীয় বাজারেরও উদ্ভব হয়। নগরায়নের (urbanization) প্রসার ঘটে। অবশ্য ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই নগরায়নের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের উন্নত মুদ্রাসমূহের মধ্যে

www.pathagar.com

মুঘল মুদ্রা স্থান লাভ করে। নানা দ্রব্য সম্ভার উৎপন্ন হয়। বাইরে তার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। মুঘল 'কারখানাতে' খুবই দক্ষ কারিগররা ছিল। ভারতের জাহাজ শিল্প ও অনুন্নত ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের আগেই ভারতীয় বণিকরা ইয়েমেনে বসবাস করত। পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলোতে যথেষ্ট জাঠ ছিল। আরবদের দ্বারা সিন্ধু বিজয়ের পর এবং দিল্লীতে সুলতানদের প্রাধান্য স্থাপনের পর সামুদ্রিক বাণিজ্যের এবং স্থলপথের বাণিজ্যের এবং যোগাযোগের ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব প্রসারণ হয়। এইসব যোগাযোগের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়রা উন্নত কারিগরী জ্ঞানেরও সাহায্য গ্রহণ করে। মুঘল আমলে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাছাড়া মুঘল কেন্দ্রীয়করণের ফলে উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অসাধারণ বিকাশ ঘটে। নানা পেশায় নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আফগান ও মুঘল উভয় শাসনকালেই হিন্দু বণিকদের প্রভাব বজায় ছিল। গ্রামের ও শহরের অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দু কুসীদজীবীদের প্রাধান্য ছিল। 'ইকতা' অধিকারী ব্যক্তি এবং 'মনসবদার' উভয়েই কুসীদজীবীদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য এবং নিজেদের বিলাস-ব্যসনের জন্য ঋণ নিয়ে উচ্চহারে সুদ দিত। মুঘল প্রশাসনের ক্ষুদ্র অফিসারদের মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু উভয়েই ছিল। কিন্তু 'কেরাণীরা' (Clerk) সবাই ছিল কায়স্থ, বাণিয়া, (জৈন ও হিন্দু) অথবা খাত্রি বর্ণের। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের সময়কাল এক হাজারী ও তার উর্ধের পদে অধিষ্ঠিত ৫৭৫ অভিজাতদের মধ্যে ১৮২ হিন্দু (প্রধানত রাজপুত ও মারাঠা) এবং ৬৯ ভারতীয় মুসলিম ছিলেন। কোন কোন স্থানে কৃষকরা বিদ্রোহ করলেও, মুঘল ভারতের কৃষকের জীবনের চিত্রটিকে অসন্তোষময় মনে করার কারণ নেই। বৃদ্ধ বয়সে ঔরঙ্গজেব রায়তদের রক্ষা করতে না পারার কথা ভাবেন। এই বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ বিভিন্ন নির্দেশে উল্লেখ করেন। গোঁড়াপন্থী ঔরঙ্গজেব অভিজাতদের জীবন যাত্রায় কোনো পরিবর্তন আনতে সফল হননি। উল্লেখ্য এই, ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কালেই আকবর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন এবং তখন থেকে একশত বছরেরও বেশী সময়কাল ধরে ভারতের বৃহত্তর অংশ যুদ্ধ ও অরাজকতা থেকে মুক্ত থাকে। বহু শতাব্দী ধরে ভারতে এ ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সাম্রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে যথার্থ আলোচনা করতে হলে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি মনে রাখতে হয়। মুহম্মদ হাবিব, মোরল্যাণ্ড, কেএম আশরাফ, নূরুল হাসান, তারাচাঁদ, সতীশ চন্দ্র, ইরফান হাবিব, ঈশ্বরী প্রসাদ, জগদীশ নারায়ণ সরকার, আথার আলি, তপন রায় চৌধুরী, হিরোসী

www.pathagar.com

ফুকাজাওয়া, বার্টন স্টেইন, সাইমন ডিগবী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁরা যে ভারতীয় জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করেন তা অগ্রাহ্য করতে হলে তো আরো নতুন তথ্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। আরএসএস তত্ত্ববিদরা তা করতে সফল হয়েছেন বলে আমার জানা নেই"।

–(অমলেন্দু দে, শিক্ষা ও সাহিত্য, ১৯৯৩)

## টিপু সুলতান

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের সর্বশেষ স্মৃতি চিহ্ন হল টিপু সুলতান (অস্তগামী সূর্য্য)। টিপুর জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করলে প্রত্যেক ভারতীয়দের গর্ব অনুভব করা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির তিনিও এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। তিনি ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে, আরব ইরান ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারত থেকে শেষবারের মত চেষ্টা করলেন বৃটিশকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু মারাঠা ও নিজামের বৃটিশ সহযোগিতার কারণে ১৭৯৯ খ্রীঃ যুদ্ধের মধ্যেই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মত হল, "তিনি গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার ও হীনমন্যতার বহু উর্ধে ছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু নির্মিত জুমআ মসজিদের সন্মুখে অবস্থিত শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির এবং টিপুর বাঙ্গালোরের প্রাসাদ সংলগ্ন হিন্দু উপাসনালয় আজও টিপুর ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় বহন করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর, Young India-তে লিখেছেন, The Ruler of Mysore was a God-fearing and just King. He was exceedingly sympathetic. He treated Hindus as brothers and showed a great respect for them." "মহীশূরের টিপু সুলতান ছিলেন একজন আল্লাহ ভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি প্রজাদের প্রতি যারপরনাই সহানুভূতিশীল ছিলেন, হিন্দুদের সঙ্গে ভাই-এর মত আচরণ করতেন এবং তাঁদেরকে মহান সম্মান দেখাতেন।"

তিনি শের শাহের ন্যায় জনহিতকর কাজের জন্য হিন্দু-মুসলিম সকল প্রজার নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রজাদের সুখ-সুবিধা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন টিপু ছিলেন দক্ষ, জনপ্রিয় প্রশাসক, প্রজাদের কল্যাণ ও উন্নতির সমূহ ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করেছিলেন, সেজন্য ভারতে তাঁরই রাজ্য সর্বাধিক শক্তিশালী ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

## মধ্যযুগে (১২০৬-১৭৫৭) বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের গভীরতা

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "বাংলাদেশের ইতিহাসের" (মধ্যযুগ) কভার পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মধ্যযুগের ইতিহাস বিকৃত করিয়া কল্পিত হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

ঐ উক্তির পাশপাশি মধ্যযুগের সমাজচিত্রে আরো কিছু নমুনা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরছি ঃ

১. "মুসলিম শাসনকালে শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতি চর্চা কোন বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয়নি; বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল।"–(বাঙালী, পঃ ৭৯-৮০ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ)

২. "পাঠান যুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেন শাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পাঠান আমলে রাজ্যশাসন বিশেষত রাজস্ব ব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।"

–(অমিত বন্দো বা. সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫।)

## অমুসলমানদের পোশাক ও আচরণ পরিবর্তনে মুসলমান

বিশেষ করে মুঘলরা যে দেশ থেকে এসেছিলেন, সেখানকার আবহাওয়া ছিল আলাদা। ফলে তাঁরা যে পরিচ্ছদের ব্যাপারে শুধু আরামের দিকটাই জানতেন তা নয়, সুন্দর ও সুপরিকল্পিত পোশাক-পরিচ্ছদের ধারণাও তাঁদের ছিল। তাঁরা এদেশে ইরান, চীন ও ইউরোপ থেকে দক্ষ কারিগর এনেছিলেন। আর দিল্লী, লাহোর, আগ্রা ও আমেদাবাদে কাপড়ের কল বসিয়েছিলেন। বিদেশী কারিগরের সাহায্যে এদেশের কারিগরদের শিক্ষা দিয়ে এদেশে নানা রকমের কাপড়ের প্রচলন করেছিলেন। আইন-ই আকবরীতে আবুল ফজল-এর বহু বর্ণনা বিস্তৃতভাবেই করেছেন।"

চাঁদনীর ব্যবস্থা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সময় থেকেই হয়। এ চাঁদনী দিয়ে গরীবের ঘরের মেঝেয় খুঁত ঢাকা হত।

www.pathagar.com

## আদব কায়দা

সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন, "যাঁরা সাবেকী ধরনের মুসলমান ভদ্রলোকের মার্জিত আদব কায়দা ও মর্যাদা ব্যঞ্জক কথোপকথন ক্ষণকালের জন্যও উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা এ সুযোগকে সবসময়ে জীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করবেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "আমার কাছে এ স্মৃতি চিরকালের জন্য লালন করবার। সেসব মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সুমার্জিত আদব কায়দা, একত্রে অবস্থান করে সোরগোল সৃষ্টি না করে, সুনিয়ন্ত্রিত স্বরে ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য এবং মুসলমান সূফী সাধকদের জীবনী আলোচনা করার দৃশ্যটা পাশ্চাত্যের নিকট একটা চমকপ্রদ উদঘাটন বলেই প্রতিভাত হবে।"

দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাটের দরবার গৃহ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ডঃ স্পীয়ার বলেন, "যতদিন পর্যন্ত মুঘল দরবারের স্থায়িত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত তা সমগ্র হিন্দুস্তানের আদব কায়দা ও সৌজন্য শিক্ষার শিক্ষায়তন ছিল। ... আঠারো শতকে রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন আফগান ও শিষ্টাচার জ্ঞান বিবর্জিত 'অসভ্য' জাঠদের উত্থানে এ আদব কায়দা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়।" ... তিনি আরো বলেছেন যে, "মুঘলদের পতনে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাট ক্ষতি হয়। এরপর থেকেই আমরা মানুষের আচার-ব্যবহারের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হতে দেখি। আজকের দিনেও ভারত সে বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।"

## ইসলামী যুগে নরবলীর উচ্ছেদ

ডায়মন্ড হারবার ফকির চাঁদ বি. এড্ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক দীনেন্দ্রকুমার সরকারের "মানব সভ্যতায় কুমারী বলি" নামক পুস্তকে কুমারী বলির অসারতা ও অসভ্যতা প্রসঙ্গে গভীর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভয়াবহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন যুগে কুমারী বলি প্রথা চালু ছিল এবং বিভিন্ন সমাজ বিবর্তনে তার পরিবর্তন হয়েও এ প্রথাটিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা যায়নি। তিনি এও দেখিয়েছেন যে, যে কুমারী কন্যাকে বলি দেওয়া হতো, সে-ই দেবীরূপে পূজিত হত। তিনি ঐ পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখছেন, জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেখা যায়, দেবী বলছেন, 'নাথ, আমিও কুমার, তুমিও কুমারী–অর্থাৎ সমস্ত কুমারী তোমার আমার অংশ। কুমারই সাক্ষাত যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরম দেবতা।" দীনেন্দ্রবাবু

www.pathagar.com

বলছেন, "কিন্তু প্রশ্ন তান্ত্রিক সাধকরা পরম দেবতা জ্ঞানে এই কুমারী কন্যাকে পূজা করছেন কেন ? কেনই বা রেড ইণ্ডিয়ান পুরোহিতরাও একই ধর্মীয় আচরণে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ঐ পুস্তকের ভূমিকাতে লিখছেন, "আজ পশু, নরনারী অথবা কুমারী বলি বললে বুঝি শোণিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এদের কণ্ঠচ্ছেদন। যেসব দেবপূজায় এই রুধির উৎসর্গীকৃত হয়, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলতে শুনেছি 'কাঁচা খেকো দেবতা।'

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে রাজস্থানের 'সতীদাহ'-এর পক্ষে তুমুল আন্দোলন থেকে নরবলির রূপ ভারতে কত শক্তিশালী ছিল তা বুঝা যায়।

দীনেন্দ্রবাবু ঐ পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে লিখছেন, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী তীরে ইতিহাস আর পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থান ত্রিম্বক বা এ্যাম্বক। ত্রিম্বকেশ্বরের মন্দিরেই কুশব্রত তীর্থ। পূণ্যার্থীরা এখানকার তীর্থ পুস্করিণীতে পূণ্যস্থান করেন। এরই আশেপাশে এগারোর কাছাকাছি বয়স্কের ছ'টি কুমারী কন্যার বলি হয়েছে পর পর। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এদের হত্যা করে, প্রতিক্ষেত্রেই তাদের স্ত্রী অঙ্গগুলি কেটে নেয়া হয়েছে।" 'কোঙ্গি' সম্প্রদায়ের বিত্তশালিনী এক নারী সন্তান কামনায়, কোনো এক বৈদ্যের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিয়েছে। চল্লিশের নিচে বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে সন্তান কামনায় বশবর্তিনী। তাই স্মরণ নিয়েছে বৈদ্যের। বৈদ্যটি এক বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবতার প্রত্যাদেশ শুনিয়েছে সন্তান কামিনীকে—মোরগ নয়, পাঁঠা নয়, পুরুষ নয়, বয়স্কা নারী নয়, কুমারী বলি চান দেবতা। কিন্তু দেবতাটি কে ?

বৈদ্যের কাছ থেকে জবাব এসেছে—"বেতাল মহারাজ। দৈত্যাধিপতি বেতাল মহারাজের কুমারী কন্যা ভিন্ন অন্য বলিতে রুচি নেই।"

দীনেন্দ্রবাবু ভারতের বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সমাজে নরবলির শত শত বাস্তব চিত্র পরিবেশন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে ধর্মপুস্তকগুলি এ বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন ঋগবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জলদেবতা বরুণের উদ্দেশ্যে প্রথম পুত্রকে উৎসর্গ করার, শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষ মোধর, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শাঙ্খায়ন বৈতান সূত্রে, অশ্বমেধ যজ্ঞে ... প্রভৃতিতে নরবলির কথা পাওয়া যায়।

কোনো কোনো স্থানে নতুন সেতু নির্মাণের সময় কুমারী বলি দিয়ে তার রক্ত অথবা জীবন্ত কন্যাকে ভূ-প্রোথিত করার কথা শোনা যায়।

www.pathagar.com

কুমারী কন্যার আত্মাহুতি শুষ্ক পুরষ্করিণীকে জলপূর্ণ করে তুলতে পারে এমন কাহিনী প্রচলিত আছে পাঠানকোটের নিকটবর্তী চম্পাবতী শহরের ইতিকথা প্রসঙ্গে। শিশু পুত্রের শোণিতেও একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারের অনুষ্ঠেয় 'নাটাই' ব্রতের কথায়।

নীলনদের জল যাতে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি করে কুমারী কন্যাকে নীলনদে ডুবিয়ে দেওয়া হত।"

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) যখন খলীফা, তখন মিশরের গভর্নর ঐ ঘটনা বন্ধের আদেশ জারি করলে মিশরের স্থানীয় জনগণ উপযুক্ত জল সরবরাহের জন্য গণ ডেপুটেশন দিল। গভর্নর খলীফা ওমর (রাঃ)-কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহর নাম করে নদীর নামে একটি চিঠি পাঠালেন এবং চিঠিটি নদীতে পুঁতে দেবার জন্য আর একটি চিঠি গভর্নরের কাছে পাঠালেন। চিঠিতে হযরত ওমর (রাঃ) লিখেছিলেন, "হে নীলনদ! আল্লাহ তোমাকে মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন; তুমি তার বদলে যদি শয়তানের ভূমিকা পালন কর এবং নরহত্যার মত পাপ কাজে লিপ্ত হও, আল্লাহর কাছে তোমায় জবাব দিতে হবে, তুমি তা না করে এই পত্র পাওয়ার পর পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বাভাবিক কাজ দিয়ে যাবে এই হুকুম আমি ওমর (রাঃ) তোমাকে দিচ্ছি।" শয়তান চিরতরে ওখানে নরবলি নিতে ভয় পেয়ে গেল। বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে ঐ চিঠি নীলনদে পুঁতে দেওয়ার পর নীলনদ জলে পূর্ণ হয়ে গেল। (ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা মশহুর হয়ে আছে।)

ইসলাম-পূর্ব যুগে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে নরবলির প্রথা ছিল। ইসলাম যেখানে প্রবেশ করেছে সেখানেই নরবলি বন্ধ করার শত চেষ্টা নিয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখি বাঙ্গালায় ভাটির দেশে নরবলির ব্যাপকতা বন্ধ করার জন্য মক্কা শরীফের বিখ্যাত ইমাম রাজি (রহঃ) পীর আব্বাসউদ্দীন সহ জালালউদ্দীন শাহের জামাতটি দিল্লি হয়ে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে এসে শাহ জালালউদ্দীন তিরমিযী পীর আব্বাসউদ্দীনকে ২৪ পরগনায় হাড়োয়া অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জটার দেউল মন্দিরে নরবলি করা হত।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, "কাপালিক প্রসঙ্গে" কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বলছে, এখন পালাও। নরমাংস না হলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তা কি জান না ? অথবা অষ্টম পরিচ্ছেদ "আশ্রয়ে" কপালকুণ্ডলা

www.pathagar.com

অধিকারীকে বলছে—তিনি যে আমাকে এতকাল প্রতিপালন করিয়াছেন অধিকারী—কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না। ... কপালকুণ্ডলা তাহা বুঝিল না—কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। অথবা ষষ্ঠ খণ্ডের "পুনরালাপে" কাপালিক বলছে, আমি স্বপ্ন দেখিলাম। যেন ভবানী আসিয়া কহিতেছে—রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজায় এ বিঘ্ন জন্মিয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এ কুমারীর শোণিতে আমার পূজা করিস নাই। ... আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।"

মুঘল আমলে বঙ্গদেশ উপন্যাসটির পটভূমি। এখানেও স্পষ্ট হয়েছে তন্ত্র সাধনার দুটি দিক। একদিকে দেবী ভবানী চান 'কুমারী' কপালকুণ্ডলার তপ্ত শোণিতে আত্মতৃপ্তি, অন্যদিকে কাপালিক মনে করে তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে চাই 'ইন্দ্রিয় লালসার' পরিতৃপ্তি। দীনেন্দ্রবাবু ৪ পৃঃ লিখেছেন, "সাধারণভাবে নরবলি হত কালী মন্দিরে। এখানে কালীঘাটের নরবলির কথা বলিতেছি। শিশু, বালক ও যুবকদের বলি দেওয়া হইত। এমনকি সময় সময় স্ত্রীলোকদেরও বলি দেওয়া হইত।"–(যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ সেকালের নরবলি। শুকতারা, ফাল্গুন ১৩৬৩, পৃঃ ৩৪ থেকে।)

সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার দূর হয় ইসলাম মানুষের মধ্যে এসে গেলে শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। আর শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তাই দেখা যায় মুসলমান সমাজে সাধনার নামে নরহত্যা কল্পনার অতীত। ইসলাম বাংলায় তথা ভারতে "তহফাতুল হিন্দ্" ভারতের জন্য পুরস্কার বা উপহারস্বরূপ এসেছিল। আর ঐ নামে একটি পুস্তক পড়ে স্বাধীনতা যোদ্ধা (মাওঃ ওবায়দুল্ল সিন্ধি, শিখ যুবক) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

## ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পত্তন ইউরোপীয়ানদের ষড়যন্ত্রে আর্য থিওরীর উৎপত্তি

প্রাচীনকালে নরগোষ্ঠীর ইতিহাসে আর্য বলে কোন কিছু পাওয়া যায় না। ভারতীয়দের দ্বারা এই থিওরী সৃষ্টিও নয়। জার্মান জাতির কারসাজির ফল হল আর্য থিওরী। ইংরেজরা প্রাচ্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জেনে নেবার আগ্রহে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম জোন্স। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত, পার্শী, ল্যাটিন, জার্মান এবং ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাগুলির মধ্যে একটা মিল দেখিয়ে বক্তব্য রাখেন। এর থেকে ইউরোপে তুলনামূলক ভাষা তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে

www.pathagar.com

মিশর তত্ত্ববিদ স্যার থোমাস ইয়ং সর্বপ্রথম আর্যান বা ইন্দো-ইউরোপিয়ান কথা দুটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃত, পার্শী, ল্যাটিন, জার্মান, বোল্টিক এবং স্লাভনিক এ সাতটি ভাষা গোষ্ঠীকে সেই থেকে 'family of Indo-European language' নামে অভিহিত করা হয়। এই সময় থেকে 'আর্য জাতি' এবং আর্য সভ্যতার প্রচার শুরু হয়। এ কথার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "এখন তো অনেক দিন পর ইউরোপ হইতে 'আর্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে।'–(বঙ্কিম রচনাবলী, পৃষ্ঠা নং ৫৬২, মৌসুমী প্রকাশনী।)

## সুমেরিয়ান থিওরি

আর্য ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এক কাল্পনিক তথ্য আবিষ্কার করে বলেছেন যে, ব্যবীলনীয় প্রাচীনতম সভ্যতা সেমিটিকদের দান সন্দেহ নেই, তবে সেমিটিকরা যখন ব্যবলিনে আসে, তখন ঐ দেশের দক্ষিণ অংশে 'সুমার' নামে একটি প্রদেশ ছিল সেই প্রদেশের অধিবাসীরা নন্ সেমিটিক ছিল, সেমিটিকরা তাদের কাছ থেকে বহু কিছু ধার করে। কাজেই তারা বলতে লাগলো সুমেরিয়ান সভ্যতা সেমিটিক সভ্যতার অগ্রবর্তী।

আর্য ও সুমেরিয়ান সভ্যতার কল্পনা যে অলীক এবং অসার তার হাজার হাজার প্রমাণ বিশ্ব ইতিহাসের ঐতিহাসিকরা, নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকারীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তার কিছু নমুনা আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে তুলে ধরলাম।

## আর্য থিওরীর অসারতা (১)

১. বহু প্রাচীন জাতির সভ্যতার নিদর্শন বহু দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আর্য সভ্যতা বলে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে তার কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই ঐতিহাসিক Fleure সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, "In India the Aryan theory rests upon a solid basis of sentiment." "ভারতে আর্য থিওরী সম্পূর্ণ একটা আবেগের উপর দাঁড়িয়ে আছে।"

www.pathagar.com

২. ভাষার 'রূপ ও প্রকৃতি' জাতি নির্ণয়ে কোন নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। ভাষার ধাতুরূপ বা শব্দগত ঐক্য যদি জাতিগত ঐক্যের প্রমাণ হয়, তবে আরবী ভাষার (সেমিটিক ভাষা) সঙ্গেও তো ইংরাজী, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। উদাহরণ ঃ

| আরবী | ইংরেজী |
|---|---|
| কাফন (শববস্ত্র) | Coff in |
| আরদ্ (মাটি) | Earth. |
| ক্বৎ (বিড়াল) | cat |
| সালাৎ (এনতি) | Salute |
| কান্দিল (বাত্তি) | candle |
| কাফুর (কর্পূর) | corpor |

## আর্য-অনার্যরা কেন ইসলামসহ অপরাপর ধর্মগ্রহণ করলো ?

মাগর মা ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় তার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ এর 'হিন্দু' 'হিন্দুত্ব আর হিন্দুয়ানী' প্রবন্ধে বলেছেন, 'এও আমরা জানলাম' যে হিন্দুর কোনো বিশেষ মত বিশ্বাস নাই। এটির কোন উপাসনা পদ্ধতিও নাই। ... (যার কারণে) আজ ভারতে সনাতনী বৈদিকদের সংখ্যা যত তার চাইতে ঢের বেশী প্রকৃতি পূজক প্রাগার্য আদিবাসী বাস করেন।

যাঁরা হিন্দু সংস্কারের কিছুই মানে না। সনাতনী বা বৈদিক সমাজ, যাগযজ্ঞই যাদের মুখ্য কৃত, বর্ণাশ্রমের বাইরে এই বিরাট প্রাগার্য সমাজকে তাঁরাই ঠেলে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজ সমাজের বাইরে দীর্ঘকাল আগে থেকেই ঠেলে দিয়েছেন আরও অগণিত মানুষকে। বৌদ্ধরা যাদের কোলে টেনে নিয়েছেন মানুষের মর্যাদা দিয়ে, ইসলাম তাঁদের টেনে নিয়েছে নিজের কাছে এবং সবশেষে এসেছেন খ্রীশ্চিয়ান ধর্মযাজকেরা ইউরোপীয় বিজয়ীদের জাহাজে চড়ে, তাঁরাও এদের টেনে নিয়েছেন গির্জার আশ্রয়ে। কিন্তু এসব 'অন্ত্যজ'রা এতই সংখ্যাগুরু যে এদের সবাইকে ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে তাঁদের সাধ্যে কুলোয়নি। এখন তাঁরা পড়ে আছেন ব্রাত্য হয়ে। গান্ধীজি যাদের হরিজন আখ্যা দিয়ে গেছেন। এঁরা কেউ নিজেকে হিন্দু ভাবেন না।"

সংস্কৃত ভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ভারতবর্ষে এল তখন ভারতবর্ষের আদি জনসাধারণ, (দ্রাবিড়, অষ্টিক প্রভৃতি) উত্তর ভারত ত্যাগ করে সংস্কৃত

www.pathagar.com

ভাষীদের পক্ষে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে দক্ষিণ ভারত হয়ে উঠে আদিবাসীদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান আশ্রয়স্থল। এর ফলে দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্ত চেতনা হিসেবে দুটি পৃথক চেতনা গড়ে ওঠে। এদিকে উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে যে ধর্মবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পেষনে বৌদ্ধধর্ম পূর্ব ভারতে এসে আশ্রয় সন্ধান করে। এরপর যখন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দিল্লিতে সুলতান শাহী প্রতিষ্ঠা করে তখন সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্র পরিণত হল দক্ষিণ ভারত। আধুনিককালে হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো দেখতে হলে যেমন দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় তেমনই মুসলিম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি উত্তর ভারতে প্রাপ্তব্য।

ভারতবর্ষ ও ইসলাম গ্রন্থে সুরজিত দাশগুপ্ত স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন, "বহু বছর ধরে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর বর্ণ হিন্দুদের জুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে তাদের ধর্মের কবল থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকর অন্যতম, তিনিও হিন্দু থেকে হাজার হিন্দুকে নিয়ে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।"

তিনি আরো লিখেছেন, "মনে রাখা ভাল একদা বর্ণ হিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্রিয়াতে নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"

ভারতে ইসলামের বিরুদ্ধে বহু রকম অপপ্রচার হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা এত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলাম ? এ বিষয়ে সত্য সন্ধান করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মনীষীর উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

৭১২ খ্রীঃ সিন্ধু বিজয়ের সময় মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণ্যবাদ জয় করার সময় দূত হিসেবে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ (নওমুসলিম)। সেই থেকে শুরু। ১৭৬৬ সালে কাশ্মীর সিংহ শেখ আবদুল্লাহর পূর্ব পুরুষরা এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে সুফি আবদুর রশিদ বেহাকী কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ করে। (ভারত অন্দরের অবরোধ এম জে আকবার আনন্দ পাবলিশার্স)। এ ধারা সব যুগে কেন চলে এসেছে তার কারণ ব্যাখ্যায় মানবেন্দ্রনাথ রায়, "ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান নামক" গ্রন্থে বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি "জয়ের পিছনে যে কারণ ছিল।" নামক অধ্যায়ে একস্থানে লিখেছেন, "আল্লাহ এক বৈ দুই নয়, ইসলামের এই মূল মতবাদই

www.pathagar.com

ইসলামকে সহিষ্ণু করেছে। ইসলাম একথা বিশ্বাস করে যে সমস্ত জগৎ তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে, আর সমস্ত মানবজাতি তার নিবুর্দ্ধিতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে এক খোদারই সৃষ্টি। যারা এই আদর্শোজ্জ্বল মতবাদে বিশ্বাসী তারা অপরের অবাধ্যতা, অবিশ্বাস ও মূর্খতাকে কৃপার চোখে দেখতে পারে, হয়ত তাদেরকে কিছু বিদ্রূপও করতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধর্মমত কোনদিনই তাদের একথা শেখায় না যে, ঐ ভ্রান্ত লোকগুলি কোন দুর্বৃত্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সেই জন্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যারা অন্যভাবে পূজার্চনা করে থাকে, মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা ভ্রান্ত বা বিপথগামী তবুও সেই এক খোদারই সন্তান তারা—সেজন্য তারাও তাদের ভ্রাতৃস্থানীয়।

"... মোহাম্মদ (দঃ) যা শেখালেন" নামক অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন, "কঠোর একেশ্বরবাদই মহামানব মোহাম্মদের ধর্ম। এই একেশ্বরবাদের জন্যই তা এত দৃঢ় ও অনমনীয় এবং এই আপাত বৈশিষ্ট্যই তাকে শ্রেষ্ঠতম ধর্মের রূপ দান করেছে। দার্শনিক অর্থে ঈশ্বরের ধারণাতেই ধর্মের ভিত্তি। কিছু না থেকে কিছু সৃষ্টির সম্ভাব্যতা মেনে না নিলে এ ধারনার ভ্রান্তিকতা কিছুতেই ঘুচতে পারে না। গ্রীস ও ভারতবর্ষেরও প্রাচীন দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এ অদ্ভুত তত্ত্ব মানতে চায়নি। ফলে আদিম যুক্তিবাদের পশ্চাৎপটে যে ধর্মের উৎপত্তি হলো, তা শেষ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধীয় মৌলিক কোন পূর্ণ ধারণায় পৌঁছতে পারলো না। তার ফল হল এই যে, হিন্দু, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের মতো বড় ধর্মগুলোও শেষ পর্যন্ত 'বিশ্বই ব্রহ্ম' এই মতবাদের কোন না কোন ধারার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এ মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে বাঁচায় না বরং যুক্তি শাস্ত্রের অনুশাসনে তাকে দেউলিয়া করতে সহায়তা করে। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সাথে এক করে দেখার জন্য ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ জেগে ওঠে। তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে সকল ধারণা নষ্ট করে দেয়।"–পৃঃ ৪৫ (মল্লিক ব্রাদার্স)

এম এন রায় দুঃখ করে লিখেছেন, "পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষন করে না।

মুন্‌শী প্রেম চাঁদ (এম এ) লিখেছেন, "ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে, একথা সত্য নয়। কোন ধর্মই তরবারি সাহায্যে প্রচারিত হতে পারে না। তরবারি সাহায্যে কোন ধর্মকে প্রচারিত করা হলে সে ধর্ম বাঁচতে পারে না।

www.pathagar.com

ভারতে ইসলাম প্রচারিত হবার প্রকৃত কারণ হল, অস্পৃশ্য ও নিম্ন শ্রেণীদের উপর বর্ণ হিন্দুদের উৎপীড়ন। বৌদ্ধরা তাঁদের গৌরবান্বিত দিনে এই শ্রেণী বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তারা কিছু পরিমাণে সফলকামও হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর বর্ণ হিন্দুদের উৎপীড়ন আবার আরম্ভ হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করার জন্যে নানারকম উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল এবং বৌদ্ধ যুগে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু কিছু পরিমাণে সমানাধিকার ভোগ করেছিল তারা তাদের নতুন অধিকার বিসর্জন দিতে অস্বীকৃত হল। তারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, একথা মনে করতে লাগল। কাজেই একটা বিরোধের সৃষ্টি হল।

ঠিক এই সময়ে সমানাধিকারের ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নতুন নীতি নিয়ে ইসলাম ভারতে আবির্ভূত হল। ইসলাম ধনী ও নির্ধন, উচ্চবর্ণ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকার করে না। যে মুহূর্তে একজন নিম্ন বর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে সেই মুহূর্ত থেকে সে আর অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয় না। সে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারে। সে একজন সৈয়দ মুসলমানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহারাদি করতে পারে। তখন সে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমান পর্যায়ে উন্নীত হত, যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ইসলাম দীক্ষা নেওয়ার আগে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে অস্বীকার করত। ... ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই ও সমান। একজন মুসলমান সাদরে একজন অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গণ করতে থাকে। কাজেই গ্রামের পর গ্রাম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যে সকল গ্রামে বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীগণ দ্রুত তাদের অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল। কাশ্মীর, আসাম, পূর্ববঙ্গ এর উদাহরণ। তিনি আরো বলেছেন, "দুঃখের বিষয়, আজও পর্যন্ত বর্ণ হিন্দুগণ তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারেননি।"

"ইসলাম কোনদিনই তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়নি ; এটা প্রচারিত হবার কারণ হল, এ ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিল যে সকল মানুষই সমান। এখন প্রয়োজন, মিথ্যার উপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা ভুলে যেতে হবে। যে মুসলমানকে আমরা বিদেশী বলে গণ্য করছি তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে মানবজাতির পরিত্রাতা।"–মুনশী প্রেম চাদ

www.pathagar.com

২. (মানবেন্দ্র নাথ রায়) "ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামী বৌদ্ধ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করল তাতেই প্রচলিত ধর্ম বিরোধী অগণিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে নীড়হীন নির্যাতিতের মত দিশেহারা হয়ে ফিরেছে, তারাই ইসলামের মতবাদকে জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ।"

৩. সুরজিৎ দাসগুপ্ত লিখেছেন, "ভারতবর্ষের সর্বত্রই নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণ অত্যাচার ও শোষণ করেছে, হিন্দু নেতারা নিজেদের ধর্মকে যতটা উদার বলে প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম যে সত্যই ততটা উদার নয়, এর উদারতা যে বহুলাংশে প্রচার সর্বস্ব তার প্রমাণ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের আচরণেই মেলে। কেরালার নিম্ন বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমানুষিক ব্যবহার অকল্পনীয় ; রাজস্থানে এই বর্ণভেদ প্রথা যে বাংলার চাইতে কত সহস্র গুণ ভয়াবহ তা আমার স্বচক্ষে দেখা। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণের লোকদের বর্ণ অনুসারে পৃথক পৃথক পোশাক ও গহনা আছে এবং নিম্নবর্ণের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ উচ্চবর্ণের লোকের সাজ-পোশাক।"–(ভারতবর্ষ ও ইসলাম)

৪. ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ, "বাংলার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইসলাম এনেছিল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার ও মুক্তির বাণী নিয়ে।"

৫. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, "ইসলামের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ইসলাম মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ সৃষ্টি করে না। তরবারি নয়, এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্য বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"

৬. "ভারতবর্ষে তলোয়ারের জোরে বা শাসন ক্ষমতার প্রভাবে ইসলাম প্রচার হয়েছে এ ধারণা ঠিক নয়, তাই যদি হত তাহলে দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি শাসকদের মূল কেন্দ্রে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হত, তা না হয়ে প্রান্ত বিন্দুগুলিতে যেমন—কাশ্মীর, কেরালা, বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য ঘটলো। এর কারণ ইসলামের আদর্শ ইসলামকে ভারতবর্ষে প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছে।"–সুরজিৎ দাশগুপ্ত

## আর্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী মনোভাব ও ভাগ্যের পরিহাস

সংস্কৃত ভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ভারতবর্ষে এলো তখন ভারতবর্ষের আদি জনসাধারণ (দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি) উত্তর ভারত ত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষীদের পক্ষে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে দক্ষিণ ভারত

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে আদিবাসীদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান আশ্রয়স্থল। এর ফলে দাক্ষিণাত্য ও আর্যবর্ত চেতনা হিসেবে দুটি পৃথক অঞ্চল গড়ে ওঠে। এদিকে উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে যে ধর্মবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পেষণে বৌদ্ধধর্ম পূর্ব ভারতে এসে আশ্রয় সন্ধান করে। এরপর যখন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দিল্লীতে সুলতান শাহী প্রতিষ্ঠা করে তখন সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হল দক্ষিণ ভারত। আধুনিককালে হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো দেখতে হলে যেমন দক্ষিণ ভারতে যেতে হয়, তেমনি মুসলিম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো উত্তর ভারতে প্রাপ্তব্য।

"ভারতবর্ষ ও ইসলাম" গ্রন্থে সুরজিৎ দাশগুপ্ত স্পষ্ট উল্লেখ করে লিখেছেন, "বহু বছর ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর বর্ণহিন্দুদের জুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে তাদের ধর্মের কবল থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকর অন্যতম, তিনিও হিন্দু থেকে হাজার হাজার হিন্দুকে নিয়ে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।"

তিনি আরো লিখেছেন, "মনে রাখা ভাল যে একদা বর্ণ হিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টি ভঙ্গির প্রক্রিয়াতে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"

## ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা

যে কোনো জাতির সংস্কৃতি বা সভ্যতা প্রকাশের শক্তিশালী উপাদান হল তার ভাষা। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাচীন ভারতের জনগোষ্ঠী প্রধান চারটি ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যথা ঃ

১. অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী ঃ কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, গদর, শবর, খাসী, নিকোবর সহ প্রায় সমগ্র আদিবাসীদের ভাষাগুল এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ এদেরকে 'নিষাদ জাতি' আখ্যা দিয়েছেন।

২. দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী ঃ এই গোষ্ঠীর আধুনিক ভাষাগুলি হল ঃ (ক) মালয়ালাম, (খ) কানাড়া, (গ) তামিল, (ঘ) তেলেগু, (ঙ) বাংলা প্রভৃতি। এই ভাষাগুলি উচ্চস্তরের সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে এদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। বাংলা অবশ্য সংস্কৃত প্রভাবে সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

৩. আর্য ভাষা গোষ্ঠী ঃ সংস্কৃতি, কাশ্মীরি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. ভোট চীন ভাষা গোষ্ঠী ঃ এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এদের প্রধান ভাষাগুলি হল, মিজো, গারো, নাগা, মনিপুরী প্রভৃতি উত্তর পূর্ব্ব পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা। আর্যদের আগমনের পরে চীন দেশ থেকে মঙ্গলজাতীয় লোকদের আগমন ঘটে, ভোট নামে মঙ্গলদের একটি শাখা হিমালয়ের পাদমূলে তিব্বত ও পূর্ব ভারতের পাদমূলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮১ সালের আদম সুমারি অনুসারে ভারতে বর্তমান ৮৬২টি ভাষা প্রচলিত আছে।

❐

www.pathagar.com

## মুহাম্মাদ সিদ্দিকের লেখা বইসমূহ ঃ

১. স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম
২. নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন
৩. বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব
৪. Basic Islamic Prayers
৫. ষড়যন্ত্রের কবলে ফিলিস্তিন
৬. ষড়যন্ত্রের কবলে দেশেদেশে মুসলমান
৭. ষড়যন্ত্রের কবলে আফগানিস্তান
৮. ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ
৯. ষড়যন্ত্রের কবলে উপমহাদেশের মুসলমান
১০. সংঘর্ষের মুখে ইসলাম
১১. মার্কিন ষড়যন্ত্র
১২. কুরআনের যুলকিফ্‌ল ও মুসলিম-বৌদ্ধ সংলাপ
১৩. দেশের কথা
১৪. ভারতের কথা
১৫. মুসলিম বিশ্বের কথা
১৬. ফিলিস্তিনের কথা
১৭. ধর্মের কথা
১৮. শিল্প-সংস্কৃতির কথা
১৯. সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইসলাম
২০. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান (সাইদুর রহমানের সঙ্গে)
২১. গুজরাতের গণহত্যা
২২. genocide in gujrat 2002
২৩. ভারতে মুসলিম নির্যাতন
২৪. Minoritias and India
২৫. ভারতে নির্মম এখনিক ক্লিনসিং

লেখকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শামীমা সিদ্দিকার প্রকাশিত ইংরেজী বই Muslims of Nepal ( নেপালের মুসলমানদের উপর প্রকাশিত বিশ্বের প্রথম বই)।

www.pathagar.com

## আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন**–(১-২০ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- **কুরআন বুঝা সহজ**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন**–(১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **তাদাব্বুরে কুরআন**–(১-৯ খণ্ড)
  – মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **সহীহ আল বুখারী**–(১-৬ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা**–(১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মা'আনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) – (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- **এহ্ইয়াউস সুনান**
  –ডঃ খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- **দারিদ্র বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি**
  – মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- **বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ষড়যন্ত্র**
  – আনসার আলী
- **কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা** (জিনতত্ত্ব)
  – প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- **প্রশ্নোত্তর**
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- **ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেষ্টো**
  – মরিয়ম জামিলা
- **মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ**
  – ইবনে সাঈজ উদ্দীন